ভূত ও মানুষ

চারিটী গল্প, অর্থাৎ

১। বাঙ্গাল নিধিরাম,
২। বীরবালা,
৩। ভুল্লু,
৪। নয়নচাঁদের ব্যবসা

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
৩৮/২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো-মেশিন-প্রেসে"
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩১২ সাল।

প্রকাশকের নিবেদন।

ভূত ও মানুষের নূতন সংস্করণ বাহির হইল। সুলেখক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় অনেকেই অবগত আছেন। এই ভূত ও মানুষে সে পরিচয় আরও পরিস্ফুট। ইহা উপন্যাস—সরস, মধুর, কৌতূহলোদ্দীপক গল্প কথা—ভূত ও মানুষের অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য-কাহিনী। যিনি পড়িবেন, তিনিই রহস্যামোদ উপভোগ করিবেন—ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। ইতি—

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
৮ই ফাল্গুন,
১৩১২ সাল।

প্রকাশক।

বাঙ্গাল নিধিরাম

প্রথম অধ্যায় : পীড়িত পথিক

নিধিরাম দেবশর্ম্মার বাটী পূর্ব্বদেশে। নিধিরাম মহাকুলীন। কিন্তু বিবাহ করা তাঁহার ব্যবসায় নয়। একটির অধিক তিনি বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিয়া টাকা লন নাই। নিধিরামের পৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ ভূমি-সম্পত্তি ছিল। সন্তান-সন্ততি হয় নাই। সেই ভূমি হইতেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কোনওরূপে দিনপাত হইত।

যখন নিধিরামের বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর, তখন তাঁহার গৃহ শূন্য হইল। ব্রাহ্মণীর শোকে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি করিবেন? সকলই ভগবানের ইচ্ছা, পুনরায় বিবাহ করিতে অনেকেই তাঁহাকে অনুরোধ করিল। নিধিরাম সে কথা শুনিলেন না। বাকি কয়টি দিন ভগবানের আরাধনা করিয়া কাটাইবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন।

এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল। একবার তাঁহার গঙ্গাস্নান করিবার ইচ্ছা হইল। একাকী তিনি বাটী হইতে বাহির হইলেন, একাকী চণ্ডীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাস লইয়া প্রাতে গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যায় গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ তিনি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইলেন। আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া, মা'র বক্ষে প্রাণ সমর্পণ করিবার অভিলাষে আস্তে আস্তে বুকে হাঁটিয়া তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। বালুকাময় তটে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইল। বেল দশটা বাজিল। প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে জগৎ ক্রমে অগ্নিময় হইতে লাগিল। নিধিরামের প্রাণ তবুও বাহির হয় না। উঠিবার শক্তি নাই, নড়িবার শক্তি নাই। কণ্ঠগত প্রাণ, কিন্তু সে সামান্য প্রাণটুকু শরীর হইতে বাহির হইতে চায় না। তাঁহার জ্ঞান ছিল। "শীঘ্র লও মা! আর কেন মা?" ধীরে ধীরে মাকে ডাকিতে লাগিলেন।

দুই জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। নিধিরাম ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে বলিলেন :—"মহাশয়! পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কৃপা করিয়া যদি আমার মুখে একটু জল দেন, তাহা হইলে এই আসন্ন কালে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি।"

এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

নিধিরাম বলিলেন,—"আমার নিবাস পূর্ব্বদেশে।"

পুনরায় সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের নাম?"

নিধিরাম উত্তর করিলেন,—"আমার নাম নিধিরাম দেবশর্ম্মা। কিন্তু মহাশয়! আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি এক্ষণে পরিচয় দিতে পারি না। মুখে যদি একটু জল দেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার ব্যাতোন?"

নিধিরাম বলিলেন,—"আমি চাকরি করি না। আমার বেতন নাই। যান্, আপনারা বাড়ী যান্। আমার জলে কাজ নাই।"

ব্রাহ্মণ, আপনার সংগী অপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"চল, হে, এককড়ি! চল বাড়ী যাই, বেলা হইল, রৌদ্রে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

এককড়ি কোনও উত্তর না করিয়া গঙ্গার জলে নামিয়া, এক কোষা জল লইলেন। নিধিরামের নিকট আসিয়া তাঁহার হাত মুখ ধোয়াইতে লাগিলেন।

এককড়ির সংগী বলিলেন,—"ছি! এই বিদেশী ঘাটের মড়াকে ছুঁইয়া ফেলিলে? তোমাকে পুনরায় স্নান করিতে হইবে। আমি বাটী চলিলাম।" এই বলিয়া এককড়ির সংগী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এককড়ি নিধিরামকে উত্তমরূপে ধোয়াইয়া মুছাইয়া জলপান করাইলেন। তাহার পর নিধিরামের নাড়ী দেখিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—"মহাশয়! আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র কিঞ্চিৎ অবগত আছি। আপনার নাড়ী নাই সত্য; শরীর শীতল হইয়াছে সত্য। কিন্তু বোধ হয়, নাড়ী শীঘ্রই গজিবে, শরীর শীঘ্রই উষ্ণ হইবে। এ যাত্রা আপনি রক্ষা পাইবেন।"

নিধিরাম বলিলেন,—"রক্ষা পাইতে আমার কিছুমাত্র সাধ নাই। জীবনে আমার সুখ নাই। আজ মা'র তীরে দেহ ত্যাগ করিব, ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি আছে?"

বৃদ্ধ এককড়ি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুই চারি জন প্রতিবাসীর সহায়তায়, নিধিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া যাইলেন। যথাবিধি তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

এককড়ির বাড়ীতে কেবল স্ত্রী, একটি কন্যা ও একটি শিশু-পুত্র। এককড়ি সদ্‌বংশ-জাত কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু দরিদ্র। কন্যার বিবাহ দিতে টাকা লাগে, সে জন্য আজ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। দেখিতে দেখিতে কন্যাটির বয়স ষোল বৎসর হইয়া পড়িল। তাঁহাদিগের ঘরে কন্যা বড় হইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। তা বলিয়া কন্যার বিবাহ বিষয়ে এককড়ি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কুলমর্য্যাদায় আপনার সমান অনেকের নিকট গিয়া তিনি কত মিনতি করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই এত টাকা চাহিয়াছিলেন যে, এককড়ির ভিটা-মাটি বিক্রয় করিলেও সে টাকা হয় না। এককড়ির কন্যার নাম হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী পরমা সুন্দরী। কিন্তু কুলীনের ঘরে সৌন্দর্য্যের গৌরব নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বদরুদ্দিনের বেটা গবিরুদ্দিন

নিধিরামকে ঘরে আনিয়া এককড়ি সপরিবারে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার পীড়া উপশম হইয়া আসিল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, এককড়ি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তখন বুঝিলেন যে, নিধিরাম উচ্চশ্রেণীর স্বভাব কুলীন। এককড়ি মনে করিলেন,—"বিধাতা এইবার বুঝি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। এরূপ পাত্রে কন্যা দান করিতে পারিলে, পিতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে।"

নিধিরাম ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন। সুস্থ হইয়া তিনি এককড়ির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন,—"মহাশয়! যদিও এ প্রাণ আমার অতি তুচ্ছ পদার্থ, তথাপি আপনার দয়া-মায়া কখনও ভুলিতে পারিব না, আপনার ধার কখনও শুধিতে পারিব না। আমার এমন কিছু নাই, যাহা দিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।"

এককড়ি বলিলেন,—"প্রাণরক্ষা করি, এমন ক্ষমতা আমার কোথায়? সমুদয়

ঈশ্বরের হাত। আপনার আয়ু ছিল, আপনি রক্ষা পাইলেন। আমি আপনার কিছুই করিতে পারি নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমি কোথায় কি পাইব? তবে যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি ভিক্ষা আপনার নিকট আমি প্রার্থনা করি।"

নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মহাশয়? আজ্ঞা করুন। ক্ষমতা থাকিলে অবশ্য আপনার আজ্ঞা পালন করিব।"

এককড়ি বলিলেন,—"ক্ষমতা আপনার সম্পূর্ণ আছে। মনে করিলেই আপনি করিতে পারেন। সত্য করুন যে, আপনি করিবেন, তাহা হইলে বলি।"

নিধিরাম বলিলেন,—"ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয় আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

এককড়ি বলিলেন—"আমি কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ। টাকার অভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারি নাই। আপনি মহাকুলীন, স্বমেল, স্বভাব। আপনাতে কন্যা অর্পণ করিলে আমার কুল রক্ষা হয়, পিতৃপুরুষদিগের মুখ উজ্জ্বল হয়। আপনি আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করেন, আপনার নিকট আমার এই ভিক্ষা।"

নিধিরাম স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হিরণ্ময়ীর রূপে-গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল। তবে অধিক বয়স হইয়াছে। এ বয়সে এরূপ লাবণ্যবতী বালিকাকে বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া হিরণ্ময়ীর চিন্তা মন হইতে দূর করিতে সর্বদাই তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই জন্যই পীড়া হইতে উঠিয়া, সম্পূর্ণভাবে পূর্বরূপ বল পাইতে না পাইতে, এ স্থান হইতে পলাইতেছিলেন। সংসার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া দেশপর্য্যটন, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ধর্মকর্মে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন, এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—"মহাশয়! আমার বয়স হইয়াছে। পুনরায় বিবাহ করিবার সময় নাই। বিশেষতঃ কন্যা হিরণ্ময়ী পরম রূপবতী, কিছুতেই আমি তাহার উপযুক্ত নই। আর সংসার করিব না, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। অতএব এ অনুরোধটি আমাকে করিবেন না। আমাকে ক্ষমা করুন।"

এককড়ি বলিলেন,—"আপনি এইমাত্র সত্য করিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যা দায় হইতে উদ্ধার না করিলে আপনি সত্যে পতিত হইবেন। আপনার বিবাহ করিবার বয়স যায় নাই। আপনার মত পাত্র পাইলে হিরণ্ময়ীকে ভাগ্যবতী বলিয়া জানিব। সত্যভ্রষ্ট হইবেন না।"

নিধিরাম বলিলেন,—"আপনি আমাকে ঘোর বিপদে ফেলিলেন। হিরণ্ময়ী রূপবতী, আমি কিছুতেই তাহার উপযুক্ত পতি নই। আমাকে ক্ষমা করুন।"

এককড়ি বলিলেন,—"আপনার আর বিপদ কি? বিপদ আমার। কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আজ কয় বৎসর আমি লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি। কিন্তু আমার টাকা নাই। বিনা টাকায় কেহ বিবাহ করিবেন না। সম্প্রতি আমি জয়দেবপুরে গিয়াছিলাম। সেখানকার জমিদার আমাদের ঘর। তিনি এই গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র নবীন যেমন কুলে-শীলে, সেইরূপ রূপে-গুণে সুপাত্র। সে মাতুলালয়ে আসিয়াছিল। গৃহিণীর বড় সাধ হইল যে, তাহাকে জামাতা করেন। আমি তাহার পিতার নিকট গিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া কত কাঁদিলাম। তিনি তিন হাজার টাকা চাহিলেন। তিন হাজার টাকা কোনও পুরুষে কখনও চক্ষে দেখি নাই। যেমন উচ্চ আশা করিয়াছিলাম, সেইরূপ ফল পাইয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলাম।"

এককড়ি পুনরায় বলিলেন,—"তাহার পর আবার বিপদের উপর বিপদ। এই

গ্রামে বদরুদ্দিন সেখ বলিয়া একজন ডাক্তার আছেন। এখন আর তিনি বদরুদ্দিন নাই। চিকিৎসা করিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে জমিদারী কিনিলেন, এই স্থানে ইমারত বাড়ী করিলেন, ও টাকার মহাজনী করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক টাকার মানুষ। যখন তাঁহার অনেক টাকা হইল, তখন তিনি "বদরুদ্দিন সেখ" নাম ছাড়িয়া "বৈদ্যনাথ সেন" নাম লইলেন। টাকা হইলে কি না হয়? ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই তাঁহাকে লইয়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে একগাছা সুতা তিনি পরিলেন। প্রথম প্রথম সুতাগাছটি কোমরে রাখিতেন, নাভির উপরে তুলিতেন না। ক্রমে আস্তে আস্তে সুতাগাছটি কাঁধের উপর তুলিলেন। তখন সেটি যজ্ঞোপবীত হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় তিনি "সেন" ছাড়িয়া "শর্মা" উপাধি গ্রহণ করিলেন। আজকাল তিনি "দেবশর্মা" হইয়াছেন। এখন তাঁহার নাম বৈদ্যনাথ দেবশর্মা। তাঁহার পুত্র গবিরুদ্দিন এখন গোবিন্দচন্দ্র দেবশর্মা হইয়াছেন। সমাজে বেশ চলিয়া গিয়াছেন। কোনও উৎপাত নাই। গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কন্যার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই উপলক্ষে দেশ-দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জমা হইয়াছিলেন। এক এক ঘড়া আর দশ দশ টাকা হইতে এক শত টাকা নগদ দিয়া পণ্ডিতসমাজকে বিদায় করিয়াছিলেন। চারিদিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের সম্প্রতি গৃহশূন্য হইয়াছে। হিরণ্ময়ীর রূপের কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিবেন এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। হিরণ্ময়ীর সহিত বিবাহ না দিলে তিনি আত্মহত্যা হইয়া মরিবেন, বাপ মার নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি বৈদ্যনাথ দেবশর্মার ৫০০ টাকা ধারি। তিনি আমার নামে ডিক্রি করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে ডাকাইয়া প্রথম নানা প্রলোভন দেখাইলেন। অনেক টাকা দিবেন, অনেক গহনা দিবেন, কত কি বলিলেন। আমি যখন তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলাম না, তখন নানারূপ ভয় দেখাইলেন। আমাকে জেলে দিবেন, বৃদ্ধ বয়সে কয়েদখানায় পাঠাইবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আজ যেন তিনি বৈদ্যনাথ দেবশর্মা হইয়াছেন, কিন্তু আমি ত জানি তিনি কে? না হিন্দু না মুসলমান, না ব্রাহ্মণ না কায়স্থ। প্রাণ থাকিতে তাঁর ঘরে আমি কি করিয়া কন্যা দিই? এখন বুঝিয়া দেখুন, আমি কিরূপ বিপদে পড়িয়াছি। আপনি যদি উদ্ধার করেন, তবেই হয়।"

ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনিয়া নিধিরাম অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া অবশেষে বলিলেন;—"আচ্ছা মহাশয়! কাল আপনাকে আমি এ কথার উত্তর দিব।"

তৃতীয় অধ্যায় : এ কালের মেয়ে

এককড়ি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। মেটে বাড়ী। অন্দরমহল সদর-বাড়ী সব এক। এককড়ির পরিবারবর্গ সকলেই নিধিরামের পীড়িতাবস্থায় সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। সেই দিন একটু অবসর পাইয়া নিধিরাম হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী! তোমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। তুমি এক্ষণে বালিকা নও। আমি যাহা বলি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। আমার বয়স হইয়াছে। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না। বৃদ্ধ স্বামী হইয়াছে বলিয়া চিরকাল তুমি দুঃখ করিবে। আমার সেই বড় ভয় হইতেছে। কি করি বল দেখি?"

হিরণ্ময়ী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, চুপ করিয়া রহিলেন, একটিও কথা কহিলেন না।

নিধিরাম পুনরায় বলিলেন,—"কি করি বল না? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই হইবে। তুমি কিছু না বলিলে কা'ল আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

হিরণ্ময়ী কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—"কাঁদিও না, কান্না কিসের? বৃদ্ধ স্বামী হইবে বলিয়া কাঁদিতেছ? তা, তোমার বাপকে বুঝাইয়া বলিব। আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবার কথা আর তিনি উত্থাপন করিবেন না।"

হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"আপনি বৃদ্ধ বলিয়া আমি কাঁদি নাই, আপনি চলিয়া যাইবেন, তাই কাঁদিতেছি। আপনি তো বৃদ্ধ নন, 'বৃদ্ধ, বৃদ্ধ' কেন বলিতেছেন?"

নিধিরাম বলিলেন,—"তবে আমাকে বিবাহ করিতে তোমার অমত নাই? তুমি সুখী হইবে? তুমি আমাকে ভক্তি করিবে? তুমি আমাকে ভালবাসিবে?"

হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"নিশ্চয়।"

নিধিরাম বলিলেন,—"সত্য?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"সত্য।"

নিধিরাম বলিলেন,—"ঠিক?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"ঠিক।"

নিধিরাম বলিলেন,—"দেখ, দুই দিন পরে আমার চুল পাকিয়া যাইবে, দাঁত পড়িয়া যাইবে, আমি কদাকার বৃদ্ধ হইয়া যাইব। তখন তো তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে না? তখনও তো ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে?"

হিরণ্ময়ী বলিলেন—"নিশ্চয়। আপনি বৃদ্ধ হইবেন, আর আমি কি চিরকাল এইরূপই থাকিব?"

নিধিরাম বলিলেন,—"দেখ হিরণ্ময়ী! তোমাকে দেখিয়াই আমি তোমার রূপে মোহিত হইয়াছিলাম। এরূপ বয়সে তোমার মত সুরূপা বালিকাকে বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া আমি এ স্থান হইতে এত সত্বর প্রস্থান করিতেছিলাম। তোমাকে বড় ভালবাসি। এ বয়সে আমাদের মনে যে কোনও ভাব অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা আর মুছিয়া ফেলিবার যো নাই। কিন্তু তোমাদের চিত্ত এখন অন্যরূপ। তোমাদের চিত্ত এখন চঞ্চল। আজ তোমাদের মন একরূপ, কা'ল অন্যরূপ। আমার সেই বড় ভয়।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়! আমি এক্ষণে আর বালিকা নাই। সকল কথা আমি বুঝিতে পারি। মনে মনে আপনাকে পতি বলিয়া বরিয়াছি। আপনি আমাকে বিবাহ করেন, সে নিমিত্ত দেবতাদিগকে কত ডাকিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনি আমার পতি। চিরকাল আপনার দাসী হইয়া থাকিব। আমি কুলটা নই যে, দুই দিন পরে আমার মনের পরিবর্ত্তন হইবে। বৃদ্ধ হউন, আতুর হউন, যাহা হউন, দেবতাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনার পদে এখন যেরূপ আমার মতি রহিয়াছে, চিরকাল সেইরূপই থাকিবে।"

এই বলিয়া হিরণ্ময়ী সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। নিধিরাম সেই দিক্ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে করিলেন,—"ভাল গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলাম! খুব ফাঁদে পড়িলাম! এ বয়সে আবার এরূপ মন কেন? হিরণ্ময়ীতে প্রাণ আমার একবারে জড়িত হইয়া গিয়াছে। হিরণ্ময়ী বিনা জীবন বৃথা। পুস্তকে যে ভালবাসার কথা বলে, তাই এই। ভালবাসার কথা শুনিলে পূর্ব্বে হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, মনে করিতাম, সে আবার কি? বুড়ো বয়সে আচ্ছা আমাকে ধেড়ে রোগে ধরিল!"

নিধিরামের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ স্থির হইল। পাড়া-প্রতিবাসী সকলে

জানিল। বদরুদ্দিন সেখ অর্থাৎ বৈদ্যনাথ দেবশর্মাও এ কথা শুনিলেন। চুপি চুপি তিনি ডিক্রিখানি জারি করিলেন। এককড়ির নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। বিবাহের একদিন থাকিতে তাঁহাকে ধরাইয়া রামনগরের জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন।

এককড়ির ঘরে কান্নাকাটি পড়িল। হিরণ্ময়ী ও তাঁহার মাতা মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "বৃদ্ধ বয়সে জেলখানায় গিয়া বাবা আর বাঁচিবেন না," এই কথা বলিয়া হিরণ্ময়ী ঘোরতর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী! কাঁদিও না। আমি দেশে যাই। সেখানে আমার যাহা কিছু ভূমিসম্পত্তি আছে, তাহা বেচিলে পাঁচ শত টাকার অধিক হইবে, তাহা আনিয়া তোমার পিতাকে আমি উদ্ধার করিব।"

এইরূপ অনেক বুঝাইয়া, অনেক প্রবোধ দিয়া, নিধিরাম বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। প্রথম রামনগর যাইয়া জেলখানায় এককড়ির যাহাতে কোনও ক্লেশ না হয়, এইরূপ উপায় করিয়া আপনার দেশাভিমুখে চলিলেন। দেশে উপস্থিত হইয়া আপনার সমুদয় ভূমি-সম্পত্তি ৭০০ টাকায় বিক্রয় করিলেন। ৬০০ টাকার নোট একটি টিনের চোঙ্গের ভিতর রাখিয়া ও এক শত টাকা নগদ গেঁজেতে করিয়া আপনার কোমরে বাঁধিলেন। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া পুনরায় চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ তুমুল ঝড়

নিধিরাম নৌকা করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একদিন অতিশয় দুর্যোগ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিন পূর্ব-বাতাস চলিতে লাগিল, টিপটিপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, নদীতে ঘোরতর তরঙ্গ উঠিল। অতি ক্লেশে মাঝিরা নৌকা চালাইতে লাগিল। ঝড় ও তুফান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া মাঝিরা এক স্থানে নৌকা লাগাইল। সে স্থানে তিনখানি বড় নৌকা বাঁধা ছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল, বায়ু ও ঢেউ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। একখানি চাদর মুড়ি দিয়া নিধিরাম নৌকার ভিতর শুইয়া হিরণ্ময়ীর রূপ মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারেন না। হঠাৎ তিনি জাগরিত হইলেন। জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। ঝড় ও তরঙ্গের শব্দে কানে তালা লাগে। ছইয়ের ভিতর হইতে যেই একটু মুখ বাহির করিয়াছেন, আর জলের ঝাপটা তাঁহার মুখে লাগিল। বারিকণাগুলি যেন সূচের মত তাঁহার মুখে বিঁধিয়া যাইল। মাঝিরা বলিল, "মহাশয়! এরূপ ঝড় তুফান তো কখনও দেখি নাই। বাতাস এখন উত্তরে হইয়াছে, আমরা নদীর উত্তর ধারে রহিয়াছি। নৌকা রাখা ভার হইয়াছে।"

নিধিরাম একবার ভাবিলেন,—"নৌকা হইতে উঠিয়া গ্রামে গিয়া আশ্রয় লই।" কিন্তু দিনের বেলা তিনি দেখিয়াছিলেন যে, নদীর উপরেই প্রায় এক ক্রোশ মাঠ, তাহার পর গ্রাম; সে অন্ধকারে, সে প্রবল ঝড়ে, সে জলের ঝাপটে, এক ক্রোশ মাঠ পার হইয়া গ্রামে যায় কার সাধ্য? তাই তিনি নৌকাতেই বসিয়া রহিলেন। ঝড়ের বেগে পট্‌পট্‌ করিয়া নৌকার কাছি ছিঁড়িতে লাগিল, লগি উঠিয়া পড়িতে লাগিল। সকলের ভয় হইল, কাছি ছিঁড়িয়া নৌকা পাছে নদীর মাঝখানে চলিয়া যায়। যতবার কাছি ছিঁড়িয়া যায়, মাঝিরা ততবার কাছি বাঁধিয়া দেয়, যতবার

লাগি উঠিয়া পড়ে, মাঝিরা ততবার পুনরায় পুঁতিয়া দেয়। নিধিরামও মাঝিদিগের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। বড় নৌকাগুলির কাছি ছিঁড়িয়া একে একে নদীমধ্যে চলিয়া গেল। অন্ধকারে ভালরূপ কিছু দেখিবার যো ছিল না। ঝড়ের শব্দের মাঝখানে একটু মনুষ্য-কোলাহলশব্দ পান্, চাহিয়া দেখেন যে, নক্ষত্রবেগে বড় নৌকার আলোটি মাঝখানের দিকে যাইতেছে। মুহূর্তমধ্যে নৌকার লণ্ঠনের আলোটি নিবিয়া যায়। মাঝিরা বলে,—"মহাশয়, ঐ একখানি নৌকা ডুবিয়া গেল।" এইরূপে একে একে দুইখানি বড় নৌকা নদীর মাঝখানে গিয়া ডুবিয়া গেল। কেবল একখানি বড় নৌকা রহিল। নদীর উচ্চ পাড়ের নীচে নিধিরামের নৌকা ছিল। তাঁহার নৌকাখানি ছোট, সে জন্য ঝড়ের প্রবল বেগ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নৌকায় লাগিতেছিল না। তাঁহার নৌকাখানি হয় তো বাঁচিয়া যাইবে, নিধিরামর এই একটু ভরসা ছিল।

কিন্তু সে ভরসা মিথ্যা হইল। অবশিষ্ট বড় নৌকাখানি কাছি ছিঁড়িয়া, তাঁহার নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার নৌকার হালটি উচ্চ ভাবে ছিল। বড় নৌকার লোকেরা সেই হালটি ধরিয়া ফেলিল। নিধিরামের নৌকার সমস্ত কাছিগুলি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া গেল। দুইখানি নৌকাই তীরের মত নদীর মাঝখানে দৌড়িল। অল্পক্ষণ মধ্যেই দুইখানি নৌকা ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বড় নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। নিধিরামের নৌকাখানিও জলমগ্ন হইল। নিধিরাম নদীর মাঝখানে ভাসিতে লাগিলেন। সাঁতার তিনি উত্তম জানিতেন। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ ঢেউ, ঘোর অন্ধকার, দিকের ঠিক নাই। কাহার সাধ্য সাঁতার দেয়, আর সাঁতার দিয়াই বা কোন্ দিকে যাইবেন? অল্প অল্প হাত-পা নাড়িয়া তিনি কেবল ভাসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাসিয়া থাকাও দুঃসাধ্য কথা। পর্বতসদৃশ তরঙ্গরাশি তৃণবৎ তাহাকে তুলিতে ফেলিতে লাগিল। ঢেউয়ের আঘাতে তাঁহার শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। একবার তরঙ্গের শিখরদেশে উঠিয়া যখন তিনি পুনরায় নামিতে থাকেন, সেই সময়ে ঢেউয়ের মাথাটি ভাঙিয়া যায় ও জলের ঝাপ্টা তাঁহার নাকে-মুখে প্রবেশ করিয়া শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। ক্রমে তাঁহার হাত পা অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল। আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া নিধিরাম ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। "হা, হিরণ্ময়ি! তোমার পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, তোমার সে মধুমাখা মুখখানি আর দেখিতে পাইলাম না। হে করুণাময় জগদীশ্বর! তুমি আমার হিরণ্ময়ীকে সুখী করিও।" আসন্নকালে নিধিরাম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হাত পা আর নাড়িতে না পারিয়া নিধিরাম জলে ডুবিলেন। প্রাণের মায়া সহসা কেহ ছাড়িতে পারে না। জলে ডুবিয়াই পুনরায় একটু হাত পা নাড়িতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে আর একবার উপরে ভাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু আর বল নাই। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঘোর কাল-নিদ্রা তাঁহাকে ক্রমে ঘিরিতেছে। পুনরায় ডুবিলেন। ডুবিতে না ডুবিতে তাঁহার পায়ে কি ঠেকিল। অমনি তাঁহার একটু চমক হইল। পায়ে যে দ্রব্য ঠেকিল, তাহা তিনি ধরিলেন, একটু বল প্রকাশ করিয়া পুনরায় উপরে ভাসিয়া উঠিলেন। মনকে প্রবোধ দিয়া নিদ্রাবেশ দূর করিলেন। পুনরায় তাঁহার চেতনা হইল। জীবনের আশা হইল, তাহাতে শরীরে কিঞ্চিৎ শক্তিরও সঞ্চার হইল। দেখিলেন যে, একগাছি কাছি তাঁহার পায়ে ঠেকিয়াছিল। টানিয়া দেখিলেন যে, সেই কাছি অতি দূরে কিছুতে বাঁধা আছে। নিধিরাম ভাবিলেন, কাছির অপর দিক্ হয় জলমগ্ন নৌকায় বাঁধা আছে, না হয় নদীর কিনারায় খোঁটায় বাঁধা আছে। বায়ুর প্রবলবেগে কাছি ডুবিয়া যায় নাই, সরলভাবে ভাসিতেছিল। তিনি সেই কাছিটি

ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পর্বতাকার তরঙ্গের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ কথা নহে। যাহা হউক, অতি কষ্টে কিছু দূর গিয়া তিনি মাটী পাইলেন। ক্রমে এক কোমর জলে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও ঢেউ তাঁহার মাথার উপর দিয়া যাইতেছিল। ক্রমে কিনারায় গিয়া উঠিলেন। দেখিলেন যে কাছিগাছটি একটি খোঁটায় বাঁধা আছে। শরীর একবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই খোঁটাটি ঠেশ দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। উপর হইতে চারিদিকে পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। নিধিরাম ভাবিলেন,—এত কষ্টে যদি প্রাণ রক্ষা হইল, শেষে কি আবার মাটী-চাপা পড়িয়া মরিব না কি!

নিধিরাম দাঁড়াইলেন। অনেক পরিশ্রম করিয়া পাড়ের উপর গিয়া উঠিলেন। পাড়ের উপর দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে বাতাসে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার! কোন্ দিকে লইয়া যাইতে লাগিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। মনে করিলেন যে, "যদি একটি গাছ পাই তো ধরিয়া বসিয়া থাকি; তাহার পর সকাল হইলে গ্রাম অনুসন্ধান করিব।" একবার একটি গাছ পাইলেন, কিন্তু সেটি চারা বাবলা গাছ। আগ্রহের সহিত ধরিতে গিয়া, তাঁহার সমস্ত হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল। বাতাসে পুনরায় তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। একবার তাঁহাকে পড় হইতে নদীর ভিতর ফেলিয়া দিল। অতি কষ্টে পুনরায় তিনি উপরে উঠিলেন। পুনরায় বাতাসে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, পাছে পুনরায় নদীর ভিতর ফেলিয়া দেয়, এই ভয়ে তিনি বুকে হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি ঝোপের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিবার মানসে যেই অগ্রসর হইয়াছেন, আর অমনি ফোঁস করিয়া একটি শব্দ হইল। নিধিরাম ভাবিলেন,—"মন্দ কথা নয়! সর্পাঘাতটিই বা বাকি থাকে কেন?" অপর দিকে গিয়া একটি গাছ পাইলেন। গাছটি ধরিয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—"চারিদিক্ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই স্থানটি উচ্চ। এখানে অনেক সাপ আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকিবে। মাটীতে এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা ভাল নয়। গাছের উপর বসিয়া থাকি। আস্তে আস্তে গাছে উঠিয়া একটি খুব বড় ডালের উপর বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝড় থামিল, বৃষ্টি থামিল, দুই একটি নক্ষত্র দেখা দিল, অন্ধকারের ঘোর নিবিড়তা অনেকটা ঘুচিল। কিন্তু এখনও আর কত রাত্রি আছে, নিধিরাম তাহা বুঝিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালের প্রতীক্ষায় তিনি গাছের উপর বসিয়া রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ঐ গাছে

সন্ধ্যার সময় কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই স্থানে মড়া পোড়াইতে আসিয়াছিলেন। সে দিনকার ঘোর দুর্যোগে তাঁহাদিগের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। কাঠ, পাতা, সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা চিতা সাজাইলেন। মড়াটি চিতার উপরে রাখিলেন, কিন্তু আগুন কিছুতেই ধরাইতে পারিলেন না। সেই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কর্তা ব্যক্তি ছিলেন—উদ্ধব দাদা। মড়াটি না পোড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত উদ্ধব দাদা প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আর সকলে সে কথায় সম্মত হইলেন না। অবশেষে উদ্ধব দাদা বলিলেন,—"তা যদি না করিবে, তবে চল, এই গ্রাম হইতে শুষ্ক কাঠ, পাতা ও পাঁকাটি লইয়া আসি। আর অমনি একটু মদ খাইয়া আসি। বৃষ্টিতে ঠিক যেন ভিজা বিড়াল হইয়া গিয়াছি। হাড়ের

ভিতর পর্য্যন্ত কন্ কন্ করিতেছে।" মদের নাম শুনিয়া সকলে একবাক্য হইয়া সম্মত হইলেন। মড়াটি চিতার উপর পড়িয়া রহিল, কাছে কেহ রহিল না। এক ক্রোশ মাঠ পার হইয়া সকলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শুঁড়ির দোকানে বসিয়া মনের সুখে মদ খাইতে লাগিলেন। তাহার পর ক্রমে সেই তুমুল ঝড় উঠিল। তখন আর ঘরের বাহিরে যায় কার সাধ্য! সুতরাং সকলকে বসিয়া বসিয়া একটু ভাল করিয়া মদ খাইতে হইল। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ঝড় থামিল। তখন লোকের গোয়াল হইতে পাঁকাটি ও পাতা চুরি করিয়া উদ্ধব দাদার দল পুনরায় শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় টলিতে টলিতে কেহ গান করিতে লাগিলেন, কেহ বাজে বকিতে লাগিলেন। বক্তা সকলেই, শ্রোতা কেহই নয়।

এক জন বলিলেন,—উদ্ধব দাদার মদটুকু খাওয়া আছে, আবার টিকিটিও রাখা আছে।"

উদ্ধব দাদা উত্তর করিলেন,—"ওহে, তোমাদের টিকি না রাখিলে চলে, আমার চলে না। বংশজ ব্রাহ্মণ, বিয়ে হয় নাই। কাওরাণীর ঘরে থাকি, দেখা সাক্ষাৎ কাওরাণীর ভাত খাই। কেহ কিছু গোল তুলিলে অমনি টিকিটি খাড়া করিয়া ধরি। বলি, 'এই দেখ, বাবা, টিকি আছে।' অমনি সবাই চুপ, আর কথাটি কবার যো থাকে না।"

আর এক জন বলিলেন,—"কেন? ফোঁটা কাটিলেই তো হয়? রামেশ্বর খুড়োর মত ফোঁটা দেখালেই তো চলে?"

উদ্ধব দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামেশ্বর খুড়ো কি করিয়াছিলেন?"

লোকটি বলিল,—"রামেশ্বর খুড়োর নাতনীর বিবাহের কথা হইতেছিল। পাত্রপক্ষীয় লোকেরা কন্যা দেখিতে আসিবেন। রামেশ্বর খুড়োর ছেলে কিনু বলিল,—'বাবা! আজ আর মদ খাইও না। বাড়ীতে আজ দুই জন ভদ্রলোক আসিবে, একটা দিন নাই খাইলে?'

"রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'রাম রাম! আজ কি মদ খাইতে পারি? যাই, সকাল সকাল স্নান করিয়া আসি। তুমি জলখাবার আর রান্না বান্নার যোগাড় করিয়া দাও।' এই বলিয়া রামেশ্বর খুড়ো স্নান করিতে গেলেন। স্নান টান কিছুই নয়, আস্তে আস্তে গিয়া শুঁড়ির বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে দুই প্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া মদ খাইতে লাগিলেন। এ দিকে নাতিনীকে দেখিতে ঘরে সেই ভদ্রলোকেরা আসিয়াছেন। 'কর্ত্তা কোথায় কর্ত্তা কোথায়'? বলিয়া কিনুকে তাঁহারা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 'স্নান করিতে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন' এইরূপ বলিয়া কিনু তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। দুই প্রহর হইয়া গেল, রান্না প্রস্তুত, তবুও কর্ত্তার দেখা নাই। যা হইয়াছে, কিনু তাহা বুঝিলেন। বাড়ী আসিয়া পাছে ভদ্রলোকদিগের সমক্ষে ঢলাঢলি করেন, সে জন্য পিতাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত কিনু শুঁড়ির বাড়ীর দিকে চলিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পিতার সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। বগলে এক বোতল মদ লইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছেন। কিনু বলিলেন,—'বাবা! তোমার কি মান অপমানের ভয় একেবারেই গিয়াছে? তোমাতে আর কি কোনও পদার্থই নাই? এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার কি জ্ঞানগোচর একেবারেই গিয়াছে?' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'কেন বাবা! হইয়াছে কি? এত রাগ কেন?' কিনু উত্তর করিলেন,—'হইয়াছে কি? বগলে ও কি!' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'বগলে এ কি! বটে! আর কপালে এ কি? এটি দেখিলে আর ওটি বুঝি দেখিলে না!' রামেশ্বর খুড়ো

শুঁড়ির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, পানাপুকুর হইতে একটু কাদা লইয়া কপালে একটি ফোঁটা কাটিয়াছিলেন। ছেলেকে সেই ফোঁটাটি দেখাইলেন। টিকি না রাখিয়া ফোঁটা কাটিলেও চলে, না চলে এমন নয়।

আর এক জন বলিলেন,—"মড়াটা আশটা যারা পোড়ায়, টিকি রাখা তাদের পক্ষে ভাল নয়। একবার একটা মড়া দানো পাইয়া এক জনের টিকি ধরিয়াছিল। আর একটু হইলেই তাহার ঘাড়টি ভাঙিগয়া দিত। ভাগ্যে তাহার কোমরে একখানি কাস্তে ছিল, চট্ করিয়া সে কাস্তেখানি বাহির করিয়া টিকিটি কাটিয়া ফেলিল, তাই তার প্রাণ বাঁচিল।"

আর এক জন বলিলেন,—"ভাই! আমাদের মড়া যদি দানো পাইয়া থাকে? যদি গিয়া দেখি, চুলির উপর মদ্দারাম গট্ হইয়া বসিয়া আছেন? তাহা হইলে কি হইবে?"

সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। তাই তো! বড় ভয়ের কথা বটে!

মড়াটি দানো পাইয়া থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু চিতার উপর নাই। বোধ হয় শৃগালে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, উদ্ধব দাদা প্রভৃতি সকলে আসিয়া দেখিলেন যে, চিতাটি খালি পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে তাঁহারা মড়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিকটে একটি ঝোপ দেখিতে পাইয়া, এক জন সেই ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গাছপানে চাহিয়াই তিনি "আঁ আঁ" করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া ধড়াশ করিয়া পড়িলেন। "কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?" বলিয়া আর সকলে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিলেন। পড়িয়া পড়িয়া সে লোকটি "গোঁ গোঁ" করিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। মুখে হাতে জল দিয়া সকলে তাঁহাকে চেতন করিলে, তিনি বলিলেন,—"ঐ গাছে!" সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গাছে কি? গাছে কি দেখিয়াছ?" কিন্তু সে লোকটি আর কিছুই বলিতে পারেন না। "ঐ গাছে!" এই কথা বলিয়াই পুনরায় গোঁ গোঁ করিতে থাকেন। তখন সকলে উদ্ধব দাদাকে বলিলেন,—"উদ্ধব দাদা! তুমি গিয়া দেখিয়া এস, গাছে কি আছে।" উদ্ধব দাদা উত্তর করিলেন,—"তোমরা যাও না কেন? মড়া পোড়াইতে আসিয়াছি, তা বলিয়া নিজের কাঁচ মাথাটি বাড়াইয়া দিতে পারি না।" এ বলে তুমি যাও; ও বলে তুমি যাও; কিন্তু যাইতে কাহারও সাহস হয় না। অবশেষে সকলে একসঙ্গে গাছের নিকট যাইলেন। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি সকলে জানিতে পারিলেন যে, গাছের ডালে একটি মানুষের মত কি বসিয়া রহিয়াছে। সকলে নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহাদের মড়াটি দানো পাইয়া গাছে বসিয়া আছে। গাছ হইতে লাফ দিয়া এখনও খাইতে কি ঘাড় ভাঙিগতে আসিল না, সে জন্য সকলের মনে অনেকটা সাহস হইল। দানো পাইলে যেরূপ প্রতিকার করিতে হয়, তখন সকলে সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। দা, কোদাল, কুঠারি, যাহার হাতে যা ছিল, সেই সকল ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। গাছে নিধিরাম বসিয়া ছিলেন। গাছে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা তিনি কতক কতক শুনিয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—"মহাশয়গণ! আমাকে মারিবেন না। আমি আপনাদের মড়া নই। আমি পথিক ব্রাহ্মণ, আজ রাত্রির ঝড়ে আমার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে আমার প্রাণ বাঁচিয়াছে। প্রাতঃকালের প্রতীক্ষায় আমি এই গাছে বসিয়া আছি।"

সকলে বলিলেন,—"আমাদের মড়া নয়, তবে শালা তুই কাদের মড়া? দানো পাইয়া মনের সুখে গাছে বসিয়া আছেন, আবার বলেন কি না,—'আমি

তোমাদের মড়া নই, আমি পথিক ব্রাহ্মণ!' নামিয়া আয় শালা, শীঘ্র নামিয়া আয়!"

নিধিরাম আস্তে আস্তে গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন। যদিও অন্ধকার, তথাপি উদ্ধব দাদা প্রভৃতি সকলে দেখিলেন যে, লোকটি প্রকৃতই তাঁহাদের মড়া নয়। সকলে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে যে বোতল আনিয়াছিলেন, সকলে তাহা হইতে এক আধ ঢোক মদ খাইলেন। পুনরায় মদ খাইয়া বুদ্ধি যখন উত্তমরূপে পাকিয়া উঠিল, তখন উদ্ধব দাদা বলিলেন,—"তা তুমি আমাদের মড়া হও আর নাই হও, তোমাকে আমরা পোড়াইতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, আমাদের নিজের মড়া কোথায় গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই।"

নিধিরাম বলিলেন,—"সে কি মহাশয়! আমি জীয়ন্ত মানুষ, আমাকে পোড়াইবার কথা কি বলেন! তামাসা করিতেছেন বুঝি?"

উদ্ধব দাদা উত্তর করিলেন,—"তুমি আমার শালা সম্বন্ধীয় কিছুই নও, যে তোমার সহিত তামাসা করিব! আমরা মড়া পোড়াইতে আসিয়াছি। শূন্য হাতে কি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাই? তুমিই বুঝিয়া দেখ, সেটা কি ভাল কাজ হয়? অবুঝের মত কথা বলিও না। চল, ভাল-মানুষের মত পুড়িবে চল। গণ্ডগোল করিও না। চল, যাদু, পুড়িবে চল।"

নিধিরাম প্রথমে তামাসা মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে বুঝিলেন যে, মাতালেরা সত্যসত্যই তাঁহাকে পোড়াইবে। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মাতালেরা বলপূর্বক তাঁহাকে ধরিয়া চিতায় শয়ন করাইল, চিতার সহিত বাঁধিয়া দিল, নিম্নে পাতা ও পাকাটি দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

প্রাণে একেবারে হতাশ হইয়া, নিধিরাম বলিলেন,—"যদি আমি তোমাদের মড়াই হইলাম, তবে আমাকে স্নান করাইয়া তাহার পর পোড়াও। সকলেই জানে যে, মড়াকে স্নান করাইয়া তাহার পর পোড়াইতে হয়।"

সকলে বলিলেন,—"হাঁ! এ কথা সত্য বটে। মড়াকে স্নান করাইয়া পোড়াইতে হয়।"

আগুন নিবাইয়া নিধিরামকে চিতা হইতে তাঁহারা উঠাইলেন ও দুই জনে দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে যাইলেন।

নদীতে উপস্থিত হইয়া নিধিরাম বলিলেন,—"একবার ছাড়িয়া দাও, একটি ডুব দিই।"

নিধিরাম ডুব দিলেন, কিন্তু আর উঠিলেন না। "মড়া পলাইল, মড়া পলাইল," বলিয়া সকলে গোল করিয়া উঠিলেন। কিন্তু অন্ধকারে নিধিরামের সন্ধান তাঁহারা আর পাইলেন না। নিধিরাম নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। অনেক দূরে তিনি পুনরায় নদীর তীরে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু সমস্ত রাত্রি জলে ভিজিয়া ও নানারূপ কষ্ট পাইয়া নিধিরামের শরীর একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল। উপরে উঠিয়া তিনি অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। তাঁহার ঘোরতর কম্প উপস্থিত হইল। সেই মাঠের উপর শুইয়া পড়িলেন। শয়ন করিতে না করিতে অজ্ঞান হইয়া যাইলেন।

নদীর উপর প্রায় এক ক্রোশ মাঠ। মাঠের পর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানিতে কেবল চণ্ডাল ও মুসলমানের বাস। রাত্রিতে ঝড় হইয়াছিল। অনেক নৌকা ডুবিয়া থাকিবে, জলমগ্ন নৌকার দ্রব্যাদি পাইবে, এই আশায় প্রাতঃকাল হইতে না হইতে গ্রামের লোকে নদীর ধারে আসিয়াছিল। চণ্ডালেরা মৃতপ্রায় ভূতলশায়ী নিধিরামকে দেখিতে পাইল। তখনও তাঁহার দেহে প্রাণ

ছিল। কোমরে তাঁহার টাকা আছে দেখিয়া কাহারও কাহারও লোভ হইল। তাঁহার নির্জীব দেহটি নদীতে ফেলিয়া দিয়া টাকাগুলি লইবার নিমিত্ত কেহ কেহ পরামর্শ করিল। কিন্তু সেই চণ্ডালদিগের মধ্যে দুই এক জন বৃদ্ধ ছিল। নিধিরামকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না; নিধিরামকে তাহারা বাটী লইয়া যাইল। অগ্নির উত্তাপ দিয়া, ও নানারূপ সেবা করিয়া তাহারা নিধিরামকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার চেতন হইতে না হইতে জ্বর-বিকার উপস্থিত হইল। অনেক দিন তিনি এই চণ্ডালের গৃহে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গেল। আরোগ্য লাভ করিলে, চণ্ডালেরা তাঁহাকে একখানি নৌকা করিয়া দিল। সেই নৌকা করিয়া নিধিরাম পুনরায় রামনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : আড় কাটায়

নিধিরামের নিকট অনেক টাকা আছে, নৌকার মাঝিরা কেহ কেহ এ কথা শুনিয়াছিল। এক দিন রাত্রিকালে নৌকার তলদেশে ছিদ্র করিয়া তাহারা নৌকাখানি ডুবাইবার উপক্রম করিল। শরীরে জল লাগিতেই নিধিরামের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকাখানি সম্পূর্ণ ভাবে ডুবিতে না ডুবিতে তিনি জলে ঝাঁপ দিলেন। দাঁড়ি-মাঝিরাও তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে জলে পড়িয়া তাঁহাকে ধরিল। কেহ হাত কেহ পা ধরিয়া জলে ডুবাইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিতে চেষ্টা করিল। বাঁচিবার নিমিত্ত সেই অন্ধকার রাত্রিতে জলের মাঝখানে নিধিরাম মাঝিদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি একলা, মাঝিরা চারি জন, কতক্ষণ আর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন? বার বার তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া ক্রমে নির্জীব করিয়া ফেলিল। আর অল্পক্ষণ পরেই মাঝিরা তাঁহার প্রাণবধ করিত, কিন্তু এই সময়ে কোথা হইতে একটি কুম্ভীর আসিয়া নিধিরামের কোমর ধরিল ও লেজের আঘাতে দুই জন মাঝির প্রাণবধ করিল। নিধিরামকে কুমীরে লইয়া চলিল। একবার ডুবাইয়া পুনরায় যখন কুমীর জলের উপর ভাসিল, তখনও নিধিরামের শরীরে প্রাণ ছিল। নিধিরামকে মুখে করিয়া কুমীর পুনরায় ডুবিল ও অল্পক্ষণ পরে নদীর তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে নলের বন ছিল। নিধিরাম এক্ষণে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি জ্ঞান ছিল। কুমীর তাঁহার কোমর ছাড়িয়া পা ধরিল। মাটীর ভিতর তাঁহার মুখ পুতিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে নিধিরাম কুমীরের দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু দেখিতে পাইলেন। কুমীরের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া অনেকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাঁহার সেই কথা মনে পড়িল। কুমীরের দুইটি চক্ষুতে তিনি দুইটি অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। যাতনায় কুম্ভীর তাঁহাকে ছাড়িয়া জলে গিয়া পড়িল। কুমীরের কামড়ে নিধিরামের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি প্রাণের দায়ে কোনও রূপে তিনি নল-বন পার হইয়া নদীর উপর গিয়া উঠিলেন। আর অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। সেই স্থানে বসিয়া আপনার দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যে,—"হা ভগবান! আমার কপালে তুমি এত লিখিয়াছিলে? কিন্তু হিরণ্ময়! তোমার মত দুর্লভ রত্ন কি অনায়াসে লাভ হয়? তোমার জন্য, তোমার পিতার জন্য, যে আমি এই নিদারুণ ক্লেশ পাইতেছি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ

নাই,—তাহাতে আমার সুখ। এখন, একবার তোমার পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিলে হয়!"

নদীর উপর যে স্থানে নিধিরাম বসিয়াছিলেন, সে স্থানটি জন-শূন্য প্রান্তর। নিকটে মনুষ্যের বসবাস নাই। উপরে কেবল একটি ভগ্ন কালীর মন্দির ছিল। নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে লোক আসিয়া কালে-ভদ্রে এই কালীর পূজা দিয়া থাকে। উপরে মন্দির আছে, কি, কি আছে, নিধিরাম তাহার কিছুই জানেন না। রাত্রিকাল, অন্ধকার, কি করিয়া তিনি জানিবেন? এক দল ডাকাত এই রাত্রিতে কোথায় ডাকাতি করিতে যাইতেছিল। কালীর পূজা দিয়া তবে তাহারা ডাকাতি করিতে যাইবে। মহা সমারোহে এই স্থানে কালীর পূজা হইতেছিল। যেখানে নিধিরাম বসিয়া আছেন, সেই স্থানে দুই জন ডাকাত বলি দিবার নিমিত্ত পাঁঠা স্নান করাইতে আনিল। নিধিরামকে তাহারা দেখিতে পাইয়া ধরিল। তাহারা বলিল,—"ভাই! মা'র কি কৃপা! মা আজ আমাদের মানুষপাঁঠা মিলাইয়া দিলেন। এখন বলি, হাঁ, মা কালী জাগ্রত বটে! অনেক কাল পরে মা'র আজ নরবলি খাইতে সাধ হইয়াছে। আজ আমাদের অনেক টাকা মিলিবে।" নিধিরাম তাহাদিগের নিকট হাতযোড় করিয়া কত মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। তাঁহাকে ধরিয়া তাহারা মন্দিরের সম্মুখে দলের মাঝখানে লইয়া গেল। ডাকাতের দলে আর আনন্দের পরিসীমা নাই। মা নিজে আজ নরবলির যোগাড় করিয়াছেন। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত নিধিরাম কত কি বলিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। ডাকাতদিগের পুরোহিত যথারীতি নিধিরামকে উৎসর্গ করিলেন। ডাকাতেরা তাঁহাকে ধরিয়া খর্পরে শোয়াইল। কেহ পায়ের দিক্ ধরিল, কেহ মাথার দিক্ ধরিল। ডাকাতদিগের সর্দার নিজে কোপ মারিবার নিমিত্ত খাঁড়া তুলিলেন। নিধিরাম বলপূর্বক খর্পর হইতে মাথা সরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—"পাপিষ্ঠ নরাধমেরা! ব্রহ্মহত্যায় তোদের ভয় নাই?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও মশালের আলোকে নিধিরামের মুখ দেখিয়া, ডাকাতদিগের সর্দার খাঁড়া নামাইল। সর্দার বলিল,—"ইহার সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত, সর্ব শরীর হইতে ইহার রক্তধারা পড়িতেছে। মা'র নিকট এরূপ বলি কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" বিরস-বদনে ডাকাতেরা নিধিরামকে ছাড়িয়া দিল। নিধিরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দার বলিল,—"ব্রাহ্মণ! তোমার খুব পরমায়ু! এস, তোমাকে গ্রামে যাইবার পথ দেখাইয়া দিই।" একটু দূরে গিয়া উপস্থিত হইলে সর্দার বলিল,—"আমি কে জান? আমি উদ্ধব দাদা। মদ খাইয়া সে দিন তোমার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে সে দিন তুমি রক্ষা পাইয়াছিলে। আজ সাদা চক্ষে তোমার মাথা কাটিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। যাও; কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, মাঠের পথ তুমি দেখিতে পাইবে না। কোনও গাছতলায় পড়িয়া রাত্রিযাপন কর। প্রাতঃকাল হইলে যেখানে ইচ্ছা যাইও।"

সকাল হইলে নিধিরাম অতিকষ্টে নিকটস্থ একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমীরের কামড়ে সর্বশরীর তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। পথ চলিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। এই গ্রামে এক সদ্গোপের বাড়ী গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই স্থানে থাকিয়া যথাবিধি আপনার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। আরোগ্য-লাভ করিয়া পুনর্বার রামনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে বহুদূর চলিয়া যাইলেন। ক্রমে রামনগরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। এক দিন সন্ধ্যাবেলা কোথাও বাসা না পাইয়া, তিনি একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণের দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সাত বেটা। মকদ্দমা মামলা,

দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চুরি ডাকাতি, সকল বিষয়ে তাহারা পরিপক্ক। কর্তাটি মকদ্দমা করিতে রামনগর গিয়াছিলেন। পুত্রেরা নিধিরামকে চণ্ডীমণ্ডপে স্থান দিয়া আহারাদির সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলেন। আহারাদি করিয়া নিধিরাম শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে পাশের একটি দ্বার দিয়া দুইটি বালক উঁকি মারিল। তাহারা দুই জনে বলাবলি করিতে লাগিল,—"ভাই! এই বামুনের কাছে অনেক টাকা আছে। আজ রাত্রিতে বাবা, কাকা সকলে মিলিয়া ইহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ইহার পলাইবার যো নাই। চারি দিকে তাঁহারা পাহারা দিয়া আছেন। কি করিয়া মানুষ মারে, কখনও তাহা দেখি নাই। আয় ভাই, এক কর্ম করি। আরও রাত্রি হইলে চুপি চুপি বাটির ভিতর হইতে আসিয়া ঐ খড়ের গাদার ভিতর লুকাইয়া থাকিব। উহার ভিতর হইতে মানুষ মারা দেখিব।" নিধিরাম শুনিয়া শুইয়া সকল কথা শুনিলেন। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। চিন্তা করিয়া তিনি কোনওরূপে চণ্ডীমণ্ডপের আড়কাটার উপর উঠিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি যখন দুই প্রহর হইল, বাড়ীর কর্তাটি রামনগর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। চণ্ডীমণ্ডপে মাদুর ও বালিশ রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মনে করিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, কাহাকেও আর ডাকাডাকি করিব না। এইখানেই শুইয়া থাকি।" চাদর মুড়ি দিয়া নিধিরামের বিছানায় বাড়ীর কর্তাটি শুইয়া রহিলেন। ঘোর রাত্রিতে ব্রাহ্মণের পুত্রেরা লাঠি বল্লম প্রভৃতি লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের নিকট উপস্থিত হইল। দুই জন আস্তে আস্তে চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া তাহাদের নিদ্রিত পিতার মাথায় সবলে এক মুগুর মারিল। মস্তক একেবারে চূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। তাহার পর তাহারা ব্রাহ্মণের কোমরে হাত দিয়া টাকা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু টাকা পাইল না। ভাল করিয়া খুঁজিবার নিমিত্ত প্রদীপ আনিল। প্রদীপ আনিয়া দেখে না, পিতাকে হত্যা করিয়াছে! শোকে, ভয়ে, ক্রোধে সকলে আকুল হইয়া পড়িল। পথিক ব্রাহ্মণ কোথায় গেল? এই স্থানেই অবশ্য কোথায় লুকাইয়া আছে! এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা প্রথমেই খড়ের গাদায় চারিদিক হইতে বল্লমের খোঁচা মারিতে লাগিল। খড়ের গাদার ভিতর হইতে বালক দুইটি ভয়ে "আঁ আঁ" করিয়া উঠিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কিন্তু অধিক আর বলিতে হইলও না, সেই মুহূর্তেই বল্লমের আঘাতে তাহারা প্রাণ হারাইল। খড়ের গাদার ভিতর হইতে বালক দুইটির মৃত দেহ বাহির করিয়া সকলে জানিতে পারিল যে, কি সর্বনাশ হইয়াছে! তাহারা মনে করিল যে, বিধাতা আজ তাহাদের প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন। প্রতিবাসীদিগের ভয়ে অধিক আর গোলমাল করিতে পারিল না। তিনটি মৃত দেহ লইয়া খিড়কির বাগানে পুকুরিতে যাইল।

নিধিরাম আড়কাটার উপর বসিয়া এই সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিলেন। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল। যখন তাহারা মৃতদেহ লইয়া খিড়কির বাগানের দিকে যাইল, তখন আস্তে আস্তে তিনি আড়কাটা হইতে নামিলেন, নামিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রামনগরের দিকে দৌড়াইলেন। তাহার পরদিন রামনগরে উপস্থিত হইয়া, প্রথমেই এককড়িকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া এককড়ি তাঁহাকে অগণ্য আশীর্বাদ করিলেন। নিধিরাম বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি আজ বাড়ী গমন করুন। আপনার নিমিত্ত বাড়ীতে সকলেই চিন্তিত আছেন। আমার এখানে বিশেষ কোনও কাজ আছে। দুই চারি দিন পরে আমিও চণ্ডীপুরে গিয়া উপস্থিত হইব।" এককড়ি, কি করিবেন? একেলা বাটী গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় : অদৃষ্টের লেখা

নিধিরাম থানায় গিয়া গত রাত্রির সমুদয় ঘটনা পুলিশের নিকট জানাইলেন। সাতভেয়েরা বদমায়েশ বলিয়া পুলিশের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। নিধিরামকে সঙ্গে লইয়া পুলিশের লোকে সাতভেয়েদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কির বাগান খুঁড়িয়া তিনটি মৃতদেহ পাইল। সাত ভাই সকলকে বাঁধিয়া রামনগর চালান করিল। পুলিশের নিকট নিধিরামকে চারি দিন থাকিতে হইল। তাহার পর তিনি পুনরায় চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমস্ত দিন পথ চলিয়া সন্ধ্যার সময় তিনি চণ্ডীপুরের নিকট একটি মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে একক্কড়ির বাড়ী অধিক দূর নয়, প্রায় এক পোয়া পথ। হন্ হন্ করিয়া মাঠটুকু পার হইতেছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকের কাতরস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। "ওগো, কে যাও গো! আমাকে রক্ষা কর।" এই কয়টি কথা শুনিতে পাইলেন। তাহার পর "গোঁ গোঁ" শব্দ হইতে লাগিল। যেন কেহ কাপড় দিয়া স্ত্রীলোকটির মুখ বন্ধ করিয়া দিল। নিধিরাম সেই দিক পানে দৌড়িলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, চারিজন লোক একটি শায়িতা স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে, ও একজন কাপড় দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নিধিরাম বলিলেন,—"এ কি? কে তোমরা?" তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল,—"সেই বাঙ্গাল শালা রে! বেটা হিরণ্ময়ীকে বে করিবেন। বামন হইয়া চাঁদে হাত! মার বেটাকে।"

যখন এককড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন বদরুদ্দিন অর্থাৎ বৈদ্যনাথ দেবশর্মার ঘরে বড়ই ভাবনা উপস্থিত হইল। বৈদ্যনাথ মনে করিয়াছিলেন যে, অধিক দিন কারাগারের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া এককড়ি হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার পুত্র গবীরুদ্দিন অর্থাৎ গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। হতাশ হইয়া গোবিন্দ একেবারে পাগল হইয়া উঠিলেন। বলপূর্বক হিরণ্ময়ীকে লইয়া বিবাহ করিবেন, তিনি এইরূপ সংকল্প করিলেন। টাকা দিয়া চারিজন ইতর লোককে বশ করিলেন। পাঁচজনে হিরণ্ময়ীকে ধরিবার নিমিত্ত সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে আজ হিরণ্ময়ী সন্ধ্যার পর একটু বাড়ীর বাহিরে আসিয়াছিলেন। সেই অবসরে পাষণ্ডেরা তাঁহাকে ধরিল ও মুখে কাপড় দিয়া মাঠের দিকে লইয়া চলিল। বাটীর লোক কি গ্রামের লোক কেহই ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হইলে, দৈবক্রমে হিরণ্ময়ীর মুখের কাপড় একটু আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি একবার চীৎকার করিতে পারিয়াছিলেন। দৈবক্রমে সেই সময় নিধিরামও মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন।

গোবিন্দের কথা শুনিয়া নিধিরাম বুঝিলেন যে, তাহারা হিরণ্ময়ীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। নিমেষের মধ্যে তিনি এক ঘা লাঠি মারিয়া দুইটি লোককে ভূতলশায়ী করিলেন। বাকি তিনজন হিরণ্ময়ীকে ছাড়িয়া নিধিরামের উপর লাঠি-বর্ষণ করিতে লাগিল। "কে কোথায় আছ গো! এস গো! ওগো, এখানে সর্বনাশ হয় গো!" এই বলিয়া হিরণ্ময়ী চীৎকার করিতে লাগিলেন। দূর হইতে কে শব্দ করিল,—"যাই, যাই, ভয় নাই।" এইরূপ শব্দ শুনিয়া গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গিগণ পলাইল। নিধিরামের লাঠিতে যে দুইজন প্রথমেই মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারাও উঠিয়া পলাইল।

গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গিগণ যখন পলাইয়া গেল, তখন হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, নিধিরাম মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাড়াতাড়ি হিরণ্ময়ী গিয়া তাঁহার মাথাটি তুলিয়া ধরিলেন। দেখিলেন, তাঁহার জ্ঞান নাই, সর্বশরীর রক্তে প্লাবিত হইতেছে।

কাঁদিতে কাঁদিতে হিরণ্ময়ী তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দূর হইতে যে লোকটি সাড়া দিয়াছিলেন, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি সুন্দর যুবাপুরুষ। আর কেহ নয়, জয়দেবপুরের ধনবান্ কুলীনের ছেলে নবীন, যাঁহার মাতুলাশ্রয় চণ্ডীপুরে, যাঁহার সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহের কথা হইয়াছিল। নবীন আসিয়া উপস্থিত হইলে, হিরণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে দুই-চারি কথায় তাঁহাকে ঘটনার বিষয় বলিলেন। নিধিরামের নাকে মুখে বুকে হাত দিয়া নবীন বলিলেন,—"বোধহয়, ইনি এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু অতি শীঘ্র ইঁহাকে গ্রামে লইয়া যাইতে হইবে। আমরা দুইজনে এত পথ লইয়া যাইতে পারিব না। রও, আমি লোক ডাকি।" এই বলিয়া নবীন চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাবেলা হিরণ্ময়ী বাহিরে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, তথাপি হিরণ্ময়ী ফিরিয়া আসিলেন না। এককড়ি ও তাঁহার গৃহিণী প্রথমে বাড়ীর আশেপাশে খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না। কত ডাকিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। মহা ভাবনা উপস্থিত হইল। প্রতিবাসিগণ চারিদিকে হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতে দৌড়িল। যাহারা মাঠের দিকে খুঁজিতে আসিয়াছিল, তাহারা নবীনের চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইল। যেস্থানে ভূতলশায়ী নিধিরামকে লইয়া হিরণ্ময়ী ও নবীন ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইল। ঘটনার বিষয় সকলে অবগত হইয়া ধরাধরি করিয়া মুমূর্ষু নিধিরামকে এককড়ির বাড়ীতে লইয়া গেল। প্রদীপ আনিয়া সকলে দেখিল যে, নিধিরামের আর কিছু বাকী নাই। বক্ষঃস্থলে প্রাণটুকু কেবল অল্পমাত্র ধুক্ ধুক্ করিতেছে। মস্তক দুই-চারি স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে, একটি চক্ষু বাহির হইয়া পড়িয়াছে, নাসিকা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই পাটি দন্ত একেবারে গিয়াছে। রক্তে রক্ত! নিধিরামের সেই সুন্দর, গৌরবান্বিত মুখখানি, একেবারে পিণ্ডাকার হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যের মুখ বলিয়া আর চিনিতে পারা যায় না।

এককড়ির ঘরে সে রাত্রিতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। যাহা হউক, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। নিধিরামকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে যত্নবান হইলেন। সে রাত্রিতে নিধিরামের মৃত্যু হইল না। তাহার পরদিনও হইল না। তিন দিনের দিনও মৃত্যু হইল না। একটু যেন আশা হইল। কিন্তু জ্ঞান নাই, গোচর নাই, কিছু নাই। কেবল নিশ্বাসটি পড়িতেছে, এইমাত্র।

হিরণ্ময়ী নিধিরামের সেবা করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী সর্বদা অচেতন নিধিরামের নিকট বসিয়া থাকেন। নবীন প্রতিদিন নিধিরামকে দেখিতে আসেন। নিধিরামের নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন। একদিন নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী! আমি শুনিয়াছি, তোমার সহিত আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল। আমার পিতা অনেক টাকা চাহিয়াছিলেন, তাই হয় নাই। তখন যদি জানিতাম যে, তোমার কি অপূর্ব রূপ, তুমি কি অমূল্য রত্ন, তাহা হইলে বাবাকে কি অমত করিতে দিতাম? মা-বাপের আমি একমাত্র সন্তান। আমাদের টাকা-কড়ির অভাব নাই। মায়ের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া হউক, পিতাকে সম্মত করাইতাম। বড়ই দুরদৃষ্ট, হিরণ্ময়ী! যে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইল না।" হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না।"

হিরণ্ময়ী এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে তাঁহার চিত্ত একটু চঞ্চল হইল। একদিকে দরিদ্র, অর্ধ বৃদ্ধ, একচক্ষুহীন, নাসিকাহীন, দন্তহীন, কিম্ভূত কদাকার ভয়াবহ নিধিরামের পিণ্ডকার মুখ, অপরদিকে ধন-সম্পত্তিবিশিষ্ট,

নবযৌবনসম্পন্ন, রূপবান্ নবীনের মুখ। নিধিরাম না বাঁচেন, হিরণ্ময়ীর এইরূপ একটু ইচ্ছা হইল। সেই দিন হইতে নিধিরামের সেবায় একটু কমও পড়িল।

তাহার পরদিন নবীন পুনরায় সেই কথা বলিলেন। সেদিন হিরণ্ময়ী আর তাঁহাকে বকিলেন না। তাহার পরদিন নবীন পুনরায় সেইভাবের কথা বলিলেন। হিরণ্ময়ী ঘাড় হেঁট করিয়া শুনিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। হিরণ্ময়ী অবশেষে উত্তর করিলেন,—"আমাকে এ সব কথা বলা বৃথা। আমি স্ত্রীলোক, আমার কি হাত আছে? আমার পিতা-মাতা আছেন, কিছু বলিতে হয়, তাঁহাদিগকে বলুন।" দুই দিন নবীন আর আসিলেন না। তাঁহাকে না দেখিয়া হিরণ্ময়ীর প্রাণ উদাস হইল। দুই দিন পরে নবীন আসিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—"আমি বাড়ী গিয়াছিলাম। তোমার সহিত বিবাহ-বিষয়ে আমার পিতা-মাতাকে সম্মত করিয়াছি। কিন্তু তোমার পিতা কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। তিনি বলিলেন,—'নিধিরামকে আমি কন্যা সমর্পণ করিয়াছি। নিধিরাম যদি এ যাত্রা রক্ষা না পান, তাহা হইলে জানিব, আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে। বিধবা হইয়া কন্যা আমার ঘরে থাকিবে।" নবীন বিলাপ করিতে লাগিলেন, হিরণ্ময়ীও কাঁদিতে লাগিলেন।

যাহার পরমায়ু আছে, তাহাকে কে মারিতে পারে? নিধিরামের ক্রমে জ্ঞান হইল, নিধিরাম ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন। প্রায় একমাস পরে নিধিরাম উঠিয়া বসিতে পারিলেন। আরও কিছুদিন পরে তিনি একটু-আধটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন। নিধিরামের প্রাণ বাঁচিল বটে, কিন্তু তাঁহার রূপ দেখিলে আর জ্ঞান থাকে না। মাথায় ও মুখের চারিদিকে সেলাই করার মত দাগ। একটি চক্ষুতে ঢেলা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নাসিকাটি বিলুপ্তপ্রায়। দন্ত একটিও ছিল না। এরূপ কিম্ভূত কদাকার রূপ কেহ কখনও দেখে নাই। দেখিলে ভয় হয়। "ইনি আমার পতি হইবেন!" এই কথা ভাবিয়া হিরণ্ময়ীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

যে দিন হইতে নিধিরাম চেতন হইলেন, সেই দিন হইতে নবীন আর হিরণ্ময়ীর সহিত মনের কথা বলিতে পারিলেন না। নিধিরাম যখন একটু-আধটু বেড়াইতে সমর্থ হইলেন, তখন একদিন সুযোগ পাইয়া নবীন হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি! পৃথিবীতে আর আমাদের কোনও আশা-ভরসা নাই। তোমার নিকট দুইটা মনের কথা বলি, এরূপ অবসর আর পাইব না। আজ সন্ধ্যার পর যদি তুমি তোমাদের বাটীর পশ্চাতে অশ্বত্থতলায় একবার আসিতে পার, তাহা হইলে দুইটা মনের কথা বলিয়া তোমার নিকট হইতে চির বিদায় হই।

হিরণ্ময়ী কোনও উত্তর করিলেন না। "যাইব কি না যাইব" সমস্ত দিন এই কথা ভাবিতে লাগিলেন। যাওয়া উচিত নয়, তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন। কিন্তু পুনরায় ভাবিলেন,—"একবার যাই না কেন? একবার গিয়া চিরবিদায় হইয়া আসি না কেন? তাহাতে আর দোষ কি?"

অষ্টম অধ্যায়ঃ সব ফুরাইল

এককড়ির বাটীর পিছনে অশ্বত্থ গাছ ছিল। অশ্বত্থ গাছের তলদেশ গোল করিয়া চারিদিক্ সান বাঁধানো ছিল। সন্ধ্যার সময় হিরণ্ময়ী নবীনের সহিত সেই অশ্বত্থতলায় সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনে কত কি বলিলেন, কত কি কহিলেন, কত কাঁদিলেন। নবীন বলিলেন,—"আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া

সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে বেড়াইব।" হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"বৃদ্ধের কদাকার মুখ মনে করিতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না, ভয়ে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে।"

দৈবের ঘটনা। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা নিধিরাম আসিয়া এই অশ্বত্থতলায় সাঙ্কের উপর বসিয়াছিলেন। যে দিকে নিধিরাম বসিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত দিকে বসিয়া হিরণ্ময়ী ও নবীনে কথাবার্তা হইতেছিল। হিরণ্ময়ী ও নবীন নিধিরামকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু নিধিরাম তাঁহাদিগের সকল কথা বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। যখন হিরণ্ময়ী ও নবীন ঘোরতর খেদ, ঘোরতর কান্না কাটনা করিতে লাগিলেন, তখন নিধিরাম আর থাকিতে পারিলেন না। নিধিরাম বলিলেন,—"নবীনবাবু! তুমি বাড়ী যাও। কল তোমার মাতুলের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। হতাশ হইও না, আমি নরাধম নই।" নবীন চমকিত হইলেন। নিধিরামের গুরু-গম্ভীর বাক্যে লজ্জিত হইয়া অধোবদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবীন চলিয়া যাইলে, নিধিরাম হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি! তোমার মনে এই ছিল? আমি কুরূপ কদাকার হইয়াছি সত্য! কিন্তু মন তো আমার সেই আছে। জীবন মন তো আমার হিরণ্ময়ীতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি হিরণ্ময়ি! এ বয়সে মনে কোনও একটা বিষয় অঙ্কিত হইয়া যাইলে তাহা আর মুছিয়া ফেলিবার যো নাই। তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি! হিরণ্ময়ি! সে কথা তুমি কিছুই জান না। হিরণ্ময়ি! কিন্তু সে কষ্ট কিছুই নয়। আজ আমার মনে তুমি যে শেল মারিলে, তাহার কাছে সে কষ্ট কি ছার! সকলই অদৃষ্টের দোষ। যাও, হিরণ্ময়ী ঘরে যাও। নিধিরাম কুরূপ, কদাকার বাঙ্গাল বটে, কিন্তু অভদ্র নয়। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহা আমি করিব।"

তাহার পরদিন নিধিরাম নবীনের মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবীনের পিতা-মাতা হিরণ্ময়ীর সহিত বিবাহে সম্মত আছেন, তাহা জানিতে পারিলেন। নিধিরাম বলিলেন,—"আপনারা অধিক আড়ম্বর করিবেন না। কেবল বর, পুরোহিত ও নাপিত লইয়া আসিবেন। এই মাসেই হিরণ্ময়ীর সহিত নবীনের বিবাহ হইবে। আমি যেমন করিয়া পারি, হিরণ্ময়ীর পিতাকে সম্মত করিব।" নবীনের মাতুল এ কথায় সম্মত হইলেন।

তাহার পর নিধিরাম এককড়িকে বলিলেন,—"মহাশয়! আমার এই বিকট মূর্তি দেখিয়া ভূত পর্য্যন্ত ভয়ে পালায়। নিজের মুখ নিজে দেখিয়া আমি ভয় পাই। আমি হিরণ্ময়ীকে কখনই বিবাহ করিব না, ইহা আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা জানিবেন। হিরণ্ময়ীর সহিত নবীনের বিবাহ হইবে, সব স্থির হইয়াছে। এখন আপনি অনুমতি করিলেই হয়।"

এককড়ি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"আমার কন্যা কুলটা নহে। কন্যা আমি আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি। কন্যা আমার আপনার পত্নী। অন্যমত করিলে আমি ধর্মে পতিত হইব, কন্যাও ধর্মে পতিত হইবে। এ কাজ করিতে আমি কিছুতেই পারিব না।"

নিধিরাম এককড়িকে ক্রমাগত জপাইতে লাগিলেন। কত বলিলেন, কত বুঝাইলেন, কিন্তু এককড়ি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এককড়ি বলিলেন,—"তুমি ও গৃহিণী যাহা জান, কর; আমি বাটী হইতে চলিলাম। এ পাপে আমি লিপ্ত থাকিব না।" এই বলিয়া এককড়ি বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিধিরামের হাতে যা অবশিষ্ট টাকা ছিল, তাহা দিয়া বিবাহের সমুদায় আয়োজন করিলেন। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। একজন জ্ঞাতি ডাকিয়া

নিধিরাম কন্যা উৎসর্গ করাইলেন। নবীনের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহকার্য্য সমাধা হইল।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া, নিধিরাম তাহার পরদিন এককড়িকে বাহির করিলেন। নিকটস্থ একটি গ্রামে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, শোকে দুঃখে আকুল হইয়া তিনি পড়িয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—"মহাশয়! কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কন্যা লইয়া আপনার জামাতা নবীন, আজ নিজ গ্রামে গমন করিবেন,—কন্যা বিদায় করিবেন, চলুন।"

এককড়ি উত্তর করিলেন,—"নিধিরাম! তোমাহেন দেব-পুরুষকে যে জামাতা করিতে পারিলাম না, পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলাম না, সে দুঃখ বড় রহিল। বৃদ্ধ হইয়াছি, অধিক দিন আর বাঁচিব না, কিন্তু এই মনের কালি আর কখনও ঘুচিবে না। চল যাই, চিরদিনের নিমিত্ত হিরণ্ময়ীকে বিদায় করি। কি জন্য তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে না, তাহা জানি না। কিন্তু আর আমি কখনও তাহার মুখ দেখিব না।"

দশ ক্রোশ দূর, জয়দেবপুর যাইবেন বলিয়া, নবীন নৌকা ভাড়া করিলেন। হিরণ্ময়ীকে লইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় করিবার নিমিত্ত এককড়ি ও নিধিরাম গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নিধিরাম এককড়িকে বলিলেন,—"মহাশয়! আমার বুকের ভিতর কিরূপ করিতেছে। মা'র সুশীতল পবিত্র নীরে শরীরের কিয়দংশ কিছুকালের নিমিত্ত নিমগ্ন করিয়া রাখি, তাহা হইলে বোধ হয় শরীর সুস্থ হইবে। আপনি আমার নিকটে বসুন, আপনার কোলে মাথা রাখিয়া একটু বিশ্রাম করি।"

এককড়ি জলের নিকট গঙ্গাতীরে বসিলেন। নিধিরাম প্রথম তাঁহার চরণ-ধূলি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিলেন। তাহার পর আপনার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিলেন। এককড়ির বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হাতে পৈতা জড়াইয়া জপ করিতে লাগিলেন। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ। হরে হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।

হিরণ্ময়ী মৃদুমধুর ভাষে নবীনকে বলিলেন,—"বাঙ্গাল কি করিতেছে দেখ! ঠাট করিয়া আবার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে।"

নিধিরাম সেই নৌকাপানে একদৃষ্টে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এককড়ি দেখিলেন যে, নৌকাখানি যতই দূরে যাইতে লাগিল, আর নিধিরামের শরীর ততই অবশ, অবসন্ন, গদ্‌গদ হইতে লাগিল। মোড় ফিরিয়া যেই নৌকাখানি অদৃশ্য হইল, আর নিধিরামের প্রাণ-বিয়োগ হইল।

ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ। হরে হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম। ওঁ রামঃ।

বীরবালা

[পাঠক, গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন]

প্রথম অধ্যায়ঃ বীর হনুমান

গল্পটি এ দেশের নয়—পশ্চিমের, বাঙ্গালীর নয়,—হিন্দুস্থানীর। ব্রাহ্মণ কায়েতের নয়—রাজপুতের। দেবীসিংহ, জাতিতে রাজপুত; নিবাস অযোধ্যায়; বয়স ২০ বৎসর; দেখিতে সুন্দর। শিশুবেলাই দেবীসিংহের পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। সংসারে তাঁহার আর কেহ নাই, কেবল বৃদ্ধা পিতামহী। তিনিই দেবীসিংহকে প্রতিপালন করিয়াছেন।

পিতামহী বলিলেন,—"দেবী! সকাল সকাল আহার করিয়া সরযূর ঘাটে গিয়া বসিয়া থাক। নৌকা করিয়া তাঁহারা আসিবেন। বরাবর তাঁহাদিগকে বাটী লইয়া আসিবে। পাণ্ডাদিগের বাড়ীতে বাসা করিতে দিবে না।"

দেবীসিংহের যখন এগার বৎসর বয়স, তখন পাঁচ বৎসরের একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী অনেক দূরে। বিবাহের পর আর তিনি শ্বশুরবাড়ী যান নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে তাঁহার মনে পড়ে না। শুভদৃষ্টির পর স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ দেবীসিংহের শ্বশুর সপরিবারে অযোধ্যায় তীর্থ করিতে আসিতেছেন। আজ সরযূর ঘাটে আসিয়া পেঁাছিবেন। তাই পিতামহী বলিলেন,—"দেবী! সকাল সকাল আহার করিয়া ঘাটে গিয়া বসিয়া থাক। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে আমাদের বাটী লইয়া আইস। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। দেবী! আজ আমি পৌত্রবধূর মুখ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিব।"

সরযূর ঘাটে গিয়া দেবী বসিয়া রহিলেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া দেবী ভাবিতে লাগিলেন। "তাঁহার শ্বশুর কিরূপ? তাঁহার নাম কি? তাঁহার স্ত্রী এখন কত বড় হইয়াছে? দেখিতে কিরূপ? নাম কি?" এইরূপ শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে নানা কথা দেবী ভাবিতে লাগিলেন। দিন অতীত হইল, সন্ধ্যা হইল, তবুও তাঁহারা আসিলেন না। দেবী মনে করিলেন,—"আজ বুঝি তাঁহারা আর আসিলেন না। যাই হউক, রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখি, তাহার পর বাটী ফিরিয়া যাইব।"

অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া দেবীসিংহ বসিলেন—বসিয়া পুনরায় শ্বশুরবাড়ীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। সরযূকূল এখন জনমানবশূন্য; নীরব। রাখালগণ গরু-মহিষের পাল লইয়া ঘরে গিয়াছে। পলাশ-কেশর-রঞ্জিত পীত-বসনা অঙ্গনাগণ এখন আর সরযূর ঘাটে নাই। পাণ্ডাদিগের কোলাহল-ধ্বনি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরযূর জল কুলকুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নক্ষত্ররাশি সরযূর ঈষৎ তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচিতেছে। দেবী তাই দেখিতেছেন, তাই শুনিতেছেন, আর শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে মনে ভাবিতেছেন। এমন সময় কি হইল?—না,—ভয়ানক "উপ" করিয়া এক প্রকাণ্ড হনুমান অশ্বত্থ গাছ হইতে লাফ দিয়া দেবীসিংহের সম্মুখে পড়িল। পাছে কামড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে দেবীসিংহ পলাইবার উদ্যোগ করিলেন। পলাইতে না পলাইতে বীর হনুমান তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার গাছতলা তুমি অপবিত্র করিলে কেন? তোমার কি কুস্তানি মতলব?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা, না মহাশয়। কৃস্তানি মতলব কেন হইবে? এই দেখুন, আমার মাথায় শিখা রহিয়াছে।"

বীর হনুমান বলিলেন,—"কৈ দেখি?"

দেবীসিংহ, বীর হনুমানের দিকে মস্তক অবনত করিলেন। টীকির মর্য্যাদা-রক্ষক বীর হনুমান বাম হাত দিয়া টীকিটি ধরিলেন; ধরিয়া, একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া টান মারিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"বেশ টীকিটি! বাঃ দিব্য টীকিটি!"

কিন্তু টীকিটি ভাল হইলে কি হইবে, দেবীসিংহের এদিকে প্রাণ বাহির হইতে লাগিল, মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল, দেবীসিংহের চক্ষে জল আসিল। টীকির টানে একবার তাঁহার ঘাড়টি খুট্ করিয়া উঠিল। ঘাড়টি যেই খুট্ করিল, আর দেবীসিংহ জ্ঞান হারাইলেন। তাহার পর কি হইল, তিনি কিছুই জানেন না।

যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেবীসিংহ দেখিলেন যে, মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোকের কোলে তাঁহার মাথা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতেছেন, সেই চক্ষু-জলের দুই-এক ফোঁটা তাঁহার গায়ে পড়িতেছে। আশে-পাশে অনেকগুলি পুরুষমানুষ, মেয়েমানুষ, বালক-বালিকা—সব দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই অপরিচিত। দেবীসিংহ যেই চক্ষু চাহিলেন, আর চারিদিকে আনন্দধ্বনি হইল। সকলে বলিল,—"আর কোনও ভয় নাই। ধর্মদত্ত এইবার প্রাণ পাইল। ধর্মের মা! আর কাঁদিও না, আর কোনও ভয় নাই। বাছাকে লইয়া এখন ঘরে যাও।"

যে স্ত্রীলোকটির কোলে তাঁহার মাথা ছিল, তিনি অতি স্নেহের সহিত দেবীসিংহের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! বাবা আমার! এখন একটু কি ভাল হইয়াছ?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন,—"তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না! আমার নাম তো ধর্মদত্ত নয়! আমার নাম যে দেবীসিং!"

স্ত্রীলোকটি কাতরস্বরে বলিলেন,—"কৈ গা। আমার ধর্মের তো এখনও জ্ঞান হয় নাই! আমার ধর্মদত্ত তো কৈ এখনও ভাল হয় নাই। সে কি বাবা ধর্ম! দশমাস দশ দিন তোমাকে গর্ভে ধরিলাম, আজ এগার বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিলাম, আমাকে তুমি চিনিতে পার না?"

সকলে বলিলেন,"ধর্মের মা! ভাবিও না, জলে ডুবিয়া যাইলে ওরূপ হয়। এখনি জ্ঞান হইবে, সকল কথা মনে পড়িবে। ধর্মদত্ত! ঐ দেখ, তোমার পিতা ভারতসিংহ বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। ঐ দেখ, রামসেবক, যিনি তোমাকে নদীর জল হইতে তুলিয়াছেন! এই দেখ, তোমার খেলাইবার সঙ্গী, প্রতাপ ও মহাবীর। আর এই দেখ, বীরবালা, যে খেলা করিতে করিতে নদীর জলে পড়িয়া গিয়াছিল। যাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত তুমি জলে ঝাঁপ দিয়াছিলে। কিনারার দিকে যাহাকে ঠেলিয়া দিয়া, তুমি নিজে গভীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে। ভাগ্যক্রমে মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতি বালকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে রামসেবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাই তো বাছার প্রাণরক্ষা হইল! তা না হইলে ভারতসিংহের আজ কি সর্বনাশ হইত! ধর্মদত্ত! এই দেখ, বীরবালা। বীরবালাকে চিনিতে পার?"

দেবীসিংহ বীরবালার পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বীরবালা একটি পাঁচ বৎসরের সুরূপা বালিকা। নিজের শরীর পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বসন আর্দ্র, হাত-পা গুলি ছোট ছোট,—দশ এগার বৎসরের বালকের

যেরূপ হয়, সেইরূপ। পিতা ভারতসিংহকে দেখিলেন, সজলনয়না মাতাকে দেখিলেন। সমবয়স্ক মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতিকে দেখিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে তাঁহার মনে বিশ্বাস হইল যে, তিনি দেবীসিংহ নন্, তিনি ধর্মদত্ত। তিনি বিংশতি বৎসরের যুবক নন্ তিনি একাদশবর্ষীয় বালক। স্বপ্নে আপনাকে দেবীসিংহ মনে করিয়াছিলেন, স্বপ্নে তিনি বীর হনুমানকে দেখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ অমাবস্যা বাবাজী

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ধর্মদত্তকে লইয়া সকলে বাড়ী যাইলেন। তাঁহার পিতা ভারতসিংহ বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! সৌভাগ্যক্রমে আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। বাবাজীকে গিয়া প্রণিপাত কর।"

বাবাজী সন্ন্যাসী। নাম অমাবস্যা বাবাজী। বাবাজী দীর্ঘদন্ত লোহিতলোচন, ঘোর কৃষ্ণকায়। ঘোর কৃষ্ণকায় বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার নাম অমাবস্যা বাবাজী হইয়া থাকিবে। ইনি অতি সাধু পুরুষ। কেবল দুগ্ধ খাইয়া প্রাণ ধারণ করেন। তাই ভারতসিংহ ইঁহাকে অতি ভক্তি করেন। চিমটা হাতে দেশে দেশে তীর্থ পর্য্যটন করিতে দেন না। নিজ ঘরে রাখিয়া ভারতসিংহ ইঁহাকে যথাবিধি পূজা করেন। সতত ইঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকেন। ভারতসিংহের ঘরে অমাবস্যা বাবাজী সর্বেসর্বা, যা করেন তাই হয়।

ধর্মদত্ত গিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কোনও কথা না বলিয়া বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস্! শাস্ত্রে আছে,—'চাচা, আপনা বাঁচা।' তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? পরের জন্য প্রাণসমর্পণ! পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ! এ সকলই কলির মাহাত্ম্য!"

চিমটার প্রহারে ধর্মদত্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সজলনয়নে পিতার মুখপানে চাহিলেন। ভারতসিংহ কিছুই বলিলেন না। মাতা আসিয়া ধর্মদত্তকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইলেন। মাতা বলিলেন,—"বাছা, ধর্ম! চুপ কর, আর কাঁদিও না। কালা-মুখ সন্ন্যাসী এখান হইতে যায়ও না, মরেও না। কি গুণে যে কর্তাকে এত বশীভূত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। উহার কু-পরামর্শে কর্তাটি দিন দিন যেন জন্তু হইতেছেন। কালা-মুখ আমার সোনার সংসার ছারখার করিল।"

কিছু দিন পরে, বীরবালার পিতা, জবরদস্তসিংহ আসিয়া ভারতসিংহের নিকট প্রস্তাব করিলেন,—"মহাশয়! ধর্মদত্ত আমার কন্যার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। যদি অনুমতি হয় ত বীরবালাকে ধর্মদত্তের হস্তে সমর্পণ করি। বীরবালা,—ধীর, লজ্জাশীলা ও পরমাসুন্দরী।"

এ কথায় সকলে সম্মত হইলেন। ধর্মদত্তের সহিত বীরবালার বিবাহ হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গত হইতে লাগিল। এদিকে ভারতসিংহের ঘরে ধর্মদত্ত বাড়িতে লাগিলেন, ওদিকে জবরদস্তসিংহের গৃহে বীরবালা বাড়িতে লাগিলেন। ধর্মদত্ত ও ধর্মদত্তের মাতা কিন্তু বড়ই অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভারতসিংহের গৃহে অমাবস্যা বাবাজীর এখন

একাধিপত্য। ধর্মদত্তকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। বিনা দোষে সর্বদাই তাঁহাকে প্রহার করেন। টাকাকড়ি বিষয়-বিভব, সমুদায় এখন অমাবস্যা বাবাজীর হাতে। ধর্মদত্তের মাতাকেও তিনি আহার-পরিচ্ছদের ক্লেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ভারতসিংহ নির্জীব জড় পদার্থপ্রায় জবু-থবু হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিন অমাবস্যা বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটার দ্বারা অতিশয় প্রহার করিলেন। ধর্মদত্তের শরীরে শতধারা হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সেইদিন বিনয় করিয়া ধর্মদত্ত বাবাজীকে বলিলেন,—"মহাশয়! দেখুন, আমি আর এখন বালক নই, এক্ষণে বড় হইয়াছি। আমাকে বিনা দোষে প্রহার করা আর ভাল দেখায় না। আমাকে আর মারিবেন না। স্মরণ রাখিবেন যে, খরতর ক্ষত্রিয়-শোণিত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে।"

বাবাজী পরিহাস করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি ধর্মদত্তকে প্রহার করিলেন। ধর্মদত্ত সে দিন আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাবাজীর গলা টিপিয়া ধরিলেন। সবল ক্ষত্রিয় যুবার সহিত শীর্ণকায় বাবাজী পারিবেন কেন? শ্বাসরোধ হইয়া বাবাজী মৃতপ্রায় হইলেন। কেবল প্রাণটি থাকিতে থাকিতে ধর্মদত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রাগদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া বাবাজী বলিলেন,—"ভাল! দেখিয়া লইব! অমাবস্যা বাবাজীর গায়ে হাত তুলিয়া কে বাঁচিতে পারে, এ কথা আমি দেখিয়া লইব।"

অল্পদিন পরে ভারতসিংহের একটি কন্যা হইল। সূতিকা-ঘরে সমাগতা প্রতিবাসিনীগণ নবপ্রসূতা কন্যাটির অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। কন্যার রূপে সূতিকাঘর প্রভাময় হইল। সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন,—"ধর্মের মা! তোমার কন্যাটির কি অদ্ভূত রূপ হইয়াছে! দিদি, আঁতুড়-ঘরে এরূপ রূপ তো কখনও দেখি নাই! কন্যাটির নাম কমলা রাখ।" সকলে মিলিয়া কন্যাটির নাম কমলা রাখিলেন।

ভারতসিংহের কন্যা হইয়াছে শুনিয়া অমাবস্যা বাবাজীর রাগ হইল। ভারতসিংহকে তিনি বলিলেন—"মহাশয়! আপনার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে কন্যা কখনও জীবিত থাকে নাই। আপনার পূর্বপুরুষদিগকে শ্বশুর বলিয়া কেহ সম্বোধন করেন নাই। ইংরাজের দৌরাত্ম্যে আজ ক্ষত্রিয়কুল কলঙ্কিত হইতেছে সত্য, কিন্তু আমি আপনার গৃহে থাকিতে আপনার কুল কলঙ্কিত হইতে দিব না। এক্ষণে যেরূপ অনুমতি হয়।"

ভারতসিংহ এক্ষণে জড় পদার্থ। জ্ঞানগোচর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন,—"যা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

অমাবস্যা বাবাজী সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নীচ জাতি ধাত্রীকে অর্থ দ্বারা বশ করিলেন। একদিন ঘোর নিশীথে, ধর্মের মাতাকে নিদ্রিত পাইয়া ধাত্রীর যোগে বাবাজী কমলাকে চুরি করিলেন। পূর্বপ্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যাটিকে মৃত্তিকা-পাত্রে রাখিলেন। সেই হাঁড়িতে একটু গুড় ও একটুখানি তুলা রাখিয়া সরা চাপা দিলেন। গ্রামের বাহিরে জনশূন্য মাঠের মাঝে লইয়া হাঁড়িটীকে পুতিয়া ফেলিলেন। গর্ত খুঁড়িবার সময় ও হাঁড়ি পুতিবার সময় বাবাজী বার বার এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

কমলা তুমি হও দূর।
যাও শীঘ্র যমপুর।।

খাও গুড় কাটো সুত।
তোমায় চাই না—চাই পুত।।

রাজপুতদিগের মনে বিশ্বাস এই যে, নবপ্রসূতা কন্যাকে সংহার করিলে, সেই কন্যাই বারবার আসিয়া গৃহে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এইরূপ প্রণালীতে মন্ত্রপাঠ করিয়া জীবিত কন্যাকে মৃত্তিকাসাৎ করিলে পুনরায় আর সে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে না।

মাতা জাগরিত হইয়া শিশুটিকে দেখিতে পাইলেন না। সূতিকাঘরে হাহাকার পড়িয়া গেল। কত কাঁদিলেন, কত কাটিলেন। মনে করিলেন,—তাঁহার অসাবধানতা বশতঃ কন্যাকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে।

অমাবস্যা বাবাজী গোপনভাবে পুলিসের নিকট পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে ধর্মদত্তের প্রতি ভগিনীবধের দোষারোপ করিলেন। পুলিসের দ্বারা তদন্তের সময় অমাবস্যা বাবাজী প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধর্মদত্ত রাত্রিকালে হাঁড়ির ভিতর করিয়া শিশুটিকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধাত্রীও সেইভাবে সাক্ষ্য দিল। প্রতিবাসী রামসেবক বলিলেন যে, রাজপুতেরা কিরূপে আপনাদিগের কন্যা বধ করিত, এ কথা ধর্মদত্ত তাঁহাকে কিছুদিন পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামসেবক মিথ্যা বলেন নাই, কুতূহলবশতঃ ধর্মদত্ত সত্য সত্যই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য ভারতসিংহ কিছুমাত্র যত্ন করিলেন না; একটি পয়সাও খরচ করিলেন না। ধরাশায়িনী শোকাকুলা পত্নীর অবিরত অশ্রুধারায় তাঁহার মন ঈষৎমাত্রও ভিজিল না। অমাবস্যা বাবাজী যে তাঁহার ঘোর সর্বনাশ করিতেছে, সে জ্ঞান তাঁহার হইল না। বীরবালার পিতা অনেক অর্থব্যয় করিলেন; সুচতুর উকীল নিযুক্ত করিয়া জামাতার রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সামান্য বালিকা হইয়াও কুলের কুলবধূ হইয়াও, এই বিপদের সময় স্বামিরক্ষার নিমিত্ত, বীরবালা উকীলের বাড়ী, সাক্ষীদিগের বাড়ী, কত লোকের বাড়ী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মদত্তের উকীল আসিয়া ভারতসিংহকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"ধর্মদত্ত যে ভগিনীকে বধ করে নাই, তাহা নিশ্চয়। অমাবস্যা বাবাজীর কুটিলতা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃত ঘটনা কি মহাশয়ের বোধ হয় অবিদিত নাই। অতএব সকল কথা প্রকাশ করিয়া, পুত্রের প্রাণরক্ষা করুন।" ভারতসিংহ, না রাম না গঙ্গা,—কোনও উত্তর করিলেন না। জড়ের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জবরদস্তসিংহের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। ধর্মদত্তের মাতা, পুত্রের হিত-কামনায় দেবতাদিগকে রাত্রি দিন ডাকিতেছেন। দেবতারা তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন না। বীরবালার কান্নায় দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার স্বামী অব্যাহতি পাইলেন না। যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ধর্মদত্ত দ্বীপান্তরিত হইলেন !!

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঘোমটাবতী

জামাতা-শোকে জবরদস্তসিংহ অতিশয় কাতর হইলেন। ক্রোধে সর্বশরীর তাঁহার কাঁপিতে লাগিল। অমাবস্যা বাবাজীর যথোচিত দণ্ড করিয়া অবশেষে

তাহার প্রাণবধ করিবেন, মনে মনে এই সংকল্প করিলেন। বিষণ্ণ-বদনে, অশ্রুনয়না মলিনবসনা বালিকা কন্যাকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি হইয়াছে, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। মাটীতে পড়িয়া বীরবালা অবিরত কাঁদিতেছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ঘোমটাবতী বলিয়া একটি উপদেবতা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরবালাকে শিশুকাল হইতে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন। বীরবালাকে আজ দুঃখসাগরে নিমগ্না দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। ঘোর-রজনীতে বীরবালা মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, ঘোমটাবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরবালাকে হাত-ছানি দিয়া ডাকিলেন। এরূপ সময়ে বীরবালার আর ভয় কি? তিনি উঠিলেন। ঘোমটাবতী যে দিকে যাইতে লাগিলেন, সেই দিকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গ্রাম পার হইয়া, দুই জনে মাঠের মাঝে উপস্থিত হইলেন। হাত বাড়াইয়া ঘোমটাবতী একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

তাহার পর ঘোমটাবতী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা কোমল, যেন অল্প দিবস পূর্বে সে স্থান কেহ খনন করিয়াছিল। হাত দিয়া বীরবালা সেই স্থানের মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি হাঁড়ি বাহির হইল। হাঁড়িটি তুলিয়া মুখের সরাখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর একটু গুড় একটুখানি কার্পাস ও একখানি কাগজ রহিয়াছে। সেইগুলি বাটী লইয়া আসিলেন ও আপনার পিতাকে দেখাইলেন। জবরদস্তসিংহ দেখিলেন যে, সেই কাগজখানিতে এইরূপ লেখা রহিয়াছে,—"আমার নাম শাহ সুলতান, নিবাস বোগদাদ। ভারতবর্ষ হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছি। লোকজন লইয়া তাঁবু খাটাইয়া এই মাঠে আমি রাত্রিযাপন করিতেছিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নিকটে ঐ ঝোপের ভিতর বসিয়াছিলাম। সেই সময় কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি একটি হাঁড়ি লইয়া মাঠে আসিল। হাঁড়ির ভিতর হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই ব্যক্তি হাঁড়িটি পুতিল। সেই মন্ত্র শুনিয়া বুঝিলাম যে, শিশুটি রাজপুত-কন্যা, নাম কমলা। কৃষ্ণকায় ব্যক্তি চলিয়া যাইলে, আমি তৎক্ষণাৎ মাটী খুঁড়িয়া হাঁড়িটি তুলিলাম। শিশুটি জীবিত রহিয়াছে দেখিলাম। আমি নিঃসন্তান। কমলাকে আমি আপনার দেশে লইয়া চলিলাম।" বীরবালার পিতা ও বীরবালা সেই কাগজখানি ও হাঁড়িটি উকীল ও বিচারকর্তাকে দেখাইলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সকলে বলিল,—"তুমি যে নিজে এই কাগজখানি প্রস্তুত কর নাই, তাহার প্রমাণ কি?"

বীরবালা ও তাঁহার পিতা পুনরায় বিষণ্ণ-চিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রিতে বীরবালা গোপনে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। পাগড়ীর ভিতর আপনার দীর্ঘ কেশ লুকাইলেন। সেই রাত্রিতেই অতি গোপনভাবে বাটী পরিত্যাগ করিলেন। পিতার প্রবোধের নিমিত্ত একখানি কাগজে এই লিখিয়া যাইলেন,—"পিতা! আমি কমলার অন্বেষণে চলিলাম। বোগদাদ নগরে চলিলাম। কমলাকে আনিয়া নিশ্চয় স্বামীর উদ্ধার করিব। স্বামিপদ ধ্যান করিয়া আমি যাইতেছি। নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইব। আপনি চিন্তিত হইবেন না।"

বীরবালা চলিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বৈ তো নয়? পথ-ঘাটের কথা তিনি কি জানেন? লোকের মুখে শুনিলেন যে, বোগদাদ অনেক দূর, পশ্চিমদিকে। বীরবালা সেই পশ্চিমদিকে চলিলেন। এক দিনে অধিক পথ যাইবেন—এরূপ ক্ষমতা কোথায়? অল্প অল্প করিয়া প্রতিদিন পথ হাঁটিতে লাগিলেন। নানা ক্লেশ পাইয়া, নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এক দিন এক স্থানে একটি

মেলা হইতেছে, বীরবালা তাহা দেখিতে পাইলেন। বীরবালা সেই মেলার ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভারতের নানা স্থান হইতে শত শত সাধুগণও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, এক জন সাধু, সিদ্ধি বাটিয়া সকলকে বিতরণ করিতেছেন। যে চাহিতেছে তাহাকেই তিনি সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন দিতেছেন। সহসা সকলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সকলের সন্দেহ হইল যে, সাধু হিন্দু নন্, মুসলমান। এইরূপ মনে করিয়া লোকে তাঁহার উপর ঢিল ও পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল। সাধুর একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি নিকটে শুইয়া ছিল। ক্রোধে অপর কাহাকে কিছু না বলিয়া, সাধু দুই হাতে কুকুরটির পা ধরিয়া তুলিলেন, নিকটস্থ একখানি পাথরের উপর আছাড় মারিলেন। কুকুরের মাথাটি ফাটিয়া গেল, চারিদিকে মস্তিষ্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, কুকুরটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। কুকুরের মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া সাধু সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া শিষ দিতে লাগিলেন। সেই শিষ শুনিয়া মৃত কুকুরটি তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল, দৌড়িয়া সাধুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সকলেই তখন সাধুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মেলাস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে সাধু অরণ্যময় নির্জন পর্বতের দিকে চলিলেন। বীরবালাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বার বার হাত নাড়িয়া সাধু তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। বীরবালা তাহা শুনিলেন না, বীরবালা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অবশেষে সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ কেন? আমাকে এরূপ বিরক্ত করিতেছ কেন?" বীরবালা তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা সমুদয় বলিলেন। সাধুর দয়া হইল। বৃক্ষপত্রে একখানি কবজ লিখিয়া বীরবালাকে দিলেন, ও বলিলেন,—"এই কবজখানি বাম হাতে ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা করিবে, সেই দণ্ডে সেইখানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। ইহার সহায়তায় তুমি বোগদাদ গমন কর। সে স্থান হইতে কমলাকে আনিয়া পতির উদ্ধার সাধন কর। আর আমার সঙ্গে আসিও না। কিন্তু দেখিও, কবজখানি যেন ছিঁড়িয়া না যায়। তাহা হইলে ফল হইবে না।"

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সবুজ ভূত

কবজ পাইয়া বীরবালার মনে আনন্দ হইল। অনায়াসে এখন বোগদাদ যাইতে পারিবেন, শাহ সুলতানের অনুসন্ধান হইবে, কমলাকে পাইবেন, পতির উদ্ধার হইবে, তাঁহার মনে এখন ভরসা হইল। বীরবালা মনে করিলেন,—"আচ্ছা দেখি দেখি সত্য সত্যই কবজের এইরূপ গুণ আছে কি না? প্রথমে বোগদাদ না গিয়া অন্য কোনও স্থানে যাইবার বাসনা করি। কবজের পরীক্ষা করি। দেখি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই কি না।"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কবজখানি বাম হাতের ভিতর করিলেন, আর মনন করিলেন,—"আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব।" মনে করিতে না করিতে বীরবালা শূন্যপথে দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিলেন। নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়া সেই প্রাচীর রহিয়াছে। বীরবালা ভাবিলেন যে, তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার ও-দিকে আর

পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ও-ধারে কি আছে? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্বনাশ! প্রাচীরের ও-ধারে পৃথিবীর ও-পারে কোটি কোটি খর্বকায় ভূত! প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে; ইচ্ছা,—প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে। পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবী একবারে রসাতল দিবে, এই তাহাদের বাসনা। কোটি কোটি খর্বকায় ভূতগণ একবার যদি প্রাচীর পার হইতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীর আর রক্ষা নাই। মনুষ্যকুল ধ্বংস করিয়া পৃথিবী তাহারা অধিকার করিবে। তাহাদের ভয়াবহ মূর্তি দেখিয়া বীরবালার প্রাণে ভয় হইল।

ছিদ্র দিয়া তাহারাও সেই সময়ে বীরবালাকে দেখিতে পাইল। ছিদ্র দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহারা বীরবালার হাত ধরিল। কবজখানি কাড়িয়া লইবে, এই তাহাদের বাসনা। অতি কষ্টে বীরবালা হাত ছাড়াইয়া লইলেন। কিন্তু ঘোর বিপদের কথা! টানাটানিতে কবজখানি ছিঁড়িয়া গেল!

যোগদাদে না গিয়া পৃথিবীর প্রান্তভাগে মিছামিছি আসিয়া কবজখানি হারাইলেন। সে নিমিত্ত বীরবালা আপনাকে কত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু কি করিবেন! আর উপায় নাই। পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। পৃথিবীর আগা কি এখানে? পথ আর ফুরায় না। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বীরবালা এইরূপ পথ চলিলেন। তথাপি লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। একদিন এক পাহাড়ের নিকট বীরবালা একটি সবুজ বর্ণের বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধা গাছতলায় বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল ও চরকা কাটিতেছিল। বীরবালাকে দেখিয়া সে অমনি তাড়াতাড়ি চরকা ফেলিয়া উঠিল, আর আকাশপানে পা করিয়া বীরবালার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বীরবালা যে দিকে যান, আর আকাশ পানে পা করিয়া বুড়ীও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অবশেষে বীরবালাকে বুড়ী যেই একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইল, আর সব দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। বীরবালার বড় ভয় হইল। দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। সবুজ বুড়ী আপনার আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। সবুজ বুড়ীর বাটীতে কোলাহল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া বীরবালা তাহাদের সকল কথা শুনিতে পাইলেন। এই পৌষপার্বণে তাহারা বীরবালাকে কাটিয়া-কুটিয়া পিণ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইবে, সবুজ ভূতেরা এই পরামর্শ করিতে লাগিল। চারিদিকে চাউল কুটিবার ধুম পড়িয়া গেল। ডা'ল বাঁটা হইতে লাগিল। অবশেষে বীরবালাকে কুটিবার সময় উপস্থিত হইল। অন্য ভূতদিগের মত সবুজ ভূতেরা আচার-বিহীন নয়। ইহারা বৃথা মাংস ভক্ষণ করে না; ঠাকুরদের নিবেদন করিয়া বীরবালার বলিদান হইবে। তাহার পর বীরবালার দেহকে কাটিয়া-কুটিয়া পিণ্টক প্রস্তুত করিবে। দুই-চারি জন সবুজ ভূতে বীরবালাকে ধরিয়া স্নান করাইল। পাহাড়ের মাথায় দেবতার মন্দিরে গিয়া পূজা দিল। যথাবিধি বীরবালাকে উৎসর্গ করিল। বলিদান দিবার নিমিত্ত বীরবালাকে পাহাড়ের ধারে লইয়া গেল। এক দিকে পাহাড়, অপর দিকে অতল গিরিগহ্বর। কোপ মারিবার নিমিত্ত কামার-ভূত খাঁড়া তুলিল। বীরবালা ভাবিলেন,—"মরিলাম তো। মরিতে তো আর বাকী নাই। কিন্তু আমার মাংস লইয়া সবুজ ভূতেরা যে পিঠে করিয়া খাইবে, তাহা দিব না।" এই মনে করিয়া তিনি পর্বতের শিখরদেশ হইতে ঝাঁপ দিলেন। শূন্যপথে বীরবালা পাহাড়ের তলদেশে পড়িতে লাগিলেন।

পাহাড়ের গায়ে একখানি পাথরের উপর সবুজ ভূতদিগের একটি ছেলে

বসিয়াছিল। ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া সবুজ-বুড়ীর বাড়ীতে সে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। সবুজ বুড়ীর বাড়ীতে আজ মানুষের পিঠে হইবে, পৌষপার্বণের দিনে পেট ভরিয়া মানুষের পিঠে খাইবে। তাই, মনের আনন্দে ভূতের ছেলেটি পায়ের উপর পা দিয়া পাথরের উপর বসিয়া আছে।

পড়িবি তো পড়, বীরবালা গিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলেন। অকস্মাৎ কি আসিয়া আকাশ হইতে ঘাড়ে পড়িল, সেজন্য ভূত-বালক চমকিয়া উঠিল। তাহার বড় ভয় হইল। নিমন্ত্রণ খাওয়া ঘুরিয়া গেল। পলাইবার নিমিত্ত সে আকাশে উড়িল। দৃঢ়রূপে বীরবালা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। আকাশে উড়িতে উড়িতে ভূত বালক ক্রমাগত গা-ঝাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু বীরবালা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, বীরবালাকে সে কিছুতেই ফেলিয়া দিতে পারিল না। উড়িতে উড়িতে ভূত-বালক গিয়া মহাসমুদ্রের উপর উপস্থিত হইল, উড়িয়া উড়িয়া তাহার শ্রান্তি বোধ হইল। সমুদ্রের উপর একখানি জাহাজ যাইতেছে, সে দেখিতে পাইল। সেই জাহাজের মাস্তুলের উপর ভূত-বালক গিয়া বসিল। এই সময় বীরবালা তাহার গলা ছাড়িয়া দিলেন, আর হাত দিয়া মাস্তুলের দড়ি ধরিলেন। 'ছাড়ান পাইয়া ভূত-বালক তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলাইল।

মাস্তুল হইতে বীরবালা নামিয়া জাহাজের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। জাহাজের লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই আশ্চর্য্য হইল যে, এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের উপর মানুষ কোথা হইতে আসিল। আকাশ হইতে পড়িল না কি? যাহা হউক, বীরবালা সেই জাহাজে রহিলেন। অল্প দিন পরে প্রবল ঝড় উঠিল, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ দ্বারা মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতে লাগিল; জাহাজ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। জাহাজের লোকে মনে করিল, বীরবালার আগমনেই তাহাদের এই বিপদ ঘটিতেছে। এ মনুষ্য নয়। ভূত কি ডাইন হইবে। আকাশ হইতে মানুষ আবার কবে কোথায়, জাহাজের উপর পড়ে? এই মনে করিয়া রাত্রিকালে তাহারা বীরবালাকে সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দিল। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে বীরবালা চলিলেন! অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সমুদ্র-কূলে বালির উপর পড়িয়া আছেন। আস্তে আস্তে উঠিলেন, উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে বালুকাপ্রান্তর, ধূ ধূ করিতেছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। যাইতে যাইতে একটি মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উটে করিয়া মনুষ্যটি আসিতেছিল। বীরবালাকে ধরিয়া সে আপনার নিকট উটের পৃষ্ঠে বসাইল, উট চালাইয়া দিল। সাত দিন সাত রাত্রি বীরবালা সেই মনুষ্যের সহিত উটের পৃষ্ঠে যাইলেন। অবশেষে তাঁহারা একটি নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মনুষ্য বীরবালাকে লইয়া এক-জন অর্থবান ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিল। ক্রেতার নাম ইব্রাহিম। বীরবালা এক্ষণে জানিতে পারিলেন যে, তিনি আরবদেশে মক্কা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মক্কা নগরে ইব্রাহিমের ঘরে বীরবালা বাস করিতে লাগিলেন। সুন্দর শান্ত-প্রকৃতি বালক দেখিয়া ইব্রাহিম বীরবালাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিমের স্ত্রীও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে বীরবালা এক দিন ইব্রাহিমের বিবিকে আপনার সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন ইব্রাহিমের স্ত্রী বুঝিতে পারিলেন যে, বীরবালা বালক নন্—বালিকা। স্বামীকে তিনি সকল কথা বলিলেন। স্ত্রী-পুরুষে বীরবালার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। দয়া করিয়া তাঁহারা বীরবালাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন ও অর্থ দিয়া বণিকদিগের সহিত যোগদাদে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় : সাহেব ভূত

বীরবালা বোগদাদে উপস্থিত হইয়া শাহ সুলতানের বাটী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শাহ সুলতান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্ব পাইলেন। বীরবালা শুনিলেন যে, আজ এক বৎসর শাহ সুলতান মরিয়া গিয়াছেন। তিনি বিপুল ধন রাখিয়া গিয়াছেন। পাঁচ বৎসরের একটি শিশুকন্যাকে সেই বিষয়ের অধিকারিণী করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরাগৎ হোসেন, কন্যাটিকে তাড়াইয়া দিয়া সমুদয় বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাহার পর নানারূপ দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অল্পদিনে সমুদয় বিষয় তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। পথের ভিখারী হইয়া অবশেষে একটি সাহেবের বাড়ীতে চাকরী করিতেছেন। এই সকল কথা শুনিয়া বীরবালার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, শিশুটি আর কেহ নয়। কমলা—এক্ষণে তিনি সেই শিশুটির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক সন্ধান করিয়া অনেক ক্লেশে, শেষে জানিতে পারিলেন যে, শাহ সুলতানের বাটী হইতে বিদূরিত হইয়া শিশুটি কয়েক দিনের নিমিত্ত পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময় সেই পথ দিয়া একটি ইংরেজ বণিক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন। নিরাশ্রয় শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহাদের দয়া হইল। আদর করিয়া তাহাকে বাটী লইয়া যাইলেন। সেই অবধি ইংরেজ বণিকের ঘরে শিশুটি বাস করিতেছিল। ইংরেজ বণিকের সহসা সৌভাগ্যের উদয় হইল। সহসা তিনি বিপুল অর্থলাভ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। শিশুটি তাঁহাদের সঙ্গেই রহিল।

এই কথা শুনিয়া বীরবালা হতাশ হইয়া পড়িলেন। বোগদাদে আসিয়াও কমলাকে পাইলেন না। কি করিবেন? এক্ষণে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পরে ভূমধ্যসাগর-কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কি করিয়া বিলাত যাইবেন, বিষণ্ণ বদনে সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিঃশ্বাসটি যেই ফেলিয়াছেন, আর কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া নিকটে কে কাঁদিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া বীরবালা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি সাহেব-ভূত! সাহেব-ভূত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওগো তুমি আমার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করিলে, জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলে কেন? এই দেখ, আমার শরীরের যোড় সব খুলিয়া গেল।"

বীরবালা দেখিলেন, সত্য সত্যই সাহেব-ভূতের শরীরের যোড় সব খুলিয়া যাইতেছে। হাত, পা, নাক, কান খসিয়া পড়িতেছে।

সভয়ে বীরবালা বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে এখানে বসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। আপনার শরীরের যোড় যে এত ভঙ্গুর, তাহাও জানিতাম না। তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিতাম।"

সাহেব ভূত পুনরায় বলিলেন,—"আমার আঙ্গুল খসিয়া গেল, এখন আঙটি পরিব কোথায়? হাত খসিয়া গেল, বালা পরিব কোথায়? পা খসিয়া গেল, মল পরিব কোথায়? নাক খসিয়া গেল, নোলক পরিব কোথায়? কান খসিয়া গেল, মাকড়ি পরিব কোথায়?"

সাহেব ভূতের দুঃখে বীরবালা দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! ইহার কি কোনও উপায় নাই?" ভূত বলিলেন,—"যদি তুমি কাদা দিয়া আমার হাত পা ভাল করিয়া জুড়িয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি ভাল হই।" বীরবালা তাহাই করিলেন। সুস্থ হইয়া সাহেব-ভূত বীরবালার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল কথা পরিচয় দিয়া বীরবালা সাহেব-ভূতকে বিলাত যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা

করিলেন। সাহেব-ভূত বলিলেন,—"তার ভাবনা কি? আমি এইক্ষণেই তোমাকে টেলিগ্রাফে বিলাত পাঠাইয়া দিতেছি। জন-সাহেব কমলাকে বিলাত লইয়া গিয়াছেন, রঙ্গিণী মেমের নিকট তোমাকে আমি পাঠাইব। আমি জীবিত থাকিতে রঙ্গিণী আমার স্ত্রী ছিলেন। জন-সাহেবের মেমের সহিত রঙ্গিণীর ভাব আছে।". এই বলিয়া সাহেব-ভূত সমুদ্রের বালি দিয়া বড় একটি টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিলেন। বীরবালাকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন।

বীরবালা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে সাহেব-ভূত তারের বাঁটটি টক্ টক্ টক্ টক্ করিয়া নাড়িলেন, আর সেই মুহূর্তেই বীরবালা বিলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে রঙ্গিণীর ঘরের ভিতর গিয়া পেঁাছিলেন। আরসির নিকট দাঁড়াইয়া রঙ্গিণী তখন বেশ-ভূষা করিতেছিলেন, মুখে পাউডার মাখিতেছিলেন। সহসা বীরবালাকে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন।

রঙ্গিণীর নিকট বীরবালা সকল পরিচয় দিলেন। বীরবালা তাঁহার নিকট দুই একদিন বাস করিলেন। তাহার পর রঙ্গিণী তাঁহাকে জন-সাহেবের নিকট লইয়া যাইলেন। জন-সাহেব বলিলেন যে, বোগদাদ হইতে কমলাকে তিনি বিলাতে আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখানে আনিয়া কন্যাটিকে বিজয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বিজয়া অতি সম্ভ্রান্ত মহিলা, অতি দয়াময়ী, অতি পবিত্র-প্রাণা। শিশুটিকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায়, অতি যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া বীরবালা বিজয়ার নিকট গমন করিলেন। কমলাকে দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অতি মধুর ভাষে বিজয়া বলিলেন,—"কমলা আমার প্রাণস্বরূপ। কমলাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।" ভূমে জানু পাতিয়া, যোড় হস্তে বীরবালা স্তুতি-বিনতি করিতে লাগিলেন, বীরবালা বলিলেন,—"মহাদয়া! দয়াময়ী! দয়াময়ী বলিয়া সকলে আপনাকে জানে। আপনার প্রভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাস, দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে। আপনি পবিত্রতাময়ী। আপনার পবিত্রতা আদর্শস্থল হইয়া ঘরে ঘরে আজ পবিত্রতার আবির্ভাব করিয়াছে। আমার পতি ধর্মের প্রতি আপনি কৃপা করুন। আমার শ্বশুর ভারতসিংহের প্রতি আপনি কৃপা করুন। ভারতসিংহ বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন হইয়াছেন। তাঁহার সংসার আজ শ্মশানভূমি হইয়াছে। কমলাকে প্রদান করুন। ধর্মকে আমি পুনরায় দেশে আনয়ন করি। ভারতসিংহের অন্ধকার সংসার পুনরায় আলোকিত হউক।"

এইরূপ স্তুতি বিনতি শুনিয়া বিজয়ার মনে দয়া হইল, ভারতসিংহের দুর্দশা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। বীরবালার হস্তে কমলাকে সমর্পণ করিলেন। বীরবালা তাঁহার কে হন, তাহা শুনিয়া কমলার আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু সকলের মুখ দেখিবেন, সে জন্য কমলার মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। বীরবালার গলা ধরিয়া কমলা কত কাঁদিলেন, কত হাসিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ পোষড়ার পিঠে

কমলাকে লইয়া বীরবালা দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নিকটস্থ নগরে থাকিয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন। জবরদস্তসিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে পাইয়া, কমলাকে দেখিয়া জবরদস্তসিংহের আর সুখের পরিসীমা রহিল না। কমলাকে দেখাইয়া, যথাবিধি উপায় করিয়া, ধর্মদত্তকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিলেন। অবশেষে ধর্মদত্ত, বীরবালা ও কমলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভারতসিংহের ভবনে উপস্থিত হইলেন। জবরদস্তসিংহ, বীরবালার পুনরাগমন, কমলা-লাভ,

ধর্মের মুক্তি, এতদিন সকল কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। আজ সকলকে লইয়া সহসা ভারতসিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ দেখিয়া ধর্মের মাতা স্বর্গ যেন হাত বাড়াইয়া পাইলেন। অমাবস্যা বাবাজীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভারতসিংহকে বলিলেন,—"আপনার এ পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূকে কিছুতেই ঘরে লওয়া যাইবে না।" এই কথা শুনিয়া জবরদস্তসিংহ আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাবাজীর চিমটাটি সেই স্থানে পড়িয়াছিল; চিমটার অগ্রভাগ অগ্নির ভিতর ছিল। অগ্নির উত্তাপে চিমটার অর্ধাংশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছিল। জবরদস্তসিংহ সেই চিমটাটি তুলিয়া লইয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা অমাবস্যা বাবাজীর নাক ধরিলেন। বাবাজীর নাসিকা পড় পড় শব্দে পুড়িতে লাগিল। তাহা হইতে দারুণ দুর্গন্ধময় ধূম নির্গত হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় বাবাজী চীৎকার করিতে লাগিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, বাবাজী আপনার পৃষ্ঠে পক্ষীর মত পাখা বাহির করিলেন। অবশেষে জানালা দিয়া উড়িয়া পলাইলেন।

সকালে আশ্চর্য্য হইলেন। সকলে তখন বুঝিলেন যে, অমাবস্যা বাবাজী মনুষ্য নন। অমাবস্যা বাবাজী যেই উড়িয়া যাইলেন, আর ভারতসিংহ যেন চমকিত হইয়া ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। নির্বাণ-প্রায় তাঁহার চক্ষু দুইটিতে পুনরায় আলোকের সঞ্চার হইল, তাঁহার মুখ প্রভাময় হইল। সহসা ভারতসিংহের যেন পুনরায় নবযৌবনের উদয় হইল। ধর্মদত্ত, বীরবালা ও কমলাকে তিনি সাদরে কোলে করিলেন। মোহবশতঃ অন্ধ হইয়া স্ত্রী-পুত্রকে নানারূপ ক্লেশ দিয়াছিলেন, দেবদুর্লভ ধর্ম যেন পুত্র ও কমলা যেন কন্যারত্নকে তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন, সে জন্য ভারতসিংহ এক্ষণে মনোদুঃখে অতিশয় কাতর হইলেন, আকুল হইয়া মনের বেদনায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে বীরবালা ভাবিলেন,—"যদি ঘোমটাবতীকে দেখিতে পাই, ত তাঁহার চরণে একবার প্রণাম করি; তিনি আমার বড় উপকার করিয়াছেন।" এইরূপ ভাবিয়া বীরবালা একাকিনী মাঠের দিকে চলিলেন। কমলা যে স্থানে মাটিতে প্রোথিত হইয়াছিলেন, বীরবালা সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষতলে ঘোমটাবতী বসিয়া রহিয়াছেন, বীরবালা দেখিতে পাইলেন। করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতঃ! আপনি কে বলুন! আপনি যে ভূতিনী নন, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। আপনি কে বলুন।" কোনও রূপ উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া ঘোমটাবতী ঘোমটা খুলিলেন। বিদ্যুৎপ্রায় তাঁহার রূপের ছটায় জগৎ আলোকিত করিল। বিশ্বসংসার শান্তিসুধায় সিক্ত হইল। আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। অপ্সরা বালকগণ মধুরতানে বীরবালার সাহস, বিক্রম ও পতিভক্তির গুণগান করিতে লাগিল। অপ্সরা বালিকাগণ বীরবালার বেশভূষা করিতে লাগিল।

বীরবালাকে মাঠের দিকে যাইতে ধর্মদত্ত দেখিয়াছিলেন। বীরবালার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভাবনা হইল। বীরবালার অনুসন্ধানে তিনিও মাঠের দিকে চলিলেন। মাঠের মাঝখানে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া ধর্মদত্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বীরবালা বসিয়া আছেন। অপ্সরা বালক-বালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কেহ তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ তাঁহার সুকোমল শরীর সুগন্ধ দ্বারা সিক্ত করিতেছে। আকাশপানে চাহিয়া দেখিলেন যে, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ধর্মদত্ত আকাশের দিকে মস্তক আরও উন্নত করিলেন। সবলে মাথাটি যেই তিনি তুলিলেন, আর তাঁহার ঘাড়টি খুট করিয়া উঠিল।

ঘাড়টি যেই খট্ করিয়া উঠিল, আর সেই অপূর্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল, দেখিলেন যে, তিনি সরযূকূলে অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। আপনার শরীর পানে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন যে, সে শরীর ধর্মদত্তের শরীর নয়, আর কার শরীর। "আমি কে?" এই কথা লইয়া তাঁহার মনে ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তিনি অযোধ্যানিবাসী দেবীসিংহ। স্বপ্নে তিনি আপনাকে ধর্মদত্ত মনে করিয়াছিলেন, আর এই সমস্ত অদ্ভুত রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে স্বপ্নই বা কি করিয়া বলি। ক্ষণকালের নিমিত্তও তিনি তো নিদ্রা যান নাই। কেবল একবার মাত্র তাঁহার ঢুল আসিয়াছিল। সম্মুখ দিকে তাঁহার মাথাটি একবার ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, আর সেই সময় তাঁহার ঘাড়টি একটু খট্ করিয়াছিল। সেই মুহূর্তেই তিনি মাথাটি সোজা করিয়া লইলেন, আর ঘাড়টি আর একবার খট্ করিল। এ কতটুকু সময়? কিন্তু এই ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি এত কাণ্ড দেখিলেন, এত কাণ্ড শুনিলেন, এত কাণ্ড করিলেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! স্বপ্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বীরবালা যে স্বপ্ন, প্রকৃত দেবীরূপিণী নারী নন, সে কথা ভাবিয়া দেবীসিংহের মন বড়ই কাতর হইল। "যদি বীরবালাকে আর দেখিতে পাইব না, তবে এ জাগরণে প্রয়োজন কি? চিরনিদ্রায় কেন আমি অভিভূত হইয়া থাকিলাম না।"

দেবীসিংহ অতি কাতর হইয়া বৃক্ষের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন যে, বৃক্ষ-ডালে একটি হনুমান বসিয়া রহিয়াছে। সেইক্ষণেই চতুর্দশবর্ষীয়া একটি পরমা-সুন্দরী বালিকা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! অযোধ্যা কি এই পথ দিয়া যাইতে হয়?" সে কণ্ঠস্বর, সে রূপ, দেবীসিংহের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, কখনও আর ভুলিবার নহে। চকিত হইয়া দেবীসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও, বীরবালা?"

বালিকাটি উত্তর করিল,—"আজ্ঞা, হাঁ। আমার নাম বীরবালা বটে। আপনি আমার নাম কি করিয়া জানিলেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকাটির পিতা এবং তদীয় পরিবারবর্গ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিচয় পাইয়া দেবীসিংহ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারাই তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশুর-বাড়ীর লোক, বালিকাটি তাঁহার স্ত্রী। আর দেখ আশ্চর্য্যের কথা কি বলিব। এই যে বালিকা বীরবালা তাঁহার স্ত্রী 'ইনি যেন সেই বীরবালা' সেই স্বপ্নের বীরবালা। অদ্ভুত মানিয়া দেবীসিংহ গাছ পানে পুনরায় চাহিয়া দেখিলেন। গাছের উপর বীর হনুমান বসিয়া হাসিতেছেন। দেবীসিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সাদরে শ্বশুর ও তাঁহার পরিবারবর্গকে দেবীসিংহ বাটী লইয়া যাইলেন। বীরবালার রূপে, বীরবালার গুণে, দেবীসিংহের পিতামহী ও আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। পৌষপার্বণের সময় গৃহে কুটুম্বেরা সমাগত হইয়াছেন। পিতামহী কত চাউল কুটিলেন, কত ডাউল বাটিলেন, কত নারিকেল কুরিলেন। নানাবিধ পিষ্টক করিয়া কুটুম্বদিগকে আহার করিতে দিলেন। এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।

লুল্লু

প্রথম অধ্যায় ঃ চুরি

"লে লুল্লু," আমীর সেখের মুখ দিয়া যখন এই কথা দুইটি নির্গত হইল, তখন তিনি জানিতেন না, ইহাতে কি বিপত্তি ঘটিবে। কথা দুইটি আমীরের অদৃষ্টে বজ্রাঘাতরূপে পতিত হইল। আমীরের বাটী দিল্লী সহরে, আমীর জাতিতে মুসলমান। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমীরের বিবি একেলা বাহিরে গিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া, স্ত্রীকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমীর ভিতর হইতে বলিলেন,—"লে লুল্লু।" অর্থাৎ কি না, "লুল্লু! তুই আমার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যা।" লুল্লু, কোনও দুরন্ত বাঘেরও নাম নয়, কিংবা ছুরিধারী কানকাটারও নাম নয়। "লুল্লু" একটি বাজে কথা, ইহার কোন মানে নাই, অভিধানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিহাস করিয়া আমীর কেবল কথাটি যোড়-তাড় করিয়া বলিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, তখন কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্য্যের কথা এই, লুল্লু একটি ভূতের নাম ছিল। আবার দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্তে আমীরের বাটীর ছাদের আলিশার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে চমকিয়া উঠিল, শুনিল,—কে তাহাকে কি লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন্। চকিতের ন্যায়, দুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর ঠিক নাই।

আমীর, ঘরের ভিতর থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, স্ত্রী এই আসে। এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়াশব্দ কিছুই পাইলেন না। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, নিঃশব্দ। বাহিরে আসিয়া, এখানে ওখানে চারিদিকে স্ত্রীকে খুঁজিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তবুও মনে এই আশা হইল, স্ত্রী বুঝি তামাসা করিয়া কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই, পুনরায় প্রদীপ হাতে করিয়া অতি-পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিলেন, বাড়ীর ভিতর স্ত্রীর নামগন্ধও নাই। আবার আশ্চর্য্যের কথা এই যে বাড়ীর দ্বার বন্ধ। সন্ধ্যাকালে নিজে তিনি যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে। তবে তাঁহার স্ত্রী কোথায় যাইলেন? পতিব্রতা সতী-সাধ্বী আমীর-রমণী বাড়ীর বাহিরে কখনই পদার্পণ করিবেন না। আর যদিও তাঁহার এরূপ কুমতি হয়, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া ত যাইতে হইবে! দ্বার ত আর ফুঁড়িয়া যাইতে পারেন না! দারুণ কাতর হইয়া আমীর এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমীরের চক্ষু হইতে বুক বহিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল। প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে না দেখিয়া গৃহ শূন্য জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য,—আমীর সবই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেবল শূন্য নয়, গ্রীষ্মকালের আতপতাপিত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া হৃদয় তাঁহার জ্বলিতে লাগিল। "আমি আমার অমূল্য নারী-রত্নকে আপন হাতেই বিলাইয়া দিলাম;" আমার কথা মত

তাহাকে জিনেই লইয়া গেল, কি ভূতেই লইয়া গেল, কি স্বয়ং শয়তান আসিয়াই লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! হায়! কি হইল!" এইরূপে আমীর নানাপ্রকার খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া, দ্বার খুলিয়া পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া আমীরের বাটী অন্বেষণ করিল। আমীরের বাটী দেখিবার পর, পাড়ার এ-ঘরে ও-ঘরে যথাবিধি অন্বেষণ হইল। গলি-ঘুঁজি সকল স্থানই দেখা হইল। খুঁজিতে আর কোথাও বাকী রহিল না, কিন্তু আমীরের স্ত্রীকে কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রতিবাসীরা ক্রমে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল, নিশ্চয় আমীরের বিবি কোনও পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। এরূপ সুন্দরী নব-যৌবনা রমণী আফিমচীর ঘরে কত দিন থাকিতে পারে? আমীর একটু একটু পাকা আফিম খাইতেন, তাহার এই দোষ। এক ত স্ত্রী গেল, তার পর যখন এই কলঙ্কের কথা আম বের কানে উঠিল, আফিমচী হউন, তখন তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—"দূর হউক, এ সংসারে আর থাকিব না, লোকের কাছে আর মুখ দেখাইব না, ফকিরী লইয়া দেশে দেশে বেড়াইব, যদি সে প্রিয়তমা লায়লারূপী সাধ্বীকে পুনরায় পাই, তবেই দেশে ফিরিয়া আসিব, না হইলে মজনুর মত এ ছার জীবন একান্তই বিসর্জন দিব।"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ফকিরের বেশে আমীর ঘর হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কিছুই লইলেন না;—লইলেন কেবল একটি টিনের কৌটা, একটি বাঁশের নল, আর একটি লোহার টেকো। আমীর কিছু সৌখীন পুরুষ ছিলেন। টিনের কৌটার ঢাকনের উপর কাচ দেওয়া ছিল, আরশির মত তাহাতে মুখ দেখা যাইত। পান খাইয়া আমীর তাহাতে কখন কখন মুখ দেখিতেন, ঠোঁট লাল হইল কি না। বাঁশের নলটি তাহার বড়ই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিসটি ক্রয় করেন। ইহার গায় হিজিবিজি কালো কালে অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সেই হিজিবিজিগুলির বড়ই গৌরব করিতেন। বস্তুত কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর,—চীনাভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,—"চীনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং সহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটি প্রস্তুত হইয়াছে। নল-নির্মাণ কার্যে মোপিঙ দ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার সখ্যাতি। মূল্য চারি আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকরাদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনঃনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" যাহা হউক আমীর যে নলটি কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া, চীনের উত্তরসীমায় লিংটিং সহরে আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ সিকিটি ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি, ধর্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটি আমীরের মনোনীত হইয়াছিল। এত মনোনীত হইয়াছিল যে, প্রতিদিন ইহাতে অতি যত্নে আমীর তেল মাখাইতেন। তেল খাইয়া খাইয়া, পাকিয়া, ইহা ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ হইয়াছিল। কৌটার ভিতর বড়ই সাধের ধন, আমীরের প্রস্তুত করা আফিম থাকিত, ইতর ভাষায় যাহাকে লোকে চণ্ডু বলে। বাঁশের নলটি দিয়া চণ্ডুর

ধূম পান করিতেন। টেকো দ্বারা কৌটা হইতে আফিম তুলিয়া নলের আগায় রাখিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রোজা

এই সকল সরঞ্জাম লইয়া আমীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দিল্লী পার হইলেন, কত নদ নদী গ্রাম প্রান্তর অতিক্রম করিলেন। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া খান, সন্ধ্যা হইলে, গাছতলায় হউক, কি মাঠে হউক, পড়িয়া থাকেন। খোদা খোদা করিয়া কোনমতে রাত্রি কাটান। এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। স্ত্রীকে পুনরায় পাইবার আশা আমীরের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। হয় ফকিরী করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে, না হয় একটা বুড়ো-হাবড়া নিকা করিয়া পুনরায় ঘরকন্না করিতে হইবে, এই ভাবিয়া শোকে তিনি নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। এক দিন তিনি একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজনদের বাটীর সম্মুখে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে গ্রামটি পশ্চিমের চক্রবেড়বিশেষ। যেখানে লোক বসিয়াছিল, সেটি জানের বাড়ী। গৃহস্বামী একজন প্রসিদ্ধ গণৎকার। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। সংসারে তাঁহার কাছে কিছুই গুপ্ত নাই। অদৃষ্টের লিখন তিনি জলের মত পড়িতে পারেন। সামুদ্রিকে হনুমানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি। ললাটে কি হাতে, যে ভাষায় বিধাতা কেন আঁচড়-পিচড় পাড়িয়া থাকুন না,—ইংরেজিতে হউক, কি ফারসীতে হউক, দেব-ভাষায় হউক, কি দানব ভাষায় হউক,—সকলই তিনি অবাধে পড়িতে পারেন। চুরি-জুয়াচুরির সকলই বলিয়া দিতে পারেন। অবোধ গবর্ণমেণ্ট যদিও তাঁহাকে একটিও পয়সা, কি একটিও টাইটেল দেন নাই সত্য, কিন্তু দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিয়া থাকে। পাঁচটি পয়সা আর পাঁচ ছটাক আটা দিয়া ভূত ভবিষ্যৎ গণাইয়া লয়। আমীর বলিলেন,—"আমিও জানের বাড়ী যাই, ইন্‌শাল্লাতালা! কে আমার বিবিকে লইয়া গিয়াছে, সে গণিয়া দিবে।" আমীর গিয়া জানের বাটীর সম্মুখে বসিলেন। অন্যান্য লোকের গণা-গাঁথা হইয়া যাইলে, অতি বিনীত-ভাবে গণৎকারের নিকট তিনি আপনার দুঃখের কথা আগাগোড়া বলিলেন। গণৎকার ক্ষণকালের নিমিত্ত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে চারিখানি খাপ্‌রা হাতে লইলেন। মন্ত্র পড়িয়া সেই চারিখানি খাপরায় ফুঁ দিতে লাগিলেন। যখন মন্ত্র পড়া আর ফুঁ দেওয়া হইয়া গেল, তখন একখানি উত্তর দিকে একখানি দক্ষিণে, একখানি পূর্বদিকে, আর একখানি পশ্চিমে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তার পর কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"ফকিরজী! আপনার স্ত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। আপনার স্ত্রীকে ভূতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু করিব কি! আমি ভূতের রোজা নই। ভূতের উপর আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্‌কালে আপনার স্ত্রীকে আনিয়া দিতাম। তবে আপনাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। আপনি এক্ষণে একটি ভাল রোজার অনুসন্ধান করুন। ভাল রোজা পাইলে নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন।" এইরূপ আশ্বাস পাইয়া আমীরের মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তাঁহার স্ত্রী যে কোনও দুষ্ট লম্পটের কুহকে পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হয় নাই, এ দুঃখের সময় তাহাও শান্তির কারণ হইল।

এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ

লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজি-ভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কি না হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। এ কথায় রক্তমাংসের শরীরেই রাগ হয়, ভূতদেহে ত রাগ হইবেই। তাই ঘৃণায় ভূতকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—"দূর হউক, আর কাহাকেও পাইব না।" ডাইনীকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—"দূর হউক, আর কাহাকেও খাইব না।" ভারতের ভূতকুল ও ডাইনীকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মাণ। শ্মশান-মশান আজ তাই নীরব। রাত্রি দুই প্রহরের সময়, জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, আকাশ পানে পা তুলিয়া জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, সেকালে ডাইনীরা যে চাতর করিত, আজ আর সে চাতর নাই। মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল! এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কি করিয়া চলিবে? তাহাও এক প্রকার লোপ হইয়াছে। নানাস্থানে কত শত গঙ্গা ময়রার ঘরে আজ অন্ন নাই। পায়ের উপর পা দিয়া, সোনা-দানা পরিয়া, যাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত, আজ তাহারা পথের ভিখারী। আমীর দেখিলেন, ভাল রোজা পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। আমীর কিন্তু হতাশ হইবার ছেলে ছিলেন না। মনে করিলেন যে,—"যদি আমাকে পৃথিবী উলট পালট করিয়া ফেলিতে হয়, তাহাও আমি করিব, যেখানে পাই সেইখান থেকে ভাল রোজা নিশ্চয় বাহির করিব।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় দেশপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন,—"হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল ভূতের রোজা আছে?" ছোট-খাট অনেক রোজার সঙ্গে দেখাও হইল। অনেক মুসলমান আসিল, যাঁহারা তাবিজ লিখিয়া ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যকে দূর করেন, তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু মনের মত কাহকেও পাইলেন না; বুক ফুলিয়া কেহই বলিতে পারিল না যে,—"ভূত মারিয়া আমি তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দিব।" অবশেষে অনেক পথ, অনেক দূর যাইয়া আমীর একটি গ্রামে গিয়া পেঁৗছিলেন। সেই গ্রামে প্রথমেই একটি বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আমীর যথারীতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল রোজা আছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"হাঁ বাছা! আছে। আমাদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে সম্প্রতি একটি দুর্দ্দান্ত ভূতে পাইয়াছিল। মহাজনের টাকার আর অবধি নাই। সে যে কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত হেকিম, কত রোজা আনিয়াছিল, তাহার আর কি বলিব, দু পা দিয়া জড় করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারে নাই। অবশেষে এই গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র পড়িয়াই তাহাকে আরোগ্য করেন। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে খাইতে পাইত না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর উদরে অন্ন ছিল না, অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, এখন অন্ন বস্ত্রের কথা দূরে থাকুক দ্বারে হাতী, ঘোড়া, উট বাঁধা।"

তৃতীয় অধ্যায় : তাঁত

বলা বাহুল্য, আমীর এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঝুঁকে সেলাম করিয়া, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত আপনার দুঃখের কাহিনী বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দেখ, ভূতে পাইলে আমি ছাড়াইতে পারি। ভূতে যদি কাহাকেও একবারে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার আমি কি করিতে পারি? পাহাড়ে লইয়া গিয়াছে, কি সমুদ্রের ভিতর

লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব ? ফকির সাহেব ! তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।" এই কথা শুনিয়া আমীর মাথা হেঁট করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুর্বাসা মুনির জাতি ! যেমন কঠিন, তেমনি কোমল ! সেই জলেই ব্রাহ্মণের মন ভিজিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"শুন ফকিরজী ! তোমাকে মনের কথা বলি,—প্রকাশ করিও না। তাহা হইলে রোজা বলিয়া আমার যা কিছু মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইয়াছে, সকলই যাইবে। তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রকৃত রোজা নই, ভূত ছাড়াইবার একটি মন্ত্রও জানি না। এমন কি, গায়ত্রী পর্য্যন্ত জানি না, আর লেখাপড়া বিষয়ে, ক খ পর্য্যন্তও শিখি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। চৌকায় বসিয়া খাই। আজকালের ইংরেজি-পড়া বাবু ভায়াদিগের মত নই।" আমীর বলিলেন,—"সে কি মহাশয় ! তবে আপনি মহাজনকন্যার ভূত ছাড়াইলেন কি করিয়া ?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"সে কথা তোমাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি। প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে আমার বড়ই মন্দ হইবে।" আমীর বলিলেন,—"আল্লার কসম্, আমার মুখ দিয়া এ কথা কখনই বাহির হইবে না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এই গ্রামে একটি তাঁতি বাস করে। তাঁতি তাঁত বুনিয়া খায়, কোন ল্যাঠাই ছিল না। একদিন কি মতি হইল, সে তাঁত বুনিতে বুনিতে একটু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিল। নিজের কানে সুরটি স্বরটি বড়ই সুমধুর বলিয়া লাগিল। পুনর্বার আস্তে আস্তে গাইয়া দেখিল, বড়ই মিষ্ট বটে ! তাঁতি মনে মনে ভাবিল, 'আমি একজন প্রকৃত গাইয়ে। এ গুণটি এতদিন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বৃথা নষ্ট হইতেছিল। জগতের দশাই এই, তা না হইলে হীরামণি মুক্তা উপরে চক্‌মক্ না করিয়া, মাটী কি জলের ভিতর কেন বৃথা পড়িয়া থাকিবে ? যাহা হউক, এখন হইতে গান গাইয়া আমি জগৎ মুগ্ধ করিব, মধুর তানে অবিরত জগতের কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দিব। আপাততঃ প্রতিবাসীদিগকে আমার গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।" এই বলিয়া তাঁতি ক্রমে গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। এক দিন যায়, দুই দিন যায়, গ্রামবাসীরা শশব্যস্ত। দুই চারি দিন পরে গ্রামের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রাণ লইয়া সকলের টানাটানি। সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গিয়া তাঁতির দ্বারে উপস্থিত। তাঁতিকে ডাকিয়া বলিল,—"বাপু হে ! পুরুষ-পুরুষানুক্রমে বহুদিন ধরিয়া আমরা এই গ্রামে বাস করিতেছি। তোমার গানের প্রভাবে আর আমরা এখানে তিষ্ঠিতে পারি না। বল ত ঘরদ্বার ছাড়িয়া উঠিয়া যাই, আর না হয় চুপ কর, গানে ক্ষান্ত দাও।" তাঁতি বলিল,—'না মহাশয় ! সে কি কথা ? গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবেন কেন ? সুরবোধ নাই বলিয়া যদি আমার গান আপনাদিগের কানে ভাল না লাগে, তাহা হইলে আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। আজ হইতে মাঠে বসিয়া আমি গান করিব। যাহার বোধাবোধ আছে, তিনি মাঠে গিয়া আমার গান শুনিবেন, আর পারিতোষিক-স্বরূপ একপণ করিয়া আমি তাঁহাকে কড়ি দিব।' এইরূপ আশ্বস্ত হইয়া গ্রামের লোকে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। তাঁতি গিয়া মাঠের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁত খাটাইল। সেখানে বসিয়া মনের সুখে গান করিতে লাগিল। তবে খেদের বিষয় এই, শুনিতে কেহ যায় না, জনপ্রাণী সেদিক মাড়ায় না। কাক পক্ষী সেদিকে ভুলিয়াও উড়িয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"ফকিরজী ! আমি বড়ই দরিদ্র ছিলাম। এ গ্রামের ভিতর আমার মত দীনদুঃখী আর কেহ ছিল না। গৃহিণী ও আমি যে কত উপবাস করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। নিজের যাহা হউক, ব্রাহ্মণীর শীর্ণ দেহ,

মলিন মুখ দেখিয়া সততই আমার প্রাণ কাঁদিত। কি করিব, কোনও উপায় ছিল না, মনের আগুন মনেই নিবাইতাম, চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইতাম। ব্রাহ্মণী একদিন আমাকে বলিলেন—'আজ ঘরে আটা নাই। তাঁতি বলিয়াছে, তাহার গান শুনিলে একপণ কড়ি দিবে। যাও না, একটুখানি কেন শুনিয়া এস না? এক পণ কড়ি পাইলে ঘরে অন্ন হইবে, দুইজনে খাইয়া বাঁচিব।' আমি বলিলাম—'দেখ ব্রাহ্মণী! ও কথাটি আমাকে বলিও না। শূলে যাইতে বল, তা যাইতে পারি, আগুনে পুড়িয়া মরিতে বলিলেও মরিতে পারি, কিন্তু তাঁতির গান আমাকে শুনিতে বলিও না, তিলেকের নিমিত্তও সে দণ্ডাগ্নি আমি সহ্য করিতে পারিব না।' এই কথা লইয়া ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার ক্রমে কিঞ্চিৎ বচসা হইল। ব্রাহ্মণী আমাকে ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন,—'যাও, একটুখানি তাঁতির গান শুনিয়া এক পণ কড়ি লইয়া আইস।' পথে বাহির হইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, কি করিব। তাঁতির গান কি করিয়া শুনি? অথচ কড়ি না লইয়া আসিলে ব্রাহ্মণী আর রক্ষা রাখিবেন না। তাঁতির গান শুনার চেয়ে মরা ভাল। এ ছার জীবনে আর কাজ নাই। গলায় দড়ি দিয়াই মরি। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, এক জনদের বাটী হইতে একগাছি দড়ি চাহিয়া লইলাম। এ মাঠে তাঁতি গান করিতেছে, অন্য দিকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, আর একটি মাঠে গিয়া আর একটি অশ্বত্থগাছে দড়িটি খাটাইলাম, ফাঁসটি ঠিক করিয়া লইলাম। গলায় দিই আর কি, এমন সময় সেই গাছের ভিতর হইতে একটি ভূত বাহির হইল। ভূত আমাকে বলিল,—'ওরে বামুন, তুই করিতেছিস্ কি?' আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট বর্ণন করিলাম। ভূত বলিল,—'আর ভাই! ও কথা বলিস্‌নে। যে গাছের তলায় এখন তাঁতি গান করিতেছে, যুগ যুগান্তর হইতে ঐ গাছে আমি বাস করিতেছিলাম। গাছটি আমার বড়ই প্রিয় ছিল। কিন্তু হইলে হইবে কি, যেদিন হইতে তাঁতি উহার তলায় গান আরম্ভ করিল সেই দিন হইতেই আমাকে ও-গাছ ও-মাঠ ছাড়িয়া পালাইতে হইল। দেখিতেছি, দুই জনেই আমরা এক বিপদে বিপন্ন। তা, তোর আর ভাবনা নাই, তুই বাড়ী ফিরিয়া যা। তোদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে আমি গিয়া পাইব। কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল তুই গিয়া যখন আমার কানে কানে বলিবি যে, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছি, তখনই আমি ছাড়িয়া দিব। মহাজনের অনেক টাকা আছে, আর সেই একমাত্র কন্যা। অনেক ধন-দৌলত দিয়া তোকে বিদায় করিবে, তোর দুঃখ ঘুচিবে।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"সেখজী! শুনিলে তো। আমি রোজা নই, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। দৈবক্রমে আমার একটি ভূতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমার এই যা কিছু বল। মহাজনের কন্যার ভূত ছাড়িলে চারিদিকে আমার নাম বাহির হইল যে, আমার মত রোজা আর পৃথিবীতে নাই। ভূতে পাইলে সকলে আমাকে লইয়া যায়। আমাকে আর কিছু করিতে হয় না, কেবল আমি রোগীর কানে কানে গিয়া বলি,—"শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে তো যাও, না হইলে এখানে তাঁতির গান দিব। তাঁতির নামে সকল ভূতই জড়সড়, পলাইতে পথ পায় না।"

চতুর্থ অধ্যায় : উদ্‌যোগ

আমীর বলিলেন,—"মহাশয়! তাহাই যদি সত্য, তবে চলুন না কেন? আপনার সেই ভূতটিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া দেন? কারণ, ভূতে ভূতে অবশ্যই আলাপ পরিচয়

আছে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে, শাদি-বিয়াতে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। আমার স্ত্রীকে যে ভূতে লইয়া গিয়াছে, তাহাকে যদি তিনি দুটো কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার অনেক উপকার হইতে পারে। না হয়, স্ত্রীকে কি করিয়া পাই, তাহার একটা না একটা উপায়ও তিনি বলিয়া দিতে পারেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এ পরামর্শ মন্দ নয়, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি, আচ্ছা চল যাই, দেখি কি হয়।" ব্রাহ্মণ দুর্গা বলিয়া, আমীর বিস্মিল্লা বলিয়া, যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা যে মাঠে ভূত থাকে, সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে গাছে ভূত থাকে, সেই গাছতলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া গাছের দিকে চাহিয়া ঊর্ধ্বমুখে দুইজনে স্তুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"হে ভূত! আশ্রিত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার দরিদ্রতা মোচন হইয়াছে। পৃথিবীতে যত ভূত আছে, সকল ভূতের তুমি শ্রেষ্ঠ। ভূতের তুমি রাজা। কৃপা করিয়া দেখা দাও, আর একবার আবির্ভাব হও।" মুসলমান বলিল,"ভূত সাহেব! হুজুরের নাম শুনিয়া কদম-বোসী করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। হুজুরের এই গাছতলায় কাঁচা পাকা গাঁসন্নি চড়াইব।" এই প্রকারে নানারূপ স্তব করিতে করিতে গাছটি দুলিতে লাগিল, গাছটির উপর যেন এক প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল, ডালপালা সমুদয় মড় মড় করিতে লাগিল। তার পর গাছের ডগায়, এক স্থানে সহসা অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। দিন দুইপ্রহরে, চারিদিকে সূর্যের কিরণ, আর সকল স্থানেই আলো, কেবল সেই স্থানটুকুতেই অন্ধকার। ক্রমে সেই অন্ধকাররাশি জমিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এক ভীষণ প্রকাণ্ড নরমূর্তিতে পরিণত হইল। নরমূর্তি ধরিয়া ভূত গাছ হইতে নামিয়া আসিল, বৃক্ষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এখানে এখন একটি নূতন কথা উঠিল! বিজ্ঞান-বেত্তারা বিশেষতঃ ভূত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয়টি অনুধাবনা করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবেরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তার পর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব সস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। সস্তা হইলে গরীব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।

গাছের পাশে দাঁড়াইয়া, কিছু রাগত ভাবে ভূত বলিল,—"বামুন! আজ আবার কেন আসিয়াছিস? তোর মত বিট্‌লে বামুন আমার অবধ্য নয়। ইচ্ছা হইলে এখনি তোর ঘাড় মুচড়াইয়া দিতে পারি। আমার অবধ্য, সেই ইংরেজী-পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি! ভয় করি, পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে টলিয়া পড়েন, কি বমন করিয়া দেন। ভক্তি করি, কেন না, এটা সেটা খাইয়া তাঁহাদের মনের কোঁচকা ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়, এই মর্ত্যলোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন. অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলেপির পাক-বিশিষ্ট নয়।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু। আমি নিজের জন্য আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসি নাই। আপনার প্রসাদে

আমার আর কিছুরই অভাব নাই। এই লোকটি নিদারুণ সন্তাপিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্তই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।"

এই কথায় ভূতের রাগ কিছু পড়িয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"সঙ্গে তোমার ও লোকটি কে?" ব্রাহ্মণ তখন আমীরের সকল কথাই ভূতকে শুনাইলেন। শুনাইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনাকে ইহার একটা উপায় করিতে হইবে, না করিলে এ লোকটি প্রাণে মরিবে। আপনি দয়ার্দ্রচিত্ত, আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহারও প্রাণ রক্ষা করুন।" ভূত বলিল,—"ইহার স্ত্রীকে নিশ্চয় লুল্লু লইয়া গিয়াছে। লুল্লু সবে নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে, ভূতগিরিতে তাহার নব অনুরাগ, সে বড়ই দুরন্ত।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে? মহাশয়! সে কি প্রকার কথা?" ভূত হাঁসিয়া বলিল,—"এ কথা তোমারা কিছুই জান না। লোকে বলে, অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ঠিক সেটি সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া নিজের ভূত হয় না। মানুষ মরিলে আমরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছি। কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূতগিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বা বেকার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্তা, তিনিই ভূতদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ভূতকে তিনি বলেন,—'যাও অমুক মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, সে মরিলে তাহার ভূত হইও, তাহার ভূতগিরি তোমাকে দিলাম।' সেই দিন হইতে ভূতটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মানুষের মাথাটি ধরিলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না; কেন না, মরিলেই তাহার ভূতগিরি করিতে পাইবে। এরূপ যে ঘটনা হয়, সে কেবল তোমাদের নিজ দোষে। দেশীয় সংবাদপত্র সকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মনশ্চিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এ দুর্দশা হইত না। এই দেখ, দেশ একেবারে নির্দ্ধন হইয়া যাইতেছে, বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়েরা ধন লুটিতেছে! ভাল, কাপড় না পরিলেই ত হয়? যদি কাপড় না পর, তাহা হইলে ত আর তোমাদিগের ধন কেহ লুটিতে পারে না। রেল করিয়া বিদেশীয়েরা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলে না চড়িলেই ত হয়, পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী-বৃন্দাবন যাও না? তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনই আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে। সেইরূপ আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি। আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করিবার উমেদারিতে থাকি। ভাল, তোমরা যদি মরা ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তো কেহ তোমাদের ভূতগিরি করিতে আসে না? তাই বলি, না মরিলেই ত সকল কথা ফুরাইয়া যায়। নিজে তোমরা মরিবে, আর যত দোষ আমাদের? অপরাধের মধ্যে এই যে, মরিলে আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি।

"যাহা হউক, লুল্লু বহুদিন হইল, ভূতগিরি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার কপালে ভাল ভূতগিরি কোথাও জুটে নাই। অবশেষে কর্তা তাহাকে দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরির উমেদারীতে নিযুক্ত করেন। দুখিরাম যদিও বৃদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহার শক্তি-সামর্থ্য বিলক্ষণ ছিল। কিছুতেই মরিতে চায় না। বৃদ্ধের কুব্যবহারে লুল্লু বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। আজ অল্পদিন হইল, দুখিরামের মৃত্যু হইয়াছে, লুল্লু তাহার ভূতগিরি পাইয়াছে। লুল্লু একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে যে এতদিন পরে এখন মনের সাধে ভূতগিরি করিতেছে, তোমাদের মুখে এ কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"সে কি কথা মহাশয়? দুরাচার লুল্লুর কার্য্যে আপনি

সন্তুষ্ট! আমরা যে, আপনার নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিতে আসিয়াছি। ইহার স্ত্রীকে আপনি উদ্ধার করিয়া দিবেন, সেই প্রার্থনায় যে, আপনার কাছে আসিয়াছি!" এইরূপ অনেক বাদানুবাদের পর ভূত বলিল,—"দেখ, আমি এক্ষণে বৈরাগ্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, সংসারের বাদবিসংবাদ, ভালমন্দ কিছুতেই থাকি না। আমি জানি না লুল্লু এখন ইহার স্ত্রীকে কোথায় রাখিয়াছে। অন্বেষণ করি, এরূপ অবকাশ আমার নাই। তোমরা এক কাজ কর; এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মাঠের মাঝখানে একটি পুরাতন কূপ আছে, সে কূপে এখন জল নাই। তাহার ভিতর ঘ্যাঁঘোঁ বলিয়া একটি ভূত বাস করে। ঘ্যাঁঘোঁ সকল সংবাদ রাখিয়া থাকে। ভূতদিগের মধ্যে সে একরূপ গেজেট। তোমরা তাহার নিকট যাও, সে সকল সন্ধান বলিয়া দিবে। তবে কথা এই, আজ কিছুদিন হইল, ঘ্যাঁঘোঁ মনোদুঃখে জর-জর হইয়াছে। মনের খেদে বিরলে সে কূপের ভিতর বসিয়া আছে। কথা কহে না, ডাকিলে উত্তর দেয় না, তাহার দেখা পাওয়া ভার। চেষ্টা করিয়া দেখ।"

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ঘ্যাঁঘোঁ

ব্রাহ্মণ এবং আমীর; আর করেন কি? দুই জনে ঘ্যাঁঘোঁর অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কূপের ধারে গিয়া ঘ্যাঁঘোঁকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ডাকিলেন,—"ঘ্যাঁঘোঁ মহারাজ! ঘ্যাঁঘোঁ বাবু! ঘরে আছেন?" মুসলমান ডাকিলেন,—"ঘ্যাঁঘোঁ সাহেব! বাড়ী আছেন?" ডাকিয়া ডাকিয়া দুই জনেরই গলা ভাঙিয়া গেল, তবুও ঘ্যাঁঘোঁ কূপ হইতে বাহির হইল না, উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। দুই জনে তখন ভাবিলেন, এ ত বড়ই বিপদ! এর আবার উপায় কি করা যায়। ব্রাহ্মণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"চল, আমরা তাঁতির কাছে যাই।" বিরস-বদনে দুই জনে ফিরিলেন। পুনরায় গ্রামে আসিয়া দুই জনে তাঁতির নিকট যাইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁতিকে বলিলেন, "ভায়া! তোমাকে একটি উপকার করিতে হইবে। ঘ্যাঁঘোঁ নামে একটি ভূত আছে। সে আমার পরম বন্ধু। তাহার কানের ভিতর অতিশয় পোকা হইয়াছে, সে পোকা কিছুতেই বাহির হইতেছে না। দারুণ ক্লেশে ঘ্যাঁঘোঁ এখন একটি কূপের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। ডাকিলে উত্তর দেয় না, বাহিরেও আসে না। মনুষ্যের কানে পোকা হইলে অনেক কালোয়াতের গানে বাহির হইতে পারে, কিন্তু ভূতের কানের পোকা তোমার গান ভিন্ন কিছুতেই বাহির হইবে না। অতএব যদি তুমি একবার সেই কূপের ধারে বসিয়া একটু গান কর, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।" এ পর্য্যন্ত ইচ্ছাসত্ত্বে কেহ তাঁতির গান শুনে নাই। আজ তাহাকে গান গাওয়াইবার জন্য লোকে উৎসুক। এ অহঙ্কার রাখিবার কি আর স্থান আছে? আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁতি বলিল,—"আমি এইক্ষণেই যাইতেছি। কাপড় পরিয়া আসি।" তাঁতি কাপড় পরিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইল। তিন জনে পুনরায় সেই কূপাভিমুখে চলিলেন। কূপের ধারে পেঁাছিয়া, তাঁতি আসন করিয়া গান আরম্ভ করিলেন; ব্রাহ্মণ ও আমীর কানে অঙ্গুলি দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তাঁতির গান কূপের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, তখন ঘ্যাঁঘোঁ ভাবিল,—"মনের খেদে জর-জর হইয়া বিরলে কূপের ভিতর বসিয়া আছি, এখানে আজ আবার

এ কি ভীষণ ব্যাপার! সে কালে কবির চিতেন শুনিয়াও প্রাণ ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতেও প্রাণ বাহির হয় নাই; আজ যে দেখিতেছি, মহাপ্রাণী ধড়ফড় করিয়া বাহির হয়।" ঘ্যাঁঘোঁ তবুও কিন্তু সহজে কূপ হইতে বাহির হয় নাই। যখন দেখিল, তাঁতির গানে নিতান্তই প্রাণ বাহির হইয়া যায়, তখন করে কি? কাজেই বাহির হইতে হইল। হামাগুড়ি দিয়া কূপ হইতে বাহির হইল। ঘ্যাঁঘোঁ বেঁটে-খেঁটে, হাড়-ওটা বুড়ো-সুড়ো ভূত। মনের খেদে দেহ তার এতই জর জর হইয়াছিল যে, তাহার চক্ষু, মুখ, নাসিকা হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

কূপ হইতে বাহির হইয়া ভূত একদিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ ও আমীর আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন,—"ঘ্যাঁঘোঁ, তুমি পলাইও না, তোমার ভয় নাই, ঐ দেখ তাঁতি ভায়া চুপ করিয়াছে। আর পলাইবে বা কোথা? যেখানে যাইবে, সেইখানে গিয়া তাঁতি ভায়া গান জুড়িয়া দিবেন। তার চেয়ে, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্য উত্তর দাও, আমরা তাঁতি ভায়াকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই।" ঘ্যাঁঘোঁ ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিল, আমীরের মুখপানে চাহিল, তাঁতির মুখপানে চাহিল। দেখিল, গলা পরিষ্কার করিয়া তাঁতি আর একটি গান আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহা দেখিয়াই ঘ্যাঁঘোঁর আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া যাইল। সে বলিল,—"আচ্ছা কি বলিবে বল, কি জিজ্ঞাসা করিবে?" ব্রাহ্মণ বলিল,—"লক্ষ্মী নামক তোমাদের যে ভূত আছে, সে এই আমীরের স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে, তুমি বলিতে পার? আর কি করিয়াই বা তাহার উদ্ধার হয়?" ঘ্যাঁঘোঁ বলিল,—"অনেক দিন ধরিয়া, ঘোর দুঃখে জর-জর হইয়া আমি এই কূপের ভিতর বসিয়া আছি। সংসারের সংবাদ বড় কিছু রাখি নাই। তবে তাঁতির গান যদি আর না শুনাও, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"অনুসন্ধান করিতে যাই বলিয়া তুমি পলাইয়া যাইবে, শেষে আর তোমার দেখা পাইব না। আমরা তেমন বোকা নই যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" ঘ্যাঁঘোঁ উত্তর করিলেন,—"পলাইয়া আর কোথায় যাইব? যেখানে যাইব, সেইখানে গিয়া তোমরা তাঁতির গান জুড়িয়া দিবে। তা ছাড়া আমীরের স্ত্রী কোথায়, অনুসন্ধান না করিয়াই বা আমি কি করিয়া বলি?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"সত্য কর যে, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে?" ঘ্যাঁঘোঁ বলিল,—"আমি সত্য বলিতেছি, শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে যাও, শীঘ্র আসিও, আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম।" ঘ্যাঁঘোঁ বলিলেন—"রও, আমি আমার বড় নাগরা জুতা যোড়াটি পায়ে দিয়া আসি। সে জুতাটি পায়ে দিলে আমি বাতাসের উপর উত্তম চলিতে পারি। মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় ভারতভূমি ভ্রমণ করিতে পারি।" এই বলিয়া ঘ্যাঁঘোঁ পুনরায় কূপের ভিতর যাইল, নাগরা জুতা পায়ে দিয়া বাহিরে আসিল, বাতাসের উপর উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল; শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, আমীর ও তাঁতি সেইখানে বসিয়া রহিলেন। ঘ্যাঁঘোঁ ফিরিয়া আসে কি না, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই একদৃষ্টে আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন। "কখন্ আসে কখন্ আসে" এই কথা সকলেই মনে মনে করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমীর বলিয়া উঠিলেন—"ঐ আসিতেছে, ঐ যেন উত্তর দিকে কালো দাগটির মত কি দেখা যাইতেছে।" নিকটবর্তী হইলে সকলেই বলিয়া উঠিলেন—"ঘ্যাঁঘোঁ বটে, নাগরা জুতা পরিয়া ঘ্যাঁঘোঁ আসিতেছে।" ঘ্যাঁঘোঁ নিকটে আসিলে সকলেই তাহার মহা সমাদর করিলেন। সকলেই বলিলেন,—"ঘ্যাঁঘোঁ! তুমি সত্যবাদী বট! মনোদুঃখে

জর-জর হইয়াও তুমি আপনার সত্য রক্ষা করিয়াছ। এখন বল, সংবাদ মঙ্গল তো?" ঘ্যাঁঘোঁ বলিল,—"সু-সমাচার বটে, আমীরের স্ত্রীর আমি সন্ধান পাইয়াছি।" সকলে বলিলেন,—"তবে শীঘ্র বল, আমীরের স্ত্রী এক্ষণে কোথায়? সে ভাল আছে তো?"

ঘ্যাঁঘোঁ বলিল,—"হিমালয়-প্রদেশে ভীমতাল নামক একটি হ্রদ আছে। হ্রদের ভিতর পাহাড়ের গায় লুল্লুদ্ একটি ঘর খুদিয়াছে। জলে ডুব দিয়া তবে সে ঘরের ভিতর যাইতে পারা যায়, অন্য পথ নাই। তাহার ভিতর লুল্লুদ্ আমীরের স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই "সে" বিহনে অশোকবনে সীতা যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন, সেই ঘরের ভিতর একাকিনী বসিয়া আমীরের রমণীও সেইরূপ কাঁদিতেছেন। কেন যে কাঁদিতেছেন, তা বলিতে পারি না। লুল্লুদ্ আমাদের একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে লইয়া গিয়াছে, তার আবার কান্না কি? লুল্লুদ্ তাহাকে এক বৎসরকাল সময় দিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে যদি শান্ত হইয়া তাহাকে নিকা না করে, তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কথা এই, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, হ্রদের ভিতর প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া লুল্লুদ্‌র ঘরের ভিতরে যায়। আমরা ভূত হইয়া ভূতের বিপক্ষতা করিতে পারি না; তাহা হইলে ভূতসমাজে আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। তবে এইমাত্র বলিয়া দিতে পারি যে, যদি তোমরা একটি হৃষ্টপুষ্ট ভূত ধরিয়া তাহার তেল বাহির করিতে পার, আর যদি সেই তেল মাখিয়া জলে প্রবেশ কর, তাহা হইলে লুল্লুদ্‌র ঘরে পৌঁছিতে পারিবে। তারপর কৌশল করিয়া আমীরের স্ত্রীকে উদ্ধার করিও। তা বলিয়া যেন আমাকে ধরিয়া তেল বাহির করিও না। মনের খেদে তো জর-জর আছিই, তার উপর আবার তাঁতির গান শুনিয়া আমার শরীরে আর শরীর নাই, এক বিন্দুও তেল বাহির হইবে না। তবে এক কাজ কর, এই মাঠের প্রান্তভাগে একটি গাছ আছে। সেই গাছে গোঁগাঁ নামে একটি গলায়-দড়ি ভূত বাস করে। নিকটে গ্রামের লোককে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে সে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। যে কেহ তাহার প্রলোভনে পতিত হয়, সে এই গাছে আসিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরে। শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হইবে বলিয়া, এই ভূত তখন তাহাদের পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে। তোমরা যদি এই ভূতটিকে ধরিয়া তেল বাহির কর, তাহা হইলে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করি। কারণ, সে দুরাচার আমার পরম শত্রু। আমার যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সে গিয়া ভাংচী দিয়া আসে। প্রেতিনী, শংখচূর্ণী, চুড়েল প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতিনীদিগের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। দুই এক স্থানে কন্যাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কন্যা দেখিয়া মনও মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু এই দুরাচার গিয়া কন্যার পিতামাতার কাছে আমার নানারূপ কুৎসা করে। সে জন্য—দুঃখের কথা বলিব কি! ভূতগিরি করিতে করিতে বুড়া হইয়া যাইলাম, আজ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই। সংসারে আমি আধখানা হইয়া আছি, পুরা ঘ্যাঁঘোঁ হইতে পারিলাম না। আর কত লোক দশটা কুড়িটা বিবাহ করিয়া ষোল আনার চেয়ে বেশী হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, মনুষ্যের দ্বারা ভূত ধরা কিছু সহজ কথা নয়। সে কালের মত এখন আর রোজা নাই যে, ভূত ধরিয়া পাল্কি বেহারা করিবে, কি গাড়ীতে যুতিয়া দিবে। কৌশল করিয়া ধরিও।

"বিবাহের কথা মনে করিয়া আমার প্রাণ এখন বড়ই হু হু করিতেছে। একটি পরমরূপবতী ভূতিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল। তাহার রূপের কথা আর বলিব কি? তাহার নাকটি দেখিয়াই আমার মন একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। ও হো নাকেশ্বরি! তোমাকে না দেখিয়া প্রাণ যে আর ধরিতে পারি না! একবার তোমার ছবিখানি দেখিয়া প্রাণ শান্ত করি। আমিও দেখি, তোমরাও দেখ, দেখিয়া চক্ষু জুড়াও।"

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভূতের তেল

নাকেশ্বরীর ছবি দেখিয়া ঘ্যাঁঘোঁর প্রাণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; সে একে একে সকলের করমর্দন করিয়া প্রস্থান করিল। তখন আমীর,—ব্রাহ্মণ ও তাঁতিকে বলিলেন,—"আপনাদিগকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। ঘর-সংসার ছাড়িয়া আপনারা আমার সঙ্গে ঘুরিতেছেন। আর আপনাদিগকে আমি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা বাটী ফিরিয়া যান, আমার কপালে যাহা আছে, তাহা হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও তাঁতি কিছুতেই আমীরকে একলা ফেলিয়া যাইতে চাহিলেন না। আমীরের অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, বিরস বদনে দুইজনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহারা চলিয়া গেলে ঘ্যাঁঘোঁর কূপের ধারে বসিয়া আমীর অনেকক্ষণ কাঁদিতে লাগিলেন। তার পর মনকে প্রবোধ দিয়া ভাবিলেন,—"কাঁদিলে কি হইবে? এখন ভূত ধরিবার উপায় চিন্তা করি, তবে ত স্ত্রীর উদ্ধার হইবে।" অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমীর মাথা হইতে পাগড়ীটি খুলিলেন। পাগড়ীটি উত্তমরূপে পাকাইলেন, আর তাহার এক পাশে একটি ফাঁস করিলেন। এইরূপ সুসজ্জ হইয়া, যে আমগাছে গোঁগাঁ নামক গলায়-দড়ি ভূত থাকে, সেই দিকে চলিলেন। গাছের নিকট উপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উঠিয়া গাছের ডালে পাগড়ীর অপর পার্শ্ব বাঁধিয়া ফাঁসটি গলায় দিতে উদ্যত হইলেন। ফাঁসটি গলায় দেন আর কি, এমন সময় চাহিয়া দেখেন যে, সেই গলায়-দড়ি ভূত সহাস্যবদনে তাঁহার সম্মুখে আর একটি ডালে বসিয়া রহিয়াছে।

ভূত বলিল,—"নে নে, শীঘ্র শীঘ্র গলায় ফাঁস্ পরিয়া ঝুলিয়া পড়, নীচে হইতে আমিও সেই সময় তোর পা ধরিয়া টানিব এখন, তা হইলে সত্বর তোর মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে আমার বেকার নাতিজামাই তোর ভূতগিরি করিতে পাইবে।" আমীর কোনও কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে জেব হইতে আফিমের কৌটাটি বাহির করিলেন। কৌটাটির ঢাকন ভূতের সম্মুখে ধরিলেন। ভূত তাহাতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওর ভিতর ও—কে?" আমীর বলিলেন,—"একটি ভূত।" গোঁগাঁ বলিল,—"ভূত! কৈ, ভাল করিয়া দেখি।" খুব ভাল করিয়া দেখিয়া গোঁগাঁর নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, ভূত বটে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"উহার ভিতর তুই ভূত ধরিয়া রাখিয়াছিস কেন?" আমীর বলিলেন,—"আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী-সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।" গোঁগাঁ বলিল,—"আমি যে লেখাপড়া জানি না।" আমীর বলিলেন,—"পাগল আর কি! লেখাপড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস ত?" গোঁগাঁ বলিল,—"ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।" আমীর বলিলেন,—"তবে আর কি! আবার চাই কি? এত দিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্য্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।" ভূত বলিল,—"তবে কি তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে না? ঐ যে পাগড়ী? ঐ যে ফাঁস?" আমীর বলিলেন,—"আমি ত আর ক্ষেপি নি যে, গলায় দড়ি দিয়া মরিব। পাগড়ী আর ফাঁস হইতেছে টোপ, ওরে বেটা! তোরে ধরিবার জন্য টোপ। যদি এ ফন্দি না করিতাম, তাহা হইলে তুই কি গাছের ভিতর হইতে বাহির হইতিস্? এখন চল্, ইহার ভিতর প্রবেশ কর্।" এই বলিয়া আমীর

তাহাকে চণ্ডুর নলটি দেখাইলেন। ভূত জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি?" আমীর বলিলেন, "ইহার নাম বাম্বু, নে, শীঘ্র ইহার ভিতর প্রবেশ কর্।" ভূত ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া আমীর টেকোটি বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখিতেছিস্?" ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—"ও আবার কি?" আমীর বলিলেন,—"এর নাম আটখিল্লে; সাধু ভাষায় ইহাকে থক্ বলে। নলের ভিতর যদি না প্রবেশ করিস্, তাহা হইলে ইহা দিয়া তোর চক্ষু উপাড়িয়া লইব।" বাস্তবিক থক্‌টি তখন যেরূপ চক্ চক্ করিতে লাগিল, তা বোধ হইল যেন সে আজন্মকাল ভূতের চক্ষু তুলিয়া আসিতেছে, যেন ভূতের চক্ষু না তুলিয়া থক্ কখনও জলগ্রহণ করে না। আর যেন অমীর যদি নাও উপড়ান্ তো থক্ নিজে গিয়া সেই মুহূর্তে ভূতের চক্ষু তুলিয়া ফেলিবে। টেকোর এই প্রকট মূর্তি দেখিয়া ভূত বড়ই ভয় পাইল, ভয়ে তাহার সর্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে করিল,—"কাজ নাই বাপু! পরের চাকর হইয়া, এডিটারি করিয়া না হয় খাইব, তা বলিয়া অন্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া সে আপনার কলেবর হ্রাস করিল, আর সুড়সুড় করিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করিল। নলের ছিদ্রে ভাল করিয়া সোলা আঁটিয়া দিয়া, আমীর গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আমীরের মনে এখন কিঞ্চিৎ স্ফূর্তির উদয় হইল। শিস্ দিতে দিতে তিনি গ্রামাভিমুখে চলিলেন, গ্রামে উপস্থিত হইয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের এ গ্রামে কলুর বাড়ী আছে?" লোকে বলিল,—"হাঁ আছে।" কলুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমীর কলুকে বলিলেন,—"কলু ভায়া! আমার একটি বিশেষ উপকার করিতে হইবে। এই বাঁশের নলটির ভিতর আমি একটি ভূত ধরিয়া আনিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই ভূতটিকে ঘানিতে মাড়িয়া তেল বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়।" কলু বলিল,—"তার আটক কি! এখনই দিব। তিল, সরিষা, তিসি, পোস্ত, কত কি পিশিয়া তেল বাহির করিলাম, আজ একটু ভূতের তেল বাহির করিয়া দিব, সে আর কি বড় কথা! কৈ, লইয়া এস।" দুই জনে ঘানিগাছের কাছে গেলেন। আমীর নল হইতে ভূতটিকে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কলু তৎক্ষণাৎ ঘানি চালাইয়া দিলেন। কলুর বলদ মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরিতে লাগিল ভূতের হাড় মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল! ভূত,—"ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল,—"এই বুঝি তোমার এডিটারির পদ? এই বুঝি খবরের কাগজের সম্পাদকতা করা?" আমীর হাসিয়া বলিলেন,—"জান না ভায়া! সম্পাদক হইতে আমি এইরূপেই প্রবন্ধ বাহির করিয়া থাকি। কেমন! উত্তম উত্তম গালি, ভাল ভাল প্রবন্ধ, এখন মনে উদয় হইতেছে ত? গোঁগাঁ ভায়া! সেকালের হরিণের গল্পটাও কি ছাই শুন নাই? যাহাতে কথা আছে,—"ওহে ভাই শশধর! আগে এ দায়ে ত তর, তার পর কাজ কাম কর আর না কর।" ঘানি হইতে ক্রমে টপ্ টপ্ করিয়া তেল পড়িতে লাগিল। প্রায় এক শিশি তেল প্রস্তুত হইল। যখন ভূতের দেহ একেবারে তেলশূন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না। আমীর সেই ছোবড়ারূপে ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোন্‌কালে মরিয়া যাইত।

সপ্তম অধ্যায় : উদ্দেশ

তেলের শিশিটি পকেটে লইয়া আমীর পুনরায় চলিলেন। যাইতে যাইতে কত পথ চলিয়া অবশেষে হিমালয়ের তলভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের উপর উঠিয়া কত চড়াই উতরাইয়ের পর ভীমতাল দেখিতে পাইলেন। ভীমতালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘ্যাঁঘোঁ যেরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্থানটিতে গিয়া বসিলেন। জানিলেন, এই স্থানটিতে ডুব মারিতে হইবে, ইহার নীচেতেই লুল্লুর ঘর। সেই স্থানে বসিয়া, শিশিটি বাহির করিয়া উত্তমরূপে সর্বশরীরে ভূতের তেল মর্দন করিলেন। তেল মাখিয়া তাঁহার শরীরে যে কেবল আসুরিক বল হইল তাহা নহে, দেহ এত লঘু হইল, যেন তিনি পাখীর মত উড়িতে পারেন। তেল মাখা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর "বিসমিল্লা" বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলে ডুব মারিয়া ক্রমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। পাতাল পর্য্যন্ত তত দূর যাইতে হয় নাই, কিন্তু অনেক, অনেক দূর গিয়া পাহাড়ের গায়ে একটি ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করিতেই একেবারে শুষ্ক ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। সেখানে আলোর অভাব ছিল না। উত্তম দিনের আলো ছিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাসস্থানের মত পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গর্ত দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কি মনুষ্য, কি ভূত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—"এখনও দিন রহিয়াছে, এত প্রকাশ্যভাবে এখানে বিচরণ করা ভাল নয়। রাত্রি হইলে সকল সন্ধান লইব।" এই মনে করিয়া একটি ছোট গর্তে লুকাইয়া রহিলেন।

জলে ডুব দিয়া যে শুষ্ক ঘরের ভিতর প্রবেশ করা যায়, এ কথা শুনিয়া কেহ যেন অবাক্ হইবেন না। লোকে পাছে ভাবেন যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা অলীক গল্পকথা, সেজন্য আমাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে হইল। আকবরের সময় একজন মিস্ত্রি লাহোরে এরূপ একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছিল যে, নিকটস্থ একটি জলাশয়ের জলে ডুব না দিয়া সে ঘরে যাইবার আর অন্য পথ ছিল না। আগ্রাতে জাহাঙ্গীর বাদশাহও এরূপ একটি ঘর দেখিয়াছিলেন। ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীর নামক পুস্তকে জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন,—"আমার পিতার সময় লাহোর নগরে যেরূপ একটি জল-গৃহ নির্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ একটি জল-গৃহ দেখিতে রবিবার দিন হাকিম আলির বাটীতে গিয়াছিলাম। আমার সহিত কতকগুলি পারিষদও ছিল. যাহারা এরূপ গৃহ কখনও দেখে নাই। জলাশয়টি দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় ছয় গজ, ইহার পাশে একটি কামরা, যাহাতে উত্তমরূপ আলো ছিল, এবং যাহার ভিতর যাইতে হইলে এই জলের ভিতর দিয়া ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কামরায় এক বিন্দুও জল প্রবেশ করিতে পারে না। কামরায় দশ-বার জন লোক বসিতে পারে। ইহার ভিতর হাকিম আমাকে টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলেন। কামরা দেখিয়া আমি বাটী ফিরিয়া আসিলাম। হাকিমকে পুরস্কার স্বরূপ দুহাজারীর পদে নিযুক্ত করিলাম।" এক্ষণে ইতিহাস দ্বারাও গল্পটি সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত বিষয় আছে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়।

আমীর পাহাড়ের গর্তে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, যখন কতক রাত্রি গত হইয়া গেল, তখন সেই গিরিগহ্বরে সহসা তুমুল ঝড় উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জলের ভিতরও ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। আমীর কান পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন জল ফুঁড়িয়া উপর যাইতেছে। ভাবিলেন,—"রাত্রি হইয়াছে, এইবার ভূত বুঝি চরিতে যাইতেছে।" যখন পুনরায় সে স্থান নিঃশব্দ হইল, তখন আমীর আস্তে আস্তে গর্ত হইতে বাহির হইলেন। অতি সাবধানে, এ ঘর সে ঘর, অর্থাৎ

কি না এ গর্ত সে গর্ত খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে অতি দূরে একটি সামান্য আলো তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। সেই দিক্ পানে গিয়া দেখিলেন, অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের কাছে গালে হাত দিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, এক মলিন-বস্ত্রা বিরস-বদনা ললনা বসিয়া রহিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমীর চিনিতে পারিলেন যে, এই রমণী তাঁহারই স্ত্রী। স্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। এমনি হৃদয়ের আবেগ উপস্থিত হইল যে, মনে করিলেন, এখনি দৌড়িয়া গিয়া ধরি, আর বলি,—"প্রিয়তমে! জানি! আর ভয় নাই, আমি আসিয়াছি, আমি তোমার আমীর আসিয়াছি।" কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিলেন, মনে করিলেন,—"ভয় নাই কিসে? এখনও ত আমরা ভূতের হাতে! এখনও ত স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারি নাই! স্ত্রীর দেখিতেছি, শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ। বোধ হয়, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। একেবারে দেখা দেওয়া হইবে না। আমি যে এখানে আসিয়াছি, ক্রমে জানিতে দিব।" এই ভাবিয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমীর একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমীর-রমণী কাঁদিতেছিলেন। অবিরল ধারায় অশ্রুস্রোত তাঁহার নয়নযুগল হইতে বহিতেছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন, এক একবার চক্ষু মুছিতেছিলেন, কখনও কখনও অপরিস্ফুট ভাষায় খেদোক্তিও করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন,—"হায়! আমার দশা কি হইল! শয়তানের হাতে পড়িয়া আমার জাতিকুল সকলি মজিতে বসিল। ধর্ম বিনা স্ত্রীলোকের আর পৃথিবীতে আছে কি? ভূতই হউক আর শয়তানই হউক, এ ধর্ম আমি তাহাকে কখনই বিনাশ করিতে দিব না। সে দুর্বৃত্ত অঙ্গীকার করিয়াছে, এক বৎসরকাল আমাকে কিছু বলিবে না। এই এক বৎসরের মধ্যে দুর্বলের বল, নিঃসহায়ের সহায়, ঈশ্বর কি আমায় পাপিষ্ঠের হাত হইতে মুক্ত করিবেন না? আমীর! আমীর!! একবার আসিয়া দেখ, আমার কি দশা হইয়াছে।" আমীর আস্তে আস্তে বলিলেন,—"ভয় নাই, ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, আমি আসিয়াছি।" আমীর রমণী চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। চক্ষুদ্বয় তখন জলে প্লাবিত ছিল কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, মনের ভ্রান্তি বশতই তিনি এরূপ শব্দ শুনিলেন। তবুও মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সহসা চক্ষু মুছিতে সাহস করিতেছিলেন না; পাছে সত্য সত্যই ভ্রান্তি হইয়া পড়ে, পাছে সে আশা কণাটুকুও উড়িয়া যায়। আমীর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, বলিলেন,—"চাহিয়া দেখ! সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি। ভয় নাই, ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই এ ঘোর বিপদ হইতে আমরা মুক্ত হইব।" এই বলিয়া একেবারে স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন. স্ত্রীও তাঁহার গলা ধরিলেন। এইভাবে বসিয়া দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর আমীর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"আর কাঁদিও না। এখন এখানকার সকল কথা আমাকে বল। প্রথম আমাকে বল, ভূত তোমাকে কি করিয়া ধরিয়া আনিল।" আমীর-রমণী বলিলেন,—"তাহার আমি কিছুই জানি না। ঘরের ভিতর হইতে যেই বাহিরে আসিয়া পা দিলাম, তুমি কি ভিতর হইতে বলিলে, শুনিতে পাইলাম। তার পর যেন একটা ঝড় আসিয়া আমাকে একেবারে ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল, একেবারে উড়াইয়া লইয়া চলিল। আমি অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, বলিতে পারি না। যখন প্রভাত হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখি, দিন হইয়াছে, সম্মুখে এক বিকট-মূর্তি বিষমদেহ নরাকার রাক্ষস। তাহাকে দেখিয়া পুনর্বার অজ্ঞান হইয়া যাইলাম। তার পর পুনরায় যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, রাত্রি হইয়াছে, ঘরে

আর কেহ নাই, একেলা পড়িয়া আছি। এই প্রদীপটি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, নানারূপ আহারীয় দ্রব্য ঘরে রহিয়াছে। আমি কিন্তু কিছুই খাইলাম না। মনে করিলাম, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। তাহার পরদিবস প্রাতঃকালে সেই বিকট-মূর্ত্তি আবার আমার কাছে আসিল। এবার আমি তাহাকে দেখিয়া অজ্ঞান হই নাই। বড়ই ভয় হইয়াছিল সত্য, অজ্ঞান হইবার উপক্রমও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সাহস করিয়া বুক বাঁধিলাম। মনে করিলাম, শুনিতে হইবে সে কে, আর কেনই বা আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে? সেই বিকটমূর্ত্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"সুন্দরি! এক্ষণে আর তুমি আমীরের রমণী নও, এক্ষণে তুমি আমার গৃহিণী। তোমার স্বামী নিজে তোমায় আমাকে দান করিয়াছে। এখন আমার এই সমুদয় ঘরকন্না তোমার। অনুমতি হইলেই এক্ষণেই আমাদের কাজিকে ডাকিয়া আনি, তিনি আমার সহিত তোমার নিকা দিয়া দিবেন।" সাহসের উপর ভর করিয়া আমি বলিলাম,—'তুমি কে? স্বামী আমার তোমাকে কি করিয়া দিলেন?' সে বলিল,—'আমি ভূত। আমার নাম লুল্লু। আমি সামান্য ভূত নই, আমি একজন সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আর এই ধনসম্পত্তি, এই গিরিগহ্বর আমার; আমি দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরি করিতেছি। ভূত-সমাজে আমি অতি প্রবল-পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত, আমার মান-মর্য্যাদা রাখিতে আর স্থান নাই।' আমি বলিলাম,—'স্বামী আমায় তোমাকে দিয়াছেন, এ কথা একেবারেই মিথ্যা। তার পর মানবী হইয়া ভূতের রমণী কবে কে হইয়াছে? দেখ, আমরা খোদা-পরস্ত, মুসলমান, ভূতপরস্তদিগের মত শয়তানের শাগ্‌রেদ নই। আমার প্রতি অত্যাচার করিলে, খোদা তোমাকে দণ্ড করিবেন।'

"এইরূপ প্রতিদিন ভূতের সহিত বাদানুবাদ হয়। ভূত কিন্তু আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করে নাই। প্রথম কয়েক দিন আমি আহার-নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। তার পর যখন দেখিলাম যে, আপাততঃ ভূত আমার প্রতি বিশেষ কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিতেছে না, তখন আহার করিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, ভূত শাসন করিবার নিমিত্ত নানারূপ তাবিজ আছে। আমিনদিগের নিকট হইতে তাহা আনিয়া নিশ্চয় তুমি আমার উদ্ধার করিবে। ভূত প্রতিদিন আসে আর বলে,—কেমন, আজ কাজি আনি? প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া, এখন তাহাকে দেখিলে আর আমার বড় ভয় হয় না, পূর্ব্বেকার চেয়ে মনে সাহসও অনেক হইয়াছে। নিকা করিবার কথা বলিলে, এখন তাহাকে একপ্রকার দূর দূর করিয়া দিই। এক দিন কিন্তু সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইল, ভূত না হইলে হয় ত ফাটিয়া মরিয়া যাইত। সমুদয় শরীর হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। রাগে নিজের হাতটি খুলিয়া লইল, অপর হাত দিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। পা দুইটা খুলিয়া লইল আর সেইরূপ ঘুরাইল। দুইটি হাত, দুইটি পা ঘুরান হইলে, চক্ষু-কোটর হইতে চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া লইল, আর যেরূপ লোকে ভাঁটা লুফিয়া থাকে, সেইরূপ দুই হাতে লুফিতে লাগিল। তার পর সমস্ত মুণ্ডটি খুলিয়া লইল, হাতে লইয়া বলিল, 'সুন্দরি! যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি এই আপনার মুণ্ডটি আপনি চিবাইয়া খাইব।' কি করিয়া নিজের মুণ্ড নিজে খাইবে, তাহা কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, আমি বলিলাম,—'তুমি নিজের মুণ্ড নিজেই খাও, আর পরেই খা'ক, আমি কেন ভূতকে বিবাহ করিতে যাইলাম? ভাল চাও ত আমাকে ঘরে রাখিয়া এস।' তখন সে বলিল,—'আচ্ছা! আজ আমি তোমাকে কিছু বলিলাম না, আজ হইতে এক বৎসর কাল

তোমাকে কিছু বলিব না। এক বৎসর পরে আমাকে নিকা কর ভালই, না কর তোমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিব। তোমার স্বামী তোমায় আমাকে দিয়াছে, আমি তোমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিব। মনে করিও না আর কখনও তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়া দিব।' সেই দিন হইতে আর আমাকে বিরক্ত করে না। রাত্রি হইলে চরিতে যায়, সকাল হইলে বাড়ী আসে, পরে ঐ বড় গর্তটিতে শুইয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যায়। মেঘ-গর্জনের ন্যায় নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাই, আমার কাছে বড় আসে না। কেবল তিন চার দিন অন্তর একবার আসিয়া আহারীয় সামগ্রী দিয়া যায়, আর জিজ্ঞাসা করে,—'কেমন, এখন তোমার মন শান্ত হইয়াছে ত? কাজি আনিব কি?' গতবার আসিয়া বলিল,—'দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। রং অনেক ফর্সা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছু দিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব সকলে বলিবে, 'লুল্লু না, এ সাহেব ভূত; কোন লার্ডের ছেলে হইবে। তখন তুমি আর আমাকে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন তুমি বলিবে 'আমার লুল্লু কই? আমার লুল্লু কোথা গেল?' তখন তুমি বলিবে, 'আর বিলম্ব সহে না, শীঘ্র আমাকে নিকা কর।' কিন্তু তা আমি করিব না। তখন আমি নলপতঃ করিব। নিকা করিবার জন্য তুমি আমার সাধ্য-সাধনা করিবে, তা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিব। মনে করিব, এ আমাকে বড়ই ভালবাসে, আমি ইহার জীবনসর্বস্ব। সকল ভূতেই বলে যে, লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আমি আর আমার গেঁটে দাদা, দুই জনেই সভ্য ভব্য নব্য। দেখিতে পাও তো, জোর না হইলে কখনও বাড়ী আসি না। যাই, এখন সাবাং মাখিগে।' এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। দু-এক দিনের মধ্যে আবার বোধ হয় আসিবে।"

আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা কি ভূতের মেস্, না মফলিসের বাড়ী? অর্থাৎ কিনা, এখানে অপরাপর ভূত থাকে, না লুল্লু একলা থাকে?" আমীর-রমণী বলিলেন যে,—"এখানে লুল্লু ভিন্ন আর কোন ভূতকে দেখি নাই। লুল্লু একলা একলা থাকে এই আমার বিশ্বাস।" আমীর বলিলেন,—"এখন সকল কথা বুঝিলাম, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন। কিন্তু কিরূপে যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইব, তাহা জানি না। আপাততঃ আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। যদি কিছু খাবার থাকে তাহা হইলে আমাকে দাও।" আমীর-রমণী বলিলেন,—"খাবারের এখানে কিছুমাত্র অভাব নাই। ভূত প্রচুর পরিমাণে সে সকল আনিয়া দেয়।" এই বলিয়া তিনি পোলাও, কালিয়া, কুর্মা, কোপ্তা, কাবাব, কারি আনিয়া স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইলেন।

অষ্টম অধ্যায় : চণ্ডু-মাহাত্ম্য

আহারান্তে বিছানায় শুইয়া আমীর নল দ্বারা চণ্ডুধূম পান করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন,—"কি করিয়া স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করি।" ধূমপান করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিলেন,—"এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তুমি কি বল? লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। ভূতের তেল মাখিয়া যদিচ আমার শরীরে ভূতের বল হইয়াছে, তথাপি তাহার সহিত বোধ হয় সম্মুখ-সংগ্রামে আমি জয়লাভ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ, ঘ্যাঁঘোঁ আমাকে বলিয়া দিয়াছে,—'কৌশল করিয়া স্ত্রীর

উদ্ধার করিও।' সে জন্য তুমি একটি কাজ কর। অল্প অল্প লুল্লুকে প্রশ্রয় দাও। দিনকতকাল তাহাকে চণ্ডুর ধূম পান করাও। তার পর কি হয় বুঝা যাইবে। গোকুলের বাঁকা কালাচাঁদের সহিত পরিণয় করিলে রক্ষা আছে, কিন্তু আফিম-কালাচাঁদের সহিত প্রেম করিলে আর রক্ষা নাই। চণ্ডুর পরিণয়ে তুমি তাহাকে আবদ্ধ কর। আমার সমুদয় সরঞ্জাম তোমার নিকট রাখিয়া যাইব। দিনকতকাল কাঁচা আফিম খাইয়া না হয়, কণ্টেশ্রেষ্ঠে কাল কাটাইব।"

আমীর-রমণী বলিলেন,—"এ পরামর্শ মন্দ নয়।"

এইরূপ কথোপকথনে নিশা অবসান-প্রায় হইল। তখন আমীর-রমণী বলিলেন,—"আর তুমি এখানে থাকিও না। ভূতের আসিবার সময় হইয়াছে। ভূত চরিতে গেলে, কাল আবার রাত্রিতে আসিও। চণ্ডুর আসবাব রাখিয়া যাও। দেখি কি করিতে পারি। কিছু খাবার দাবার সঙ্গে লইয়া যাও, দিনের বেলায় খাইবে।" আমীর, স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় সেই গর্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

প্রাতঃকাল না হইতে হইতে ভূত বাটী ফিরিয়া আসিয়াই, প্রথমে আপনার গর্তে গিয়া শুইল। ঘোরতর নাক ডাকাইয়া অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইল। তার পর উঠিয়া হ্রদের জলে স্নান করিতে যাইল। পাথর দিয়া, ঝামা দিয়া, বালি দিয়া, সাবাং দিয়া উত্তমরূপে গা মাজিল। শরীরের নানাস্থানে রক্ত ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা আপনি বলিল,—"ক্রমে এইবার দুধে-আলতার রং হইয়া আসিতেছে?" তার পর সাজগোজ করিয়া আমীর-রমণীর নিকট গমন করিল। বলিল,—"কি সুন্দরি! দেখিতেছ? দিন দিন কি হইতেছি? দুধে আলতার রং!" আমীর-রমণী বলিলেন,—"তাই তো! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।" ভূত বলিল,—"পাথর, ঝামা, বালি, সাবাং!" আমীর-রমণী বলিলেন,—"সত্য সত্যই তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত।" ভূত বলিল,—"তবে কাজি ডাকি?" আমীর-রমণী বলিলেন,—"কাজি ডাকায় আমার কিছু আপত্তি নাই, তবে কি না জান, তুমি হইলে ভূত, আমি হইলাম মানুষ, দুই জনে মিলিবে কি করিয়া তাই ভাবিতেছি। মানুষের মত একটু আধটু যদি তোমার ব্যবহার দেখি, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ, দুই জনে পরিণয় হইতে পারিবে। এই দেখ, এত খাদ্যদ্রব্য তুমি আমাকে আনিয়া দাও, নিজে কিন্তু একদিনের জন্যেও একটু খুঁটিয়া মুখে দাও না। কি খাও, কি না খাও, তাহাও জানি না। সাপ খাও, কি ব্যাং খাও,—কিছুই বলিতে পারি না। হয় তো কোন্ দিন পচা মড়া খাইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। মুখের গন্ধে আমার প্রাণ বাহির হইবে। তার পর দেখ, মানুষে পান খায়, তামাক খায়, গ্যাঁজা খায়, আরও কত কি খায়। আহা! আমার স্বামী আমীর কেমন চণ্ডু খাইতেন! কাছে বসিয়া মনের সাধে কেমন তাঁহাকে আমি চণ্ডু খাওয়াইতাম। যখন চণ্ডুর ধূম আমার নাকে প্রবেশ করিত, তখন কেমন আমি স্বর্গসুখ লাভ করিতাম। তাঁহার চণ্ডুর আসবাবগুলি আমি আমার কাঁধের ঝুলি করিয়া রাখিয়াছিলাম। শয়নে উপবেশনে সর্বদাই আমার নিকট রাখিতাম। আহা! আজ পর্য্যন্ত সেই ঝুলিটি আমার কাঁধেই রহিয়াছে।" ভূত বলিল,—"বটে! তা, আমিও চণ্ডু খাইব, নিয়ে এস, এখনি খাইব।" আমীর-রমণী বলিলেন,—"তাহা যদি করিতে পার তো বড় ভালই হয়। ভূত-ভূতিনীদিগের কাছে তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত বট, কিন্তু আমাদের নাকে তোমাদের গায়ের একটু গন্ধ লাগে, একটু বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ। রীতিমত চণ্ডুটি খাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে, আর তোমার গায়ে সে গন্ধ থাকিবে না, মানুষ-মানুষ গন্ধ হইবে।" ভূত বলিল,—"তা দাও, খাইব।"

আমীর-রমণী বলিলেন,—"কাঁচা আফিম হউক, কি গুলি হউক, কি চণ্ডু হউক, অল্প অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করিতে হয়। একেবারে অধিক খাইলে অসুখ করে। তোমার অসুখ করিলে প্রাণে আমি বড়ই ব্যথা পাইব। কারণ, তোমার প্রতি এখন আমার নব অনুরাগ বই ত নয়? যাহা হউক, চণ্ডু শুইয়া খাইতে হয়। মূর্খ লোকের বিশ্বাস এই যে, চণ্ডু একবার টানিলেই অচেতন হইয়া পড়ে বলিয়া, সকলে ইহা শুইয়া খায়। তাহা নহে, শুইয়া খাইতে বাগ হয় বলিয়া খায়।" এই বলিয়া আমীর-রমণী চণ্ডুর আসবাব বাহির করিয়া দিলেন। প্রদীপের নিকট ঘরের এক পার্শ্বে মাটীতে শুইয়া তাহাকে ধূমপান করিতে বলিলেন। কি করিয়া খাইতে হয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। সে অল্প অল্প ধূমপান করিলে, আমীর-রমণী বলিলেন,—"এখন আর নয়, চরিতে যাইবার পূর্বে পুনরায় ও-বেলা আসিয়া খাইও। কিছু কি টের পাইতেছ?" ভূত বলিল,—"আর কিছু টের পাইতেছি না, কেবল গা চুলকাইতেছে, আর একটু বমী বমী করিতেছে।" আমীর-রমণী বলিল,—"ঐটুকুই এর আয়েস, একেই নেশা বলে।" ভূত তখন চলিয়া গেল। পুনরায় সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আর একবার চণ্ডু খাইল। রাত্রি হইলে যথানিয়মে চরিতে যাইল। তখন আমীর আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন।

নবম অধ্যায় : উদ্ধার

ভূতের চণ্ডু খাওয়ার বিবরণ স্ত্রীর নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমীর বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। পূর্বেকার মত কথোপকথনে দুইজনে একত্রে রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাত না হইতে হইতে আপনার গর্তে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। ভূত দিনে দুইবেলা আসিয়া চণ্ডু খায়। আমীর রাত্রিতে স্ত্রীর নিকট থাকেন। আমীর যখন দেখিলেন, চণ্ডুপানে ভূতের বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, আর ছাড়িবার যো নাই, তখন তিনি একদিন স্ত্রীকে বলিলেন,—"কাল তুমি ভূতকে আর চণ্ডু দিও না; বলিও চণ্ডু ফুরাইয়া গিয়াছে, মনুষ্যালয় হইতে চণ্ডু আনিতে বলিবে।" তার পরদিন প্রাতঃকালে যখন ভূত চণ্ডু খাইতে আসিল, আমীর-রমণী তাহাকে বলিলেন,—"দেখ, সঙ্গে করিয়া যাহা কিছু চণ্ডু আনিয়াছিলাম, সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ তোমাকে খাইতে দিই এমন আর নাই, তুমি লোকালয় হইতে চণ্ডু লইয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া ভূতের মন বড়ই উদাস হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, কি সর্বনাশের কথা সে শুনিল! বিরসবদনে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। যত বেলা হইতে লাগিল, শরীরে ও মনে ততই ক্লেশ হইতে লাগিল। প্রথম আকর্ণ পূরিয়া হাই উঠিতে লাগিল, তার পর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, গা-ভাঙ্গিতে লাগিল। সর্বশরীরে ঘোর বেদনা হইল, প্রাণ আই-ঢাই করিতে লাগিল। সেদিন আর নিদ্রা হইল না। বৈকালবেলা খালি নলটি লইয়া প্রদীপের শীসের কাছে ধরিয়া একবার টানিল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ দূর হইল না। একান্তমনে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কখন সন্ধ্যা হইবে যে, লোকালয়ে যাইয়া চণ্ডু আনিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। সেদিন যেই সন্ধ্যা হইল, অমনি ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। ভীমতালের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-নগর সে-নগর, এ-দেশ সে-দেশ, সমস্ত ভারতভূমি ঘুরিল, চণ্ডু কোথাও পাইল না। আবকারির এমনই কড়া নিয়ম যে, সন্ধ্যা না হইতেই সকল দোকান বন্ধ হইয়া যায়। এদিকে চণ্ডু বিনা প্রাণ জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। উপরে গিয়া আর সব চিন্তা ছাড়িয়া, কেবল চণ্ডুর

বাহির হয়। উদরেরও বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। শরীর আর বয় না, আর উঁড়িতে বা চলিতে পারে না। তখন ভাবিল,—"বৃথা আর ঘুরিয়া কি হইবে? মরি তো ঘরে গিয়া মরি, প্রিয়তমার মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব। তাহাকে বলিব, 'দেখ, তোমার প্রেমের ভিখারী হইয়া আমি এই প্রাণ বিসর্জন করিলাম।' হয়ত আমাকে বাঁচাইবার জন্য ইহার একটা উপায়ও করিতে পারে। অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া, ঘোরতর যাতনায় ব্যথিত হইয়া, ভূত সেদিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। আমীর জানিতেন, কি ঘটনা ঘটিবে, তাই তিনিও সে দিন স্ত্রীর নিকট হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া আপনার ঘরে গিয়াছিলেন। ভূত কিন্তু আপনার ঘরে আসিয়াই সেইখানে শুইয়া পড়িল। শরীর এতই বিকল হইয়াছিল যে, সেখান হইতে নড়িতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সেইখানে পড়িয়া ক্রমাগত উঃ আঃ করিতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ হইয়া গেল। সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হইতে লাগিল, লিগেমেণ্ট সমস্ত আলগা হইল, শরীরের জয়েন সব একেবারে খুলিয়া গেল, হাড়ের সন্ধি সমুদয় একে একে খসিয়া গেল, যাবতীয় অস্থি পৃথক পৃথক হইয়া পড়িল। উত্থানশক্তি-রহিত। ঘোর বেদনায়, ঘোর যাতনায় লুল্লু পড়িয়া রহিল। প্রভাত হইলে, হাসিতে হাসিতে হাত ধরাধরি করিয়া, আমীর ও আমীর-রমণী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আমীর বলিলেন,—"কি হে বাপু! সভ্য ভব্য নব্য ভূত! পুরাতন কথাটা কি কখনও শুন নাই? 'থোড়া থোড়া করকে খাও-মুঝে, মম লগুঁ কড়ুয়া। আব জল্দ বেচো, গরু বেচো, মুঝকো লাও ভেড়ুয়া।'

ইহার অর্থ এই, আফিম বলিতেছেন, 'অল্প অল্প করিয়া আমাকে প্রথম খাও; কেন না, আমি তিত লাগি। এখন ভেড়ুয়া। স্ত্রী বিক্রয় কর, কি গরু বিক্রয় কর, বিক্রয় করিয়া যেখান হইতে পাও আমাকে লইয়া আইস।" ভূত চিঁচিঁ করিয়া বলিল,—"এ বিপদের সময় মুখনাড়া দিচ্ছিস্ তুই আবার কে?" আমীর বলিলেন,—'আমি আমীর, এই রমণীর স্বামী, যাহাকে তুই নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছিস; তাই আজ তোর যাতনা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেছি।" ভূত বলিল,—"তোমার জরু তুমি ফিরিয়া লও, অমন জরুতে আমার কাজ নাই। বাবা! ওতো জরু নয়! সুখে স্বচ্ছন্দে ভূতগিরি করিতেছিলাম, এ কি বাপু! ভূতের আবার চণ্ডু খাওয়া কি? ঐতো আমাকে মজাইল। এখন তোমার কাছে যদি আফিম কি চণ্ডু থাকে ত দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ধড়ে প্রাণ আসিলে তোমার স্ত্রীকে এবং তোমাকে ঘরে লইয়া যাইব। কেবল ঘরে রাখিয়া আসিব না, এখন দেখিতেছি আমাকে চিরকাল তোমার গোলামি করিতে হইবে। চণ্ডু না পাইলে ত আর বাঁচিব না; সুতরাং চণ্ডুর জন্য তোমার গোলামি করিতে হইবে। দুই-বেলা চণ্ডু দিও, যা বলিবে তাহা করিব, তোমার সংসারে ভূতের মত খাটিব।" আফিমের মহিমা আমীর ভালরূপেই জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, লুল্লু যাহা বলিতেছে, তাহা প্রকৃত কথা। প্রতারণা ইহাতে কিছুই নাই। পকেট হইতে বাহির করিয়া প্রথমে তাহাকে একটু কাঁচা আফিম খাইতে দিলেন। ইহাতে ভূতের শরীর কিঞ্চিত সুস্থ হইল; শরীরের অস্থি সমুদয় পুনরায় যে যাহার স্থানে গিয়া যোড়া লাগিল। তখন সে উঠিয়া বসিল। তার পর আমীর তাহাকে চণ্ডু পান করিতে দিলেন। তাহাতে তাহার দেহে পুনরায় প্রাণ-সঞ্চার হইল, শরীর স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল। লুল্লু তখন আমীরের পদতলে পড়িয়া বলিল,—"মহাশয়! আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী, বড়ই দোষ করিয়াছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন। বড়ই নিদারুণ ক্লেশ হইতে আপনি আমাকে মুক্ত করিলেন। আপনার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। চিরকাল দাসানুদাস

হইয়া আপনার এবং এই বিবিজীর সেবা করিব। এখন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লউন। আজই রাত্রিতে আপনাদিগকে ঘরে লইয়া যাইব।" আমীর ও আমীরের রমণী তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর ভূত আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। দুই জনে লুল্লুর পিঠে বসিলেন। জল হইতে বাহির হইয়া লুল্লু আকাশ-পথে উঠিল। তাড়িৎবেগে আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় সকলে দিল্লী নগরে আসিয়া পেঁাছিলেন। আমীরের ছাদে গিয়া ভূত ইঁহাদিগকে নামাইয়া দিল। আমীর ফকির-বেশে গৃহত্যাগ করিবার সময় ঘরে চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। চাবি খুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে ঘরে প্রবেশ করিলেন। লুল্লুর জন্য একটি ঘর নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "লুল্লু! এই ঘরটি তোমার, তুমি এই ঘরে থাকিবে। আফিম কি চণ্ডু যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব।" লুল্লু বলিল—"হাঁ, এ জনমে আপনাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। ছাড়িবার যোও নাই।" পরদিন প্রাতঃকালে আমীর প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। আমীর বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইলেন।

দশম অধ্যায় : লুচি

যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইলে, লুল্লু ও আমীর দুই জনে এক সঙ্গে শুইয়া মনের সুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া চণ্ডু পান করিলেন। এইরূপে ভূতে মানুষে ক্রমে বড়ই ভাব হইল। একদিন চণ্ডু খাইতে খাইতে আমীর বলিলেন,—"হে লুল্লু! হে চণ্ডু-সেবক-কুল-তিলক! আমার বড় সাধ হইতেছে যে, পুনরায় বন্ধুদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করি,—যাঁহারা স্ত্রী-উদ্ধার বিষয়ে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন তুমি আমার শত্রু ছিলে, এখন কিরূপ প্রাণের মিত্র হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা একবার আসিয়া দেখুন। প্রথম হইতেছেন সেই জান্, যিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ। তার পর সেই ব্রাহ্মণ, যাঁহার মত রোজা এ ধরাধামে কখনও হয় নাই, হবে না। তার পর আমাদের তাঁতি-ভায়া, যাঁর মত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ পৃথিবীতে হয় নাই, হবে না। তার পর সেই কলুর পো, যাঁর মত তৈলনিষ্পীড়ক জগতে হয় নাই, হবে না। আর যদি ভূতদিগকে আনিতে পার, তাহা হইলে ত বড়ই সন্তুষ্ট হই। সেই ভূততত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণের ভূত, সেই অমানুষিক অভৌতিক প্রেমিক ঘ্যাঁঘোঁ, আর সেই ভাবিসম্পাদক তৈলপ্রদায়ক গোঁগাঁ! তোমার গেঁটে দাদার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও আমার বড়ই ইচ্ছা। আর একটি কথা—আহা! ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ হয় নাই, তাহার সেই নাকেশ্বরীকে আনিয়া যদি দুই জনে মিলন করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ই সন্তুষ্ট হই।" লুল্লু বলিল,—"আপনার সমুদয় আদেশ পালন করিতে আমি সমর্থ। আমি এই রাত্রিতেই সকলকে এখানে আনিতেছি।" সন্ধ্যার সময় ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমীর সকলকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপনার বিবিকে পাইয়াছেন শুনিয়া সকলে পরম সুখী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুল্লু পুনর্বার আকাশ-পথে যাত্রা করিয়া ব্রাহ্মণের ভূত, ঘ্যাঁঘোঁ, গোঁগাঁ ও সভ্য ভব্য নব্য গেঁটে দাদাকে লইয়া আসিল। ঘ্যাঁঘোঁর মনোহর নাক-ধারিণী বিশ্ববিমোহিনী সেই ভূতিনীকেও আনিয়া দিল। ভূতিনী অন্তঃপুরে আমীর-পত্নীর নিকট গমন করিলেন। পুরুষ মানুষ ও

পুরুষ-ভূত সকলে বহির্বাটীতে উপবেশন করিলেন। পরস্পরে আলাপ পরিচয় হইলে, আমীর অনুনয়-বিনয় করিয়া সকলকে বলিলেন,—"মহোদয়গণ! আজ রাত্রিতে আমার এ গরীবখানাতে পদার্পণ করিয়া আপনারা বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার মনে একটি বাসনা বড়ই প্রবল হইয়াছে, আপনারা তাহা করুন। বড় ইচ্ছা, নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ-কার্য্য আজ রাত্রিতেই সমাধা করি। গোঁগাঁ যে ঘ্যাঁঘোঁর নামে মিথ্যা কুৎসা করিয়াছিল, তাহা আমার পত্নী, নাকেশ্বরীর মাসীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গোঁগাঁও এ কথা এখন স্বীকার করিতেছে। নাকেশ্বরীর মাসী বিবাহে সম্মতিদান করিয়াছেন, এখন আপনাদিগের কি মত?" সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন,—"তথাস্তু, শুভকার্য্যে বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" তখন আমীর—লদ্লদ প্রভৃতি ভূতদিগকে পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু উপস্থিত ভূতগণ সকলেই মৌন হইয়া রহিল। আমীরের আদেশ পালনে কেহই তৎপর হইল না। আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কি তোমাদিগকে কোন দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছি? পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করা কি তোমাদের অভিপ্রেত নয়?" লদ্লদ উত্তর করিল,—"মহাশয়! আপনি যেরূপ সদাশয় লোক, তাহাতে আপনার সমস্ত আদেশই আমাদের শিরোধার্য্য। তবে কি না, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম ফিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ক মৃত্তিকাভাণ্ড জল-স্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র-পারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্য্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন। যার পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা,—দিবারাত্রি তাঁহাদিগকে পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিংবা কল্মা পড়িতে হইবে, তবে তাঁহাদের ধর্মটা টায়টোয়ে বজায় থাকিবে। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন যেরূপ অনুমতি হয়।" আমীর বলিলেন,—"তবে আর তত আড়ম্বরের আবশ্যক নাই। ভারতীয় ভূত-সমাজকেই কেবল নিমন্ত্রণ কর।"

নানাবিধ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পান-ভোজনের সামগ্রীরও আয়োজন হইল। মুহূর্তের মধ্যে ভূতেরা অনেক লুচি, অনেক সন্দেশ, অনেক দধি জমা করিয়া ফেলিল। নগরবাসী অনেক লোককে আমীর সেই রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইলে, আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় আয়োজন হইলে, মহাসমারোহে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল। আমীর নিজে কন্যাদান করিলেন, ব্রাহ্মণটি পুরোহিত হইলেন। বিবাহের মন্ত্র তিনি জানিতেন না সত্য, কিন্তু একটি দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া ওঁ আং করিয়া কোন রকমে সে রাত্রির কার্য্য সারিলেন। পূর্ণযৌবনী ভূতকামিনী ঘ্যাঁঘোঁপত্নীর রূপ-মাধুরী দেখিয়া সকলেরই মন বিমোহিত হইল। একমনে অনিমিষনয়নে সকলে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন। যিনি যত দেখেন, দেখিয়া পিপাসা হৃদয়ে তাঁহার ততই প্রজ্বলিত হইল। বরকে সকলে বলিলেন,—"ঘ্যাঁঘোঁ! তুমি অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ! যে, এরূপ অমূল্য কন্যারত্নকে লাভ করিলে।" ঘ্যাঁঘোঁ চক্ষু ঠারিয়া ঈষৎ হাসিলেন। বর কি না? অধিক কথা ত আর কহিতে পারেন না? তবে সেই ঠার, সেই হাসির অর্থ এই—"আমি পূর্বেই না বলিয়াছিলাম, ও রূপ দেখিয়া কার প্রাণ সুস্থির থাকিতে পারে?" নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদি-ক্রিয়াও উত্তমরূপে সমাধা হইল। যিনি যত পারিলেন, লুচি ও সন্দেশ তুলিলেন, ও পুঁটলি বাঁধিয়া ঘরে লইয়া গেলেন।

সভাস্থলেই বাসর-ঘর হইল। বাসর-ঘরে গান গাইবার নিমিত্ত সকলে একবাক্য হইয়া তাঁতিকে অনুরোধ করিলেন। পুলকে পুলকিত হইয়া, সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে তাঁতি সেই রাত্রিতে মনের সুখে গান করিলেন। শ্রোতারা একদৃষ্টে তাঁহার মুখ-ভঙ্গিমা দেখিয়াই আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। গানের কণামাত্র কাহারও কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না। আমীরের অনুরোধে দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সে রাত্রিতে সাবধান হইয়াছিলেন। তুলা দিয়া সকলেই কান একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। সে রাত্রিতে নৃত্যেরও অভাব হয় নাই, ভূত-ভূতিনীরা দলে দলে কতই যে নাচিল তাহা আর কি বলিব! প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে মজলিস ভাঙ্গিল। তখন লুল্লু,—জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে ঘরে রাখিয়া আসিলেন। নগরবাসীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

একাদশ অধ্যায় : লেখকদল! সাবধান!

ভূত ও ভূতিনী সকল বিদায় হইবার পূর্বে, আমীরকে তাহারা বলিল,—"মহাশয়! আপনার সদাচারে আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যদি কোন বিষয়ে আপনার উপকার করিতে পারি ত বলুন, আমরা বড়ই সুখী হইব।" আমীর বলিলেন,—"আমার উপকার করিতে যদি নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের বাসনা আমি পূর্ণ করিব। এখান হইতে চারি ক্রোশ দূরে যমুনার কূলে আমার অনেক ভূমি ছিল; তাহার আয় হইতে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমাদিগের রাজার হালে চলিত। সেই ভূমি এক্ষণে যমুনার জলপ্লাবনে একেবারে বালুকাময় হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে তোমরা যদি বালুকা সব তুলিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।" ভূতেরা বলিল,—"যে আজ্ঞে, আমরা এই-ক্ষণেই করিতেছি। এই বলিয়া যত ভূত সেই মুহূর্তে ভূমির নিকট যাইল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদয় বালি উঠাইয়া ফেলিল। ভূমি পূর্বের মত উর্বর ও ফল-শালী হইল। তখন তাহারা আমীরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমীর কিন্তু গোঁগাঁকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তাহাকে বলিলেন,—"গোঁগাঁ! তুমি যাইও না। তোমার অস্থি মজ্জা সমুদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার শরীর একেবারে ভঙ্গিয়া গিয়াছে। আফিম আর দুধ, এই দুই বস্তু নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে তোমার শরীর পুনর্গঠিত হইতে পারে। যেহেতু আফিম অতি অপূর্ব পদার্থ, ইহা সেবন করিলে মানুষ যে বয়সে খায়, সেই বয়সেই চিরকাল থাকে, শরীরের কোষ সমুদয় ধ্বংস হয় না, ম্যালেরিয়া বিষ-জনিত জ্বর ইহার নিকটে আসে না। কি মনুষ্যের, কি ভূতের, ইহা সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অতএব তুমি লুল্লুর নিকট অবস্থিতি কর। চণ্ডু পান করিতে অভ্যাস কর।" গোঁগাঁ তাহাই স্বীকার করিল। এইরূপে আমীর স্ত্রীকে লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই লুল্লু গণ্যমাণ্য সকলের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একটু আধটু যাঁহারা নেশা করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি 'মা' বলিয়া ভিন্ন কথা কহিতেন না। চণ্ডুর মোহিনী শক্তি প্রভাবে তাঁহার বিকৃতি আকার ক্রমে সুকৃতি হইয়া উঠিল। নব্য না হউন, সত্য সত্যই তিনি একজন সভ্য ভব্য ভূত হইলেন। চণ্ডুর সহিত দুধ-ঘি খাইয়া তাঁহার রং যথার্থই ফরসা হইয়া উঠিল। তবে তাঁহার দোষ এই, নেশাখোর ভিন্ন অপরের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। যাহা হউক এত পোষ মানিয়াছিলেন যে, আমীর-

রমণী তাঁহাকে দেখিয়া আর কিছুমাত্র লজ্জা বা ভয় করিতেন না। আমীরের অবস্থা ভাল হইলেও, লুল্লু তাঁহাকে গাড়ী করিতে দেন নাই। তাঁহার যেখানে যাইবার আবশ্যক হইত, তিনি পিঠে লইয়া যাইতেন। তাহার পিঠে চড়িয়া আমীর-রমণী কতবার বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। লুল্লুকে সর্বদা এখানে সেখানে যাইতে হইত বলিয়া তিনি স্বর্ণকারের দ্বারা দুইখানি পাখা গড়াইয়া লইয়াছিলেন। কোথাও যাইতে হইলে ঐ দুইখানি পাখা পরিয়া উড়িয়া যাইতেন, তাহাতে তাহাকে দেখাইত ভাল, আর তাহা পরিয়া অনেক দূর যাইলেও শ্রম হইত না। একবার সমুদ্র দেখিতে আমীর-রমণীর বড়ই সাধ হইয়াছিল। লুল্লু এ কথা শুনিয়া বলিলেন,—"তার ভাবনা কি? আমার পিঠে চড়। আমার মাথাটি ভাল করিয়া ধর, আমি সমুদ্র দেখাইয়া আনিতেছি।" এই প্রকারে তিনি আমীর-রমণীকে সমুদ্র দেখাইয়া আনিলেন।

ধন্য লুল্লু

কিছুদিন পরে, গোঁগাঁর শরীর পুনরায় সবল হইলে, আমীর তাঁহাকে বলিলেন,—"গোঁগাঁ! আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা করিব। একখানি খবরের কাগজ খুলিব, তাহার সম্পাদক হইবে তুমি।" যথাসময়ে আমীর একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত,—গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীর আর স্থান রহিল না। সংবাদপত্রখানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ হইল।

গোঁগাঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র-আফিসেই তাঁর অদৃশ্যভাবে গতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোঁগাঁ তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কি বলিব! তাই বলি, লেখক দল! সাবধান!

নয়নচাঁদের ব্যবসা

প্রথম পর্ব : আঠারো

নয়নচাঁদের বাড়ী ফরাশ-ডাঙ্গা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা, নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ আড্ডায় বসিয়া নিত্য-ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার মজার কথা চাই, তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়ান! আজকাল তোমার কিছু সুখ সাওয়াল দেখিতেছি। চিনির জলে আর সে তোমার ষোলা নাই। এখন সন্দেশটুকু রসগোল্লাটুকু এ না হইলে আর তোমার চা'ট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়াছে, গায়ে তোমার তেলা মারিয়াছে। যকের টাকা পাঁইয়াছ না কি?"

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন,—"সত্য হে! ব্যাপারখানা কি বল দেখি নয়ান! গুলিখোর বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাঁটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ান! কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তা বল।"

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে, বাজখাঁই স্বরে বলিলেন,—"আড্ডাধারী মহাশয়! ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইঁহারা হিন্দু কি মুসলমান?"

গগন বলিলেন,—"ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কারে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে, ফট্ করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড্ খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"চট কেন ভাই। কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয় তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তার চেয়ে না বলা ভাল। আজকাল আমার হইল ধর্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কি হয়? তোমাদের মতি-গতি অন্যরূপ। কিসে আমার দু পয়সা হইল, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না। আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।"

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতূহল জন্মিল। কিসে নয়নের পয়সা হইল, এ কথাটি শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ বড়ই উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,—"আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা বিদ্রূপ কর তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, কৃস্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী,—আর কি নাম করিতে বাকী রহিল, আড্ডাধারী মহাশয়?"

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আর কি বাকী আছে? বাকী আর কিছুই নাই। সে যে ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়াছিলেন,—'ওরে আঁটকুড়োর বেটারা। যদি সত্তর পর্য্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি কি রাখিলি?' ছেলেরা কেবল

সতর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল; তা নয়ান! তুমি সতর ছাড়িয়া উনিশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছ। বাকী আর কিছু রাখ নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃস্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতর আঠারোর মানে কি?"

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন,—"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া খেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া ইট, পাটকেল, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন, তাহা ছুড়িয়া সেই ব্রাহ্মণদেবতা ছেলেদের মারিতেন। একদিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ্ গশ্ করিতেছিল, জবা ফুলের মত চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্‌মট্ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। একবার আঠারো বলিলে হয়! মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ! বড়ই বিপদ! আঠারো না বলিলেও নয়, ও-দিকে ব্রাহ্মণের এইরূপ উগ্রশর্মা মূর্ত্তি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'ভাই! এ পুকুরপাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে? এই কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগার, বার, তের, চোদ্দ, পনর, ষোল, সতর।—এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতর বলিল, আর ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—'তবে রে আঁট-কুড়োর বেটারা! আর বাকি রইলো কি? যদি সতর পর্য্যন্ত বলিলি তবে আর আঠারোর বাকি রাখিলি কি? এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যে দিকে পাইল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ান! তুমি আমাদিগকে কৃস্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে, বৈষ্ণব বলিলে, মায় ব্রহ্মজ্ঞানী পর্য্যন্ত বলিলে। বাকি আর কি রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ, বিশ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।"

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন,—না, না, তোমাদের আমি ও সব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃস্টান কি তোমাদের আমি বলিতে পারি? আমি বলিয়াছি, যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।"

দ্বিতীয় পর্ব : কপাৎ

নয়ন বলিলেন,—"মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও, আমিও তাই। মুসলমান হও, আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সেগুলিকে মানিব, আমিও যে ঠাকুরগুলিকে মানিব, তোমাদেরও সেগুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে মনের মিল রহিল কোথায়?"

সকলে বলিলেন,—"ঠিক! ঠিক! নয়ান বলিতেছে ভাল। আমাদেরও ঐ মত।"

নয়ন বলিলেন,—"আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত আর হাবড় হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটী

দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই চারিটি মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন।"

সকলেই বলিলেন,—"ঠিক! ঠিক! ঠিক কথা! হাবড় জাবড় তেত্রিশ কোটীর চাল-কলা যোগায় কে হে, বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাক, থাক! বেচারি গরুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টি তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকী সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও!"

নয়ন বলিলেন,—"আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কাটিগঙ্গা, আর এক হইলেন ফণী মনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।"

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া, মাটীতে মাথা ঠুকিয়া, এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটীতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন,—"হে মা কাটিগঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।"

নয়ন পুনরায় বলিলেন,—"কিন্তু এখনও আসল দেবতাটির কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব, তাই মনে করিয়া সেটি বাকী রাখিয়াছি। সে দেবতাটি, মা শীতলা। তাঁরই বরে আমার সুখ, সম্পত্তি, আর আমার ঐশ্বর্য্য। সাবধান! কচা-খাওয়া দেবতা!"

সকলেই বলিলেন,—"সাবধান! কাঁচা-খাওয়া দেবতা!"

নয়ন বলিলেন,—"এ বাপু ঘেঁটু নয়, পেঁচো নয়, তোমার মাণিকপীর নয়! এ মা শীতলা! ইংরেজি খবরের কাগজে পর্য্যন্ত মার নাম বাহির হইয়াছে। মার বরে আমার সব।"

শীতলার নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। আর একটু আগে তেত্রিশ কোটী দেবতা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সে কথাটি শুনিয়া থাকেন, এই ভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া হইল, ভাই? তুমি আধ পয়সার চিনির জলে ষোলা ফেলিয়া, সেই ষোলাটি চুষিয়া চা'ট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্লা কি করিয়া হইল, ভাই?"

নয়ন বলিলেন,—"হাঁ! এখন পথে এস! পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয়ান এই চুপ!"

এই কথা বলিয়া নয়ন "কপাৎ" করিয়া মুখ বুজিলেন।

যার যেমন ক্ষমতা সকলে শীতলার পূজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখের চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পর্ব : এই কিল তো এই কিল!

নয়ন বলিতেছেন,—"এবার আমার বড়ই দুর্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনও দিন হয়, কোনও দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের

হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন্, কিন্তু ফিকিরটি আমিই প্রথমে বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটী লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটীর একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানাটানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় চলিলাম।

সেখানে উপস্থিত হইয়া এক স্থানে শুনিলাম যে, একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল। বসন্ত রোগে তাহার তিনটি ছেলে মরিয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত, আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটি ভাড়া করিলাম। বাড়ীওয়ালী ও আশে পাশের লোককে বলিলাম যে মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, ঐ যে পাণ্ডা ছিল, সে ভাল করিয়া মা'র পূজা করিত না। লোকে পূজা দিলে আগে থাকিতে সে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিত। মা তাই তার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্তে মা আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামাডোল, খুব মহামারী, লোক মরিয়া উড়কুড় উঠিতেছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। আমাকে পাইয়া সকলের প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে,—'মা জাগ্রত বটে। একজন পাণ্ডা যাইতে না যাইতে, কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর একটি পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনও ভয় নাই।'

পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়! আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম্ থাকিতে থাকিতে দু পয়সা রোজকার করিয়া পুনরায় ইয়ার বক্সির কাছে ফিরিয়া আসি। কলিকাতার আড্ডাগুলি সাহেবেরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন। সেখানে আমার মন টিকে না। তাই, শীতলাটি হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কি ছাই শীতলার গান জানি! কিন্তু চিরকাল হইতে আমি দশ-কর্মা; যে কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হুনহর। নিজেই একটি শীতলার ছড়া বাঁধিলাম, তাহার কতকটা বলি, শুন—

"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়ো অ্যাণ্ডা বাচ্ছা টপ্ টপ্ খাই॥
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল॥
বড় বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি॥
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁটা ছাড়া কোরে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল॥
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও-কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই॥
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত॥

পাতাল-মুখো বসন্ত বলে নীচে কোরে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ॥
খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল॥
হাড়ভাঙ্গা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধোরে খাই॥
শীতলা বলেন আমি চা'ল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই॥
চা'ল পয়সা আনো হবে পুজোর বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চৌষট্টি হাজার॥"

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা! ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে সময় যদি কেহ বলিত যে,—'নয়ান! হাইকোর্টের জজগিরি খালি হইয়াছে, তুমি সেই জজগিরিটি কর।' আমি তাতেও রাজি হইতাম না। প্রথম দিনের রোজগারটি আনিয়া গিন্নিকে বলিলাম—'গিন্নি! একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপ-ধোন! ব্যাপারখানা কি? বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখঝামটা দাও! গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপ-ধোন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?'

কিন্তু, দেখ লম্বোদর ভায়া! তোমাদের আমি একটি জ্ঞানের কথা বলি। সাদাচোখোদের যে কখনও বিশ্বাস করিবে না, সে কথা বলা বাহুল্য! সাদা-চোখোদের মনটি সদাই জিলেপির পাক। সত্য কথা কারে বলে, তারা একেবারে জানে না। প্রমাণ চাও? আচ্ছা প্রমাণও করিয়া দিই। এই দেখ, ছিঁচকে-চোর বলিয়া তাহারা আমাদের মিথ্যা অপবাদ রটায়। আচ্ছা তাহারা তামা, তুলসী, গংগাজল হাতে করিয়া বলুক,—কবে কার ছিঁচকে কোন্ গুলিখোর চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়! আপনিও বলুন,—ছিটের জন্য কবে কোন্ গুলিখোর আপনার নিকট ছিঁচকে আনিয়াছে? ঘটি চোর বল, বাটি চোর বল, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের দু'কড়ার ছিঁচ্‌কে কে কবে চুরি করে বাপু? তাই বলি, হে সাদা-চোখোগণ! ভুলিয়াও কি তোমরা কখনও সত্যকথা বলিতে শিখিবে না?"

লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। সাদা-চোখোদের বিশ্বাস নাই। সাদা-চোখোদের ছাঁওয়া মাড়াইলে নাইতে হয়।"

নয়ন বলিলেন,—"আর বিশ্বাস করিও না এই পেশাদার মাতালদের। মন তাদের সাদা বটে, কিন্তু কখন্ কি ভাবে থাকে, তার ঠিক নাই। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা যোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয় তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুর ফুর করিয়া বাতাস হইতেছে, সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে হয়তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়-হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা একবারে রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্মান্তিক করে। পা'ল-পার্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, এ কথা বুঝি। তা নয়! সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্টপ্রহর তুমি মদ

খাইয়া তর্ হইয়া থাকিবে! মেজাজটি গরম করিয়া রাখিবে। ঠাকুর দেবতা লইয়া তোমার বাড়ীতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাদের মারিতে দৌড়িবে। এ কি বাপু! এরে কি ভাল কাজ বলে? না এরে হিন্দুধর্ম বলে? থুঃ! ছি!"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এইরূপ কোনও একটা মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছিলে না কি?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটি জাগ্রত, হেলা ফেলা গুড়ুক তামাকের শীতলা নয়, তাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।"

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

নয়ন বলিলেন,—"ভাই! একদিন প্রাতঃকালে শীতলাটি হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জানি কি ছাই যে, সে মাতালের বাড়ী? তাহা হইলে কি আর যাইতাম? তার বাড়ীতে গিয়া, মন্দিরেটি বাজাইয়া, সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি,—"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই" আর মিন্‌সে করিল কি জান ভাই! এক না কম্বল-মুড়ি দিয়া, 'আঁ আঁ' শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৌড়িয়া আসিল। তার সেই বিকট 'আঁ আঁ' শব্দ শুনিয়াই পেটের পিলে আমার চম্‌কিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া আমি পালাইবার উদ্যোগ করিলাম। তা ভাই! পলাইতে না পলাইতে বেটা যেন ঠিক কেঁদো বাঘের মত আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তার পর দুঃখের কথা বলিব কি ভাই, এই কিল! এই কিল, তো এই কিল! আর সে কিল তো নয়! এক একটি কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জায়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,—হায় হায় হায়! কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম? শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন যে সখের প্রাণটি, সে প্রাণটি আজ হারাইলাম।"

চতুর্থ পর্ব : বসিয়া আছে দুইটি ভূত

যাহা হউক, মনের সাধে কিল মারিয়া মিনসে আমার শীতলাটি কাড়িয়া লইল। আমি পলাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা পাইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে মনে শীতলাকে বলিলাম যে,—"মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাই না, তোমার চা'ল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

গগন বলিলেন,—"ঈশ! তাই তো। এ যে ঠিক সেই সুবল ঘোষের কথা।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবলের কি হইয়াছিল?"

গগন বলিলেন,—"দুধ বেচিয়া সুবলের পিসী কিছু টাকা করিয়াছিলেন! পিসী মরিয়া যাইলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে, দুগোৎসবটি করি। ঠাকুরগড়া হইল, পূজার দিন আসিল। সিঙ্গি, চোরা, ময়ূর, গণেশের শুঁড়, এই সব দেখিয়া সুবলের মনে বড় আনন্দ হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল। পূজার কয়দিন স্বয়ং নিজে ক্রমাগত শাঁক বাজাইলেন। প্রাণপণ চিক্কুড়ে শাঁকে ফুঁ দিলেন। কোঁৎ পাড়িয়া শাঁক বাজাইতে বাজাইতে এখন গোগ্‌গোলটি বাহির হইয়া পড়িল। তার পর সেই গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির। গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির হইয়া, বিসর্জনের সময় ঠাকুরের

সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া, হাত যোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—
ধন চাই না, মা! মান চাই না মা! চাই না পুত্তর বর।
এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া এই বেরিয়েছে গোগ্‌গোল তাই রক্ষা কর॥
নয়ানেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। চা'ল চাই না মা! পয়সা চাই না মা! এখন এই হাড়গুলি যোড়া লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ান! ঠিক নয়?"

নয়ন বলিলেন,—"হাঁ, ভাই ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি ভাই! পাঁচ সাত দিন পরে আমার নামে এক চিঠি! যে শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল, তার চিঠি! ডাকে সেই খোলার ঘরে গিয়া চিঠি উপস্থিত। মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কি করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে, শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

যাই কি না যাই? এই কথা লইয়া মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া করিতে লাগিলাম। গিন্নী রাগিয়া বলিলেন,—"যাও-ই-না ছাই! তোমায় সে কি খাইয়া ফেলিবে?"

আমি বলিলাম,—'তুমি তো বলিলে, যাও-ই-না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জান না? মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। চুণে-হলদে বাটিয়া হাতে তোমার কড়া পড়িয়া গেল, তবু বল, যাও-ই-না ছাই। এঁটেল মাটী দিয়া আর একটি শীতলা গড়িতে পারিব, প্রাণটি তো আর এঁটেল মাটী দিয়া গড়িতে পারিব না!'

যাহা হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপ্ রে বলিতে এখনও সর্ব শরীর শিহরিয়া উঠে! বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত!"

লম্বোদর বলিলেন,—"মাইরি?"

নয়ন বলিলেন,—"মাইরি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন দুইটি ভূত।"

সর্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা যেন মাটীতে পুতিয়া গেল! টাকরা পর্য্যন্ত ধূলি মাড়িয়া গেল! পলাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না! অজ্ঞান হতভোম্ব হইয়া আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুই জনের মধ্যে যিনি কর্তা-ভূত, আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া তাঁর আগুনের হল্‌কা বাহির হইতে লাগিল। তিনি আমাকে হাতছানি দিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমাতে কি আর আমি ছিলাম যে, ভাবিব চিন্তিব? সুড়্ সুড়্ করিয়া ভিতরে যাইলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে আমি ঘরের এক পাশে বসিলাম।

কর্তা ভূত বলিলেন,—'আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি আর কেহ নই, আমি সেই মিত্তির জা, যে তোমার শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল। তোমার এ শীতলাটি জাগ্রত বটে! কেবল ঐ শীতলাটির জন্য ভূত হইয়া আমাকে আট্‌কে থাকিতে হইয়াছে, তা না হইলে বাস আমার বৈকুণ্ঠে। এখন তোমার শীতলাটি ফিরিয়া লও, যে আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই।'

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন,—'আহা! ইহারে তুমি অনেক কিল মারিয়াছে, তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না। ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত, সে কথাগুলি ইহাকে

খুলিয়া বল। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লোকে আরও ভক্তিভাবে ইহার শীতলাকে পূজা দিবে। ইহার দুপয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়। পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে; এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।'

কর্তা-ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কিসে বৈকুণ্ঠটি আমার কানের কাছ দিয়া গিয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও?'

'ভূতেদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল; আমি বলিলাম,—'আজ্ঞে হাঁ, শুনিতে চাই বই কি? তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে, আর জ্ঞান থাকে না।'

কর্তা-ভূত হাসিয়া বলিলেন,—'না, না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মটকাইয়া দিব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে সকল কথা শুন।'

আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—"নয়ান! তোমার সাহস তো কম নয়! স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতেদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো কম নয়?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"বেঁধে মারে সয় ভাল। করি কি? ভূতের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না! কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে, তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড়-সুড় করিতেছে; এস দুইটি কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া আমাদের হাত নিশ-পিশ করিতেছে, এস ভাঙিগয়া দিই! তাহা হইলে কি করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম, ভাল-মানুষ ভূত। সেই কর্তা-ভূতের এখন আশ্চর্য্য কাহিনী শুন।"

পঞ্চম পর্ব : কর্তা-ভূত বলিতেছেন

কর্তা-ভূত বলিতেছেন,—তোমার শীতলাটি কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়ই আনন্দ হইল। কারণ এইরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনও কাজে নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটি জাগ্রত শীতলা, মরা শীতলা নয়। ভাল এঁটেল মাটী, ভাল সিন্দুর, ভাল রাঙগতা দিয়া গড়া। বেলে মাটী নয়, মেটে সিন্দুর নয়, জাল রাঙগতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা পায়ের কোড়ে আঙগুলের আগা পর্য্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব-চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এবার গতিক বড় ভাল নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকটমূর্তি, দেখিলেই প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়। কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনও

একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ কর্ম সকলই করিয়াছি। ভাল কাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিমকালে একটি পুণ্য কাজ করি। আমি চন্দ্রায়ণটি করিলাম। গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির জা। আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা'র দুধ কারে বলে বাছুরটি তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্ম-সার হইয়াছিল। মর-মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ীর বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

চান্দ্রায়ণ করিতে মাথাটি নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটি ঠিক্ বোম্বাই ওলের মত হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ী লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁফরে পড়িল। কি ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা-ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়-হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি, কখনও তক্তপোষের উপর, কখনও তক্তপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ কোণে, সে কোণে, যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল চারি জন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করিব? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটী মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কি না? কাঁটা ফুটিয়া, ছড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থায় যে শরীরে আমি মিত্তিরজা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মত। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটি পুকুরের সান-বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকি তিন জন মাঠে ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটি ছিল, সে আমাকে বলিল,—"খুব মজার লোক তো তুমি। এত লোককে আমরা লইয়া যাই, কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা, ভাল, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। অনেকের মাথায় আজকাল টিকি দেখিতে পাই না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে, এই যাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাদের দুই গালে দুই থাপর মারে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?"

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কিসের জন্য? আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিব, সেই জন্যে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"তাও নয়। এই যে তারের খবর আছে, সেই টুক্ টুক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।"

যমদূত বলিলেন,—"ওঃ! বটে। সেই জন্যে? এখন বুঝিলাম।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যমদূত বলিলেন,—"তোমাদের পাড়ার নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে?"

আমি বলিলাম,—"জানিতাম বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি মরিয়া ভূত হইয়াছেন।"

যমদূত বলিলেন,—"হাঁ! তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীটি আমার।"

আমি বলিলাম,—"এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুর যে রাঘব গাঙ্গুলির!"

যমদূত বলিলেন,—"হাঁ, এ পুষ্করিণী রাঘব গাঙ্গুলির বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন যে, আমার—সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছিল, বলিবেন?"

যমদূত বলিলেন,—"বলিব না কেন, বলিব! তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মত পেছলা-পিছলি কর! সে জন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাই হউক, শুন।"

ষষ্ঠ পর্ব : নেই-আঁকুড়ে দাদা

যমদূত বলিতেছেন,—নেই-আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ীর নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলাগাছে দিব্য একখানি আঙট পাতা রহিয়াছে। মনে মনে করিলেন যে, কা'ল এই আঙট পাতাখানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্মে, সেই রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে লইতে আসিলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল। সেই ঘরের ভিতর, সেই রাত্রিতে বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে লইয়া উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাণ্ডস মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাণ্ডসের প্রহারে জর-জর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে,—"হায় রে! যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম আমার এরূপ সাজা দিত? যমের কাণে সেই কথাটি প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাগি কি বলিতেছে?"

আমরা বলিলাম,—"বিধবা বলিতেছে যে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, যম কি করিয়া আমার এরূপ সাজা করিত।" যমের রাগ হইল। যম বলিলেন,—"নিয়ে আয় তো রে, ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে! দেখি কি করিয়া সে আপনার বোনকে বাঁচায়?" নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দশা হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম,—"চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কি সময় হইয়াছে?" আমরা বলিলাম;—"না, আপনার এখনও সময় হয় নাই, এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ী যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা করিয়া আপনি ফিরিয়া আসিবেন।" নেই-আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কথাটা কি? শুনিতে পাই না? যমের বাড়ী গিয়া তাহার ভগিনী কি বলিয়াছিলেন, আমরা সে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম, নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"বটে। আচ্ছা, চল যাই।" পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন,—"দেখ, এই স্থলে আমি একটি দেবালয় করিব মানস করিয়াছি।" আবার খানিক দূর গিয়া,—"এই স্থলে আমি একটি অতিথিশালা করিব, আমার এই ইচ্ছা।" আবার খানিক দূর গিয়া "সাধারণে জল পান করিবে বলিয়া এই জলাশয়টি আমি করিয়া দিয়াছি।" এইরূপ স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা, ঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন! যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম, যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম। যম বলিলেন,—"নেই-আঁকুড়ে শোন্, তোর বোন্ ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আঙট পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাণ্ডস মারতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমার এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্ধার কথা শুনিয়া তোরে আমি এখানে আনিয়েছি। কি করিয়া বোনকে বাঁচাইবি, বাঁচা!" নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"আমার পুণ্যের অর্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমার ভগিনীকে আপনি খালাস দিন।" নেই-আঁকুড়ের কি পুণ্য আছে দেখিবার নিমিত্ত যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতাপত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন,—"শুন্‌লি তো নেই-আঁকুড়ে, তোর এক ছটাকও পুণ্য নাই! বোনকে তার আবার ভাগ দিবি কি?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—"পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই সমুদয় দূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন!" যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম,—"হাঁ মহাশয়! পথে আসিতে আসিতে, এখানে দেবালয় করিবার মানস আছে, এখানে স্কুল করিবার মানস আছে, নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।" যম আরও রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"ভণ্ড! সে সকল কাজ তো তুই করিস্ নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কি হইবে?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—"আমার ভগিনী আঙটপাতে ভাত খাইয়াছিলেন, না কেবল মানস করিয়াছিলেন?" যম বলিলেন,—"মানস করিয়াছিল।" নেই-আঁকুড়ে বলিলেন,—"তবে?" যম বুঝিলেন। যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের মানস করিলেও পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইনি করিয়া তিনি বিধবার মাথায় ডাণ্ডস মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণু-দূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে

ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল, তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

সপ্তম পর্ব : এঁড়ে গরু

কর্তা-ভূত অর্থাৎ মিত্তির-জা বলিতেছেন,—যমদূতদিগের কাজ সারা হইলে পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমাকে খাড়া করিয়া দিল। যম সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতা পত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত। চারিদিকে শত শত বিকটমূর্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাণ্ডস, কাহারও হাতে সাঁড়াসী। পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। অনেক খাতা-পত্র উল্টাইয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—মহাশয়! ইহার পুণ্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই পাপ! অতি উৎকট উৎকট পাপ। ইহার মত মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার সময় এ যে চান্দ্রায়ণটি করে, তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কেবল মাথাটি নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছুমাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে এক বিন্দু পুণ্য আছে এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্বে এক জন ব্রাহ্মণকে একটি মর-মর এঁড়ে গরু দান করিয়াছিল। কিন্তু বাছুরটি ব্রাহ্মণের ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই; পথেই শুইল আর মরিল। মরিয়া সে এঁড়ে বাছুরটি এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন,—"কেমন হে মিত্তির-জা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুনলে তো! এখন তুমি কি করিতে চাও! তোমার যে রতিমাত্র পুণ্যটুকু আছে, আগে তাহার ফল ভোগ করিয়া লইতে চাও, না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও?"

আমি উত্তর করিলাম,—"মহাশয়! আপনার এখানে কিরূপ দস্তুর, কিরূপ আইনকানুন, তা তো আমি জানি না? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন, আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কি প্রকার হইবে? তার পর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোন্‌টি চাই।"

যম উত্তর করিলেন,—"সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট মহাপাতক করিয়াছ। সে জন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে। তোমার গলিত দেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে, অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে হইবে। অষ্টপ্রহর যমদূত তোমার মাথায় ডাণ্ডস মারিবে। সাঁড়াসী দিয়া যমদূতে তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে। বিধিমত তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চীৎকার করিবে। চিরকাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে, সামান্য একটু নাম মাত্র পুণ্য করিয়াছিলে, মরিবার পূর্বে সেই যে মর মর এঁড়ে বাছুরটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে, কেবল মাত্র এক দিনের জন্য সেই পুণ্যটুকুর ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গরুটি এখন এখানে আসিয়াছে। এক দিনের জন্য তাহারে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে; যা করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।"

আমি বলিলাম,—"পুণ্যের ফলটি আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের দণ্ড যাহা হয়, তাহার পর আপনি করিবেন।"

যম আজ্ঞা করিলেন,—"ওরে! মিত্তিরজার সেই এঁড়ে গরুটো আন্‌তো!"

এঁড়ে গরু আনিতে যমদূত সব দৌড়িল। এঁড়ে গরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থিচর্ম-সার এঁড়ে বাছুর নাই! আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না। যমপুরীতে অনেক খোল ভূষি খাইয়া বাছুরটি এখন বিপর্য্যয় এক ষাঁড় হইয়াছিল। লম্বা লম্বা বিপর্য্যয় দুই সিং! দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়! চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ! রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিতেছে। রাগে পা দিয়া মাটী চষিয়া ফেলিতেছে। কারে ঘুঁতাই, কারে মারি, সদাই এই মন! দুই দিকে দুই দাঁড় ধরিয়া চারি জন যমদূতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন,—"মিত্তির-জা! এই তোমার সেই এঁড়ে গরু! তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে।"

এঁড়ে গরুকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত যম আদেশ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সিং নীচে করিয়া, এঁড়ে গরু আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন হে এঁড়ে গরু! আজ আমি তোমাকে যা বলিব, তাই তুমি করিবে তো?"

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ! আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম,—"এঁড়ে গরু! তবে তুমি এক কাজ কর। তোমার একটি সিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটি সিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও, সমস্ত দিন দুই জনকে বন্‌ বন্‌ করিয়া চরকীর পাক খাওয়াও।"

লম্বোদর, গগন, আশুধারী মহাশয়, সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন,—"বাহবা! বাহবা! মিত্তির-জা! তুমি এক জন লোক বটে! কিন্তু নয়ান, মিত্তিরজা তোমাকে ঠিক কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তির-জা যে সিং দিতে বলিবেন, মিত্তির-জা তেমন পাত্র নন্‌। শরীরের অন্যস্থানে সিং দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভদ্রসমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধ হয় মিত্তির-জা তোমার নিকট আসল কথাটি গোপন করিয়াছিলেন।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"আমারও মনে সে সন্দেহটি উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডলের কথাটি বলেন, তখন মিত্তিরজা-ভূতের মুখে ঈষৎ একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, মিত্তিরজা-ভূত কি বলিতেছেন, তাহা শুনুন।"

মিত্তিরজা-ভূত বলিলেন,—আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গরু, যম ও চিত্তগুপ্তকে তাড়া করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতা-পত্র ফেলিয়া চিত্রগুপ্তও লাফাইয়া পড়িলেন। তার পর, এই দৌড়! দৌড়! প্রাণপণ যতনে দৌড়।

কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথা? এঁড়ে গরু না-ছোড়-বান্দা! যেখানে দৌড়িয়া পালান, সিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার এঁড়ে গরু গিয়া উপস্থিত হয়।

অষ্টম পর্ব : মিত্তিরজার পুণ্য।

কর্তা-ভূত বলিতেছেন,—যমপুরীর ভিতর কোনও স্থলে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্তঘূর্ণিত নয়নে এঁড়ে গরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দুই জনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিবলোকে যাইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু! ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে, সেখানেও এঁড়ে গরু! পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই জনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। সেখানে নারায়ণ শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদঘর্ম মুমূর্ষুপ্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে গরু বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইবে।

যম ও চিত্রগুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—"এ মানুষটি দেখিতেছি, সাধারণ মনুষ্য নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এ সব কাড়িয়া লইবে। দেশে দেশে আমাদিগকে ফকীর হইয়া বেড়াইতে হইবে। চল, আমরা এখন সকলে সেই সেই মানুষটির কাছে যাই।"

যম বলিলেন,—"দ্বারে সেই এঁড়ে গরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তির-জাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।"

নারায়ণ বলিলেন,—"তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এস। আমি এঁড়ে গরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবে না।"

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, এঁড়ে গরু সিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গরু বলিল,—"মহাশয়! আপনার বাটীতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিন্। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তির-জা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।"

সুমিষ্টভাবে নারায়ণ বলিলেন,—"এঁড়ে গরু! তুমি ব্যস্ত হইও না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। ঐ দেখ, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তির-জা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা মিত্তির-জা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁর কথা শুনিবে তো?"

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—"মিত্তির-জা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তির-জা যদি পুনরায় বলেন, না, ইহাদিগকে সিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁর কথা শুনিব না কেন? অবশ্য শুনিব।"

নারায়ণ বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস। সকলে চল, মিত্তির-জার কাছে যাই।"

নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত ; এইরূপে সকলে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গরু দুই চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পলায়।

মিত্তির-জা ভূত বলিলেন,—আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কি করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট যাহা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত-শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিও না যে, আমি—মিত্তির-জা, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পলাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূতদিগকে হুকুম দিলাম,—"যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্ত্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাশ কর।"

যমপুরীতে তৎক্ষণাৎ মহা-সমারোহ পড়িয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, পাপী খালাশ পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পূতিময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপিগণকে স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জ্বলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদিগের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম। শত শত কর্ম্মকার আনিয়া পাপীদিগের হস্ত পদের শৃঙ্খল কাটাইতে লাগিলাম। মর্ম্মভেদী কান্নার ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীতে আজ চারিদিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র পাপী গলবস্ত্র হইয়া, যোড়হাতে আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল,—"ধন্য মিত্তির-জা! শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আজ আপনার কৃপায় যমযন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম। না হইলে, নির্দয় যম আরও কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।"

সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে পাপিগণ এইরূপে আমার স্তবস্তুতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিত্তির-জা! এ কি বল দেখি? যমের উপর তোমার এত রাগ কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আজ্ঞে না! যমের উপর আর আমার আড়ি কি? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটি দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই যা! সে যা হউক, এখন আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। যে লোক লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে উদ্ধার করে, তার আবার পাপ কোথায়? তার পর,—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ধ্যানে পায় না, আজ সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর আমার পাপ কোথায় রহিল?"

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"না মিত্তির-জা! তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল। এঁড়ে গরুকে মানা করিয়া দাও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনরূপ অত্যাচার না করে।"

এঁড়ে গরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গরু আপনার গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম। যাইবার পূর্বে যোড়-

হস্তে নারায়ণের নিকট একটি প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া কিন্তু সুদর্শন চক্র ফোঁস করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতরে যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায়ে আমি পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়নচাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্বে আমি সে কাজটি করিয়াছিলাম?"

নারায়ণ বলিলেন,—ঈশ! করিয়াছ কি? সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-কাড়া পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও, শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়ন চাঁদের শীতলাটি ফিরিয়া দাও। আর, সকলকে গিয়া বল, যেন নয়নচাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।"

কি করিব? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটি লইয়া যাও যে, পুনরায় আমি বৈকুণ্ঠে গমন করি। এই বলিয়া মিত্তির-জা-ভূত আমার শীতলাটি আমাকে ফিরিয়া দিলেন।

নবম পর্ব : পরিশেষ

আন্ধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নয়ান! সেই যে আর একটি ভূত সেখানে বসিয়াছিল, সে ভূতটি কে? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ, করিয়াছিলাম! শুনি যে, সেটি নেই-আঁকুড়ে দাদার ভূত। মর্ত্যে আসিবার পূর্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, মিত্তির-জা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল?"

নয়ন বলিলেন,—"শীতলাটি হাতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটি সরু সরু বাঁশের সলার মত লম্বা হইল। তাহার পর হায়ুই-বাজির মত একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেল।"

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর তুমি কি করিলে?"

নয়ন বলিলেন,—"আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি এক গুণ পসার ছিল, এখন দশ গুণ পসার হইল। কালেজের সেই যারা এম এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। এক দিন লোক সব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বদজরদ্কি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম। টাকা-কড়ি ঘরে ধরে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মরসুমটি কমিয়া

গেল। সাহেবরা গণিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপ হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদেরও এক একটি শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয়। এস, একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া আপনার আপনার ঘরে যাই।"

সকলে মাটীতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন,—"হে মা কাটি-গঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়, ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ, ওঁ নমঃ।"

মুক্তা-মালা

কঙ্কাবতী, ফোক্‌লা দিগম্বর, ভূত ও মানুষ, পাপের পরিণাম
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেশিন-যন্ত্রে
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩৩১ সন।

প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্গের প্রসিদ্ধনামা লেখক পরলোকগত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় তেইশ বৎসর পূর্বে "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত তাঁহার "আদুরী ও আরসী" প্রভৃতি এগারটি গল্প একত্র করিয়া "মুক্তামালা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে শুধু গল্পগুলি খাপছাড়া ভাবে প্রকাশিত না করিয়া, একটা মূল গল্প রচনা করিয়া তাহার মধ্যে ঐ এগারটি গল্প, মূল গল্পের অংশ রূপে সন্নিবিষ্ট করেন, ফলে, "মুক্তামালা" গ্রন্থ এগারটি স্বতন্ত্র গল্পের পুস্তক না হইয়া ঐ এগারটি গল্পসমন্বিত একটি স্বতন্ত্র উপন্যাসে পরিণত হয়। ঐ গল্পগুলি যখন "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হয়, তখন ঐ গল্পগুলির অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছিল; তাহার পর উপন্যাস আকারে ঐ গল্পগুলি জুড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন "মুক্তামালা" গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন ঐ গ্রন্থেরও যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। এখন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও নাই, আর প্রায় তেইশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম সংস্করণ "মুক্তামালা" গ্রন্থও বাজারে নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঢং এর লেখাও বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনব, আর তাঁহার "মুক্তামালা" গ্রন্থও বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনব। বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন একটি অভিনব সামগ্রী এইভাবে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নিকট হইতে "মুক্তামালা" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের স্বত্ব ক্রয় করিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ "মুক্তামালা" প্রকাশ করিলাম। এখন আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই সুখী হইব।

ইতি—

বঙ্গবাসী আপিস,
কলিকাতা,
৭ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল।

প্রকাশক।

মুক্তা-মালা

সূচনা

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেব বাবু মজলিস করিয়া বসেন। সেই মজলিসে যাদব, মাধব, রাঘব, ত্রিলোচন, গদাধর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি বন্ধুগণ নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকেন। সেই মজলিসে সকলে গাঁজার ধূমপান করেন। মহাদেব বাবুর টাকায় সভার সমুদয় ব্যয় নির্বাহিত হয়। সুতরাং মহাদেব বাবু আড্ডার আড্ডাধারী, দলের দলপতি। সভায় সভ্যগণ সর্বদা তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করেন। ভালরূপে আজগুবি গল্প করিতে পারিলেই মহাদেব বাবুর সন্তোষভাজন হইতে পারা যায়। গাঁজার ধূম পান করিতে করিতে সভায় প্রতিদিন নানারূপ গল্প হয়।

বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পূর্বদিক হইতে ফুর ফুর করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

মহাদেব বাবু বলিলেন,—"এই দুর্যোগের সময় মজার দুই একটি গল্প না হইলে প্রাণ শিথিল হইয়া যায়। কাহারও তবিলে কি একটিও ভাল গল্প নাই?"

যাদব বলিলেন,—"কি গল্প শুনিতে ইচ্ছা করেন? একটা ভূতের গল্প করিব?"

মহাদেব বাবু উত্তর করিলেন,—"নূতন ধরণের ভূতের গল্প হয়, তো বল। পচা গল্প শুনিতে ইচ্ছা হয় না।"

হলধর বলিলেন,—"ভূতের গল্প, সাপের গল্প, বাঘের গল্প, চোর ডাকাতের গল্প, রাজা-রাণীর গল্প, যুদ্ধের গল্প, এ সব অনেক হইয়া গিয়াছে। নূতন আর কিছুই নাই।"

মহাদেব বাবু বলিলেন,—"সেকালের মত একালে আশ্চর্য্য ঘটনাও ঘটে না। আরব্য উপন্যাসের লোকে কত জিন্ দেখিতে পাইত। পঞ্চাশের উপর আমার বয়স হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত একটাও জিন্ কি একটাও পরী আমি দেখি নাই। সে জন্য আরব্য উপন্যাসের মত গল্পও আর একালে হয় না।"

রাঘব বলিলেন,—"একালে তেমন বাদশাও নাই, তেমন রাজাও নাই। বিক্রমাদিত্যের মত রাজা একালে থাকিলে, কত বত্রিশ সিংহাসন, কত বেতাল পঞ্চবিংশতি হইত।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"ভাল কথা বলিলে। একটি লোকের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে বাঁকুড়া হইতে আমাদের বাসায় একটি লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। প্রতিদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া সেই গল্প তিনি আমাদের নিকট করিয়াছিলেন। তাহার অনেক কথা আমি একখানি খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলাম। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাস কি বেতাল পঁচিশের গল্প। এ কলিকালে যে এরূপ ঘটনা হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস হয় না।"

আগ্রহ সহকারে সকলেই সেই গল্প শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঘনশ্যাম বাবুর মনে মনে গৌরব বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"না না, সে

মিথ্যা গল্প। লোকটা গল্পে'। তাহার কথা বিশ্বাস হয় না। সে গল্প শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

হলধর বলিলেন,—"যদি বেতাল পঁচিশের মত গল্প হয়, তাহা হইলে এই বাদলার সময় বড়ই মিষ্ট লাগিবে। বল না, ভাই ঘনশ্যাম! সে কি গল্প?"

ঘনশ্যাম উত্তর করিলেন,—"সে কাজের গল্প নহে। সে লোকটা হয় তো গাঁজাখোর। তাহার গল্প শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

রাঘব বলিলেন,—"আমরাই কোন্ গাঁজাখোর নই! গাঁজাখোরের গল্প গাঁজাখোরকেই ভাল লাগে।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"গাঁজাখোর বলিলাম বটে, কিন্তু গাঁজা খাইতে তাহাকে আমি কখন দেখি নাই। গুড়ুকটী পর্য্যন্ত সে খায় না। তবে তাহার নিজের মুখেই আমি শুনিয়াছি যে, সে একবার পাগল হইয়া গিয়াছিল। পাগলের গল্প শুনিয়া কি হইবে?"

যাদব বলিলেন,—"তা হউক! পাগলের গল্পই আমরা শুনিব।"

এইরূপে সকলে অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু ঘনশ্যাম সে গল্প বলিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নিরাশ হইয়া সকলে অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তখন ঘনশ্যাম বাবুর ভয় হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সকলে যখন আরও অনেক সাধ্য-সাধনা করিবে, তখন তিনি গল্প আরম্ভ করিবেন। এখন আর কেহ অনুরোধ করিল না দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল যে, পাছে গল্পটি বলা না হয়। তিনি ভাবিলেন, আর একবার অনুরোধ করিলেই আমি গল্প করিব।

কিন্তু সে অনুরোধ কেহই আর করিল না। তখন ঘনশ্যাম বাবুকে নিজেই সেই কথা পুনরুত্থাপন করিতে হইল। তিনি বলিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় যে গল্পটি করিয়াছিলেন, আমাকে তাহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তোমাদের ভাল লাগিবে কি না, সেই ভয়ে আমি বলিতে সাহস করি নাই।"

আড্ডাধারী মহাদেব বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। গম্ভীর স্বরে এখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় কে?"

ঘনশ্যাম উত্তর করিলেন,—"সেই বাঁকুড়ার লোক, যিনি আমাদের নিকট তাঁহার অদ্ভুত জীবন-বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস মানভূম জেলা। কিন্তু এখন তিনি বাঁকুড়া জেলায় শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। তিনি লেখাপড়া জানেন। ইংরাজিতে দুই একটা পাশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাহিনী শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঠিক আরব্য উপন্যাস কি বেতাল-পঁচিশের গল্প।"

মহাদেব বাবু বলিলেন,—"গল্পটি যদি এত ভাল, তবে বলই না কেন, ছাই! কিন্তু সকলে যতই তোমায় অনুরোধ করিল, ততই যেন তোমার লেজ মোটা হইয়া উঠিল।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"আপনার যখন শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তখন নিশ্চয় আমি বলিব। কিন্তু এ একটি গল্প নয়। আরব্য উপন্যাসের মত অনেকগুলি গল্প। দিনারজাদির মত আজ সূচনা করিয়া রাখি। তাহার পর আমার খাতাখানি আনিয়া প্রতিদিন কিস্তিবন্দি করিয়া কিছু কিছু বলিব।"

মহাদেব বাবু সে কথায় সম্মত হইলেন। ঘনশ্যাম বাবু গল্প আরম্ভ করিলেন।

ঘনশ্যাম বাবু বলিলেন,—"যাঁহার নিকট আমি এ গল্প শুনিয়াছি, তাঁহার নাম সুবল গড়গড়ি। আমার নিজের কথায় আমি এ গল্প করিব না; গড়গড়ি

মহাশয় যে ভাবে আমাদের বাসায় বলিয়াছিলেন, আমিও সেই ভাবে তাঁহার কথায় গল্পটি করিব।"

প্রথম রজনী : গড়গড়ি মহাশয়

গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন,—

আমার নাম সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। আমাদের বাড়ী মানভূম জিলার সামান্য একখানি গ্রামে। আমাদের গ্রামের নিকট অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। নিকটে বনও আছে। সেই বনে পূর্বে অনেক ব্যাঘ্র ও ভল্লুক বাস করিত। কখন কখন বন্য হস্তীরও উপদ্রব হইত। গ্রামের নিকট আমাদের কিছু সম্পত্তি ছিল। আমাদের নিজের চাষবাসও ছিল।

সেই জন্য সেই সামান্য স্থানে আমরা সম্পত্তিশালী লোক বলিয়া পরিগণিত ছিলাম। পুরুলিয়ার জিলাস্কুলে প্রথম আমি বিদ্যা-শিক্ষা করি। সে স্কুল হইতে পাশ দিয়া, কলিকাতার কলেজে আমি অধ্যয়ন করি। কলিকাতায় কলেজ হইতে আর একটা পাশ দিলাম। ইহার কিছু দিন পরেই আমার পিতার পরলোক হইল। সে জন্য আর আমার লেখাপড়া হইল না। পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত আমাকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

সে সময় সংসারে আমার মাতা, আমার পরিবার ও এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম অক্রুর ছিল, কিন্তু তাহাকে আমরা "ওক্কুর" বলিয়া ডাকিতাম। যখন পিতার পরলোক হয়, তখন ভ্রাতার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। কনিষ্ঠকে আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। মাতাঠাকুরাণীরও সে চক্ষুর পুত্তলিস্বরূপ ছিল। আমার পরিবারও তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

বাঁকুড়া জিলায় কুতুবপুর নামক গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। এক্ষণে সেই স্থানে আমি বাস করিতেছি। আমার শ্বশুরের পুত্র অথবা অন্য কন্যা ছিল না। আমার পিতার পরলোকের পাঁচ বৎসর পরে আমার শ্বশুর মহাশয়ও ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি আমার স্ত্রী পাইলেন। এই সম্পত্তি পাইয়া আমি মনে করিলাম যে, নিজে আমি ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারি নাই; কনিষ্ঠ ওক্কুরকে ভালরূপে লেখাপড়া শিখাইব। এইরূপ মনন করিয়া আমি তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া ভাল একটি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কলিকাতায় যাহাতে সে পরম সুখে দিনযাপন করিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পুনরায় আমি দেশে প্রত্যাগমন করিলাম।

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ভ্রাতার লেখাপড়া বিষয়ে আমি বড়ই নিরাশ হইলাম। তাহার এখন যেরূপ বয়স, তাহাকে তিনটা পাশ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে একটিও পাশ দিতে পারিল না। পূজা ও গ্রীষ্মের অবকাশে যখন সে বাটী থাকিত, তখন তাহার কথা-বার্তায় আমি সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। তাহার চরিত্র-বিষয়েও ক্রমে দুই একটা কথা আমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। কলিকাতার খরচের নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা প্রতি মাসে তাহাকে আমি দিতাম। কিন্তু ক্রমে আমি শুনিতে পাইলাম যে, তাহা ব্যতীত মাঝে মাঝে সে গোপনভাবে মাতার নিকট হইতে আরও অনেক টাকা লইত। এই কথা শুনিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে অনেক বুঝাইলাম। টাকা যে সে অপব্যয় করে নাই, তাহার প্রমাণ স্বরূপ সে আমাকে

অনেক প্রকার হিসাব দেখাইল। কিন্তু সে যে আমাকে মিথ্যা কথা বলিতেছে, আর তাহার চরিত্র যে নিষ্কলংক নহে, এখন তাহা আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম। আমি মনে করিলাম যে, ইহার লেখা-পড়া আর হইবে না, ইহাকে আর কলিকাতায় রাখা উচিত নহে। দেশে লইয়া গিয়া শীঘ্রই ইহার বিবাহ দিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি তাহাকে দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। কলিকাতায় থাকিয়া এখন হইতে যত্ন করিয়া লেখা-পড়া শিখিবে, আমার নিকট বার বার সে এইরূপ অঙ্গীকার করিল। অগত্যা একেলাই আমি দেশে প্রত্যাগমন করিলাম।

বাটী গিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তাহার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে আমাদের মাতাঠাকুরাণীর পরলোক হইল। সুতরাং বিবাহ বিষয়ে অন্ততঃ এক বৎসর কাল বিলম্ব হইয়া গেল। মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে কনিষ্ঠকে দেশে আনাইলাম। তাহার চাল-চলন দেখিয়া আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলাম। মনে করিলাম যে, আর তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইব না। মিষ্ট বাক্যে তাহাকে অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু সে আমার কথা শুনিল না। আমার অমতেই কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কলিকাতায় আমার দুই তিনটি বন্ধু ছিলেন। আমার ভ্রাতার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিতে তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিতেন। সেই সমুদয় পত্রে ক্রমাগতই মন্দ সংবাদ আসিতে লাগিল। আমার ভ্রাতার চরিত্র দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ভ্রাতাও আমার নিকট ক্রমাগত টাকা চাহিতে লাগিল। এত দিন মাতার নিকট হইতে গোপনে টাকা লইয়া সে অকুলান কুলান করিত। এখন মাতা নাই। টাকার নিমিত্ত আমাকে না লিখিলে আর উপায় নাই। প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে নানারূপ ওজর করিয়া সে আমার নিকট টাকা চাহিত। কখন পীড়া হইয়াছে, কখন চুরি গিয়াছে, কখন টাকা হারাইয়া গিয়াছে, পুস্তক কিনিতে হইবে, কাপড় কিনিতে হইবে,—অন্যায় খরচের নিমিত্ত টাকা আবশ্যক হইলে প্রথম প্রথম এইরূপ নানা প্রকার ওজর করিয়া সে আমাকে চিঠি লিখিত। কিন্তু ক্রমে তাহার সে ভয় দূর হইল। পৈতৃক বিষয়ের সে এক জন অংশীদার, অর্ধাংশের উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেই টাকা লইয়া সে যাহা ইচ্ছা করিবে,—ক্রমে ক্রমে সে আমাকে এইরূপ অসম্মানসূচক পত্র লিখিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য যে, এইরূপ পত্র পাইয়া প্রথম আমি যার-পর-নাই আশ্চর্য্য হইলাম ও তাহার পর ঘোরতর দুঃখিত হইলাম। ভ্রাতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত আমি কলিকাতায় আসিলাম। সে স্থানে আসিয়া আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু সে আমার মুখের উপর উত্তর করিতে লাগিল। যাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করি, যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, সে আমার সহিত এইরূপ কথাবার্তা করিতে লাগিল, এ দুঃখ কি আর রাখিবার স্থান আছে। ভ্রাতাকে কত বুঝাইলাম, কত মিনতি করিয়া তাহাকে বলিলাম। কিন্তু আমার কথা অপেক্ষা তাহার বন্ধুদিগের কথা তাহার নিকট অধিক হইল। দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তাহার হাত ধরিলাম। আমার হাত ছাড়াইয়া সে বাসা হইতে চলিয়া গেল।

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় এইরূপে আমাদের নিকট তাঁহার জীবন-বিবরণ প্রদান করিতে লাগিলেন। আজ রাত্রি হইয়াছে, আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক। কাল আমার খাতা লইয়া আসিব। যতদূর হয়, কাল পুনরায় গড়গড়ি মহাশয়ের গল্প করিব।"

দ্বিতীয় রজনী : গুরুদেব

শরদিন ঘনশ্যাম পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন।

গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন :—

যদিও আমি নিজে এ পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করি নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত শ্রীল গোলক চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের বংশের গুরুদেব। ঠাকুর মহাশয়ের বাটী আমাদেরই গ্রামে। কিন্তু তিনি বার মাস কলিকাতাতেই থাকিতেন, কেবল প্রতি বৎসর পূজার সময় এক মাসের জন্য দেশে গমন করিতেন। আমি মনে করিলাম যে, কনিষ্ঠকে বুঝাইবার নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয়কে অনুরোধ করি। ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে একটি হোটেল করিয়াছিলেন। হোটেলের কাজে তাঁহার লাভ হয় নাই। এক্ষণে তিনি পাঁঠার দোকান করিয়াছেন। সন্ধান করিয়া আমি সেই পাঁঠার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাস্তার ধারেই দোকান। সেই দোকানে দুইটি ছাড়ানো ছাগল ঝুলিতেছিল। ঠাকুর মহাশয় তখন ব্যস্ত ছিলেন। এক জন খরিদদারকে তখন তিনি আধসের মাংস বিক্রয় করিতেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছিলেন যে, সে মাংস টাট্‌কা। খরিদদার বলিতেছিল যে, সে মাংস বাসি। খরিদদার বলিল যে, সে খাসি; ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, সে পাঁঠা। খরিদদার বলিল যে, পিঠের দাঁড়ার মাংস ভাল, সেই মাংস আমি লইব; ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, পাঁজরার মাংস ভাল, তাহাই লইয়া যাও।

মাংস লইয়া খরিদদার প্রস্থান করিলে, ঠাকুর মহাশয়কে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। ঠাকুর মহাশয়ের দক্ষিণ পদ কিছু স্থূল ছিল, অর্থাৎ সে পায়ে গোদ ছিল। সেই স্থূল পাদপদ্মটি তিনি আমার মস্তকে তুলিয়া দিলেন। গোদের গ্যাঁজ হইতে রস প্রবাহিত হইয়া আমার মস্তক সিক্ত হইল, দুই চারি ফোঁটা আমার চক্ষুর উপর দিয়া বহিয়া গেল। নানারূপ আশিস্ বচনে সম্ভাষণ করিয়া ঠাকুর মহাশয় আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইলেন। একখানি খোলার বাটীতে ঠাকুর মহাশয়ের দোকান ছিল। পথের ধারেই দোকান। তাহার পশ্চাতেই ভিতর দিকে খোঁয়াড়। সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অনেকগুলি ছাগল ছিল। খোঁয়ারটি দিন দুই প্রহরেও অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে। সে নিমিত্ত কিরূপ ছাগল ও কতগুলি ছাগল তাহার ভিতর ছিল, প্রথম তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। খোঁয়াড়ের পশ্চাতে, বাটীর সর্বশেষে, আর একখানি ঘর। সেই ঘরে ঠাকুরমহাশয় রন্ধন ও শয়ন করেন। এই ঘরখানির সম্মুখে একটি বারেণ্ডা ও তাহার পর একটু উঠান ছিল। সে জন্য খোঁয়াড়ের ন্যায় এ স্থানে অন্ধকার ছিল না। ঠাকুর মহাশয় সেই বারেণ্ডায় আমাকে বসাইলেন। কলিকাতার ও দেশের নানারূপ কথার পর, আমার ভ্রাতার কথা গুরুদেবকে আমি বলিলাম। কিন্তু গুরুদেব আমার সে কথায় বড় কান দিলেন না। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিলেন, আমার ভ্রাতার পক্ষে তাহা তিনি বলিলেন। "সে বিশেষ কোন মন্দ কাজ করে নাই, বয়সকালে এইরূপ সকলেই করিয়া থাকে, বড় হইলে তাহার চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে," এইরূপ ভ্রাতার পক্ষ হইয়াই তিনি আমাকে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় আমি ইতি পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার ভ্রাতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক; আমার ভ্রাতার ইয়ার তিনি নহেন। কিন্তু অনেকগুলি খোলার-বাটী-নিবাসিনীদিগের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের আলাপ পরিচয় ছিল; কারণ, তাহাদের বাটী ফলাহার করিয়া তিনি বাসা-খরচ বাঁচাইতেন ও দক্ষিণা গ্রহণে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করিতেন। আমি শুনিয়াছিলাম যে ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে দুই এক জন খোলার-বাটী-নিবাসিনীর সহিত আমার

ভ্রাতার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। এক্ষণে আমার মনে সন্দেহ হইল যে, ওঙ্কর যে ভাবে চলিতেছে, সেই ভাবে চলিলে গরুদেবের লাভ আছে, নিতান্ত অলাভ নাই। কথোপকথন করিতে করিতে খোঁয়াড়ের ভিতর হইতে ছাগলদিগের কাতরতাসূচক চীৎকার আমি বার বার শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া এখন আর আমার ততটা অন্ধকার বোধ হইল না। আমি দেখিলাম যে, ছাগলগুলি অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। খোঁয়াড়ে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তাহার ভিতর দশটি ছাগল ধরে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠেশা-ঠেশি করিয়া ঠাকুর মহাশয় পঁচিশটির অধিক ছাগলে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে গায়ে গায়ে ঠেশা-ঠেশি করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, শয়ন করিবার স্থান একেবারেই ছিল না।

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর মহাশয়! আপনার ছাগলগুলির বোধ হয় বড় জল-পিপাসা পাইয়াছে।"

গরুদেব উত্তর করিলেন,—"দুই একদিনে সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে। জল দিবার আর আবশ্যক নাই।"

আমি বলিলাম,—"উহাদের ক্ষুধাও বোধ হয় পাইয়াছে।"

গরুদেব বলিলেন,—"ক্ষুধা নিশ্চয় পাইয়াছে। আজ তিন দিন উহাদিগকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উহাদিগকে কি খাইতে দেন?"

গরুদেব উত্তর করিলেন,—"খাইতে! খাইতে আবার কি দিব! খাইতে দিলে আর ব্যবসা চলে না।"

আমি বলিলাম,—"এরূপ কয় দিন ইহারা অনাহারে থাকে?"

গরুদেব বলিলেন,—"সাত আট দিনের অধিক উহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় না। সাত আট দিনের মধ্যেই এক এক খেপ শেষ হইয়া যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"একটু একটু জল পান করিতে দেন না কেন?"

গরুদেব উত্তর করিলেন,—"উহারা গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। পিপাসায় উহাদের জ্ঞান নাই। জল দিলে বড়ই গোলমাল করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে এ সাত আট দিন একটু জল পর্য্যন্ত উহারা পায় না?"

গরুদেব বলিলেন,—"পূর্বে দুই এক দিন অন্তর এক আধ কলসী জল দিতাম। কিন্তু জল দেখিলে তাহা পান করিবার নিমিত্ত বড়ই হুড়াহুড়ি করে। সে জন্য আর দিই না।"

খোঁয়াড়ের দিকে একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এগুলি কি খাসি?"

গরুদেব উত্তর করিলেন,—"খাসি! খাসি কোথায় পাইব! খাসির দাম দিবে কে? দুই পয়সা উপার্জন হইবে বলিয়া ব্যবসা করিতেছি। খাসির মাংস দিলে কি আর চলে!"

আমি বলিলাম,—"পাঁঠাও তো নয়।"

গরুদেব বলিলেন,—"পাঁঠা! তুমি পাগল! পাঁঠার দাম কত! লোককে দেখাইবার নিমিত্ত কেবল তিন চারিটা পাঁঠা রাখিয়াছি। বাকিগুলি পাঁঠী।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পাঁঠী! স্ত্রী পশু না খাইতে নাই?"

গরুদেব উত্তর করিলেন,—"আমি নিজে খাই না, আমি বিক্রয় করি। আমার শিষ্য যজমান আছে। মাছ-মাংস একেবারেই আমি খাই না। সকলেই

জানে যে, গোলক চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণ। লেখা-পড়া জানি না, নিজের নামটিও সই করিতে পারি না, ঢেরা দিয়া সারি। তবুও দেখ, এই নিষ্ঠার জন্য তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে সকলেই আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।"

আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাহিরে এক জন খরিদদার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহিরে গমন করিলেন। খরিদদারের সহিত তাঁহার কথা-বার্তায় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে পাঁঠার মাংস ভিন্ন অন্য মাংস লইবে না; পাঁঠা তাহাকে দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য সে অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। খোঁয়াড়ের ভিতর যে তিন চারিটি পাঁঠা ছিল, তাহার একটিকে ঠাকুর মহাশয় অনেক কষ্টে বাহির করিয়া খরিদদারকে দেখাইলেন। ক্রেতার তাহা মনোনীত হইল। তাহার পর ঠাকুর মহাশয় সেই পাঁঠাকে বাটীর ভিতর আনিলেন। যে স্থানে আমি বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে দুইটি খোঁটা ভূমিতে প্রোথিত ছিল। পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক্ হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। সে চক্ষু দুইটির ভাব এখনও মনে হইলে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়া উঠিলাম,—"ঠাকুর মহাশয়! ঠাকুর মহাশয়! করেন কি? উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথম উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।"

ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন,—"চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথমে বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা! দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।"

ঠাকুর মহাশয় এইরূপ বলিতে লাগিলেন, আর ও দিকে তাঁহার হাত চলিতে লাগিল। সিদ্ধহস্ত! শীঘ্রই অনেক চর্ম তিনি তুলিয়া ফেলিলেন। আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—"আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে, মাথার উপর ভগবান্ কি নাই!"

আমি এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতাকে পুনর্বার আমি অনেক বুঝাইলাম ও তাহাকে দেশে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে আমার সহিত দেশে গমন করিল না। নিরাশ হইয়া পর দিন আমি একেলাই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলাম। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন পরে শুনিলাম যে,

যে দিন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছিল, ঠিক তাহার পরদিন পুনরায় যখন তিনি ঐরূপ চর্মোত্তোলন-কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময় পুলিশের লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ইতিপূর্বে এই কাজের নিমিত্ত তাঁহার আরও তিনবার জরিমানা হইয়াছিল। সে জন্য এবার তাঁহার কিছু অধিক অর্থ দণ্ড হইল।

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন পরে গুরুদেব দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া তিনি সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, জীবন্ত ছাগলের চর্ম উত্তোলন বিষয়ে আমিই কলিকাতার পুলিশের নিকট সংবাদ দিয়াছিলাম, আমা হইতেই তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে। লোকের নিকট এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলাম। কিন্তু কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিল না। সকলেই আমাকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলেই বলিল যে, যে লোক গুরুর সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার মত পাষণ্ড আর জগতে নাই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঘনশ্যাম সে রাত্রি গল্প বন্ধ করিলেন। পরদিন পুনরায় তিনি সেই গল্প আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় রজনী : পায়ে বেড়ি

গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন :—

টাকার জন্য ভ্রাতা আমাকে বার বার পত্র লিখিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, ভ্রাতাকে কলিকাতায় থাকিতে দিলে তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে। সে নিমিত্ত আমি তাহার খরচের টাকা বন্ধ করিয়া দিলাম। ভ্রাতা প্রথম প্রথম আমাকে মান-সম্ভ্রমের সহিত পত্র লিখিত; তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার পত্র তীব্র ভাব ধারণ করিল। "এক্ষণে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, পৈতৃক টাকা লইয়া সে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে, পৈতৃক টাকার হিসাব না দিলে সে আমার নামে নালিশ করিবে"—অবশেষে সে আমাকে এইভাবে পত্র লিখিতে লাগিল। এরূপ পত্রের আমি কোন উত্তর দিলাম না, তাহার নিকট টাকাও পাঠাইলাম না। মনে করিলাম যে, অর্থাভাবে নিশ্চয় তাহাকে দেশে আসিতে হইবে। তখন তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে আমি সংসারী করিব। এইরূপ ভাবিয়া আমি একটি সুপাত্রী স্থির করিয়া রাখিলাম।

কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ দেশে প্রত্যাগমন করিল। বিবাহ করিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে বার বার অনুরোধ করিলাম। কিন্তু আমার কথা সে কিছুতেই শুনিল না। টাকা-কড়ি সম্বন্ধে ক্রমাগত সে আমার সহিত কলহ করিতে লাগিল। সে বালক থাকিতে পৈতৃক সম্পত্তির কিরূপ আয় ছিল, সে টাকা কিরূপে ব্যয় হইয়াছিল, সেই হিসাবের নিমিত্ত সে আমাকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিল! এই সময় পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে তাহার অংশের কিছু নগদ টাকা আমার নিকট জমা ছিল। আমি দেখিলাম যে, সে টাকা তাহার হাতে পড়িলে আর রক্ষা থাকিবে না। বিশেষতঃ দেশে আসিয়াই যত দুষ্ট লোকের সহিত তাহার সৌহৃদ্য হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, আমাদের গুরুদেবের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এক দিন ভ্রাতাকে আমি বলিলাম,—"ওক্কুর! দেখ ভাই! আমার পুত্র-কন্যা কিছুই নাই। পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন স্নেহের বস্তু আমার আর কেহ নাই। পৈতৃক যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় তোমার। তাহার পর, আমার শ্বশুরের যে সম্পত্তি আমার স্ত্রী পাইয়াছে, তাহাও পরে তোমার হইবে। পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব এই মুহূর্তে আমি তোমাকে

কড়ায়-গণ্ডায় দিতে পারি। কিন্তু ভাই! পাছে তুমি টাকা অপব্যয় কর ও পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট কর, সে জন্য এক্ষণে হিসাব দিতে আমি আপত্তি করিতেছি। তুমি বিবাহ কর। তোমার দুই একটি পুত্র-কন্যা হউক। তখন সমুদয় হিসাব তোমাকে আমি বুঝাইয়া দিব।"

বলা বাহুল্য যে, আমার সেরূপ কথায় ওঙ্কর সন্তুষ্ট হইল না। আমার নামে সে নালিশ করিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া তখন সে বাটী হইতে চলিয়া গেল। দুই চারি দিন সে আর বাটী আসিল না। এক দিন দুই প্রহরের সময় তাহার কতকগুলি বন্ধুর সহিত সে বহীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া সে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল ও আমার প্রতি নানারূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া সে বলিল,—"অন্য সম্পত্তি বিভাগের নিমিত্ত পরে আমি আদালতে নালিশ করিব। কিন্তু আমার অংশের যে নগদ টাকা তোমার নিকট আছে, তাহা এই মুহূর্তে তোমাকে দিতে হইবে। তাহা না দিলে তোমাকে আমি অপমান করিব।"

সেই মুহূর্তে আমি তাহার টাকা ফেলিয়া দিলাম। পিতার মৃত্যুর দিন হইতে হিসাব-পত্রও তাহাকে আমি দেখাইতে চাহিলাম। কিন্তু হিসাবের প্রতি সে কটাক্ষও করিল না। অনেকগুলি নগদ টাকা হাতে পাইয়া বন্ধুদিগের সহিত তৎক্ষণাৎ সে প্রস্থান করিল। সেই দিন আমি আমার গৃহিণীকে বাঁকুড়া জিলায় তাঁহার পিত্রালয়ে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

ইহার পর তিন চারি মাস কনিষ্ঠের আর দেখা নাই। লোকপরম্পরায় শুনিলাম যে, টাকা পাইয়া দুই চারিজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সে কলিকাতায় গমন করিয়াছে।

এক দিন আমি নিকটস্থ একখানি গ্রামে প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলাম। বাটী ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়াছিল। বৃহৎ একটি মাঠ দিয়া আমি আসিতেছি, এমন সময় মানুষের অতি মৃদু কাতর স্বর আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সেই কাতর স্বর অনুসরণ করিয়া নিকটে গিয়া আমি দেখিলাম যে, মাঠের মাঝখানে এক গাছতলায় একটি লোক পড়িয়া আছে। আমি নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে সে আমার নিকট একটু জল প্রার্থনা করিল। কিছুদূরে একটী পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীতে আমার চাদর ভিজাইয়া সেই জল আনিয়া আমি তাহাকে পান করাইলাম। লোকটির কথায় বুঝিতে পারিলাম যে, সে পশ্চিমদেশীয় খোট্টা। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সে আমাকে বলিল যে,—"তাহার নিবাস জৌনপুর জিলা। পত্নীর সহিত পদব্রজে সে জগন্নাথ গিয়াছিল। সে স্থান হইতে সে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পথে বিসূচিকা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহার পত্নীর পরলোক হয়। জগন্নাথেই তাহাদের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল। ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে তাহারা পথ পর্য্যটন করিতেছিল। যে পথে সচরাচর যাত্রী গমনাগমন করে, সে পথে লোকে বড় ভিক্ষা প্রদান করে না। সে জন্য সে এই গ্রাম্য পথ অবলম্বন করিয়াছিল। সেই দিন প্রাতঃকালে এই মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সে-ও সহসা বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়াছে। চলিবার শক্তি তাহার নাই। পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।"

বিদেশী লোকটির জন্য আমার মনে অতিশয় দুঃখ হইল। আমি দেখিলাম যে, রোগে তাহার মৃত্যু না হউক, মাঠের মাঝখানে জীয়ন্ত অবস্থাতেই সেই রাত্রিতে তাহাকে শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে। তাহার পর সেই অনাথ নিঃসহায় ব্যক্তি পিপাসায় একটু জলের জন্য কতই না যন্ত্রণা ভোগ করিবে! সে অবস্থায় আমি তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিলাম না। তাহাকে আমি বুকে তুলিয়া লইলাম। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে আমার বাটীর দিকে অগ্রসর হইলাম। অনেক

রাত্রিতে আমি বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরের একটি চালায় লোকটিকে রাখিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে এক হাতুড়ে ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলাম। কিন্তু তিনি আমার ভ্রাতার ইয়ার। তিনি আসিলেন না। অন্য যাহা কিছু ঔষধ পাইলাম, লোকটিকে তাহাই সেবন করাইলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না। দুই দিন পরে সেই অনাথ হিন্দুস্থানী আমার বাটীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

তাহার সৎকারের নিমিত্ত আমি প্রতিবাসীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু কেহই আসিলেন না। বরং গ্রামের সকল লোকেই আমার উপর খড়্গহস্ত হইলেন। সকলে বলিলেন,—"সুবল উন্মাদ পাগল হইয়াছে। তাহা না হইলে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত, অজ্ঞাতকুলশীল, একটা খোট্টাকে বাটী আনিবে কেন? সে নিজে পাগল হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রামের ভিতর বিসূচিকা আনিয়া সে আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করে কেন?"

গ্রামের লোক যে নিতান্ত অন্যায় কথা বলিল, তাহা নহে। বরং আমি নিজেই যে অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি করিব? সেই অনাথ লোকটিকে সে অবস্থায় মাঠের মাঝখানে ফেলিয়া আসিতে আমি পারি নাই।

আমার এক জন প্রজার একখানি গরুর গাড়ী ছিল। সেই গরুর গাড়ীতে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া আমি একলাই তাহাকে দাহ করিলাম।

পরদিন আমি এক জন প্রতিবাসীর গৃহে গমন করিয়াছিলাম। তিনি তামাক খাইয়া আমাকে বলিলেন,—"সুবল ভায়া! তামাক ছাড়িয়া দিয়াছ, না?"

ইহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম,—"তামাক ছাড়িয়া দিব কেন?"

যাহা হউক, তিনি আমাকে হুঁকা দিলেন না, নিজেই ধূমপান করিয়া হুঁকাটি রাখিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—"যে লোকটিকে তুমি বাটী আনিয়াছিলে, যাহার শব তুমি দাহ করিয়াছ, সে কি জাতি তাহার কিছুই ঠিক নাই। এ কথা লইয়া গ্রামে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অন্য লোক দূরে থাকুক, তোমাদের ঠাকুর মহাশয়ও তোমার বাটীতে আর জলগ্রহণ করিবেন না।"

ফল কথা, সেই দিন হইতে গ্রামে আমি এক ঘরে হইলাম। ক্রমে শুনিলাম যে, আমাদের ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগেই সকলে আমাকে এক ঘরে করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গ্রামবাসীদিগের বাটীতে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার বাটীতেও কেহ আসিতেন না। সেই দিন হইতে আমি তামাক ছাড়িয়া দিলাম।

কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, আমার ভ্রাতা দেশে আসিয়াছে। গ্রামে এক বন্ধুর বাটীতে সে অবস্থিতি করিতেছে। আরও শুনিলাম যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের নিমিত্ত সে আদালতে নালিশ করিবে। আমার নিকট হইতে যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমাখরচের নিমিত্ত সে তাহার অংশ বন্ধক দিবে। এইরূপ কথা শুনিয়া আমি ভ্রাতার নিকট বলিয়া পাঠাইলাম যে,—"সম্পত্তি বিভাগের নিমিত্ত মকদ্দমা করিবার প্রয়োজন কি? গ্রামের দুই এক জন ভদ্রলোককে সে মধ্যস্থ মনোনীত করুক। তাঁহারা যেরূপ বিভাগ করিয়া দিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত হইব। অথবা সে, না হয়, নিজেই বিভাগ করুক। তাহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ অংশ সে আমাকে প্রদান করুক। তাহাতে আমি কিছুমাত্র আপত্তি করিব না।"

ভ্রাতার নিকট হইতে আমার এ প্রস্তাবের কোনরূপ উত্তর পাইলাম না।

পাঁচ দিন পরে, এক দিন সন্ধ্যার সময় বাটীর ভিতর আমার ঘরে বসিয়া আমি পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম। সহসা সাত আট জন লোকের সহিত আমার ভ্রাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহারা আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। আমি চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কাপড় দিয়া তাহারা আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর, আমাকে শয়ন করাইয়া তাহারা আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল ও সেই মুণ্ডিত মস্তকে ও ঘাড়ে কাগজের মত কি বসাইয়া দিল। অবশেষে আমার পদদ্বয় তাহারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। কিছুক্ষণ পরে আমার মস্তক ও ঘাড় অতিশয় জ্বলিতে লাগিল। সে স্থানে হাত দিতে পারিলে আমার যাতনার অনেক শান্তি হইত। কিন্তু তাহারা আমার হাত বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। শরীরের কোন স্থান চুলকাইতে অথবা কোন স্থানে বেদনা হইলে সে স্থানে হাত দিতে না পারিলে যে কি বিষম কষ্ট হয়, তাহা যে ভুগিয়াছে সেই জানে। কিছুক্ষণ পরে আমার বোধ হইল যে, তাহারা আমার মস্তক ও ঘাড়ে বেলেস্তারা দিয়াছে, কারণ, সেই দুই স্থানে বড় বড় দুইটি ফোস্কা হইয়াছে বলিয়া আমার অনুভব হইল। রাত্রি দুই প্রহরের পর তাহারা আমার মুখ খুলিয়া দিল। তখন আমি আমার ভ্রাতাকে ডাকিলাম। ভ্রাতা ঘরের বাহিরে ছিল, কিন্তু আমার নিকট আসিল না। আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের কারণ কি, তখন আমি আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

নিকটস্থ গ্রামের সেই যে হাতুড়ে ডাক্তারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, তিনি এই গুণ্ডাদের মধ্যে ছিলেন, আর তিনিই আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঘাড়ে ও মাথায় বেলেস্তারা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"মহাশয়ের মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়াছে। চিকিৎসার নিমিত্ত আপনার ভ্রাতা আমাকে আনিয়াছেন। ভয় নাই, আপনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। তবে আপনার এই উন্মত্ততা কিছু গুরুতর। আরোগ্য লাভ করিতে কিছু বিলম্ব হইবে। এইরূপ উন্মত্ততার গুণ এই যে, উন্মাদের মনে মানুষ খুন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। সে জন্য মহাশয়কে বন্ধন করিয়া রাখিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাকে আপাততঃ কিছু কষ্ট দিতে বাধ্য হইতেছি।"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি উন্মত্ত! আমি পাগল! আমার উপর এ অত্যাচার কেন? মা'র পেটের ভাই হইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের উপর কেহ যে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে, তাহা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আর এ গ্রামের লোকই বা কিরূপ নিষ্ঠুর যে, তাহাদের সম্মুখে এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে, অথচ কেহ কিছু বলিতেছে না।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন,—"যে পাগল হয়, সে নিজে বুঝিতে পারে না। অন্য লোককে সে পাগল মনে করে। আপনিও সেইরূপ মনে করিতেছেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে যে, আপনি পাগল। তা না হইলে গুরুর নামে কেহ পুলিশে নালিশ করে না, পাগল না হইলে ওলাউঠা রোগগ্রস্ত একটা সাঁওতালকে মাঠ হইতে কেহ আনে না।"

আমি দেখিলাম যে, বাক্য দ্বারা এ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করা বৃথা। তথাপি আমি বলিলাম,যে, —"আমার ভ্রাতাকে একবার ডাকিয়া দাও। আমাকে ছাড়িয়া দিতে বল। পৈতৃক সমুদয় সম্পত্তি কল্যই তাহাকে আমি লিখিয়া দিব। পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্দ্দকেও আমার প্রয়োজন নাই। তাহার পর কল্যই আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার শ্বশুরালয়ে গমন করিব।"

এইরূপ অনেক বিনয় করিয়া আমি বলিলাম, কিন্তু আমার ভ্রাতা আমার নিকটে আসিল না ; কেহই আমাকে ছাড়িয়া দিল না। চীৎকার করিতে করিতে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহারা পুনরায় আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল, আর বলপূর্বক আমাকে ধরিয়া রহিল। সুতরাং আমাকে চুপ করিতে হইল। ডাক্তার আমাকে বলিলেন,—"বৃথা আপনি চেষ্টা করিতেছেন, বৃথা গোলমাল করিতেছেন। গ্রামের সকলেই জানে যে, আপনি পাগল হইয়াছেন। কেহই আপনার সাহায্য করিতে এ স্থানে আসিবে না। আপনি যদি স্থিরভাবে থাকিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে আপনার মুখের কাপড় ও হাতের বন্ধন খুলিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই উন্মত্ত অবস্থায় পাছে আপনি অন্য লোককে খুন করেন, সে জন্য পায়ে আপনার বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকিবে।"

নিরুপায় হইয়া আমি সেইরূপ অঙ্গীকার করিলাম। তাহারা আমার মুখের কাপড় ও হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল। ইহাতেও আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। কিন্তু আমার মস্তক ও ঘাড় অতিশয় জ্বলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে, ঘরে আমাকে চাবি দিয়া সকলে চলিয়া গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঘরের ভিতর একেলা বসিয়া আমি কত কি যে চিন্তা করিতে লাগিলাম, মনে কত যে দুঃখ হইল, তাহা আর আপনাদিগকে কি বলিব, আপনারাই তাহা ভাবিয়া দেখুন !

পরদিন প্রাতঃকালে প্রথমেই গুরুদেব আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় তাঁহার পদধূলি দিয়া তিনি বলিলেন,—"আমি জানি যে, সজ্ঞান অবস্থায় তুমি আমার সর্বনাশ কর নাই, পাগল অবস্থাতেই তাহা করিয়াছিলে। আশীর্বাদ করি, বাবা, তুমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ কর।"

গ্রামের আরও কয়েক জন লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি উন্মত্ত হইয়াছি, সে জন্য অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শীঘ্র আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারিব, সে আশ্বাসও অনেকে আমায় প্রদান করিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমি সুহৃদ্ বলিয়া জানিতাম, তাঁহাদিগের নিকট আমি অনেক মিনতি করিয়া বলিলাম যে, আমি পাগল হই নাই, আমি সজ্ঞানেই আছি। কিন্তু কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সকলেই বলিলেন যে, পাগল না হইলে কেহ গুরুর সর্বনাশ করে না, ওলাউঠা রোগগ্রস্ত সাঁওতালকে কেহ ঘরে আনে না। আমার অনেক কাকুতি-মিনতি-বাক্যে এক জন কেবল আমার শ্বশুরালয়ে আমার গৃহিণীর নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

দিনের বেলা আমার ভ্রাতার এক বন্ধু আমার নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্য লইয়া আসিলেন। কিন্তু সেদিন আমি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলাম না। পাড়ার অনেক ছেলেও সে দিন আমাকে দেখিতে আসিল ! কেহ বলিল,—"সুবল দাদা," কেহ বলিল,—"সুবল কাকা, পাগল হইয়াছে, আয় ভাই দেখি।"

ঘরের তখন দ্বার বন্ধ ছিল। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া তাহারা আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি তখন মুখ বুজিয়া ছিলাম। তথাপি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—"ঈশ ! এক বার দাঁত দেখ ! ঠাকুর-মা বলিয়াছেন যে, একবার ছাড়া পাইলে আর রক্ষা রাখিবে না, পাড়ার যত ছেলেকে ঐ লম্বা লম্বা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিবে।"

এই বলিয়া তাহারা জানালা দিয়া ছোট ছোট ঢিল ছুড়িয়া আমাকে মারিতে লাগিল। তাহার পর আমার উঠানের পেয়ারা গাছে উঠিয়া পেয়ারা খাইল।

পেয়ারা গাছ হইতে আমার বাটীর এক কোণে দুই ঝাড় আখ দেখিয়া তাহা ভাঙিয়া খাইতে খাইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সেই ডাক্তার ও আর তিন জন লোক পুনরায় আসিলেন। কিন্তু আমার ভ্রাতা আমার নিকট আসিল না। একটি গেলাসে কিছু ঔষধ লইয়া ডাক্তার বাবু আমাকে তাহা খাইতে বলিলেন। আমি কিছুতেই খাইলাম না।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"এ ডাক্তারি ঔষধ নহে, দেশী গাছ-গাছড়া। অনেক কষ্টে আমি ইহা যোগাড় করিয়াছি। এ ঔষধ সেবন করিলে সত্বর আপনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন।"

ঔষধ খাইতে আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। আমাকে তিনি অনেক বুঝাইলেন, অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু ঔষধ খাইতে কিছুতেই আমি স্বীকৃত হইলাম না। তখন ডাক্তার বাবু, তাঁহার সাঙ্গগণের সহায়তায় বলপূর্বক আমাকে শয়ন করাইয়া, আমার বুকে হাঁটু দিয়া সেই ঔষধ আমাকে সেবন করাইলেন। ইহার পর কি হইল, আর আমি ঠিক বলিতে পারি না। ঔষধ সেবন করিবামাত্র আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ রজনী : যিনি ভূমিকম্প করেন

কত দিন এরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। ক্রমে আমার অল্প অল্প জ্ঞানের উদয় হইল। জ্ঞান হইবার পর এক দিন রাত্রিকালে আমি আমার ভ্রাতার ব্যবহার ও নিজের অবস্থা ভাবিতেছিলাম। আমার স্ত্রী ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার শোচনীয় অবস্থার সংবাদ পাইলেন কি না ও ভ্রাতার হাত হইতে তাঁহারা আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন কি না, এইরূপ নানা চিন্তায় মন আমার নিতান্ত কাতর হইতেছিল। এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে কে আমাকে ডাকিল,—"সুবল! সুবল!"

অনেক মিনতি করিয়া ডাক্তারের নিকট রাত্রি কালে আমি একটি আলোকের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ডাক্তার তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। আমার ঘরের এক পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। "সুবল! সুবল!" বলিয়া কে যখন আমাকে ডাকিল, তখন আমি চমকিয়া উঠিলাম। সে শব্দ শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে যে ডাকিতেছে, সে ঘরের ভিতরেই আছে। ঘরের এদিকে ওদিকে চারি দিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু ঘরের ভিতর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে আমি মনে করিলাম যে, ভ্রমবশতঃ এইরূপ শব্দ শুনিয়াছি, প্রকৃত কেহ আমাকে ডাকে নাই। এইরূপ মনে করিয়া পুনরায় আমি আমার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় পুনরায় সেই শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

পুনরায় কে যেন আমাকে ডাকিল,—"সুবল! সুবল!"

পুনরায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। চমকিত হইবার আরও কারণ এই যে, এবার আমি সে কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহার এ কণ্ঠস্বর, বহুকাল পূর্বে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পুনরায় সেই শব্দ হইল,—"সুবল! সুবল!"

আমি বলিলাম,—"কে আমাকে ডাকিতেছেন? আমি কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।"

সেই স্বর বলিল,—"আমাকে দেখিতে পাইতেছ না কেন, এই যে আমি বসিয়া আছি!"

আমি বলিলাম,—"কোথায়?"

স্বর উত্তর করিল,—"এই ঘরের কোণে।"

যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই কোণের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম,—"ও কোণে তো কিছুই নাই, কেবল জলের কলসীটি রহিয়াছে!"

স্বর উত্তর করিল,—"আমি এই জলের কলস। এ জন্মে আমি জলের কলস হইয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"আপনি জলের কলস হইয়াছেন! আপনি কে?"

স্বর উত্তর করিল,—"আমি সনাতন নস্কর। আর জন্মে আমি তোমার প্রতিবেশী ছিলাম। আমাকে মনে নাই?"

সত্য বটে, সনাতন নস্কর নামে আমাদের এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন। তাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে মান্য করিতাম। আশ্চর্য্য হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি নস্কর মহাশয়? এ জন্মে আপনি মেটে কলসী হইয়াছেন? মানুষ মরিয়া কলসী হয়?"

কলসী উত্তর করিলেন,—"মানুষ মরিয়া নানা রূপ হয়। সে রূপের সংখ্যা চৌরাশি হাজার।"

আমি বলিলাম,—"জীবিত অবস্থায় আপনি এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন, তবে কেন আপনাকে সামান্য একটি মেটে কলস হইতে হইয়াছে?"

নস্কর মহাশয় অর্থাৎ কলসী উত্তর করিলেন,—"আমি তো তবু অনেক ভাল দ্রব্য হইয়াছি। জগবন্ধুকে জান? জগবন্ধুর মা মরিয়া সামান্য একখানি খুরি হইয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"আমি শুনিয়াছি যে, জীবাত্মার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। কুম্ভকারের দ্রব্যে পরিণত হইলে জীবাত্মার উন্নতি কিরূপে হয়?"

নস্কর মহাশয় উত্তর করিলেন,—"জগবন্ধুর মা এখন খুরি হইয়া আছেন। আর জন্মে তিনি হয় তো একখানি সরা হইবেন। আর তার পরজন্মে হয় তো তিনি মালশী হইবেন। তার পর হয় তো তিনি একখানি তিজেল হইবেন, তার পর তোলো হাঁড়ি—এইরূপ ক্রমে ক্রমে তিনি উন্নতি লাভ করিবেন। আমি এখন কলস আছি। আর জন্মে আমি হয় তো পূজার ঘট হইব। তাহার পর হয় তো পিতলের ঘড়া হইব। কিন্তু আমি আর অধিক বকিতে পারি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পিপাসায় বড় কাতর হইয়াছি। তোমার উপর যে সমুদয় অত্যাচার হইয়াছে, কয় দিন তাহা এই কোণে বসিয়া সমস্ত আমি দেখিয়াছি। তোমার পিতার পুত্র যে এমন কুলাঙ্গার হইবে, স্বপ্নেও তাহা কখন আমি ভাবি নাই। কয় দিন এক ছটাক জলও কেহ আমাকে প্রদান করে নাই। শুষ্ক হইয়া আমি ঢন্ ঢন্ করিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এক্ষণে কি করিতে আপনি আমাকে আজ্ঞা করেন?"

নস্কর মহাশয় বলিলেন,—"প্রথমে আমাকে লইয়া বাহিরে চল। তাহার পর পুষ্করিণী হইতে আমাকে জলে পূর্ণ করিয়া আমার পিপাসা নিবারণ কর। তাহার পর, আমি এ পাপ পৃথিবীতে আর থাকিতে ইচ্ছা করি না। কলিকাতায় লইয়া আমাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর।"

আমি বলিলাম,—"ওঙ্কর ও তাহার বন্ধুগণ পায়ে বেড়ি দিয়া আমাকে

লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কি করিয়া আমি আপনাকে বাহিরে লইয়া যাইব ?"

নস্কর মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তোমার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখ।"

আমি আমার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য্য! এতক্ষণ আমি কিছুতেই জানিতে পারি নাই; আমার পায়ে বেড়ি নাই, আমার পায়ে শৃঙ্খল নাই।

অদ্ভুত মানিয়া সেই কলসীকে লক্ষ্য করিয়া নস্কর মহাশয়কে আমি নমস্কার করিলাম। কিন্তু পুনরায় আমার মনে আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম,—"সত্য বটে, আমার পদদ্বয় মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঘরের দ্বারে বাহিরে তাহারা কুলুপ দিয়া গিয়াছে। ঘর হইতে কি করিয়া আমি বাহির হইব ?"

নস্কর মহাশয় বলিলেন,—"দ্বার খুলিয়া দেখ।"

শয্যা হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া আমি কপাট টানিয়া দেখিলাম। ঘরের দ্বার স্বচ্ছন্দে খুলিয়া গেল। আরও আশ্চর্য্য হইয়া নস্কর মহাশয়কে আমি বার বার নমস্কার করিলাম।

কলসী পুনরায় আমাকে বলিলেন,—"সুবল! আর তোমার এ স্থানে থাকা উচিত নহে। তোমার ভ্রাতা কুলাঙ্গার, না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তোমার প্রতি সে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার দণ্ড সে শীঘ্রই পাইবে। এক্ষণে আমি তৃষ্ণায় বড় কাতর হইয়াছি। পুষ্করিণীতে লইয়া শীঘ্র আমাকে জলে পূর্ণ কর। তাহার পর কলিকাতায় লইয়া গিয়া শীঘ্র আমাকে মা গঙ্গার নির্ম্মল পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ কর। পৃথিবীতে আর আমি থাকিতে ইচ্ছা করি না। আহা! জগবন্ধুর মা, যিনি খুরি হইয়া কালযাপন করিতেছেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু তাঁহার কপালে নাই। কপালে থাকিলে এই উদ্যোগে পরজন্মে তিনি সরারূপ লাভ করিতে পারিতেন। তাহার পর অনায়াসে তিনি মালশী হইতে পারিতেন।"

পুনরায় বিছানার নিকট আসিয়া, ঘরের যে স্থানে আমার বাক্সটি থাকিত, সেই দিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম। সে স্থানে আমার বাক্স নাই। বুঝিতে আর বাকি রহিল না। বাক্সটি ভ্রাতা লইয়া গিয়াছেন। পথ-খরচের জন্য আমি কি করিব, এখন সেই ভাবনা আমার মনে উদয় হইল। কিন্তু নস্কর মহাশয়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই সময় ঘরের আর এক কোণে এক প্রকার খড়-খড় শব্দ হইতে লাগিল। সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে, কি একটি গোলাকার দ্রব্য ইঁদুরে টানিয়া গর্ত্তের ভিতর লইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু গর্ত্তটির মুখ সঙ্কীর্ণ, সে জন্য গোলাকার দ্রব্যটি গর্ত্তের ভিতর সহজে প্রবিষ্ট হইতেছে না। তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া আমি দেখিলাম যে, সে দ্রব্যটি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, বেত-নির্ম্মিত পোয়া, শালগ্রামের সহিত যাঁহাকে পূজা না করিয়া কখনও আমি জলগ্রহণ করিতাম না। আজ তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয় আমার বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম,—"মা! তবে সত্য সত্যই তুমি এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছ!"

মনে মনে আমি এইরূপ খেদ করিতেছি, এমন সময় ঘরের অন্য কোন হইতে নস্কর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"সুবল! লক্ষ্মীর ভিতর যে মোহরটি আছে, তাহা বাহির করিয়া লও। এ বিপদের সময় তাহা লইতে দোষ নাই। ইহাতে তোমার পথ-খরচ হইবে।"

এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পোয়ার ভিতর হইতে আমি মোহরটি বাহির করিয়া লইলাম। তাহার পর অন্য কোণ হইতে মৃন্ময় কলসরূপধারী নস্কর মহাশয়কে

অতি ভক্তিভাবে তুলিয়া লইলাম। ধীরে ধীরে বাটী হইতে বাহির হইলাম। প্রথমেই বৃহৎ একটি সরোবরে গিয়া সুশীতল বারি দ্বারা কলসটি পূর্ণ করিলাম। নস্কর মহাশয়কে এইরূপে পরিতৃপ্ত করিয়া পূর্ণ কলসটি স্কন্ধে লইয়া আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

যথা সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া অতি ভক্তিভাবে কলসটি আমি গঙ্গাজলে সমর্পণ করিলাম। তাহার পর যথাশক্তি নস্কর মহাশয়ের শ্রাদ্ধ করিলাম।

শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কোথায় যাই, কি করি, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে বাঁকুড়ায় শ্বশুরালয়ে গমন করাই স্থির করিলাম।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি ক্রমে গড়ের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে নির্জন একটি বৃক্ষতলে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পথে এক একটি গ্যাসের লণ্ঠন জ্বলিয়া উঠিল। আকাশে এক একটি করিয়া নক্ষত্র উদিত হইল। সাহেব ও মেমদিগের গাড়ির আলোক আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

এই সময় সহসা এক বৃদ্ধ আমার নয়নগোচর হইলেন। আমার নিকট হইতে প্রায় দশ হাত দূরে তিনি বসিয়া ছিলেন। এত দূরে তিনি বসিয়া ছিলেন, তথাপি তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমি শুনিতে পাইতেছিলাম। দ্রুতবেগে অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য সাধিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে সেইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছিল। বৃদ্ধের যাতনা দেখিয়া আমার মনে দুঃখ হইল।

আমি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়ের কি হাঁপানি রোগ আছে? নিশ্বাস ফেলিতে কি আপনার বড় কষ্ট হইতেছে?"

কিছু রুক্ষভাবে তিনি উত্তর করিলেন,—"হাঁপানি রোগ থাকিবে কেন? আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি, সেই জন্য এত দ্রুতবেগে নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়াছেন? এ বয়সে ছুটা-ছুটি করা উচিত নয়।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"তোমাদের মত দৌড়িয়া আমাকে পথ চলিতে হয় না। আকাশপথে আমি ভ্রমণ করি! এই মাত্র জাপান হইতে আসিতেছি।"

তাঁহার কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। মানুষ হইয়া শূন্যপথে কেহ কি ভ্রমণ করিতে পারে! না, জাপান হইতে একমুহূর্ত্তে কেহ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে! আমি মনে করিলাম লোকটা পাগল।

তথাপি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জাপানে মহাশয় কি জন্য গিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"সে স্থানে আমি ভূমিকম্প করিতে গিয়াছিলাম। পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হয়, সে সমুদয় ভূমিকম্প আমিই করিয়া থাকি। ভূমিকম্প করিয়া আমি জীবিকা নির্বাহ করি।"

আমি ঘোরতর আশ্চর্য্য হইলাম। মানুষে যে আবার ভূমিকম্প করে, ভূমিকম্প করা যে আবার মানুষের একটা ব্যবসায়, এ কথা আমি পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। এখন আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, লোকটা বদ্ধ পাগল।

তথাপি পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পিতা-মাতার নিকট আমি শুনিয়াছি যে, সহস্রফণা বাসুকি পৃথিবী বহন করিয়া আছেন। একটি মস্তক শ্রান্ত হইলে, যখন তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্য মস্তকে তিনি পৃথিবী গ্রহণ করেন, তখনই পৃথিবী কম্পিত হয়, আর তাহাকেই লোকে ভূমি-কম্প বলে।

এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার কথা কিরূপে আমি বিশ্বাস করিতে পারি ?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন,—"সে সব গাল-গল্প। বাসুকিকে আর ভূমি-কম্প করিতে হয় না। বাসুকির মস্তক-পরিবর্ত্তনে যদি ভূমিকম্প হইত, তাহা হইলে এককালে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইত। এই মাত্র আমি জাপানে বৃহৎ একটি ভূমি-কম্প করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দেখ, সে ভূমি-কম্প কলিকাতায় হয় নাই।"

আমি উত্তর করিলাম,—"সত্য বটে, বাসুকি দ্বারা ভূমিকম্প হইলে এককালে সমস্ত পৃথিবীতে হইত। কিন্তু তথাপি, মহাশয় যে ভূমিকম্প করেন, তাহাও আমার বিশ্বাস হয় না।"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন,—"প্রত্যক্ষ যদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে তো বিশ্বাস করিবে ? যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে সামান্য একটু ভূমিকম্প করিয়া তোমাকে আমি দেখাইতে পারি। কিন্তু দেখ, ইহাই আমার উপজীবিকা। সে ভূমিকম্পের মূল্য তোমাকে দিতে হইবে।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, এক টাকার ভূমিকম্প আমি ক্রয় করিতে পারি।"

এই কথা বলিয়া,—"পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া আমি তাঁহার হাতে দিলাম।"

টাকাটি পাইয়া বুদ্ধ ভূমির উপর ফুৎকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ বহুদূর পর্য্যন্ত নিকটের ভূমি কাঁপিয়া উঠিল, আর নিকটস্থ বৃক্ষসমূহ হেলিতে দুলিতে লাগিল। তাহার উপর যে সমুদয় কাক বসিয়া ছিল, বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উড়িতে লাগিল। সভয়ে কা কা রবে তাহারা চারিদিক্ পূর্ণ করিল। আমিও ঘোরতর শঙ্কিত হইলাম। কিন্তু চিন্তা করিবার কি ভয় করিবার আমি আর সময় পাইলাম না। নিম্নদিক্ হইতে মুখ তুলিয়া বুদ্ধ আমার শরীরে একটি ফুঁ দিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ-পথে নক্ষত্র-বেগে আমার শরীর ধাবিত হইল। প্রাণের আশা আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। ভয়ে আমি জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। সামান্য একটু যা জ্ঞান ছিল, তাহার সহায়তায় আমি ভাবিলাম যে, পৃথিবীর উপর পড়িলেই আমার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, আর তক্ষণাৎ আমার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে।

হু হু শব্দে আমি নিম্নে পতিত হইতে লাগিলাম। ভূমিতে পড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ঝড়ের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দে বায়ু আমার কানের কাছ দিয়া উপরদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। চৌরঙ্গির উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, গাছপালা ক্রমেই স্পষ্টরূপে আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই। এইবার সবলে ভূমির উপর পতিত হইব, ইহলীলা এইবার শেষ হইবে। এমন সময় সহসা আমার হাতে কি ঠেকিয়া গেল। প্রাণপণ যত্নে তাহা আমি ধরিয়া ফেলিলাম। চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, তাহা এক গির্জার চূড়া। কলিকাতার দক্ষিণে যে কাথিড্রাল নামক গির্জা আছে, নৈবেদ্যের ঊর্দ্ধ-দেশের ন্যায় যাহার শিখরদেশ সূক্ষ্ম হইয়া আকাশ অভিমুখে উত্থিত হইয়াছে, ইহা সেই গির্জার চূড়া।

পঞ্চম রজনী : সাগর-বক্ষে

প্রাণপণ যত্নে সেই গির্জার চূড়া আমি ধরিয়া রহিলাম। আপাততঃ অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু আমি সুস্থির থাকিতে

পারিলাম না। সেই সময় বায়ু সবলে প্রবাহিত হইতেছিল। বায়ুবলে গির্জার চূড়াকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমার দেহ দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। বায়ুর গতি নির্দেশ করিবার নিমিত্ত কেহ কেহ ছাদের উপর উচ্চ স্থানে যে যন্ত্র স্থাপিত করেন, সেই যন্ত্রের ন্যায় গির্জার চূড়াকে বেষ্টন করিয়া আমি ক্রমাগত ঘুরতে লাগিলাম।

সে রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে গির্জার নিম্নে দুই একটি লোককে আমি দেখিতে পাইলাম। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া আমি তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার চীৎকার কেহই শুনিতে পাইল না, কেহই আমাকে দেখিতে পাইল না। সমস্ত দিন আমি বায়ুবলে সেইরূপ চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে সমস্ত দিন আমি চীৎকার করিলাম। কিন্তু প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত আমার সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। গির্জার সেই চূড়া অনুসরণ করিয়া কতবার নিম্নে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতেও আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এইরূপে চারিদিন ও পাঁচ রাত্রি কাটিয়া গেল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। কখন্ আমাকে, সেই আশ্রয়স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়, জ্ঞানশূন্য হইয়া কখন্ আমি ভূতলে পতিত হই, এখন কেবল সেই চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু বলিতে আমার লজ্জা হয়, জীবন-ধারণের নিমিত্ত এই সময় আমি একটি উপায় আবিষ্কার করিলাম। সে উপায়টি অতি ঘৃণিত। কিন্তু কি করিব। এরূপ অবস্থায় পড়িলে মানুষের ভাল-মন্দ বিচার থাকে না।

মহাদেব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন, "আশুাধারী মহাশয়! আমরা দেখিলাম যে, গড়গড়ি মহাশয় সেই জীবনধারণের উপায় গোপন করিতেছেন। সে নিমিত্ত তাঁহাকে আমরা নানারূপ প্রবোধ বচনে উৎসাহিত করিলাম। আমাদের প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গড়গড়ি মহাশয় পুনরায় তাঁহার গল্প আরম্ভ করিলেন।"

এই কলিকাতা সহরে অসংখ্য কাক আছে। সকল স্থানেই তাহা উপবিষ্ট হয়। গির্জার মাথায় কয়দিন আমাকে ঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া কাকেরা মনে করিল যে, এ বস্তুটা মানুষ নহে, বায়ুর গতিনির্দেশ করিবার নিমিত্ত কোনরূপ একটা যন্ত্র। সাহেবরা এই যন্ত্র এরূপ উচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া কাকেরা নির্ভয়ে আমার মস্তকে বসিতে আরম্ভ করিল। সেই কাক ধরিয়া আমি ভক্ষণ করিতে লাগিলাম, তাহার মাংস ভক্ষণে ক্ষুধা ও শোণিত পানে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিলাম। এরূপ স্থানে রন্ধন করিবার সুযোগ ছিল না; সুতরাং কাকগুলিকে কাঁচা অবস্থাতেই ভক্ষণ করিতে হইল। গির্জার মাথায় এইরূপে আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এরূপ ঘূর্ণায়মান অবস্থায় গির্জার শিখরদেশে মানুষ চিরজীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। কিরূপে এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইব, সর্বদাই সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে বেলুনের কথা আমার স্মরণ হইল। বেলুনের সহায়তায় মানুষ আকাশে উড্ডীয়মান হয়। তাহার পর পারাচুট, অর্থাৎ বৃহৎ একটি ছাতার সহায়তায় মানুষ অনেক উচ্চ স্থান হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করে। আমি মনে করিলাম যে, সেই উপায়ে আমিও আপনাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব।

যে দিন হইতে আমি গির্জার মাথায় ঘুরিতেছিলাম, সেই দিন হইতে অনেক কাটা ঘুঁড়ি আমার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। প্রতিদিন অনেকগুলি কাটা ঘুঁড়ির সুতাও আমার গায়ে ও গির্জার মাথায় লাগিয়া যাইতেছিল। এখন হইতে

আমি সেই ঘুঁড়িগুলি ধরিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় দুইশত ঘুঁড়ি সংগ্রহ করিলাম। তাহাদের সূতা একত্রিত করিয়া মোটা রজ্জুর ন্যায় করিলাম। তাহার সহিত আমার চাদরখানিও যোগ করিলাম। সেই দুই শত ঘুঁড়ি পৃথক পৃথক রাখিলাম বটে, কিন্তু সকলকেই সেই রজ্জু ও চাদরে সংযুক্ত করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া যে দিন বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই দিন আমি ঘুঁড়িগুলি ছাড়িয়া দিলাম। সেই রজ্জু ও চাদর আমার শরীরে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিলাম। বায়ুভরে ঘুঁড়িগুলি যাই উড়িল, আর সেই সময় আমিও গির্জার চূড়া ছাড়িয়া দিলাম। ঘুঁড়িগুলি বায়ুভরে আকাশপথে চলিতে লাগিল, দড়ি ধরিয়া আমি তাহার নীচে ঝুলিতে লাগিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘুঁড়িগুলি মাটীর দিকে নামিল না, আকাশের উপর উঠিতে লাগিল। ইহার কারণ এই যে, ঘুঁড়ি অনেকগুলি ছিল, বায়ু অধিক প্রবল ছিল, আর মনোদুঃখে ও ভালরূপ আহার-অভাবে আমার শরীর শীর্ণ, শুষ্ক ও লঘু হইয়া গিয়াছিল।

হু হু শব্দে আমি আকাশে উঠিতে লাগিলাম। মেঘরাশি পার হইয়া অসীম আকাশের নিবিড় নীল প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, আকাশে তখন সূর্য্য ছিল না। ভাগ্যে সে দিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ছিল, আকাশে চন্দ্র ছিল না। সূর্য্য, কি চন্দ্র আমার মাথায় লাগিয়া গেলে বড়ই বিপদ ঘটিত। কিন্তু আকাশের উপর নক্ষত্র বিজ্ বিজ্ করিতেছিল। পাছে নক্ষত্র আমার চক্ষুতে লাগিয়া যায়, সে জন্য আমাকে বড়ই সতর্ক হইতে হইল। যত দূর সাধ্য অতি সাবধানে নক্ষত্রের নিকট দিয়া ঘুঁড়িগুলি চালাইতে লাগিলাম।

তথাপি হঠাৎ একটি নক্ষত্রের গায়ে আমার ঘুঁড়িগুলি লাগিয়া গেল। আকাশ-পটে নক্ষত্রগণ চুমকির ন্যায় আটা দিয়া জোড়া থাকে। কেবল যেগুলি মজবুত, সেইগুলি পিত্তলনির্মিত পেরেকের ন্যায় পোতা থাকে। নীচে হইতে তাহাদের স্থূল গোড়গুলি আমরা দেখিতে পাই। কোন কোন পুরাতন পেরেকের ন্যায় নক্ষত্রের গোড়া আল্গা হইয়া গিয়াছে। খোঁচার ন্যায় তাহারা উঠিয়া আছে। এইরূপ একটা নক্ষত্রের গায়ে আমার ঘুঁড়ি লাগিয়া গেল। নক্ষত্রটি তৎক্ষণাৎ আকাশ-পট হইতে খসিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে আমার পঞ্চাশখানি ঘুঁড়ি ছিঁড়িয়া গেল। প্রথম আমার বড় ভয় হইয়াছিল, কিন্তু ইহা আমার শাপে বর হইল। এখন আমি পৃথিবীর দিকে অল্প অল্প নামিতে লাগিলাম। এখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ঘুঁড়ির সংখ্যা কিছু অধিক হইয়াছিল, সেই জন্য তাহারা নীচে নামে নাই, আমাকে লইয়া উপরে উঠিয়াছিল। একে একে ঘুঁড়িগুলিকে আমি কাটিয়া দিতে আরম্ভ করিলাম। ঘুঁড়ির সংখ্যা যতই অল্প হইতে লাগিল, ততই আমি নীচে নামিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে এক প্রকার কোলাহল শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। তখন ঘোর রাত্রি, নিবিড় অন্ধকার। নিম্নদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিসের কোলাহল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আরও নীচে নামিলাম। সর্বনাশ! সুন্দরবন পার হইয়া আমি সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিসের কোলাহল, এখন তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আর উপায় নাই। সমুদয় ঘুঁড়ি প্রায় কাটিয়া দিয়াছি, পুনরায় উপরে উঠিবার আর উপায় নাই। ফল কথা, অবিলম্বে ঝপ করিয়া আমি সমুদ্রের জলে পড়িলাম। পর্বত সমান তরঙ্গ আমাকে একবার আকাশে তুলিতে লাগিল, একবার পাতালে নামাইতে লাগিল। নাকে মুখে আমার জল প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ানক লোণা জল! ভাগ্যে আমি সাঁতার জানিতাম, তাই জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারিলাম। কিন্তু সমুদ্রের পর্বত সমান ভীষণ তরঙ্গের ভিতর পড়িয়া মানুষ

কতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে! প্রাণের আশা আমি একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। মনে মনে আমি ঠাকুরদের নাম করিতে লাগিলাম।

হাত-পা শিথিল হইয়া কখন্ জলমগ্ন হই, সেই প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় নিকটে বৃহৎ একটি ঝিনুক দেখিতে পাইলাম। আপনারা পুষ্করিণীতে যে ঝিনুক দেখিয়াছেন, এ সেরূপ নহে, এ সমুদ্রের ঝিনুক, বৃহৎ একখানি মানোয়ারি জাহাজের মত। ঝিনুকটি হাঁ করিয়া সমুদ্র-জল পান করিতেছিল। আমি মনে করিলাম, ঝিনুকটির ভিতর গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করি। এইরূপ মনে করিয়া আমি তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কিন্তু যেই তাহার ভিতর গিয়াছি, আর ঝিনুক তৎক্ষণাৎ তাহার খোলা দুইখানি বন্ধ করিয়া দিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঝিনুকটি বৃহৎ একখানি মানোয়ারি জাহাজের মত বড়। সে জন্য তাহার ভিতর বায়ুর অভাব ছিল না, নিশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্যে আমার কোন ক্লেশ হয় নাই। ঝিনুকের পেটের ভিতর তাহার নাড়ীর এক অংশ বালিশ করিয়া আমি শয়ন করিলাম। গির্জার চূড়ায় ঘূর্ণায়মান অবস্থায় অনেক দিন আমি নিদ্রা যাইতে পারি নাই। ঝিনুকের ভিতর আজ যেমন শয়ন করিলাম, তেমনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

জীয়ন্ত সামুদ্রিক ঝিনুকের ভিতর শয়ন করিয়া কয় দিবস আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয়, তিন চারি দিন একাদিক্রমে নিদ্রা গিয়া থাকিব। নিদ্রা হইতে উঠিয়া ক্ষুধায় আমি কাতর হইলাম। ঝিনুকের উদরটি নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন ছিল না; কারণ, ইহার পেটের ভিতর জালার ন্যায় বৃহৎ একটি মুক্তা ছিল। সেই মুক্তার আলোকে ঝিনুকের উদরদেশ আলোকিত ছিল। ইতিপূর্বে ঝিনুকমাংসের আমিষ গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। এক্ষণে হাত দিয়া দেখিলাম যে, ঝিনুকটি বৃহৎ বটে, কিন্তু তাহার মাংস নিতান্ত কঠিন নহে। কাকের মাংস ভক্ষণে কাঁচা মাংসের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা দূর হইয়াছিল; সুতরাং জঠরের জ্বালায় আমি এইবার ঝিনুকের কাঁচা মাংস খাইতে আরম্ভ করিলাম। কথায় আছে যে, এমন কাজ নাই, যাহা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি না করিতে পারে।

ঝিনুকের উদরে থাকিয়া তিন মাস কাল তাহারই মাংস ভক্ষণ করিয়া আমি জীবন ধারণ করিলাম। তিন মাস পরে সে মাংস নিঃশেষ হইয়া গেল। এখন হইতে কি খাইয়া প্রাণ-ধারণ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। তাহার মাংস ভক্ষণে ঝিনুকটি কিছু দিন পূর্বে মরিয়া গিয়াছিল। সে জন্য শেষ কালের মাংসে কিছু দুর্গন্ধও হইয়াছিল। দুই দিন উপবাসী থাকিয়া বাহির হইবার চেষ্টায় ভিতর হইতে ঝিনুকের খোলা ধরিয়া আমি টানা-টানি করিতে লাগিলাম। আমার টানা-টানিতে সহসা বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইয়া ঝিনুকটি দুই খণ্ড হইয়া গেল। এক এক খণ্ড এক একখানি জাহাজের ন্যায় সমুদ্রের উপর ভাসিতে লাগিল। যে খণ্ডের উপর আমি ছিলাম, তাহাতে সে জালা সদৃশ মুক্তাটি ছিল না। অপর খণ্ড, যাহাতে মুক্তাটি ছিল, তাহা কিছু দূরে ভাসিতেছিল। আমি ভাবিলাম যে, যেমন করিয়া হউক, মুক্তাটি আমায় দেশে লইয়া যাইতে হইবে। এত বড় মুক্তা কেহ কখনও দেখে নাই, ইহার মূল্য সাত রাজার ধন, ইহা বিক্রয় করিয়া পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমি ধনবান্ হইতে পারিব। এইরূপ মনে করিয়া আমি জলে ঝাঁপ দিয়া ঝিনুকের অপর খণ্ড, যাহার উপর মুক্তা ছিল, সাঁতার দিয়া তাহাতে গিয়া উঠিলাম।

আমাকে লইয়া ঝিনুকের খোলা সেই অকূল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। দুই দিন পরে দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া, আমি আমার

চাদর নাড়িয়া, জাহাজের লোককে সংকেত করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। অবিলম্বে জাহাজখানি অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

এইরূপে আরও পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। সাত দিন আমি অনাহারে ছিলাম. জল পর্য্যন্ত আমার উদরে যায় নাই। আমার শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল. দুর্বলতায় আমার নিদ্রা আসিয়া গেল। অজ্ঞান অভিভূত হইয়া আমি শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। সমুদ্র-তরঙ্গে ঝিনুকের খোলাখানি উঠিতে-নামিতে ছিল, সর্বদাই খোলাখানি সমুদ্র-বক্ষে দুলিতেছিল। সহসা, "খ্যাস" করিয়া একটি শব্দ হইল ও সেই মুহূর্তে ঝিনুকের খোলাখানি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

আমি দেখিলাম যে, ঝিনুকের খোলাখানি সমুদ্রতীরে লাগিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। এত দুঃখের পর আমি যে পুনরায় তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা দেখিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। মনে করিলাম যে, উপরে নিশ্চয় গ্রাম আছে। গ্রামে গিয়া প্রথম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করিব, তাহার পর একখানি গরুর গাড়ী আনিয়া মুক্তাটিকে লইয়া যাইব।

এইরূপ মনে করিয়া ঝিনুকের খোলা হইতে আমি নামিলাম, কিন্তু যেই আমি নামিয়াছি, আর পর্বত প্রমাণ একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। তরঙ্গটি আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া আমি অনেক দূর বালুকাময় শুষ্ক চড়ার উপর গিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যে স্থানে ঝিনুকের খোলা ছিল, সেই দিকে দৃষ্টি করিলাম। দেখিলাম যে, নিম্নগামী তরঙ্গ-জলের সহিত ঝিনুকের খোলাখানি দূর সমুদ্র অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! আমার বহুমূল্য মুক্তাটি ভাসিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঝিনুকের খোলাখানি সমুদ্রের মাঝখানে চলিয়া গেল,—অবিলম্বে সমুদ্র-তরঙ্গে লীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

এই সময় পশ্চিম দিকে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। বালুকাময় সমুদ্রকূল পরিত্যাগ করিয়া আমি উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরে উঠিয়া লোকালয় দেখিতে পাইলাম না। প্রথমে নিবিড় হেঁতাল বন দেখিতে পাইলাম। তাহার পর অন্যান্য গাছও দেখিতে পাইলাম। নিবিড় অরণ্য, যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই দিকেই বন আমি মনে করিলাম যে, এ স্থানটি হয় সাগরদ্বীপ অথবা সুন্দরবনের অপর কোন অংশ।

আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল। তখনও অল্প অল্প আলোক ছিল। সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম যে আমার দক্ষিণ দিকে বনের ভিতর দিয়া কি একটা বৃহৎ জন্তু অতি নিঃশব্দে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। তখন আমার বড় ভয় হইল। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, এ অন্য জন্তু নহে, এ ব্যাঘ্র, দূর হইতে আমার অনুসরণ করিতেছে সুবিধা পাইলেই লম্ফ প্রদানপূর্বক আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। আমি তাড়াতাড়ি একটি গাছে উঠিয়া পড়িলাম। গাছে কিছুদূর উঠিয়াছি, আর বাঘ ভয়াবহ গর্জন করিয়া এক লম্ফে সেই বৃক্ষতলে আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আমি গাছের আরও উপরে উঠিতে লাগিলাম, বাঘ উচ্চ এক লম্ফ প্রদান করিয়া গাছ হইতে আমাকে পাড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আমি তখন যে স্থানে উঠিয়াছিলাম, লম্ফ প্রদান করিয়া বাঘ ততদূর পেঁাছিতে পারিল না। বাঘ পুনরায় ভূতলে পতিত হইল। ভীষণ গর্জন করিতে করিতে পুনরায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর আমার প্রতি

একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুইটি গোলাকার অগ্নি-শিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

বৃক্ষের উপর যতদূর উঠিতে পারা যায়, ততদূর আমি উঠিলাম। তাহার পর সরু শাখা, তাহার উপর আর উঠিতে পারিলাম না। বৃক্ষটি একটু হেলা অর্থাৎ বক্রভাবে ভূমি হইতে উঠিয়াছিল। সর্বনাশ! ব্যাঘ্র বৃক্ষের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। আমি ভাবিলাম, আর রক্ষা নাই। এইবার আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণপণ যত্নে আমি গাছটি নাড়া দিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্রের কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। ব্যাঘ্র ক্রমাগত বৃক্ষের উপর আরোহণ করিতে লাগিল।

আমার নিকট হইতে ব্যাঘ্র আর পাঁচ হাত আছে, আমার নিকট হইতে আর চারি হাত আছে, আমার নিকট হইতে আর তিন হাত আছে, আমার নিকট হইতে আর দুই হাত আছে। ভয়ে থর থর করিয়া আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল।

ব্যাঘ্র আমার এক হাত নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে ধরিবার নিমিত্ত সে হাত বাড়াইল। যদিও ইহার পর শাখা-প্রশাখা অতিশয় সরু ও ভঙ্গপ্রবণ ছিল, তথাপি প্রাণের দায়ে আমি আরও একটু উচ্চে গিয়া উঠিলাম। আশ্চর্য্য! সেই সময় আমার মাথার উপর খিল্ খিল্ শব্দে কি হাসিয়া উঠিল!

চকিত হইয়া আমি উপরে দৃষ্টি করিলাম। দেখিলাম যে, ঠিক আমার মস্তকের উপর সরু এক শাখাতে এক নরমুণ্ড ঝুলিতেছে। দেহ হইতে মুণ্ডটি নূতন কর্তিত হইয়াছে; কারণ, তাহার গলদেশ হইতে তখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িতেছিল। মস্তকটি মুণ্ডিত, কেবল মধ্যস্থলে এক গুচ্ছ কেশ ছিল। টিকিটি গাছের ডালে বাঁধা ছিল। টিকি দ্বারা লম্বিত হইয়া মুণ্ডটি নারিকেলের ন্যায় বৃক্ষ-শাখায় ঝুলিতেছিল। মুণ্ডটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছিল, আর আমাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদান করিয়াছিল। কি ভয়ানক তাহার দন্ত দুই পাঁতি!

উপরে অদ্ভুত ভয়াবহ মুণ্ড, নিম্নে দুরন্ত ব্যাঘ্র, আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। কিন্তু তখন অন্য সমুদয় চিন্তা আমার মন হইতে দূর হইল। মনে করিলাম যে,—"মুণ্ড! তুমি ভূত হও, আর রাক্ষস হও! তোমার দ্বারা আমি ব্যাঘ্রের মুখ হইতে রক্ষা পাইব।" এইরূপ ভাবিয়া আমি মুণ্ডটিকে ধরিয়া টান মারিলাম। তাহার শিখার কেশগুচ্ছ চড়্ চড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। এক টানে মুণ্ডটিকে বৃক্ষশাখা হইতে ছিঁড়িয়া টিকি দ্বারা লম্বিত করিয়া আমি ব্যাঘ্রের মুখের নিকট ধরিলাম। সম্মুখে টাট্‌কা নরমুণ্ড দেখিয়া ব্যাঘ্রের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। যথালাভ মনে করিয়া সে হাত দিয়া মুণ্ডটি ধরিল। পরক্ষণেই এক লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষের নীচে গিয়া পড়িল। তাহার পর নরমুণ্ডটিকে মুখে লইয়া ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে বনের ভিতর প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ রজনী : ডাকিনীর বাড়ী

আমি বৃক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আর একটি ভয়াবহ দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইল। জন্তু নহে, মনুষ্য নহে, কিরূপ নূতন এক প্রকার জীব এই সময় বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মানুষের ন্যায় তাহার আকৃতি, কিন্তু প্রায় ছয় হাত লম্বা। মূর্ত্তিটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের নর-দেহ, অনেক দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিলে যেরূপ হয়, মূর্তিটি সেইরূপ শীর্ণ ও শুষ্ক ছিল। তাহার শরীরে মাংস একেবারেই ছিল না, শুষ্ক চর্ম দ্বারা

কেবল হাড়গুলি আবৃত ছিল। তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণের বৃহৎ একটি ঝুনা নারিকেলের মত ছিল। মস্তকের চুল ঠিক ছোবড়ার মত, স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল। তাহার স্তন নাভিদেশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। অলঙ্কার স্বরূপ তাহার দুই কর্ণে দুইটি শুভ্রবর্ণের কৃমি ঝুলিতেছিল। নোলোকস্বরূপ নাসিকাতেও একটি কৃমি ছিল। সেই কৃমির অগ্রভাগে মুক্তার স্থানে বৃহৎ একটি কোলা ভেক ঝুলিতেছিল। মূর্তিটির কোমর রক্তবর্ণের ঘাগ্‌রা দ্বারা আবৃত ছিল, কিন্তু সে ঘাগ্‌রা কেবল জানু পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তাহার নিম্নে শুষ্ক বাঁশের ন্যায় পা দুইখানি অনাবৃত ছিল। মুখমণ্ডলে মানুষের যে স্থানে চক্ষু থাকে, ইহার সেই স্থানে দুইটি কোটর ছিল, আর সেই কোটরের মধ্যে দুইটি রক্তবর্ণের বর্ত্তুল ঘূর্ণিত হইতেছিল। এখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ভয়াবহ মূর্ত্তি মাঝে মাঝে মুখব্যাদান করিতেছিল, আর সেই সময় তাহার মুখের ভিতর হইতে অগ্নিস্ফুলিংগ বাহির হইতেছিল। সেই অগ্নির আলোকে আমি ইহার শরীরের ভাবভংগী দেখিতে পাইলাম। সেই আলোকে আমি ইহার দন্ত দুই পাঁতিও দেখিতে পাইলাম। কি দীর্ঘ, কি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের দন্ত! যেন নরমাংস চিবাইবার নিমিত্ত সেই দন্ত গঠিত হইয়াছে। এরূপ ভয়ানক দৃশ্য পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই। ভয়ে আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। নীরবে গাছের উপর আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমি যে বৃক্ষে বসিয়াছিলাম, এই ভয়াবহ মূর্ত্তি আসিয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল। কিছু দূর উঠিয়া একটি স্থূল শাখার উপর অশ্বারোহণের ন্যায় সে উপবিষ্ট হইল। তাহার পর বিড় বিড় করিয়া সে কিরূপ শব্দ করিল। আর সেই মুহূর্ত্তে বৃক্ষটি আকাশের উপর উঠিয়া হু হু শব্দে বায়ুর ন্যায় চলিতে লাগিল। এখন আমি সকল কথা বুঝিতে পারিলাম। গাছটি ডাকিনীর গাছ, সেই অদ্ভুত জীব ডাকিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল যে, ডাকিনীদিগের আকৃতি ঠিক মানুষের মত হয়। কিন্তু আজ আমার সে ভ্রম দূর হইল। এখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ডাকিনীদিগের আকৃতি কতকাংশে মানুষের মত হইলেও ইহারা অতি ভয়াবহ জীব।

গাছ, দেশ প্রদেশ নদ নদী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় এক পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিকে গিরিশ্রেণী, সেই সমুদয় গিরিশ্রেণী নিবিড় অরণ্যে আবৃত। ইহাই কি হিমালয় প্রদেশ?

এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ পৃথিবীতে অবতরণ করিল। পৃথিবী স্পর্শ করিবামাত্র ইহার মূল এরূপ ভাবে ভূমিতে লাগিয়া গেল, যেন বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষটি সেই স্থানেই চিরকাল বর্ধিত হইয়াছে। ডাকিনী লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিল। সেই মুহূর্ত্তে নিকটস্থ এক গিরিগহ্বর হইতে আর একটি ডাকিনী বাহির হইল। তাহারও আকৃতি ঠিক প্রথম ডাকিনীর মত ছিল। কিন্তু ইহার মুখ কৃষ্ণবর্ণের ঝুনা নারিকেলের মত নহে, শুষ্ক অলাবুর মত। দ্বিতীয় ডাকিনী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নারিকেলমুখী! মুণ্ড আনিয়াছ?" তাহার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, প্রথম ডাকিনীর মুখ নারিকেলের মত, সেই জন্য তাহার নাম নারিকেলমুখী! নারিকেলমুখী উত্তর করিল,—"হাঁ লাউমুখী! মুণ্ড আনিয়াছি। ভাল মুণ্ড! আজ চমৎকার ভাঁটা খেলা হইবে।"

নারিকেলমুখীর এই উত্তরে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, গহ্বর হইতে যে ডাকিনী বাহির হইল, তাহার নাম "লাউমুখী।"

লাউমুখী বলিল,—"তবে আমি আমার মুণ্ড লইয়া আসি, আর জয়-পরাজয় বিচার করিবার নিমিত্ত ভূমিকম্প-দাদাকে ডাকিয়া আনি।"

এই কথা বলিয়া পুনরায় সে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরে সে টাটকা একটি নরমুণ্ড হাতে লইয়া বাহির হইল। তাহার সঙ্গে এক বৃদ্ধও গহ্বর হইতে বাহির হইলেন। ডাকিনীদ্বয়ের মুখ-নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলোকে আমি দেখিলাম যে, ইনি সেই বৃদ্ধ, পৃথিবীতে ভূমিকম্প করা যাঁহার উপজীবিকা। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। কিন্তু নারকেলমুখী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে, পলায়ন করিবার কোন উপায় ছিল না। সে জন্য গাছের উপর আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধের সহিত, মুণ্ড হাতে লইয়া লাউমুখী গিরিগহ্বর হইতে বাহির হইয়া বলিল,—"কৈ নারিকেলমুখী! তোমার মুণ্ড কৈ? রাত্রি অধিক হইয়াছে। শীঘ্র এস, ভাঁটা খেলা আরম্ভ করি। কে হারে, কে জিতে, ভূমিকম্প ঠাকুরদাদা তাহার বিচার করিবেন।"

"আমার মুণ্ড লইয়া আসি।" এই কথা বলিয়া নারিকেলমুখী বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। আমার বড় ভয় হইল। যে স্থানে মুণ্ড লম্বিত ছিল, সে স্থান হইতে সরিয়া বৃক্ষের আর এক শাখায় গিয়া আমি লুক্কায়িত থাকিতে চেষ্টা করিলাম।

নারিকেলমুখী গাছে উঠিয়া মুণ্ড অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যে স্থানে মুণ্ড ঝুলিতেছিল, সে স্থানে মুণ্ড নাই। "এ কি হইল! মুণ্ড কোথায় গেল?" এইরূপ বলিতে বলিতে ঘোরতর বিস্মিতা হইয়া সে গাছের এ শাখা সে শাখা হাতড়াইতে লাগিল। সামান্য সেই গাছে কতক্ষণ আর আমি লুক্কায়িত থাকিতে পারি? সহসা তাহার বাখারিনিন্দিত হস্ত আমায় গায়ে ঠেকিয়া গেল। "এ কি!" এই কথা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর বলপূর্বক বৃক্ষ হইতে নামাইয়া সে আমাকে ভূমিকম্পের নিকট লইয়া গেল।

বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া নারিকেলমুখী বলিল,—"দাদা! গাছে আমার মুণ্ড নাই। তাহার পরিবর্তে গাছে এই আস্ত মানুষটি ছিল। এই মানুষ বোধ হয় আমার মুণ্ড চুরি করিয়াছে।"

ভূমিকম্প বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি আপনার অপরিচিত নহি। কলিকাতা গড়ের মাঠে যাহাকে আপনি এক টাকার ভূমিকম্প বিক্রয় করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তি।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বটে! তুমি সেই ব্যক্তি! ইহার মুণ্ড লইয়া তুমি কি করিয়াছ?"

মুণ্ড লইয়া যাহা করিয়াছিলাম, সত্য সত্য বৃদ্ধকে সেই বিবরণ আমি প্রদান করিলাম। বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—"এ বড় বিষম কথা! নাতিনী দুইটি মুণ্ডে মুণ্ডে ঠোকাঠুকি করিয়া ভাঁটা ক্রীড়া করে। তোমাদের মত ইহাদের পা নাই যে, ইহারা ফুটবল খেলিবে। কিন্তু এ বড় অন্যায় কথা যে, তোমরা তাহাদিগকে এ সামান্য ক্রীড়া হইতেও বঞ্চিত করিবে। অন্য লোক হইলে, তাহার মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া আমি নাতিনীকে ভাঁটা খেলিতে দিতাম। কিন্তু তুমি আমার খরিদ-দার। সে জন্য তোমার মুণ্ড আমি ছিঁড়িয়া লইতে পারি না। কিন্তু নারিকেলমুখীর মনোদুঃখ তোমায় নিবারণ করিতে হইবে। তাহাকে তোমার বিবাহ করিতে হইবে। আজ রাত্রিতেই তাহার সহিত তোমার আমি বিবাহ দিব। লাউমুখী! বিবাহের আয়োজন কর। শঙ্খ আনয়ন কর, আমি নিজে শঙ্খ বাজাইব। লাউমুখী, তুমি উলু দাও।"

লাউমুখী তৎক্ষণাৎ উলুধ্বনি করিল। উলু! উলু! উলু! তাহার উলুধ্বনিতে জগৎ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

নারিকেলমুখীর দিকে আমি একবার চাহিয়া দেখিলাম। তাহার রূপ দেখিয়া আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এ কিম্ভূত কদাকার ডাকিনীকে কিরূপে আমি পত্নীরূপে বরণ করিব!

অতি মিনতি সহকারে আমি ভূমিকম্প মহোদয়কে বলিলাম,—"মহাশয়! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু মহাশয়! আমি হইলাম মানুষ, ইনি হইলেন ডাকিনী। ইঁহার সহিত কিরূপে আমার পরিণয় হইতে পারে? তাহা ব্যতীত ঘরে আমার আর একটি পত্নী আছেন। সপত্নীর নিকট গিয়া আপনার নাতিনীর সুখ হইবে না।"

ভূমিকম্প ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে আমরা ছাড়িয়া দিব না। নারিকেলমুখী তোমাকে ভেড়া করিয়া চিরকাল এই স্থানে রাখিয়া দিবে।"

আমি বলিলাম,—"সে সুখের কথা বটে। কিন্তু মহাশয়! এরূপ সুপাত্রীর উপযুক্ত পাত্র আমি নই।"

ভূমিকম্প উত্তর করিলেন,—"সে চিন্তা তোমাকে করিতে হইবে না। নারিকেলমুখীর ভাব দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমার প্রতি তাহার মন হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া নারিকেলমুখী ঈষৎ হাসিয়া আমার প্রতি কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিল। পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া ভেকসংযুক্ত নোলকটি একবার নাড়িল। তাহার অপূর্ব রূপ ও হাব-ভাব দেখিয়া আমার মন একেবারে মোহিত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, মৃত্যু হউক, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তথাপি এ কদাকার ডাকিনীকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।

বৃদ্ধের নিকট আমি বারবার অনেক ওজর আপত্তি করিলাম, বিনয় বচনে আমি অনেক সাধ্যসাধনা করিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই আমাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া আমি বলিলাম,—"মহাশয়। ইনি ডাকিনী, আমি মানুষ। কিছুতেই আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব না। আপনি আমার মস্তক কাটিয়া ইঁহাকে প্রদান করুন। আমার মুণ্ড লইয়া ইনি ভাঁটা ক্রীড়া করুন। বিবাহ আমি ইঁহাকে কিছুতেই করিব না।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"তুমি আমার খরিদ-দার। তোমার মুণ্ড আমি কিছুতেই কাটিয়া ভাঁটা করিতে পারি না। নিশ্চয় তোমার নারিকেলমুখীকে বিবাহ করিতে হইবে। লাউমুখী! শঙ্খ আনয়ন কর! উলু দাও।"

পুনরায় উলুধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এইবার উলু দিতে দিতে লাউমুখী আমার নিকটবর্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"বল যে, ঐ মন্দিরে গিয়া কালীর গলদেশস্থিত মুণ্ডমালা হইতে একটি মুণ্ড আনিয়া দিতেছি।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, কিছু দূরে বনের ভিতর একটি ভগ্ন মন্দির রহিয়াছে। লাউমুখীর সঙ্কেত আমি বুঝিতে পারিলাম।

ভূমিকম্প বৃদ্ধকে আমি বলিলাম,"এ বিবাহকার্য্য অল্পক্ষণের নিমিত্ত আপনি স্থগিত রাখুন। আমি আপনাদের মুণ্ড লইয়াছি, তাহার পরিবর্তে আর একটি মুণ্ড আনিয়া দিতেছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া ভূমিকম্প আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর একটি মুণ্ড তুমি আনিয়া দিবে! সে মুণ্ড তুমি কোথায় পাইবে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"ঐ মন্দিরে মা আছেন। মায়ের গলদেশে যে মুণ্ড-মালা আছে, তাহা হইতে একটি মুণ্ড আমি আনিয়া দিব।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সন্ধান তোমাকে কে বলিয়া দিল?"

আমি কোন উত্তর করিলাম না।

ভূমিকম্প বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন,—"এ কথার উপর, কথা বলিবার আমাদের শক্তি নাই। যখন তুমি মা জগদম্বার নাম করিয়াছ, তখন আর আমরা কোন আপত্তি করিতে পারি না। যদি তুমি মায়ের মুণ্ডমালা হইতে ভাল একটি মুণ্ড আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমরা ছাড়িয়া দিব। কিন্তু মায়ের গলদেশ হইতে মুণ্ড আনয়ন করা নিতান্ত সহজ কাজ নহে।"

আমি বলিলাম,—"সহজ হউক আর কঠিন হউক, আমি এ কাজ করিতে চেষ্টা করিব।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বেশ। তবে চল, সকলে মন্দিরে যাই। আমরা মন্দিরের বাহিরে থাকিব। নারিকেলমুখী ও লাউমুখীর সহিত আমি সম্মুখ দিকে পাহারা দিব। শাঁখমুখীকে ডাকিয়া আন, সে আপনার দলবলের সহিত পশ্চাৎ দিকে পাহারা দিবে। তুমি পলাইতে পারিবে না।"

শাঁখমুখী আপনার দল-বলের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে আমরা মন্দিরের নিকট গমন করিলাম। আমি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঠিক দ্বারে শ্রীমতী নারিকেলমুখী পাহারা রহিলেন। তাঁহার বাম দিকে ভূমিকম্প-মহাশয় ও দক্ষিণ দিকে শ্রীমতী লাউমুখী বসিয়া রহিলেন। মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে শাঁখমুখী আপনার দল-বলের সহিত পাহারা দিতে লাগিল।

সপ্তম রজনী : মুণ্ডমালা

ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমি দেখিলাম যে, মন্দিরটি অতি প্রাচীন, কিন্তু নিতান্ত ভগ্ন হয় নাই। ভিতরে একটি কালীমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি বোধ হয় প্রস্তর দ্বারা গঠিত। মন্দিরের একপার্শ্বে একটি কুলঙ্গি আছে, সেই কুলঙ্গিতে লৌহ-নির্ম্মিত একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। মায়ের পাদপদ্ম ফুল ও কুলঙ্গিতে প্রদীপ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মায়ের নিত্য-পূজা হইয়া থাকে। বোধ হয়, ডাক ও ডাকিনীগণ তাঁহার পূজা করে। কিন্তু আর একটি আশ্চর্য্য কথা। মায়ের হাতে ও গলদেশে যে নরমুণ্ড রহিয়াছে, সে মুণ্ড-গুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত কৃত্রিম মুণ্ড নহে। প্রকৃত টাট্‌কা নরমুণ্ড। কিন্তু সকল মুণ্ডগুলিই মুণ্ডিত, কেবল উপরিভাগে এক একটি শিখা আছে। সেই টিকি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া মুণ্ডগুলি মালার সূত্রে লম্বিত আছে। ডাকিনীর বক্ষে আমি যেরূপ মুণ্ড দেখিয়াছিলাম, আর সেই মুণ্ডটি বৃক্ষ-শাখায় যে ভাবে টিকি দ্বারা লম্বিত ছিল, মায়ের গলদেশেও সেইরূপ মুণ্ড ছিল ও সেই ভাবে লম্বিত ছিল।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অতি ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে মাতাকে আমি প্রণাম করিলাম। তাহার পর মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত যোড় করিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"মা জগদম্বে! তুমি জগতের মাতা। মা! তুমি দক্ষিণ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া জগৎকে অভয় ও বর প্রদান করিতেছ, আমাকে মা তুমি অভয় প্রদান কর। আমি মা, বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার নিকট মা, কোন বিষয় অবিদিত নাই। কত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে আমি ডাকিনীর হাতে পড়িয়াছি। মা! নারিকেলমুখীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না। কিন্তু মা, সে আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবে। তোমার মুণ্ডমালা হইতে যদি একটি মুণ্ড আমাকে প্রদান কর, তাহা হইলে, মা, এ বিপদ

হইতে আমি পরিত্রাণ পাই। কিন্তু মা, তোমার অনুমতি বিনা আমি মুণ্ড লইতে পারি না। সেই অনুমতি, মা, তুমি আমাকে প্রদান কর।"

মা বোধ হয় আমার স্তবে সন্তুষ্টা হইলেন। কারণ, আমি দেখিলাম যে, তাঁহার অভয় ও বর হস্তযুগল নিম্নগামী হইল, আর তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্নভাব ধারণ করিল।

মায়ের এইরূপ প্রসন্ন ভাব দর্শন করিয়া মুণ্ডমালা স্পর্শ করিতে আমার সাহস হইল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মুণ্ডগুলি টিকি দ্বারা লম্বিত ছিল। আমি মনে করিলাম যে, অনায়াসেই একটি মুণ্ড খুলিয়া লইতে পারিব। এইরূপ মনে করিয়া প্রথম আমি বন্ধন খুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে বন্ধন কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। তাহার পর আমি মনে করিলাম যে, মুণ্ডটি অনায়াসে ছিঁড়িয়া লইতে পারিব। মুণ্ডটি ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। আমার দেহে যত বল ছিল, সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়া দুই হাতে টানাটানি করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই ছিঁড়িতে পারিলাম না। তাহার পর মায়ের হাতের খড়্গখানি লইয়া শিখাটি কাটিতে চেষ্টা করিলাম। খড়্গ অতি সুতীক্ষ্ণ ছিল, তথাপি শিখার একগাছি কেশও কাটিতে পারিলাম না। তাহার পর কুলিঙ্গ হইতে সেই লৌহ-প্রদীপটি আনিয়া দীপশিখা দ্বারা টিকিকেশগুচ্ছ দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার একগাছি কেশও দগ্ধ হইল না। নিরুপায় হইয়া সে মুণ্ডটি ছাড়িয়া অন্য মুণ্ডগুলি একে একে টানিয়া দেখিলাম; কিন্তু একটি মুণ্ডও মালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলাম না। অবশেষে মায়ের বাম হস্তের মুণ্ডটি দুই হাতে ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। বাহির হইতে ডাকিনীগণ খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমার টানাটানি দেখিয়া মুণ্ডটির মনে বোধ হয় দয়া হইল। ঈষৎ হাসিয়া সে আমাকে বলিল,—"বৃথা টানাটানি! ভগদত্তের হাতী আনিয়া যদি তুমি টানা-হেঁচড়া কর, তাহা হইলেও কিছু করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম,—"তবে, মহাশয়, কৃপা করিয়া আপনি নিজে গমন করুন। আপনি না গমন করিলে নারিকেলমুখী আমাকে বিবাহ করিবে।"

মুণ্ড বলিল,—"বেশ তো! অমন চমৎকার পতিব্রতা লাভ করিবে। সে তো আনন্দের বিষয়।"

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! এ তামাসার সময় নহে। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আমার প্রতি আপনি কৃপা করুন।"

মুণ্ড বলিল,—"মন্দ কথা নহে! আমি নারিকেলমুখীর নিকট স্ব-ইচ্ছায় গমন করিব। আমাকে লইয়া লাউমুখীর সহিত সে ভাঁটা খেলিবে। লাউমুখীর যে আর একটি মুণ্ড আছে, তাহার সহিত আমাকে ঠোকাঠুকি করিবে। যদি আমি ভাঙ্গিয়া যাই, তাহা হইলে লাউমুখী জিতিবে; আর যদি লাউমুখীর মুণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে নারিকেলমুখী জিতিবে। ভাবিয়া দেখ, এরূপ কাজে কোন্ মুণ্ড স্ব-ইচ্ছায় গমন করে?"

আমি বলিলাম,—"মহাশয় দেবতা! মায়ের বাম হস্তে আপনি বিরাজ করিতেছেন। আমি আপনার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। কৃপা করিয়া যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন, তবেই হয়।"

মুণ্ড বলিল,—"দেখ! আমরা বেতাল। আমরা সমস্যা, হেঁয়ালি, গল্প ভালবাসি। সমস্যা দিলে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পূরণ করিতে পারিবে?"

আমি বলিলাম,—"না মহাশয়! আমার সে শক্তি নাই। আমি পাড়া-গেঁয়ে অজ্ঞ লোক।"

মুণ্ড বলিল,—"তবে তুমি একটি গল্প কর, আমি শুনি। তাহার পর, ডাকিনীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি এক জন পাড়া-গেঁয়ে অজ্ঞ লোক। গল্প আমি জানি না।"

বেতাল অর্থাৎ মুণ্ড বলিল,—"তুমি সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে না, তুমি গল্প বলিতে পারিবে না, কোন কাজ করিতে পারিবে না। অথচ, তোমার ইচ্ছা যে, আমি গিয়া আর একটি মুণ্ডের সহিত ঠোকাঠুকি করি। এ কি কাজের কথা! যাও! নারিকেলমুখীকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না কর।"

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। গল্প আমি জানি না। অথচ, গল্প না বলিলে মুণ্ডলাভ হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি বলিলাম,—"মহাশয়! ভাল গল্প আমি জানি না। তবে দুই একখানি পুস্তকে ও বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে গুটিকত গল্প আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে গল্প কি আপনার ভাল লাগিবে?"

বেতাল বলিল,—"সেই গল্প আমি ভালবাসি। বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আরম্ভ কর।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, মহাশয়! একটি গল্প আমি বলিতেছি; শ্রবণ করুন। কিন্তু এ গল্পটি সামান্য এক গোপ-কন্যার কথা। সেই গোপকন্যার নাম ছিল আদুরী।"

বেতাল বলিল,—"আদুরী! গোয়ালার মেয়ে! তাহার গল্প শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। সে আদুরীর কি হইয়াছিল, তাহা বল।"

আমি বলিলাম,—"এ গল্পটি আমি বঙ্গবাসীতে পাঠ করিয়াছিলাম। গল্পটি যেরূপ পাঠ করিয়াছি, সেইরূপ আপনাকে বলিতেছি। শ্রবণ করুন।"

এই বলিয়া আমি আদুরী ও আরসীর গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম। মায়ের বাম হস্তের মুণ্ড ও মালার মুণ্ডগণ মনোযোগপূর্বক আমার গল্প শুনিতে লাগিল। *

* বেতালগণের নিকট গড়গড়ি মহাশয় অনেকগুলি গল্প করিয়াছিলেন। তাহার গুটিকতক কেবল এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। এখন হইতে "রঙ্গনা" পরিচ্ছেদে পুস্তককে বিভাগ করিবার আর আবশ্যক নাই।

আদুরী ও আরসী

প্রথম পরিচ্ছেদ : পাঁচ কম পাঁচ কুড়ি

"আদুরি! আদুরি!" প্রাচীরের গায়ে গোবরলেপি দিতে দিতে আদুরীর মা চীৎকার করিয়া কন্যাকে ডাকিতে লাগিলেন।

"ও আদুরি! আদুরি! ও আভাগি!"—আদুরীর মা পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে আদুরী সাড়া দিল। সামান্য একখানি মেটে ঘর; তাহার পাশে একটু রান্নার চালা; অপর দিকে গরু থাকিবার নিমিত্ত আর একটি ছোট চালা;—এই হইল আদুরী ও আদুরীর মায়ের ঘর। জাতিতে উহারা গোয়ালা। দুইটি দুগ্ধবতী গাভী,—এই হইল তাহাদের সম্পত্তি।

"বেলা হইয়া গেল যে! কখন্ হাটে যাইবি? দুপুর বেলা হাটে গেলে কি আর দই বিক্রী হবে?"—আদুরীর মা পুনরায় চীৎকার করিয়া মেয়েকে বকিতে লাগিলেন।

গাভী দুইটির দুগ্ধ ও দধি বিক্রয় করিয়া, আদুরীর মা দিনপাত করেন। যখন দুগ্ধ না থাকে, তখন ধান কিনিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। সেই পরিশ্রমে যাহা লাভ হয়, তাহাতে এক প্রকার চলিয়া যায়;—তবে কষ্টে।

একবার আদুরীর মায়ের সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা। তখন আদুরীর মাতামহী অর্থাৎ আদুরীর আয়ী বা দিদিমা জীবিতা ছিলেন। একদিন গরু হারাইয়া গিয়াছিল। বনে-বাদাড়ে আদুরীর দিদিমা গরু খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে দিন নিকটস্থ একখানি গ্রামে এক শৃগাল ক্ষেপিয়াছিল। সে গ্রামে অনেকগুলি লোককে দংশন করিয়াছিল। পাছে আমাদের গ্রামে আসিয়া আমাকে কামড়ায়, এই ভয়ে আদুরীর মাতামহী ছোট একটি ঠেঙা হাতে করিয়া গরু খুঁজিতেছিলেন।

যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, সামান্য একটি মাঠান পথের ধারে এক জন সাহেব বসিয়া আছেন। সাহেব পাখী মারিতে আসিয়াছিলেন। শ্রান্ত হইয়া, বন্দুকটি পাশে রাখিয়া, গাছতলায় বসিয়া, পকেট হইতে কি বাহির করিয়া সাহেব খাইতেছিলেন। সভয়ে আদুরীর দিদিমা এক পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। দুই চারি হাত গিয়া, সাহেব কি করিতেছেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত একবার মুখ ফিরাইলেন। সর্ব্বনাশ! দেখিলেন যে, সাহেবের পিঠের জামার উপর আগের দুই পা রাখিয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর একটা শৃগাল উঠিতেছে! অন্য স্ত্রীলোক হইলে ভয়ে পলায়ন করিত। কিন্তু আদুরীর আয়ী ডাকা-বুকো সাহসী স্ত্রীলোক ছিলেন।

"ও সাহেব, পাগলা শেয়াল! ও সাহেব, শেয়াল!"—এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে তিনি সাহেবের পশ্চাৎ দিকে আসিয়া হাতের ঠেঙ্গার বাড়ি শৃগালকে দুই ঘা মারিলেন। শৃগাল সাহেবকে ছাড়িয়া আদুরীর দিদিমাকে আক্রমণ করিল ও দুই তিন স্থানে বিলক্ষণ দংশন করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সাহেবও উঠিয়া বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে শৃগালকে বধ করিলেন।

আদুরীর মাতামহীকে শৃগাল দংশন করিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে, তাহা দেখিয়া সাহেব সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। সাহেব বলিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে সহরে চল, ভাল ডাক্তার দেখাইয়া তোমার চিকিৎসা করাইব। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি কিছুতেই শুধিতে পারিব না।"

আদুরীর দিদিমা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"তোমার সহিত সহরে যাইলে, ডাক্তারের ঔষধ খাইলে, আমার জাতি যাইবে। আমি ঘরে লোহা পোড়াইয়া দিব, কলার ভিতর করিয়া সুলতানি বনাত খাইব ; তাহা করিলেই ভাল হইয়া যাইব। আমি বৃদ্ধা বিধবা ; আমাদের সহজে মৃত্যু হয় না।"

সাহেব তাহার পর তাঁহাকে ছোট একটি চামড়ার থলি অর্থাৎ মণি ব্যাগ দিলেন ও বলিলেন,—"তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ। সে ঋণ ইহাতে শোধ হয় না। তবে আমার নিকট যাহা ছিল, সমস্ত আমি তোমাকে দিলাম। ইহার ভিতর যাহা আছে, তাহা খরচ করিয়া আপনার চিকিৎসা করাইবে।"

এই বলিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন।

বাটী আসিয়া আদুরীর আয়ী মণিব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর পাঁচটি টাকা ও ছোট একখানি ছাপার কাগজ রহিয়াছে। টাকা কয়টি লইয়া তিনি কাগজখানি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আদুরীর মা বলিলেন,—"মা! কাগজখানি ফেলিও না, এ হয় তো সামান্য কাগজ নয় ; সেই যারে বলে নোট, এ হয় তো তাই। হাটবার দিন হাটে গিয়া গদাধর কাপড়-ওয়ালাকে দেখাইবে। এ নোট কি না, সে তোমায় বলিয়া দিবে।"

হাটবার দিন সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া আদুরীর দিদিমা গদাধরকে কাগজখানি দেখাইলেন। গদাধর সৎ লোক। গদাধর বলিল,—"এ নোট বটে! এক শত টাকার নোট। কিন্তু নোট ভাঙ্গাইতে হইলে বাটা লাগে। এই কাগজখানি লইয়া আমি তোমাকে পাঁচ কম পাঁচ কুড়ি টাকা দিতে পারি।"

কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ কাগজখানি না দিয়া আদুরীর দিদিমা আরও পাঁচ জনকে দেখাইলেন। অন্যান্য লোক কেহ চারি টাকা কম, কেহ তিন টাকা কম, কেহ দুই টাকা কম পাঁচ কুড়ি টাকা দিতে চাহিল। কিন্তু আদুরীর দিদিমা তবুও কাগজখানি কাহাকেও দিলেন না। বাটী ফিরিয়া আসিয়া মেয়েকে বলিলেন,—"এত নগদ টাকা এখন এই কুঁড়ে ঘরে আনিলে বাড়ীতে ডাকাত পড়িবে, আমাদের সকলকে কাটিয়া ফেলিবে। আমার ঘা সারিয়া গেলে, আমি ভাল হইলে, চুপি চুপি টাকাগুলি আনিয়া ঘটী করিয়া একস্থানে পুতিয়া রাখিব। এখন খরচ করিয়া ফেলা হইবে না। সময় আছে, অসময় আছে। অসময়ে কাজে লাগিবে।"

তাহাই স্থির হইল। আদুরীর মাতামহী নোটখানি লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু কোথায় রাখিলেন, সে কথা কাহাকেও বলিলেন না, মেয়েকেও বলিলেন না। আদুরীর দিদিমার জলাতঙ্করোগ ঘটিল না বটে ; কিন্তু অল্প দিন পরে জ্বর-বিকার-রোগে সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল। পীড়ার প্রারম্ভেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সুতরাং নোটখানি কোথায় যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিলেন না।

তাঁহার মৃত্যু হইলে, আদুরীর মা ঘর আতিপাতি করিয়া সর্বত্র খুঁজিলেন ; কিন্তু নোট কিছুতেই পাইলেন না। নোটখানির জন্য অনেক কাঁদিলেন, অনেক দুঃখ করিলেন, অবশেষে নিরাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সুতরাং আদুরীর মাতার সৌভাগ্যসূর্য্য যেমনি উদয় হইল, তেমনি অমাবস্যা-নিশির নিবিড় তমোরাশিতে মিশিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চন্দ্রহার

"আদুরি! আদুরি! পোড়ারমুখি! বেলা উল্টে গেল যে! তোর জন্যে কি হাট বসিয়া থাকিবে? পোড়ারমুখি! দইটুকু না বেচিলে লুণ, লঙ্কা, হলুদ কোথা হইতে আসিবে? আর কি সে নোট আছে, যে মট্ করিয়া ভাঙ্গাইব আর এক মালসা টাকা লইয়া আসিব? তা যে, কপালগুণে কাঠের ময়ূরে হার গিলিল। তোর কি! তুই দুই দিন পরে শ্বশুরবাড়ী যাবি। আমার এমন কেউ নাই যে, এক বেলা এক মুঠা ভাত দেয়!"

এইরূপ বলিয়া আদুরীকে বকিতে লাগিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে আদুরী বলিল,—"যাই মা! যাই! এই যাই! এখনও তত বেলা হয় নাই।"

আদুরী কিছু বিলম্ব করিতেছিল, সত্য, বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণও ছিল। আদুরী নিতান্ত বালিকা নহে; অষ্টাদশবর্ষীয়া পূর্ণযুবতী। দুই বার শ্বশুরবাড়ী ঘর করিয়াছে। সংসারের কাজ লইয়া ছোট ননদ অর্থাৎ স্বামীর ছোট ভগিনীর সহিত কলহ হইয়াছিল। বিনা দোষে ছোট ননদ তাহাকে মারিয়াছিল। ভগিনীকে কিছু বলিতে না পারিয়া, স্বামী আদুরীকে মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আজ কয় মাস আদুরী মাতার গৃহে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার সর্বদা ভয় পাছে শ্বশুরবাড়ীর লোক, লাগাইয়া ভাঙ্গাইয়া স্বামীকে পর করিয়া দেয়। তাহার শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম অধিক দূরে নয়। সেই গ্রামে সৌরভী বলিয়া এক চঞ্চলা, অল্পবয়স্কা, বিধবা নাপিতিনী আছে। কেহ কেহ তাহার স্বামীকে সেই সৌরভীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়াছিল। আদুরীর কানে সে কথা উঠিয়াছিল। তাহাতে আদুরীর মন সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তাহার পর, স্বামী পূর্বে যেরূপ ঘন ঘন তাহার নিকট আসিতেন, এক্ষণে সেরূপ ঘন ঘন আর আসেন না। গত কল্য আসিবার কথা ছিল; কিন্তু আসেন নাই। তাহাও আদুরীর এক দুঃখের কারণ হইয়াছিল। স্বামী হয় তো হাটে আসিবেন, স্বামীর সহিত হয় তো হাটে সাক্ষাৎ হইবে, এই ভাবিয়া আদুরী আজ একটু ভাল করিয়া সাজ-গোজ করিতেছিল। সেই জন্যই আদুরীর ঘর হইতে বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছিল। মা, আদুরীর মনের কথা জানেন না; বিলম্ব দেখিয়া মা চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিলেন।

আদুরীর একখানি ভাল কালাপেড়ে কাপড় ছিল। সেই ধব-ধবে কাপড়-খানি আজ সে পরিধান করিল। একটু তেল মাখিয়া মাথার চুলগুলি আঁচড়াইল। গরু গরে চুণ খয়ের দিয়া একটি পান খাইল। ঘরের ভিতর মেটে দেয়ালের গায়ে পেরেকে বহুদিনের ছোট একখানি আরসী থাকিত। পান খাইয়া ঠোঁট লাল হইল কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত পেরেক হইতে আদুরী আরসীখানি পাড়িয়া লইল। আরসীখানি হাতে লইয়া, ঠোঁট একটু ফুলাইয়া, মুখ দেখিতে লাগিল। যে দুই এক কোসা চুল এলোথেলো ভাবে আশে পাশে পড়িয়াছিল, তাহা সোজা করিয়া দিল।

একমনে এইরূপ ভাবন করিতে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে বাহির হইতে মা পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"পোড়ারমুখি! আজ তোর কি আর বার হবে না?"

"যাই মা! যাই!—এই কথা বলিয়া আদুরী আরসীখানি দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলাইতে গেল। দৈবক্রমে আরসীর সুতা পেরেকে না লাগিয়া, পাশ দিয়া গেল। আরসীখানি তাহার হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

দুঃখে ও ভয়ে আদুরীর মন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। বহু দিনের আরসী। এই আরসীতে তাহার দিদিমা যৌবনকালে মুখ দেখিয়াছিলেন, চুল বাঁধিয়াছিলেন; তাহার মাও তাহাই করিয়াছিলেন; আদুরী নিজেও বাল্যকাল হইতে এই আরসীতে মুখ দেখিতেছিল। আজ সেই আরসীখানি তাহার অসাবধানতাবশতঃ ভাঙ্গিয়া গেল। মা সহজেই উগ্রস্বভাববিশিষ্টা স্ত্রীলোক; কথায় কথায় সর্বদা বকিয়া ঝকিয়া থাকেন। আজ মা যে কত তিরস্কার করিবেন, তাহার ঠিক নাই। খণ্ড খণ্ড হইয়া আরসী ঘরের মেজেতে পড়িয়া রহিল। সে সব কাচের খণ্ড আদুরী আর তুলিল না। ভয়বিহ্বল চিত্তে, শশব্যস্ত হইয়া দধির ভাণ্ড মাথায় লইয়া, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঘরের ভিতর ঝমাৎ করিয়া কি শব্দ হইল?"

আদুরী তাহার উত্তর না দিয়া কেবল বলিল,—"ইশ্! অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে!" এই বলিয়া হন্ হন্ করিয়া সে চলিয়া গেল।

হাটের নিকট বড় একটি আমবাগান আছে। সেই আমবাগান পার হইয়া হাটে প্রবেশ করিতে হয়। আদুরী দেখিল যে, সেই আমবাগানের ভিতর এক জন পুরুষ একটি স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। পুরুষ মানুষটি যে তাহার স্বামী, আদুরী তাহা চিনিতে পারিল। স্ত্রীলোকটির কেবল পশ্চাৎ দিক সে দেখিতে পাইল, তাহাকে সে চিনিতে পারিল না।

"এ আর কেহ নয়, এ সেই সৌরভী নৃপতিনী,"—এই ভাবিয়া আদুরী ঘোর শোকাকুলা হইয়া, সোজা পথ ছাড়িয়া, অপথ ধরিল। কাঁটা খোঁচা পায়ে ফুটিতে লাগিল; কিন্তু আদুরীর তাহা গ্রাহ্য নাই। মনের আবেগে দ্রুতবেগে সে চলিতে লাগিল। সহসা একটা কাঁটায় বাঁধিয়া তাহার সেই কালাপেড়ে কাপড়খানি ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। বহু কালের সঞ্চিত আরসীখানি ভাঙ্গিল, স্বামী পর হইয়া গেল, বড় সাধের কালাপেড়ে কাপড় ছিঁড়িয়া নষ্ট হইল!—আদুরীর আর দুঃখের সীমা রহিল না।

নিকটে একটি ছোট পুষ্করিণী ছিল। সেই পুষ্করিণীর ধারে, এক নির্জন গাছতলায়, দধির ভাণ্ডটি মাথা হইতে নামাইয়া সে ভূমিতে রাখিল। তাহার পর বাম হাতের উপর গণ্ডদেশ রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নীরবে সে কাঁদিতে লাগিল। দরদর ধারায় চক্ষের জল তাহার হাত বাহিয়া পড়িতে লাগিল। বিপদের উপর বিপদ! এমন সময় কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া সেই দধিভাণ্ডের ভিতর মুখ প্রবিষ্ট করিয়া দধি খাইতে চেষ্টা করিল। দধিভাণ্ড গড়াইয়া পুষ্করিণীর ভিতর পড়িল!

আর কিছু বাকি রহিল না! দুর্ভাগ্য একেবারে চরম সীমায় উঠিল! "হে ঠাকুর! আমার উপর আজ কেন এত লাগিয়াছ?" —এই বলিয়া আদুরী আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই স্থানে বসিয়া কাঁদিল। নিজের দুঃখ চাপা দিয়া, "মাকে আজ কি বলিয়া মুখ দেখাইব,"—কেবল তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। যাহা হউক, আর কি করিবে? অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিল; তাহার পর হাটে প্রবেশ করিল। সে স্থানে স্বামীকে দেখিতে পাইল না। এক জন পরিচিত লোকের নিকট হইতে দুই আনা পয়সা ধার করিয়া লঙ্কা, হলুদ, লবণ প্রভৃতি যাহা আবশ্যক ছিল, তাহা ক্রয় করিল। তাহার পর দুই প্রহর অতীত হইয়া গেলে, বিষণ্ণ বদনে বাটী ফিরিয়া আসিল।

বাটী আসিয়া, আদুরী পিঁড়া অর্থাৎ দাওয়ার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ও দুই হাতে চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিল। মা যত বলিলেন,—"আদুরী, কাঁদিস কেন?" "আদুরী, কাঁদিস কেন?"—আদুরী তাহার

কোনও উত্তর না দিয়া, কেবল ততই কাঁদিতে লাগিল। মা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনেক সান্ত্বনার পর অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে আদুরী বলিল,—"মা! আজ যে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।"

মা বলিলেন,—"আজ যাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিস, প্রতিদিন যেন তাহার মুখ দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে।"

এ আবার কি কথা! আরসীর জন্য তো গালাগালি তিরস্কারই হইবে,—তাহা না হইয়া, মায়ের মুখে মিষ্ট কথা! চক্ষু হইতে হাত দুইখানি সরাইয়া বিস্মিতভাবে আদুরী মাতার মুখপানে চাহিল।

আদুরীর মা বলিলেন,—"হাটের নিকট আমবাগানে জামাইকে দেখিয়া তুই অপথে চলিয়া গিয়াছিলি কেন? তোর বড় ননদ, যে তোকে বড় ভালবাসে, তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে সে আজ হাটে আসিয়াছিল। তোর ছোট ননদ বিনা অপরাধে তোরে মারিয়াছে,—ভাই-ভগিনীতে সেই কথা হইতেছিল। হাটের মাঝখানে ঘরের কথা না বলিয়া আমবাগানে একটু আড়ালে গিয়া ভাই-ভগিনীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তুই অপথ দিয়া পলাইয়া গেলি কেন?"

আদুরীর তখন চক্ষু ফুটিল। আদুরী তখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার স্বামী সৌরভী নাপতিনীর সহিত, কথা কহিতেছিল না, আপনার বড় ভগিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।

আদুরীর মা পুনরায় বলিলেন,—"তোর বড় ননদ তোকে দেখিতে আসিয়াছে। তোর জন্য চমৎকার একখানি নীলাম্বরী কাপড় আনিয়াছে; গুলবসানো ভাল নীলাম্বরী কাপড়;—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। জামাইও আসিয়াছেন। তাঁহারা স্নান করিতে গিয়াছেন। আর আদুরী! এখনও তোকে আমি সকল কথা বলি নাই। বড় আহ্লাদের কথা, আদুরী—"

স্বামী আসিয়াছেন শুনিয়া, আদুরীর মন প্রফুল্ল হইল। সহাস্য বদনে আদুরী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মা? কি আহ্লাদের কথা?"

আদুরীর মা বলিলেন,—"বল দেখি, কি? সেই যারে বলে চন্দ্রহার!"

ব্যগ্র হইয়া আদুরী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মা? কি? বল না!"

আদুরীর মা বলিলেন,—"এত দেশ থাকিতে তোর আম্মী আর স্থান পায় নাই। আরসীর পিছনের কাঠ খুলিয়া, নোট যে তাহার ভিতর গুঁজিয়া রাখিবে আবার কাঠটি যেরূপ ছিল, সেইরূপ করিয়া জুড়িয়া দিবে, এত কারখানা যে তোর আম্মী করিবে,—এ কথা আমি কি করিয়া জানিব? অন্য কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিলে পাছে উইপোকায় খাইয়া ফেলে, সেই জন্য বোধ হয়, তোর আম্মী আরসীর ভিতর রাখিয়াছিল। যাহা হউক, ভাগ্যে আজ তুই আরসীখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলি, তাই তো নোটখানি বাহির হইয়া পড়িল! আমি ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলাম, আরসী চুরমার হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া গেল। তোরে গালি দিতে দিতে কাচগুলি কুড়াইতেছি, এমন সময় দেখি, না, পাশে একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে! কাগজখানি তুলিয়া দেখিলাম যে, সেই নোট! তখন তোরে যে কত আশীর্ব্বাদ করিলাম, তা বলিতে পারি না।"

সে দিন বড় আনন্দের দিন বটে। স্বামী আসিয়াছেন, বড় ননদ আসিয়াছেন, নীলাম্বরী কাপড় হইয়াছে, তাহার পর সেই এক ঘটী টাকার কাগজ পুনরায় লাভ হইয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা হইলে আদুরী বুঝিল যে, সৌরভী

বিষয়ে কথাটা সম্পূর্ণ অলীক ও অমূলক। সে দিন আদরীর মুখে আর হাসি ধরে না।

আদরীর মা পঞ্চাশ টাকা দিয়া মেয়েকে রূপার চন্দ্রহার গড়াইয়া দিলেন। সময় অসময়ের জন্য বাকি টাকা ঘটী করিয়া ঘরের এক কোণে পুতিয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয় মুণ্ড

ঘনশ্যাম বলিলেন,—সুবল গড়গড়ি মহাশয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"গল্পটি সমাপ্ত করিয়া মুণ্ডকে আমি বলিলাম ;—তবে, মহাশয়। এখন চলুন !"

আমি কোন উত্তর পাইলাম না।

কোন উত্তর না পাইয়া মুণ্ডের দিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য্য ! মায়ের বাম হস্তে মুণ্ড নাই। মুণ্ডের স্থানে চমৎকার একটি রক্তবর্ণের বৃহৎ মুক্তা রহিয়াছে। মুণ্ড এক্ষণে সেই মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এমন মুক্তা কখন দেখি নাই। সমুদ্রের মাঝখানে জ্বালার মত মুক্তা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার এরূপ জ্যোতি ছিল না। মায়ের বাম হস্তে এ রক্ত-মুক্তার প্রভায় চারি দিক্ আলোকিত হইয়া ছিল।

কিছুক্ষণ আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। এক্ষণে কি করা কর্তব্য, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। চিন্তা করিয়া অবশেষে এই স্থির করিলাম যে, ডাকিনীর নিকট যাইতে একে একে সমস্ত মুণ্ডদিগকে অনুরোধ করিব। একান্ত কাহাকেও যদি না লইয়া যাইতে পারি, সকল মুণ্ডই যদি ইহার মত রক্ত-মুক্তার রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে শেষকালে মায়ের এই খড়্গে আমি আপনার মুণ্ড কর্ত্তন করিয়া মায়ের পাদপদ্মে সমর্পণ করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া মুণ্ড-মালার নিম্ন দেশে যে মুণ্ডটি ছিল, তাহাকে আমি বলিলাম,—"মহাশয় আপনাদিগকে খুলিয়া কি কাটিয়া কি ছিঁড়িয়া লইয়া যাই, এরূপ শক্তি আমার নাই, তবে অনুগ্রহ করিয়া যদি আমার সহিত স্ব-ইচ্ছায় ডাকিনীর নিকট গমন করেন, তবেই আমার পরিত্রাণ হয়।"

মুণ্ডমালার মুণ্ড বলিল,—"একটি গল্প বল !"

আমি বলিলাম,—"এই মাত্র একটি গল্প করিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। গল্পটি শুনিয়া অম্যাকে ফাঁকি দিয়া মায়ের হাতে উনি রক্ত-মুক্তার আকার ধারণ করিলেন।"

মালার মুণ্ড বলিল,—"তবে ডাকিনীকে গিয়া বিবাহ কর।"

ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে, মনে মনে আমি এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। সে জন্য অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া আমি আর একটি গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমি বলিলাম,—"মুণ্ড মহাশয়। এবার আমি আপনার নিকট এক ভূতের গল্প করিব। এ বিলাতি ভূত, দেশী ভূত নহে, এ ঘটনাটি বিলাতে ঘটিয়াছিল।"

মুণ্ড বলিল,—"তবে শীঘ্র আরম্ভ কর, ভূতের গল্প শুনিতে আমি বড় ভালবাসি।"

আমি বলিলাম,—"এ গল্পটি টম্ সাহেবের কথা, আমার নিজের কথা নহে। মনে করুন যেন টম্ সাহেব এ গল্পটি করিতেছেন।"

ভূতের বাড়ী

প্রথম পরিচ্ছেদঃ টম্ সাহেব

টম্ সাহেব বলিতেছেন,—

সম্প্রতি এক জন পুরাতন বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হাসিতে হাসিতে তিনি আমাকে বলিলেন,—"দেখ টম্, এ লণ্ডন নগরে একখানি ভূতের বাড়ী আছে।"

আমি উত্তর করিলাম,—"বটে! সত্য বলিতেছ, না তামাসা করিতেছ? তুমি পণ্ডিত লোক, ভূতে তোমার বিশ্বাস নাই।"

আমার বন্ধু বলিলেন,—"না ভাই, না, তামাসা নয়। সেই বাটী আমি ভাড়া লইয়াছিলাম। তিন দিনের অধিক তাহাতে বাস করিতে পারি নাই। বিশেষ কিছু যে ভয়ানক দেখিয়াছি, তাহা নহে! তবে কিরূপ শব্দ হয়, মনের ভিতর সর্বদাই কেমন একটা আতঙ্ক হয়। কিন্তু সেই বাটীতে এক জন বৃদ্ধা বাস করে। কি করিয়া সে থাকে, তা জানি না। বৃদ্ধা বলিল,—"কোন ভাড়াটীয়াই সে বাড়ীতে দুই দিনের অধিক বাস করিতে পারে না।"

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভূতের বাড়ী! এত দিনের পর বুঝি আমার সাধ মিটিল। ভূত কিরূপ, দেখিতে চিরকাল আমার মনে একান্ত বাসনা। সেই সাধ মিটাইবার জন্য আমি শ্মশানে মশানে বনে জঙ্গলে ঘোর নিশীথে কত যে ঘুরিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ভূত দেখা আমার কপালে কখন ঘটে নাই। আজ কি ভগবান্ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন? দেখা যাউক, কি হয়।

বন্ধুর নিকট হইতে সে বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলাম। বাটীর নিকট গিয়া দেখিলাম—তালা বন্ধ। প্রতিবাসিগণের নিকট শুনিলাম যে, সে বাটীতে যে বৃদ্ধা বাস করিত, সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রিকালে ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সেই পর্য্যন্ত সে বাড়ীর ভিতর মনুষ্য দূরে থাকুক, কাক পক্ষী কেহ প্রবেশ করে না। সে বাড়ীতে নেংটি ইঁদুর কি বড় ইঁদুর, কোন ইঁদুর বাস করে না। আমার আরও কৌতূহল জন্মিল। প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে গৃহস্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি ধনবান্ লোক।

ভূতের বাড়ী আমি ভাড়া লইব শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন,—"বাড়ীর যে দুর্নাম আছে, তাহা বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন। আমি এতদিন নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছিলাম। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছি। আমার খুড়া মহাশয় ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। কবে হইতে ঐ বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। সপরিবারে নিজে আমি ঐ বাড়ীতে দুই দিন বাস করিয়াছিলাম। দুই দিনের পর প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিলাম। আপনি যদি সে বাটীতে কিছু দিন বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাড়ার টাকা লওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘর হইতে আপনাকে কিছু দিতে প্রস্তুত আছি।"

যাহা হউক, আমি চাবি লইয়া আসিলাম। আমার এক জন ডানপিটে বীরপুরুষ চাকর ছিল। ভূত প্রেত দানা দৈত্য কিছুই সে মানিত না। মনে

তাহার অপরিমিত সাহস, দেহে তাহার অসীম বল। তাহাকে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, আর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন হে, তুমি আমার সহিত সে বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিবে?"

চাকর উত্তর করিল,—"ভূত! ভূত আমার কাছে আসিবে? আমি ভূতের বাবা! দেখি, কেমন আমার সম্মুখে ভূত বাহির হয়! ভূতের চড়চড়ি করিয়া খাইব।"

তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে আহ্লাদ হইল। ভূত মানি আর নাই মানি, তবু যেন স্থানবিশেষে কালবিশেষে প্রাণটা কেমন ছেঁক ছেঁক করে, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। এক জন সঙ্গী থাকিলে মনে অনেকটা সাহস হয়। চাকরের হাতে চাবি দিয়া আমি বলিলাম,—"তুমি তবে সেই বাড়ীতে যাও, ঘর-দ্বার পরিষ্কার রাখ, বিছানা ঠিক করিয়া রাখ। আমার পিস্তল ও ছোরা লইয়া যাও, তোমার নিজেরও পিস্তল ও ছোরা ছাড়িও না। সন্ধ্যাবেলা আমি সে স্থানে যাইব।"

সন্ধ্যার সময় আমি সে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার চাকর দ্বার খুলিয়া দিল। চাকরের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হে, সব ভাল তো?"

ভৃত্য বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, সব ভাল।" এই কথা বলিয়া, চাকর আর একটু ঈষৎ হাসিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিছু দেখিয়াছ, না, কি?

সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞা না, কিছু দেখি নাই, তবে আমার কানের কাছে কে যেন ফুশ্ ফুশ্ করিয়া কথা কহিতেছিল। এরূপ শব্দ বার বার শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"তোমার ভয় হইয়াছে না কি?"

চাকর হাসিয়া বলিল,—"ভয়! আমার শরীরে ভয় নাই, আমি ভূতের বিধাতা পুরুষ। যদি ভূত দেখিতে পাই, আনন্দ হইবে, ভয়ের লেশ মাত্র মনে উদয় হইবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ভূতের খেলা

চাকরের সহিত এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে আমার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি অতি বিক্রমশালী, ভীরুতা কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। আপনা অপেক্ষা দ্বিগুণ দেহবিশিষ্ট বড় বড় ডালকুত্তাকে তাড়া করিয়া তাহার ঘাড় ধরিত। কোনও একটি নূতন বাড়ীতে যাইলে প্রথমেই সে কোথায় ইঁদুর আছে, কোথায় আরসলা আছে, তাহার জন্য গলি-ঘুঁজি এ কোণ সে কোণ শুঁকিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ সেই কুকুরের ব্যবহার দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। প্রথমতঃ সে সেই বাড়ীর ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করিবে না। অনেক আদর করিয়া ভুলাইয়া যদিও প্রবেশ করাইলাম, কিন্তু ভয়ে একবারে জড় সড় হইয়া গেল। পদদ্বয়ের ভিতর লাঙ্গুল রাখিয়া কুণ্ডলী হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পায়ে পায়ে জড়াইতে লাগিল। লম্ফ ঝম্ফ নাই, শব্দ নাই, ইঁদুর অনুসন্ধান নাই। আজ সে নীরব, আজ তার কিছুই নাই। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা এ ঘর সে ঘর বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এক তালা, দোতালা, তেতালায় কত যে কামরা, তাহা বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমরা বৃহৎ একখানি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ঘরের ভিতর, ভূতের দৌরাত্ম্য যাহাকে বলে, তাহার প্রথম সূচনা হইল।

ঘরটি আমার চাকর পরিষ্কার করে নাই। মেজেতে নিবিড় ধূলা পড়িয়াছিল কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ দেখিলাম, আমার ঠিক সম্মুখে একটি পায়ের দাগ পড়িল। শিশুর পদচিহ্ন। তাহার আগে, কি আশে পাশে আর দাগ নাই, কেবল সেই একটি দাগ মাত্র। অগ্রসর হইয়া সেই পদচিহ্নের উপর আমার নিজের পা রাখিলাম। অমনি, ঠিক সেই সময়ে আমার সম্মুখে আর একটি পায়ের দাগ পড়িল। আমি চাকরের গা টিপিলাম, চাকরও আমার গা টিপিল। এইরূপে যতই যাই, আগে আগে ধূলার উপর ততই এক একটি শিশুপদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকে। কিন্তু কেবল এক পায়ের চিহ্ন, দুই পায়ের দাগ পড়ে না। যখন ঘরের অপর প্রান্তে প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আর দাগ পড়িল না।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে একখানি বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। চাকর বাতি জ্বালাইয়া আমার সম্মুখে টেবেলের উপর রাখিল। সহসা ঘরের অন্য দিক হইতে একখানি চৌকি আকাশ-পথে উড়িয়া ঠিক আমার সম্মুখে পড়িল। আমি বলিলাম,—"বাঃ! মন্দ কথা নয়!"

ক্রমে দেখিলাম, সেই চৌকির উপর যেন কি বসিয়া রহিয়াছে। মানবের আকৃতি বটে, কিন্তু তাহার দেহ যেন অতি তরল ধূম দ্বারা গঠিত। কুকুরটি ভয়বিহ্বল হইয়া ঘোরতর আর্তনাদ করিতে লাগিল। চাকর তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেল। ঘাড় হেঁট করিয়া কুকুরকে সান্ত্বনা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় কি আমার পিঠে কিল মারিলেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"না, কি হইয়াছে?"

চাকর বলিল,—"আমার পিঠে কে ভয়ানক একটা কিল মারিল।"

আমি বলিলাম,—"এ সব কারখানা বোধ হয় বদমায়েশ লোকের। কি করিয়া করিতেছে, ধরিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।"

এক্ষণে এ ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম। আমার শয়ন-ঘর এই তালায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এখনও নিদ্রা যাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং এই তালায় অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। একটি ক্ষুদ্র কামরার নিকট উপস্থিত হইয়া চাকর বলিল,—"এ কি হইল! এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? আমি এই মাত্র ইহার চাবি খুলিয়া কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।" আমি দ্বার টানিয়া দেখিলাম, ভিতর হইতে কে খিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে! বিস্ময়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে, আশ্চর্য্য! দ্বার আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। আমরা দুই জনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক প্রকার অমানুষিক গন্ধে ঘর ক্রমে পরিপূরিত হইতে লাগিল। এক প্রকার ভৌতিক ত্রাসে আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। সে আশংকা যে কি, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। নরজীবনের প্রতিকূল কোন একটা ভীষণ পদার্থ যেন সেই ঘরে আছে এইরূপ আমাদের মনে হইল। সর্বনাশ! সহসা ঘরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল সে ঘরে আর অপর দ্বার কি জানালা ছিল না। প্রথম দুই জনে দ্বার টানা-টানি করিয়া দেখিলাম। খুলিতে পারিলাম না। আমার চাকর বলিল,"অতি পাতলা তক্তা দিয়া কপাট যোড়াটি গঠিত। দুই লাথিতে ভাঙ্গিয়া ফেলিব। দেখি ভূতে কি করিয়া রক্ষা করে! দুই লাথি নয়, হাজার লাথিতেও সে কপাট ভাঙ্গিল না। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে ভগ্নপ্রবণ কপাট ভাঙ্গিতে পারিলাম না। শ্রান্ত হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম। তখন খলখল করিয়া বিকট

হাসির শব্দ হইল। দ্বারটি আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। সে ভয়াবহ ঘর হইতে তাড়াতাড়ি আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা বারেণ্ডায় দাঁড়াইলাম। এক পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া কেমন একটা নীলবর্ণের অলৌকিক আলো জ্বলিতেছিল। কি আলো, কোথায় যাইতেছে, দেখিবার নিমিত্ত আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম। সিঁড়ি দিয়া আমাদের আগে আগে আলোটি তেতালায় উঠিতে লাগিল। তেতালার উপরে উঠিয়া সামান্য একটি শয়নাগারে প্রবেশ করিল। যে বৃদ্ধা এই বাড়ীতে একাকী বাস করিত, এই ঘরটি তাহার ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিলাম। ঘরের ভিতর একটি দেরাজ ছিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর একখানি রেশমের রুমাল রহিয়াছে। রুমালের এক ধারে দুইখানি চিঠি বাঁধা রহিয়াছে। চিঠি দুইখানি লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইলাম। দ্বিতলে আসিবার নিমিত্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার পাশে পাশে যেন আর কে নামিতেছে। কিন্তু তাহাকে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না। সহসা খপ্ করিয়া কে আমার হাত ধরিল। আমার হাত হইতে চিঠি দুইখানি কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত কে যেন বার বার চেষ্টা করিল। দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ করিয়া আমি তাহার সে চেষ্টা বিফল করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঘোর বিভীষিকা।

আমার নিজের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া প্রথম ঘাড়, পিস্তল ও ছোরা মেজের উপর রাখিলাম। নিকটস্থ ছোট একটি ঘরে চাকরকে শুইতে বলিলাম। মাঝের দ্বার খোলা রহিল। কুকুর ঘোরতর ভয়ে ভীত হইয়া ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। মাঝে মাঝে ত্রাসজনিত বিকট রোদনের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। যে পত্র দুইখানি উপর হইতে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পড়িতে লাগিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চিঠি দুইখানি কোন একটি পুরুষ তাহার প্রিয়তমাকে লিখিয়াছিল; কিন্তু নাম-ধাম কাহারও ছিল না। ভালবাসার কথা ছাড়া, তাহাতে কোন একটা বিভীষিকার আভাসও ছিল। যেন কে কাহাকে খুন করিয়াছে, এই ভাবের কথা। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আমি চৌকির উপর রাখিলাম। ঘরে দুইটি বড় বড় বাতি জ্বলিতেছিল। শীতপ্রধান দেশ। অগ্নিস্থানে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছিল। ফল কথা, ঘরটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ছিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার ঘড়িটি শূন্যপথে চলিয়া যাইতে লাগিল। এক হাতে ছোরা, অপর হাতে পিস্তল লইয়া তাড়াতাড়ি আমি ঘড়ি ধরিতে দৌড়িলাম। কিন্তু "সোঁৎ" করিয়া ঘড়ি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

পুনরায় আমি চৌকিতে বসিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। ঘরের ভিতর এক্ষণে বিকট শব্দ হইতে লাগিল। কুকুরটি ভয়ানক কাতর রবে ঘর পরিপূরিত করিল। আমি তাহাকে থামাইতে যাইলাম। যে কুকুর আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, আজ সেই কুকুর আমাকে কামড়াইতে আসিল! দংশনভয়ে আমি তাহার গায়ে হাত দিতে সাহস করিলাম না।

চাকর এই সময় সহসা তাহার ঘর হইতে দৌড়িয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে, মাথার চুলগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। মুখে নীল মাড়িয়া দিয়াছে। "মহাশয়

পলায়ন করুন, মহাশয় পলায়ন করুন! এ স্থানে আর তিলার্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন। বাপ রে, ধরিল রে, মা রে!" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তড়তড় করিয়া লাফে লাফে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু ধরিতে না ধরিতে সে সদর দরজা খুলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ শ্মশান সদৃশ অট্টালিকার ভিতর আমি এখন একা পড়িলাম।

এখন প্রাণে আমার অতিশয় ত্রাস হইল। একবার মনে ভাবিলাম, আমিও পলায়ন করি। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব সকলে হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি উপরে উঠিলাম, পুনরায় আমি নিজের শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। পুনরায় আমি পড়িতে বসিলাম। আমার হাতে পুস্তক,—সম্মুখে বাতি। পুস্তক ও বাতির মধ্যবর্তী স্থানে, আমার কোলে, তালগাছপ্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষের আকৃতি দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ছাদে ঠেকিল। সেই মস্তকে চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল। সর্ব-শরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। পিস্তল লইবার নিমিত্ত আমি হাত বাড়াইলাম। হাত অসাড় ও অবশ! হাত উঠিল না। আমি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। পা অসাড় ও অবশ। পা উঠিল না। চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। জ্ঞান হত হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু তখনও একটা চিন্তাশক্তি আমার মনে ছিল। ভাবিলাম, যদি এখন ভয় করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণ হারাইব। এইরূপ মনে করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম, বাতি নিবিল না, অগ্নি-স্থানে অগ্নি নির্বাণ হইল না, তথাপি ঘর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, যেমন করিয়া হউক, ঘরে আলো রাখিতে হইবে। অন্ধকারে থাকিলে মারা পড়িব।

পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিলাম। এবার উঠিতে পারিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া একটি জানালা খুলিয়া দিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। অল্প অল্প চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোকে দেখিলাম যে, তালবৃক্ষপ্রমাণ কৃষ্ণবর্ণের বিকট মূর্তি তখন সম্পূর্ণভাবে ঘরে নাই, কেবল তাহার ছায়াটি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুনরায় গিয়া চৌকিতে বসিলাম। পীত, হরিত, লোহিত—নানা বর্ণের গোলাকার আলোক এক্ষণে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ও গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর ভূমিকম্প হইলে যেরূপ হয়, ঘর সেইরূপ দুলিতে লাগিল। যে চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম, তাহার নীচে হইতে ঠিক জীয়ন্ত মানুষের রক্ত-মাংসের হাতের ন্যায় একখানি স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাতখানি ধরিতে যাইলাম। খপ করিয়া চিঠি দুইখানি লইয়া নিমেষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইহার পর, একখানি চৌকির উপর একটি যুবতী বসিয়া রহিয়াছে, এইরূপ দেখিলাম। তাহার পর একজন পুরুষ ঘরের ভিতর উপস্থিত হইল। বালকের মূর্তি, বৃদ্ধার মূর্তি, নানা প্রকার আকার ঘরের ভিতর আবির্ভাব হইতে লাগিল ও একে একে বিলীন হইতে লাগিল। তাহা ব্যতীত আরও যে কত ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইল, সে সকল বর্ণনা করিবার আর স্থান নাই।

মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার ঘাড় ভাঙিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে ঘাড়ে হাতও আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া আমি বার বার সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কি করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, তাহাই আশ্চর্য্য কথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ শেষ কথা।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা টম্ সাহেবের বিবরণ। প্রভাত হইলে এই সমুদয় উপদ্রব থামিল। টম্ সাহেব তখন এক প্রকার নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন; যাহা হউক, সে বাটী হইতে কি করিয়া পলাইবেন, এক্ষণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোনরূপে উঠিয়া কুকুরকে ডাকিলেন। কুকুর তাঁহার নিকটে আসিল না। কাছে গিয়া দেখিলেন যে, কুকুরটির গলদেশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কুকুর মরিয়া গিয়াছে।

টম্ সাহেবের চাকর সেই দিন অবধি বায়ুগ্রস্ত হইল। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে পলায়ন করিল।

বাড়ীওয়ালার নিকট গিয়া টম্ সাহেব চাবি ফিরাইয়া দিলেন, আর বলিলেন,—"ভূত দেখিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। যথেষ্ট হইয়াছে, সাধ বিলক্ষণ মিটিয়াছে।"

বাড়ীওয়ালা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার মত সাহসী পুরুষ পৃথিবীতে অতি বিরল। আপনার যে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাহাই পরম লাভ।"

তাহার পর চিঠি দুইখানির কথা শুনিয়া তিনি আরও বলিলেন,—"এত দিন ঐ বাড়ীতে যে বৃদ্ধা বাস করিতেছিল, পত্র দুইখানি বোধ হয় তাহার স্বামীর। আমার খুড়া মহাশয়ের জীবনকালে সে ব্যক্তি একবার ঐ বাটী ভাড়া লইয়াছিল। বৃদ্ধার স্বামী অতিশয় পাষণ্ড ছিল। বৃদ্ধার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে টাকার লোভে সে বধ করিয়াছে, দিনকত এইরূপ জনরব শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক, ঐ বৃদ্ধা ব্যতীত সে বাটীতে এ পর্য্যন্ত আর কেহ বাস করিতে পারে নাই। বৃদ্ধার মৃত্যুও সে দিন অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। সে সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলিয়া থাকে। সেই অবধি এমন একটি লোক পাই না যে, সাহস করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করে। বাড়ীটি দেখিতেছি, আগা-গোড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।"

টম্ সাহেব উত্তর করিলেন,—"বাড়ীটি আগাগোড়া না ভাঙ্গিয়া একটি কর্ম করিলে হয়। যে ঘরে আমরা বন্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, যে ঘরে বিকট গন্ধ বাহির হইয়াছিল, কেবল সেই ঘরটি প্রথম ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয়।"

বাড়ীওয়ালা তাহাই করিলেন। সেই ঘরের মাটীর নিম্ন হইতে নানারূপ অদ্ভুত দ্রব্য বাহির হইল। তাহা কি, সে কথা বলিবার আর স্থান নাই, আবশ্যকও নাই। বাড়ীওয়ালা সেই সমুদয় দ্রব্য পোড়াইয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে ভূতের উপদ্রব থামিয়া গেল।

গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন,—

গল্পটি সমাপ্ত হইবার পূর্বে আমি মুণ্ডের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলাম। কেমন ধীরে ধীরে ইহার নাসিকা, কর্ণ, মুখ প্রভৃতি বিলীন হইয়া গোলাকার ধারণ করিল! কেমন ধীরে ধীরে ইহা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল! ফলকথা, এ দিকে আমার গল্পটি সমাপ্ত হইল, আর ও দিকে মুণ্ডটিও রক্ত-মুক্তা হইয়া গেল।

এবার আর আমি পূর্বের ন্যায় আশ্চর্য্য হইলাম না। আর অধিক তর্ক-বিতর্ক না করিয়া, মালায় তাহার পাশের মুণ্ডটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়ের অভিপ্রায়

কি? আস্তে আস্তে আমার সহিত গমন করিবেন, না আপনার নিকটও একটি গল্প করিতে হইবে?"

তৃতীয় মুণ্ড বলিল,—"ডাকিনীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আর একটি গল্প কর। নতুবা বাহিরে গিয়া নারিকেলমুখীকে বিবাহ কর।"

কাজেই আমাকে আর একটি গল্প করিতে হইল।*

* গড়গড়ি মহাশয় একে একে মুণ্ডদিগের নিকট গল্প করিতে লাগিলেন। এক একটি গল্প সমাপ্ত হয়, আর এক একটি মুণ্ড রক্ত-মুক্তা হইয়া যায়, বার বার সে বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক।

পুরাতন কূপ

প্রথম অধ্যায় : নীলকুঠি।

কাণপুরের নিকট নবাবগঞ্জ নামক একটি স্থান আছে। সেই স্থানে একটি পুরাতন কূপ আছে। সেই কূপে এক বাঙ্গালী বালক একবার পড়িয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী বালক সেই সময়ে পাঁড়েনী নামক এক ব্রাহ্মণীর নিকট বাস করিতেছিল। পাঁড়েনীর স্বামী বালকের পিতার পাচক-ব্রাহ্মণ ছিল। এই ঘটনার কুড়ি বৎসর পরে জনকয়েক বাঙ্গালী বাবু পাঁড়েনীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট পাঁড়েনী সেই ঘটনা এইরূপে বর্ণন করিল :—

পাঁড়েনী বলিল,—কাণপুর হইতে ফরাক্কাবাদের রাস্তায় জোন সাহেবের নীলকুঠি ছিল। গোবিন্দবাবু সেই নীলকুঠিতে কাজ করিতেন। তিনি স্বজবাবু ছিলেন। সাহেব, বাবুকে অতিশয় ভালবাসিতেন। নিকটে একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরিবার লইয়া, গোবিন্দ বাবু তাহাতে বাস করিতেন। পরিবারের মধ্যে গোবিন্দবাবুর বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী। আমার স্বামী সেই সংসারে পাচক-ব্রাহ্মণের কাজ করিতেন। কালক্রমে গোবিন্দ বাবুর ভার্য্যা যুগল পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া, সূতিকা-ঘরেই মানবলীলা সংবরণ করেন। এ অঞ্চলে তখন বাঙ্গালীদিগের যথেষ্ট সম্মান ছিল। চারি দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। গোবিন্দবাবুর বিপদে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি নিজে শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সদাশয় জোন সাহেবও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন।

গোবিন্দবাবুর বৃদ্ধা মাতা নবপ্রসূত শিশু দুইটিকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এক সঙ্গে দুই জনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে নিমিত্ত পিতামহী তাহাদের নাম লব কুশি রাখিলেন। কিছু দিন পরে বাবু দেশে গিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়া নব বধূ লইয়া কর্মস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। নূতন বধূটির ক্রমে চক্ষু-মুখ ফুটিল, সেই সঙ্গে সপত্নীপুত্রদ্বয়ের উপর তাঁহার বিদ্বেষ দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। বাবু নিজেও ক্রমে ছেলেদের প্রতি অনাস্থাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিতান্ত দুরন্ত, এই বলিয়া সর্বদাই তিনি তাহাদিগকে তাড়না করিতেন। কিন্তু যত দিন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা জীবিতা ছিলেন, তত দিন শিশু দুইটির বিশেষ কোন অযত্ন হইতে পায় নাই। ছেলে দুইটির বয়স যখন পাঁচ বৎসর, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে পিতামহীর পরলোক হইল। পিতামহীকে হারাইয়া বালক দুইটি একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িল। বাপ স্নেহহীন, বিমাতা শত্রু। উঠিতে বসিতে প্রহার, তিরস্কার ও কুবাক্যে তাহাদের সুকোমল হৃদয় জর্জরিত হইল। বালক দুইটি দেখিতে কিন্তু রাজপুত্রের ন্যায়। সাধ করিয়া পিতামহী তাহাদের মস্তকে কেশ বাড়িতে দিয়াছিলেন। ঝোঁকড়া-ঝোঁকড়া কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকেশ-সম্বলিত মস্তক নাড়িয়া যখন দুই ভ্রাতায় কথাবার্তা হইত, তখন কাহার পাষাণ মন সে রমণীয় দৃশ্যে ও সে সুধামাখা স্বরে দ্রবীভূত না হইত? হইত না কেবল বিমাতার, আর হইতনা স্ত্রী-চরণপরায়ণ পিতা ঠাকুরের। মাতৃহীন বালক দুইটির সকল গুণই ছিল। দোষের মধ্যে ছিল কেবল বয়সগুণে অস্থিরতা, দৌড়াদৌড়ি ও দুরন্তপণা। ফল কথা, শিশু

দুইটির রূপ গুণ দিন দিন যতই বিকসিত হইতে লাগিল, বিমাতার মনে হিংসা-দ্বেষও ততই প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু জোন সাহেব তাহাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন, তাহাদের দুরন্তপণা তিনি ভালবাসিতেন, তাহাদের সহিত তিনি নিজে ছুটাছুটি করিতেন। নীলের হউজ হইতে শিশু দুইটি যখন তাঁহার দুগ্ধফেননিভ ধবল বসন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিত, তখন রাগ করা দূরে থাকুক, আদরে তিনি তাহাদিগকে বুকে করিয়া লইতেন। জুতা, মোজা ও ভাল ভাল পরিচ্ছদ জোন সাহেব তাহাদিগকে সর্বদাই কিনিয়া দিতেন। শিশু দুইটির আর এক জন সহায় ছিলেন। আমার পতি পাঁড়ে তাহাদিগকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। ভাল মাছ, দুধের সর, ঘরে যাহা কিছু উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইত, লুকাইয়া তিনি তাহাদিগকে তাহা আহার করিতে দিতেন।

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। লব কুশির বয়স সাত বৎসর হইল। এই সময়ে গদর পড়িল, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। দেশে অরাজকতার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। গৃহদাহ, লুট-পাট, মার-পিট, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি চারিদিকেই চলিতে লাগিল। বিদ্রোহিগণ ঘোর নিষ্ঠুরতা সহকারে সাহেব-দিগকে বধ করিতে লাগিল। বাঙ্গালীরা ইংরেজের গুরু, এই বলিয়া বাবুদের প্রতিও অত্যাচার কম হইল না। নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী আজিমুল্লা বাবুদের ডাকিয়া বলিল,—"তোমরা আমাদের অধীনে চাকরী কর।" বাবুরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। সেই অপরাধে বাবুদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবার হুকুম হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কার্য্যে তাহা পরিণত হয় নাই।

জোন সাহেব গোবিন্দ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবু! এ স্থানে আর আমার থাকা উচিত নয়। বদমায়েসেরা আমাকে মারিয়া ফেলিবে। আপাততঃ কাণপুরে গিয়া আশ্রয় লইব। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি যথারীতি কুঠির কর্ম চালাইবে। যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া গোবিন্দ বাবুর হস্তে সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন। নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের জোন সাহেব বাপ-মা ছিলেন। দয়া-মায়া, পরোপকারে তিনি দেবস্বভাববিবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। জোন সাহেব তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, এই অশুভ সংবাদে চারি দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। শত শত লোক আসিয়া যোড়হস্তে জোন সাহেবকে বলিল,—"মহাশয়! আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না, আপনার নিমিত্ত আমরা সকলে প্রাণ দিব।"

কিন্তু সে ঘোরতর বিপ্লবের সময় জোন সাহেব সে স্থানে থাকা উচিত বোধ করিলেন না। বাবুর হাতে সকল কর্মের ভার দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। জোন সাহেব একবার বিলাতে গিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার গৃহ শূন্য হইয়াছিল। আর তিনি বিবাহ করেন নাই।

জোন সাহেব চলিয়া গেলে, দুই দিবস পরেই বদমায়েসেরা সাহেবের বাঙ্গালা জ্বালাইয়া দিল। গোবিন্দ বাবুর ঘর লুট-পাট করিল। তাঁহাকে খুঁটিতে বাঁধিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিল। তাঁহার স্ত্রীর গায়ে যাহা-কিছু গহনা-পত্র ছিল, সে সমস্তই কাড়িয়া লইল। পুনরায় আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলিবে, এরূপ ভয়ও দেখাইল। সর্বত্রই তখন বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত। বিচার নাই, বিবেচনা নাই, ঘোরতর অরাজকতা! কোন স্থানে সপরিবারে পলাইয়া যে, আপনার, স্ত্রীর ও শিশু দুইটির প্রাণরক্ষা করিবেন, এরূপ উপায় গোবিন্দ বাবুর ছিল না।

বাবুরাম নামক এক জন সে দেশী কায়স্থ তাঁহার অধীনে কর্ম করিতেন। বাবুরামের নিবাস অযোধ্যার এলাকায় হরডুই জিলায় একখানি গ্রামে। এই

বিপ্লবের সময় পরিবারবর্গকে বিদেশে নিজের কাছে রাখা উচিত নয়, এই ভাবিয়া বাবুরাম তাহাদিগকে হরড়ই পাঠাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিলেন।

গোবিন্দ বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"ভাই! তোমার পরিবারবর্গের সহিত যদি আমার স্ত্রী ও পুত্র দুইটিকে তোমার গ্রামে পাঠাইয়া দাও, ও তোমার গৃহে তাহাদিগকে কিছু দিনের নিমিত্ত আশ্রয় দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়; এমন কি, তাহাদিগের প্রাণদান করা হয়। তা না হইলে এবার আসিয়া বদমায়েসেরা সকলকে মারিয়া ফেলিবে। পরিবারবর্গ কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত হই। তাহার পর আমার নিজের কপালে যাহা থাকে, তাহাই হইবে।"

বাবুরাম উত্তর করিলেন,—"আমার পরিবারের সহিত আপনার স্ত্রীকে আমি পাঠাইতে পারি। কিন্তু বালক দুইটির ভার আমি লইতে পারিব না। তাহারা এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করিবে। এ হুলুস্থুলের সময় কে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? সঙ্গে আমি নিজে যাইতে পারিতাম, তাহা হইলেও একটা কথা থাকিত। কিন্তু সাহেবের অবর্তমানে তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আপনিও যাইবেন না, আমিও যাইব না।"

অগত্যা গোবিন্দ বাবু কেবল স্ত্রীকে বাবুরামের পরিবারের সহিত পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

ছেলে দুইটি লইয়া এখন মোর ভাবনা উপস্থিত হইল। কবে কে আসিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া যাইবে, সর্বদাই এই ভয় হইতে লাগিল। অবশেষে পাঁড়ে বলিলেন,—"মহাশয় যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে ছেলে দুইটিকে আমি কাণপুরে রাখিয়া আসি। কাণপুরের নিকট নবাবগঞ্জে মাঠের মাঝখানে একটি নির্জন বাগানে বনের ভিতর আমার স্ত্রী বাস করেন। সে স্থানে কোন ভয় নাই। আমার স্ত্রীর দুইটা মেটে কলসী চুরি করিতে কেহ আর যাইবে না। যদি বলেন তো লব কুশিকে আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া আসি।"

গোবিন্দ বাবু আমার স্বামীর কথায় সম্মত হইলেন। স্বামী রাত্রিকালে ছেলে দুইটিকে একখানি গরুর গাড়ীতে বসাইয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লব ও কুশি।

তাড়াতাড়ি আমি একখানি চারপাই পাতিয়া দিলাম। জোন সাহেব যে ভাল মখমলের জামা দিয়াছিলেন, ছেলে দুইটি সেই জামা পরিয়া ছিল। তাহাদের কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল এলোথেলো হইয়া বুকে পিঠে পড়িয়াছিল। দেবকুমার তুল্য তাহাদের রূপ! বনের ভিতর আমার সেই ভাঙ্গা খোলার ঘর সেই অপূর্ব রূপ-রাশিতে আলোকিত হইল। বাজার হইতে পেঁড়া, জিলেপি প্রভৃতি খাবার কিনিয়া দিয়া, আমার স্বামী পুনরায় বাবুর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

অজ্ঞাত স্থানে, অপরিচিত লোকের কাছে আসিয়া ছেলে দুইটি প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিল। কিছুক্ষণ তাহারা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমার আদর ও স্নেহে ক্রমে তাহাদের সাহস হইল। ক্রমে তাহারা দুই একটি কথা কহিতে লাগিল। তাহার পর যখন কে লব কে কুশি এই লইয়া আমি ক্রমাগত ভুল করিতে লাগিলাম, তখন আর তাহারা হাসি রাখিতে পারিল না; হা হা করিয়া দুই ভাই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সেই সময় হইতে তাহারা ভয় ও লজ্জা-ভাঙ্গা হইয়া

গেল। বস্তুতঃ কে লব আর কে কুশি, তাহা চিনিবার যো ছিল না। একরূপ মুখ, একরূপ চক্ষু, সব ঠিক একরূপ। তাহার উপর আবার একরূপ চুল ও একরূপ পোষাক। কে লব কে কুশি, চারি পাঁচ দিন আমার চিনিতে গেল।

এক দিন লব আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"পাঁড়েনি! তোমরা হিন্দুস্থানী; বাবাকে বাঁধিয়া তোমরা মারিয়াছিলে। তোমরা কি আমাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে?"

আমি বলিলাম,—"না বাবা! তোমাদিগকে কেহ কিছু বলিবে না। কাহার এমন পাষাণ হৃদয় আছে যে, তোমাদের গায়ে হাত তুলিবে?"

কুশি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কাঁসিখানি আমাকে বাজাইতে দিবে, পাঁড়েনী? কাঁসি বাজাইতে আমি বড় ভালবাসি।"

আমি বলিলাম,—"কুশি! কাঁসিখানি একবার তোমাকে বাজাইতে দিব। অধিক বাজাইলে কাঁসি ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমরা গরীব মানুষ; পুনরায় কাঁসি কোথায় পাইব?—তোমরাই বা কিসে রুটি খাইবে?"

শুনিয়াছিলাম, ছেলে দুইটি বড় দুরন্ত। কিন্তু আমার কাছে তাহারা কিছুমাত্র দুষ্টপনা করে নাই। ছেলেমাত্রই মিষ্ট কথার বশ। লব কুশিও তাহাই ছিল। তবে দোষের মধ্যে এই যে, আমি তাহাদিগকে ঘরে আটক করিয়া রাখিতে পারিতাম না। তাহারা মাঠে-মাঠে, এ বাগানে সে বাগানে বেড়াইতে যাইত। ছোট ছোট গাছে উঠিত। মাঝে মাঝে নবাবগঞ্জের বাজারেও যাইত, কিন্তু নবাবগঞ্জের সকল লোকেই তাহাদিগকে ভালবাসিত।

রামদীন নামক নবাবগঞ্জে একটি যুবক ছিল। সে ভাল লোক ছিল না। এই দুর্দ্দিনে মন্দ লোকের বড়ই প্রভুত্ব বাড়িয়াছিল। দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করা তো সামান্য কথা, এখন কেহ কাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও তাহার দাদ-ফরিয়াদ ছিল না। এক দিন লব কুশিকে রামদীনের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়া আমার প্রাণে বড় আতঙ্ক হইল। বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া যদি সে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলে, আমার সেই আশঙ্কা হইল। কিন্তু ভয়ে আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না।

আর এক দিন দুই ভাই একটি পায়রার ছানা লইয়া বাটী আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পায়রার ছানা তোমরা কোথায় পাইলে?"

কুশি বলিয়া ফেলিল,—"রামদীন আমাদিগকে পাতকোর ভিতর হইতে ধরিয়া দিয়াছে।"

লব অমনি বলিয়া উঠিল,—"কুশি! কুশি! করিলে কি? বলিয়া দিলে! রামদীন যে মানা করিয়াছিল। রামদীন যে তোমাকে কাটিয়া ফেলিবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কূপ! কোন কূপ হইতে রামদীন তোমাদিগকে পায়রা ধরিয়া দিয়াছে?"

কুশি উত্তর করিল,—"না পাঁড়েনি, আমি আর বলিব না। সে কূপের ভিতর গর্ত্ত আছে। সে গর্ত্তের ভিতর রামদীন কখন কখন শুইয়া থাকে। তাহার ভিতর রামদীনের টাকা আছে। বলিতে সে মানা করিয়াছিল। যদি বলি, সে আমাকে কাটিয়া ফেলিবে।"

যাহা হউক, ছেলে দুইটিকে ভুলাইয়া আমি সকল কথা বাহির করিলাম। বুঝিলাম যে, আমাদের বাড়ী হইতে অল্প দূরে যে একটি বাগান আছে, আর সেই বাগানের ভিতর যে এক পুরাতন অন্ধকূপ আছে, রামদীন সেই কূপ হইতে কপোতশাবক ধরিয়া দিয়াছিল। আরও বুঝিলাম যে, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া যখন সরকারী খাজানাখানা লুঠ করে ও পথে মাঠে টাকা ছড়াইয়া ফেলে, তখন রামদীন কিছু টাকা সংগ্রহ করে, আর সেই টাকা কূপের ভিতর সে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

পরদিন আমি রামদীনকে মিনতি করিয়া বলিলাম,—"বাবা! অনাথ শিশু দুইটি আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহাদিগকে প্রাচীন অন্ধকূপের নিকট লইয়া যাওয়া কি ভাল? কোন্ দিন পড়িয়া গিয়া শেষে কি তাহারা প্রাণ হারাইবে!"

"তোমাকে বলিয়া দিয়াছে, বটে!" এই কথা বলিতে বলিতে রামদীন গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

চারি পাঁচ দিন গত হইয়া গেল। এক দিন অপরাহ্ণ তিনটার সময়, যে বাগানে সেই অন্ধকূপ আছে, ছেলে দুইটি সেই বাগানে খেলা করিতেছিল। কুশি সে দিন আমার নিকট হইতে আর একবার কাঁসি চাহিয়া লইয়াছিল। নিকটে সেই বাগানের বাহিরে, আমি গরু দুইটি ছাড়িয়া দিয়া, পাছে কাহারও ক্ষেতে পড়ে, এ নিমিত্ত চৌকি দিয়া বসিয়াছিলাম। ও দিকে কুশি কাঁসি বাজাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া ছেলেদের জন্য আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিছু ক্ষণ পরে সহসা কাঁসির শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। "লব তুমি পারিবে না, আমি নামি," এই কয়টি কথা সহসা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এই কয়টি কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীন কূপের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, লব উপরে দাঁড়াইয়া আছে, আর সর্বনাশ! একটি ঝাঁকড়ামাথা কূপের ভিতর নামিতেছে! সেই মুহূর্তে ঝাঁকড়া মাথাটি কূপের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

"ও মা! এ কি সর্বনাশ হইল," "কে কোথায় আছ, শীঘ্র এস,"—এরূপ চীৎকার করিতে করিতে আমি কূপের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িলাম। কূপের নিকট আসিয়া লবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"লব! লব! কুশি কই?"

লব উত্তর করিল,—"তোমার কাঁসিখানি কূপের ভিতর পড়িয়া গিয়াছে, কুশি তাহা তুলিয়া আনিতে কূপের ভিতর নামিয়াছে।"

পাতকোর ভিতর আমি উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু কুশিকে দেখিতে পাইলাম না। আমি তাড়াতাড়ি কূপের ভিতর নামিতে চেষ্টা করিলাম; কিছুতেই নামিতে পারিলাম না। পুনরায় উপরে আসিয়া কূপের ভিতর মুখ করিয়া,—"কুশি! কুশি!" করিয়া বারবার চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমি কত ডাকিলাম. লব কত ডাকিল; কিন্তু কোন উত্তর নাই; কোন সাড়া শব্দ নাই। ঘোরতর বিপদ যে ঘটিয়াছে, তখন তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে লোক ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু সে মাঠের মাঝখানে কাহারও সাড়া পাইলাম না, জনপ্রাণী কেহ আসিল না। তখন আমি লবকে বলিলাম,—"তুমি শীঘ্র নবাবগঞ্জে গিয়া খবর দাও। দুই চারি জন পুরুষ মানুষ, যাহাকে দেখিতে পাও, তাহাকে ডাকিয়া আন। আমি কূপের ধারে দাঁড়াইয়া থাকি।"

লব নবাবগঞ্জের দিকে দৌড়িল।

মাঝে মাঝে আমি কূপের ভিতর মুখ করিয়া, 'কুশি কুশি' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে করিলাম যে, আর এখন লোক আসিলেই বা কি হইবে! যা হইবার, তা হইয়া গিয়াছে, ঘোর সর্বনাশ ঘটিয়াছে! কূপে তখন প্রায় চারি পাঁচ হাত জল ছিল। হয় কুশি তাহাতে ডুবিয়া মরিয়াছে, আর না হয় কূপের দূষিত বায়ুতে শ্বাসরোধ হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। এখন লোক আসিলে আর কোন ফল হইবে না, কেবল তাহার মৃতদেহটি তুলিবে। আশা ভরসা একেবারে গেল বটে, তথাপি মন বুঝিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তখনও লব ফিরিল না। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নিজে নবাব-

গঞ্জের দিকে দৌড়িলাম। পথে দেখিলাম, লব দুই জন পুরুষ মানুষ সঙ্গে লইয়া আসিতেছে। তাহাদের এক জনের হাতে কূপ হইতে লোটা তুলিবার কাঁটা ছিল।

সকলে পুনরায় কূপের নিকট আসিলাম। রজ্জু-সংযুক্ত কাঁটা প্রথম তাহারা কূপের ভিতর নামাইয়া দিল। জল ভেদ করিয়া কাঁটা গিয়া ভূমি স্পর্শ করিল। চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কাঁটা দিয়া তাহারা কূপের নিম্নদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। কাঁটাতে কোন বস্তুই বাধিয়া গেল না। কূপের ভিতর কুশির চিহ্ন মাত্রও তাহারা দেখিতে পাইল না। অবশেষে এক জন লোক কূপের ভিতর গিয়া নামিল। জলে ডুব দিয়া অনেক অনুসন্ধান করিল। কুশির মৃতদেহ তাহারা পাইল না। কুশি যে কূপের ভিতর পড়িয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যখন সে কূপের ভিতর প্রবেশ করে, লব তখন উপরে; সে, আগা-গোড়া সমুদয় দেখিয়াছে। দূর হইতে আমিও কুশির মাথা দেখিতে পাইয়াছিলাম। সুতরাং সে যে কূপে পড়িয়া মরিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু মৃতদেহ গেল কোথা?

যে লোকটি কূপের ভিতর নামিয়াছিল, সে বলিল,—"কূপের পার্শ্বে অনেকগুলি গহ্বর আছে, এমন কি জলের ভিতরও একপার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত। সেই গর্ত্ত বোধ হয়, পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাক্ষসে হয় তো তাহার মৃতদেহ টানিয়া লইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।"

ক্রমে সে স্থানে আরও অনেক লোক আসিল। আরও দুই চারি জন কূপের ভিতর নামিল। কিন্তু কুশির কিছুমাত্র সন্ধান হইল না।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। আর কি করিব! লবকে লইয়া আমি আমার কুটীরে যাইলাম।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ শুভ সংবাদ

"কুশি কোথায় গেল, কুশির কি হইল," এই কথা বলিয়া লব কাঁদিয়া আকুল হইল। দুই জনে এক প্রাণ এক শরীর বলিলেও হয়। আজ কুশিকে হারাইয়া চারি দিক সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, লবও বাঁচিবে না। তাহার পর আমার নিজের কথা। আমার ছেলে পিলে হয় নাই। কুশি যদি আমার নিজের ছেলে হইত, তাহা হইলে, সে দিন আমি যেরূপ হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা বোধ হয়, অধিক শোকাকুলা বা অধিক অধীরা হইতাম না। লবের ভয়ে অধিক কাঁদিতে পারিলাম না। মনের ভিতর শোকানল গুমে গুমে জ্বলিতে লাগিল। হায়! কি করিয়া আমি পুনরায় পাঁড়ের নিকট এ পোড়া মুখ বাহির করিব? আমি কুশির বাবাকে কি বলিব!

কোনরূপে সে কাল-রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পর দিন লব ও আমি পুনরায় কূপের ধারে গিয়া বসিলাম। সান্ত্বনা করিতে করিতে আমি লবকে একবার বলিয়াছিলাম যে, "কুশি স্বর্গে গিয়াছে।" লব সেই কথাটি ক্রমাগত তোলা-পাড়া করিতে লাগিল।

লব বলিল, "স্বর্গ উপরে, যে স্থানে সূর্য্য উঠে, চন্দ্র উঠে, নক্ষত্র উঠে। কুশি সেখানে যায় নাই, কুশি কূপের ভিতর গিয়াছে। সেখানে অন্ধকার, সেখানে পাতাল; সেখানে স্বর্গ নয়। কুশি যদি স্বর্গে যায়, তাহা হইলে প্রথম সে কূপ হইতে উঠিবে, তাহার পর স্বর্গে যাইবে। সেই সময় আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিব,

তাহাকে স্বর্গে যাইতে দিব না। চল, পাঁড়েনি, তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত কূপের ধারে গিয়া আমারা বসিয়া থাকি।"

কি করি! ছেলেকে তা না হইলে কিছুতেই সুস্থির রাখিতে পারি না। কাজেই দুই জনে কূপের ধারে গিয়া বসিয়া রহিলাম। বাজার হইতে খাবার আনাইয়া লবকে দিলাম, কিন্তু সে কিছুই খাইল না। বিরসবদনে, একান্ত মনে, সমস্ত দিন কেবল কূপের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইলে অনেক বুঝাইয়া লবকে লইয়া বাড়ী যাইলাম।

কিন্তু লব বলিল,—"পাঁড়েনি! আজ আমি ঘরের ভিতর শুইব না। ঘরের বাহিরে এই স্থান হইতে পাতকো দেখা যায়, কূপের দিকে চাহিয়া আমি এই স্থানে বসিয়া থাকিব। কূপ হইতে কুশি যখন উঠিবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আনিব।"

কি করি! চারপাই আনিয়া সেই স্থানে দুই জনে বসিয়া রহিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। লব একদৃষ্টে কূপের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। শোকে তাপে অনাহারে, আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়াই একটু অবসন্ন হইয়া পড়িলাম; আমার চক্ষু দুইটি একটু বুজিয়া আসিল। এমন সময় সহসা লব চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ কুশি, ঐ কুশি, ঐ কুশি আসিয়াছে।"

এই কথা বলিয়া সে পাগলের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে কূপের দিকে দৌড়িল। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিছু দূরে দেখি যে, সত্য সত্যই কুশি! টলিতে টলিতে কুশি আসিতেছে!

লব তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল,—"কুশি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, ভাই! পাঁড়েনি বলে, তুমি স্বর্গে গিয়াছ। আমি বলিলাম, না পাঁড়েনি, কুশি স্বর্গে যায় নাই। সে একলা কোথাও যায় না। যেখানে যাই, আমরা দুই জনে একসঙ্গে যাই। এখন চল, ভাই, বাড়ী চল। আমি তোমাকে স্বর্গে যাইতে দিব না।"

অন্য সময় হইলে, বোধ হয় ভূত বলিয়া আমার মনে ভয় হইত। কিন্তু তখন আমার জ্ঞান ছিল না। তাড়াতাড়ি গিয়া আমি কুশিকে কোলে লইলাম। কোলে লইয়া তাহাকে বাড়ী আনিলাম। কিন্তু ছেলে কথা কহে না। তাহার শরীর কৃশ, মুখ মলিন, মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। মুখে হাতে তাহার জল দিলাম। ঘরে দুধ ছিল, তাহাকে খাইতে দিলাম, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে কুশির মুখ দিয়া দুই একটি কথা বাহির হইল। কি ঘটিয়াছিল, কুশির মুখ হইতে তখন ক্রমে ক্রমে সকল কথা জানিতে পারিলাম।

কুশি বলিল,—"পাতকোর ধারে আমরা দুই জনে খেলা করিতেছিলাম। মাঝে মাঝে একবার লব, একবার আমি, আমরা দুই জনে কাঁসি বাজাইতেছিলাম। এমন সময় কূপের ভিতর হইতে একটি পায়রা উড়িয়া গেল। কূপের ভিতর কোন্ স্থানে পায়রার বাসা আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি উঁকি মারিলাম। দৈব-ক্রমে আমার হাত হইতে কাঁসিখানি কূপের ভিতর পড়িয়া গেল। কূপের গা অনেক স্থানে ভাংগা ছিল, ইটের খাটাল বাহির হইয়াছিল। কূপে যে জল আছে, তাহা আমি জানতাম না। এ কূপ হইতে কেহ জল লয় না। সে জন্য মনে করিলাম যে, কূপে জল নাই, কূপ শুষ্ক। ইটের খাটাল দিয়া কূপের ভিতর অনায়াসে নামিতে পারা যায়। কাঁসির জন্য, পাঁড়েনি, তুমি দুঃখ করিবে, তাই লব

কূপের ভিতর নামিতে চাহিল। কিন্তু আমি তাহাকে নামিতে দিলাম না। কাঁসি আনিবার নিমিত্ত আমি নিজেই নামিলাম।"

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কুশি পুনরায় বলিল,—"ভাঙ্গা স্থানের গর্ত্তে ও ইটের খাটালে পা দিয়া কূপের ভিতর আমি আস্তে আস্তে নামিতেছিলাম। এমন সময় একবার যেখানে আমি পা রাখিয়াছিলাম, হঠাৎ সেই স্থানের ইট একটু ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ঝুপ করিয়া অনেক নীচে গিয়া পড়িলাম ; কিন্তু একেবারে জলে গিয়া পড়ি নাই। সে স্থানে ইটের ভিতর হইতে ছোট একটি গাছ বাহির হইয়াছিল। আমি সেই গাছটি ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম। তৎক্ষণাৎ কে আসিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিল। আমাকে টানিয়া কূপের গায়ে একটি গর্ত্তে লইয়া গেল। সে স্থানে নিবিড় অন্ধকার। কে আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। তাহার পর তোমরা, 'কুশি, কুশি' করিয়া ডাকিতে লাগিলে। তখন সে বলিল,—"খবরদার! যদি কথা কও, কি উত্তর দাও, তাহা হইলে তোমাকে এখনি কাটিয়া ফেলিব।" তাহার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে রামদীন। ভয়ে আমি চুপ করিয়া রহিলাম ; উত্তর দিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ গর্ত্তের ভিতর নিঃশব্দে দুই জনে বসিয়া রহিলাম। তাহার পর উপরে তোমাদের আর কোন সাড়া-শব্দ পাইলাম না। তখন রামদীন বলিল,—'তুমি এই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, আমি দেখিয়া আসি।' এই বলিয়া রামদীন উপরে উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিল। আসিয়া বলিল,—'এখন উপরে কেহ নাই। বড় যে পায়রার কথা পাঁড়েনীকে বলিয়া দিয়াছিলি? এখন কি হয়? এখন যদি তোকে মারিয়া ফেলি, তাহা হইলে তোর কোন্ বাপ রাখে? কিন্তু তোকে প্রাণে মারিব না। বিলক্ষণ সাজা দিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিব।' রামদীন এখন আমাকে উপরে উঠিতে বলিল। ইটে পা দিয়া ছোট ছোট গাছ ধরিয়া আমি উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি একলা কিছুতেই উপরে উঠিতে পারিতাম না। উপর হইতে রামদীন হাত বাড়াইয়া দিতে লাগিল। সেই হাত ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অতি কষ্টে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, তুমিও নাই, লবও নাই, কেহ কোথাও নাই। তখন তোমরা নবাবগঞ্জে লোক ডাকিতে গিয়াছিলে। হাত ধরিয়া রামদীন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। বাগানের বাইরে সাহেবদের যে খোলার ঘরে সহিস ও চাকরেরা থাকিত, রামদীন আমাকে সেইস্থানে লইয়া গেল। আমাকে সে দুটি ছোলাভাজা খাইতে দিল। সেই ছোলাভাজা ও একটু জল খাইয়া আমি মাটীর উপর শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে রাত্রি হইল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সে রাত্রিতে আর কি হইল, তাহা আমি জানি না। আজ দিন হইলে রামদীন তলওয়ার বাহির করিয়া কখন আমাকে কাটিতে যাইতেছিল, কখন আমাকে মারিতে যাইতেছিল। সে বলিল,—'তোরে এক একবার মারিয়া ফেলিতে মন হয়, কিন্তু আবার মন হয় না। তাহা না হইলে কূপের ভিতর গলা টিপিয়া তোরে আমি মারিয়া ফেলিতাম। কেমন! পাঁড়েনীকে আর কিছু বলিবি? পায়রার কথা বলিয়াছিলি, তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমার টাকার কথা প্রকাশ করিয়া দিলি কেন?' আমি বলিলাম,—'পাঁড়েনীকে আর কখন কিছু বলিয়া দিব না। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বাড়ী যাই। আমার জন্য লব হয় তো কত কাঁদিতেছে।' সে বলিল,—'এখনও নয়, আরও জব্দ করিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিব।' রামদীনের কাছে অনেক টাকা আছে, সাহেবদের কাপড় আছে। সে সকল আমাকে দেখাইল। তাহার পর সে টাকা গণিতে বসিল। তাহার পর ঘরের ভিতর আমাকে বন্ধ করিয়া দ্বারে শিকল দিয়া, আজ রামদীন একবার বাহিরে গিয়াছিলাম। যদি আমি চীৎকার করি, তাহা হইলে আমাকে কাটিয়া

ফেলিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে একবার মাত্র অল্পক্ষণের নিমিত্ত বাজারে গিয়াছিল। বাজার হইতে পুরি আনিয়া সেও খাইল, আমাকেও খাইতে দিল। তাহার পর পুনরায় রাত্রি হইল। রামদীন নিদ্রা গেল। আজ আমি কোনরূপে পলাইব, এইরূপ মনে করিয়া জাগিয়া রহিলাম। অনেক রাত্রিতে রামদীনের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। যখন আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে, সে নিদ্রা গিয়াছে, তখন আমি আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া পলাইয়া আসিলাম।"

এই গেল কুশির বিবরণ। পর দিন আমি রামদীনের নিকট গিয়া তাহার পায়ে হাতে অনেক পড়িলাম। ঘরে আমার দুধ হইত, তাহাকে এক লোটা দুধ দিলাম। ঘি করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে ঘি তাহাকে দিলাম। বাজার হইতে পেঁড়া কিনিয়া দিলাম। এইরূপ বিধিমতে সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে বলিলাম,—"বাবা! শিশু দুইটির মা নাই! আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। আমার নিকট কুশি কিছু মাত্র তোমার নিন্দা করে নাই। তোমার কি আছে না আছে, সে কথাও কিছু বলে নাই। আর যদি তুমি দু-পয়সা রোজগার করিয়া থাক, সে তো ভাল কথা। সে কথা আমি গোপন রাখিব, কাহাকেও কিছু বলিব না। তুমি তাহাদিগকে পায়রা ধরিয়া দিয়াছিলে, সে জন্য লব কুশি তোমার কত সুখ্যাতি করিয়াছিল। সে দিন তুমি পাতকোর ভিতর না থাকিলে কুশি নিশ্চয় জলে পড়িয়া মারা পড়িত। ভাগ্যে তুমি সে সময় পাতকোর ভিতর ছিলে, তাই তাহার প্রাণ বাঁচিয়া ছিল। যদি বাছা, ছেলেটির তুমি প্রাণ রক্ষা করিলে, তবে আর তাহাকে কিছু বলিও না।"

কিছু দিন পরে ইংরেজের পুনরায় রাজত্ব হইল। দেশে পুনরায় বিচার-আচার আরম্ভ হইল, অরাজকতা ঘুচিল, লুট-পাট, খুন-খারাবি সব বন্ধ হইয়া গেল। দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইলে, গোবিন্দবাবু হরডুই হইতে স্ত্রীকে আনাইয়া ও আমার নিকট হইতে ছেলে দুইটিকে লইয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। আমাদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ তিনি যে টাকা দিলেন, পাঁড়ে সেই টাকা দিয়া জমী লইয়া চাষ করিতে লাগিলেন। আজ দশ বৎসর হইল, পাঁড়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি লোকের গম পিষিয়া ও নানা প্রকার দুঃখ ধান্ধা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি।

কিন্তু বাবু! ছেলে দুইটির জন্য এখনও আমার প্রাণ কাঁদে। সেই পর্য্যন্ত লব কুশির আমি কোন সংবাদ পাই নাই। তাহারা কোথায় আছে, কেমন আছে, বলিতে পারেন?

যাঁহাদের নিকট পাঁড়েনী লব ও কুশির গল্প করিতেছিল, সেই বাঙ্গালী বাবুগণ উত্তর করিলেন,—"না, পাঁড়েনি! আমরা তাহাদিগকে জানি না; যদি তুমি তাহাদের ঠিকানা বলিতে পারিতে, তাহা হইলে চিঠি লিখিয়া সংবাদ লইতে পারিতাম। তাহাদের বাড়ী কোন্ গ্রামে, কোন্ জেলায়, যখন তাহার কিছুই তুমি জান না, তখন কি করিয়া আমরা তাহাদের সন্ধান লইব?"

এই কথা শুনিয়া, আপনার পারিতোষিক লইয়া বিরস বদনে পাঁড়েনী চলিয়া গেল।

শম্ভু ঘোষের কন্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ : হরিদাসী

"হ্যাঁ! মহাশয়! ইহার নাম হরিদাসী, আমার এক মাত্র কন্যা। হরিদাসী আমাদের প্রাণ, গৃহিণীর ও আমার। হরিদাসীকে এক দণ্ড না দেখিলে পৃথিবী আমরা আঁধার দেখি। হরিদাসীকে একবার ভাল করিয়া দেখুন, মহাশয়! আমাদের ঘরে এমন মেয়ে হয় না, রাজার ঘরে হইলে তবে শোভা পায়।"

সত্য সত্যই হরিদাসীর রূপ-লাবণ্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। কন্যাটির বয়স দশ বৎসরের অধিক নয়। তথাপি তাহাকে একবার দেখিলে, বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। রংটি ফুটফুটে; চক্ষু দুইটি টানা টানা; চক্ষুর তারা দুইটি উজ্জ্বল, চুল চুলে ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষুর পাতাগুলি ঘন দীর্ঘ; নিবিড় মেঘ রাশির ন্যায় মাথার চুল;—ফল কথা, কৃষকের ঘরে এরূপ কন্যা অতি বিরল।

হরিদাসী শম্ভু ঘোষের কন্যা। শম্ভু ঘোষের নিবাস বীরভূম জেলা। ইঁহার ঘরে আজ কুটুম্ব আসিয়াছেন। আহারাদি করিয়া কুটুম্ব বাহিরের একখানি চালায় বসিয়া আছেন। বৈশাখ মাস, বেলা দুই প্রহর, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। শম্ভু ঘোষ কুটুম্বের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছেন। এমন সময় নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে হরিদাসী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। চালাখানি সহসা যেন আলোকিত হইল। কুটুম্ব হরিদাসীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া হরিদাসীর পিতা উপরের কথাগুলি বলিলেন।

শম্ভু ঘোষ পুনরায় বলিলেন,—"হাঁ মহাশয়! ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে, জীবের প্রতি দয়া করিলে, ভগবান্ যে প্রসন্ন হন, তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।"

কুটুম্ব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন? কি হইয়াছিল?"

শম্ভু বলিলেন,—"আপনি একটু শয়ন করুন, কাছে বসিয়া আমি সেই গল্প করি। বড় গল্প করিয়া আপনাকে আমি বিরক্ত করিব না, গল্পটি ছোট। হরিদাসী, মা! তুমি ঘরের ভিতর যাও।"

শম্ভু বলিলেন,—আজ পাঁচ বৎসরের কথা বলিতেছি। একবার ধান বেচিতে আমি শিউড়ি গিয়াছিলাম। আমার নিজের সামান্য একখানি গরুর গাড়ী আছে। ধানের থলিগুলি সেই গাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম।

যাইবার চারি পাঁচ দিন পূর্ব হইতে পাড়া প্রতিবাসী সকলে আসিয়া বলিতেছিলেন,—"ঘোষের পো! আমার জন্য এ জিনিস আনিও, কেহ বলিতেছিলেন, আমার জন্য সে জিনিস আনিও। কাহারও কাপড়, কাহারও বাসন, কাহারও শিল, এইরূপ নানাবিধ জিনিস আনিতে সকলে আমাকে অনুরোধ করিতেছিলেন। তাহার পর আমার নিজের গৃহিণীর ফর্দ্দ। সেও একরাশি জিনিসের ফর্দ্দ! আমি লেখাপড়া জানি না; মন আমার কাগজ কলম; যাহার যে বস্তু আবশ্যক, সে সব আমি মনে করিয়া লইলাম। অবশেষে হরিদাসীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার কি চাই, মা?"

হরিদাসী উত্তর করিল,—"আমার জন্য ভাল একটি কাঠের পুতুল আনিও, বাবা।"

যাইবার দিন প্রাতঃকালে হরিদাসী গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আদর

করিয়া আমি তাহাকে কোলে লইলাম। আমার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া হরিদাসী পুনরায় বলিল,—"আমার জন্য ভাল দেখিয়া কাঠের পুতুল আনিও, বাবা।"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ, মা! নিশ্চয় আনিব। শিউড়ির বাজারে সকলের চেয়ে ভাল যে কাঠের পুতুল পাই, তোমার জন্য তাহাই আনিব।"

আমাদের গ্রাম হইতে শিউড়ি দশ ক্রোশ পথ। সন্ধ্যা বেলা সে স্থানে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর ধান বেচিলাম। কতক কতক জিনিসও ক্রয় করিলাম। তৃতীয় দিন যাহা বাকী ছিল, সেই সমস্ত জিনিস-পত্র কিনিলাম। বলা বাহুল্য যে, হরিদাসীর জন্য একটি কাঠের পুতুলও কিনিলাম। এই সব কাজ সারিতে অনেকটা বেলা হইয়া গেল। আজ আমার বাটী ফিরিবার কথা। সকলকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, তৃতীয় দিন যেমন করিয়া পারি বাড়ী আসিয়া পেঁছিব। কিন্তু এত বেলায় শিউড়ি হইতে বাহির হওয়া উচিত নয়; কারণ, বাড়ী পেঁছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে। সময়টাও ভাল ছিল না। দেশে এক প্রকার আকাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠেঙাড়েরা পথে দুই একটা মানুষও মারিয়াছিল। ধান বেচিয়া আমার সংগে টাকা ছিল। এই সকল কারণে একবার মনে করিলাম, আজ আর বাটী ফিরিব না। কিন্তু না গেলে বাড়ীর লোকে অতিশয় চিন্তিত হইবে। তাহার পর হরিদাসীর চাঁদমুখখানি দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ বড়ই কাতর হইয়া উঠিল। যা থাকে কপালে, যাই! অবশেষে এই মনে করিয়া দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাবা গো!

শীতকাল! দারুণ শীত। তাহার উপর সমস্ত দিন বাদলার মত করিয়াছিল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। হু-হু শব্দে বাতাস বহিতেছিল। সন্ধ্যাবেলা বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমার কাপড়-চোপড় সব ভিজিয়া গেল। শীতে আমি কাঁপিতে লাগিলাম। সর্ব শরীর আমার অবশ হইয়া গেল। তখনও আমার গ্রাম হইতে আমি পাঁচ ক্রোশ দূরে।

দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিলাম। আমাদের গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে বড় মাঠের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পুনরায় ঘোর মেঘ করিয়া আসিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার উপর প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল। নিবিড় অন্ধকার। কোলের মানুষ দেখা যায় না। আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে ছোট একটি নদী আছে। সেই নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদীটি পার হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একবার শিশুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কোন শিশু যেন কাঁদিতেছে, এইরূপ বোধ হইল! কিন্তু একবারের অধিক আর সে শব্দ শুনিতে পাইলাম না। কারণ, তাহার পরক্ষণেই বাতাসের ঝট্‌কা প্রবল হইয়া উঠিল। সেই বাতাসের শব্দে অন্য শব্দ সব ডুবিয়া গেল।

মনে করিলাম, এ কিছু নয়, ভ্রান্তিবশতঃ ওরূপ শব্দ আমার কানে লাগিয়াছিল। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আবার 'বাবা গো!' এইরূপ একটি শিশুকণ্ঠ-শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিল। তখন আমার মনে অতিশয় ভয় হইল। একবার মনে করিলাম, এ আর কিছু নয়, এ ভূত কি পেতিনী। আবার মনে হইল, না, তা নয়, এ ঠেঙাড়ে, আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য এরূপ কৌশল করিতেছে। একবার মনে করিলাম যে, গাড়ী ছাড়িয়া আমি দৌড়িয়া পলায়ন করি। কিন্তু গরু যোড়াটি নূতন কিনিয়াছিলাম। তাহার মায়া ছাড়িতে পারিলাম না। গাড়ী দ্রুত-বেগে হাঁকাইয়া দিলাম।

দুই চারি পা গিয়াছি, এমন সময় আবার 'মা গো!' বলিয়া শব্দ হইল। তখন মনে আমার চিন্তা হইল—সত্য সত্যই যদি কোন ছেলে এই মাঠের মধ্যে, এই রাত্রিকালে, এই দুর্যোগে, এই শীতে, একা পড়িয়া থাকে! তাহা হইলে শম্ভু ঘোষ, তুমি কি বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ? তোমার মনে কি দয়ামায়া নাই? তুমি না যাদব ঘোষের বেটা? ছি! শম্ভু ঘোষ! তোমার এরূপ করা উচিত নয়।

এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। যে দিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে আস্তে আস্তে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোর অন্ধকার! কিছু দেখিবার যো ছিল না। যথাসাধ্য এ দিক ও দিক খুঁজিতে লাগিলাম। কিছুই পাইলাম না। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় একবার বিদ্যুৎ হইল। সেই আলোকে দেখিলাম যে, আমার নিকট হইতে অল্প দূরে নদীর ধারে ঝোপের ভিতর সাদা রঙ্গের কি পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া হাত দিয়া দেখিলাম যে, একটি চার পাঁচ বৎসরের শিশু! তখনও জীবিত আছে, শীতে কাঁপিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারে না। যাহার শিশু হউক, হাড়ীর হউক, আর মুচির হউক, বালক হউক, কি বালিকা হউক, ভগবানের জীব! আমি যে তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম, সে জন্য আমার মনে ঘোর আনন্দের উদয় হইল।

তাড়াতাড়ি আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। শিশুটিকে গাড়ীর উপর শয়ন করাইলাম। আমার পাছুড়িখানির যে দিকটি একটু শুষ্ক ছিল, সেই দিকটি তার গায়ে চাপা দিলাম। এইরূপ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলাম।

যখন আমার বাড়ীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, সকলে নিদ্রা গিয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। দূর হইতে দেখি যে, আমার বাড়ীতে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছে, অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ আমার বাটীতে আসিয়াছে। আমার ভয় হইল। মনে করিলাম, কি বিপদ ঘটিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী রহিল, আমি লাফাইয়া পড়িলাম। দৌড়িয়া গিয়া গৃহে উপস্থিত হইলাম। আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল। পাড়ার মেয়েরা হাউ হাউ করিয়া উঠিল। শশব্যস্ত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছে? হরিদাসী ভাল আছে তো? হরিদাসী কই?"

গোলমালের ভিতর হইতে অনেক কষ্টে এক জনের মুখ হইতে শুনিলাম যে, হরিদাসী হারাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। গ্রামের ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে সর্বত্র অনুসন্ধান হইয়াছে; কিন্তু কোথাও হরিদাসীকে পাওয়া যায় নাই। তাহার গায়ে গহনা ছিল, নিশ্চয় তাহাকে চোরে মারিয়া ফেলিয়াছে।

এত দূর বলিয়া কুটুম্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া শম্ভু ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! নিদ্রা গেলেন কি?"

কুটুম্ব উত্তর করিলেন,—"না, নিদ্রা যাই নাই। সকল কথা শুনিতেছি। তাহার পর কি হইল?"

শম্ভু পুনরায় বলিলেন,—নয়নের পুতলী আমার হরিদাসী নাই, প্রতিবাসিনীর মুখে এই নিদারুণ শুনিয়া আমি জ্ঞান-হারা পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িলাম। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় যে স্থানে আমার গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, নক্ষত্র-বেগে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে তুলিয়া শিশুটিকে বুকে লইলাম। দৌড়িয়া পুনরায় ঘরের ভিতর গিয়া প্রদীপের আলোকে শিশুর মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া

দেখিলাম। সেই চাঁদ-মুখখানি দেখিয়া শূন্য দেহে আমি প্রাণ পাইলাম। তাহার পর অনেক তাপ দিয়া, অনেক শুশ্রূষা করিয়া মেয়েকে আমরা ভাল করিলাম।

কুটুম্ব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাটী হইতে মাঠের মাঝে সে কি করিয়া গিয়াছিল?"

শম্ভু বলিলেন,—"আমি যে সে দিন বাটী পেঁাছিব, হরিদাসী তাহা শুনিয়াছিল। বাবা কখন্ আসিবেন, কখন্ আমার জন্য পুতুল আনিবেন, সমস্ত দিন সে বার বার সকলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। বৈকালবেলা আর থাকিতে পারিল না। চুপি চুপি একাকী আগে হইতে আমাকে আনিবার নিমিত্ত সে বাটী হইতে বাহির হইল। পাঁচ বৎসরের শিশু! পথ-ঘাট জানে না। মাঠের মাঝখানে গিয়া পাঁড়ল। সন্ধ্যা হইল, ঝড়-জল হইল, অন্ধকার হইল। জনশূন্য সেই মাঠের মাঝখানে কত কাঁদিল, কাহারও সাড়া শব্দ পাইল না। ভয়ে ও শীতে মৃতপ্রায় হইয়া সেই নদীর ধারে ঝোপের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল। ভাগ্যে আমার মনে একটু দয়ার উদয় হইল, তাই সে রাত্রিতে আমার মেয়ে বাঁচিল। সেই জন্য বলি যে, জীবে দয়া করা ভাল। যে জীবে দয়া করে, ভগবান্ তাহার প্রতি কৃপা করেন।"

ললিত ও লাবণ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রাইজের পুস্তক

হাসিতে হাসিতে ললিত আজ বাটী আসিল। স্কুলে ললিত আজ প্রাইজ পাইয়াছে। ললিত সাত বৎসরের ছেলে। কিন্তু এরূপ সুবোধ শিশু পৃথিবীতে অতি বিরল।

প্রাইজের পুস্তকগুলি ললিত মাতাকে দেখাইতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের ভগিনী লাবণ্য আহ্লাদে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

ললিত বলিল,—"মা! আমি ভাল পড়া বলিতে পারি, সে জন্য এই বইখানি পাইয়াছি; কাহারও সহিত ঝগড়া করি না, একটিও মিথ্যা কথা বলি না, সে জন্য এই বইখানি পাইয়াছি।"

ললিতের মা বলিলেন,—"বাঁচিয়া থাক, বাবা! চিরজীবী হও!"

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল,—"ইহাতে ছবি আছে, দাদা?"

ললিত উত্তর করিল,—"কেবল একটি গরু ও একটি ঘোড়ার ছবি আছে; ভাল ছবি নাই।"

মাতার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া, ললিত পুনরায় বলিল,—"মা! বইগুলি বাবাকে দেখাইব? কিন্তু মা, ভয় করে। আর সকলের বাবা ছেলেদের আদর করেন, কিন্তু আমাদের বাবা কেবল বকেন কেন, মারেন কেন, মা? কিন্তু মা! যা থাকে কপালে, কেবল আজ আমি তাঁহাকে প্রাইজের বইগুলি দেখাইব।"

ছেলের কথা শুনিয়া ললিতের মা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাতার কান্না দেখিয়া লাবণ্য তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল। হয় তো মন্দ কথা বলিয়াছি, এই মনে করিয়া ললিত অপ্রতিভ হইল।

সন্ধ্যা হইলে পিতা বাটী আসিলেন। রাগত মনে আরক্ত নয়নে তিনি স্বতন্ত্র ঘরে গিয়া বসিলেন। কিছু পরে কাঁপিতে কাঁপিতে ললিত দ্বারের নিকট গিয়া বলিল,—"বাবা! আজ আমি প্রাইজ পাইয়াছি, এই বইগুলি পাইয়াছি!"

ঘরের ভিতর হইতে কর্কশ বচনে পিতা উত্তর করিলেন,—"যা যা, ছোঁড়া, আমাকে বিরক্ত করিসনে।"

বিষণ্ণ বদনে ললিত ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় পিতা কি ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন,—"কই! কি বই পাইয়াছিস, দেখি?"

ললিত পুস্তক দুইখানি লইয়া পিতার নিকট গেল। পিতা বলিলেন,—"বই এখন এইখানে রাখিয়া যা, পরে দেখিব।"

পুস্তকগুলি পিতার নিকট রাখিয়া ললিত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে পিতা পুস্তক দুইখানি বাজারে লইয়া বিক্রয় করিলেন। নয় আনা পয়সা হইল। সেই নয় আনা পয়সায় মদ খাইয়া প্রতিদিন যে স্থানে তিনি রাত্রিযাপন করেন, সেই স্থানে গিয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মেয়ের হাতের বালা

ললিতের পিতার কিছু সম্পত্তি ছিল। সে সমুদয় তিনি নষ্ট করিয়াছেন। যে দুই বিষয়ে মানুষ অধঃপাতে যায়, সে দুই বিষয় এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সংসার চলিবার আর উপায় নাই ; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসামে ভাল কর্ম্ম করেন। বড় ভ্রাতৃবধূকে তিনি মাতার ন্যায় ভক্তি করেন, আর ললিত ও লাবণ্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ। পাছে ইঁহাদের কোনওরূপ কষ্ট হয়, সে নিমিত্ত তিনি প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া দেন। যে টাকা পাঠাইয়া দেন, তাহাতে সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। কিন্তু কর্ত্তাটির দোষে সংসারে নিয়তই কষ্ট।

চারি মাস পূর্বে ভাই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সংসারের কথা লইয়া দুই ভ্রাতায় বাদানুবাদ ও অবশেষে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। নানারূপ বকা-বকির পর, কনিষ্ঠ বলিলেন,—"তুমি যাহা জান, তাহা কর। এখন হইতে তোমাকে আর আমি একটি পয়সাও দিব না।"

ললিতের মাতা সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং স্বামী যখন তাঁহাকে বলিলেন যে—"ভাই আর আমাকে টাকা পাঠায় না," তখন কাজেই তাঁহাকে সে কথায় বিশ্বাস করিতে হইল।

ভাই রাগবশতঃ টাকা বন্ধ করিবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত তাহা করেন নাই। তিনি মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছিলেন। স্ত্রীকে লুকাইয়া কর্ত্তাটি সে টাকা লইয়া অপব্যয় করিতেছিলেন। সে নিমিত্ত সেই দিন হইতে সংসারে আরও ঘোরতর কষ্ট হইল।

খিদিরপুরে এক বিধবা স্ত্রীলোকের বাটীতে দুইটি ঘর ভাড়া করিয়া ইঁহারা বাস করিতেছিলেন। বিধবার এই ভাড়াটিই ছিল দিনযাপনের একমাত্র সম্বল। তিন মাস তিনি ভাড়া পান নাই। সে জন্য অনেক তাগাদা ও অনেক ভর্ৎসনা করিয়া অবশেষে বিধবা ইঁহাদিগকে বাটী হইতে উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত বার বার বলিতেছিলেন।

দুই একখানি যা গহনা ছিল, ললিতের মাতা তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে টাকাও স্বামী কাড়িয়া লইয়া বাহিরে খরচ করিয়া ফেলিলেন। নিজের যাহা হউক, শিশু দুইটিকে লইয়া ললিতের মাতা বড় বিপদে পড়িলেন। তাহাদের আহারের নিমিত্ত ঘটী-বাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন-খানি থালা, দুই একটি লোটা ও লাবণ্যের হাতের দুইগাছি ছোট ছোট সোনার বালা, ইহা ভিন্ন ঘরে আর কিছুই রহিল না।

কিন্তু সে দুইগাছি বালাও এক দিন গেল। কর্ত্তাটি একদিন মেয়ের হাত হইতে সেই বালা দুইগাছি বলপূর্বক খুলিয়া লইলেন। পাঁচ বৎসরের শিশু-কন্যা ; মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। পিতার মনে দয়ার লেশমাত্র হইল না। বালা দুইগাছি লইয়া স্বামী চলিয়া গেলে, ললিতের মাতা, ললিত ও লাবণ্য তিন জনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে ললিত বলিল,—"লাবণ্য, তুমি কাঁদিও না। আমি যখন টাকা আনিতে শিখিব, তখন তোমাকে বড় বড় বালা কিনিয়া দিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : এখন হইতে ভাল হইব

কর্ত্তাটি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বালা লইয়া গেলেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার সুখ হইল না। প্রতিদিন যে স্থানে তিনি রাত্রিযাপন করেন, যাহার জন্য তিনি স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে এরূপ নিদারুণ ক্লেশ দেন, বালা বিক্রয়ের টাকা যাহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন, দুই চারি দিন পরে সে তাঁহাকে অনেক অপমান করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। ললিতের পিতা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন।

ক্ষুণ্ণ মনে ললিতের পিতা সন্ধ্যার পর বাটী আসিলেন। নিঃশব্দে আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

পাশের ঘরে শিশু দুইটিকে লইয়া ললিতের মাতা নিদ্রা যাইতেছিলেন। ঘোর রাত্রিতে স্বামীর ঘরে একরূপ শব্দ শুনিয়া সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া স্বামীর ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, স্বামী "গোঁ গোঁ" শব্দ করিতেছেন, তাঁহার মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইয়াছে। কি হইয়াছে, বার বার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু কোন উত্তর দিলেন না। ললিতের মাতা তখন আর কি করিবেন? সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, টাকা নাই—যে, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিবেন্। বাড়ীওয়ালী বিধবাকে ডাকিয়া মাথায় জল দিয়া, তাঁহার যথাশক্তি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইল। নিকটস্থ একটি ডাক্তারের নিকট গিয়া ললিত অনেক কাঁদিয়া ও মিনতি করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়াই বলিলেন যে, "ইনি আফিম খাইয়াছেন ; আমি পুলিশে খবর দিই। ইঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইবে।"

ললিতের পিতার তখন জ্ঞান ছিল। হাঁসপাতালে যাইতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ডাক্তারের নিকট অনেক মিনতি করিয়া পুলিশে সংবাদ-প্রেরণবিষয়েও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। ডাক্তার যথাসাধ্য বাটীতেই তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যার পর তাঁহার শরীর একটু সুস্থ বলিয়া বোধ হইল। রাত্রি নয়টার সময়ে তিনি স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে আপনার নিকট বসাইয়া স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, আমি এতদিন অন্ধ ও পাগল হইয়া ছিলাম ; তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।"

ললিতের মাতা বলিলেন,—"নিশ্বাস ফেলিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, এখন আর অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া তাহার পর যাহা কিছু বলিবার, তখন বলিবে।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ললিতের পিতা উত্তর করিলেন,—"না না! আমি বেশ আছি। আমার শরীরে এখন আর কোন অসুখ নাই। ললিত বাবা! লাবণ্য মা! এস বাবা, এস মা, আমার কাছে এস! ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তবু কেন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে? আমি তোমাদিগকে ভালরূপ দেখিতে পাইতেছি না। আমি বড় নিষ্ঠুর, তোমাদিগকে আমি বড় কষ্ট দিয়াছি। কিন্তু এখন হইতে আমি খুব ভাল হইব। এখন হইতে তোমাদিগকে খুব আদর করিব। আমি খুব ভাল হইব ; এখন হইতে আমি খুব—"

বাকি কথা আর মুখ দিয়া বাহির হইল না! চক্ষু দুইটি কপালে উঠিল। আর তাঁহার ভাল হইতে হইল না, জনমের মত ললিতের পিতার সব ফুরাইল!

ললিতের মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন। মাটীতে পড়িয়া ললিত কাঁদিতে লাগিল। লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল।

সে রাত্রিতে আর কিছুই হইল না। পর দিন ঘটী বাটি যাহা কিছু বাকি ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কর্ত্তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইল। সহায়-সম্পত্তিহীনা স্ত্রী, শিশুসন্তান দুইটিকে লইয়া যে কি করিবেন, কি খাওয়াইবেন, তাহার কোন উপায় ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মা, তুমি না খাইলে আমি খাইব না

মা কথাগুলি বলিয়া দিলেন, ললিত শিশুহাতে কাকাকে পত্র লিখিল,—"খুড়া মহাশয়! পিতার হঠাৎ পরলোক হইয়াছে। আপনি কয়মাস খরচ দেন নাই। তাহাতে ঘরের গহনা-গাঁটি, বাসন-কোষন যাহা ছিল, সমুদয় বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মাতার হাতে কিছুই নাই। আপনি শীঘ্র আসিয়া আমাদের যাহা হয় বিলি করিবেন। তা না করিলে, অনাহারে আমরা মরিয়া যাইব।"

বাড়ীওয়ালী বলিলেন,—"ললিতের মা! আমি অনাথা বিধবা। ঘর দুইটি ভাড়া দিয়া আমার চলে। তিন মাস ভাড়া পাই নাই। আমি কি করিয়া খাই, তা বল। তুমি বাছা অন্য স্থানে যাও।"

ললিতের মাতা উত্তর করিলেন,—"দিদি! ললিতের কাকাকে চিঠি লেখা হইয়াছে। চিঠি পাইলেই তিনি আসিবেন। তখন তোমার ভাড়া দিয়া আমরা চলিয়া যাইব। আর দুই দিন অপেক্ষা কর। তা না করিলে, শিশু দুইটিকে লইয়া কোথায় যাই, তা বল? আমার বাপের বাড়ীতে কেহ নাই যে, এক দিন গিয়া দাঁড়াই।"

দুই দিন গেল, তিন দিন গেল। বাড়ীওয়ালী পুনরায় উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তেজনা করিলেন। চারিদিন গেল, পাঁচ দিন গেল, তবুও কাকার কোন সংবাদ নাই। বাড়ীওয়ালী পুনরায় বলিলেন,—"দুই ভাইয়ে তুমুল ঝগড়া হইয়াছিল। তোমার স্বামী তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তোমার দেবর, বাছা, আসিবেন না; আর তিনি তোমাদের মুখ দেখিবেন না। সে আশা ছাড়িয়া দাও। আমার বাটী হইতে আজই তোমরা উঠিয়া যাও।"

যাহা হউক, আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। তবুও কাকার কোন সংবাদ নাই। সাত দিনের দিন, "আমি তারকেশ্বরে যাই"—এই কথা বলিয়া, ললিতের মাতা ও শিশু দুইটিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া, দ্বারে চাবি দিয়া, বাড়ী-ওয়ালী কোথায় চলিয়া গেলেন।

শিশু দুইটির হাত ধরিয়া ললিতের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলেন। কোথায় যে যাইবেন, তাহা কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। ক্রমে গড়ের মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিভৃত একটি পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল যে, তাঁহার পিতার একজন জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার বাটীতে ললিতের মাতা একবার গিয়াছিলেন। কুলের কুলবধূ; পথ-ঘাট জানেন না। অনেক সন্ধান করিয়া, অতি কষ্টে, অপরাহ্ণে, তাঁহার বাটী আসিয়া ললিতের মাতা দিন কয়েকের নিমিত্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

পিতার জ্ঞাতি অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"তোমাদের এখন অশৌচ অবস্থা। আমার ঘর-দ্বার অধিক নাই। আমাকে

ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, পূজা-অর্চ্চনা করিতে হয়, শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়, তাহার উপর আমার স্ত্রীর শুচি-বাই। তোমার ছেলে-পিলে আমার পূজার দ্রব্যাদি সব ছুঁইয়া ফেলিবে। আমার এখানে বাছা, স্থান হইবে না।"

নিরাশ হইয়া ললিতের মাতা সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে আসিয়া একটি ঘাটে বসিলেন। তখন পর্য্যন্ত কেহ কিছু আহার করে নাই। লাবণ্য ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া কাঁদিতেছিল। ললিত নীরবে ছল ছল নয়নে চুপ করিয়া ছিল। ললিতের মাতার নিকট কেবল চারিটি পয়সা ও একটি সিকি ছিল। ললিত গিয়া সেই চারি পয়সার মটর দাল ও কদলী কিনিয়া আনিল। মটর দাল ভিজাইয়া মাতা, পুত্র-কন্যাকে ভাগ করিয়া দিলেন, নিজের জন্য কিছু রাখিলেন না। ললিত বলিল,—"না, মা! তুমি যদি না খাও, তাহা হইলে আমি খাইব না।" পুত্রের অনুরোধে কাজেই তাঁহাকে খাইতে হইল। বাকি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন। শিশু দুইটিকে লইয়া সে রাত্রি মাতা সেই গঙ্গার ঘাটেই পড়িয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : একবার উঠ, বাবা!

পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, পুনরায় তিন জনে আস্তে আস্তে খিদিরপুরে গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, ললিতের কাকা আসেন নাই, তাঁহার নিকট হইতে কোন চিঠিও আসে নাই। নিরাশ হইয়া পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে লাবণ্য ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া বড়ই কাঁদিতে লাগিল। ললিত অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িল। গড়ের মাঠে সেই নিভৃত পুষ্করিণীর ধারে পুনরায় তিন জনে গিয়া বসিলেন। পূর্বদিনের মটর ডালের কিয়দংশ মায়ের আঁচলে বাঁধা ছিল। শিশু দুইটিকে তাহাই খাইতে দিলেন। তাহার পর পুনরায় গঙ্গার সেই ঘাটে আসিয়া বসিলেন। লাবণ্য পুনরায় ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে লাগিল। মাতার নিকট তখনও একটি সিকি ছিল। সিকিটি ভাঙ্গাইয়া চারি পয়সার কদলী আনিবার নিমিত্ত ললিতকে তিনি দোকানে পাঠাইলেন।

ললিত দোকানে যাইতেছে, এমন সময় দৈবক্রমে তাহার হাত হইতে সিকিটি পড়িয়া গেল। সিকিটি গড়াইয়া একখানি ইটের ধারে গিয়া লাগিল। নিমিষের মধ্যে ইতর লোকের একটি বালক সিকিটি কুড়াইয়া লইল। ললিত তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল, বালক সিকিটি আপনার মুখের ভিতর পুরিল। ললিত তাহার গাল টিপিয়া ধরিল, বালক সিকিটি গিলিয়া ফেলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে ললিত মাতার নিকট আসিয়া সকল কথা বলিল। শেষ সম্বল যাহা ছিল, তাহা গেল। মাতা ভাবিলেন,—"আর উপায় নাই। দেবর আসিবেন না। ভগবান্ আর আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না। এখন আমি শিশু দুইটিকে লইয়া করি কি? যাই কোথায়?"

ক্ষুধার জ্বালায় লাবণ্য অতিশয় কাঁদিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল। মাতা, শিশু দুইটিকে লইয়া পুনরায় খিদিরপুর অভিমুখে চলিলেন। আর চলিতে পারেন না। গড়ের মাঠের সেই পুষ্করিণীর ধারে পুনরায় গিয়া বসিলেন। দুঃখের আর কূল-কিনারা নাই, অকূল পাথার! ভাবিতে লাগিলেন,—"হায় হায়! আমি কি করি, আমি কোথায় যাই!"

পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাতা একেবারে পাগলিনী হইয়া পড়িলেন। সেই উন্মত্ত অবস্থায় সহসা তিনি বাম হস্তে লাবণ্য ও দক্ষিণ হস্তে ললিতকে ধরিয়া পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিলেন। 'ঝপ্' করিয়া একটি শব্দ হইল, জলে অল্প তরঙ্গ উঠিল, তাহার পর সেই গভীর জল পুনরায় পূর্বরূপ স্থির প্রশান্ত আকার ধারণ করিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় শিয়ালদহ হইতে একখানি গাড়ী দ্রুত-বেগে খিদিরপুর অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়ীর ভিতর একটি বাবু বসিয়া ছিলেন। "গাড়োয়ান শীঘ্র চল, তোমাকে বক্‌শিস্ দিব," এই কথা বাবু বার বার বলিতেছিলেন। গড়ের মাঠ দিয়া যাইবার সময় বাবু দেখিলেন যে, একটি পুষ্করিণীর ধারে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়াছে। কি হইয়াছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত, গাড়ী থামাইয়া, বাবু সেই স্থানে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, জল হইতে পুলিশের লোকে একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক, একটি সাত আট বৎসরের বালক ও একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার মৃতদেহ উপরে তুলিয়াছে। মৃতদেহ বটে, কিন্তু তিনটির রূপে পুষ্করিণীর পাড় আলো করিয়াছিল। যে দেখিতেছিল, সে-ই হায় হায় করিতেছিল।

অজ্ঞান পাগলের ন্যায় হইয়া বাবু গিয়া সেই মৃতদেহের উপর পড়িলেন। "ললিত! লাবণ্য! একবার উঠ। একটা কথা কও! আমি তোমাদের কাকা আসিয়াছি। আর তোমাদের ভাবনা নাই, আমি তোমাদের জন্য টাকা আনিয়াছি। উঠ বাবা! উঠ মা! একটা কথা কও।"

ললিত, লাবণ্য ও তাহাদের মাতা আর উঠিলেন না, আর কথা কহিলেন না।

মূল্যবান্ তামাক ও জ্ঞানবান্ সর্প

প্রথম অধ্যায়ঃ সূচনা

ফরসডাঙ্গায় পূর্বে অনেক গুলির আড্ডা ছিল। তাহার সঙ্গে দুই একটি গাঁজার আড্ডাও ছিল। তাহাদিগের মধ্যে জয়গোবিন্দ ভড়ের আড্ডাটি সর্বপ্রধান ছিল। সেই আড্ডায় মাণিক বাবু, নবীন বাবু, হরেন বাবু, গণেন বাবু প্রভৃতি অনেকগুলি বাবু সভ্য ছিলেন। ভড় মহাশয় ইহার আড্ডাধারী ছিলেন।

একদিন তিন ছিলিম মূল্যবান্ বড় তামাক সেবনের পর, হরেন বাবু যুদ্ধের কথা আরম্ভ করিলেন। মাণিক বাবু জ্ঞানগম্ভীরস্বরে তাহার আলোচনা করিলেন। গণেন বাবু তাহার উপর টীকা করিলেন। নবীন বাবু কিছু বলিবার জন্য হাঁ করিয়াছেন, এমন সময় আড্ডাধারী মহাশয় তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

আড্ডাধারী বলিলেন,—"হরেন! তোমাদের মুখে কি আর অন্য কথা নাই? যুদ্ধের কথা শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালা-পালা ধরিয়া গেল। যদি অন্য গল্প থাকে তো বল, যে শুনি।"

আড্ডাধারীর বিরক্তিভাব দেখিয়া হরেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের গল্প করিব?"

আড্ডাধারী ভাবিতে লাগিলেন। সেই অবসরে নবীন বাবু বলিলেন,—"শাস্ত্র-প্রসঙ্গ, ভূত-প্রসঙ্গ, ব্যাঘ্র-প্রসঙ্গ এ সভায় অনেক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নূতনত্ব আর কিছু নাই। অদ্যকার সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, আফ্রিকা মহাদেশে এক প্রকার সর্প আছে। তাহাদের শরীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত স্থূল। তথাপি তাহারা আস্ত হংস-ডিম্ব গলাধঃকরণ করিতে পারে। সামান্য বাঁশের ন্যায় স্থূল অজগর সর্পও মহিষ প্রভৃতি পশুকে গ্রাস করে। আজ সাপের গল্প হউক না কেন?"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ, নবীন! আমি একখানি নভেল লিখিব মনে করিয়াছি। ভূতের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি; বাঘের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। এখন সাপের গল্প পাইলেই আমার পুস্তকখানি পূর্ণ হয়। কেহ যদি ভাল ভাল, অথচ সম্পূর্ণ সত্য, সাপের গল্প জান তো বল দেখি, শুনি, ভাই!"

সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাণিক বলিলেন,—"তোমরা সকলেই দেখিতেছি, সর্প বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সঙ্গে করিয়া আজ আমি এই যে বাবুটিকে আনিয়াছি, ইঁহার নাম তিনু, সম্প্রতি ইনি দেশ হইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের দেশে অনেক প্রকার সাপ আছে। ইনি বোধ হয় সাপের গল্প করিতে পারেন।"

এই কথা শুনিয়া তিনু বাবুকে সম্বোধন করিয়া আড্ডাধারী বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার সহিত আমার আলাপ-পরিচয় নাই। কিন্তু আপনি যখন মাণিকের বন্ধু, তখন আমারও বন্ধু। অনুগ্রহ করিয়া যদি দুই একটি সাপের গল্প করেন, তাহা হইলে, বড়ই বাধিত হই। যে পুস্তকখানি ছাপাইতে আমি

মানস করিতেছি, তাহাতে আপনার নাম দিয়া গল্পগুলি ছাপাইব। আপনার দেশ কোথায় ?"

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—"অতি নিকটে। এক দিন রেলে যাইতে হয় ; তাহার পর, দুই দিন জাহাজে যাইতে হয় ; তাহার পর, তিন দিন হাঁটিয়া যাইতে হয়। আমাদের দেশে রং-বেরঙের সাপ আছে। সেই সব সাপের গল্প আমি করিতে পরি।"

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নূতন গল্প, না পুরাতন ?"

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—"আনকোরা টনটনে টাট্‌কা গল্প।"

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য গল্প ? না মিথ্যা কল্পিত বানানো গল্প ?"

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—"সম্পূর্ণ সত্য গল্প। তামা তুলসী গঙ্গাজল হাতে লইয়া বলিতে পারি। যাহা আমার নিজের বাড়ীতে ঘটিয়াছে, যাহা নিজে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেইরূপ গল্প আমি করিব। এই যে সর্প, ইহারা নাগ জাতি। মানুষ অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধি শতগুণ অধিক। ইহাদের বুদ্ধিবিষয়ে আজ আমি দুই তিনটি দৃষ্টান্ত দিব। তবে বলিতে ভয় হয়। একে তো পাষণ্ডগণ আমাকে গ্যাঁজাখোর বলে। তাহার উপর গল্পগুলি কিছু অদ্ভুত। পাছে আপনারা বিশ্বাস না করেন, সেই ভয়।"

আড্ডাধারী, নবীন, মাণিক প্রভৃতি সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, আপনার সে ভয় নাই। আপনি যখন বড় তামাক সেবন করেন, তখন আপনি আমাদের ভাই। আপনার কথা সকলেই আমরা বিশ্বাস করিব।"

এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া, তিনু বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা! তবে প্রথমে একটি গল্প করি। মহাশয়গণ একটু প্রণিধান করিয়া শ্রবণ করুন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বালিকা ও কৃষ্ণসর্প

তিনু বলিতেছেন,—"আমার বাড়ীর নিকট এক পুষ্করিণী আছে। তিন বৎসর বয়স্কা আমার একটি কন্যা আছে। একদিন প্রাতঃকালে বালিকাটি পুষ্করিণীতে পড়িয়া গিয়া হাবু-ডুবু খাইতেছিল। কেহই দেখিতে পায় নাই, আর একটু হইলেই জলমগ্ন হইয়া সে মরিয়া যাইত। এমন সময় কোথা হইতে একটি কৃষ্ণসর্প আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার বিপদ দেখিয়া সাপটি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল ও তাহাকে ধরিয়া অবিলম্বে কিনারায় আনিয়া ফেলিল। সাপটি বালিকার প্রাণরক্ষা করিল ; কিন্তু যেরূপ বুদ্ধিসহকারে সে এ কার্য্য সাধন করিল, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ বুদ্ধি ?"

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—"সাপটি প্রায় দশ হাত লম্বা হইবে। পুষ্করিণীর মাঝখানে যে স্থানে মেয়ে আমার হাবু-ডুবু খাইতেছিল, সাপটি তাড়াতাড়ি প্রথম সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর আপনার শরীরের মধ্যভাগ দিয়া বালিকার গলায় সে দৃঢ়রূপে একটি পাক দিল। সেই পাকে গলা বন্ধ হইয়া বালিকা আর জল গিলিতে পারিল না। সাপটি তখন তাহার মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা সাঁতার দিতে লাগিল। এইরূপে সন্তরণ করিয়া বালিকাকে ক্রমে সে কিনারায় আনিয়া ফেলিল। এমনি দৃঢ়রূপে সাপ তাহার

গলায় পাক দিয়াছিল যে, এক ফোঁটা জলও বালিকার উদরস্থ হইতে পায় নাই। অতি সুবুদ্ধি সাপ। কেমন, গল্পটি ভাল নহে ?"

আড্ডাধারী উত্তর করিলেন,—"অতি চমৎকার গল্প। তাহার পর ?"

তিনু বলিলেন,—"মেয়েকে কিনারায় রাখিয়া সাপটি আস্তে আস্তে তাহার গলার পাক খুলিয়া দিল। তখন মেয়ে নিশ্বাস ফেলিতে পারিল। নিশ্বাস ফেলিয়া মেয়ে ভূমি হইতে উঠিল। তখন সাপটি কুলোপনা চক্র ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমার মেয়ে সেই ফণার উপর স্নেহের সহিত ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া তাহাকে অনেক আদর করিল। আহ্লাদে আটখানা হইয়া সাপটি হাসিতে লাগিল। এইরূপে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া সেদিন সে বনে চলিয়া গেল। তাহার পর দিন সকাল বেলা দেখি যে, সেই সাপটি পুনরায় আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমার মেয়ে তখন ধামি করিয়া মুড়ি খাইতেছিল। সুড়-সুড় সুড়-সুড় করিয়া সাপটি তাহার নিকট গিয়া বসিল। চিনিতে পারিয়া ধামি হইতে আমার মেয়ে তাহাকে দুই গাল মুড়ি দিল। কুড়-কুড় কুড়-কুড় করিয়া সাপ বসিয়া বসিয়া সেই মুড়িগুলি খাইল। মুড়িগুলি খাইয়া সে পুনরায় বনে চলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিদিন সকাল বেলা আমার মেয়ের কাছে সে মুড়ি খাইতে আসে। বিশ্বাস না করেন, চলুন আমার বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিবেন।"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"না না! আপনার বাড়ী অতি নিকটে বটে; কিন্তু সে স্থানে আমাদের যাইতে হইবে না। আপনার কথাই যথেষ্ট। আর আছে ?"

তৃতীয় অধ্যায়ঃ শিশু ও বেঁড়ে

তিনু বলিলেন,—"আছে বৈ কি। আর একটি বলি শুনুন। আট মাসের আমার এক শিশু ছেলে আছে। গৃহিণী কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন; ছেলেটিকে বাড়ীর উঠানে ছাড়িয়া দেন। বাড়ীর প্রাঙ্গণে সে হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে ষাঁড়ের মত চীৎকার করে। তাহার কান্নার শব্দ শুনিলে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়। কিন্তু এখন আর সে কাঁদে না। দু এক দিন চুপ করিয়া করিয়া থাকিবার পর, আমরা এক দিন ভাবিলাম যে, ছেলে পূর্বের মত আর কাঁদে না কেন ? মন-মন্‌সারে এক দিন আমরা আড়ি পাতিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, ছেলে যেই কান্নার সুর তুলিল, আর নিকটে এক গর্তের ভিতর হইতে একটি সাপ উঁকি মারিয়া দেখিল। তাহার পর সাপটি ক্রমে ক্রমে সেই গর্তের ভিতর হইতে বাহির হইল। চন্দ্রবোড়া কাহাকে বলে তা জানেন তো ? এ সেই চন্দ্রবোড়া সাপ। কিন্তু এ সাপটির একটু বাহার আছে। সাপটির লেজ কিরূপে খসিয়া গিয়াছে। সে জন্য এটি বেঁড়ে বোড়া সাপ। গর্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, ক্রমে শিশুর নিকটে আসিয়া সাপটি বসিল। তাহার পর শিশুর মুখপানে চাহিয়া চক্ষু টিপিয়া কি ইশারা করিল। অবশেষে সাপ পিছন ফিরিয়া, আপনার সেই বেঁড়ে লেজটি শিশুর হাতে পুরিয়া দিল।

আড্ডাধারী বলিলেন,—"বটে! তাহার পর ?"

তিনু উত্তর করিলেন,—"বেঁড়ে লেজটি হাতে পাইয়া মায়ের স্তন মনে করিয়া, শিশু সন্তোষের সহিত তাহা চুষিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, ওঃ, এই জন্যে ছেলে আর কাঁদে না বটে! এইরূপ প্রতিদিন আসিয়া সাপ আপনার

বেঁড়ে লেজটি শিশুর হাতে প্রদান করে। শিশু তাহা চুষিয়া চুপ করিয়া থাকে, কখন বা লেজটি মুখে করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এইরূপে কিছু দিন যায়, এমন সময় এক দিন দেখি না যে, ছেলে পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সাপের দেখা নাই। আমরা ভাবিলাম যে, বড়ই বিপদ হইল; সাপ আসিল না, এখন ছেলে ভুলাই কি করিয়া? ঘোর চিন্তায় আমরা নিমগ্ন আছি, এমন সময় কোথা হইতে আর একটি কিছু বড় বেঁড়ে বোড়া সাপ হুড়তে পুড়তে ছেলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও সেইরূপ চক্ষু টিপিয়া ছেলেকে প্রথমে ইশারা করিল; তাহার পর আপনার বেঁড়ে লেজটি তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। লেজটি মুখে দিয়া ছেলে চুপ করিল। এই নূতন সাপটি এইরূপে সাত দিন ছেলের নিকট আনাগোনা করিল। তাহার পর সেই পুরাতন সাপটি পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা দেখিলাম, পুরাতন সাপটি কিছু রোগা হইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া ভাবিলাম,—ওঃ, আর কিছু নয়, পুরাতন সাপটির জ্বর হইয়াছিল, তাই নূতন সাপকে এই কয় দিনের নিমিত্ত আপনার এক্‌টিনী করিতে সে পাঠাইয়া দিয়াছিল। চট করিয়া আপনার মত আর একটি বেঁড়ে সাপ সে খুঁজিয়া পায় নাই। পাঠাইতে তাই একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কেমন মহাশয়, এ গল্পটি কেমন?"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"অতি চমৎকার!"

তিনু বলিলেন,—"ছেলেটির নাম আমরা সুরেন্দ্র রাখিয়াছি। তাহার নামটি ছাপাইবেন। তাহা হইলে তাহার গর্ভধারিণীর মনে খুব আনন্দ হইবে। আর শিশুদের সরল হৃদয়,—কাল-সর্পকেও তাহাদের বিশ্বাস; এইরূপ নানাপ্রকার অলংকার দিবেন। আর 'সাপিনী তাপিনীতাপে বিবরে লুকায়'—এইরূপ ছড়াও তাহার ভিতর দুই একটি দিবেন।"

আড্ডাধারী বলিলেন,—"ছড়ায় আবশ্যক নাই, গল্পটি অতি চমৎকার। তাহাই যথেষ্ট। আর আছে?"

চতুর্থ অধ্যায়ঃ গরুর দাড়ি

তিনু উত্তর করিলেন,—"আছে বই কি! আর একটি গল্প বলি, তবে শুনুন। দাঁড়াশ সাপ কারে বলে তা জানেন? আমাদের বাড়ীর কাছে প্রকাণ্ড এক দাঁড়াশ সাপ ছিল। বিশ হাতের কম নয়। জাহাজি দড়া বলিলেও চলে। প্রতিদিন রাত্রিতে গোয়ালে আমার গরু বাঁধা থাকে; তাহার একটু দূরে বাছুরটি বাঁধা থাকে; এক দিন রাত্রিতে কি করিয়া গরুর দাড়িটি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আর একটু হইলেই সমস্ত দুধটুকু বাছুরে খাইয়া ফেলিত। ভাগ্যে, সেই সময় নিকটে সেই পাড়ার দাঁড়াশ সাপটি ছিল। দাঁড়াশ সাপ যেই দেখিল যে, গরুর দাড়ি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, গরু ছুটিয়া বাছুরের নিকটে যাইতেছে, আর দুধ খাইবার জন্য বাছুর লাফালাফি করিতেছে, তখন সাপটি আপনার মাথার দিক্ দিয়া গরুর গলায় একটি বেড় দিল, আর লেজটি খোঁটায় জড়াইয়া গরুকে আটক করিয়া রাখিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। গরু কত টানাটানি করিল, কিন্তু সাপ কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা গরু ও সাপকে এই অবস্থায় দেখিলাম। সাপের সঙ্গে ঘরকন্না করিয়া আমাদের ভরসা হইয়াছিল। সে জন্য গোয়ালের ভিতর গরুর গলায় সাপ দেখিয়া আমাদের কিছুমাত্র ভয় হইল না। ছেঁড়া দাড়িতে গিরা দিয়া আমরা গরুকে

বন্ধন করিলাম। সাপ তখন ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেল। গাভী দোহন হইলে, আমি মনে করিতেছি যে, এইবার যাই, গরুর জন্য একগাছি নূতন দড়ি কিনিয়া আনি। এমন সময়ে দেখি না যে, সেই সাপটি পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার সে একেলা আসে নাই, আপনার স্ত্রী, দাঁড়াশনীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। আমার মনের ভাব বুঝিয়া দুই জনেই ঘাড় নাড়িতে লাগিল। সাপে কথা কহিতে পারে না, তাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'দড়ি কিনিবার জন্য তোমাকে আর পয়সা খরচ করিতে হইবে না। এখন হইতে আমরা দুই জনে দড়ির কাজ করিব।'

এই বলিয়া একটি সাপ পূর্ব্বৎ মস্তকের দিক্ দিয়া গরুর গলায় ও লেজের দিক্ দিয়া খোঁটাতে ফের দিয়া রহিল। তখন আমি ছেঁড়া দড়ি গাছটি গরুর গলা হইতে খুলিয়া লইলাম। পালা করিয়া, পাখীতে যেরূপ ডিমে তা দেয়, সেইরূপ দাঁড়াশ ও দাঁড়াশনী এখন পালা করিয়া আমার গরু বাঁধিয়া রাখে। আমাকে আর দড়ি কিনিতে হয় না! তবে প্রতিদিন সাপ দুইটিকে খাইবার নিমিত্ত একটু একটু দুগ্ধ প্রদান করিতে হয়। হয় না-হয়, আমার বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসুন।"

আন্ডাধারী বলিলেন,—"না না আপনার বাড়ী আমাকে যাইতে হইবে না। আপনি কি আর মিথ্যা বলিতেছেন। আর আছে?"

পঞ্চম অধ্যায়ঃ চুল বাঁধা ফিতা

তিনু উত্তর করিলেন,—"আজ আর অধিক বলিব না। আর একটি বলি, শ্রবণ করুন। আমার বড় মেয়েটি যখন দশ বৎসরের, তখন এক দিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি রথ দেখিতে যাইতেছিলাম। মেয়েটির চুল বড় দীর্ঘ ছিল না, কেবল কাঁধের উপর পড়িত। গৃহিণী তাহার সাজগোজ করিয়া চুলগুলি একটি সবুজ ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। যাইতে যাইতে একটি আমবাগানের নীচে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় মেয়ের মাথা হইতে ফিতাটি খুলিয়া বাতাসে কোথায় উড়িয়া গেল। আর খুঁজিয়া পাইলাম না। মেয়ের চুল এলোথেলো হইয়া পড়িল। দুই হাত মাথায় দিয়া মেয়ে আমার কাঁদিতে লাগিল। এই স্থানে একটি আঁব-ডাল ঝুলিয়া ছিল। লাউ-ডগা সাপ জানেন? সেই সুন্দর উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের সরু সাপ; যাহারা গাছের পাতার সঙ্গে মিশিয়া থাকে? সেই স্থানে সেই আঁব-ডালে পাতার ভিতর লাউ-ডগা সাপের একটি ছানা ছিল! মেয়ের কান্না শুনিয়া সাপের ছানাটি ডাল হইতে তড়াক্ করিয়া মেয়ের কাঁধের উপর পড়িল। তাহার পর মস্তকের উপর উঠিয়া প্রথম মুখ ও লেজ দিয়া চুলগুলি পরিষ্কার ও সমান করিল। অবশেষে চারিদিকে ফের দিয়া চুলগুলি বাঁধিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়! ছানা সাপ! বেড় দিতে কুলান হইল না। সে নিমিত্ত বিরস বদনে সে পুনরায় গাছের ডালে গিয়া উঠিল। ডালে উঠিয়া ঘাড় নাড়িল। ঘাড় নাড়িয়া যেন সে বলিল,—"আমি ছানা-সাপ, আমি ছোট, সে জন্য আমার দ্বারা এ কাজ হইল না, ইহাতে আমার দোষ নাই।"

আন্ডাধারী বলিলেন,—"তাহার পর?"

তিনু বলিলেন,—"তখন আমরা আর কি করি। মেয়ের চুল বাঁধা হইল না। সেই আলুথালু চুলে মেয়েকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। প্রায় দুই শত

হাত আগে গিয়াছি, তখনও সে আঁব-বাগান পার হই নাই, এমন সময়ে দেখি না, আর একটি আঁবগাছের ডাল হইতে একটি বড় লাউ-ডগা সাপ সহসা লাফ দিয়া টপ করিয়া মেয়ের মাথার উপর পড়িল। গাছ পানে চাহিয়া দেখি যে, সে ছানা সাপটিও ডালে বসিয়া আছে। দুইটি সাপে অতি দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া থাকিবে। কারণ, দুই জনেরই ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল, দুই জনেই গলদঘর্ম হইয়া গিয়াছিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ছানা সাপটি নিজে চুল বাঁধিতে না পারিয়া, তাহার মাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিয়াছে। ডালে ছানা ও আমার মেয়ের মাথায় তাহার মা। দুই জনে চক্ষুঠারে প্রথম যেন কি বলাবলি করিল। তাহার পর বড় সাপটি মেয়ের চুলগুলির গোড়ায়, যে স্থানে ফিতা ছিল, সেই স্থানে আপনার শরীরটি জড়াইল। অবশেষে মাথার ঠিক মাঝখানে, যে স্থানে ফিতার ফাঁস থাকে, সেই স্থানে আপনার মুখটি রাখিল। তাহার পর মুখের ভিতর আপনার লেজ প্রবিষ্ট করিয়া সাপটি নিদ্রা গেল। তাহার মুখ ও লেজ সংলগ্ন হইয়া চমৎকার ফুল-কাটা ফাঁসের মত হইল ও সাপটি নিজে অতি সুন্দর রেশমী সবুজ ফিতার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। রথ দেখা হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিয়া সাপটিকে আমরা উঠানে লাউমাচায় ছাড়িয়া দিলাম। প্রতি দিন বৈকাল বেলা মেয়ের চুল বাঁধিবার সময়, সে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে ডাকিতে হয় না। আমার গৃহিণী সাপটিকে লইয়া মেয়ের চুল বাঁধিয়া দেন। হয় না হয়, চলুন, এখনি আমার দেশে চলুন, স্বচক্ষে সাপটিকে দেখিয়া আসিবেন।"

অধ্যাপারী বলিলেন,—"আর আছে ?"

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ পাকা মুহুরী

তিনু উত্তর করিলেন,—"আরও ? আমার গৃহিণী অনেক জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে আরও অনেক সাপের কথা বলিব। আপাততঃ কেবল আর একটি বলিয়া শেষ করি। আমার আট বৎসরের একটি বালক আছে। স্কুলে সে পড়িতে যায়। বাড়ী আসিয়া যোগ করিবার নিমিত্ত মাষ্টার তাহাকে এক তৈরিজ দিয়াছিলেন। শ্লেটে লিখিয়া অঙ্কটি ছেলে ঘরে আনিয়াছিল। বালক অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু অঙ্কটি বড় ছিল, কিছুতেই সে ঠিক দিতে পারিল না। হতাশ হইয়া বিরসবদনে শ্লেটের পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কাঁধের উপর বসিয়া একটি সাপ মুখ বাড়াইল। তাহার পর সাপটি আরও অগ্রসর হইয়া পেন্সিল সহিত তাহার দক্ষিণ হস্তে অনেকগুলি পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিল। এইরূপে বালকের হাত ধরিয়া শ্লেটের উপর তাহাকে লিখাইতে লাগিল। মুহূর্তমধ্যে বিনা ভুলে যোগটি সমাপ্ত করাইল। তাহার পর দিন আমরা সকলে মিলিয়া বালককে ত্রৈরাশিক প্রভৃতি আরও নানারূপ কঠিন কঠিন অঙ্ক দিলাম। বালক যোগও ভাল করিয়া শিক্ষা করে নাই। কিন্তু সেই সর্পের সহায়তায় মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় অঙ্কগুলি সে কষিয়া ফেলিল। সেই অবধি মুহুরিগিরি করিবার নিমিত্ত সাপটিকে আমরা পুষিয়া রাখিয়াছি। সংসার খরচের হিসাব, গয়লার সহিত দুধের হিসাব, ধোপার সহিত কাপড়ের হিসাব, আমাদের সামান্য একটু পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব,—কড়ায় গণ্ডায় সমুদয় হিসাব সেই সাপটি রাখে। জমিদারী সেরেস্তায় হিসাবের গোলমাল হইলে, সাপটিকে ভাড়া দিয়া আমরা মাঝে মাঝে বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জন করি। তাহাকে আমার মাহিনা দিতে হয় না,

খাইতে দিতেও হয় না। সাপটি বনে চরিয়া আসে। তবে ভাল বেঙ পাইলে, সমাদর করিয়া কখন কখন তাহার আমরা নিমন্ত্রণ করি।"

অন্ধাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বাড়ীতে যে মুহুরিগিরি করে, এ কোন্ জাতীয় সাপ? এ সাপের নাম কি?"

তিনু উত্তর করিলেন,—"ইহার নাম শংখচূড়। হিসাবপত্রে এ জাতীয় সাপ সাক্ষাৎ শুভংকর।"

তিনু বাবুর গল্পে সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

সেকালের মোহর

প্রথম অধ্যায় : বালিকা

কলিকাতা সহর। গলির পথ। সন্ধ্যার সময়। ঘোর অন্ধকার। বর্ষাকাল। টিপ-টিপ করিয়া জল পড়িতেছে। গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হন্ হন্ করিয়া যাইতেছেন। গিরিশচন্দ্র এক জন নব্য-যুবক। শান্ত সুশীল সভ্যভব্য নব্য-যুবক। গিরিশচন্দ্রের বয়ঃক্রম প্রায় কুড়ি বৎসর হইবে। শ্যাম বর্ণ; মুখে দুই চারিটা ব্রণের দাগ আছে। গোঁপ-দাড়ির রেখা দিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মাঝারি গোচের মানুষ; দীর্ঘও নহেন, খর্বও নহেন, স্থূলও নহেন, কৃশও নহেন। তাঁহাকে দেখিলে বলবান্ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের সংকুচিত গঠনটি দেখিলে ভবিষ্যতের লক্ষণ ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

গিরিশচন্দ্রের গায়ে কামিজ আছে। কুঞ্চিত পাকানো চাদরখানি তাঁহার বক্ষস্থলের দুই দিকে লম্ববান রহিয়াছে। সেই অন্ধকারে ছাতি মাথায় দিয়া গিরিশচন্দ্র হন্ হন্ করিয়া চলিতেছেন। সে গলির রাস্তায় সে সময় কেবল দুই একটি লোক যাতায়াত করিতেছিল। গিরিশ দেখিলেন যে, এক জন শুভ্রবস্ত্র-পরিধায়ী মানুষ বিপরীত দিক্ হইতে তাঁহার দিকে দ্রুত বেগে আসিতেছে। এক পার্শ্বে কতকগুলি খোয়া জমা করা ছিল। সহসা সেই খোয়ার উপর সেই মানুষ পতিত হইল। গিরিশ তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। কিছুদূরে অবস্থিত রাস্তার লণ্ঠনের ঈষৎ আলোকে দেখিলেন যে, লোকটি এক বালিকা। বালিকার বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর হইবে। মুখশ্রী ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে ভদ্রলোকের কন্যা বলিয়াই বোধ হইল।

গিরিশ তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাকে কি বড় আঘাত লাগিয়াছে?"

বালিকা অধোমুখে উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা না, আমাকে অধিক লাগে নাই।"

গিরিশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি ভদ্রলোকের কন্যা। এ অন্ধকারে রাত্রিতে একাকিনী তুমি কোথায় যাইতেছ? নিকটে কোন লোকের বাটীতে যাইবে?"

বালিকা ছল্ ছল্ চক্ষে মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"আমার পিতা সহসা অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন। আমাদের কেহ নাই। সে নিমিত্ত আমি ডাক্তার ডাকিতে দৌড়িয়া যাইতেছি। আমার পিতা ডাক্তারখানায় কর্ম করেন। সেই ডাক্তারখানায় যাইতেছি। সে ডাক্তারখানা এ স্থান হইতে কিছু দূরে।"

বালিকার মৃদু-মধুর স্বর গিরিশের মন হরণ করিল। এরূপ ভাব,—কখনও কাহাকেও দেখিয়া কি কাহারও কথা শুনিয়া তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। গিরিশ মনে মনে ভাবিলেন যে, এই বালিকার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে পারি।

গিরিশ বলিলেন,—"আমি ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছি। অল্প দিনের মধ্যেই বোধ হয় ডাক্তার হইব। চল, তোমার পিতাকে গিয়া দেখি। আমি যদি কোন প্রতিকার করিতে পারি, তো ভালই; তাহা না হইলে, আমাকে ঠিকানা বলিয়া দিও,

আমি ডাক্তার আনিয়া দিব। এ রাত্রিতে, এ অন্ধকারে, এ বৃষ্টিতে তোমায় যাইতে হইবে না।"

বালিকা সে কথায় সম্মত হইল। বালিকা আগে আগে যাইতে লাগিল। গিরিশ তাহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাধব চক্রবর্তী

বালিকা আগে আগে চলিল; গিরিশ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিছুদূরে গিয়া তাঁহারা আরও একটি সংকীর্ণ অন্ধকারময় অপরিষ্কার গলিতে প্রবেশ করিলেন। সেই গলির ভিতর একটি একতলা বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বালিকা দ্বারে ঘা মারিল। ভিতর হইতে এক জন বয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। বালিকা তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"সে ডাক্তার হয় নাই, অন্য ডাক্তার আনিয়াছি।"

গিরিশ তাঁহাদের সঙ্গে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে সামান্য একটা বৈঠকখানা দেখিলেন। সে ঘরে কেহ নাই; সব অন্ধকার। বৈঠকখানার পর সামান্য একটু প্রাঙ্গণ। তাহার পর, ভিতর-বাটী। ভিতর-বাটীতে দুইটি ছোট একতলা ঘর। ঘরের অবস্থা, জিনিসপত্রের অভাব স্ত্রীলোক দুইটির অলঙ্কারশূন্য দেহ, মলিন বস্ত্র, এই সমুদয় দেখিয়া গিরিশ মনে করিলেন যে, ইহারা নিতান্ত দরিদ্র। যে ঘরে মিট্-মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের একপার্শ্বে একখানি তক্তপোষ ছিল। সেই তক্তপোষে একজন কৃষ্ণকায় পঞ্চদশ মানুষ শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার শরীর কৃশ ও রুগ্ন বলিয়া বোধ হইল। বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক হইবে। গলায় যজ্ঞোপবীত, তাহাতে গিরিশ বুঝিলেন যে, ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। গিরিশ আরও বুঝিলেন যে, বয়স্কা স্ত্রীলোক তাঁহার গৃহিণী ও বালিকা তাঁহার কন্যা। কিন্তু তাহাকে সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তির কন্যা বলিয়া বোধ হয় না। চমৎকার মাহা-মরি রূপ না হউক, বালিকা সুন্দরী বটে;—মাজা-মাজা রং, বড় বড় চক্ষু, বড় ভ্রূযুগল, পূর্ণ গণ্ডদেশ গোল গোল গড়ন, মেঘরাশির ন্যায় কেশ, তাহার উপর একটা মৃদু-মধুর ভাব। সেই মৃদু-মধুর ভাবে মন আকর্ষণ করে। সেই মৃদু-মধুর ভাবে মস্তক অবনত করিয়া, বালিকা যখন দুই একটি কথা বলে, তখন সতৃষ্ণ নয়নে সকলকেই তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহার সেই কমলমুখনির্গত পীযূষময় কথা আরও দুই একটি শুনিতে ইচ্ছা হয়। সামান্য সেই প্রদীপের আলোকে বালিকার মুখশ্রী দেখিয়া গিরিশের মন মোহিত হইল। বালিকার বয়স বুঝি দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণী আধ ঘোমটা দিয়া স্বামীর পদতলে তক্তপোষের এক কোণে বসিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়া তিনি সেই জল মুছিতেছিলেন। বালিকা পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাবা! পথে বড় অন্ধকার; বৃষ্টি পড়িতেছে। এক স্থানে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। ইনি আমাকে ধরিয়া তুলিয়াছিলেন। ইনি ডাক্তার। সে জন্য, তোমার ডাক্তারখানা পর্য্যন্ত আর যাই নাই। ইঁহাকে আনিয়াছি।"

ইঁহারা ব্রাহ্মণ; তাহা দেখিয়া গিরিশের মনে প্রথম কতকটা আনন্দ-সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার পর, কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই, এই কথা শুনিয়া গিরিশের মন আরও প্রফুল্ল হইল। গিরিশ মনে মনে ভাবিলেন যে, আজ রাত্রির এই

ঘটনাতে বিধাতার কোনরূপ ফন্দি আছে। তা না হইলে, পথে প্রথম এই অপরিচিতা বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে কেন? তাহার পর, আলোকে ইহার মুখশ্রী দেখিয়া আমার মন এত চঞ্চল হইবে কেন? বালিকা যেন কত দিনের পরিচিতা, এ যেন আমার, এইরূপ ভাব আমার মনে উদয় হইবে কেন? দেখা যাউক,—বিধাতা কিরূপ ভবিতব্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

গিরিশ মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী পুনরায় বলিলেন,—"কেন বাবা! চুপ করিয়া রহিলে যে? তবে কি কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে? তবে কি ইনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না?"

গিরিশ চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন,—"না মা! কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আপনি যখন আমাকে ছেলে বলিলেন, তখন আমিও আপনাকে মা বলিয়া ডাকি। কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একটু ঔষধ সেবন করিতে হইবে। আমি ঔষধ লিখিয়া দিতেছি, সেই ঔষধ সেবন করিলে রাত্রিতে ভালরূপ নিদ্রা হইবে, আর কাল ইনি ভাল হইয়া যাইবেন। ইহাকে প্রকৃত রক্তবমন বলে না। ইহাতে কোন ভয় নাই।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"এত রাত্রিতে ঔষধ আনিতে যায় কে? তার পর—" ব্রাহ্মণী সহসা চুপ করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তাহার পর ঔষধের দাম কোথা হইতে আসিবে? আমি যে ডাক্তারখানায় কাজ করি, সে ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে পারিলে দাম লাগে না। কিন্তু এত রাত্রিতে সে স্থানে যায় কে? তখন প্রাণের দায়ে মেয়েকে পাঠাইয়াছিলাম। এত রাত্রিতে পুনরায় আর কন্যাকে পাঠাইতে পারি না।"

গিরিশ উত্তর করিলেন,—"সে জন্য কোন ভাবনা নাই। কোন্ ডাক্তারখানা আমাকে বলিয়া দিন, আমি এইক্ষণে গিয়া ঔষধ আনিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"গোপীমোহন রায়ের ডাক্তারখানা। তোমাদের মুহুরি মাধব চক্রবর্তীর পীড়া হইয়াছে, এই কথা বলিয়া ঔষধ চাহিলেই, তাহারা তৎক্ষণাৎ দিবে।"

গিরিশ একটু কাগজ লইয়া যথা প্রয়োজন ঔষধ লিখিলেন। তাহার পর নিজেই ঔষধ আনিতে যাইলেন।

গোপীমোহন রায়ের ডাক্তারখানা কিছু দূর। যথাসময়ে গিরিশ সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া গিরিশ দেখিলেন যে, বাম দিকে একটি বড় ঘর; দক্ষিণ দিকেও সেইরূপ একটি বড় ঘর। সম্মুখে প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের পরে পূজার দালান। পূজার দালানের পশ্চাতে অন্তঃপুর। সদর দরজায় গ্যাস জ্বলিতেছিল। বাম দিকের বড় ঘরখানিতে ডাক্তারখানা,—নানারূপ ঔষধের বোতল ও নানারূপ যন্ত্রে সুসজ্জিত। বাম দিকের সেই বড় ঘরের পার্শ্বে একটি ছোট ঘর। সেই ঘরে কম্পাউণ্ডার ঔষধ প্রস্তুত করে। দক্ষিণ দিকের বড় ঘরখানিতে ঔষধাদি কোনরূপ দ্রব্য ছিল না। ঘরের মধ্যস্থলে একটি টেবেল ছিল; তাহার পার্শ্বে তিনখানি চৌকি ছিল। ঘরের তিনদিকে দেয়ালের নিকট এক একখানি বেঞ্চি ছিল। এই ঘরে বসিয়া গোপীমোহন ডাক্তার প্রাতঃকালে আগত রোগীদিগের নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন। যেমন বাম দিকের বড় ঘরের পার্শ্বে এক ছোট ঘর, দক্ষিণ দিকেও সেইরূপ একটি ছোট ঘর। এই ছোট ঘরের দ্বার তখন বন্ধ ছিল। এ ঘরে কি আছে না আছে গিরিশ তাহা দেখিতে পাইলেন না। গিরিশ দেখিলেন যে, পূজার দালানে অনেকগুলি বড় বড় কাঠের বাক্স আছে। বিল ত হইতে যাহাতে ঔষধ আমদানি হয়, সেই বাক্স।

বাম দিকে ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিয়া, গিরিশ কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে

ঔষধ প্রার্থনা করিলেন। গিরিশ বলিলেন,—"আপনাদের মুহুরি মাধব চক্রবর্তী মহাশয়ের অসুখ হইয়াছে; তিনি আমাকে এই ঔষধ লইতে পাঠাইয়াছেন।"

কম্পাউণ্ডার গিরিশকে দক্ষিণ দিকের ঘরে বসিতে বলিল;—যে ঘরে টেবেল, চেয়ার ও বেঞ্চি ছিল, গিরিশ সেই ঘরে বসিলেন। তাহার পার্শ্বে যে ছোট কুঠুরি ছিল, তাহা তখন তালা দ্বারা বন্ধ ছিল।

কম্পাউণ্ডার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া গিরিশকে দিল। গিরিশ প্রত্যাগমন করিয়া, ঔষধ মাধব চক্রবর্তী মহাশয়কে প্রদান করিলেন; আর বলিলেন,—"প্রাতঃকালে আমায় কলেজে যাইতে হইবে। এগারটার সময় ছুটী পাইব। সেই সময় আসিয়া আপনি কেমন থাকেন, তাহা দেখিয়া যাইব।"

তৃতীয় অধ্যায় : মোহর চুরি

গিরিশ আপনার বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। সেই বালিকার মুখখানি কেবল তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। বালিকা অবিবাহিতা, নাম সরলা, মাধব চক্রবর্ত্তীর কন্যা। গিরিশ কুপাত্র নহেন। তবে কেনই বা বিবাহ হইবে না? এইরূপ কত চিন্তা গিরিশের মনে উদয় হইতে লাগিল। তাহার পর, গিরিশ নিজের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেন। বালিকার পিতা-মাতা বিবাহ দিতে সম্মত হইলেও, এ অবস্থায় কি করিয়া তিনি পরিবার প্রতিপালন করিবেন? গিরিশের নিবাস কৃষ্ণনগর জেলায় সামান্য একখানি গ্রামে। তাঁহার মাতার অনেকদিন পরলোক হইয়াছে। অভিভাবকের মধ্যে একমাত্র পিতা ছিলেন। পল্লীগ্রামে ডাক্তারি করিয়া তিনি গিরিশের খরচ যোগাইতেন। এক বৎসর গত হইল, পিতার কাল হইয়াছে। গিরিশ তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। গ্রামে গিয়া যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সমদয় বিক্রয় করিয়া তিন শত টাকা হইল। ডাক্তারি পাশের তখনও দুই বৎসর বাকি ছিল। গিরিশ মনে করিলেন, এই তিন শত টাকা সম্বল করিয়া কোনরূপে আমি ডাক্তারি পাশ দিব। কলিকাতা আসিয়া সেই তিন শত টাকা এক স্থানে জমা রাখিলেন। মনে করিলেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এ তিন শত টাকায় হাত দিব না। সন্ধ্যার সময় এক ধনবান ব্যক্তির দুইটি পুত্রকে পড়াইয়া যাহা পাইতেন, তাহাতেই বাসা ও কলেজের খরচ নির্বাহ করিতেন। গিরিশ ভাবিলেন,—"এ অবস্থায় আমার বিবাহ করা কিছুতেই উচিত নহে। আমার ডাক্তারি পাশ হইবার এক বৎসর বাকি আছে। যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয় অপেক্ষা করেন, আর যদি পাশ হইতে পারি, তাহা হইলে দেখা যাইবে।"

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় গিরিশ রাত্রিযাপন করিলেন।

কলেজের ছুটী হইলে, পর দিন এগারটার সময় গিরিশ,—মাধব চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে যাইলেন। দেখিলেন যে, তিনি ভাল আছেন; কিন্তু অতিশয় দুর্বল।

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"এই অবস্থায় আমাকে ডাক্তারখানায় যাইতে হইয়াছিল। আমার মনিব গোপীবাবু আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। ডাক্তারখানায় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। গোপীবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে যে বড় ঘরখানি আছে, যে ঘরে বসিয়া প্রাতঃকালে তিনি বাহিরের রোগীদিগের নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন, সেই ঘরের পাশে একটি ছোট কুঠরি আছে। সেই কুঠরিতে একটি দেরাজ আছে; সেই দেরাজে অনেকগুলি ছোট ছোট টানা আছে। সেকালের মোহর ক্রয় করা গোপী বাবুর বাই। মাঝে মাঝে এক একটি মোহর কিনিয়া কাগজ নির্ম্মিত একটি সাবানের বাক্সর ভিতর ফেলিয়া তিনি

দেরাজের টানার ভিতর রাখিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশটি মোহর হইয়াছিল। এ কথা কিন্তু জনপ্রাণী কেহই জানিত না। দেরাজের টানার চাবি, সে কুঠরির চাবি, গোপী বাবু আপনার কাছে রাখিতেন, কাহারও হাতে কখনও দিতেন না। আজ প্রাতঃকালে গোপী বাবু নিজে দাঁড়াইয়া সেই ঘরের দেরাজ আলমারি প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি মোহরগুলি গণিয়া দেখিতেন। জিনিষপত্র স্থানান্তরিত হইলে আজও যথারীতি মোহরগুলি গণিয়া দেখিতে যাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে, মোহর দেখিতে পাইলেন না। দেরাজের টানার ভিতর সে সাবানের বাক্সও নাই, সে মোহরও নাই। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোপী বাবু বলেন যে, দুই দিন পূর্ব্বে তিনি মোহর গণিয়া দেখিয়াছিলেন। এই দুই দিনের ভিতর কেহ তাহা চুরি করিয়াছে। এই দুই দিনের ভিতর কে সে কুঠরির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, অথবা কুঠরির নিকট বড় ঘরে একাকী কে ছিল, সেই বিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে।"

গিরিশ বলিলেন,—"আমি কাল রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বড় ঘরে একাকী বসিয়াছিলাম। পাশের কুঠরিও দেখিয়াছিলাম। তখন তাহাতে তালা বন্ধ ছিল।"

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"হাঁ, তোমারও কথা উঠিয়াছিল। গোপী বাবু তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে, আজ প্রাতঃকালে কুঠরির তালা যেমন বন্ধ সেইরূপ বন্ধ ছিল। দেরাজের চাবিও বন্ধ ছিল। সে নিমিত্ত গোপী বাবু বলেন যে, বাহিরের চোর আসিয়া তাঁহার মোহর চুরি করে নাই ; ঘরের চোরেই করিয়াছে।"

দুই মাস গত হইল। চোর ধরা পড়িল না। মোহর পুনঃপ্রাপ্তির আশা গোপী বাবু ছাড়িয়া দিলেন। গিরিশ, মাধব চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। মাধব চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীকে তিনি মা বলিতেন। গিরিশ তাঁহাদের বাটী যাইলে সরলার মুখ প্রফুল্ল হইত। গিরিশের কথা সরলা এক মনে এক ধ্যানে শুনিত। দুই এক দিন গিরিশ যদি তাঁহাদের বাটীতে না যাইতেন, তাহা হইলে সরলা ভালরূপে কাজ-কর্ম্ম করিত না, সর্ব্বদাই বিরস মনে থাকিত।

এক দিন সরলার মাতা স্বামীকে বলিলেন,—"মেয়ে বড় হইয়াছে। তাহার জ্ঞান হইয়াছে। বিবাহের জন্য আমরা কতই না ভাবিতেছিলাম। বিধাতা আপনি বুঝি সরলার বর আনিয়া দিলেন।"

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"আমি চুপ করিয়া নাই। গিরিশের পরিচয় আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সকল বিষয়ে সুপাত্র বটে, কিন্তু অবস্থা ভাল নহে, তাহা ব্যতীত, গিরিশের কোন কুলে কেহ নাই। তাহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথা হইয়াছিল। সরলাকে বিবাহ করিতে গিরিশের বিশেষরূপ আগ্রহ আছে। কিন্তু সে বলে যে, পাশ না দিয়া কিরূপে বিবাহ করি? যদি পাশ না হই, তাহা হইলে কি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিব? ভাল, যখন এত দিন গিয়াছে, তখন আরও কিছু দিন অপেক্ষা করা যাউক। গিরিশ আমার নিকট সত্য করিয়াছে যে, পাশ হইলে সে অন্য কোন স্থানে বিবাহ করিবে না।"

মাধব চক্রবর্ত্তীর মনিব, গোপীমোহন ডাক্তারের সহিতও গিরিশের আলাপ পরিচয় হইল। গিরিশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শান্ত স্বভাব দেখিয়া গোপী বাবু সর্ব্বদাই তাহার প্রশংসা করিতেন।

একদিন গোপী বাবু গিরিশকে বলিলেন,—"আমি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। হাঁপানি কাশিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। প্রতিদিন যত বাড়ী হইতে ডাক আসে, সে সকল স্থানে যাইতে পারি না। ডাক্তারখানার কাজও ভালরূপ

দেখিতে পারি না। তুমি যদি আমার ডাক্তারখানায় আসিয়া নিযুক্ত হও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়। প্রাতঃকালে আমার বাটীতে যে সমুদয় রোগী আসে, অবসর পাইলে তাহাদিগকে তোমায় দেখিতে হইবে, আর ডাক্তারখানার কার্যকর্মের ভারও লইতে হইবে। আপাততঃ তোমার সমুদয় খরচ আমি দিব, তাহার পর তুমি পাশ হইলে তোমাকে ডাক্তারখানার একটা অংশ দিব। আর যাহাতে তোমার ভালরূপ পসার হয়, তাহাও আমি করিব।"

গিরিশ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যে বালক দুইটিকে তিনি পড়াইতেন, তাহাদের নিমিত্ত অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, গিরিশ ডাক্তারখানার কাজেই সমুদয় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে দিন প্রাতঃকালে যাইতে হইত না, সে দিন বাহিরের রোগীদিগকে দেখিয়া, তাহাদের নিমিত্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। সন্ধ্যার সময় ডাক্তারখানার কাজ দেখিতেন।

গিরিশের বাসা কিছু দূরে ছিল। সে নিমিত্ত এক দিন মাধব চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বলিলেন,—"প্রতিদিন এত দূর হইতে ডাক্তারখানায় আসিতে তোমার কষ্ট হয়। আমার বাটীর বাহিরে ছোট ঘরটি পড়িয়া আছে। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সেই ঘরে আসিয়া থাকিতে পার। আর আমাদেরও যদি একমঠা হয়, তোমারও একমঠা হইবে।"

সরলার নিকট বাস করিবেন, সরলাকে প্রতিদিন দেখিতে পাইবেন, সে জন্য গিরিশের মনে আনন্দ হইল। মাধব চক্রবর্ত্তীর সেই ছোট বৈঠকখানায় গিরিশ বাস করিতে সম্মত হইলেন।

গিরিশ বলিলেন,—"আপনার বাহিরের ঘরে আমি থাকিব, আপনার ঘরেও আমি খাইব। কিন্তু আপনার অবস্থা ভাল নহে। আপনাকে খরচ লইতে হইবে। আমার যত ব্যয় যখন গোপী বাবু নির্ব্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন আপনি খরচ লইবেন না কেন? খরচ না লইলে আমি আপনার বাটীতে থাকিব না।"

অগত্যা মাধব চক্রবর্ত্তীকে এ কথায় সম্মত হইতে হইল। গিরিশ মাধব চক্রবর্ত্তীর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘরে আহার করিতে লাগিলেন। সরলাকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেন। সরলার লজ্জাশীলতা, সরলার মধুর কথা সরলার নানা গুণ দেখিয়া তিনি নিতান্ত মুগ্ধ হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায় : বাক্সমোড়া চেট

গোপী বাবুর ডাক্তারখানায় এক দিন বিলাত হইতে অনেক ঔষধ আসিয়াছিল। গিরিশ সেই বাক্সগুলি পূজার দালানে রাখাইলেন। কিন্তু মূল্যবান ঔষধের বাক্স কয়টি গোপী বাবু সেই মোহর-চাবির কুঠরিতে রাখিতে আদেশ করিলেন।

গোপী বাবু বলিলেন,—"ছোট কুঠরিতে ঐ দেরাজটা মিছামিছি স্থান জোড়া করিয়া আছে। ঐ দেরাজ হইতে আমার মোহর চাবি গিয়াছে। ওটাকে দেখিলে আমার রাগ হয়। দেরাজটা বিক্রয় করিয়া ফেল। তাহার পর ঐ ঘরে ভাল ভাল ঔষধের বাক্সগুলি রাখিয়া দাও।"

যাহারা কাঠকাঠরার ব্যবসা করে, সেইরূপ এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া, মাধব চক্রবর্ত্তী দেরাজটা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কুলি ডাকিয়া সেই ব্যক্তি দেরাজ বাহিরে আনিল। গোপী বাবুর দেরাজের টানার চাবিগুলি ফেলিয়া দিলেন। চাবি

কয়টি হাতে করিয়া গিরিশ মনে করিলেন,—"দেখি, দেরাজের ভিতর কিছু আছে কি না।"

একে একে টানাগুলি খুলিয়া, তাহার ভিতর হাত প্রবিষ্ট করিয়া গিরিশ উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলেন। এ টানা সে টানা দেখিবার পর, অবশেষে একটির ভিতর যেই তিনি হাত দিয়াছেন, অমনি তাঁহার হাতে কি ঠেকিয়া গেল। তিনি সেই জিনিসটি টানিয়া বাহিরে আনিলেন। দেখিলেন যে,—সাবানের বাক্স! খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর মোহর!

সকলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মোহরগুলি গোপী বাবু গণিয়া দেখিলেন যে, ঠিক তাঁহার সেই পঞ্চাশটি মোহর রহিয়াছে। মোহর দেখিতে ডাক্তারখানার সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই এক একবার এক একটি মোহর তুলিয়া হাতে করিয়া দেখিল। গিরিশও একবার একটি মোহর তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন।

টানার ভিতর মোহরের বাক্স কি করিয়া পুনরায় আসিল? মোহর যখন চুরি গিয়াছিল, তখন গোপী বাবু এক একটি টানার ভিতর হাত দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছিলেন। বিলাতী দেরাজ। টানা একেবারে বাহির করিয়া ফেলিবার যো ছিল না। কিন্তু খুঁজিতে তিনি বাকি করেন নাই। তিনি একেলা নহেন, ডাক্তারখানার প্রায় সকল লোকেই টানার ভিতর হাত দিয়া দেখিয়াছিল। কাহারও হাতে তখন সাবানের বাক্স ঠেকে নাই। আজ পুনরায় ইহার ভিতর সে মোহরপূর্ণ বাক্স কোথা হইতে আসিল?

যে লোক দেরাজ কিনিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ও অনেক বার দেরাজের টানাগুলি টানিয়া ও নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর গোপী বাবুর নিকট হইতে সাবানের বাক্সটি লইয়া কাত অর্থাৎ আড় করিয়া টানার ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিল। সাবানের বাক্স গিয়া দেরাজের পশ্চাৎ দিকের কাঠের গায়ে লাগিল। তখন সকলকে সে হাত দিয়া দেখিতে বলিল। সাবানের বাক্স আড় হইয়া কাঠের গায়ে ঠিক সমান ভাবে লাগিয়াছিল। হাত দিলেই কাঠের মত বোধ হইতে লাগিল। যে দিন মোহর অন্তর্হিত হয়, সে দিন গোপী বাবু দেরাজ নাড়িয়াছিলেন। সেই নাড়া-চাড়ায় টানার ভিতর সাবানের বাক্স আড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর, টানার ভিতর যে, হাত দিয়া দেখিয়াছিল, তাহার হাতেই সাবানের বাক্সর পৃষ্ঠদেশ ঠিক কাঠের মত বোধ হইয়াছিল। সকলেই বুঝিল যে, মোহর অন্তর্হিত হইবার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গোপী বাবু তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে দেখাইবার নিমিত্ত মোহরপূর্ণ সাবানের বাক্সটি লইয়া সত্বর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। যে দিন এ ঘটনা ঘটিল, সে দিন মঙ্গলবার।

গিরিশ বাসায় আসিলেন। মাধব চক্রবর্ত্তী তখন বাটী আসেন নাই। মোহর পুনঃপ্রাপ্তির বিষয়ে গিরিশ সরলা ও সরলার মাতার নিকট গল্প করিলেন।

সরলা বলিল,—"মোহর কিরূপ, আমি কখনও দেখি নাই!"

গিরিশ বলিলেন,—"মোহর কখনও দেখ নাই? রও! আমি তোমাকে দেখাইতেছি। আমার যে দিন জন্ম হয়, সেই দিন পিতামহ আমাকে একটি মোহর দিয়া দেখিয়াছিলেন। আমি বড় হইলে পিতা সেই মোহরটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—'গিরিশ! ইহা আক্‌বরী মোহর, ইহা লক্ষ্মী; যাহার কাছে থাকে, তাহার ভাল হয়। সে জন্য তোমাকে আমি ইহা দিতেছি। অতি যত্নে ইহা রাখিবে, কিছুতেই ইহা নষ্ট করিবে না।' সেই অবধি মোহরটি আমি অতি সাবধানে রাখিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া গিরিশ আপনার ঘরে গমন করিলেন। বাক্স হইতে মোহরটি আনিয়া সরলাকে দেখাইলেন। সরলা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া মোহরটি পুনরায় গিরিশকে দিল। গিরিশ তখন তাহা আপনার পকেটে রাখিলেন। মনে করিলেন যে, পরে ইহা বাক্সতে তুলিয়া রাখিব।

কিছুক্ষণ পরে গোপী বাবুর দরওয়ান আসিল। হোলির সময় গিরিশের নিকট সে বক্‌শিশ চাহিয়াছিল। আট আনা দিতে গিরিশ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। গিরিশ বলিলেন,—"তোমার আমি আট আনা পয়সা ধারি; দিই, লইয়া যাও।"

এই বলিয়া গিরিশ পকেট হইতে একটি সিকি ও কতকগুলি পয়সা বাহির করিলেন। সেই পয়সার সহিত মোহরটিও বাহির হইয়া পড়িল। দরওয়ান তাহা দেখিল। মোহরটি পুনরায় পকেটে রাখিয়া, গিরিশ তাহাকে একটি সিকি ও চারি আনা পয়সা গণিয়া দিলেন। দরওয়ান তাহা লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন বুধবার প্রাতঃকালে গিরিশ ডাক্তারখানায় গমন করিলেন। বিলাত হইতে যে সমুদয় বাক্স আসিয়া পূজার দালানে ছিল, গিরিশ তাহার গুটিকত বাক্স খুলাইয়া, একেলা ফর্দ্দের সহিত ঔষধ মিলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই মোহরপূর্ণ সাবানের বাক্স হাতে করিয়া গোপী বাবু সেই স্থানে আসিলেন। গিরিশ যে স্থানে মাটীতে বসিয়া ফর্দ্দের সহিত ঔষধ মিলাইতেছিলেন, তাহার পার্শ্বে একখানি তক্তপোষ ছিল। মোহরপূর্ণ সেই সাবানের বাক্স তক্তপোষের উপর রাখিয়া গোপী বাবু বন্ধু-বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আহ্লাদ-সহকারে সেই মোহর দেখাইতে লাগিলেন।

সকলকে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"দুই বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি এই মোহরগুলি জমা করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর ইহাদের মুখ দেখিতে পাইব না। কিন্তু কা'ল হঠাৎ পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল। আর একটু হইলেই যে দেরাজ কিনিয়াছিল, সে লইয়া চলিয়া যাইত। ভাগ্যে গিরিশ টানার ভিতর হাত দিয়া দেখিল, তাই আমি পুনরায় মোহরগুলি পাইলাম। সে এই গিরিশ, যে মাটীতে বসিয়া কাজ করিতেছে। এই গিরিশ হইতেই আমি আমার মোহরগুলি পাইয়াছি।"

গোপী বাবু গিরিশের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিলেন। গিরিশও তাঁহার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া গোপী বাবু এইরূপ পরিচয় দিয়া মোহর দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্স হইতে দুই একটি মোহর তুলিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, চলিয়া গেলেন। তাহাতেও গোপী বাবুর মন তৃপ্ত হইল না। তিনি সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রাস্তা দিয়া পরিচিত লোক যে যায়, তাহাকে মোহর দেখিবার নিমিত্ত ডাকিয়া আনেন।

গিরিশ আপনার মনে কাজ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে গোপী বাবুর বৃদ্ধা মাতা এক দাসী সঙ্গে করিয়া দালানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গিরিশকে বিশেষরূপে স্নেহ করিতেন। গিরিশকে তিনি বলিলেন,—"গিরিশ! বাক্সমোড়া এই চটগুলি ফেলিয়া দিও না, অনেক কাজে লাগিবে। যারে রাখ, সে—ই রাখে! চটগুলি আমাকে দাও, আমি বাটীর ভিতর লইয়া যাই।"

যে চট-দ্বারা আবৃত হইয়া বিলাত হইতে কতকগুলি বাক্স আসিয়াছিল, গোপী বাবুর মাতা সেই চটগুলি বাছিয়া ও ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া তক্তপোষের উপর রাখিতে লাগিলেন। এ কার্য্যে চাকরাণীও তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বাটীর ভিতর একটি ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—"ঐ যাঃ! খোকা বুঝি পড়িয়া গেল! আহ্লাদি! মাটীতে যে চট পড়িয়া আছে, তুই, সেইগুলি লইয়া আয়!"

এই বলিয়া গোপী বাবুর মাতা তক্তপোষের উপর যে চটগুলি রাখিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি দুই হাতে সেইগুলিকে জড় করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। নীচে অর্থাৎ মাটীর উপর যে চটগুলি পড়িয়াছিল, আহ্লাদি চাকরাণী তাহা লইয়া তাঁহার সংগে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। গিরিশ এক মনে আপনার কাজ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় : শোণিত-পাত

বন্ধু-বান্ধবের প্রতীক্ষায় গোপী বাবু সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর এক জন পরিচিত লোককে পাইয়া মোহর দেখাইতে আনিলেন। দালানে উপস্থিত হইয়া তক্তপোষের উপর চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"মোহরের বাক্স কি হইল? গিরিশ! মোহরের বাক্স কই?"

গিরিশ উত্তর করিলেন,—"মোহরের বাক্স আমি কি জানি!"

গোপী বাবু বলিলেন,—"সে কি, তক্তপোষের উপর আমি এই স্থানে বাক্স রাখিয়াছিলাম। সে বাক্স কোথায় গেল?"

গিরিশ বলিলেন,—"আহ্লাদি ঝীকে সংগে লইয়া আপনার মাতা চট লইতে দালানে আসিয়াছিলেন। তবে বোধ হয় তিনিই বাক্স বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন।"

গোপী বাবু বাটীর ভিতর দৌড়িয়া গেলেন ও মোহরের কথা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন,—"সে কি! আমি কেন মোহরের বাক্স আনিব? বাক্স তক্তপোষের উপর রহিয়াছে, আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম।" আহ্লাদি ঝীও ঠিক সেই কথা বলিল।

গোপী বাবু পুনরায় দালানে আসিয়া গিরিশকে বলিলেন,—"গিরিশ! মা বাক্স লইয়া যান নাই। বাক্স তক্তপোষের উপর রহিয়াছে, তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। আহ্লাদী ঝীও তাহা দেখিয়া গিয়াছে। তুমি বোধ হয়, তামাসা করিয়া বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছ। আর কেন, দাও। বাক্স বাহির করিয়া দাও।"

গিরিশ উত্তর করিলেন,—" সে কি মহাশয়! আপনার সহিত আমি তামাসা করিব, এ কি সম্ভব! বাক্স তক্তপোষের উপর ছিল, তাহা আমিও দেখিয়াছি। বন্ধুবান্ধবকে আনিয়া আপনি দেখাইতেছেন, তাহাও শুনিতেছি। কিন্তু আমি আপনার মনে কাজ করিতেছি। আপনার বাক্সতে আমি হাত দিই নাই। বাক্স কে লইল, কোথায় গেল, তাহার বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না।"

গোপী বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"বাক্সর পা নাই যে চলিয়া যাইবে, পাখা নাই যে উড়িয়া যাইবে। আমার মা কিছু আর বাক্স চুরি করেন নাই। বাক্স তক্তপোষের উপর রহিয়াছে, তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। আহ্লাদী ঝীও তাহা দেখিয়া গিয়াছে। তাহার পর এ দালানে অপর কোন ব্যক্তি আসে নাই। তুমি একেলা এই দালানে আছ। দাও, বাক্স কোথায় রাখিয়াছ, বাহির করিয়া দাও।"

গিরিশও রাগত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তবে কি মহাশয় আমাকে চোর বলেন নাকি?"

গোপী বাবু আরও কুপিত হইয়া বলিলেন,—"বাক্স না পাওয়া গেলে আর কি বলিব?"

গিরিশ বলিলেন,—"তবে এই আপনার ঔষধ রহিল, এই কাগজ রহিল, এই দোয়াত কলম রহিল, আমি চলিলাম। শুই দেখুন, আমার হাতে কিছুই নাই

কাপড়ে কিছু নাই, চাদরে কিছু নাই, জামার ভিতর কিছু নাই। আপনার মোহর আমি খাইয়া ফেলি নাই।"

এই কথা বলিয়া গিরিশ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ক্রোধে কম্পিত হইয়া গোপী বাবু বলিলেন,—"তুমি যাবে কোথা? বাক্স বাহির করিয়া দিয়া তবে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। তা না হইলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। ওরে, এরে ধর তো। ঐ ছোট কুঠরিতে বন্ধ করিয়া রাখ।"

পূর্বে গোপী বাবুর ডাক্তারখানা হইতে অনেক ঔষধ চুরি যাইত। কম্পাউণ্ডার, দ্বারবান প্রভৃতি সকলের তাহাতে সন্দ ছিল ও সকলের তাহাতে ভাগ ছিল। গিরিশ আসিয়া সেই সব চুরি বন্ধ করিয়াছিলেন। সে নিমিত্ত গিরিশের উপর সকলের ঘোরতর রাগ ছিল। সকলে আসিয়া গিরিশকে ধরিল ও সেই মোহর-চুরির ছোট কুঠরিতে লইয়া গেল। সে স্থানে লইয়া, কাপড় দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া, গিরিশকে তাহারা নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারের চোটে গরুতর আঘাত লাগিয়া গিরিশের মুখ দিয়া ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সে রক্ত মুখ হইতে বাহির হয় নাই; সে রক্ত কৃষ্ণবর্ণের নহে। গিরিশের শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র বাল্যকাল হইতেই দুর্বল ছিল। সে রক্ত লোহিতবর্ণ; বক্ষঃস্থলের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল। গিরিশকে যাহারা মারিতেছিল, শোণিত দেখিয়া তাহাদের ভয় হইল। হাতে মুখে জল দিয়া গিরিশকে তাহারা একটু সুস্থ করিল, ও রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর গিরিশকে সেই ঘরে বন্ধ করিয়া, দালানে ও সকল স্থানে পাতি পাতি করিয়া তাহারা মোহরের বাক্স খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সকল অনুসন্ধান বৃথা হইল, মোহরের বাক্স বাহির হইল না। যখন এই সমুদয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তখন মাধব চক্রবর্তী ডাক্তারখানায় ছিলেন না। তিনি তাগাদায় গিয়াছিলেন।

এই গোলযোগের সময় গোপী বাবুর দরওয়ান তাঁহাকে বলিল যে,—"মহাশয়! গত কল্য গিরিশ বাবুর নিকট আমি একটা মোহর দেখিয়াছি। কাল আমার সাক্ষাতে গিরিশ বাবু পকেটে হাত দিয়া কতকগুলি পয়সা বাহির করিলেন। সেই পয়সার সহিত একটা মোহর দেখিয়াছিলাম।"

দরওয়ান বলিল, কাল সে গিরিশের নিকট মোহর দেখিয়াছি। গোপী বাবুর মোহর চুরি গেল, আজ প্রাতঃকালে। সে কথা গোপী বাবুর বড় হৃদয়ঙ্গম হইল না। ক্রোধে ও দুঃখে তিনি জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। দরওয়ান, গিরিশের নিকট মোহর দেখিয়াছে, এই কথা শুনিয়াই তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, মোহর গিরিশ চুরি করিয়াছে। পূর্ব দিন যখন দেরাজ হইতে বাহির হয়, তখন দুই একটা মোহর হাতে করিয়া সকলেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছিল। গিরিশও তাহা হাতে করিয়াছিলেন। সে নিমিত্ত গোপী বাবু ভাবিলেন যে, গিরিশ কাল একটা মোহর কোনরূপে পকেটে ফেলিয়াছিল। তাহার পর আজ সমুদয়গুলি লইয়াছে। মোহর আবার কে কবে পয়সার সঙ্গে পকেটে রাখিয়া থাকে?

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ হাতে হাতকড়ি

মাতা অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহা না শুনিয়া গোপী বাবু পুলিশে নালিশ করিলেন। পুলিশের লোক আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিল।

গোপী বাবু বলিলেন যে,—"আর এক বার আমার এই মোহর চুরি গিয়াছিল। যে রাত্রিতে চুরি যায়, সে রাত্রিতে গিরিশ আসিয়া পাশের ঘরে

অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। কিন্তু তখন আমি তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করি নাই। তাহার পর সে আমার ডাক্তারখানায় কর্ম করে। গত কল্য সেই গিরিশ টানার ভিতর হইতে মোহর বাহির করিয়া আমাকে প্রদান করে। কি অভিপ্রায়ে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সে বোধ হয়, টানার ভিতর প্রথম নিজেই রাখিয়া তাহার পর আপনি সেই মোহর বাহির করিয়াছিল। আজ প্রাতঃকালে মোহরের বাক্স দালানে তক্তপোষের উপর রাখিয়া আমি সদর-দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এই অবসরে মোহর সে কোন স্থানে সরাইয়া রাখিয়া থাকিবে। ইহার একটি মোহর আমার দরওয়ান তাহার পকেটে দেখিয়াছে। দালানে আজ প্রাতঃকালে এক গিরিশ ব্যতীত অপর কেহ আসে নাই। একবার কেবল আমার মাতা, ঝীকে সংগে লইয়া আসিয়াছিলেন। মাতা যখন বাটীর ভিতর ফিরিয়া যান, তখন মোহরের বাক্স তক্তপোষের উপর ছিল। ঝীও তাহা দেখিয়াছে।"

গোপী বাবুর মাতা, আহ্লাদী ঝী, দ্বারবান প্রভৃতি সকল লোকের সাক্ষ্য পুলিশের লোকে গ্রহণ করিল। গিরিশের পকেট অনুসন্ধান করিয়া তাহারা একটি মোহর পাইল। গিরিশের ঘর-তল্লাস করিয়া কিন্তু আর কিছুই পাইল না। যাহা হউক. অবশেষে হাতে হাতকড়ি দিয়া পুলিশের লোক গিরিশকে চালান দিল। মাধব চক্রবর্তী, তাঁহার স্ত্রী ও সরলা শোকে অভিভূত হইলেন। চক্রবর্তী মহাশয় গোপী বাবুর অনেক হাতে-পায়ে ধরিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না।

দুই দিন পরে গিরিশের মকদ্দমা আদালতে উঠিল। গিরিশ যে মোহর চুরি করিয়াছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু গোপী বাবু মকদ্দমার বিশেষরূপ তদবির করিতে লাগিলেন। যে হাকিমের নিকট গিরিশের বিচার হইতেছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে দুই একটি কথা নির্গত হইল, তাহাতে সকলের বোধ হইল যে, গিরিশের তিনি দণ্ড না করিয়া ছাড়িবেন না। ফরিয়াদির পক্ষের সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে, হাকিম গিরিশকে চুরি অপরাধে অভিযুক্ত করিলেন ও তাঁহার কোন রূপ সাফাই সাক্ষী আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশ বলিলেন যে, তাঁহার কোন সাফাই সাক্ষী নাই। গিরিশকে কারাবাস-প্রেরণের উদ্দেশে হাকিম রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় আদালতে একটা গোল পড়িল। সকলে দেখিল, এক জন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি এক বালিকার হাত ধরিয়া ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। কন্যাটি ঠিক বালিকা নহে, যৌবন প্রস্ফুটিতপ্রায়। বালিকার মধু-মাখা লাবণ্য দেখিয়া সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলা বাহুল্য যে, সে বালিকা আর কেহ নহে—সরলা। গিরিশের বিপদে সরলা ও সরলার মাতা নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। কয় দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, দুই জনেই এক মনে ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। লোকপরম্পরায় সরলা শুনিল যে, গিরিশের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই, কেবল তাঁহার নিকট হইতে সেই যে মোহরটি বাহির হইয়াছিল, তাহার জন্য গিরিশের কয়েদ হইবার সম্ভাবনা।

পিতাকে সরলা বলিল,—"বাবা! গোপী বাবুর মোহর বুধবার দিন চুরি গিয়াছে, কিন্তু মঙ্গলবার দিন গিরিশ বাবুর নিকট আমি মোহর দেখিয়াছি। তাহা হইলে গিরিশ বাবু কি করিয়া মোহর চুরি করিলেন? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, গিরিশ বাবুর পিতামহ এই মোহর দিয়া আঁতুড়ে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু কাহারও কোন বস্তু চুরি করিবার লোক নহেন। চুরি হইবার পূর্ব দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার দিন দ্বারবান যে গিরিশ বাবুর পকেটে মোহর দেখিয়াছিল,

সে কথা সকলে গোপন করিয়াছে। আমি গিয়া হাকিমকে এ কথা বলিব। কোথায় বিচার হইতেছে, সে স্থানে আমাকে লইয়া চল।"

মাধব চক্রবর্তী উত্তর করিলেন,—"বাপ রে! ও কথা মুখে আনিও না। আমি নিশ্চয় জানি বটে যে, গিরিশ মোহর চুরি করে নাই। কিন্তু কি করিব বল, গোপী বাবুর কত হাতে-পায়ে ধরিলাম, তিনি আমার কথা শুনিলেন না। ভগবান যা কপালে লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। তুমি এখন বালিকা নও, তোমাকে কি আদালতে লইয়া যাইতে পারি? লোকের কাছে তাহা হইলে মুখ দেখাইতে পারিব না। তাহার পর গোপী বাবু আমাকে ছাড়াইয়া দিবেন। এ বৃদ্ধ বয়সে কোথায় আবার চাকরি খুঁজিয়া বেড়াইব?"

সরলা ও সরলার মাতা বার বার তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। দুই জনে কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন যে,—"সরলা যদি একটা কথা বলিলে গিরিশ বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, তাহা হইলে সে কাজ নিশ্চয় করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্যায় করিয়া গোপী বাবু কয়েদ দিতেছেন। তাহাকে রক্ষা করিলে লোকে যদি আমাদের নিন্দা করে, তো করুক। গোপী বাবু যদি তোমাকে ছাড়াইয়া দেন, এতই যদি তিনি নরাধম হন্ তো হউন; আমরা ভিক্ষা মাগিয়া খাইব।"

মাধব চক্রবর্তী অগত্যা সরলাকে আদালতে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায় : ফণ্ডে টাকা

কন্যাকে লইয়া মাধব চক্রবর্তী আদালতে উপস্থিত হইলেন। হাকিম তৎক্ষণাৎ সরলার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। সরলাকে বড় অধিক কিছু বলিতে হইল না। গিরিশের পক্ষ হইয়া সরলার আগমন, তাহাই যথেষ্ট হইল। এরূপ সুশীলা সুরূপা ভদ্রকন্যা যাহার সপক্ষে সাক্ষী, সে যে নির্দোষ, সরলাকে দেখিয়াই হাকিমের মনে সেই বিশ্বাস জন্মিল, চুরি হইবার পূর্ব দিন গিরিশের নিকট তিনি মোহর দেখিয়াছিলেন, সরলাকে কেবল এই কথা বলিতে হইল।

সরলার আন্তরিক ভাব হাকিম বুঝিতে পারিলেন। গিরিশকে ছাড়িয়া দিবার সময় ঈষৎ হাসিয়া তিনি সরলাকে বলিলেন,—"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমরা দুই জনে সুখী হও।"

লজ্জায় সরলা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া গিরিশ, মাধব চক্রবর্তী ও সরলা তিন জনে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে সে দিন আর আনন্দের সীমা রহিল না। সরলার মাতা সন্ধ্যার সময়ে হরি-লুট দিলেন।

তাহার পর দিন গোপী বাবু মাধব চক্রবর্তীকে কর্ম হইতে জবাব দিলেন। বিরস বদনে চক্রবর্তী মহাশয় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। গিরিশ বলিলেন,—"মহাশয়! এজন্য কিছুমাত্র ভয় করিবেন না। আর এক মাস পরে আমি পাশ হইব, নিশ্চয় পাশ হইব। তখন আমি ডাক্তার হইব। যে কোন প্রকারে হউক, নিশ্চয় আপনাদিগের প্রতিপালন করিতে পারিব। আপাততঃ আমার তিন শত টাকা জমা আছে, সেই তিন শত টাকা খরচ করিব। তবে আর ভাবনা কি? আপনার যদি অমত না থাকে, তাহা হইলে সত্বর একটা ভাল দিন দেখাইয়া সরলাকে আমার হস্তে প্রদান করুন।"

এই ঘটনার আট দিন পরেই সরলার সহিত গিরিশের শুভ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। গিরিশ শ্বশুরের সংসারেই রহিলেন।

এক মাস পরে গিরিশ সুখ্যাতির সহিত ডাক্তারি পাশ দিলেন। তিন শত টাকার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দিয়া নিকটে ভাল একটি বাটী ভাড়া লইয়া নিজের ডাক্তারখানা খুলিলেন। কিন্তু গোপী বাবু তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন। গিরিশ চোর, গিরিশের চরিত্র ভাল নহে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ইহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে, চারি দিকে এইরূপ কুৎসা রটাইতে লাগিলেন। সে জন্য গিরিশের পসার ভাল হইল না, ভালরূপ অর্থোপার্জন হইল না। যাহা হউক, তিনি, শ্বশুর-শাশুড়ীকে, পিতা-মাতার ন্যায় ভক্তিসহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মাধব চক্রবর্তী মহাশয় দুই এক স্থানে কর্মের যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর দুর্বল ও রুগ্ন, সে জন্য গিরিশ তাঁহাকে আর চাকরি করিতে দিলেন না। চাকরি আর তিনি করিতেও পারিতেন না। কারণ, অল্প দিন পরে বাতরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ধন না হউক, গহনা না হউক, মনের মত পতি পাইয়া, বাপ মায়ের কাছে থাকিয়া, সরলা সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সরলার এক কন্যা হইল। মাতামহ আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন,—লীলা।

গোপী বাবুর ধন-ঐশ্বর্য্য অনেক ছিল বটে ; কিন্তু মনে তাঁহার সুখ ছিল না। যত বয়স হইতে লাগিল, তাঁহার হাঁপানি কাশি ততই প্রবল হইতে লাগিল। জীবন তাঁহার কষ্টময় হইল, শরীর ক্লেশের আগার হইল, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার যন্ত্রণাদায়ক হইল। ইহার উপর তাঁহার দুইটি পুত্রই বিসূচিকা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এক দিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। একটির বয়ঃক্রম দ্বাদশ ও অপরটির বয়স দশ বৎসর। ইহার কিছু দিন পরে গোপী-বাবুর আর একটি বিপদ ঘটিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। সেই কন্যার একটি শিশু পুত্র ছিল। যে দিন মোহর চুরি যায়, সে দিন তাহারই কান্না শুনিয়া গোপী বাবুর মাতা তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর গমন করেন। কয়েক বৎসর পরে গোপী বাবুর কন্যার শ্বশুর-বাড়ীতে এক দিন তাঁহার পুত্র পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া যায়। তখন ঘাটে আর কেহ ছিল না। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য গোপী বাবুর কন্যা জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু তিনি সাঁতার জানিতেন না। মাতা-পুত্র দুই জনেই জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। গোপী বাবু এইরূপে নিঃসন্তান হইলেন। সকলেই বলিল, এমন কি, তাঁহার নিজের মাতাও বলিলেন যে, বিনা দোষে গিরিশের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছিল, তাহারই প্রতিফলস্বরূপ তাঁহার এই সমুদয় বিপদ ঘটিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে মোহরের কোন সন্ধান হয় নাই। সে নিমিত্ত এখনও তাঁহার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, গিরিশই তাঁহার মোহর চুরি করিয়াছে। গিরিশের সহিত পুনরায় সদ্ভাব করিতে মাতা তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি মাতার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশের বক্ষঃস্থল বড় ভাল ছিল না। বিশেষ কোন রোগ ছিল না বটে, কিন্তু বক্ষঃস্থলের সংকুচিত গঠন দেখিয়া, তিনি নিজেই সর্বদা ভয় পাইতেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র ভালরূপ সবল নহে, গিরিশের মনে এই ধারণা ছিল। তাহার পর গোপী বাবুর লোক দ্বারা প্রহারের পর তাঁহার বক্ষঃস্থলে যে বেদনা জন্মে, সে বেদনা কিছুতেই দূর হয় নাই। সেই সময় হইতে মাঝে মাঝে কাসি হইয়া তিনি বড়ই কষ্ট পাইতেন। এই সকল কারণে, অর্থোপার্জন করিতে আরম্ভ করিয়াই, গিরিশ লাইফ ইনশিয়োর অর্থাৎ ফণ্ডে টাকা জমা দিতে লাগিলেন। দুইটি ফণ্ডে তিনি টাকা দিতেন। প্রথম স্থানের সহিত এই নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছিল যে, গিরিশের মৃত্যু হইলে সে ফণ্ড হইতে তাঁহার স্ত্রী নগদ তিন সহস্র টাকা পাইবেন। দ্বিতীয় স্থানের সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর

পর তাঁহার স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দিন মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া পাইবেন। প্রথম স্থানে গিরিশকে ছয় মাস অন্তর পঞ্চাশ টাকা দিতে হইত; দ্বিতীয় স্থানে তিনি প্রতি মাসে তিন টাকা করিয়া দিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : সংকট পীড়া

এইরূপে প্রায় সাত বৎসর কাটিয়া গেল। মাধব চক্রবর্তী মহাশয়ের শরীর আর সুস্থ ও সবল হইল না। গ্রীষ্মকালে তাঁহার বাত-বেদনার প্রকোপ যখন কিছু হ্রাস হইত, তখন তিনি একটু উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতেন। কিন্তু সে কেবল অল্প দিনের জন্য। বলিতে গেলে প্রায় বারো মাস তাঁহাকে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইত। সরলার আর সন্তানাদি হয় নাই, কেবল সেই একমাত্র কন্যা,—লীলা। লীলা পিতার বড় আদরের সামগ্রী। পিতার সহিত তাহার যত মনে কথা হইত। বাবা, বাবা, বলিয়া লীলা অজ্ঞান! বলা বাহুল্য যে, মেয়েটিকে গিরিশ প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। গিরিশের ধন-ঐশ্বর্য্য ছিল না বটে; কিন্তু লীলার কথা, লীলার হাসি, লীলার ভালবাসা, তাঁহার লক্ষ টাকার অধিক ছিল। ফল কথা, গিরিশের সংসারে শান্তি ছিল, সুখ ছিল।

কিন্তু, হায়! লীলার যখন বয়স পাঁচ বৎসর হইল, তখন এই সুখের সংসারে এক ঘোর দুর্ঘটনা ঘটিল। এই সময় গিরিশের ভয়ানক কাসি হইল, রাত্রি দিন কাসি, এক মুহূর্তের জন্য বিরাম নাই, বক্ষঃস্থল যেন খানখান হইয়া ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। শ্লেষ্মার সহিত ক্রমে ঈষৎ রক্ত দেখা দিল। প্রত্যহ বৈকাল বেলা অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। গিরিশ নিজে ডাক্তার ছিলেন। কি হইতেছে, তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। যক্ষ্মা-কাস রোগ দ্বারাই তিনি আক্রান্ত হইলেন। গিরিশ ভাবিলেন যে,—আর আমার নিস্তার নাই।

ক্রমে তিনি শুষ্ক ও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্ত্রী ও কন্যার মুখপানে চাহিয়া তিনি যত দিন পারিলেন, সংসার-নির্বাহের নিমিত্ত অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন। নিতান্ত অশক্ত হইয়াও তিনি যথাশক্তি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ সংকট সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া লোকে আর কত দিন পরিশ্রম করিতে পারে! ছয় মাস পরেই তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন।

গিরিশের সঞ্চিত অর্থ ছিল না। মাসে মাসে যাহা উপার্জন করিতেন, তাহাই খরচ হইয়া যাইত। স্ত্রী ও কন্যাকে যে কয়খানি গহনা দিয়াছিলেন, সম্বলের মধ্যে কেবল তাহাই ছিল। শয্যাশায়ী হইয়া, নিরুপায় হইয়া, গিরিশ এখন সেই গহনাগুলি বেচিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

রোগ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। দিন দিন তিনি বিছানার সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। গিরিশ বুঝিলেন যে, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, আর অধিক বিলম্ব নাই। অবশিষ্ট যে অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশ টাকা হইল। গিরিশের এই শেষ সম্বল। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা কয়দিন? এ পঞ্চাশ টাকা ফুরাইলে তাহার পর কি হইবে? বৃদ্ধ ও রুগ্ন শ্বশুর ও বৃদ্ধা শাশুড়ীর দশা কি হইবে? সহায়সম্পত্তিহীনা কুলের কুলবধূ সরলার দশা কি হইবে? প্রাণাধিকা শিশু লীলার কি হইবে? আহা! সংসারের সে কিছুই জানে না। সদাই মনের আনন্দে সে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। হায়! দুই দিন পরে সে লীলার কি দশা ঘটিবে? ক্ষুধায় কাতর হইয়া দুইটি মুড়ির জন্য কি এক মুষ্টি ভাতের জন্য লীলা যখন কাঁদিবে,

তখন কে দুইটি মুড়ি কি এক মুষ্টি ভাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিবে? গিরিশ ভাবিয়া আকুল হইলেন, চারিদিক্ তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হে ভগবান্! তোমার মনে কি এই ছিল!

গিরিশ অনেক দিন ধরিয়া ফণ্ডে টাকা দিয়া আসিতেছেন। ফণ্ডের সহিত তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইলেই, তাঁহার স্ত্রী নগদ তিন হাজার ও মাসে দশ টাকা পাইবেন। তবে আর ভাবনা কি? সত্য বটে। কিন্তু এক ফণ্ডে মাসে তাঁহাকে তিন টাকা করিয়া দিতে হয়। শয্যাগত হইয়াও অতি কষ্টে তিনি তাহা দিয়া আসিতেছেন। এখন আর তিনি কি করিয়া দিবেন? তাহার পর অপর ফণ্ডে ছয় মাস অন্তর যে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিতে হয়, পাঁচ দিন পরে সেই পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে। এখন কোথা হইতে সে পঞ্চাশ টাকা তিনি দিবেন? নিয়মিত দিনে টাকা দিতে না পারিলে, নিরূপিত প্রাপ্য হইতে তাঁহার পরিবার বঞ্চিত হইবেন। এত দিন তিনি যে ফণ্ডে টাকা দিয়া আসিতেছেন, সে বৃথা হইবে; তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, স্ত্রী একটি পয়সাও পাইবে না। যে পঞ্চাশটি টাকা হাতে আছে, তাঁহার সেই শেষ সম্বল। তাহা যদি তিনি ফণ্ডে প্রদান করেন, তাহা হইলে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কি খাইয়া তিনি জীবিত থাকিবেন? অপর দিকে, ফণ্ডে সেই পঞ্চাশ টাকা না দিলে, দুই দিন পরে তাঁহার অনাথা স্ত্রী ও কন্যা একেবারে পথে দাঁড়াইবে। "হে জগদীশ্বর! এই পাঁচ দিনের ভিতর আমার মৃত্যু হয়, তবেই রক্ষা! তাহা না হইলে, হে ঈশ্বর! আমার অবর্তমানে এঅনাথা-দিগের কি দশা হইবে?"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া গিরিশ নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন।

নবম অধ্যায় : এ কে?

গিরিশের যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার পরম বন্ধু। দুই জনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। গিরিশ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ভাই! আমার শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্রটি তুমি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ। আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। ঠিক করিয়া বল দেখি, আর কত দিন আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে?"

গিরিশের বন্ধু তাঁহার বক্ষঃস্থল অতি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"ভাই! যখন তুমি আমাকে ঠিক সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছ, তখন আমাকে তাহা বলিতে হইবে। আমার উপর অসন্তুষ্ট হইও না। এ যাত্রা তুমি কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। তবে তিন মাসের ভিতর তোমার মৃত্যু হইবে না, ছয় মাসের অধিক তুমি কিছুতেই বাঁচিবে না। চারি পাঁচ মাস পরেই নিশ্চয় তোমাকে এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার বক্ষঃস্থলের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আমার এইরূপ অনুমান হইতেছে। কিন্তু একেলা আমার কথায় তোমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি আরও দুই জন ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইব। তাঁহারা কি বলেন, শুনিতে হইবে।"

গিরিশের বন্ধু আরও দুই জন ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইলেন। সকলেই একমত হইয়া বলিলেন যে, ছয় মাসের অধিক গিরিশ কিছুতেই জীবিত থাকিবে না।

গিরিশ বলিলেন,—"আমি ডাক্তার। আমার শরীরের ভিতর যাহা হইতেছে, তাহা আমি উত্তমরূপ জানি। এ রোগে বাঁচিবার আশা বড়ই প্রবল হয়। কিন্তু

আমি শিশু নই। শীঘ্রই যে আমাকে যাইতে হইবে, তাহা আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি। এক্ষণে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—পাঁচ দিনের ভিতর মৃত্যু হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—"কিছুতেই নয়। পাঁচ দিন কেন, তিন মাসের ভিতর কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

অন্য ডাক্তার দুই জন চলিয়া যাইলে, গিরিশ আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই ! তুমি আজ আমার নিমিত্ত যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহাতে কি কি আছে ?"

যে ঔষধ যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, গিরিশের বন্ধু তাহার নাম করিলেন।

গিরিশ বলিলেন,—"বারো দাগ ঔষধ দিয়াছ। আচ্ছা, কেহ যদি ভুলিয়া একেবারে বারো দাগ খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে কি হয় ।"

বন্ধু উত্তর করিলেন,—"কি হয়, তাহা কি তুমি জান না ? দুর্বল লোকের কথা দূরে থাকুক, সুস্থ সবল ব্যক্তিও মরিয়া যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া গিরিশ বলিলেন,—"তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সে দিন এইরূপে গত হইল। তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে গিরিশ বলিলেন,—"সরলা ! লীলা মা ! তোমরা দুই জনে আমার নিকট এস। সরলা, তুমি এক পাশে থাক, লীলা তুমি এক পাশে থাক। তোমরা দুই জনে আমার নিকটে থাকিলে আমি ভাল থাকি।"

গিরিশ খাটে শুইয়া আছেন। সরলা বাম পাশে বসিল, লীলা তাঁহার দক্ষিণ পাশে বসিল। বাম হাতে গিরিশ সরলার একটি হাত ধরিলেন। সন্ধ্যাকাল, অন্ধকার হইয়াছে। ঘরে প্রদীপ জ্বালিতে গিরিশ বারণ করিলেন। সরলা ও লীলার হাত ধরিয়া সেই অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে চক্ষু বুজিয়া গিরিশ শয়ন করিয়া রহিলেন। এই ভাবে আধ ঘণ্টা শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সহসা সেই ঘরে এক জন পুরুষ মানুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরলা চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সে পুরুষ মানুষ কে ?

দশম অধ্যায় : সেই চট

গিরিশ যে সময়ে সরলা ও লীলাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন, সেই সময়ে গোপী বাবুর বাটীতে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। গোপী বাবুর বৃদ্ধা মাতা যে ঘরে শয়ন করিতেন, সেই ঘরের দ্বার-জানালায় কিছু ফাঁক হইয়া গিয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাস, নূতন শীত পড়িয়াছে।

আহ্লাদী ঝিকে ডাকিয়া গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—"আহ্লাদি ! দ্বার-জানালার ফাঁক দিয়া রাত্রিতে ঘরে বড় হিম আসে। বুড়ো হাড় ! সমস্ত রাত্রি যেন কুকুরে চিবায়। গায়ের ব্যথায় সকালে উঠিতে পারি না। তুই এক কর্ম কর্। এই ছেঁড়া কাপড়খানা ছিঁড়িয়া নেকড়া কর্, আর সেই নেকড়া জানালার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজিয়া দে। তাহা করিলে রাত্রিতে ঘরে হিম আসিবে না।"

আহ্লাদী বলিল,—"ঠাকুর-মা ! সে দিন চোরকুঠরি ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটা ভাঙ্গা বাক্সর ভিতর কতকগুলা চট দেখিয়াছি। সেই চট দিয়া পর্দা করিলে হয় না ?"

গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—"চোর-কুঠরিতে চট কোথা হইতে আসিল ?"

আহ্লাদী বলিল,—"তা জানি না। একটা ভাঙ্গা বাক্স, ডালা নাই, তাহার ভিতর রহিয়াছে দেখিলাম।"

গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—"চল্ দেখি, দেখি! কি চট, কোথা হইতে আসিল, আর তাহাতে পর্দা হইবে কি না?"

ঝিকে সঙ্গে লইয়া গোপী বাবুর মাতা চোর কুঠরিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চোর-কুঠরির ভিতর সহজেই অন্ধকার, তাহাতে সন্ধ্যা হইয়াছে। আহ্লাদী গিয়া প্রদীপ আনিল। একটা কাঠের বাক্সে কতকগুলা ছেঁড়া চট রহিয়াছে, গোপী বাবুর মাতা তাহা দেখিতে পাইলেন।

গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—"ওরে! ও আহ্লাদী! এ সেই চট! তোর মনে পড়ে? যে দিন মোহর চুরি যায়, সেই দিন গিরিশের কাছ হইতে বাক্স-মোড়া চট আমি আনিয়াছিলাম। সেই চটগুলি আনিয়া আমি এই বাক্সটার ভিতর ফেলিয়াছিলাম। তাহার পর সেই মোহর লইয়া হাঙ্গামা-হুজ্জৎ, মকদ্দমা-মামলা! এ চটের কথা আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে আজ সাত আট বৎসরের কথা। এ চটগুলা দেখিয়া আমার প্রাণে যেন কেমন একটা আতঙ্ক হইতেছে।"

আহ্লাদী ঝি বলিল,—"হাঁ! ঠাকুর-মা! এ চটের কথা এখন আমার সব মনে পড়িতেছে। তাড়াতাড়ি আমরা দুই জনে আসিয়া এই বাক্সর ভিতর চটগুলা ফেলিয়া রাখিলাম। তাহার পর সেই হাঙ্গামা, সেই পুলিশের লোক। এখনও সে সব কথা মনে হইলে ভয় হয়। আহা! গিরিশ বাবু না কি মরমর হইয়াছেন!"

গোপী বাবুর মাতা উত্তর করিলেন,—"হাঁ! আমি শুনিয়াছি, ডাক্তারে জবাব দিয়াছে। ছুঁড়ীর দশা যে কি হইবে! এত দিন পরে এ চটে আর কি কোনও কাজ হইবে? পচিয়া হয় তো গোবর উঠিয়া গিয়াছে!"

একাদশ অধ্যায় : আবার সেই মোহর

গোপী বাবুর মাতা দুই হাতে অনেকগুলি চট ধরিয়া সেই বাক্স হইতে বাহির করিলেন। সেই চটের ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ একটি কঠিন বস্তু ভূতলে পতিত হইল, আর সেই সঙ্গে উজ্জ্বল নূতন পয়সার মত কি সব ঘরের চারিদিকে গড়াইয়া গেল।

আহ্লাদী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোপী বাবুর মাতা থপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, আর বলিলেন,—"আহ্লাদি! আমাকে বাতাস কর, আমার গা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে!"

একটু সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় বলিলেন,—"শীঘ্র গোপীকে ডাকিয়া আন্!"

আহ্লাদী তাড়াতাড়ি গোপী বাবুকে ডাকিয়া আনিল। মাতা বলিলেন,—"গোপী! এই দেখ, কি বাহির হইয়াছে!"

গোপী বাবু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, চটের সঙ্গে সেই সাবানের বাক্স দুই ভাগ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ও তাহার ভিতর হইতে মোহর সকল বাহির হইয়া ঘরের চারিদিকে গড়াইয়া গিয়াছে।

গোপী বাবু সাবানের বাক্সটি তুলিয়া লইলেন ও মোহর কুড়াইতে লাগিলেন। আহ্লাদী ঝিকেও কুড়াইতে বলিলেন।

আহ্লাদী বলিল,—"না, ও মোহরে আমি হাত দিব না, ও বড় অপয়া মোহর, যে ইহাতে হাত দিবে, তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।"

গোপী বাবু নিজেই সমস্ত মোহর কুড়াইয়া গণিয়া দেখিলেন যে,—ঠিক পঞ্চাশটি মোহর রহিয়াছে।

মাতা তখন বলিলেন,—"গোপী! আমি হতভাগীই তবে চোর! গিরিশের

মত হাতে হাতকাড় দিয়া আমাকে এখনি পুলিশের লোক ধরিয়া লইয়া যাইবে! আমাকে জেলখানায় পাঠাইয়া দিবে। পায়ে বেড়ি দিয়া আমাকে সেই জেলখানায় রাখিয়া দিবে। তারকেশ্বরের মোহান্তকে যেরূপ করিতে হইয়াছিল, আমাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। হাঁটু পর্য্যন্ত ইজের পরিয়া আমাকে ফুলগাছে জল দিতে হইবে, পাথর ভাঙ্গিতে হইবে, ঘানিগাছে সরিষা হইতে তেল বাহির করিতে হইবে। কালীঘাটে মোহান্তর পট কিনিয়াছিলাম, তাহাতে এই সব দেখিয়াছি। কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! এ বৃদ্ধ বয়সে আমি কি করিয়া ইজের পরিব? সে সব কাজ কি করিয়া করিব?"

গোপী বাবু বলিলেন, "না, মা! তোমার সে সব ভয় নাই।"

মাতা বলিলেন,—"পুলিশে যদি এ কথা জানিতে না পারে, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া ধরা দিব। আহা! আমার পাপের জন্য সে ব্রাহ্মণের ছেলের কত না লাঞ্ছনা হইয়াছে! শুনিতেছি, সে মর-মর হইয়াছে। আজ সাত বৎসরের কথা হইল বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে সে কখন সুখী হয় নাই। সেই অপমান সে কখনও ভুলিতে পারে নাই। সেই মনস্তাপে অবশেষে তাহার এই উৎকট রোগ হইয়াছে। আমার এই পাপের জন্য পুলিশে আমি নিজে গিয়া ধরা দিব। তার পর, না হয় গলায় দড়ি দিয়া, কি আফিম খাইয়া মরিব। কিন্তু ধর্ম্ম জানেন, আমি জানিয়া শুনিয়া এ কাজ করি নাই! তাড়াতাড়ি যখন চট সব গুটাইয়া লইলাম, সেই সঙ্গে বোধ হয়, এই কাল বাক্সটাও গুটাইয়া লইয়াছিলাম। যতক্ষণ দালানে ছিলাম, ততক্ষণ তক্তপোষের উপর বাক্স দেখিয়াছিলাম। বাক্স যে সেইখানেই ছিল, সে সময় নিশ্চয় তাহাই আমার মনে হইয়াছিল। তাই বলিয়াছিলাম যে, যখন আমি বাড়ীর ভিতর আসি, তখনও তক্তপোষের উপর বাক্স দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এ মিথ্যা কথার জন্য নরকেও আমার স্থান হইবে না। কিন্তু ভগবান্ জানেন, ধর্ম্ম জানেন যে, জানিয়া শুনিয়া আমি এ মিথ্যা কথা বলি নাই।"

আহ্লাদী বলিল,—"আমিও তো সেই কথা বলিয়াছিলাম। অত শত কে জানে বাপু! দালানে গিয়া তক্তপোষের উপর মোহরের বাক্স দেখিলাম! আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর আসিলাম। তুমি বাছা যে চটের সঙ্গে বাক্স গুটাইয়া আনিবে, আমি কি করিয়া জানিব? আমি ভাবিয়াছিলাম যে, বাক্স সেইখানেই রহিল, এই মনে করিয়া আমিও সেই কথা বলিয়াছিলাম। আমারও কত পাপ হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া আহ্লাদী কাঁদিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন, "গোপী! সেই সময়ে গিরিশের নামে নালিশ করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। তুমি আমার কথা শুন নাই। মাধব চক্রবর্ত্তীকে ছাড়াইয়া দিতে মানা করিয়াছিলাম। তুমি আমার কথা রাখ নাই। তাহার পর গিরিশের প্রতি শত্রুতা করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম। সে কথাও তুমি আমার রক্ষা কর নাই। বিনাদোষে সেই ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতি তুমি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছ। সেই পাপে একদিনে তোমার চাঁদের মত দুইটি ছেলে গিয়াছে। সেই পাপে আমার শ্বশুরের বংশ নির্ব্বংশ হইয়া গেল, এক গণ্ডূষ জল দিতে আর কেহ রহিল না!"

গোপী বাবু বলিলেন,—"আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, গিরিশ আমার মোহর চুরি করিয়াছে, তাই এ কাজ করিয়াছিলাম। আর মা, আমাকে ভর্ৎসনা করিও না। সেই সব কথা মনে করিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

মাতা বলিলেন,—"এখন তোমাকে একটি কথা বলি, শুন। নিশ্চয় ইহা মাতৃ-আজ্ঞা বলিয়া জানিও। যদি এবার আমার কথা না রক্ষা কর, তাহা হইলে

ভগবানকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় আমি গলায় দড়ি দিয়া, না হয় বিষ খাইয়া মরিব।"

গোপী বাবু বলিলেন,—"কি আজ্ঞা করিবে, মা, তা বল। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি তাহা করিব।"

মাতা বলিলেন,—"তুমি এই মুহূর্ত্তে গিরিশের নিকট যাও। তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর এই মোহরগুলি তাহাকে দিয়া এস। ও পাপ মোহরে আমাদের কাজ নাই।"

গোপী বাবু উত্তর করিলেন,—"তার আটক কি মা! আমি এখনি তাহাই করিব। এ পঞ্চাশটা মোহরের আর কতই মূল্য হইবে? ১২০০ টাকার অধিক নয়। এ ১২০০৲ টাকা দিলে আমরা দুঃখী হইয়া যাইব না।"

মাতা বলিলেন,—"তবে এখনি তাহাকে এ মোহরগুলি দিয়া এস, আর বিলম্ব করিও না।"

দ্বাদশ অধ্যায় : গোপী বাবুর দান

মোহরের বাক্সটি হাতে লইয়া গোপী বাবু বাটী হইতে বাহির হইলেন। গিরিশের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরলার মাতা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সরলার পিতা ঘরের ভিতর ছিলেন, তিনি তাঁহাকে দেখেন নাই। গোপী বাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া, গিরিশ যে ঘরে শুইয়া ছিলেন, বরাবর সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সামান্য বাড়ী, গিরিশের ঘর কোনটি অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। ঘরের ভিতর সহসা এক জন পুরুষ মানুষ দেখিয়া সরলা চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সরলার মাতা ঘরে প্রদীপ লইয়া আসিলেন।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, স্তব্ধ হইয়া, গোপী বাবু গিরিশের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মুদিত চক্ষে গিরিশ শুইয়া আছেন। কিন্তু আর সে গিরিশ নাই, সর্বশরীর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, হাত-পা কাঠির ন্যায় হইয়া গিয়াছে, বিছানার সহিত তিনি যেন মিশিয়া রহিয়াছেন। কেবল পূর্বের ভাব—মুখশ্রীর বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

গোপী বাবুর চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে,—"এই শোচনীয় দৃশ্যের এক মাত্র কারণ, আমি পাপিষ্ঠ নরাধম।"

গিরিশ চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া আছেন। পার্শ্বে পাঁচ বৎসরের সেই মেয়েটি নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে। শীঘ্রই কি বিষম সর্বনাশ ঘটিবে, সে পাঁচ বৎসরের বালিকা যেন তাহা বুঝিয়াছে। এ বয়সের অস্থিরতা ও চপলতা সেই জন্য যেন সে ভুলিয়া চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া আছে। গোপী বাবু মনে মনে ভাবিলেন,—"আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারের ফলে এই শিশুটি শীঘ্রই অনাথা হইবে। আমা অপেক্ষা নরাধম পৃথিবীতে আর নাই।"

বালিকাকালে সরলা পিতার সহিত গোপী বাবুর বাটীতে যাইত। সুতরাং গোপী বাবুকে সে বিলক্ষণ জানিত। এত শত্রুতার পর গোপী বাবুকে সহসা আজ তাঁহাদের গৃহে দেখিয়া সরলা বিস্মিত হইল। খাট হইতে নামিয়া সে ভূমিতে দাঁড়াইল। লীলা সভয়ে গোপী বাবুর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গোপী বাবু খাটের নিম্নে ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন; বসিয়া আস্তে আস্তে গিরিশের একটি হাত ধরিলেন। গিরিশ চক্ষু চাহিলেন।

গোপী বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"গিরিশ! গিরিশ! আমাকে ক্ষমা কর।"

ধীরে ধীরে গিরিশ উত্তর করিলেন,—"এ সময় কাহারও উপর আমার রাগ-দ্বেষ নাই। সকলকেই আমি ক্ষমা করিয়াছি।"

গোপী বাবু পুনরায় বলিলেন,—"গিরিশ, আমি অতি পাপিষ্ঠ; আমি অতি নরাধম। বিনাদোষে আমি তোমার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। তোমার এ রোগের কারণ আমি। ক্ষমার পাত্র আমি নই বটে, কিন্তু তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

গিরিশ বলিলেন,—"আপনাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাটী প্রত্যাগমন করুন। আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। আমি নিদ্রা যাইব।"

গোপী বাবু পুনরায় বলিলেন,—"তুমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ, আজ এই মাত্র তাহা আমরা জানিতে পারিলাম। জানিতে পারিয়াই তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়াছি। সেই মোহর আজ পুনরায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমার মা না দেখিয়া চটের সহিত গুটাইয়া মোহরের বাক্স বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছিলেন। বাটীর ভিতর চোর-কুঠরিতে একটা ভাংগা বাক্সে সেই চটের সহিত মোহরগুলি এত দিন পড়িয়া ছিল। আজ তাহা পুনরায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই দেখ, সেই সাবানের বাক্স, আর ইহার ভিতর সেই পঞ্চাশটি মোহর।"

গিরিশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"মোহর যে এক দিন না এক দিন পাইবেন, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, আজ সেই ঘটনা ঘটিল। সকলে আমাকে নিরপরাধ বলিয়া জানিল, এই কথা আমি যে শুনিয়া যাইতে পারিলাম, সে জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি।"

গোপী বাবু বলিলেন,—"যাইবে কেন গিরিশ? কোথায় যাইবে? যত টাকা আবশ্যক হয়, তাহা দিয়া তোমাকে আমি ভাল করিব।"

গিরিশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি নিজে ডাক্তার। আপনি সব জানেন। এক্ষণে আপনি বাটী গমন করুন, আমি আর কথা কহিতে পারি না।"

গোপী বাবু বলিলেন,—"আর কেবল একটি কথা বলি। তোমাকে আর অধিক কষ্ট দিব না। সেই কথাটি বলিয়াই আজ আমি বিদায় হই। পুনরায় কাল আসিয়া তোমার ভালরূপ চিকিৎসার আয়োজন করিব।"

গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা?"

গোপী বাবু বলিলেন,—"এই মোহরগুলি তোমাকে দিয়া যাইতে মাতা আজ্ঞা করিয়াছেন। এ মোহরগুলি আমি রাখিয়া যাই। এ মোহর এখন তোমার, এ আমার নয়।"

গিরিশের মুখ ঈষৎ রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত হইল। অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলিলেন,—"কি! ঐ মোহরগুলি আমি লইব। কখনই না!"

মোহর লইবার নিমিত্ত গোপী বাবু গিরিশকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কথা কহিতে গিরিশের অতিশয় কষ্ট হইতেছিল। এমন কি, এক্ষণে শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া-সম্পাদনেও তাঁহার ক্লেশ হইতেছিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিরিশ বলিলেন,—"মহাশয়! কথা কহিবার আর আমার শক্তি নাই। মিনতি করি, এ শেষ অবস্থায় আর আমাকে কষ্ট দিবেন না। আপনার মোহর কিছুতেই আমি লইব না। আপনার ইচ্ছা হয়, গরীব দুঃখীকে ইহা দান করিবেন। আমার স্ত্রী কি আমার কন্যা, কি আমার শ্বশুর-শাশুড়ি কেহ যেন এ মোহর স্পর্শ না করে, অনাহারে মৃত্যু হইলেও কেহ যেন আপনার নিকট

হইতে একটি পয়সাও গ্রহণ না করে। সরলা! লীলা! যদি অনাহারে তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও এ মোহর কি ইঁহার একটি পয়সা কখন স্পর্শ করিও না। সরলা! আমার এই অন্তিম দশায় তোমাকে আমি এই আজ্ঞা করিলাম। কখনও ভুলিও না।"

একটু নিঃশব্দে থাকিয়া, গোপী বাবুর মুখপানে চাহিয়া গিরিশ পুনরায় বলিলেন,—"মহাশয়! বিনা অপরাধে আমার প্রতি যাহা কিছু অত্যাচার হইয়াছে, সে সব আমি ক্ষমা করিলাম। কিন্তু মোহর লইতে আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, অথবা আমার স্ত্রী, অথবা আমার কন্যা, আমার অবর্ত্তমানে কেহ আপনার মোহর স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে বাটী প্রত্যাগমন করুন। এই আমার শেষ কথা। আর আমি কথা কহিতে পারি না।"

এই কথা বলিবার পর গিরিশের মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। সরলা তাড়াতাড়ি আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তাহার পর হাত যোড় করিয়া সে গোপী বাবুকে বলিল,—"মোহরের কথা, মহাশয় আর কখন মুখে আনিবেন না। প্রাণ গেলেও আপনার মোহর কখনই লইব না। আপনি বাটী প্রত্যাগমন করুন। আপনাকে দেখিলে ইঁহার মনে কষ্ট হয়। এ স্থানে আপনার আগমন না করাই ভাল ছিল।"

গোপী বাবুকে সরলা এক প্রকার বাটী হইতে দূর করিয়া দিল। নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া মোহরের বাক্স হাতে করিয়া, বিরস বদনে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : আর কেন ভাই!

সরলা ও লীলা পুনরায় গিরিশের দুই পার্শ্বে বসিল। গিরিশ পূর্ব্ববৎ তাহাদের হাত ধরিয়া রহিলেন। মোহর প্রদানের কথা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, গিরিশের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ঘন ঘন সবলে নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। সেই নিশ্বাসে কিরূপ এক প্রকার শব্দ হইতে লাগিল।

সরলা অতিশয় ভয় পাইল। তাড়াতাড়ি পিতাকে সে সেই ঘরে ডাকিয়া আনিল। লাঠি ধরিয়া মাধব চক্রবর্ত্তী অতি কষ্টে সেই ঘরে আসিলেন। ঘরে আসিয়া গিরিশের অবস্থা দেখিয়া তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,—"শীঘ্র যাও। গোপালকে শীঘ্র ডাক্তার আনিতে বল।"

গিরিশ চক্ষু চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—"না মহাশয়! ডাক্তার আনিতে হইবে না। শীঘ্রই আমি সুস্থ হইব।"

সরলার মাতা সে কথা শুনিলেন না। ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত তিনি গোপালকে বলিতে গেলেন। গোপাল এক জন প্রতিবাসী।

কিছুক্ষণ পরে গিরিশের বন্ধু সেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশের পার্শ্বে যাই তিনি খাটের উপর বসিয়াছেন আর তাঁহার পা লাগিয়া খাটের নীচে কি ঠন করিয়া পড়িয়া গেল। মস্তক অবনত করিয়া খাটের নীচ হইতে তিনি সেই বস্তুটি বাহির করিলেন। দেখিলেন যে, একটি শিশি, যে শিশিতে কল্য তিনি বারো দাগ ঔষধ দিয়াছিলেন। আজ দেখিলেন যে, শিশিটি সম্পূর্ণ খালি! গিরিশ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। ডাক্তার চক্ষু চাহিতে বলিলেন।

গিরিশ চক্ষু চাহিলেন না। চক্ষুর পাতা টানিয়া ডাক্তার দেখিলেন যে, চক্ষু দুইটি ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছে, তারা দুইটি সঙ্কুচিত হইয়াছে।

সরলা, লীলা, মাধব চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার স্ত্রীকে ডাক্তার সে ঘর হইতে যাইতে বলিলেন। তাহার পর একাকী পাইয়া, খালি শিশিটি দেখাইয়া, তিনি গিরিশকে বলিলেন,—"গিরিশ, ছি ভাই! এমন কাজও করিতে হয়?"

গিরিশ অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"কি করি ভাই! না করিলে নয়। দুই দিন আগে কি দুই দিন পরে—এই বই তো নয়! আর গোটা কত দিন অধিক বাঁচিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে পথের ভিখারিণী করিতে পারি না। করুণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিবেন, তিনি আমার বিচার করিবেন। কাহাকেও এ কথা বলিও না, ভাই।"

ডাক্তার বলিলেন,—"কাহাকেও বলি না বলি, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। যথারীতি তোমার চিকিৎসা আমি করিব। এখনি তোমাকে বমন করাইব, তাহার পর তাড়িত-যন্ত্র প্রয়োগ করিব।"

গিরিশ বলিলেন—"আর কেন ভাই! এ মৃত্যু সময়ে কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দাও?"

ডাক্তার বলিলেন,—"না ভাই! আমি কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। সে অনুরোধ করিও না, সে অনুরোধ আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিব না।"

গিরিশ বলিলেন,—"তবে যা জান তাই কর। কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু ভাই, আমার নিকট সত্য কর যে, এ কথা জনপ্রাণী কাহাকেও বলিবে না। ইহার ভিতর প্রতারণা কিছুই নাই। যে ফণ্ডে টাকা দিয়াছি, তাহাদের নিয়ম ভঙ্গ করি নাই। সে যাই হউক, এ কথা কাহাকেও বলিও না। তুমি আমার বালক-কালের বন্ধু, মরণকালে তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই।"

ডাক্তারের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গিরিশের নিকট তিনি সেইরূপ সত্যে আবদ্ধ হইলেন। তাহার পর সরলার মাতাকে একটু জল গরম করিতে বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি আনিতে সত্বর গমন করিলেন।

সরলা ও লীলা পূর্ব্ববৎ গিরিশের নিকট আসিয়া বসিল। শ্বশুর-শাশুড়িকে সে ঘরে আসিতে হাত নাড়িয়া গিরিশ নিষেধ করিলেন। সরলা ও লীলার হাত ধরিয়া গিরিশ পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ শেষ কথা

গিরিশের নিশ্বাস-প্রশ্বাস এতক্ষণ অতি সবলে পড়িতেছিল, অতি ব্যস্ত হইয়া তিনি যেন বায়ু আকর্ষণ করিতেছিলেন। ক্রমে নিশ্বাসের সে ভাব কমিয়া আসিল। সরলা মনে করিল যে, গিরিশ বুঝি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন ও তাঁহার বুঝি নিদ্রা আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরে গিরিশ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি সুন্দর!"

সরলা মস্তক অবনত করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল।

গিরিশ পুনরায় বলিলেন,—"রম্য দেশ! অতি সুন্দর! সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ঘোর হরিদ্‌বর্ণে আচ্ছাদিত প্রান্তর, অদূরে নানা বৃক্ষে সুশোভিত পর্ব্বতশ্রেণী। মাঝে নদী কুল-কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নদীতীরে প্রস্ফুটিত ফুলগুলির কি সুন্দর বর্ণ! কি অপূর্ব্ব সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে। ঐ শুন মধুর বাদ্য! না, ও বাদ্য নয়, মন্দ মন্দ বায়ুহিল্লোলে

আলোড়িত বৃক্ষ-পত্রের মর্মর শব্দ। কিন্তু কি মধুর শব্দ! ঐ যে, আমার মা, নদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছেন। ঐ যে, আমার পিতাও তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। আরও কত লোক রহিয়াছে। যাই মা যাই! এখনি যাইব। কিন্তু নদী পার হই কি করিয়া? কতকগুলা কাদায় যে আমাকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে! না, এ কাদা নয়, আমার শরীর। যাই হউক, এ শরীরে আর আমার কাজ নাই। এ ক্লেদরাশি আমাকে বড় ভারি রাখিয়াছে। এ ক্লেদরাশি হইতে একবার নিষ্কৃতি পাইলেই আমি বাঁচি। ছি ছি! পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁকের মত কি কদর্য্য বস্তু! আমাকে যেন জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। একবার এগুলা দূর করিয়া পরিষ্কৃত হইতে পারিলেই আমি ও-পারে উড়িয়া যাই। তখন সব সুখ, সব শান্তি! যাই মা, যাই! আর বিলম্ব নাই।"

সরলা মনে করিল,—গিরিশ প্রলাপ বকিতেছেন। গিরিশের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল।

ঈষৎ চক্ষু চাহিয়া ধীরে ধীরে গিরিশ পুনরায় বলিলেন,—"সরলা! তবে ভাই, যাই! লীলা, মা! তবে আমি যাই! ঐ দেখ, নদীতীরে আমার বাবা ও আমার মা দাঁড়াইয়া আছেন। অতি সুন্দর, অতি রম্য দেশ, সরলা! আমার পিতা-মাতার কি জ্যোতির্ময় শরীর হইয়াছে! ঐস্থানে যত লোক দেখিতেছি, সকলেরই ঐরূপ দেবশরীর। ঠিক যেন নির্মল, সুশীতল, সূর্য্যকিরণ দ্বারা গঠিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের জ্যোতি দ্বারা ঐ প্রদেশ আলোকিত হইয়াছে। তাঁহার বিমল জ্যোতি দ্বারা ঐ পরলোকবাসীদের, ঐ দেবতনুসম্পন্ন লোকদিগের দেহ ওতপ্রোতভাবে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। সামান্য জলকণা যেরূপ মহাসাগরবক্ষে ক্রীড়া করে, সেইরূপ পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, রোগ জরা শোক তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, প্রিয়জনকে সঙ্গে লইয়া, সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, ঐ দেবতনুবিশিষ্ট জীবগণ পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। আমার মা আমাকে ঐস্থানে ডাকিতেছেন। সরলা! আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। লীলা মা! তোমরা যখন আসিবে, তখন তোমাদের জন্যও আমি ঐ নদীতীরে দাঁড়াইয়া থাকিব। ঐস্থানে রোগ নাই, শোক নাই, কোন দুঃখ নাই। তোমরা দুই জনে আসিলে, তখন সকলে একসঙ্গে থাকিব। আর কখন ছাড়াছাড়ি হইবে না। সরলা! লীলা! তবে এখন আমি বিদায় হই।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গিরিশ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—"কিন্তু সরলা! কিন্তু লীলা! তোমাদের আমি গুটিকত কথা বলিয়া যাই। আমার এ শেষ কথা। আমার কথাগুলি কখন ভুলিবে না। লীলা এখন আমার এ সকল কথা বুঝিতে পারিবে না। লীলা বড় হইলে, সরলা তুমি তাহাকে আমার এই শেষ কথাগুলি বুঝাইয়া দিবে। সকল লোক ঐ পবিত্র স্থানে যাইতে পারে না। এই পৃথিবীতে আসিয়া যাহারা সত্য-পথ হইতে বিচলিত হয় না, যাহারা কাহারও অনিষ্ট করে না; যাহারা হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে কাহাকেও দর্শন করে না; যাহারা সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষকে কখন বিস্মৃত হয় না; যাহারা সর্বদা তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিয়া জগতের হিতসাধনে জীবন অতিবাহিত করে,—কেবল তাহারাই ঐ সুখের স্থানে গমন করিতে পারে, কেবল তাহারাই প্রিয়জনকে লইয়া ঐ স্থানে অনন্তকাল থাকিতে পায়। সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে বিস্মৃত হইয়া যাহারা অন্যরূপে জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের পরলোক অন্যরূপ। সেই স্থানে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে তাহারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। দেখিও সরলা! দেখিও লীলা! তোমরা যেন ঐ সুখের স্থান হইতে বঞ্চিত হইও না। দেখিও, যেন পুনরায় তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আজ

আমার পিতা-মাতা যেমন আমাকে আদর করিয়া ঐ পবিত্র জ্যোতির্ময় স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেন যথাকালে তোমাদিগকেও আমি সেইরূপ আদর করিয়া লইয়া যাইতে পারি। তবে সরলা ! তবে লীলা! এখন বিদায় হই।"

গিরিশ নীরব হইলেন। একান্ত মনে তিনি ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

সরলা এখন বুঝিতে পারিল যে, গিরিশের অধিক বিলম্ব নাই। নিঃশব্দে সরলা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পিতার অবস্থা ও মাতার কান্না দেখিয়া লীলা বিস্মিত মনে, মলিন বদনে, সজল নয়নে, একবার মায়ের মুখপানে, একবার বাপের মুখপানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গিরিশের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সরলা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। একবার সে পাখা বন্ধ করিল। চকিত হইয়া সে দেখিল যে, গিরিশের গায়ে যে চাদরখানি ছিল, বক্ষঃস্থলে এতক্ষণ যাহা উঠিতেছিল ও নামিতেছিল, তাহা আর নড়িতেছে না, চাদরখানি স্থির হইয়া গিয়াছে। শশব্যস্ত হইয়া সরলা গিরিশের নাকে হাত দিয়া দেখিল। সেই মুহূর্তে সরলা মূর্ছিত হইয়া খাটের উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইল। লীলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সরলার পিতা-মাতা সেই ঘরে দৌড়িয়া আসিলেন। সেই মুহূর্তে ডাক্তারও পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার দেখিলেন যে, গিরিশ চির-দিনের নিমিত্ত ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভয়ানক আংটি

প্রথম পরিচ্ছেদ : হারাধনের স্বপ্ন

কলিকাতার নিকট হাবড়া। হাবড়ার নিকট রাজীবপুর। রাজীবপুরের পরাণ বাঁড়ুয্যের বাড়ী। পরাণ বাঁড়ুয্যের এক মাত্র পুত্র,—তাহার নাম হারাধন। হারাধন কলেজে পড়েন, ছোকরা বয়স,—নিতান্ত ছোকরা নয়, উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবা।

রাত্রি হইয়াছে। শয্যায় শয়ন করিয়া হারাধন আরব্য উপন্যাস পাঠ করিতেছেন। কমর-উল-জমানের গল্প, যে গল্পে পরীতে এক দেশের রাজকন্যা আনিয়া অন্য দেশের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিল। হারাধন এক মনে এক ধ্যানে সেই গল্প পড়িতেছিলেন।

নিদ্রায় হারাধনের চক্ষু জড়িয়া যাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হারাধন পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। পাশ ফিরিয়া হারাধন মনে মনে বলিলেন,—"আমার ঐরূপ হয়! পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে পরমাসুন্দরী কন্যা, জিন কি পরীতে আনিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহ দেয়!"

কন্যাটির কি প্রকার রূপ হইবে, তাহার মুখ, চক্ষু, কি প্রকার হইবে, হারাধন সেই বিষয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে একখানি চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। চিত্রই বা কি করিয়া বলি? সৌদামিনীসদৃশ অপূর্ব প্রভারাশিসম্পন্ন, অলৌকিক রূপলাবণ্যে গঠিত, সহাস্য-বদনা দ্বাদশবর্ষীয়া এক কন্যাকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গীয় রূপরাশি দর্শনে বিমোহিত হইয়া হারাধন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নিদ্রায়ও হারাধন অর্ধপ্রস্ফুটিত-মনোহর-পুষ্প-মুকুলসদৃশ সৌন্দর্য্যময়ীকে দর্শন করিলেন। হারাধন স্বপ্ন দেখিলেন যে,—সেই কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত তাহার পিতা স্বয়ম্বর সভা করিয়াছেন। নানা দেশ হইতে রাজগণ আগমন করিয়া সভায় ঘটের মত সারি সারি বসিয়া আছেন। মাল্য-চন্দনপূর্ণ পাত্র হস্তে কন্যা বাহির হইল। অর্জুনের সম্মোহন বাণে প্রপীড়িত কৌরবরথিগণের ন্যায় রাজগণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ঘোর চীৎকারে মালা প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা আপন আপন গলা বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। হারাধন সভার এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কন্যা অন্য কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া, হারাধনের নিকটে আসিয়া, তাঁহারই গলায় মাল্য প্রদান করিল। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ন্যায় রাজগণ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া তাঁহারা হারাধনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। হারাধন যুদ্ধ করিলেন না, তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। মুষলমুখবিশিষ্ট কদাকার এক রাজা আসিয়া সবলে তাঁহার কান মলিয়া দিল। সেই কান-মলার চোটে হারাধনের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল।

সমুদয় অলীক স্বপ্ন-কথা। সমুদয় মিথ্যা। তা বটে। কিন্তু হারাধনের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কন্যার মুখখানি তাঁহার মনে আরও গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। হারাধন পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। এরূপ কন্যা নিশ্চয় কোন স্থানে আছে, ও তাহার সহিত নিশ্চয় আমার পরিণয় হইবে; হারাধনের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। "সেই বালিকা ভিন্ন

অন্য কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না"—হারাধন মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এই প্রতিজ্ঞায় হারাধন দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি এম, এ, পাশ করিলেন। তাঁহার পিতা সংগতিপন্ন লোক। চারিদিক হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু বিবাহ করিতে হারাধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যে বালিকার কমলনয়ন দুইটি রাত্রি-দিন তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল, একান্ত মনে তাহার ধ্যানেই তিনি নিমগ্ন রহিলেন।

এক বৎসর গত হইয়া গেল, দুই বৎসর গেল, তিন বৎসর গেল, তথাপি সে সোনার প্রতিমার সহিত হারাধনের সাক্ষাৎ হইল না। পথে-ঘাটে সকল স্থানেই, সকল সময়েই তিনি সেই বালিকার অনুসন্ধান করেন। এক স্থানে কতকগুলি লোক দেখিলেই সতৃষ্ণ নয়নে তিনি তাহাদের মুখপানে চাহিয়া থাকেন। মনে করেন—এইবার বুঝি আমি তাহার দর্শন পাইব। কিন্তু বৃথা আশা! স্বপ্নদৃষ্ট বালিকার সহিত এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। হারাধন কিন্তু নিরাশ হইলেন না। এক দিন-না-নিশ্চয় তাহাকে আমি পাইব,—বরং এই আশা তাঁহার মনে দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা

সে বৎসর প্লেগের ভয়ে যখন কলিকাতা হইতে লোক পলায়ন করিতেছিল, তখন এক দিন জন কয়েক আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে হারাধন হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। ষ্টেশন জনাকীর্ণ, বড় ভিড়। এক এক গাড়ীতে দ্বিগুণ তিনগুণ আরোহী। অতি কষ্টে আত্মীয়দিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া হারাধন দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রথমে গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, তাহার পর বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। গাড়ী চলিতে চলিতে পশ্চাৎ দিকের একখানি তৃতীয় শ্রেণী হারাধনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হারাধন দেখিলেন যে, এই গাড়ীখানির দ্বার ধরিয়া এক চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষের বালিকা বাহিরে ঝুলিতেছে। তাহার অভিভাবকগণ সকলেই গাড়ীতে উঠিয়াছেন, বালিকা একেলা কেবল উঠিতে পারিতেছে না। গাড়ীর ভিতর হইতে এক জন লোক, বোধ হয় পিতা, প্রাণপণে বালিকার হাত ধরিয়া টানিতেছেন। কিন্তু গাড়ীতে তিল রাখিবার স্থান নাই, কিছুতেই তিনি তাহাকে গাড়ীর ভিতর লইতে পারিতেছেন না।

ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া বালিকা গাড়ীর দ্বারে ঝুলিতে লাগিল। আর একটু এই অবস্থায় থাকিলেই সে রেলের নিম্নে পড়িয়া কাটা যাইবে। ঈশ্বরের কৃপায় এই মুহূর্তে সেই গাড়ীখানি হারাধনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহির হইতে বালিকাকে ধরিয়া হারাধন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিলেন। দ্বার খোলা ছিল। একবার সুযোগ পাইয়া বলপূর্বক গাড়ীর ভিতর তিনি বালিকাকে ঠেলিয়া দিলেন। বালিকার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

এতক্ষণ বালিকার পশ্চাৎ দিক হারাধনের দিকে ছিল, তিনি তাহার মুখ দেখিতে পান নাই। সে আসন্ন বিপৎ-কালে কিছু দেখিবার কি ভাবিবার অবকাশও ছিল না। বালিকা যখন গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, তখন নিমিষের নিমিত্ত হারাধন তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলেন। সেই বিকশিত পঙ্কজ মুখ, সেই মৃগ-নয়ন, সেই বিম্বাধর, সেই কৃষ্ণধনুসম ভ্রূযুগল, ফল কথা স্বপ্ন-দৃষ্ট সেই বালিকাকে আজ চকিতের ন্যায় দেখিয়া হারাধন স্তম্ভিত হইলেন। শরীর তাঁহার

রোমাঞ্চিত ও অবশ হইয়া আসিল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল।

বালিকা কে, কাহার কন্যা, বাড়ী কোথায়? তাহার তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। জানিবার আর উপায়ও নাই। তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া একবার যদি সেই হৃদয়নিধি তিনি হাতে পাইলেন, আর সেই মুহূর্তেই বিধি তাহা কাড়িয়া লইলেন! এরূপ বাদ-সাধা বিধাতার কি উচিত? মনের খেদে হারাধনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তবে সেই নিমেষকালের মধ্যে হারাধন একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বালিকার সিঁথিতে সিন্দুর ছিল না, সুতরাং তাহার বিবাহ হয় নাই। আর সেই ভিড়েও—সেই গোলযোগেও —"গেল রে, বামুনের মেয়েটা গেল রে!" এইরূপ একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন। এই দুই বিষয় স্মরণ করিয়া হারাধনের মনে কথঞ্চিৎ আশা জন্মিল। তিনি মনে করিলেন যে, বিধাতা যখন আমার স্বপ্নটি এতদূর সত্য করিলেন, তখন তাহার শেষ ভাগটাও তিনি সত্য করিবেন। এই বালিকার সহিত নিশ্চয় আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে, নিশ্চয় ইহার সহিত আমার পরিণয় হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : খড়্গধারী বীর

এতক্ষণ হারাধন এক প্রকার চেতনাশূন্য হইয়াছিলেন। যখন পুনরায় তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, তখন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন। হাতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দক্ষিণ হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে এক অঙ্গুরী দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বালিকা যখন রেলের দ্বার ধরিয়া গাড়ীর বাহিরে ঝুলিতেছিল, তখন তাহার বাম হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে তিনি এই অঙ্গুরী ক্ষণকালের নিমিত্ত দেখিয়াছিলেন। "তাহার হাত হইতে আমার হাতে আংটী কি করিয়া আসিল? গোলেমালে তাহার বাম হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি হইতে আসিয়া ঠিক আমার দক্ষিণ হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে আসিয়া পড়া সম্ভব নহে! তাহার পর, বালিকার অঙ্গুলি অপেক্ষা আমার অঙ্গুলি অনেক স্থূল। তাহার অঙ্গুরী ঠিক আমার হাতে কি করিয়া হইল? প্রথম তো অভাবনীয়, এক বালিকাকে নিদ্রাবস্থায় দর্শন করা,—সে এক আশ্চর্য্য কথা। তাহার পর সেই স্বপ্নের বালিকাকে শরীরী-অবস্থায় দর্শন করা,—সে এক আশ্চর্য্য কথা। অবশেষে তাহার হাতের আংটী আমার হাতে উড়িয়া আসা,—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? সত্য-সত্য কি এই ব্যাপার কোন দেব, দানব, ভূত, প্রেত, অথবা জিন পরী দ্বারা সংঘটিত হইতেছে?"

হারাধন এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর "গুর-গুর" করিতে লাগিল। তাঁহার মনে আতঙ্ক হইল। আংটীর প্রতি তিনি সাবধানে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন, তাহা সোনার নহে, রূপার নহে, তামার নহে, পারদের নহে, অষ্ট ধাতুর নহে, কোন প্রকার জ্ঞাত পরিচিত দ্রব্য দ্বারা সে আংটী গঠিত নহে। সে অপূর্ব অলৌকিক আংটী। হারাধন আংটীর প্রতি আরও সাবধানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। আশ্চর্য্য! শুভ্রবর্ণের সামান্য সেই রেখা-প্রায় আংটীর ভিতর এক জন ভীষণ কৃষ্ণকায় বীর অবিরত তলোয়ার ঘুরাইতেছে, এইরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন। ভয়-বিহ্বল হইয়া হাত হইতে আংটী খুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। হারাধনের মন নিতান্ত উতলা হইয়া উঠিল। যত মনে করেন, এখন আর

আমি আংটীর দিকে চাহিয়া দেখিব না, ততই মন সেই দিকে ধাবিত হয়, ঘুরিয়া ফিরিয়া চক্ষু সেই আংটীর দিকে গিয়া পড়ে। আংটীর দিকে চক্ষু পড়িলেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হারাধন পাগলের ন্যায় হইলেন। "হাত হইতে আংটী না খুলিলে, হয় পাগল হইয়া যাইব, না হয় মরিয়া যাইব," তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হইল।

গাড়ী করিয়া দ্রুতবেগে হারাধন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটী আসিয়া প্রথমে অঙ্গুলিতে তৈল মর্দ্দন করিয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে চেষ্টা করিলেন। অঙ্গুরী কিছুতেই বাহির হইল না। তাহার পর সাবানের জল দিয়া চেষ্টা করিলেন। অঙ্গুরী একটুও সরিল না, বরং টানাটানিতে অঙ্গুলি ফুলিয়া আংটী আরও গভীর ভাবে বসিয়া গেল। সুতরাং মানসিক ভয় ব্যতীত এখন শারীরিক যন্ত্রণাও উপস্থিত হইল। "সহসা এ কি বিপদে পড়িলাম! এমন বিপদে কেহ তো কখন পড়ে না।" হারাধন এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইল। বালিকার মধুর মুখখানি সর্বদাই তিনি মানস-চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন। অন্য চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইল না, সর্বদাই কেবল সেই বালিকার চিন্তা। এ চিন্তায় আনন্দ ছিল বটে, কিন্তু অন্য দিকে আংটীর চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। আংটীর প্রতি যখনই চাহিয়া দেখেন, তখনই সেই খড়্গধারী বীরকে তাহার ভিতর দর্শন করেন। "হায়, আমার এ কি হইল! যাহাকে তিন বৎসর এক মনে ধ্যান করিতেছিলাম, আজ তাহার দর্শন পাইয়া কোথায় আনন্দসাগরে ভাসমান হইব, না আমি ভৌতিক অঙ্গুরীয়ের জ্বালায় অস্থির হইলাম!"

ভয়ে ও চিন্তায় সে রাত্রিতে হারাধনের কিছুমাত্র নিদ্রা হইল না। বিছানায় পড়িয়া তিনি ছট্-ফট্ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি প্রথমে স্বর্ণকারের বাটীতে গমন করিলেন। স্বর্ণকার চিম্‌টা, হাতুড়ী ও নানাবিধ যন্ত্র দিয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে উকা দিয়া কাটিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু উকা ঘর্ষণে আংটীর গায়ে বিন্দুমাত্র দাগও পড়িল না। এ আংটীর তুলনায় হীরক বরং কোমল, স্বর্ণকারের এইরূপ বোধ হইল। আংটী খুলিয়া কি কাটিয়া ফেলিতে কর্ম্মকারগণও বিধিমত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে হারাধন রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের নিকট গমন করিলেন। নানা প্রকার অম্ল প্রয়োগ করিয়া তাঁহারাও সে আংটী গলাইতে পারিলেন না। আংটী যে কি ধাতু দিয়া গঠিত, তাহাও কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে,—"আমরা আলিউমিনম, প্লাটিনম প্রভৃতি যত প্রকার নূতন ধাতু বাহির হইয়াছে, সে সব দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ধাতু আর কখন দেখি নাই। সামান্য আংটীর ভিতরে কৃষ্ণবর্ণের তলোয়ার-ধারী বীরও কখন দেখি নাই।"

ফল কথা, হারাধনের হাত হইতে কিছুতেই আংটী বাহির হইল না; আংটীর জ্বালায় হারাধন ঘোর বিপদে পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নূতন বীর

কিছু দিন পরে আংটীর ভিতর হইতে খড়্গধারী পুরুষের অন্তর্ধান হইল। মাঝে নানা মূর্ত্তি আংটীর ভিতর উদয় হইয়াছিল। এক একটি মূর্ত্তির ভাব

দেখিলে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে; সর্বশরীর শিহরিয়া যায়। অবশেষে ইহার ভিতর আর একটি আশ্চর্য্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল; এই মূর্ত্তির কতকগুলা মুখ, কতকগুলা হাত, আর ছাগলের মত ঠ্যাং। ইহার নাম আংটী-বীর! বিকটাকার আংটী-বীর মনের আনন্দে আংটীর ভিতর নৃত্য করিতেছিল। তাহার নৃত্য দেখিয়া হারাধনের মূর্চ্ছা হইল। সেই সময় হইতে মৃগীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার তিনি মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। ফল কথা, মনের মত পত্নী লাভের আশা এখন দূরে গেল, হারাধন সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইলেন।

হারাধনের পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন ঘোর উদ্বিগ্ন হইলেন। ডাক্তার, বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোজা আনিয়া ঝাড়ান-কাড়ান করাইলেন, ভূত নামাইলেন, দেবতাস্থানে হত্যা দিলেন, হাতে গলায় কোমরে কবচ ও মাদুলি পরাইলেন, গণৎকারের বাড়ী গিয়া জানিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; হাত হইতে আংটী খসিল না। বহুমুণ্ডধারী ছাগ-পদযুক্ত আংটী-বীরও আংটীর ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইল না। হারাধনের মূর্চ্ছা দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। হারাধন কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িলেন তাহার প্রাণসংশয় হইল। তাঁহার প্রাণের আশা সকলে ছাড়িয়া দিল।

নিরুপায় হইয়া, সকলে অবশেষে হারাধনের অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিবার পরামর্শ করিলেন। অঙ্গুলিটির মূলচ্ছেদ ব্যতীত আংটী কিছুতেই বাহির হইবে না। আংটী বাহির না হইলে হারাধন বাঁচিবেন না। সুতরাং ইংরেজ ডাক্তার আনিয়া আঙুল কাটানই স্থির হইল। অজ্ঞান করিয়া আঙুল কাটা হইবে, সেই ভয়ে হারাধন ঘোর ভীত হইলেন। সন্ধ্যার পর হারাধন শয়ন করিলেন। কিন্তু হায়! আঙুল আর কাটিতে হইল না। সেই রাত্রিতে হারাধনের যে মূর্চ্ছা হইল, সে মূর্চ্ছা আর কিছুতেই ভাঙ্গিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া গেল; হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনা হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন যে, হারাধন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হারাধনের পিতা-মাতার আজ ঘোর সর্বনাশ হইল। সংসার তাঁহাদের আজ শ্মশানভূমি হইল। পিতা ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন; মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া, মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিলেন বটে যে, হারাধনের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু জীবিত শরীরের ন্যায় তাঁহার দেহে এখনও উত্তাপ ছিল। ডাক্তার বলিলেন,—"কোন কোন মৃতদেহে এইরূপ উত্তাপ থাকে।" এই কথা বলিয়া ভিজিট লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শ্মশানভূমি

সেই রাত্রিতেই হারাধনের দেহ শ্মশানভূমিতে নীত হইল। চিতা সজ্জিত হইল, চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। কিন্তু আগুন কিছুতেই ধরিল না। তিনবার সকলে চেষ্টা করিলেন। তিনবার আগুন নিবিয়া গেল। হারাধনের দেহ শীতলও হইল না। তাঁহাকে লইয়া যাঁহারা শ্মশানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন লোকের মনে ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এক জন বলিলেন,—"দেখ ভাই! ছোকরা রোগে মরিল না, কোথা হইতে এক আংটী আসিয়া ইহার প্রাণবধ করিল। তাহার পর চিতায় আগুন ধরিল না; মৃতদেহ যেরূপ শীতল হয়, সেরূপ শীতল হইল না। আর একটি আশ্চর্য্য বিষয়

দেখ, ছোকরার মুখশ্রী কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই, ঠিক যেন নিদ্রা যাইতেছে! এ সব ভৌতিক ব্যাপার। চল ভাই! আপনার আপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন করি।"

এই বলিয়া কেহ কেহ পলাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু সেই দলে দুই তিন জন সাহসী পুরুষ ছিলেন। কাহাকেও তাঁহারা পলায়ন করিতে দিলেন না। ভালরূপ উদ্যোগ করিয়া পুনরায় তাঁহারা চিতায় অগ্নিপ্রদান করিলেন। এইবার চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চিতার অধোদেশে হুহু শব্দে অগ্নি শিখা উত্থিত হইল। সকলেই বুঝিল যে, এইবার সেই সুকুমার যুবার কোমল দেহ অল্পক্ষণের মধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

• কিন্তু এ সময় আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। এই সময়, সেই রাত্রিকালে, সেই শ্মশানে, কোথা হইতে এক কামিনী আসিয়া সহসা উপস্থিত হইল। যৌবন প্রস্ফুটিত প্রায়; পঞ্চদশবর্ষীয়া পরমা রূপবতী কামিনী সহসা সেই শ্মশানভূমিতে আসিয়া আবির্ভূতা হইল। তাহার রূপের ছটায় সেই অন্ধকার নিশি যেন আলোকিত করিল। ব্যগ্রভাবে কামিনী পাগলিনীর ন্যায় হাত তুলিয়া কি যেন বলিল।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহ বা ঘোর ভয়ে ভীত হইলেন, কেহ বা স্তম্ভিত হইলেন; কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। হাত যোড় করিয়া এক জন বলিলেন,—"মা! তুমি কে তা বল? কি জন্য এ ঘোর নিশিতে এ শ্মশানভূমিতে তোমার আগমন হইয়াছে?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিমলা

যে কন্যাকে হারাধন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত তাঁহার হাবড়া ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাঁহার হাত হইতে আংটী আসিয়া হারাধনের অঙ্গুলিতে লাগিয়া গিয়াছিল,—সেই কন্যার নাম বিমলা। তাঁহার পিতার নাম রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, নিবাস শ্রীরামপুরের নিকট একখানি গ্রামে। কন্যার বিবাহে ইঁহাদের অনেক টাকা খরচ হয়। কিন্তু রমানাথ দরিদ্র। কন্যাদায়ে রমানাথ বিপন্ন হইলেন। কেবল বিমলা নয়, তাঁহার আর একটি ছোট কন্যা ছিল, তাহার নাম কমলা। অনেক কষ্টে রমানাথ একস্থানে বিমলার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন, কিন্তু কি কারণে সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বিমলা দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল; যৌবন অঙ্কুরিত হইল। পিতার ঘোর দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। কিছু দিন পরে আর এক স্থানে সম্বন্ধ স্থির হইল; কিন্তু দৈবক্রমে তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। পুনরায় তৃতীয় স্থানে স্থির হইল; সব ঠিক ঠাক; বিবাহের দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বদিন ভাবী জামাতা বিসূচিকা রোগে হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বিমলা-বিষয়ে একটি দুর্নাম রটিল। "ঐ যে অপূর্ব্ব অলৌকিক রূপ, উহা ভাল লক্ষণ নহে, বিধবা হইবার লক্ষণ। গৃহস্থ ঘরে এত রূপ কেন?" ফল কথা, "বিমলা বড় অপয়া মেয়ে" চারি দিকে এইরূপ জনরব উঠিল। সেই দিন হইতে পিতা আর কোন স্থানে তাহার বিবাহ স্থির করিতে পারিলেন না। সেই অপয়া কন্যার সহিত কেহই আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইল না।

এই সময় বিমলাদের বাড়ী কোথা হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন। বিমলার পিতা দুঃখী হইলেও সাধুসঙ্গ ভাল বাসিতেন; যথাসাধ্য সাধুসন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা করিতেন। সপরিবার শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, তিনি সেই সন্ন্যাসীর সেবা করিলেন। অপরাহ্ণে, বিমলার মাতা কন্যার হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর

সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন,—"বাবা, আমার এ কন্যাটির কি কখনও বিবাহ হইবে না ?"

সন্ন্যাসী, বিমলার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিলেন,—"তোমার এ কন্যাটির ভাল ঘরেই বিবাহ হইবে, তবে ফুল ফুটিতে এখনও বিলম্ব আছে। যে ঘরে বিবাহ হইবে, সে ঘরে তোমাদের কন্যা সহজে পড়ে না। সর্বস্ব বেচিয়া দিলেও সে সুপাত্র কিছুতেই তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি এই অঙ্গুরীটি তোমার কন্যাকে দিলাম। বাম হস্তে সে ইহা ধারণ করিবে। ইহার ভিতর আংটীবীর আছেন। সেই আংটী-বীরের প্রসাদে ও তাঁহার তাড়নায় তোমার কন্যা সেই সুপাত্র লাভ করিবেন!" আংটী প্রদান করিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

যে দিন বিমলা আংটী ধারণ করিল, সেই দিন হারাধনের মুখশ্রী চিন্তাপথে উদিত হইয়া, তাহার মানসপটে অঙ্কিত হইল। সেই রাত্রিতে সে হারাধনকে পুনরায় স্বপ্নজগতে দর্শন করিল। বিমলা স্বপ্নে দেখিল যে, তাহার বিবাহের নিমিত্ত পিতা স্বয়ম্বরসভা আহ্বান করিয়াছেন। রাজগণ ঘটের মত সারি সারি বসিয়া আছেন। মাল্যচন্দন লইয়া যখন সে বাহির হইল, তখন "আমাকে দাও, আমাকে দাও," বলিয়া একটা চীৎকার পড়িয়া গেল। এক পার্শ্বে মলিন বদনে মানসকল্পিত সেই ব্রাহ্মণযুবক বসিয়াছিলেন। বিমলা তাঁহার গলায় মাল্য প্রদান করিল। ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইল। সেই কোলাহলে বিমলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বলা বাহুল্য যে, ঠিক সেই রাত্রিতে হারাধনও মানস-ক্ষেত্রে বিমলাকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন ও ঠিক সেই রাত্রিতে তিনিও ঐরূপ স্বয়ম্বরের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আংটী-বীর এইরূপে ঘটকালী করিলেন।

বিমলা সেই বরের প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতে লাগিল। বাটীতে কোন অপরিচিত লোক আসিলেই সে এক মনে তাঁহার কথাবার্তা শ্রবণ করিত। মনে করিত, যাঁহাকে আমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি, এইবার বুঝি তিনি আসিয়াছেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিত না। দেখিতে দেখিতে, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর কাটিয়া গেল। কন্যা বয়ঃস্থা হইল বটে, কিন্তু সে নিমিত্ত পিতা মাতা উদ্বিগ্ন হইলেন না। কুলীনের ঘরে এরূপ হয়, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কন্যার বর যে আপনি আসিয়া জুটিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কনিষ্ঠা কন্যা কমলার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন যে, বিমলার বর আসিলেই এক সঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ দিব।

গত বৎসর প্লেগের হিড়িক হইবার পূর্বে, বিমলার পিতা সপরিবারে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিবার সময় ষ্টেশনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। হারাধন বিমলাকে গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া দিলেন। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বিমলা একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। "কে আমার প্রাণরক্ষা করিল," তাহা দেখিবার নিমিত্ত সেই মুহূর্ত্তে একবার সে ষ্টেশনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নিমেষ কালের নিমিত্ত দুই জনের চারি চক্ষু এক হইল। কিন্তু গাড়ী তখন বেগে চলিতেছিল। নিমিষের মধ্যে গাড়ী দূরে গিয়া পড়িল। বিমলা আর হারাধনকে দেখিতে পাইল না। বাটী ফিরিয়া গিয়া সেই রাত্রিতে বিমলা প্রথম মুখ ফুটিয়া ছোট ভগিনীকে বলিল,—"কমলা! সন্ন্যাসী যে দিন আংটী দিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে আমি এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে আরও কতবার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। সন্ন্যাসী যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, সে তিনি। আজ তাঁহাকে আমি

হাবড়া ষ্টেশনে দেখিয়াছিলাম। গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া দিয়া তিনিই আমার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছেন। আর দেখিতেছি, আমার হাতে সে আংটী নাই। আংটী আমার আঙ্গুলে এত কসা হইয়া গিয়াছিল যে, আপনা-আপনি খুলিয়া পড়া সম্ভব নহে। সন্ন্যাসীর বরে শীঘ্রই বোধ হয়, কোন একটা ঘটনা ঘটিবে।"

কমলা সেই কথা মাতাকে বলিল। সন্ন্যাসীর বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, এই মনে করিয়া পিতামাতা সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : আরসী

এ দিকে হারাধন আংটীর জ্বালায় অস্থির হইলেন, ওদিকে বিমলা ঘন ঘন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিল। বিমলার চিত্ত সাতিশয় চঞ্চল হইল। শীঘ্রই কিছু একটা ঘটিবে, এই চিন্তা রাত্রি-দিন তাহার মনে জাগিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে আরসীখানি সম্মুখে রাখিয়া বিমলা চুল বাঁধিতেছিল। সহসা আরসীর ভিতর সে নিজের মুখ না দেখিয়া হারাধনের মুখ দেখিতে পাইল। চমকিত হইয়া পশ্চাৎ দিকে ও আশে-পাশে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই। বিস্মিতা হইয়া পুনরায় আরসীর দিকে সে চাহিয়া দেখিল; তাহার ভিতর পুনরায় হারাধনের মুখ দেখিতে পাইল। পূর্বে যেরূপ স্বপ্নে দেখিয়াছিল, ষ্টেশনে শরীরী অবস্থায় তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিল, এখন সেরূপ নয়। তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে, মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, ভয়ে ও চিন্তায় তাঁহার মুখখানি যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিমলা আবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সে ঘরে অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পুনরায় সে আরসীর দিকে চাহিয়া দেখিল। এবার দেখিল যে ঘোর সর্বনাশ ঘটিয়াছে। হারাধনের দেহ বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে, পিতা-মাতা মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, পাড়া-প্রতিবাসী আসিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছেন। ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিমলা আরসী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, পুনরায় তাহার দৃষ্টি আরসীর উপর আপনি-আপনি পড়িল। এবার আরও ভীষণ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হইল। এবার সে দেখিল যে, ঘোর অন্ধকার রজনী, নিকটে গঙ্গা কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিতা হইতেছেন, চারি দিকে ছিন্ন বস্ত্র, শূন্য কলস, কৃষ্ণবর্ণের কয়লা, শুভ্র-বর্ণের নরমুণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। ভীষণ শ্মশান-ভূমি! হারাধনের দেহ শুভ্র-বর্ণের বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। চিতা সজ্জিত হইতেছে। ভয়ে বিমলা চক্ষু মুদিত করিল; মন তাহার কাতর হইল, বুক ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। "হে সন্ন্যাসী! হে বাবা! অবশেষে তুমি এ কি করিলে?" এই বলিয়া চক্ষু বুজিয়া বিমলা কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষু বুজিয়া অধিকক্ষণ সে থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে পুনর্বার আরসীর দিকে চাহিয়া দেখিল। অশ্রুজলে নয়ন দুইটি ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রথম সে কিছুই দেখিতে পাইল না। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় সে আরসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এবার তাহার ভিতর বহুমুণ্ডধারী, বহুহস্তসম্পন্ন, ছাগপদবিশিষ্ট, দানবাকৃতি এক মূর্ত্তি সে দর্শন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পুনর্জ্জীবন

বাহিরে যে বস্তু থাকে, আরসীতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে। সম্মুখে বসিয়া বিমলা চুল বাঁধিতেছিল, আরসীতে তাহারই ছায়া পড়িবার কথা। তা না হইয়া আরসীর ভিতর নূতন নূতন দৃশ্য আপনা-আপনি আবির্ভূত হইতে লাগিল। প্রথম হারাধন, তাহার পর শ্মশান, তাহার পর আংটী-বীর; বিমলা যতবার আরসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, ততবার নূতন নূতন বিষয় সে দেখিতে পাইল। বিমলা আরসীর ভিতর আংটী-বীরকে দেখিল। আংটী-বীর হাত তুলিয়া তাহাকে যেন বলিল,—"যাও, যাও! শীঘ্র যাও!"

এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিমলার আর কিছুমাত্র জ্ঞান-চৈতন্য রহিল না। এখন হইতে সে আর আত্মবশে রহিল না। এখন হইতে সে কি করিল, সে কথা কিছুই সে জানে না। পরে অনেকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছিল। সে বলে যে,—"আরসীর ভিতর আমি আংটী-বীরকে দেখিলাম। দেখিয়া, আমি বড় ভয় পাইলাম। কিন্তু আংটী-বীর অতি ব্যস্তভাবে হাত তুলিয়া—'যাও, যাও, শীঘ্র যাও!" আমাকে এইরূপ আদেশ করিলেন। তাঁহার কথার শব্দ আমি শুনি নাই, তবে তাঁহার মুখের ভাবে আমি বুঝিলাম যে, তিনি আমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন। তাহার পর কি হইল, আমি কোথায় যাইলাম, কি করিলাম, সে বিষয় আমি কিছুমাত্র জানি না, আমার কিছুমাত্র মনে নাই।"

আংটী-বীরের আদেশ পাইয়া বিমলা এলোথেলো বেশে পাগলিনীর প্রায় হইয়া দাঁড়াইল। চুল বাঁধিবার সাজ-সজ্জা ও আরসী সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রুদ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে সে বাড়ী হইতে বাহির হইল। ঘটনাচক্রে কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না। নিশি-ভূতে মানুষকে রাত্রিকালে ঘর হইতে বাহির করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় যেরূপ নানাস্থানে লইয়া যায়, বিমলাকে লইয়া আংটী-বীরও সেইরূপ করিল। অজ্ঞাত অপরিচিত পথে বিমলা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। অজ্ঞান অবস্থায় পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া অবশেষে ঘোর রাত্রে সেই অপরিচিত শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া সে উপস্থিত হইল। চিতায় যখন সবে মাত্র আগুন ধরিয়াছে, চিতার অধোদেশ হইতে যখন অগ্নিশিখা উঠিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিমলা আসিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইল। নিতান্ত উতলা হইয়া, হাত তুলিয়া, বিমলা বলিল,—"রও! অগ্নি শীঘ্র নির্বাণ কর।"

সেই ঘোর নিশীথে সেই শ্মশানভূমিতে, সহসা চিতার পার্শ্বে এক রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া, সকলেই ভয়ে ভীত হইলেন। কিন্তু পলাইতে কাহারও সাহস হইল না। এক জন হাত যোড় করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তুমি কে, তা বল।"

নিতান্ত উতলা হইয়া বিমলা বলিল,—"শীঘ্র অগ্নি নির্বাণ কর। চিতা হইতে শীঘ্র ইঁহাকে বাহির কর। ইনি মরেন নাই, ইনি জীবিত আছেন।" এই কথা বলিয়া বিমলা নিজে চিতা হইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন আর সকলেও তাড়াতাড়ি অগ্নি নির্বাণ করিয়া ফেলিলেন ও হারাধনের দেহ ভিতর হইতে বাহির করিয়া মাটিতে শায়িত করিলেন। ভাগ্যে অগ্নি তখনও চিতার উপর দিকে যায় নাই। নতুবা হারাধনের দেহ নিশ্চিত কিছু না কিছু পুড়িয়া যাইত। যাহা হউক, হারাধনের দেহে অগ্নি স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই।

বিমলা ধীরে ধীরে হারাধনের নিকট গিয়া বসিল, ধীরে ধীরে তাঁহার অঙ্গগুলি

হইতে আংটি খুলিয়া লইল। যে অঙ্গুরীয় স্বর্ণকার, কর্মকার প্রভৃতি কত লোক কত টানাটানি করিয়াও খুলিতে পারে নাই, আজ বিমলা একটু ছুঁইবামাত্র সেই আংটি খুশ্ করিয়া খুলিয়া আসিল। কিন্তু সেই সময় হইতে আংটি যে কোথায় গেল, তাহার কিছু ঠিক নাই। তখন হইতে সে আংটি আর কেহ দেখে নাই।

বিমলা যেই আংটি খুলিয়া লইল, আর সেই মুহূর্তে হারাধন একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইল। একবার তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু পুনরায় তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন। তাঁহার জ্ঞান কিন্তু এখনও হইল না। "হারাধন! হারাধন!" করিয়া সকলে উচৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন না। যাহা হউক, সকলে এখন বুঝিতে পারিলেন যে, হারাধন পুনরায় জীবনলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে মুহূর্তে বিমলা হারাধনের অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইল, সেই মুহূর্তে আংটি তাহার হাত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, আর সেই মুহূর্তে বিমলাও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মুখে হাতে জল দিয়া সকলে তাহার চেতনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিমলার কিছুতেই জ্ঞান হইল না। হারাধন ও বিমলা দুই জনেই অচেতন হইয়া পাশাপাশি সেই শ্মশান-ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কেহ কখনও গল্পেও শ্রবণ করে নাই, চক্ষে দেখা তো দূরের কথা! সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। কোথা হইতে সে রাত্রিতে সে পরমা সুন্দরী কামিনী আসিয়া এরূপ কাণ্ড করিল, কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহাও কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

অবশেষে দুই জনকেই তাঁহারা খাটিয়া করিয়া হারাধনের বাটী লইয়া গেলেন। তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনা লইয়া ঘোর কোলাহল পড়িয়া গেল। পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, হারাধনের পিতা-মাতা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তখনও হারাধনের জ্ঞান হয় নাই, তখনও ভয়ের কারণ বিলক্ষণ ছিল। পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদের আহ্লাদ হইল না।

তৎক্ষণাৎ বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া হারাধনের পিতা দুই জনের বিধিমত চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন, হারাধন ও বিমলার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। দুই জনেই নিদারুণ জ্বর-বিকার দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। অজ্ঞান অবস্থায় দুই জনেই প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। সেই প্রলাপের দুই একটা কথা শুনিয়া, হারাধন ও বিমলার স্বপ্ন-দর্শন প্রভৃতি অদ্ভুত কাহিনীর কতকটা আভাস সকলে পাইলেন। তবে প্রকৃত ঘটনা যে, কি ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। বিমলা যে কে, তাহাও কেহ জানিতে পারিলেন না। তখন সে সকল ভাবনা ভাবিবারও সময় ছিল না। দুই জনেরই পীড়া অতি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল; অনেক সময় তাঁহাদের জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বয়সের বলে হউক, অথবা চিকিৎসার গুণেই হউক, দুই জনেই সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তবে এক-বিংশতি দিন পর্য্যন্ত দুই জনেই অচৈতন্যভাবে শয্যাগত হইয়া রহিলেন। বাইশ দিনের দিন দুই জনেরই এক সঙ্গে জ্ঞান হইল।

নবম পরিচ্ছেদ : ফলশ্রুতি

বিমলার জ্ঞান হইলে, সকলে তাহার পরিচয় পাইলেন। হারাধনের পিতা তৎক্ষণাৎ তাহার পিতাকে পত্র লিখিলেন। বিমলার পিতা কন্যার অনুসন্ধান করিতে আর বাকী রাখেন নাই। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি-দিন তাহাকে খুঁজিতে ছিলেন। মাতা ও ভগিনী কমলা, দিবারাত্র তাহার নিমিত্ত কাঁদিতেছিলেন। বিমলার সংবাদ পইয়া তৎক্ষণাৎ তিন জনেই হারাধনের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিমলার পিতার সহিত হারাধনের পিতার ও বিমলার মাতার সহিত হারাধনের মাতার সাতিশয় সদ্ভাব ও প্রণয় হইল।

বিমলা ও হারাধন ক্রমে সুস্থ ও সবল হইলেন। বিমলা ও হারাধনের গল্প আদ্যোপান্ত ক্রমে সকলেই শুনিলেন। আংটি-বীরের কথা লইয়া অনেক স্থানে অনেকরূপ বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, সে দেবতা, কেহ বলিলেন সে ভূত; কিন্তু হাঁদাই মোল্লা বলিলেন যে, সে দেবতাও নয়, সে ভূতও নয়, সে এক জাতীয় ইফ্রিট। মাখনতোষ, অর্থাৎ ম্যাকিন্টশ নামে এক জন ইংরেজের কানে এ কথা উঠিলে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আংটি-বীর এক প্রকার জীব, পিরিনি-পর্বতে একবার এইরূপ জীবের কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল।

যাহা হউক, বিমলার রূপ, গুণ ও নম্র প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। হারাধনের তো কথাই নাই। যে রত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে বসিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়া তিনি যে অপার সুখসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সে আর বিচিত্র কি? বিমলার মনের ভাবও সেইরূপ। স্বপ্নে সে স্বইচ্ছায় হারাধনকে বরণ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রকৃত অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া সে আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করিল। এই সময় হারাধনের এক ধনবান্ বন্ধু কমলার রূপে মুগ্ধ হইলেন। দুই ভগিনীর এক দিনে বিবাহ হইবে, তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। মনের সুখে, স্নেহের ভরে, যখন দুই ভগিনী গলা-জড়াজড়ি করিয়া কথাবার্তা কহিত, তখন এই পাপময় সংসারে এক অপূর্ব শোভার আবির্ভাব হইত।

শুভ দিনে, শুভক্ষণে, শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। বিমলার পিতার অধিক খরচ হইল না, অথচ এক দিনে তিনি দুইটি কন্যার দায় হইতে মুক্ত হইলেন। মনের মত দুইটি জামাতা পাইয়া বিমলা ও কমলার মাতা পরম সুখে তাঁহাদিগকে বরণ করিলেন। বিমলা ও কমলার শরীরে যেখানে যাহা ধরিল, বহুমূল্য অলঙ্কারে সমুদয় শরীর বিভূষিত হইল। তাহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না। পরম সুখে তাহারা দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

মুণ্ড মহাশয়! আমি শুনিয়াছি যে, এই গল্পটির বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। কারণ, ইহা সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ভৌতিক গল্প। ইহা পাঠ করিলে কি শ্রবণ করিলে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; অবিবাহিত যুবকগণ রূপবতী ও গুণবতী পত্নীলাভ করেন; অবিবাহিতা কন্যাগণ মনের মত পতি পাইয়া, নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া কাজ করা সাটিনের জ্যাকেট পরিয়া, গরবে গরবিণী হইয়া, ঠুঁটোর মত বসিয়া নাটক-নবেল পড়িয়া কালযাপন করিতে থাকেন।

মুণ্ড মহাশয়! ইহা হইতে আর একটি উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়। লোকের মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ দাহ করা উচিত নহে। শ্বাসরোধ ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য

বন্ধ হইলেই যে, লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। হারাধনের মত কখন কখন লোক মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। পরে তাহাদিগের পুনরায় চেতনা হয়। দেহের কঠিনতা ও পচনচিহ্নের আরম্ভ, এই দুইটি মৃত্যুর নিশ্চিত লক্ষণ। আমাদের দেশে দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। হারাধনের মত ঘটনা ঘটিলে তাহা আর ধরিবার উপায় থাকে না। ভ্রমক্রমে কখন কখন মৃতবৎ জীবন্ত মানুষকে যে ভূমিসাৎ করা হয়, বিলাতের লোক তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন। সে স্থানে তবু এক দিন দুই দিন পরে কবর দিবার রীতি প্রচলিত আছে। আমাদের এ উষ্ণপ্রধান দেশ। এ স্থানে তত বিলম্ব করিতে পারা যায় না। কিন্তু দ্বাদশ দণ্ড অপেক্ষা করিয়া সৎকার করিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না।

কেন এত নিদয় হইলে ?

প্রথম অধ্যায় : নটবর দাস

নটবর দাস জাতিতে কায়স্থ, নিবাস কলিকাতা, সৌখিন যুবক, বয়স বাইশ বৎসর। প্রায় এক বৎসর হইল নটবরের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। পুনরায় বিবাহ করিবেন, দুই তিন স্থানে কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন, এখনও মনের মত স্ত্রীরত্ন লাভ হয় নাই।

নটবর ভাবিলেন যে, পুনরায় সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার পূর্বে একটু আমোদ করিয়া বেড়াই। ফিট্‌ফাট্‌ পোষাক পরিয়া তাই তিনি খড়দহে ফুলদোল দেখিতে গেলেন। রাত্রি দুইটার সময় নিদ্রার ঘোরে তাঁহার চক্ষু দুইটি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সেই সঙ্গে ফুলদোলে তাঁহার অরুচি জন্মিল। কলিকাতা প্রত্যাগমনের মানসে তিনি স্টেশনে আসিলেন। গাড়ীতে তিল রাখিবার স্থান নাই, নটবর উঠিতে পারিলেন না।

নটবর মনে করিলেন,—"পাঁচ ক্রোশ পথ বই তো নয়! এমন পূর্ণিমার রাত্রি, এমন দক্ষিণ বায়ু! হাঁটিয়া যাই।"

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বড় রাস্তা ধরিলেন। কিন্তু পথ-চলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রায় চারিটার সময় বামদিকে একটি প্রশস্ত পথ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে, এই রাস্তা দমদমা স্টেশনে গিয়াছে। বাকি পথটুকু রেলগাড়ীতে যাইবেন, এইরূপ মানস করিয়া সেই বামদিকের পথ ধরিলেন।

কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়াও নটবর দমদমার স্টেশন পাইলেন না। পথ ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিল। কেবল বন ও বাগান। জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ নাই। নটবর বড় বিপদে পড়িলেন। আর পা উঠে না। নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া এক গাছতলায় তিনি বসিয়া পড়িলেন।

গাছতলায় বসিয়া আছেন, এমন সময় দূর হইতে আগত সুমধুর নারী-কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কে যেন অতি সুমধুরস্বরে গান গাহিতেছে। গীতের কথাগুলি এইরূপ—

কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।

এই পর্য্যন্ত নটবর শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই ভয়ানক এক হৃদয়ভেদী চীৎকার হইল। অমানুষিক চীৎকার। সেই নির্জন স্থানে নটবর একাকী। প্রাণে তাঁহার ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে তিনি পলায়ন করিলেন। পুনরায় অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া স্টেশন পাইলেন। প্রাতঃকালে কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কলিকাতা আসিলেন বটে; কিন্তু নটবরের মনে সেই গীত, সেই অমানুষিক শব্দ, সর্বদাই জাগিতে লাগিল। "কেন এত নিদয় হইলে," এই কথাগুলি যেন

তাঁহার জপমন্ত্র হইল। কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন হইতে সে কথাগুলি কিছুতেই তিনি দূর করিতে পারিলেন না। নটবরকে যেন পাগল করিয়া তুলিল।

নটবর ভাবিলেন যে,—"কাহার সে গীত। কাহার চীৎকার, তদন্ত করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। তা না করিলে আমি পাগল হইয়া যাইব।"

এইরূপ মনে করিয়া, নটবর তাহার পরদিন শিয়ালদহে গাড়ীতে উঠিয়া দমদমা গমন করিলেন। দমদমা স্টেশনে নামিয়া সেই স্থানটার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু হতাশ হইলেন না। মাঝে মাঝে সর্বদাই তিনি এই স্থানে আসিতে লাগিলেন। সেই নারীকণ্ঠস্বর পুনরায় শুনিবার প্রতীক্ষায় দিবাকালে ও রাত্রিকালে সর্বদাই তিনি এই অঞ্চলে পথে পথে ঘুরিতে লাগিতেন।

পুনরায় পূর্ণিমা আসিল। সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নটবর এই স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই প্রহর হইল। নটবর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। নিকটে দুইটি বাগান-বাড়ী দেখিতে পাইলেন। একটিতে বড় একখানি দোতালা বাড়ী, অপরটিতে ছোট একখানি একতলা অট্টালিকা আছে। দুই বাগানের মাঝখানে একটি মতিঝিল আছে, ঝিলের উপর এক স্থানে একটি পুল বা সাঁকো আছে। এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইবার পথ ঐ পুলের উপর দিয়া গিয়াছে। দুইটি বাড়ীই খালি পড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হইল। একটু বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত নটবর ছোট বাগানটিতে প্রবেশ করিলেন। চাদরখানি মাথায় দিয়া তাহার বারেণ্ডায় শুইয়া পড়িলেন।

বারেণ্ডা হইতে কিছু দূরে বাগানের সীমায় ইষ্টক-নির্মিত একটি নিম্ন প্রাচীর ছিল। নটবর দেখিলেন যে, বাহির হইতে প্রাচীরের উপর মুখ বাড়াইয়া কে একজন উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। বাগানের বাহিরে সেই সময় গাড়ীর গড় গড় শব্দ হইল। গাড়ীখানি বাগান হইতে কিছু দূরে থামিল। অল্পক্ষণ পরেই নটবর দেখিলেন যে, বাগানের ফটক পার হইয়া ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বৎসরের এক বালিকা দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছে।

ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া নটবর বারেণ্ডায় চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। বালিকা হন্ হন্ শব্দে আসিয়া একটি অশোক বৃক্ষের নিকট দাঁড়াইল। তাহার পর বাতাসাপূর্ণ একখানি সরা সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া হাত যোড় করিয়া মনে মনে কি বলিতে লাগিল। যে লোকটা বাহির হইতে উঁকি মারিতেছিল, সেই সময় সে এক লম্ফে প্রাচীর পার হইয়া বালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বল শাণিত একখানি ছোরা বাহির করিয়া বালিকাকে সে বলিল,—"যদি চীৎকার কর কি একটি কথা কও, তাহা হইলে এখনি তোমাকে কাটিয়া ফেলিব। শীঘ্র হাতের বালা দুইগাছি খুলিয়া দাও।"

বালিকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শাণিত ছোরা দেখাইয়া লোকটা আরও ভয় দেখাইতে লাগিল। নটবর আর থাকিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ও আপনার ছড়ির দ্বারা লোকটার হাতে নিদারুণ প্রহার করিলেন। তাহার হাত হইতে ছোরা দূরে গিয়া পড়িল। সহসা সেই স্থানে অন্য একজন পুরুষ দেখিয়া লোকটা নিমিষের নিমিত্ত চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর ছোরাখানি কুড়াইয়া এক লম্ফে প্রাচীর পার হইয়া পলায়ন করিল।

ভয়ে বালিকা কাঁপিতেছিল। হাত ধরিয়া নটবর তাহাকে বারেণ্ডার ধারে আনিয়া বসাইলেন। আশ্বাস প্রদান পূর্বক নটবর তাহাকে বলিলেন,—"তোমার আর কোন ভয় নাই। আমি চোর নই, আমি ভদ্রলোক। কি জন্য তুমি এই গভীর রাত্রিতে এই নির্জন স্থানে একাকী আসিয়াছিলে?"

বালিকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না। কতক সাধ্য সাধনা করিয়া, কতক ভয় প্রদর্শন করিয়া, আস্তে আস্তে পশ্চাৎ লিখিত বিবরণটি নটবর সেই বালিকার মুখ হইতে বাহির করিলেন।—

"বালিকার বাড়ী কলিকাতা, পিতার নাম পীতাম্বর বসু। পিতা ব্রহ্মদেশে কর্ম করেন। কর্ম ছাড়িয়া পিতা দেশে আসিতে পারেন নাই, সে জন্যও বটে, টাকার অভাবের জন্যও বটে, বালিকার আজ পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ দিতে পারেন নাই। সম্প্রতি তিনি দেশে আসিয়াছেন। বালিকার মাতা জীবিত নাই। এক ভগিনী ছিলেন। বালিকা ভগিনীপতির বাটীতে সেই ভগিনীর নিকট থাকিতেন। আজ দেড় বৎসর সেই ভগিনী মারা পড়িয়াছেন। বালিকা বলিল যে, সে ভগিনীপতি অতি মন্দ লোক। কিন্তু পিতা তাহার সহিত বিবাহ স্থির করিয়াছেন। বালিকা এখন পিসীর নিকট থাকে। যাহাতে এই ভগিনীপতির সহিত বিবাহ না হয়, পিসী চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু পিতা সে কথা শুনিতেছেন না। মাঝের-গাঁ নামক কোন স্থান হইতে সম্প্রতি তাঁহাদের বাটীতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। তাহার মাথায় একটি ভূত অধিষ্ঠান হয়। পিসীর চেষ্টায় সেই স্ত্রীলোক তাহার ভূতকে আহ্বান করে। ভূত আসিয়া বলিল যে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় একাকী আসিয়া বালিকা যদি এই স্থানে সিন্নি প্রদান করে, তাহা হইলে ভগিনীপতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে, ভাল বর আপনি আসিয়া যাইবে। সেই জন্য সে আজ সিন্নি দিতে আসিয়াছিল। চাকর ও পিসী সঙ্গে আছেন। কিছু দূরে গাড়ী থামাইয়া তাঁহারা সেই গাড়ীতে বসিয়া আছেন।

বালিকার রূপ দেখিয়া ও সুমিষ্ট কথা শুনিয়া নটবরের মন মজিয়া গেল। নটবর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি ইহাকে পাই, তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব, না পাইলে এ প্রাণ বিসর্জন দিব।

আরও সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় ফটকের ধারে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল,—"স্বর্ণ, স্বর্ণ! এখনও হয় নাই?"

"পিসী-মা ডাকিতেছেন," এই কথা বলিয়া বালিকা দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, নটবর কিছুক্ষণের নিমিত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে বলিয়া উঠিলেন,—"ঐ যা! বালিকার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি!"

নটবর দৌড়িয়া বাগান হইতে বাহির হইলেন। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। দ্রুতবেগে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। কিন্তু অবিলম্বে শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। গাড়ী চলিয়া গেল।

বালিকার পিতার নাম নটবরের মনে ছিল—পীতাম্বর বসু। কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতায় অনেক সন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল অনুসন্ধান বিফল হইল। পীতাম্বর বসুকে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নর-মুণ্ড

বিশেষরূপে তদন্ত করিবার নিমিত্ত এক দিন নটবর সেই বাগানে আগমন করিলেন। এক জন উড়িয়া মালীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মালী বাগান খুঁড়িতেছিল। নটবর তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা কোদালি হাতে করিয়া মালী চুপ করিয়া দাঁড়াইল। একান্ত মনে কান পাতিয়া কি যেন সে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আপনার মনে সে বিড় বিড় করিয়া বলিল :—

"কেন এত নিদয় হইলে ?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।"

ঘোরতর বিস্মিত হইয়া নটবর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ও কি বলিতেছ ?"

চমকিত ও রাগত হইয়া মালী উত্তর করিল,—"আমি যা বলি না কেন, তোমার সে কথায় কাজ কি ?"

মালীর নিকট হইতে নটবর সে বালিকারও কোন সন্ধান পাইলেন না। নটবর ভাবিলেন,—"এই মালীর মুখে সেই গীত আজ আমি পুনরায় শুনিলাম। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আমাকে বাহির করিতে হইবে। কিছু দিনের নিমিত্ত এই বাটী ভাড়া লইয়া আমি এ স্থানে বাস করিব। দেখি কি হয়!"

এইরূপ স্থির করিয়া নটবর মালীকে উদ্যানস্বামীর নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবগত হইলেন যে, এই দুইখানি বাগান গোকুল বাবুর। গোকুল বাবুর বাটীতে গিয়া নটবর ছোট বাড়ীখানি ভাড়া লইতে চাহিলেন। গোকুল বাবু বলিলেন যে, ও বাড়ীর অখ্যাতি আছে, সকলে বলে যে, ও বাড়ীতে ভূত আছে। আমার পুত্রবধূ সম্প্রতি ঐ বাটীতে মারা পড়িয়াছেন।

নটবর সে কথায় ভয় পাইলেন না। পুনরায় অতিশয় আগ্রহ সহকারে বাড়ীটি প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে বিনা ভাড়ায় সে বাটীতে বাস করিতে গোকুল বাবু তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় নটবর বিছানা-পত্র লইয়া ও এক জন চাকর সঙ্গে করিয়া সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীখানিতে চারিটি ঘর ছিল। একটি ঘরে তালা বন্ধ ছিল। তাহাতে গৃহ-স্বামীর টেবেল, চৌকি, খাট প্রভৃতি দ্রব্যাদি ছিল।

আর একটি প্রশস্ত ঘরের মেজেতে নটবর আপনার বিছানা করিলেন। চাকরকেও এক পার্শ্বে তাহার বিছানা করিতে বলিলেন। নিদ্রা হইল না। রাত্রি দুই প্রহর হইল। অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ করিয়া নটবর বাহিরে বারেণ্ডায় আসিয়া শয়ন করিলেন। পদতলে বসিয়া চাকর তাঁহার পা টিপিতে লাগিল।

সহসা চাকর বলিয়া উঠিল,—"ও কাহারা ? মহাশয় ! দেখুন, দেখুন, ও কি ?"

তাড়াতাড়ি নটবর উঠিয়া বসিলেন। অশোক বৃক্ষের উত্তর দিকে আস্তাবল অথবা মালীর ঘরের মত একটু স্থান ছিল। নটবর দেখিলেন যে, তাহার নিকট কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আবৃত দুইটি মানুষ একসঙ্গে বেড়াইতেছে, আর আস্তাবলের ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোক উঁকি মারিতেছে। বৃক্ষের ছায়ায় সে স্থানটি অন্ধকারে আবৃত ছিল, নটবর ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কৃষ্ণকায় সেই দুইটি মনুষ্যের চক্ষু হইতে গন্ধকের অগ্নির ন্যায় নীলবর্ণের অল্প অল্প অগ্নি-শিখা বাহির হইতেছিল। সেই আলোকে নটবর মানুষ তিনটিকে দেখিতে পাইলেন। আস্তাবল হইতে যে স্ত্রীলোকটি উঁকি মারিতেছিল, সে ঠিক যেন সেই বালিকার মত, যে বালিকার সহিত সে দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অন্ততঃ নটবরের মনে প্রথম তাহাই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে বিশ্বাস দূর হইল। কৃষ্ণকায় দুই ব্যক্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, জীবিত মানুষের মত তাহাদের মুখ নয়। মুখে মাংস কি চর্ম কিছুমাত্র নাই, কেবল অস্থি, শ্মশানঘাটে যেরূপ নরমুণ্ড পড়িয়া থাকে, অনেকটা সেইরূপ, কিন্তু অতি ভয়ানক। তাহার পর তাহাদিগের চক্ষুকোটর হইতে যে নীলবর্ণের অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল, তাহাও অতি ভয়ানক।

রহিলেন। সেই ঘরের এক পার্শ্বে তাঁহার ভগিনী শয়ন করিল। ঘরে ছোট একটি ইংরেজী বাজনা ছিল, আস্তে আস্তে সেই বাজনা টিপিয়া মা-লক্ষ্মী গুন্ গুন্ শব্দে এই গীতটি গাহিতে লাগিলেন—

'কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে!'

এইটুকু গাহিয়াই মা-লক্ষ্মী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যেরূপ চীৎকার কাল রাত্রিতে আপনি শুনিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর হইতে একটি পুরুষ মানুষ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। সে লোক কখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। কিন্তু যখন সে বাহির হইয়া যায়, জ্যোৎস্নার আলোকে তাহাকে আমি তখন চিনিতে পারিলাম। চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখিলাম যে, মা বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার গলার আধখানি কে কাটিয়া দিয়াছে, ঘর রক্তগঙ্গা হইয়াছে। মা তখনও জীবিত আছেন। ভগিনীকে ও আমাকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন,—"আমার কপালে যাহা ছিল, তাহা ঘটিল। তোমরা দুই জনে আমার নিকট সত্য কর যে, আমাকে কে মারিয়াছে, সে কথা তোমরা প্রকাশ করিবে না।" এত কাকুতি-মিনতি করিয়া মা আমাদিগকে বলিলেন যে, আমরা থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার পায়ে হাত দিয়া দুই জনেই আমরা সত্য করিলাম। এখনও মা মাঝে মাঝে আমার সম্মুখে আসিয়া সেই সত্য পালন করিতে আদেশ করেন। তাই! তাহা না হইলে, কোন্ কালে বেটাকে মারিয়া আমি ফাঁসি যাইতাম।"

নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর?"

মালী বলিল,—"তাহার পর আর বড় কিছু নয়। গোকুল বাবুর অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল। মা-লক্ষ্মী আপনার গলায় আপনি ছুরি দিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণ হইল। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেন নাই। আপনার যদি সাহস হয়, তাহা হইলে পূর্ণিমার রাত্রিতে পুনরায় আসিবেন। সে দিন আরও কিছু দেখিতে পাইবেন। কোন ভয় নাই, মা-লক্ষ্মীকে আবার ভয় কি? ঐ দুইটা পাষণ্ড ভূতকেই যা ভয়।"

তৃতীয় অধ্যায় : মতি ঝিল

পূর্ণিমার রাত্রিতে পুনরায় আসিতে নটবর প্রতিশ্রুত হইলেন। পূর্ণিমা আসিল। সন্ধ্যাবেলা নটবর সেই বাগানে আসিয়া দেখিলেন যে, মালী তখন সে স্থানে নাই। অন্য একটি বাগানে আর কয়েক জন উৎকলবাসীর সহিত তাহার বাসা। তাহার অনুসন্ধানে নটবর সেই স্থানে গমন করিলেন। মালীকে দেখিয়া নটবর বলিলেন,—"ভূতের বাড়ীর নিকট যে বড় বাড়িটী আছে, তাহাতে দেখিলাম আলো জ্বলিতেছে। সে বাড়ীতে কেহ আসিয়াছে?"

মালী বলিল,—"হাঁ। গোকুল বাবুর বেহাই, সেই মা-লক্ষ্মীর পিতা, দুই চারি দিনের নিমিত্ত সপরিবারে ঐ বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী নাই, কেবল এক কন্যা; আমার মা-লক্ষ্মীর সেই ভগিনী। আর কে কে আসিয়াছে, তাহা

জানি না। গোকুল বাবুর পুত্র, সেই হতভাগা নবীনকেও আজ ঐ বাড়ীতে দেখিয়াছি।"

রাত্রি যখন দুই প্রহর হইল, তখন নটবর ও মালী আস্তে আস্তে সেই ভূতের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ঘরে তালা বন্ধ ছিল, নিঃশব্দে দুই জনে তাহার পার্শ্বে বারেণ্ডায় দাঁড়াইলেন। ঘরের একটি জানালা খোলা ছিল। কিন্তু ঘরটি তখন অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। দুই জনে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সহসা সেই ঘরের ভিতর নীলবর্ণের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। মালী ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল। নটবর দেখিলেন যে, ঘরের ভিতর টেবিলের পার্শ্বে পরমা সুন্দরী এক যুবতী একখানি চৌকিতে বসিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে সেই চাকর-চাকরাণীর কৃষ্ণকায় ভূত দুইটি দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের চক্ষু-কোটর হইতে নীলবর্ণের অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। টেবিলের উপর বাক্সর মত ছোট একটি ইংরেজী বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে যুবতী সেই বাদ্যযন্ত্রটির স্থানে স্থানে টিপিতে লাগিলেন। তাহা হইতে সুমধুর শব্দ নির্গত হইল। সেই সুরে যুবতী সেই গীতটি আরম্ভ করিলেন।

"কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।"

এই কয়টি কথা ধীরে ধীরে সুমধুর স্বরে গাহিয়াই যুবতী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ঘরের ভিতর সেই নীলবর্ণের আলোক নির্বাণ হইয়া গেল। সেই হৃদয়বিদারক কাতর শব্দ শুনিয়া নটবর ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পদদ্বয় তাঁহার থর থর কাঁপিতে লাগিল। সেই সময় আর একটি যুবা পুরুষের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। বারেণ্ডার নিম্নে বৃক্ষে ঠেস দিয়া লোকটি দাঁড়াইয়া আছে। সেও ভয়ে কাঁপিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে মালীর দৃষ্টিও তাহার উপর পড়িল।

"নরাধম পাপিষ্ঠ পশু! স্বামী হইয়া এরূপ পতিব্রতা স্ত্রীর গলায় তুই ছুরি মারিয়াছিস্। মায়ের কাছে সত্য করিয়াছিলাম বলিয়া, তুই সে সময় ফাঁসী হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিস। কিন্তু আজ তোরে যমে টানিয়া এ স্থানে আনিয়াছে। আজ তোরে মারিয়া আমি ফাঁসী যাইব।"

এইরূপ বলিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া মালী সেই লোকটির প্রতি ধাবিত হইল। বড় বাড়ীর দিকে লোকটি দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। মালীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। দুই বাড়ীর মধ্যস্থিত সেই মতিঝিলের উপর যে পুল ছিল, লোকটি তাহার উপর উপস্থিত হইয়া সবলে পড়িয়া গেল। পুলের মধ্য-স্থলে পড়িল না, পার্শ্বে কাষ্ঠনির্মিত রেলের গায়ে পড়িল। তাহার ভারে রেল ভাঙ্গিয়া গেল। রেল ভাঙ্গিয়া লোকটি ঝিলের জলে পড়িল। ঝিলটি অপ্রশস্ত বটে, কিন্তু ইহাতে জল বিলক্ষণ গভীর ছিল। লোকটি ডুবিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মাথাটি একবার ভাসিয়া উঠিল। মাথা তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে লোকটি মালীকে বলিল,—"জগু! আমি সাঁতার জানি না। আমার প্রাণ রক্ষা কর। তোরে অনেক টাকা দিব।"

এই কথা বলিতে না বলিতে লোকটি পুনরায় ডুবিয়া গেল। তাহার প্রাণ-রক্ষা করিতে জগু জলে ঝাঁপ দিল না। দুই হাত আপনার বুকে রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া পুলের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। নটবরও দৌড়িয়া সঙ্গে

সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি সাঁতার জানেন না। তিনি জলে ঝাঁপ দিতে পারিলেন না। জগদ্বকে তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, জগদ্ব কিছুতেই জলে পড়িল না।

হাবুডুবু খাইয়া লোকটির মাথা আর একবার উপরে উঠিল। আর একবার অতি কাতরস্বরে জগদ্বর নিকট সে প্রাণভিক্ষা চাহিল। জগদ্ব পূর্ববৎ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটি পুনরায় ডুবিয়া গেল। এমন সময় জগদ্বর ঠিক সম্মুখে জ্যোৎস্না কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া যেন জ্যোৎস্না-নির্ম্মিত কিরূপ একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জগদ্ব একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, আর একান্তমনে যেন সে কি শুনিতে লাগিল। নটবর জ্যোৎস্না-নির্ম্মিত সেই মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। একান্তমনে মালী কি শুনিয়া উত্তর করিল,—"আচ্ছা, মা! তুমি যখন বলিতেছ, তখন তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। তোমার পতি হইবার উপযুক্ত ওপাপিষ্ঠ নহে। যাহা হউক, তোমার আজ্ঞায় নরাধমের আমি প্রাণরক্ষা করিতেছি।"

এই বলিয়া মালী তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল। সেই সময় তৃতীয় বার লোকটির মাথা জলের উপর উঠিয়াছিল। জগদ্ব তাহার চুল ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু লোকটি দুই হাত দিয়া মালীকে জড়াইয়া ধরিল। মালী বলিল,—"পাপিষ্ঠ! যদি আমাকে এরূপ জড়াইয়া ধরিবি, তবে কি করিয়া আমি তোর প্রাণরক্ষা করিব?"

নটবরের কানে মালীর কেবল এ কয়টি কথা প্রবেশ করিল। তাহার পর তিনি দেখিলেন যে, মালী ও সেই লোকটি জড়াজড়ি করিয়া দুই জনেই ডুবিয়া গেল। চীৎকার করিতে করিতে নটবর পুল হইতে নামিয়া ঝিলের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সাঁতার জানেন না, সে নিমিত্ত নটবর জলে ঝাঁপ দিতে সাহস করিলেন না। মনে করিলেন যে, যদি কোন প্রকারে কিনারার গোড়ায় আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিবেন। কিন্তু নিকটে কেহই আসিল না। দুই জনেই জলমগ্ন হইয়া গেল। একবারও তাহারা আর উপরে উঠিল না।

চতুর্থ অধ্যায় : মিলন

নটবর ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া বড় বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ চাকর-বাকর সকলেই দৌড়াইয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই জলে নামিতে সাহস করিল না। ক্রমে দূর হইতে অপর লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা জলে নামিয়া দুই জনকেই সেই রাত্রিতে তুলিল। কিন্তু দুইটিই মৃতদেহ; অনেকক্ষণ পূর্বে দুই জনেরই প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যাহাকে মালী তাড়া করিয়াছিল ও যাহাকে বাঁচাইতে সে জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, সে লোকটি আর কেহ নয়, উদ্যানস্বামী গোকুল বাবুর পুত্র নবীন,—মা-লক্ষ্মীর স্বামী। কলিকাতায় থাকিতে কি হইয়াছিল, সেই জন্য সে গলায় ছুরি মারিয়া স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল, আর সেই কু-অভিপ্রায়সাধনের নিমিত্তই সে স্ত্রীকে এই নির্জন বাগানবাড়ীতে আনিয়াছিল।

এই বিপত্তির সময় নটবর ভিড়ের মাঝে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া বড় বাড়ী হইতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই দৌড়িয়া আসিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ধন সেই বালিকাকে তিনি দেখিতে পাইলেন,—সেই স্বর্ণ,—চোরের হাত হইতে যাহাকে তিনি রক্ষা করিয়া-

ছিলেন। স্বর্ণ আর কেহ নহেন, মা-লক্ষ্মীর ভগিনী। পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া, মদের নেশায় উন্মত্ত হইয়া, নবীন যখন তাহার ভগিনীর গলায় ছুরি মারে, স্বর্ণ তখন সেই ঘরে ছিল, স্বর্ণ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে পিতা আসিয়া নবীনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। সে নরাধমকে কি করিয়া স্বর্ণ বিবাহ করে? মৃত্যুকালে ভগিনীর পায়ে হাত দিয়া স্বর্ণ দিব্য করিয়াছিল; সে নিমিত্ত পিতার নিকট সকল কথা সে খুলিয়া বলিতে পারে নাই। মাঝের-গাঁর সেই মেয়ে-মানুষ ভিতরের সকল সন্ধান লইয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল। "তোমার ভগিনী উপদেবতা হইয়া বাগানবাড়ীতে আছেন। সিন্নি দিয়া হাতযোড় করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তুমি নবীনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে।" মাঝের-গাঁর মেয়েমানুষ এই কথা বলিয়াছিল। তাহার পর সে চোর পাঠাইয়া দিয়াছিল। প্রাণের দায়ে অসীম সাহসে ভর করিয়া, স্বর্ণ সেই রাত্রি ভূতের বাটীতে পূজা দিতে আসিয়াছিল।

আর অধিক বলিবার কিছু নাই। কিছু দিন পরে পীতাম্বর বসু পরম আনন্দে নটবরের হস্তে স্বর্ণকে সমর্পণ করিলেন। পরম আনন্দে নটবরের মাতা নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। স্বর্ণ হেন স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া নটবর সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। নটবর বলেন,—"ভূতের কৃপায় আমি মনের মত পত্নী লাভ করিয়াছি। ইংরেজী খাঁ বাবুদিগের সুমতি হউক; ভূতের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি হউক, এই আমার প্রার্থনা।"

বেতাল ষড়্‌বিংশতি

প্রথম অধ্যায় : স্কুলের মাষ্টার

নূতন-পাড়া নামক একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে একটি স্কুল আছে। গৌরীশঙ্কর নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক সেই স্কুলে মাষ্টারি করেন। তাঁহার বেতন কুড়ি টাকা। কুড়ি টাকা বেতনে কেহ বড় মানুষ হইতে পারে না ; কিন্তু বড় মানুষ হইতে গৌরীশঙ্করের বড় সাধ। কাহার বা সাধ নয়? কি করিয়া রাতা-রাতি অর্থবান হইতে পারা যায়, গৌরীশঙ্কর সর্বদাই সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাতারাতি বড়-মানুষ হইবার উপায় পৃথিবীতে বড় অধিক নাই,—একেবারে নাই বলিলেও চলে। কিন্তু গৌরীশঙ্কর সুবুদ্ধি লোক, সহজেই সে উপায় তিনি বাহির করিলেন।

গৌরীশঙ্কর শুনিলেন যে, শ্মশানে গিয়া শব-সাধন করিতে পারিলে দেবীর বরে যাহা ইচ্ছা তাহাই লাভ করিতে পারা যায়। "একটা মড়ার উপর বসিয়া কিছুক্ষণ জপ করা বই তো নয়! কেনই বা তা না পারিব?"

গৌরীশঙ্কর সাহসী পুরুষ ছিলেন, এ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইলেন। কি করিয়া এ কাজ করিতে হয়, সেই দিন হইতে তিনি সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গুরুগিরিতে তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু মাথায় একটি টিকি রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক, গৌরীশঙ্কর শব-সাধনের চেষ্টায় রহিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে শব-সাধনের নিমিত্ত তিনি একটি মন্ত্র পাইলেন। আর এক জনের নিকট তিনি ইহার প্রকরণও কিছু কিছু জানিয়া লইলেন। গুরু তাঁহার ছিল না, এ কার্য্যে উত্তর-সাধক হয়, এমন এক জন লোকও তিনি পাইলেন না। উত্তর-সাধকের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই। কারণ, রাতারাতি বড় মানুষ হইতে হইলে, সে কাজটা গোপনে হইলেই ভাল হয় ; ভাগিদার করা উচিত নয়।

মন্ত্রের যোগাড় হইল, প্রকরণ ঠিক হইল। এখন চাই মড়া। মড়া না হইলে শব-সাধন হয় না। যেমন তেমন মড়ায় এ কাজ হয় না। গৌরীশঙ্কর অনেক দিন ধরিয়া, উপযুক্ত শবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে কিছুদিন পরে তাঁহাদের গ্রামে সর্পাঘাতে এক জন চণ্ডালের মৃত্যু হইল।

গৌরীশঙ্কর সেই চণ্ডালের আত্মীয়গণকে বলিলেন,—"সর্পদংশনে লোকের প্রকৃত মৃত্যু হয় না। একপ্রকার অজ্ঞান হইয়া থাকে। ভাল রোজার হাতে পড়িলে পুনরায় জীবিত হইতে পারে। গঙ্গার ধারে হইলে, মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই উচিত। এ স্থানে গঙ্গা নাই। শ্মশানে লইয়া বাঁশের একটি উচ্চ মাচা নির্মাণ করিয়া, তাহার উপর ইহাকে সাত দিন রাখিয়া দাও। ইহার যদি আয়ু থাকে, তাহা হইলে এই সাত দিনের মধ্যে কোন না কোন স্থান হইতে রোজা আসিয়া ইহার প্রাণদান করিবে। কত স্থানে এরূপ কত ঘটনা হইয়া গিয়াছে।"

বিন্দু মাত্র আশা থাকিতে কে আর প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করে? চণ্ডালেরা তাঁহার কথায় সম্মত হইল। নূতনপাড়ার বাহিরে মাঠের মাঝখানে যে একটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে, সেই পুষ্করিণীর ধারে এ স্থানের লোকে শব দাহ

করে। বাঁশের মাচা না করিয়া, চণ্ডালেরা সেই পুষ্করিণীর ধারে একটি বটগাছের উপর আত্মীয়ের মৃতদেহ বাঁধিয়া রাখিল।

গৌরীশঙ্কর বাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। কারণ, একে চণ্ডালের মড়া, তাহার উপর আবার সর্পাঘাতে মৃত্যু,—শব-সাধনের পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী। শাস্ত্রের বচনটা বোধ হয় তিনি শুনিয়াছিলেন, যথা ;—

যষ্টীবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমুতম্।
রজ্জুবদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালং বাতিভূতিকম্॥
তরুণং সুন্দরং শূদ্রং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সংমুখে রণবর্ত্তিনম্॥

গৌরীশঙ্কর বাবুর কপালে আর একটি সুবিধা হইল। চণ্ডালের মৃত্যুর তিন দিন পরেই শনিবার অমাবস্যা পড়িল। নানারূপ শুভ লক্ষণ দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"বিপুল ধনসম্পত্তির অধিস্বামী এইবার নিশ্চয় হইব।" ধনবান হইয়া কোথায় কাহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, কোন স্থানে রাজ-ভবনসদৃশ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন, কিরূপ জমীদারী ক্রয় করিবেন, কি উপায় অবলম্বনে মহারাজা উপাধি লাভ করিবেন, এখন এই সমুদয় কথা তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ হইয়াছিল ; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া, টাকা অভাবে এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সংসারে বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। মুখে প্রকাশ না করুন, কিন্তু মনে মনে বিবাহের জন্য গৌরীশঙ্কর বিশেষ লালায়িত ছিলেন। পুত্রবধূ লইয়া ঘর করিতে তাঁহার মাতারও যে একান্ত বাসনা ছিল, সে কথা আর বলা বাহুল্য। এক্ষণে সেই সমুদয় বাসনা পূর্ণ হইবে। চণ্ডালের মড়া পাইয়া, সম্মুখে শনিবার অমাবস্যা পাইয়া, গৌরীশঙ্কর বাবু আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মদ্য, মৎস্য, মাংস, গুড়, পিষ্টক, পরমান্ন, তিল, কুশ, সর্ষপ, দীপ, এলাচি, কর্পূর, খয়ের, পান, আদা, পাটের দড়ি, প্রভৃতি নানারূপ কুলাচার-দ্রব্য তিনি আহরণ করিলেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় পূজার উপকরণ লইয়া, গৌরীশঙ্কর একাকী শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রাম হইতে প্রায় আধ ক্রোশ, মাঠের মাঝখানে, জনশূন্য সেই শ্মশানক্ষেত্র। সে কালে এই পুষ্করিণীর ধারে দুষ্ট দস্যুগণ পথিকগণকে মারিয়া ফেলিত। এখনও দিনের বেলা এ স্থানে যাইতে ভয় হয়। ঘোর তিমিরাবৃত অমাবস্যা নিশার তো কথাই নাই। কিন্তু গৌরীশঙ্করের মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের উদয় হইল না। নির্ভয় চিত্তে একাকী তিনি গমন করিতে লাগিলেন। যদি লোভবশতঃ অজ্ঞানতা-সহকারে এ কার্য্য তিনি না করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম,—"ধন্য গৌরীশঙ্কর! তোমার সাহসকে ধন্য! তুমি বীরপুরুষ বটে! বীর সাধনে মন্ত্র-সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত তুমি উপযুক্ত পাত্র বটে। কিন্তু তোমার অজ্ঞানতার জন্য দুঃখ হয়। তুমি মনুষ্যের নিকট উপদেশ না গ্রহণ কর, সমুদয় চরাচর জগতের শিক্ষাদাতা সদাশিবকে একান্ত মনে গুরুরূপে বরণ কর নাই কেন ?"

একাকী নির্ভয় হৃদয়ে গৌরীশঙ্কর যাইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধকার! ভয়াবহ নির্জন শ্মশানভূমি! রাত্রি এক প্রহরের সময় তিনি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া, প্রথম তিনি অঘোর-অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা চারিদিক রক্ষা করিলেন। তাহার পর পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া, নূতন অধৌত এক চিতার উপর পূজার স্থান চিহ্নিত করিলেন। তাহার পার্শ্বে দীপ

রাখিবার নিমিত্ত সামান্য এক গর্ত্ত খুঁড়িলেন। অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে সেই বটবৃক্ষে উঠিলেন। পকেট হইতে দীপ-শলাকা জ্বালাইয়া মাদুরাবৃত মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। শবের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। মড়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আর একটি মন্ত্র বলিয়া শবকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর শবকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তিনি কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিলেন। অবশেষে যে রজ্জু দ্বারা শব গাছে আবদ্ধ ছিল, আস্তে আস্তে তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যথাসাধ্য ধীরে ধীরে মড়াকে গাছ হইতে নামাইলেন। তাহার পর মড়ার কোমর ধরিয়া পূজার স্থানে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। পুষ্করিণী হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন ও চন্দনাদি সুগন্ধ তাহার শরীরে লেপন করিলেন। গৌরীশঙ্কর যখন এইরূপ করিতেছেন,তখন মড়া একবার হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিল। তাহার মুখদেশ তখন ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু গৌরীশঙ্কর তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। মড়ার শরীরে তিনি বার বার থু থু দিতে লাগিলেন। মড়া পুনরায় স্থির হইল। তখন তাহাকে পুনরায় প্রক্ষালন করিয়া, পুনরায় তাহার শরীরে চন্দনাদি লেপন করিলেন। তাহার পর সেই অধৌত চিতার উপর তিনি কুশ ছড়াইলেন। মড়ার কোমর ধরিয়া, সেই কুশের উপর লইয়া পূর্বশির করিয়া তাহাকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর এলাচি কর্পূর প্রভৃতি মসলা সংযুক্ত পান তাহার মুখে দিয়া মড়াকে অধোমুখ অর্থাৎ উপুড় করিলেন। এইরূপ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে চন্দন দ্বারা, এক চারি-কোণা ঘর অঙ্কিত করিলেন। সেই চারি-কোণা ঘরের ভিতর একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিলেন। মড়া যাহাতে উঠিতে না পারে, সেই জন্য তাহার পদদ্বয় পট্টসূত্র দ্বারা বন্ধন করিলেন। অবশেষে মড়ার পৃষ্ঠে একখানি কম্বল বিছাইয়া, অশ্বারোহণের ন্যায় তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন। মড়ার দুই হাত দুই পার্শ্বে বিস্তৃত করিয়া কুশ রাখিয়া, গৌরীশঙ্কর নিজের দুই পা মড়ার দুই হাতের উপর রাখিলেন। মড়ার দীর্ঘ কেশ ছিল, সেই চুলগুলি খুলিয়া গৌরীশঙ্কর ঝুঁটি বাঁধিয়া দিলেন। অস্ত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া, চারিদিকে সরিষা ছড়াইয়া দিলেন। তাহার পর আর কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নানা বিভীষিকা

এইরূপ নানা প্রকার আয়োজন ও মন্ত্র পাঠ করিয়া গৌরীশঙ্কর পূজা আরম্ভ করিলেন। গুরু নাই যে গুরুর পূজা করিবেন, কাজেই প্রথম তিনি দশদিকপালের পূজা করিলেন। তাহার পর ইন্দ্রকে বলি প্রদান করিলেন। নানা মন্ত্রে ও নানা উপকরণে দেবতাদিগের পূজা করিয়া, গৌরীশঙ্কর জপ আরম্ভ করিলেন। অমাবস্যা রাত্রি তো ছিলই, তাহার উপর ক্রমে ক্রমে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। এরূপ নিবিড় অন্ধকার দ্বারা পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল যে, প্রলয়কালে সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। তাহার পর তুমুল ঝঞ্ঝাবাতে দশ দিক পূর্ণ হইল। প্রবল বায়ুবেগে গৌরীশঙ্করকে শবের পৃষ্ঠ হইতে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না। দৃঢ় বীরাসনে তিনি শবের পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। দন্ত কিড় মিড় করিয়া, হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া মড়া উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পদদ্বয় পাটের দড়ি দ্বারা বাঁধা ছিল। নিজের দুই পা দিয়া গৌরীশঙ্কর তাহার হাত দুইটা মাটীতে চাপিয়া রাখিলেন।

শব উঠিতে পারিল না। এই সময় আকাশে মাঝে মাঝে উল্কাপাত হইতে লাগিল ; মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল ; ঘোর বজ্র-শব্দে কর্ণে তালি লাগিতে লাগিল। এই সমস্ত উপদ্রবে গৌরীশঙ্কর কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। শবের উপর বসিয়া একান্ত মনে তিনি জপ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগে মেঘ ক্রমে দূরীভূত হইল, আকাশ পরিষ্কার হইল ; পৃথিবী ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থির হইল। এমন সময় সহসা এক দিক হইতে বন্য শূকরের পাল আসিয়া দন্ত দ্বারা গৌরীশঙ্করকে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। সহসা এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণকালের নিমিত্ত তিনি চমকিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুদিত করিয়া, তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। বন্য শূকর অদৃশ্য হইয়া পড়িল। পৃথিবী আর একবার নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর, সহসা অতি নিকটে ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জন শ্রবণ করিয়া গৌরীশঙ্কর একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া, তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। গ্রাস করে আর কি! সহসা ভীত হইয়া, গৌরীশঙ্কর পলায়নের উপক্রম করিলেন। কিন্তু সে চিন্তা নিমিষের নিমিত্ত তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। মনকে দৃঢ় করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, পুনরায় তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাঘ্র চলিয়া গেল। তাহার পর গৌরীশঙ্করের চারিদিকে অসংখ্য কাল-সর্প আসিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিতে লাগিল। কিন্তু এবারও তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন না, সে নিমিত্ত ভয়ও পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে সাপের গর্জন থামিয়া গেল। তাহার পর গৌরীশঙ্করের ঠিক কানের নিকট বিকট হাসির শব্দ হইল। সেরূপ বিকট হাসি কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই। সেই শব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি মনকে স্থির করিলেন। তাহার পরক্ষণেই পালে পালে পিশাচ, ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য, ডাকিনী, শাকিনী, হাকিনী, ভৈরব বটুক প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে এরূপ বিকট শব্দ করিতে লাগিল যে, সে শব্দ শুনিলে কোন মনুষ্যই চেতন অবস্থায় থাকিতে পারে না। পুনরায় আর একবার পলায়ন করিবার নিমিত্ত গৌরীশঙ্করের মন হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি মনকে দৃঢ় করিতে সমর্থ হইলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া তিনি একান্ত মনে জপ করিতে লাগিলেন। গৌরীশঙ্কর ভাবিলেন যে,—"ভূত প্রেত কখন দেখি নাই, একবার চাহিয়া দেখি, ভূত-প্রেত কিরূপ হয়।" এই বলিয়া তিনি নিমিষের নিমিত্ত একবার চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে পরক্ষণেই পুনরায় তাঁহাকে চক্ষু বুজিতে হইল। সে বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ স্থির থাকিতে পারে না। সে অন্ধকারে তিনি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন না ; কিন্তু মাঝে মাঝে তাহাদের মুখবিবর হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। সেই আলোকে তাহাদের রূপ তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সর্বাঙ্গে সহস্র সহস্র কৃমি দুলিতেছে। পাতালের ন্যায় মুখবিবর। মুখের ভিতর হইতে অনবরত রক্ত নির্গত হইতেছে। গজদন্তের ন্যায় বড়, কিন্তু বক্রাকার, ভীষণ দন্ত। ললাট দেশে কেবল একটি গোলাকার চক্ষু। সেই চক্ষু হইতেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও সর্প বাহির হইতেছিল। চকিতের নিমিত্ত তিনি চাহিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কেবল একটি ভূতের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িয়াছিল। সেই এক জনের যৎসামান্য রূপের পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন। অন্যান্য ভূতের কিরূপ আকার ছিল, তাহা তিনি দর্শন করেন নাই। ঐ ভূত ব্যতীত ক্ষণকালের নিমিত্ত আর এক জন উপদেবতা তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল। উপরি উক্ত ভূতকে দেখিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন।

কিছুক্ষণ পরে উষ্ণ বায়ুস্রোত তাঁহার মুখের উপর পড়িতে লাগিল। তিনি আর একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে এক বৃদ্ধা ডাকিনী হাঁ করিয়া, দীর্ঘ ও ঘোর রক্তবর্ণ জিহ্বা বার বার লেহন করিতেছে। বৃদ্ধা ডাকিনীর একটিও দন্ত নাই। সর্বশরীর তাহার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অতি ভয়ানক আকৃতি। জিহ্বা দ্বারা তাঁহার নাসিকা স্পর্শ করে আর কি। ডাকিনীকে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন।

গৌরীশঙ্কর পুনরায় জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ভূত-প্রেতগণ নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় বার বার ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। গৌরীশঙ্কর মনে করিলেন যে,—ভূমিকম্পে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মড়ার সহিত যেন তিনি পাতাল-পুরীতে নামিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই হুশ্ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আর একবার মনে হইল যে, মড়ার সহিত তিনি যেন শূন্যে উঠিতেছেন; কিন্তু পরক্ষণেই হুশ্ করিয়া নামিয়া পড়িলেন। সেই সময় তাঁহার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, অনেক কষ্টে মনকে স্থির করিয়া পুনরায় তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ভূত প্রেতের উপদ্রব নিবৃত্ত হইল। পৃথিবী আর একবার স্থির হইল। এই সময় অতি সুমধুর বামা স্বরে নিকটে কে আসিয়া গৌরীশঙ্করকে বলিল,—"নাথ! অনেক কষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে উঠ! আমি আসিয়াছি। বিবাহের নিমিত্ত তুমি লালায়িত হইয়াছিলে, এখন চাহিয়া দেখ, দেবী তোমার নিমিত্ত কিরূপ পত্নী প্রেরণ করিয়াছেন। নাথ! চিরকাল তোমাকে আমি প্রেমে আবদ্ধ করিয়া রাখিব। যে স্বর্গীয় সুখ শচী ইন্দ্রকে প্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ নানা সুখে আমি তোমাকে পরিতোষ করিব। হে প্রাণনাথ! গাত্রোত্থান কর। ঐ বীভৎস আসনের উপর আর বসিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই।" কামিনীর সুমধুর স্বরে গৌরীশঙ্করের হৃদয়ে যেন সুধাসিঞ্চন করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন,—"সম্মুখে যৌবনপ্রাপ্তপ্রায় চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা এক কামিনী। তাহার রূপে সেই অমাবস্যা রাত্রিও আলোকিত হইয়াছিল।

কামিনীর মধুর বচনে গৌরীশঙ্করের হৃদয় শীতল হইল; তাহার স্থির-বিদ্যুৎসম রূপ-মাধুরী দর্শনে তাঁহার মন মোহিত হইল। তিনি মনে করিলেন,—"কাজ কি আর ধনে? দেবী যখন কৃপা করিয়া এরূপ জগন্মোহিনী যুবতীকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তখন ইহাকেই লইয়া পরম সুখে আমি জীবন অতিবাহিত করি। আমার যতই ধন ঐশ্বর্য্য হউক না কেন, সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আমি এরূপ নারী পাইব না। আর জপে প্রয়োজন নাই, উঠিয়া ইহাকে হৃদয়ে ধারণ করি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া গৌরীশঙ্কর শবের উপর হইতে উঠিবার নিমিত্ত উপক্রম করিলেন; কিন্তু সেই সময় কে যেন তাঁহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—"কর কি? এ যে সব মায়া! জপ পরিত্যাগ করিলে মুহূর্তমধ্যে হয় তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আর না হয় পাগল হইয়া যাইবে।" গৌরীশঙ্করের তখন যেন চমক হইল। তিনি মনে করিলেন,—"সত্য বটে, এ সমুদয় মায়া। কিন্তু এ কামিনীর রূপ দেখিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারেন না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি তাহার নিকট ধাবিত হইতে ইচ্ছা হয়। দূর হউক, আর ইহার দিকে চাহিয়া দেখিব না।" এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর চক্ষু মুদিত করিলেন। কামিনী অতি সুমধুর স্বরে নানারূপ সাধ্য-সাধনা করিল; কিন্তু গৌরীশঙ্কর কিছুতেই আর চক্ষু উন্মীলন করিলেন না। নিরাশ হইয়া মায়াময়ী অন্তর্হিত হইল। পৃথিবী পুনরায় নীরব হইল। গৌরীশঙ্কর চাহিয়া দেখিলেন যে,

এখন আর সে স্থানে বন্য পশু অথবা ভূত-প্রেত প্রভৃতি কিছুই নাই। এখন চারি দিকে কেবল নিবিড় অন্ধকার।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বীরের বাক্যবাণ

গৌরীশঙ্কর পুনরায় একান্ত মনে জপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা মাতার কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই অমাবস্যা রাত্রি,—সেই ভয়াবহ শ্মশান-ভূমি। —সে স্থানে মাতা কেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই চিন্তা করিয়া তাঁহার মন বড়ই কাতর হইল। তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন,—সত্য সত্যই তাঁহার বৃদ্ধ মাতা বটে। যষ্টি হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মা বলিলেন,—

"উত্তিষ্ঠ বৎস তে কার্য্যং সর্ব্বং যাতু ন সংশয়ঃ।
প্রভাতসময়ো জাতস্ত্বৎপিতা ক্রোশতে গৃহম্॥
প্রায়ো বিমৎসরা লোকা রাজানো দণ্ডধারিণঃ।
কদাচিৎ কেন বা দৃষ্টস্তদা কিঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি॥"

মাতার মুখে এরূপ সংস্কৃত বচন শুনিয়া গৌরীশঙ্কর বিস্মিত হইলেন। "আমার পিতা নাই, দেশে রাজপুরুষ আছে বটে; কিন্তু রাজা নাই। ইনি কি আমার মাতা নহেন, ইনি কি মায়া?" গৌরীশঙ্কর ভাল রূপে পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। হুবহু তাঁহার মাতা, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। মস্তকে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা বলিলেন,—"বাছা, তুই আমার একমাত্র সন্তান। কেন তুই এমন অসীম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস? যদি তোর কোনরূপ বিপদ ঘটে, তাহা হইলে কাহাকে লইয়া আমি আর এ সংসারে থাকিব? কাজ কি বাছা ধনে? ব্রাহ্মণের ছেলে,— তুই ভিক্ষা করিয়া খাইবি, চল্, বাছা ঘরে চল্, আর জপে প্রয়োজন নাই।"

মাতা এইরূপে খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, যদি প্রকৃত আমার মাতা হন, তাহা হইলে ইনি আমার হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু মাতা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন না। অনেক খেদ করিয়া, অবশেষে তিনি প্রস্থান করিলেন। ইহার পর আরও অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আসিয়া গৌরীশঙ্করকে তুলিতে চেষ্টা করিল। বহুকাল পূর্বে মৃত পিতা ও জ্ঞাতিগণও আসিয়া, তাঁহাকে শবের উপর হইতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর উঠিলেন না। নানারূপ বিভীষিকা দর্শনে তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

রাত্রি প্রায় তিনটা হইল। এমন সময় এক জন থিয়েটারী বীর সেই শ্মশান-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরীশঙ্কর একবার থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে এক জন অভিমন্যু সাজিয়া আসিয়াছিল। থিয়েটারে যাঁহারা বীর সাজেন, তাঁহারা মনে করেন যে, খুব চীৎকার করিতে পারিলেই বীরত্ব প্রদর্শন করা হয়। থিয়েটারের রীতি অনুসারে সেই অভিমন্যুও ভয়ানক চীৎকার করিয়াছিল। তাহার চীৎকারে অনেক লোকের কান হইতে পোকা বাহির হইয়া গিয়াছিল; অনেক লোকের কর্ণে তালি লাগিয়াছিল; তাহা ভিন্ন চারি

পাঁচ জনের কর্ণতন্তু ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। চারি পাঁচ জনের কর্ণপটহে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। সেই হতভাগারা জন্মের মত বধির হইয়া গিয়াছে। গৌরীশঙ্কর চীৎকারে অস্থির হইয়া তৎক্ষণাৎ থিয়েটার হইতে প্রস্থান করেন। সেই অবধি থিয়েটারী বীরকে তিনি বড় ভয় করেন। এখন সেই থিয়েটারী বীর শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। থিয়েটারী বীর অতিকর্কশ স্বরে ঘোর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"রে রে রে, কে রে তুই? যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি! জানিস আমি থিয়েটারী বীর। এ জগতে এমন কে আছে যে, আমার চীৎকার সহ্য করিতে পারে? আমার কর্কশ বচনে কাহার না কান ঝালা-পালা হয়? আমি যখন থিয়েটারের তক্তার উপর দাঁড়াইয়া ঘোর রবে চীৎকার করিতে থাকি, তখন কোন দর্শক, কোন শ্রোতা না কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? কে না আমাকে শত শত গালি দিয়া থাকে? কে না বলে যে, যবনিকা-পতন হইলে বাঁচি? যুদ্ধং দেহি। যুদ্ধং দেহি।"

গৌরীশঙ্কর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থিয়েটারী বীরের বক্তৃতা প্রাণপণে সহ্য করিলেন, কিন্তু শেষকালে তিনি আর পারিলেন না। হায়! হায়! এত কষ্ট করিয়া শেষকালে সব বিফল হইল। তিনি মনে করিলেন,—বরাহ-ব্যাঘ্রের উপদ্রব সহ্য করিলাম, ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম্যেও মনকে স্থির রাখিলাম, অপ্সরার মোহিনী শক্তি আমাকে মোহিত করিতে পারে নাই, মাতার সকরুণ ক্রন্দনেও আমি বিচলিত হই নাই, কিন্তু এই থিয়েটারী বীরের বাক্যবাণে আমার কর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়া জর্জরীভূত হইল। ইহার জ্যেঠামি আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

এইরূপ মনে করিয়া, গৌরীশঙ্কর আসন ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু এবারও কে যেন তাঁহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—"কর কি? এ প্রকৃত থিয়েটারী বীর নহে, এ মায়া-প্রসূত ভূত। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। এখনি এ চলিয়া যাইবে।"

গৌরীশঙ্কর মন দৃঢ় করিয়া জপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু থিয়েটারী বীর দ্বিগুণভাবে চীৎকার আরম্ভ করিল, তাহার চীৎকারে গগন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গৌরীশঙ্কর আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। থিয়েটারী বীরের বাক্য-বাণে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কানে অঙ্গুলি দিয়া ধড়মড় করিয়া তিনি শবের পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া পড়িলেন। শ্মশানক্ষেত্র হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় চারিদিকে ঘোর কলরব উপস্থিত হইল। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, ভূত প্রেত পিশাচ দানা দৈত্য ডাকিনী শাকিনী বেতাল বটুক চেটক প্রভৃতি উপদেবতা, ও শত শত থিয়েটারী বীর এক সঙ্গে তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। কেহ লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য করিতে লাগিল। অবশেষে ভয়ঙ্কর এক বেতাল আসিয়া গৌরীশঙ্করের টিকি ধরিল। তাঁহার টিকিটি ধরিয়া তাঁহাকে দূরে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিল। ভাগ্যে পুষ্করিণীর মাঝখানে গিয়া তিনি পড়েন নাই, তাই রক্ষা। পুষ্করিণীর যে স্থানে কেবল কর্দ্দম ছিল, সেই স্থানে গিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, সেই স্থানে তিনি পড়িয়া রহিয়াছেন। সে সময় তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না। অজ্ঞান অভিভূত হইয়া তিনি পড়িয়া ছিলেন। কেবল অল্প অল্প নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছিল, কেবল অল্প অল্প গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিলেন, কেবল অল্প অল্প রক্তমিশ্রিত ফেনা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছিল। জীবনের এই সামান্য মাত্র চিহ্ন কেবল অবশিষ্ট ছিল।

চতুর্থ অধ্যায় : ধি-বী, যু-দে

প্রাতঃকালে এক জন রাখাল-বালক গৌরীশঙ্কর বাবুকে এই অবস্থায় প্রথম দেখিতে পাইল। তাহার চীৎকারে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পড়িল। নিকটে সেই চণ্ডালের শব ও পূজার আয়োজন দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিল যে, কি কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। গৌরীশঙ্কর বাবুকে ধরাধরি করিয়া সকলে গৃহে লইয়া গেল। প্রথম ডাক্তার—বৈদ্য আসিয়া তাঁহার চেতনা-সম্পাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কেহ তাঁহাকে চেতন করিতে পারিল না।

যদি বা যৎসামান্যভাবে তাঁহার দেহে একটু জীবনের সঞ্চার হয়, যদি বা তাঁহার মনে একটু জ্ঞানের উদয় হয়, কিন্তু প্রতিদিন রাত্রি তিনটার সময় গৌরীশঙ্করের পৃষ্ঠদেশে গুপগাপ শব্দ হয়। কিরূপে তাঁহার পৃষ্ঠে এরূপ শব্দ হয়, তাহা কেহ দেখিতে পায় না ; কিন্তু কে যেন সবলে তাঁহার পৃষ্ঠে কিল মারিতেছে, এইরূপ বোধ হয়। সেই সময় প্রহারের চোটে যন্ত্রণায় গৌরীশঙ্করের মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়ে। দিনের বেলা শরীরে যাহা একটু বলের সঞ্চার ও মনে যাহা একটু জ্ঞানের উদয় হয়, সেই প্রহারের চোটে তাহা লোপ পাইয়া যায়। তাহার পর গৌরীশঙ্কর পুনরায় জড়ের মত পড়িয়া থাকেন। ফল কথা, ডাক্তার ও বৈদ্য দ্বারা কোন রূপ উপকার হইল না।

এক মাত্র পুত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, গৌরীশঙ্করের মাতার দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি রাত্রি দিন কাঁদিতে লাগিলেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, পুত্রের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রোজার কথা শুনিলেই, দৌড়িয়া তিনি তাহার নিকট গমন করেন ; নানারূপ মিনতি করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনেন। প্রতি রাত্রিতে রোজাগণ নানারূপ ঝাড়ান করিতে লাগিল। দিনের বেলা একটু উপশম হয়। এক আধ বার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া গৌরীশঙ্কর বিস্ময়াপন্ন মুখে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু দিনের বেলা যাহা একটু উপকার হয়, রাত্রি তিনটার সময় ভূতের কিলের চোটে সে উপকার লোপ প্রাপ্ত হয়। রাত্রি তিনটার সময় প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া ভূতে তাঁহার পিঠে গুপ-গাপ গুপ-গাপ কিল মারে। আধ ঘণ্টা পরে কিলের শব্দ থামিয়া যায়। গৌরীশঙ্কর তাহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন ও সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে রক্তমিশ্রিত ফেনা নির্গত হইতে থাকে। তাঁহার পিঠে কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ,—কোন স্থানে রক্তবর্ণ,—কিলের দাগও সকলে দেখিতে পায় ; কিন্তু কে যে আসিয়া কিল মারিয়া যায়, কেহ তাহা দেখিতে পায় না।

এইরূপে এগার দিন কাটিয়া গেল। এখনও গৌরীশঙ্করের চেতনা হইল না ; এখনও প্রতি রাত্রিতে ভূতের প্রহার নিবারিত হইল না। শব-সাধনের একাদশ দিন পরে গৌরীশঙ্করের মাতা শুনিলেন যে, যে চণ্ডালের শব লইয়া গৌরীশঙ্কর সাধনা করিতেছিলেন, তাহার পিতৃব্য ভূতের মন্ত্র অবগত আছে। গৌরীশঙ্করের মাতা তাহার নিকট গমন করিলেন। প্রথমে সে কিছুতেই আসিতে স্বীকার পাইল না। কারণ, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের দেহ লইয়া গৌরীশঙ্কর সেই বিড়ম্বনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক মিনতির পর, সে আসিয়া ঝাড়ান কাড়ান করিতে লাগিল। তাহার মন্ত্রের বলে সামান্য একটু উপকার হইল। গৌরীশঙ্কর এবার চাহিয়া দেখিলেন। "ধি-বী, যু-দে" এই শব্দ দুইটি কয়বার তিনি উচ্চারণ করিলেন।

চণ্ডালের মন্ত্রে আর অধিক উপকার হইল না। গৌরীশঙ্করের জ্ঞান হইল

না, রাত্রিকালে ভূতের প্রহারও নিবারিত হইল না। আরও অনেক রোজা আসিয়া চিকিৎসা করিল ; কিন্তু তাহাদের মন্ত্রেও বিশেষ কোনরূপ উপকার হইল না।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে গৌরীশঙ্করের মাতা এক ব্রাহ্মণের কথা শুনিলেন। তাঁহার নিবাস প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। তিনি ভূত প্রেত সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরীশঙ্করের মাতা বৃদ্ধা ছিলেন, তথাপি লাঠি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে সেই ব্রাহ্মণের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের পদতলে তিনি শয়ন করিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের দয়া হইল। তিনি গৌরীশঙ্করের নিকট আগমন করিয়া নানারূপ ঔষধ প্রদান করিলেন ও নানারূপ মন্ত্রপাঠ করিলেন। দুই দিন কোন-রূপ ফল হইল না। তৃতীয় রাত্রিতে, "অ ক্ষঃ ক্ষাং-ক্ষৌ কার্জাস নৌ," ব্রাহ্মণ যেই এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, আর গৌরীশঙ্কর বিপরীত ভাবে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। এত দিন পরে এই প্রথম তিনি উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলেন। গৌরীশঙ্করের এইরূপ ভাব দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পুনরায় এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেন, "রাঁ রাঁ সাঁ সাঁ লাঁ লাঁ হুঁ হঃ সং সঃ খং খঃ তং তঃ ধং সং স্ফুং ছুাং হুং হুং হুং ক্ষাঁং ক্ষাঁং ক্ষৌং সং সঃ ছুঁং ছুঃ ধং সঃ স্তুং স্তুঃ ছুাং হুঁ হুং হুঁ ক্ষাঁং ক্ষাঁং ক্ষৌং সং ফং ফঃ হুং ফট্ স্বাহা ; কাহার আজ্ঞা—না, শ্রীশ্রীউচ্চমরেশ্বরের আজ্ঞা।" এ শব্দগুলির অর্থ কি, যাঁহাদের এ সম্বন্ধে বোধ আছে, তাঁহারা অনায়াসেই অবগত হইতে পারিবেন।

নানারূপ মন্ত্রবলে ব্রাহ্মণ গৌরীশঙ্করকে জড়ভাব হইতে মুক্ত করিলেন ; কিন্তু তিনি ঘোর উন্মাদ অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার জ্ঞান কিছুমাত্র হইল না। রাত্রিতে প্রহারও বন্ধ হইল না। গৌরীশঙ্কর যথারীতি আহারাদি করিতে লাগিলেন, উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের চিকিৎসায় এই পর্য্যন্ত হইল। কিন্তু তিনি কথা কহিতেন না। কখন কখন আপনা-আপনি, অথবা লোকের কথার প্রত্যুত্তরে কেবল "খি-বী, যু-দে" এই শব্দ উচ্চারণ করিতেন। এই দুইটি শব্দ ভিন্ন অন্য কথা তিনি মুখে আনিতেন না। আর এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিত ও সেই সময় আতঙ্কে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিত। প্রতি রাত্রিতে ভূতের প্রহারে গৌরী-শঙ্করের দেহ দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে গৌরীশঙ্করের মাতাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আপনার পুত্রকে সামান্য ভূতে পায় নাই। সামান্য ভূত হইলে আমি তাহার প্রতিকার করিতে পারিতাম। ইহার শরীরে বেতাল আশ্রয় করিয়াছে। বেতালকে দূর করি, আমার সেরূপ ক্ষমতা নাই।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন।

পুত্রের উন্মত্ততা দূর করিবার নিমিত্ত ও ভূতের প্রহার হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, মাতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। সেই একমাত্র পুত্র। তাঁহার যখন এ দশা হইল, তখন সংসার ধর্ম্ম আর কাহাকে লইয়া? গৃহে থাকিয়া আর লাভ কি? মাতা ভাবিলেন,—"পুত্রকে লইয়া যে দিকে দুই চক্ষু যায়, সে দিকে আমি চলিয়া যাইব। নানা তীর্থস্থানে আমি ঘুরিয়া বেড়াইব। যদি কোন স্থানে কোন মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় আমার পুত্র আরোগ্য লাভ করিবে। আর তা না হয়, তাহা হইলে পথে পথে বেড়াইয়া, আমি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব। আমার অবর্ত্তমানে এই উন্মাদের কপালে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

এইরূপ ভাবিয়া, তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গৌরীশঙ্কর! বাবা! আমরা যদি কাশী বৃন্দাবনে যাই, তাহা হইলে তুমি কি ভাল হইবে?"

গৌরীশঙ্কর উত্তর করিলেন,—"থি-বী, যন্-দে।"

মাতা জানিতেন যে, ঐ দুইটি শব্দ ভিন্ন গৌরীশঙ্কর অন্য কোন কথা মুখে আনিবেন না। তথাপি মায়ের প্রাণ! তিনি কেবল ঐ দুইটি শব্দই শুনিবার নিমিত্ত গৌরীশঙ্করকে সম্বোধন করিয়া নানা কথা কহিতেন, নানা পরিচয় তাহাকে প্রদান করিতেন, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, পুত্রের সহিত নানা গল্প করিতেন। পুত্র কেবল বলিত,—'থি-বী, যন্-দে।'

পঞ্চম অধ্যায় : দেখিতে সামান্য লোক

পুত্রকে লইয়া গৌরীশঙ্করের মাতা বাটী হইতে বাহির হইলেন। প্রথম অর্থাভাব, দ্বিতীয় পাঁচ জনের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা,—এই দুই কারণে তাঁহারা পদব্রজে পথ চলিতে লাগিলেন। মাতা বৃদ্ধা ছিলেন, অধিক পথ চলিবার তাঁহার শক্তি ছিল না; এক দিনের পথ তিনি চারি দিনে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে অতি সামান্য টাকা ছিল। পাছে সেগুলি শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, সেই ভয়ে যথাসাধ্য ভিক্ষা দ্বারা তিনি পথে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষিপ্ত পুত্র সহিত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া, সকলের দয়া হইত। সে নিমিত্ত পথে আহারাভাবে তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় নাই। পুত্র কিরূপে ক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া অনেকে বৃদ্ধার দুঃখে দুঃখী হইত। তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া, কোন কোন স্থানে ধনবান লোকের গৃহিণীগণ তাঁহাকে নগদ অর্থও প্রদান করিতেন। পুত্রের চিকিৎসার নিমিত্ত কোন দিন কি আবশ্যক হয়, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী যথাসাধ্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন। এইরূপে দুইজনে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিলেন। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে সকলকেই মাতা অতি বিনীত ভাবে পুত্রের বিবরণ প্রদান করিতেন। কিন্তু কোনও স্থানে কাহারও দ্বারা তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না; গৌরীশঙ্করকে কেহই সে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারিল না। তবে বায়ু-পরিবর্ত্তনে, নানা দেশ পর্য্যটনে ও নানা দৃশ্যদর্শনে এই মাত্র উপকার হইল যে, গৌরীশঙ্করের বিমর্ষভাব অনেকটা দূর হইল; পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার চিত্ত যেন কিছু প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। কিন্তু যে স্থানেই গমন করেন, যে স্থানেই দুই জনে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত শয়ন করেন, সেই স্থানেই রাত্রি তিন প্রহরের সময় গৌরীশঙ্করের পৃষ্ঠে ভূতের প্রহারে প্রপীড়িত হয়। তবে প্রহারে প্রহারে পিঠে ক্রমে তাঁহার কড়া পড়িয়া গেল। পিঠ কঠিন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা যাতনার কিছু লাঘব হইল। যাহা হউক, গৌরীশঙ্করের উন্মত্ততা ঘুচিল না, ভূতও তাঁহাকে ছাড়িল না।

এইরূপে তিন বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল। মাতার বার্দ্ধক্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বয়সের গুণে, পথক্লেশে, ভাবনা চিন্তায়, দিন দিন তিনি দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি ক্রমে হীন হইতে লাগিল। রোগগ্রস্ত হইয়া, যদি কিছু দিন তাঁহাকে পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে দুই জনের কি দশা হইবে, আর সহসা যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পুত্রের কি দুর্দ্দশা হইবে, এই সব ভাবিয়া প্রাণ তাঁহার বড়ই আকুল হইল। যাহা হউক, তিন বৎসর পরে শীতকালের প্রারম্ভে তাঁহারা উত্তরাখণ্ড হইতে নামিয়া, পুনরায় হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বারের নিকট জ্বালাপুর নামক এক-খানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের প্রান্তদেশে বৃহৎ একটি আমবাগান আছে। এক

দিন অপরাহ্নে গৌরীশঙ্কর ও তাঁহার মাতা সেই বাগানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথশ্রমে কাতর হইয়া দুই জনে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সেই বৃক্ষতলে আর একটি পুরুষ বসিয়াছিলেন। লোকটি দেখিতে বাঙালীর মত, পরিধান বাঙালীর মত, তবে চাদরখানি তিনি মাথায় বাঁধিয়াছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর মত তাঁহার বেশভূষা ছিল না। ভদ্র বাঙ্গালী সন্তানের যেরূপ হয়, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও ভাব-ভঙ্গী সেইরূপ ছিল। তাঁহার বয়স ত্রিশ বছরের কিছু অধিক হইবে। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই, গৌরীশঙ্করের মাতা পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইনি সাধু নহেন; সুতরাং বৃদ্ধা তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সেই লোকটি এক বৃক্ষমূলে ঠেস দিয়া, অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। মাতা ও পুত্র সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছুদূরে উপবেশন করিলেন। বাঙ্গালী তাঁহাদের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিলেন। কটাক্ষপাত করিবামাত্র তিনি চমকিত হইলেন। তাহার পর, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তিনি স্থিরদৃষ্টিতে গৌরীশঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলেন। গৌরীশঙ্করকে ভাল করিয়া দেখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু চাহিয়া তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা! আমি বাঙ্গালী, তোমরা আমার দেশস্থ লোক। কত দিন ধরিয়া তোমার পুত্রের এ দশা হইয়াছে?"

সামান্য এই কয়টি কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধার মনে কিরূপ এক অনির্ব্বচনীয় আশার সঞ্চার হইল। সকল লোকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করে,—"তোমার পুত্রের কি হইয়াছে?" ইনি সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। গৌরীশঙ্করের যাহা হইয়াছে, তাহা যেন তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অবগত আছেন, কথার ভাবে সেইরূপ প্রকাশ হইল। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য-ভাবে, তাঁহার সুমধুর কথায়, বৃদ্ধার তাপিত-হৃদয় যেন শীতল হইল। ফল কথা, বৃদ্ধাকে কে যেন বলিয়া দিল যে,—ইনি সামান্য পুরুষ নহেন। ভাগ্যবলে আজ তুমি ইঁহার দর্শন পাইলে: এইবার তোমার দুঃখের অবসান হইল। তাঁহার প্রশ্নের কোনও রূপ উত্তর না দিয়া, বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তাঁহার পা-দুইটি ধরিতে যাইলেন।

বৃদ্ধাকে নিবারণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"ছি! মা! অমন কাজ করিবেন না। আপনি বৃদ্ধা, আমার মাতৃস্থানীয়া।"

গৌরীশঙ্করের মাতা বলিলেন,—"বাছা! ভগবান আমাকে যেন বলিয়া দিতেছেন যে, তোমা হইতে আমার পুত্র আরোগ্য-লাভ করিবে। বাছা! এই দুঃখিনীকে তুমি এ দায় হইতে উদ্ধার কর। অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পুত্রটি ভিন্ন জগতে আমার আর কেহ নাই। ইহার এই দশায় আমি মৃতপ্রায় হইয়া আছি, পাগলের ন্যায় আমি দেশে দেশে ঘুরিতেছি। তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।"

বাঙ্গালী উত্তর করিলেন,—"আমি কিছু করিতে পারিব কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে মা, আপনার পুত্রকে সুস্থ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। নিকটে এই গ্রামখানির নাম জ্বালাপুর, এ স্থানে পাণ্ডাদের বাস। আমি আজ দুই দিন এ স্থানে আসিয়াছি। এক জন পাণ্ডার বাটীতে বাসা লইয়া আমি অবস্থিতি করিতেছি। আমার সঙ্গে বাসায় চলুন। আজ রাত্রিতে আপনার পুত্রের নিমিত্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

বলা বাহুল্য যে, গৌরীশঙ্করের মাতা অতি আগ্রহে এ কথায় সম্মত হইলেন। তিন জনে ধীরে ধীরে জ্বালাপুর অভিমুখে চলিলেন। অল্পক্ষণ পরে তিন জনে সেই পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালী আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর সকলে আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে,

বাঙ্গালী গৌরীশঙ্করকে এক স্বতন্ত্র ঘরে একাকী শয়ন করিতে দিলেন। তাঁহার মাতাকে অন্য এক ঘরে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। গৌরীশঙ্কর শয়ন করিলে সেই ঘরে বাঙ্গালী গিয়া নানারূপ ক্রিয়া করিলেন। কি কি কাজ করিলেন, তাহার বিবরণ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই। বাঙ্গালী নানারূপ ক্রিয়া করিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া বসিলেন। দ্বারের নিকট বসিয়া বাতির আলোকে একখানি পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। ঘরের ভিতর গৌরীশঙ্কর নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রাত্রির প্রথম ভাগে কোনও রূপ ঘটনা হইল না। তিনটার সময় যথারীতি গুপ্-গাপ্ শব্দ আরম্ভ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া বাঙ্গালী আলোক লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যে, গৌরীশঙ্করের পিঠের উপর সেই শব্দ হইতেছে, তিনি গোঁ গোঁ করিতেছেন, মুখ দিয়া তাঁহার ফেনা বাহির হইতেছে, মাঝে মাঝে তিনি চিৎ হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যতবার তিনি চিৎ হইতে চেষ্টা করিতেছেন, ততবার কে যেন তাঁহাকে বলপূর্বক উপুড় করিয়া ফেলিতেছে। উপুড় করিয়া কে যেন তাঁহার পিঠে কিল মারিতেছে। আলোটি ঘরের মাঝখানে রাখিয়া, বাঙ্গালী গৌরীশঙ্করের শিয়রদেশে গিয়া উপবেশন করিলেন। সে স্থানে বসিয়া তিনি তাহার মাথায় জপ করিতে লাগিলেন। জপ আরম্ভ করিবামাত্র কিলের শব্দ থামিয়া গেল। গৌরীশঙ্কর সুস্থির হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে গৌরীশঙ্কর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"থি-বী যু-দে।"

বাঙ্গালী বলিলেন,—"পরিষ্কার করিয়া সকল কথা বল!"

গৌরীশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না। বাঙ্গালী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ক্রমাগত জপ করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটিয়া গেল। জপ ব্যতীত তিনি আরও নানারূপ ক্রিয়া করিলেন। অবশেষে গৌরীশঙ্কর আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"থি-বী যু-দে।"

বাঙ্গালী বলিলেন,—"ভাল করিয়া বল!"

গৌরীশঙ্কর বলিলেন,—"থিয়েটারী বীর যুদ্ধং দেহি।"

বাঙ্গালী বলিলেন,—"হে থিয়েটারী বীর! আজ হইতে আর তুমি ইহাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না। কেমন! আমার আজ্ঞা তুমি পালন করিবে তো?"

গৌরীশঙ্কর এইবার প্রকৃতপক্ষে বক্তার হইলেন। আজ তিন বৎসর ধরিয়া "থি-বী, যু-দে" ভিন্ন অন্য কথা মুখে আনেন নাই, আজ তিনি নানারূপ কথা বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু এখন তিনি যে সমুদয় কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার নিজের নহে। যে ভূত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, এ সমুদয় তাহার কথা।

গৌরীশঙ্করের মুখ দিয়া সেই ভূত বলিল,—"মহাশয়! আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি সেইরূপ করিব। এ ব্যক্তি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছে। ধনলোভে বিনা শিক্ষায় এ অসীম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 'দেখি, মন্ত্র সফল হয় কি না? দেখি, আরাধনা করিলে ঈশ্বর সত্য সত্য মনুষ্যের প্রতি কৃপা করেন কি না,'—এইরূপ মনে করিয়া মন্ত্র ও মহাশক্তির পরীক্ষা করিতে এই ব্যক্তি গিয়াছিল। সেরূপ কার্য্যের পরিণাম এইরূপ হয়।"

বাঙ্গালী বলিলেন,—"যাই হউক, ইহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। আর কেন? ইহাকে এক্ষণে নিষ্কৃতি প্রদান কর।"

ভূত বলিল,—"আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। আপনি মহাত্মা লোক। মানুষে আপনাকে জানে না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। বিষ্ণুপ্রয়াগ অঞ্চলে তুষারাবৃত হিমালয়শিখরে যেরূপে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, যেরূপে আপনি প্রভুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা আমি জানি। যোগিগণ কেবল সমাধিযোগে যাঁহার দর্শন লাভ করেন, তিনি সর্বদাই আপনার হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে জড়জগতের অপর পারে সেই মহান জ্যোতির্মণ্ডল পর্য্যন্ত সকল বিষয় আপনি অবগত আছেন। কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞ সাজিয়া আপনি সংসারে বিচরণ করেন। মোহে মুগ্ধ, ক্ষুধায় ক্ষীণ, রোগে রুগ্ন, শোকে আকুল, ভারতের কোটি কোটি লোকের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত কত ক্লেশ, কত অপমান, আপনি না ভোগ করেন। জগতের হিতের নিমিত্ত দীন-বেশে সামান্য লোকের ন্যায় আপনি অর্থ উপার্জন করিয়া অকাতরে তাহা বিতরণ করেন। হে মহাত্মন্! আমি"—

বাঙ্গালী বলিলেন,—"চুপ!"

এই বলিয়া তিনি গৌরীশঙ্করের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অগ্নি-শিখার ন্যায় সেই দৃষ্টি যেন রোগীর উপর পড়িতে লাগিল। তাঁহার সমুদয় মনের ভাব যেন রোগীর মনকে বিদ্ধ করিয়া, তাহার ভিতর ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, গৌরীশঙ্কর অর্থাৎ ভূত, মস্তক অবনত করিয়া বলিল,—"বেশ। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। অজ্ঞ সাজিয়া সংসারে আপনি থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হউক। পাগল বলিয়া, লোকের নিকট পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হউক। এক্ষণে আপনার কি আজ্ঞা বলুন।"

বাঙ্গালী বলিলেন,—"এ ব্রাহ্মণকে আর তুমি ক্লেশ দিতে পারিবে না।"

যে আজ্ঞা বলিয়া ভূত গৌরীশঙ্করের দেহ হইতে প্রস্থান করিল। গৌরীশঙ্কর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। মাতার সহিত তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। বাঙ্গালীর কৃপায় তাঁহার ভাল কর্ম্ম হইল। যথাসময়ে তিনি বিবাহ করিলেন। গৌরীশঙ্করের মাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পরম সুখে ঘর-কন্না করিতে লাগিলেন।

ভগিনীপতির আঁবুই খুড়ো

গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন—"এই গল্পটি শেষ করিয়া আমি দেখিলাম যে, এখন কেবল একটি মুণ্ড বাকী আছে। মুণ্ড-মালার আর সমুদয় মুণ্ডগুলি রক্ত মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছে।"

এই শেষ মুণ্ড আমাকে বলিল,—"তুমি এই মাত্র যে গল্পটি বলিলে, সেটি অতি চমৎকার গল্প। সে গল্পটি আমাদের সম্বন্ধে। গৌরীশঙ্করকে যে বেতাল পাইয়াছিল, সে আমার ভগিনীপতির আঁবুই খুড়ো। এখন আমার নিকট সেইরূপ আর একটি ভাল গল্প কর।"

ভগিনীপতির আঁবুই খুড়ো কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি শেষ মুণ্ডকে বলিলাম,—"আপনাদিগের নিকট আমি অনেক গল্প করিলাম। কিন্তু ডাকিনীর হাত হইতে কেহই আমাকে পরিত্রাণ করিলেন না।

আমাকে ফাঁকি দিয়া সকলেই লাল-মুক্তা হইয়া বসিলেন। আপনিও কি তাহাই করিবেন ?"

মুণ্ড উত্তর করিল—"ডাকিনীর জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ভাল একটি গল্প বল।"

আমি ভাবিলাম যে,—"পূর্বেই আমি স্থির করিয়াছি যে, ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। একান্তই যদি ডাকিনীর হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাই, তাহা হইলে মায়ের এই খড়্গ দ্বারা আমার মুণ্ড কাটিয়া মায়ের চরণে অর্পণ করিব।"

এইরূপ ভাবিয়া মুণ্ডকে আমি বলিলাম,—"আপনার নিকট এবার আমি চমৎকার একটি গল্প বলিব। ইহা মদন ঘোষের গল্প। মদন ঘোষ নিজে এই গল্পটি বলিতেছেন।"

মুণ্ড বলিল,—"তবে শীঘ্র আরম্ভ করিয়া দাও।"

আমি মদন ঘোষের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

মদন ঘোষের বদনে হাসি

প্রথম অধ্যায় : ভট্টাচার্য্য মহাশয়

আমি মদন ঘোষ। আমার বদনে আপনারা হাসি দেখিতেছেন। নূতন আমার বিবাহ হইয়াছে। সেই জন্য আমার মুখে এত হাসি। কিন্তু তা' বলিয়া আমি বে-পাগলা নই। তবে মনের মত পত্নীলাভ হইলে চিত্ত একটু প্রফুল্ল হয়। আমারও তাই হইয়াছে। তাই হাসি-মুখে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছি—"গুড্ মর্ণিং।"

সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়া লোকে বিদ্যালাভ করে। সে বস্তু আমি কতটুকু লাভ করিয়াছি, তাহা এই গল্পটি পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। তাহা ব্যতীত আমি আর একটি বহুমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছি। দেবীর কৃপায় আমি রাধারাণীকে পাইয়াছি। রাধারাণী আমার গৃহের একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী।

কলিকাতায় যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় আমি বাড়ী যাইতাম। বাড়ী আমাদের বর্দ্ধমান জেলা,—সামান্য একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে। বাড়ী গিয়া ভক্তিভাবে দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করিতাম। বৈকাল বেলা মাঠে গিয়া দাঁড়াগুলি খেলিতাম।

যে বৎসর আমার প্রথম চাকরী হইল, সে বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় আমি দেশে যাইতে পারিলাম না। কলিকাতাতেই সে বৎসর মায়ের শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলাম। সেই সূত্রে আমি রাধারাণীকে লাভ করিলাম।

সে বৎসর প্রাতঃকালে উঠিয়া, আমি আমার দোয়াতটিকে ভাল করিয়া ধুইলাম। পুরাতন নিবগুলি ফেলিয়া, কলমে নূতন নিব পরাইলাম। চারি পয়সা দিয়া একটি সরস্বতী ঠাকুর কিনিয়া আনিলাম। ছোট একখানি চৌকির মাঝখানে ঠাকুরটিকে বসাইয়া, তাঁহার সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে দোয়াত কলম ও পুস্তক সাজাইলাম। শুভ্রবর্ণের ফুল ও পূজার অন্যান্য উপকরণও আহরণ করিলাম।

এ সব আয়োজন করিলাম বটে, কিন্তু পুরোহিতের কি হইবে? কলিকাতায় আমি কখন ক্রিয়াকর্ম্ম করি নাই। সে নিমিত্ত পুরোহিতের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আজ—উপায়?

ভাবিতে ভাবিতে আমার বাসার দ্বারে গলিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের বাসায় আর যত লোক আছেন, পূজা-পাঠের তাঁহারা ধার ধারেন না। নন্দী-ভৃঙ্গীর সন্ধান বরং তাঁহারা জানেন; কিন্তু পুরোহিতের সন্ধান তাঁহারা কিছুই জানেন না। তাই মনে করিলাম যে, পথে যদি সাত্ত্বিক গোছের মানুষ দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরোহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিব।

ভাগ্যে আমার বাসার নিকট দুই তিনখানি খোলার বাড়ী ছিল, তাই আমাকে অধিকক্ষণ আর পথে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। খোলাঘরের লক্ষ্মীগণের সরস্বতীর প্রতি বিদ্বেষ নাই। কার্ত্তিক ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি, সরস্বতী ঠাকুরাণীর প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ ভক্তি। মহাসমারোহের সহিত আজ তাঁহারা দেবীর পূজা করিতেছেন। ঘরের মাঝখানে তাঁহারা একখানি প্রতিমা খাড়া করিয়াছেন। প্রতিমার সম্মুখে বড় একখানি থালা রাখিয়াছেন, সেই থালে ঝমা-ঝম প্রণামী পড়িতেছে।

কলিকাতায় পূজা-করা ব্যবসাটি নিতান্ত মন্দ নহে। বড় পূজার সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনেকে প্রণামী-স্বরূপ এত টাকা আদায় করেন যে, বারো মাস সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের সংসার চলিয়া যায়।

আমি গলির পথে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে নিকটের একখানি খোলার বাড়ী হইতে এক জন ব্রাহ্মণ বাহির হইলেন। বর্ণ তাঁহার কালো নহে ; শ্যামবর্ণ বলিলে যাহা বুঝায়, তাঁহার বর্ণ সেইরূপ ছিল। তাঁহার মুখে বসন্তের দাগ ছিল। কপালে তাঁহার সুদীর্ঘ একটি ফোঁটা ছিল ; গায়ে একখানি নামাবলি ছিল। তিনি যে পুরোহিত, তাঁহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না।

ভক্তিভাবে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। হাত তুলিয়া জয়-অস্তু বলিয়া তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আমার ঘরে গিয়া মায়ের পূজা করিতে তাঁহাকে আমি অনুরোধ করিলাম। আমার কথায় তিনি সম্মত হইলেন। তাঁহার পূজা ও আমার অঞ্জলি প্রদানের পর, আমি তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিলাম। আজ আমার মুখে হাসি দেখিয়া আপনারা কত কি মনে করিতেছেন, কিন্তু সে দিন তাঁহার প্রফুল্ল ডায়মনকাটা মুখখানি যদি দেখিতেন, তাহা হইলে বলিতেন যে, হাঁ! হাসি বটে! তাহার কারণ এই যে, দক্ষিণাটি কিছু আশাতিরিক্ত হইয়াছিল।

সেই প্রফুল্ল বদনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে বলিলেন,—"দেখ, বাপু! আজকালের ছোকরাদের মতি-গতি নিতান্ত মন্দ হইয়াছে। সব সাহেবি ধরণ—সাহেবি মত। কিন্তু তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ধর্ম্মকর্ম্মে তোমার মতি আছে। তোমার নাম কি বাপু?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমার নাম মদনমোহন ঘোষ। আমরা সদ্‌গোপ।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"বাঃ! চমৎকার নামটি। মদনমোহন! অতি সুন্দর নাম।"

আমার নামটি যে ভাল, জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত তাহা আমি জানিতাম। মনে মনে কত আমি আমার নামের গৌরব করিতাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আজ সেই নামের প্রশংসা করিলেন। তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল।

আমার নিবাস কোথায়, আমার পিতা-মাতা বর্ত্তমান আছেন কি না, এইরূপ নানা প্রকার পরিচয় গ্রহণ করিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে দিন বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় পদধূলি প্রদান করিতেন। প্রণামী স্বরূপ টাকা-টা সিকি-টা দিয়া আমি তাঁহার সম্মান করিতাম। ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম যে, পুরোহিতগিরি ব্যতীত তিনি ঘটকালী ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। সে নিমিত্ত আমার যে তখনও বিবাহ হয় নাই, কথায়-বার্ত্তায় তাঁহাকে আমি জানাইলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"এমন সুপাত্র! বিদ্বান্! চাকরে! এখনও বিবাহ হয় নাই!"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। উত্তর আর কি করিব! প্রতিদিন আমি সাবান মাখিয়া স্নান করি। এখন আর আমার পাড়াগেঁয়ে চেহারা নাই। নানারূপ সুগন্ধযুক্ত তৈলে সিক্ত করিয়া, চুলগুলি ফিরাইতে প্রতিদিন আমি আধ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করি। আরসীতে যখন আমি আমার মুখ দেখি, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিলেন, আমিও তাহাই মনে মনে ভাবি। নিজের সুখ্যাতি নিজে করিতে নাই। কিন্তু আপনারা বরং আমার বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, সকলেই বলিবে যে, মদন এক জন সুন্দর পুরুষ বটে। ফল কথা, আমার নাম মদন, আমি কাজেও মদন।

কিছু দিন পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় আমার বাসায় আগমন করিলেন।

সে দিন আসিয়া বলিলেন,—"দেখ, আমি ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘটকালী করি ; তোমাদের জাতির ঘটকালী কখন করি নাই। কিন্তু যে স্থানে আমার বাসা, তাহার ভিতর-বাটী —এক প্রবীণ ভদ্র লোক ভাড়া লইয়াছেন। তিনি তোমাদের জাতি ; উপাধি পাল। পাল মহাশয়কে সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নিবাস শুনিয়াছি, হুগলী জেলায় কোন স্থানে। তাঁহার এক বয়স্থা কন্যা আছে। কন্যাটির বয়ঃক্রম বারো কি তেরো হইবে। তোমাদের জাতিতে এত বড় কন্যা থাকে না। কিন্তু তাহার কারণ আমি কতকটা পাইয়াছি। আমি যে বাড়ীতে থাকি, সেই বাড়ীর নীচের তলায় একটি ঘরে তোমাদের জাতীয় আর এক ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহারও নিবাস হুগলী জেলায়। সকলে তাঁহাকে নিয়োগী মহাশয় বলিয়া ডাকে। তাঁহার পুত্র পীড়িত হইয়াছে। চিকিৎসার নিমিত্ত তাহাকে তিনি কলিকাতায় আনিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি যে, এই পুত্রের সহিত পাল মহাশয়ের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। তাহার পীড়াবশতঃ এখনও বিবাহ হয় নাই। আমার বোধ হয়, এ বিবাহ কখন হইবেও না ; কারণ, নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র কাসরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সকলে তাহার আরোগ্যলাভের আশা করিতেছে। সে জন্য পাল মহাশয়ের নিকট এখন আমি তোমার কথা উত্থাপন করিতে পারি না। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। তুমি গিয়া পাল মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় কর। তাহা করিতে পারিলে, যথা সময়ে এ কাজের অনেক সুবিধা হইবে।"

দ্বিতীয় অধ্যায় : গোঁপ ছাঁটা বিভীষণ

বিবাহের কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উল্লাসে পরিপূর্ণ হইল। কারণ, আমার নাম মদন। প্রাণের কথা আমি খুলিয়া বলিতেছি। সে জন্য আমাকে আপনারা পাগল মনে করিবেন না। বিবাহের সময় আপনাদের বোধ হয়, এইরূপ আনন্দ হইয়া থাকিবে। তবে আপনারা প্রকাশ করেন না, এই যা।

আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলাম,—"পাল মহাশয় প্রবীণ, সঙ্গতিপন্ন, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহার সহিত আমি কিরূপে আলাপ-পরিচয় করিব ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তুমি এক কাজ কর। আমাদের বাড়ীতে তুমি একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেই স্থানে বাস কর। দোতালার অন্দর মহলের দিকে, ঠিক পাল মহাশয়ের ঘরের পার্শ্বে, একটি ঘর খালি আছে। তুমি সেই ঘরটি ভাড়া লও। এক বাড়ীতে বাস করিতে করিতে ক্রমে পাল মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হইবে।"

প্রাতঃকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। আফিস হইতে আসিয়া সেই দিন সন্ধ্যাবেলা আমি তাঁহার বাসায় গমন করিলাম। যে বাড়ীতে তিনি থাকেন, সেই বাড়ীটি আমি দেখিলাম। ইহা দক্ষিণ-দ্বারী চক্-মিলান দোতালা বাড়ী। সম্মুখেই পূজার দালান, তাহাতে এক জন স্বর্ণকার কাজ করে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, একতালার দক্ষিণদিকে যে ঘরটি, তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাস করেন। বামদিকের ঘরটিতে এক জন উৎকলবাসীর মুড়ি-মুড়কির ও তেলে-ভাজা কচুরির দোকান। পূর্বদিকে একখানি ঘরে পীড়িত পুত্র লইয়া নিয়োগী মহাশয় আছেন। একতালায় পশ্চিম দিকে একখানি ঘরে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকেন। তাঁহার কি মোকদ্দমা আছে। সেই মোকদ্দমার কথা একবার জিজ্ঞাসা করিলে আর রক্ষা নাই। দুই ঘণ্টা ধরিয়া তোমাকে তিনি সেই পরিচয় প্রদান করিবেন। তুমি তখন মনে করিবে যে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কি কুকর্ম্ম

করিয়াছি। বাহির-বাটীর উপরের ঘরগুলিতে আফিসের বাবুদের বাসা। কোনও ঘরে এক জন, কোনও ঘরে দুই জন, কোনও ঘরে বা তিন চারি জন বাবু বাস করেন। নীচের তালার অবশিষ্ট ঘরগুলিতে তাঁহাদের রন্ধন হয়। উপরের একটি ঘরে এক জন সামান্য গোছের দালাল থাকেন। কেশব সেন জীবিত থাকিতে তিনি ঘোরতর ব্রাহ্ম ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় তিনি পথে নিশান ধরিয়া যাইতেন। এখন পুনরায় তিনি হিন্দু হইয়াছেন। এখন আর তিনি মুরগী ভক্ষণ করেন না। ভিতর-বাড়ীতে দোতালার পশ্চিম দিকে সারি সারি যে তিনটি ঘর আছে, তাহা ব্যতীত অন্দর মহলে এখন আর অন্য বাসোপযোগী ঘর নাই। বাড়ীটি পুরাতন ও ভগ্ন। ভিতর-বাটীর বাকি সমুদয় ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিকে বাসোপযোগী সেই তিনটি ঘরে পাল মহাশয় একেলা সপরিবারে বাস করেন। তাঁহার পরিবার অধিক নহে, কেবল স্ত্রী ও সেই কন্যা। ভিতর-বাড়ীর দোতালায় যে ঘরে পাল মহাশয় নিজে থাকেন, ঠিক তাহার পার্শ্বে বাহির বাটীতে একটি ঘর খালি আছে। সেই ঘরটি ভাড়া লইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমার ঘরের সম্মুখে বারেণ্ডা আছে। সেই বারেণ্ডা বরাবর পাল মহাশয়ের ঘরের সম্মুখ দিয়া ভিতর-বাটীতে চলিয়া গিয়াছে। ভিতর-বাটী ও বাহির-বাটীর মাঝে এই বারেণ্ডায় একটি দ্বার আছে। এই দ্বার দিয়া বাহির-বাটী হইতে ভিতর-বাটীতে যাইতে পারা যায়। কিন্তু এখন ইহা সর্বদা ভিতরে খিল ও বাহিরে শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধ থাকে। বাড়ীর দক্ষিণে প্রশস্ত রাজপথ, পশ্চিমে একটি গলি। গৃহস্বামীর অবস্থা এক্ষণে মন্দ। সে জন্য বাড়ী ভাড়া দিয়া তিনি কাশীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাড়ীটি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জিম্মায় আছে। ভাড়া আদায় করিয়া প্রতি মাসে তিনি গৃহস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। সে জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ঘরে থাকেন, তাহার ভাড়া তাঁহাকে দিতে হয় না। বাড়ীটির অবস্থা ভালরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। সে নিমিত্ত আমি এই বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে আমি উপরের সেই ঘরটি ভাড়া লইয়া, তাহাতে বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, পাল মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইল না ; তাঁহার কন্যাকেও আমি দেখিতে পাইলাম না। আমার ঘরটি ভিতর-বাটীর ঠিক নিকটেই ছিল ; সে জন্য কখন কখন তাহার কণ্ঠস্বর ও মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। পাল মহাশয় বাড়ীর ভিতর হইতে বড় বাহির হইতেন না ; অন্ততঃ প্রাতঃকালে ও সন্ধার সময় আমি যখন বাড়ীতে থাকিতাম, তখন তাঁহাকে বড় বাহিরে আসিতে দেখিতাম না। দুই দিন কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। একখানি পুস্তক হাতে লইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া তিনি কোথায় গমন করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের অধিক হইবে। তাঁহার মুখ দেখিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি হয় ; কিন্তু মুখখানি অতিশয় বিষণ্ণ। তিনি যেন ঘোর দুঃখে সর্বদাই নিমগ্ন আছেন। হাতে পুস্তক দেখিয়া বুঝিলাম যে, তিনি লেখা-পড়া জানেন। সেই বিষণ্ণবদনে লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া আমি ভাবিলাম যে, যদি কপালে থাকে, তাহা হইলে এ লোকের আমি জামাতা হইব।

কিন্তু আর এক জনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে। সে কিরূপ, তাহা আমাকে দেখিতে হইবে। কিন্তু তাহার পিতা অর্থাৎ নিয়োগী মহাশয়ের ভাব দেখিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল। নিয়োগী মহাশয়ের মুখখানি অনেকটা বিভীষণের মত। মুখের দুই পাশে দুই গাল যেন দম্ভ করিয়া আগে বাড়িতেছে। তাহার মাঝখানে আধ-পাকা আধ-কাঁচা ছাঁটা গোঁপগুলি সব খোঁচা

খোঁচা হইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে, লোকে যে গোঁপ-ছাঁটা বদমায়েশের কথা বলে, ইনি এক জন তাই। সে যাহা হউক, আমি অনেক কৌশল করিয়া তাঁহার পুত্রের সহিত আলাপ করিলাম। তাঁহার পুত্রের মুখমণ্ডলে সুলক্ষণ আমি কিছু দেখিলাম না। পিতার বদমায়েশি ভাব যেন পুত্রের মুখেও প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু রোগে এখন তাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে, মুখ তাহার শুষ্ক ও মলিন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহার জন্য আমার মনে দুঃখ হওয়া উচিত ; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তাহা আমার হয় নাই। তাহার প্রতি বরং আমার হিংসা হইল। আমি এমন সুন্দর পুরুষ,—যাহাকে মনে মনে পত্নীরূপে বরণ করিয়াছি, সে এই মর্কটের হাতে পড়িলেও পড়িতে পারে, সে চিন্তা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। সত্য বটে, সেই সুন্দরীকে আমি এখনও চক্ষেও দেখি নাই কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! তাহার পায়ের চারি-গাছি মলের রুণু রুণু শব্দ সর্বদাই যে আমার কানে লাগিয়া আছে! আফিসে চাবি খোলার শব্দ হয়, আর আমার প্রাণটা ধড়াশ করিয়া উঠে ; আমি ভাবি, এ বুঝি আমার হৃদয়-আসীনা আমার প্রাণদেবীর পদনিঃসৃত সেই কিঙ্কিনীশব্দ। তাহাকে আমি দেখি নাই সত্য ; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিবরণ অবলম্বন করিয়া আমার মানসক্ষেত্রে তাহার চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলাম।

নিয়োগী-পুত্রের পীড়া সংকট ; সর্বদাই সে ঘরের ভিতর শইয়া থাকে ; উঠিয়া বেড়াইবার শক্তি বড় নাই ; তথাপি সে মাঝে মাঝে বাটীর ভিতর গিয়া পাল মহাশয়ের পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করে। পাল মহাশয়ের সহিত নিয়োগী মহাশয়ের বহুদিন ধরিয়া আলাপ-পরিচয় আছে। শুনিলাম যে, দেশে ভূমিসম্পত্তি লইয়া একবার পাল মহাশয়ের কি মকদ্দমা হইয়াছিল। তাহাতে জাল করিয়া ও মিথ্যা সাক্ষীর যোগাড় করিয়া নিয়োগী মহাশয় তাঁহার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। সেই অবধি দুই পরিবারে বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল।০ এই সব কথা শুনিয়া মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়া ভাবিতাম যে, কে হে তুমি মদন ঘোষ! যে পাল মহাশয়ের কন্যার প্রতি কটাক্ষ কর? তবে আশা এই যে, নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বোধ হয়, এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না। সে যাহা হউক, আমি সেই পীড়িত যুবকের নিকট মাঝে মাঝে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতাম। গল্পচ্ছলে পাল মহাশয়ের কথা, তাঁহার পরিবারের কথা, তাঁহার কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। নিয়োগী-পুত্র ভাল করিয়া আমাকে পরিচয় প্রদান করিত না। কথার ছলে আমার সন্দেহ হইল যে, পাল মহাশয়ের সংসারে কোনরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সে কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার নহে। ইতিপূর্বে বন্ধু-বান্ধব ও কুটুম্বদিগের দ্বারা আমি পাল মহাশয়ের বংশ-পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সময় কে এক জন আমাকে বলিয়াছিল যে, পাল মহাশয়ের এক পুত্র আছে। সে পুত্র এখন কোথায়? সে কথার কোন সন্ধান আমি পাইলাম না। নিয়োগী-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে আমার উপর রাগিয়া উঠে।

তৃতীয় অধ্যায় : রাক্ষস না ভূত!

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। পাল মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হইল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সর্বদা আমি সাক্ষাৎ করিতাম। তিনি বলিতেন,—"ব্যস্ত হইও না। নিয়োগীপুত্রের জীবনের আশা থাকিতে তোমার কোন আশা নাই। অপেক্ষা কর, দেখা যাউক, কি হয়।"

আমাদের বাটীর সম্মুখে রাস্তার অপর পারে একখানি মুদির দোকান আছে। একদিন রবিবার বৈকাল বেলা দেখিলাম যে, পাল মহাশয় সেই দোকানে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ সেইরূপ বিষণ্ণ ও চিন্তায় আচ্ছন্ন। একখানি পুস্তক তিনি পাঠ করিতেছিলেন, ও কদাচ কখন কখন এক একবার মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত দুই একটি কথা কহিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি দোকানে প্রবেশ করিয়া যে তক্তোপোষের উপর তিনি বসিয়াছিলেন, তাহার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। কোন দ্রব্য আমার প্রয়োজন আছে কি না, মুদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম,—"না।" তক্তোপোষের উপর আরও তিন ব্যক্তি বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। পাল মহাশয়ের ন্যায় তাঁহারাও প্রবীণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমাকে কোন কথা বলিলেন না। পাল মহাশয় পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া আমার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। আমি যুবক; সামান্য একটা ছোঁড়া বলিলেও হয়; আর তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। তাঁহাদের সহিত প্রথম কথা কহিতে আমি সাহস করিলাম না। তাঁহারা, প্রথম আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম: কিন্তু আমার সহিত কেহ একটিও কথা কহিলেন না। নিরাশ হইয়া সে স্থান হইতে আমি প্রস্থান করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় এক মনে কি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়াছিলাম। তিনি কালীসিংগীর মহাভারতের শান্তি পর্ব পাঠ করিতেছিলেন।

সেই দিনই আমি সেই পুস্তক ক্রয় করিলাম; আর সেই রাত্রি হইতে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলাম। ভিতর-বাটীতে পাল মহাশয়ের ঘর, আর বাহির-বাটীতে আমার ঘর, দুয়ের মাঝখানে কেবল একটি প্রাচীর ব্যবধান ছিল। আমি মনে করিলাম যে, আমার মহাভরাত পাঠের শব্দ প্রাচীর পার হইয়া, পাল মহাশয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইবে। কিন্তু ঠিক বিপরীত ফল হইল। আমার ঘরের সম্মুখে বারেণ্ডা আছে; আর সেই বারেণ্ডার উত্তর-সীমায় বাটীর ভিতর যাইবার জন্য দ্বার আছে। সেই দ্বার সর্বদা বন্ধ থাকে। একদিন রাত্রিকালে আমি যথারীতি উচ্চৈঃস্বরে মহাভারত পাঠ করিতেছি, এমন সময় বাটীর ভিতর দিক হইতে সেই দ্বারে কে ধাক্কা মারিতে লাগিল। মহাভারত পাঠে আমার মন তখন নিমগ্ন ছিল, সুতরাং সে শব্দ প্রথম আমি শুনিতে পাই নাই। ক্রমে ধাক্কার শব্দ বৃদ্ধি হইয়া যখন আমার কণ্ঠ-শব্দকে পরাজয় করিল, তখন সে শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম।

তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া সেই দ্বারের নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা! কে শব্দ করিতেছে!" ভিতর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"একটু ধীরে ধীরে যদি বাপু তুমি পুস্তক পাঠ কর, তাহা হইলে এ বাড়ীতে আমি তিষ্ঠিতে পারি, তা না হইলে আমাকে অন্যত্র পলায়ন করিতে হইবে।"

ঘোরতর অপ্রতিভ হইয়া আস্তে আস্তে পড়িবার নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলাম। অঙ্গীকার করিয়া সে রাত্রিতে যখন লজ্জায় ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়া পুনরায় আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম, তখন যদি আপনারা আমাকে দেখিতেন, তাহা হইলে এই মদনের বদনে আপনারা বিন্দুমাত্রও হাসি পাইতেন না। রাগ করিয়া আমি মহাভারত দূরে নিক্ষেপ করিলাম। সেই দিন হইতে আর সে পুস্তক আমি স্পর্শ করিলাম না।

পাল মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইল না। বরং মহাভারত পাঠের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আমি লাঞ্ছিত হইলাম। গোঁফ ছাটা নিয়োগী মহাশয়

বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া দম্ভের সহিত বিচরণ করেন। তাঁহাকে দেখিতে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়। ডাক্তারগণ আসিয়া তাঁহার পুত্রকে পনর দিনের মধ্যে ভাল করিয়া দিবেন বলিয়া আস্ফালন করে। কিন্তু তাহার কাসি যায় না, জ্বরও কমে না, শরীরে সে বলও পায় না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে ক্রমাগত আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁহার কৃপা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এই ভাবে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল।

ক্রমে চৈত্র মাস পড়িল। তখন নূতন গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। রাত্রিতে সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহার পর পুনরায় নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ চেষ্টা করিলাম; কিছুতেই আর নিদ্রার আবেশ হইল না। শয্যা হইতে উঠিয়া আমি আলো জ্বালাইয়া ঘড়িতে দেখিলাম যে, একটা বাজিয়া গিয়াছে। আমার ঘরের পশ্চিম দিকে দুইটি জানালা ছিল। তাহার একটি জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ঘরের নিম্নেই গলি পথ। গলির ভিতর পাল মহাশয়ের দিকে দূরে একটি গ্যাসের আলো। গলির ওপারে অন্যান্য লোকের বাড়ী। আমরা যে বাটীতে থাকি, তাহার উত্তরে একটি অশ্বত্থ গাছ ছিল। তাহার নিম্নে ষষ্ঠী ঠাকুরের অনেকগুলি নোড়া-নুড়ি ছিল। সেই অশ্বত্থ গাছের ডাল, পাল মহাশয়ের তিনটি ঘরের মধ্যে দুইটি ঘরের ঠিক গায়ে লাগিয়াছিল।

জানালার দিকে দাঁড়াইয়া সহসা আমার সেই গাছের দিকে একবার দৃষ্টি পড়িল। সর্বনাশ! সেই গাছের উপর, নিবিড় শাখা-প্রশাখা ও পত্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, কি একটা জন্তুর মত সেই স্থূল ডালটির উপর আসিয়া বসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষ-শাখার উপর দিয়া সে পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু দূরে গ্যাসের আলোক ছিল, তাই আমি তাহাকে দেখিতে পাইলাম; নতুবা সে অন্ধকার রাত্রিতে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম না। যখন সে আরও অগ্রসর হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, সে কোনরূপ জন্তু নহে। তাহার আকৃতি কতকটা মানুষের মত। মানুষের মত বটে; অথচ তাহাকে মানুষ বলিয়া আমার বোধ হইল না। ঘোড়ার মত তাহার মুখ লম্বা ছিল। মুখের বর্ণ সবুজ। বন্য শূকরের ন্যায় বড় বড় দাঁত। যে স্থানে চক্ষু থাকে, তাহার সেই স্থানে গোল গোল দুইটি গর্ত্ত ছিল। শরীরের নিম্নভাগ মানুষের মত ছিল। কিন্তু সে মানুষ নহে, ভূতও নহে। আমি ভাবিলাম যে, যখন ইহার সবুজ কপালের উপর রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা রহিয়াছে, তখন এ নিশ্চয়ই রাক্ষস। আর, তাহার কি দাড়ি! ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এমন চাপদাড়ি তো কখনও দেখি নাই। গোঁফে ও দাড়িতে তাহার সেই সবুজ লম্বা মুখ-মণ্ডলের অধোদেশটি আবৃত হইয়াছিল। ভয়ে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম, আতঙ্কে স্তম্ভিত হইয়া আমি আর জানালা বন্ধ করিয়া দিতে পারিলাম না, সে স্থান হইতে পলাইতেও পারিলাম না, কি চীৎকার করিতেও পারিলাম না।

আরও অদ্ভুত কথা। সেই রাক্ষসটা ক্রমে অগ্রসর হইয়া পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় অর্থাৎ মাঝের ঘরের জানালার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সেই জানালাতে সে অঙ্গুলি দ্বারা টোকা মারিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল। এইরূপ কিছুক্ষণ অতি ধীরে ধীরে জানালায় শব্দ করিবার পর ভিতর হইতে কে জানালা উদ্ঘাটন করিল, গ্যাসের আলোকে নিমিষের নিমিত্ত আমি তাহার হস্তটি দেখিতে পাইলাম। সেই হাতে সোনার বালা ছিল। মৃণাল সদৃশ সেই কোমল বাহু,—পাল মহাশয়ের বয়স্ক গৃহিণীর নহে, সে হস্ত তাঁহার কন্যার। সবুজ রাক্ষসের সহিত পাল মহাশয়ের কন্যার সম্বন্ধ!

চতুর্থ অধ্যায় : সবুজ রাক্ষস

জানালার ধারে অশ্বত্থ ডালের উপর রাক্ষস বসিয়া রহিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। ভয়ে আমি কাঁপিতে লাগিলাম। চিন্তা-শক্তি একেবারে আমার লোপ পাইয়া গেল। একদৃষ্টে আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

পাল মহাশয়ের কন্যা প্রথম জানালাটি উদ্ঘাটন করিল। তাহার পর আমি শব্দে বুঝিলাম যে, জানালার দুইটি রেল খুলিয়া সে ভিতর দিকে টানিয়া লইল। রেল তুলিয়া রাক্ষসের জন্য সে পথ করিয়া দিল। রাক্ষস জানালা দিয়া, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

রাক্ষস যেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, আর সেই সময়ে আমার একটু জ্ঞানের উদয় হইল। তাড়াতাড়ি আমি আমার জানালাটি বন্ধ করিয়া দিলাম। জানালা বন্ধ করিয়া আরও আমার একটু সাহস হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটি ভয়ের বিষয় আমার মনে উদয় হইল। আমার ঘরের পর পাল মহাশয়ের ঘর ; তাহার পর যে ঘর, সেই ঘরে রাক্ষস প্রবেশ করিয়াছে। দূর অধিক নহে, ভিতর ও বাহির-বাটীর মাঝখানে বারেণ্ডায় সেই একমাত্র দ্বার। সেই পথে আসিয়া রাক্ষস যদি আমাকে খাইয়া যায় ? পাল মহাশয়ের কন্যার সহিত তাহার প্রণয়, কারণ, তাহার ইঙ্গিত-শব্দ শ্রবণ মাত্র জানালা খুলিয়া রেল তুলিয়া, কত কষ্ট করিয়া, তাহাকে সে ঘরে আসিতে দিয়াছে। নিজের প্রণয়িনীকে সে ভক্ষণ করিবে না। প্রণয়িনীর পিতামাতাকেও সে ভক্ষণ করিবে না। থাকিবার মধ্যে নিকটে আছি আমি। যদি সে বলিয়া বসে যে, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু জলযোগ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আর তাহাকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত যদি পাল মহাশয়ের কন্যা আমাকে দেখাইয়া দেয়, ত হা হইলে আমি কি করিব ?

বিবাহের লোভে কেন যে মরিতে এ স্থানে আসিয়াছিলাম ! একবার মনে করিলাম যে, সে বাটী হইতে পলায়ন করি। আর একবার মনে করিলাম যে, চীৎকার করিয়া পাঁচ জনকে আহ্বান করি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম যে, কাজ নাই বাপু ! আর দ্বার খুলিবার শব্দ পাইয়া রাক্ষস চাই কি কুপিত হইতে পারে। রাক্ষসের কোপে পড়িয়া শেষে কি প্রাণটা হারাইব ! আজ হয়, দুই দিন পরে হয়, সুবিধা পাইলেই সে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বিছানায় আমি শুইয়া পড়িলাম। শয়ন করিয়া পাল মহাশয়ের কন্যার কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই বালিকা বয়সে রাক্ষসের সহিত প্রণয় ! ছি ! ভাল কন্যাকে বিবাহ করিতে আমার মন-প্রাণ এত আকুল হইয়াছিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ইহার পর কি হইল, আর আমি কিছুই জানি না।

পরদিন প্রাতঃকালে, দিনের আলোকে আমার অনেকটা সাহস হইল। গত রাত্রির ঘটনা বার বার চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার মনে করিলাম, সে সমুদয় মিথ্যা, স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু ভালরূপে অনুধাবন করিয়া অবশেষে স্থির করিলাম যে, না, সে স্বপ্ন নহে ; সত্য সত্যই আমি এক অপূর্ব জীব দর্শন করিয়াছিলাম ; সে জীব রাক্ষস হউক, আর ভূতই হউক, আর যাহাই হউক। গত রাত্রিতে মনে করিয়াছিলাম যে, এ বাটীতে আর থাকিব না, অন্য স্থানে গিয়া বাসা করিব। কিন্তু প্রাতঃকালে সে কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম। মনে করিলাম যে, ইহার সবিশেষ তত্ত্ব আমাকে লইতে হইবে।

পাল মহাশয়ের বালিকা কন্যা যে সেই কিম্ভূতকিমাকার সবুজ রাক্ষসের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। তাহা ব্যতীত সহসা বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাটীতে বাসা করিলে পাছে রাক্ষসের কোপে আমি পতিত হই, সে আশঙ্কাও আমার মন হইতে দূর হয় নাই।

আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে গমন করিলাম। তাঁহাকে একেলা পাইয়া গত রাত্রির সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট বর্ণন করিলাম। তাঁহার ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে আমি এই বিবরণ প্রদান করিতেছিলাম। আমার কথা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে চক্ষু টিপিলেন। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আমি ঘরের দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, দ্বারের নিকট একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া গোঁপ-ছাটা নিয়োগী সমুদয় কথা শুনিতেছে। আমি যেই ফিরিয়া চাহিলাম, আর তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে সে প্রস্থান করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"নিয়োগী ভাল মানুষ নহে। পাল মহাশয়ের এ বন্ধু, কুটুম্ব ও হববৈবাহিক। তোমার কথা এ শুনিয়া ফেলিল। কাজটা বড় ভাল হইল না।"

তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"বড়ই আশ্চর্য্য কথা তুমি বলিলে। যাহা বলিলে, তাহা সত্য কি স্বপ্ন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।' কিন্তু যখন তাহার বড় বড় দাঁত ও চক্ষুর স্থানে কেবল কোটর, রং সবুজ, আর কপালে লাল ফোঁটা, তখন সে নিশ্চয় রাক্ষস, সামান্য ভূত নহে। আমাদের গ্রামের নিকট একবার এইরূপ একটা রাক্ষস আসিয়াছিল।"

পঞ্চম অধ্যায় : হারাণ সুরের গল্প

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছিল ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—"সে তোমাদের জাতি। তাহার নাম ছিল হারাণ সুর। লোকালয় হইতে কিছু দূরে গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠের ধারে হারাণ সুর আপনার স্ত্রী ও দুইটি শিশু-পুত্র লইয়া বাস করিত। হারাণ সুরের পীড়া হইল। কিছু দিন পীড়া ভোগ করিয়া এক দিন রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইল। শিশু দুইটিকে ছাড়িয়া লোক ডাকিবার নিমিত্ত, তাহার স্ত্রী সে রাত্রি বাহির হইতে সাহস করিল না। শিশু দুইটিকে লইয়া স্বতন্ত্র একটি শয্যাতে শয়ন করিয়া, সে কাঁদিতে লাগিল। যখন ঘোর রাত্রি হইল, তখন কে এক জন বাহিরে আসিয়া ঘরের আগড় ঠেলিতে লাগিল,—'মাসি! আগড় খুলিয়া দাও।' হারাণের স্ত্রী মনে করিল যে, আমার বোন্‌পো তো কেহ নাই ; এ ঘোর রাত্রিতে বিপদের সময় কে আসিয়া ডাকাডাকি করে। সে জন্য প্রথম উত্তর দিল না। কিন্তু বাহিরের সে ব্যক্তি পুনরায় সবলে আগড় ঠেলিয়া বলিল,—'শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, মাসি! মেসোমহাশয়ের পীড়ার কথা শুনিয়া আমি আসিয়াছি। শীঘ্র আগড় খুলিয়া দাও।' —হারাধনের স্ত্রী ভাবিল যে,—দূরসম্পর্কীয় তাহার কোন ভগিনী থাকিতে পারে। কর্ত্তা হয় তো তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে জন্য সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সে শয্যা হইতে উঠিয়া আগড় খুলিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর এক মূর্ত্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে হারাণের পত্নী সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহার বর্ণ সবুজ, তাহার মুখ ও পেট যেন এক একটি জান্না। তাহারও কপালে ফোঁটা ছিল।

সেই জন্য আমার বোধ হয় যে তুমি কাল রাত্রিতে যাহাকে দেখিয়াছিলে, সেও রাক্ষস –ভূত নহে। কারণ, ভূতে ফোঁটা কাটে না, আর তাহাদের রং সবুজ হয় না।"

এত দূর বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। অতি আগ্রহের সহিত আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হারাণ সুরের ঘরে তাহার পর রাক্ষস কি করিল ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া, হারাণ সুরের পত্নীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে ছেলে দুইটির নিকটে গিয়া তাহাদের মাঝখানে শয়ন করিল। ভাগ্যে শীতকাল ; সে জন্য বিছানায় বড় একখানি কাঁথা ছিল। সেই কাঁথা দিয়া ছেলে দুইটিকে সে ঢাকা দিল। নিজেও কাঁথা মুড়ি দিয়া কাঁদিতে ও কাঁপিতে লাগিল।

"রাক্ষস কিন্তু তাহাদিগকে কিছু বলিল না। ঘরের অপর পার্শ্বে যে স্থানে একটি মাদুরের উপর হারাণ সুরের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, রাক্ষস বরাবর সেই স্থানে গিয়া মাদুরের উপর উপবেশন করিল। তাহার পর, মড়াৎ করিয়া হারাণের একটি হাত ভাঙিয়া কড় মড় শব্দে চিবাইতে লাগিল। সে হাতটি সমাপ্ত হইলে পুনরায় আর একটি হাত ভাঙিয়া সেইরূপে ভক্ষণ করিল। হাত দুইটি শেষ হইলে একটি পা ভাঙিয়া খাইতে লাগিল। ঘরের ভিতর ক্রমাগত চপ-চপ চপ-চপ কড়-মড় কড়-মড় শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে শিশু দুইটির নিদ্রাভঙ্গ হইল। গা টিপিয়া মাতা তাহাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করিল। কাঁদিবে কি, চীৎকার করিবে কি, তোমার মত তাহারাও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁথার ফাঁক দিয়া তিন জনে এই ভীষণ ও বীভৎস ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। হারাণের স্ত্রী ভাবিতে লাগিল যে,—স্বামীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাক্ষস যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র ভক্ষণ করিতেছে, তাহাতে আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সমুদায় শরীরটা খাইয়া শেষ করিবে। ইহার পেটটি যেরূপ জালার মত দেখিতেছি, তাহাতে একটি দেহ খাইয়া ইহার পেট ভরিবে না। তখন আমাদের তিন জনকেই হয় তো খাইয়া ফেলিবে। নিজের যাহা হউক, শিশু দুইটিকে যে সে ভক্ষণ করিবে, প্রাণ থাকিতে তাহা তো আমি দেখিতে পারিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া হারাণের স্ত্রী গা টিপিয়া শিশু দুইটিকে উঠিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা উঠিয়া বসিল। তখন সে ছেলে দুইটির হাত ধরিয়া ঘর হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। আগড়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় রাক্ষসের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া, দন্ত কড়মড় করিয়া অতি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'কোথা যাস ?'—হারাণের পত্নী সভয়ে অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিল,—'কোথাও যাই নি, বাবা! ছেলে দুইটি এখনি বিছানা ভিজাইয়া দিবে, সে জন্য তাহাদিগকে একবার বাহিরে লইয়া যাইতেছি।' —রাক্ষস বলিল,—'শীঘ্র আসিস্ !' —হারাণের পত্নী বলিল,—'হাঁ, বাবা, শীঘ্র আসিব।' —এই কথা বলিয়া আগড় খুলিয়া ছেলে দুইটিকে লইয়া, সে ঘর হইতে বাহির হইল। ঊর্দ্ধশ্বাসে তিন জনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া, এক প্রতিবেশীর গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল। প্রতিবাসী-দিগের নিকট সকল বিবরণ প্রকাশ করিল। কিন্তু সে রাত্রিতে রাক্ষসের সম্মুখে যাইতে কেহই সাহস করিল না। পরদিন প্রাতঃকালে অনেক লোক একত্র হইয়া লাঠি সোঁঠা লইয়া হারাণের গৃহে গিয়া দেখিল যে, সে রাক্ষস নাই, হারাণের দেহও নাই, কেবল দুই চারিখানি অতি ক্ষুদ্র হাড়ের কুচি ঘরের ভিতর মাদুরের উপর পড়িয়া আছে। সমুদয় দেহটি ভক্ষণ করিয়া, রাক্ষস প্রস্থান করিয়াছে।"

ষষ্ঠ অধ্যায় : পত্রের অর্থ

এই গল্প শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি বলিলাম,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আর আমি এ বাটীতে থাকিব না। গত রাত্রিতে রাক্ষসের বোধ হয় ক্ষুধা ছিল না, তাই আমার প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার যে দিন সে আসিবে, সে দিন যদি তাহার ক্ষুধা থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? নিকটে পাইয়া নিশ্চয় সে আমাকেই খাইবে। অতএব অদ্যই আমি এ বাসা হইতে উঠিয়া যাইব। প্রাণটা থাকিলে অনেক কন্যা জুটিবে, অনেক বিবাহ হইবে। পাল মহাশয়ের কন্যায় আর আমার প্রয়োজন নাই।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"তুমি ইংরেজী পড়িয়াছ। ইংরেজী পড়িয়া ভূত প্রেত রাক্ষসে এত তোমার ভয় কেন? এ কলিকাতা সহর। আমি অনেক দিন কলিকাতায় আছি। এ স্থানে কখনও রাক্ষসের উপদ্রব হইতে শুনি নাই। কলিকাতা সহরে একটি মানুষকেও কখনও রাক্ষসে খায় নাই। তোমার কোন ভয় নাই। ব্যস্ত হইও না। দেখ না কি হয়। রাত্রিতে একটু সতর্ক থাকিবে। রাক্ষস যদি পুনরায় আগমন করে, তাহা হইলে আমাকে বলিবে। আজ আমি তোমাকে রাম-কবচ লিখিয়া দিব। তাহা ধারণ করিলে, আর তোমার কোন ভয় থাকিবে না।"

রাম-কবচ ধারণ করিয়া আমার ভয় দূর হইল। সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া, অন্য স্থানে আমি আর গমন করিলাম না। তাহার পর দুই রাত্রি আমি একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে জানালা খুলিয়া, অশ্বত্থ গাছের দিকে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আর রাক্ষস দেখিতে পাইলাম না। তৃতীয় দিনে আফিস হইতে আসিয়া বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া আমার ঘরের তালা খুলিতেছি, এমন সময় বাড়ীর ভিতর যাইবার যে দ্বার সর্ব্বদা বন্ধ থাকে, পাল মহাশয়ের দিক হইতে সে দ্বারে কে ধাক্কা মারিল, আর তৎক্ষণাৎ কপাটের ফাঁক দিয়া আমার দিকে কে এক খণ্ড কাগজ ফেলিয়া দিল। তাড়াতাড়ি আমি কাগজখানি কুড়াইয়া লইলাম। তাহার পর ঘরের ভিতর গিয়া, তক্তপোষের উপর বসিয়া, তাহা আমি পাঠ করিলাম। কাগজখানিতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"মহাশয়! আমাদের বিষয়ে আপনি লোককে কোন কথা বলিয়াছেন। লোকের কাছে এরূপ গল্প করিলে আমাদের মন্দ হইবে। এরূপ গল্প আর করিবেন না। আমাদের এই উপকার করিবেন।"

কাগজখানিতে কাহারও নাম স্বাক্ষর ছিল না। কিন্তু হাতের লেখা নিতান্ত কাঁচা। তাহা দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, এ লেখা পাল মহাশয়ের কন্যার। তাহার পত্র পাইয়া আমি রাক্ষসের কথা সব ভুলিয়া যাইলাম। কাগজে লেখা আছে,—"আমাদের এই উপকার করিবেন।" ইহার অর্থ কি? পাল মহাশয়ের কন্যা দ্বারের ফাঁক দিয়া আমাকে দেখিয়া থাকিবে। আমার রূপ দেখিয়া সে মোহিত হইয়াছে, আমার উপর সে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। ঐ চারিটি কথার ইহা ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। উপকার! আমাকে ভালবাসে, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত সে লালায়িত হইয়াছে। সামান্য ঐ "উপকার" কথাটির ভিতর যে এত অর্থ নিহিত আছে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের দুই জনের মন-প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে, সে জন্য তাহার মনের ভাব আমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম।

পুলকে পুলকিত হইয়া কাগজখানি আমি একবার মাথায় রাখিলাম। তাহার অর্থ এই যে, "হে সুন্দরি! তোমার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য্য করিলাম।" তার পর

তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া কাগজখানি আমি বুকের উপর রাখিলাম। তাহার অর্থ এই যে, "হে বরাননে! তোমার পত্র স্পর্শে আমার উত্তাপিত হৃৎপিণ্ড সুশীতল হইল।"

সাধে কি পিতা-মাতা আমার নাম মদন রাখিয়াছেন! মদন না হইলে এত ভাবুক আর কেহ হইতে পারে না। কিন্তু এমন সুখের সময় পোড়া রাক্ষসের কথা পুনরায় আমার মনে পড়িল। যাহার পায়ে আমি প্রাণ সঁপিয়াছি, কদাকার দুরন্ত রাক্ষসের সহিত তাহার যে ভাব, সেই চিন্তায় আমার হৃদয় জর জর হইল। তাহার পর যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতি দেব-যোনি-ভুক্ত জীবগণ অন্তর্য্যামী হইয়া থাকে। আমার মনের কথা যদি সেই রাক্ষস জানিতে পারে? কুপিত হইয়া রাত্রিকালে আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যদি হারাণ সুরের ন্যায় কড়মড় করিয়া আমাকে ভক্ষণ করে? প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে যদি দেখে যে, মদনের আর চিহ্ন মাত্র নাই, বিছানার উপর কেবল দুই তিন কুচি হাড় পড়িয়া আছে?

ভয়ের কথা বটে। কিন্তু চিরকাল হইতে আমি সাহসী পুরুষ; তাহাতে রাম-কবচ ধারণ করিয়াছি। নানারূপ প্রবোধ দিয়া মন হইতে আমি রাক্ষসকে দূর করিলাম। আমি ভাবিলাম যে, পাল মহাশয়ের কন্যার ন্যায় শান্ত সুশীলা রূপবতী গুণবতী কামিনী রাক্ষসের সহিত প্রণয় করিতে পারে না। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে আমাকে ঘোরতর ভালবাসিয়া আমার নিকট উপকারের প্রার্থনা করিত না। প্রকৃত আমি রাক্ষস দেখি নাই, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আর যদিও প্রকৃত সে রাক্ষস হয়, তাহা হইলে পাল মহাশয়ের নিকট অন্য কোন কাজে সে আসিয়া থাকিবে। কলিকাতা সহরে জনাকীর্ণ পথে দিনের বেলা গাড়ী করিয়া অথবা পদব্রজে রাক্ষস আসিতে পারে না। সে জন্য রাত্রিকালে গোপন ভাবে আসিয়াছিল। শুনিয়াছি যে, সহরের ভিতর উট কি হাতী আসিবার হুকুম নাই। রাক্ষস আসিবারও বোধ হয়, হুকুম নাই।

এইরূপ নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া মন হইতে কুচিন্তা দূর করিলাম। পাল-কন্যার কল্পিত মুখচন্দ্রের বিমল জ্যোতি দ্বারা আমার তাপিত হৃদয় আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিতে লাগিলাম।

সপ্তম অধ্যায় : মদনের বদনে অম্বলের বড়ি

দুই দিন পরে অপরাহ্নে আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আমি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছি, এমন সময় দ্বারের নিকট পাল মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বাহিরে যাইতেছিলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া পাল মহাশয় দাঁড়াইলেন। তাহার পর, আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার ঘরের পার্শ্বে তুমিই বাসা লইয়াছ?"

স্বয়ং পাল মহাশয় আমার সহিত কথা কহিলেন! হৃদয়-মন্দিরে যে দেবীকে স্থাপিত করিয়া অহরহঃ পূজা করি, সেই দেবীর পিতা আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন! শরীর আমার শিহরিয়া উঠিল, মন আমার পুলকিত হইল, বুক আমার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম,—"মদন! প্রাতঃকালে আজ কাহার মুখ তুমি দেখিয়াছিলে?"

অতি বিনীত ভাবে আমি উত্তর করিলাম,—"আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়। আমিই আপনার ঘরের পার্শ্বে বাস করি।"

পাল মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"তুমি অতি উত্তম মহাভারত পাঠ করিতে পার। তবে কি জান, দূর হইতে আমি বুঝিতে পারি না, কেবল শব্দ পাই, এই মাত্র। বৃথা শব্দ শুনিয়া কি হইবে, সেই জন্য ধীরে ধীরে পড়িতে বলিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর যদি তোমার অবকাশ থাকে, আর আমার ঘরে আসিয়া যদি তুমি পাঠ কর, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করি।"

আগ্রহের সহিত আমি উত্তর করিলাম,—"সন্ধ্যার পর আমার কোন কাজ নাই। আপনি ডাকিলেই আমি আপনার ঘরে গিয়া মহাভারত পাঠ করিতে পারি।"

পাল মহাশয় বলিলেন যে,—"তবে আজ সন্ধ্যাবেলা আমি তোমাকে ডাকিব। এক ঘণ্টাকাল তোমার নিকট আমি মহাভারত শ্রবণ করিব।"

সন্ধ্যার পর পাল মহাশয় সেই বারেণ্ডার দ্বারে ধাক্কা মারিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার ঘরে গিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মহাভারত পাঠ করিলাম। আমার কণ্ঠস্বর অতি মধুর, তাহার উপর আমি সুর করিয়া পড়িতে পারি। নিজে পাঠ করিয়া আমি নিজেই মোহিত হই। কিন্তু পাল মহাশয়ের বোধ হয়, সঙ্গীত-বিদ্যায় অধিকার নাই। তিনি বলিলেন,—"এ কাশীদাসী মহাভারত অথবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নহে। সুর করিয়া পড়িতে হইবে না, সহজ ভাষায় পাঠ কর।" যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তাহাই করিতে লাগিলাম।

এইরূপ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আমি তাঁহার নিকট মহাভারত পাঠ করিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রবিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া, অতি আদরে তিনি আমাকে ভোজন করাইলেন।

প্রথম দুই চারি দিন আমি তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাই নাই। পাল মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণনয়নে আমি চারিদিকে চাহিয়া থাকিতাম; তাহার মলের শব্দ অথবা কণ্ঠ-স্বর শুনিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণ কর্ণে সর্বদাই আমি সতর্ক থাকিতাম। যে দিন আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেই রবিবারে আমার বাসনা পূর্ণ হইল। এক জন ঠিকা ঝি ব্যতীত পাল মহাশয়ের অন্য দাসদাসী ছিল না। প্রাতঃকালে দুই একঘণ্টা,—অপরাহ্নে দুই এক ঘণ্টা, কাজ করিয়া সে ঝি আপনার গৃহে চলিয়া যাইত। আমি ও পাল মহাশয় যখন ভোজন করিতে বসিলাম, ঝি তখন উপস্থিত ছিল না। আহার করিতে বসিয়া আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, সে সমুদয় পাল মহাশয়ের কন্যা আনিয়া দিল। সেই দিন তাহাকে দর্শন করিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।

নিশ্চয় নয়ন সার্থক হইল। তাহাকে দেখিলে কাহার না নয়ন সার্থক হয়? কেমন মাজা-মাজা উজ্জ্বল রং! কেমন নরম নরম গোল-গোল গায়ের গড়ন! চাঁদের মত মুখখানি বটে, কিন্তু চাঁদ যেরূপ চাকার ন্যায় গোল, সেরূপ গোল নহে। চাঁদের মুখে অলকা-তিলকা আছে, ইহার তাহা নাই। নাকটি শুক-চঞ্চুর ন্যায় বটে, কিন্তু সেইরূপ বঁড়শীর ন্যায় বক্র নহে। চক্ষু দুইটি মৃগ-নয়নের মত বটে, কিন্তু সেরূপ ড্যাব-ডেবে নহে। বাহু দুইটি মৃণালের মত বটে, কিন্তু ততটা সরু নহে। উরুদ্বয় রাম-রম্ভাকে পরাজয় করে বটে, কিন্তু তত মোটা নহে। ফল কথা, কালিদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদিগের রূপ-বর্ণনা পাঠ করিয়া যেরূপ মুখশ্রী আমি মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নহে। তাহার মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক মানুষের মত; কবি-কল্পিত কোনরূপ অলৌকিক অদ্ভূত জীবের ন্যায় নহে। তাহাকে দেখিয়া আপনাদের দাসানুদাস মদনের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। প্রথমে শাকের ঘণ্ট না খাইয়া, প্রথমে অম্বলের বড়ি মদন বদনে দিয়া বসিলেন।

অষ্টম অধ্যায় : মেদো চাঁড়াল ও পঞ্চু বাবু

পাল মহাশয়ের সহিত এইরূপে আমার আলাপ পরিচয় হইল। দিন দিন তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার কন্যার রূপে গুণে আমার মন মোহিত হইয়া গেল। কি করিয়া তাহাকে পাইব, কেবল সেই চিন্তায় আমি দিনপাত করিতে লাগিলাম। রাক্ষসকে আর আমি দেখিতে পাই নাই। সে রাত্রির ঘটনা স্বপনের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া ক্রমে আমার প্রতীতি হইল।

কিছু দিন গত হইলে, পাল মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি অনুরোধ করিলাম। তখন বৈশাখ মাস। ফল দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয়ের গৃহিণী এক দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বাটীর ভিতর ডাকিলেন। ফল গ্রহণ করিয়া, কিছুক্ষণের নিমিত্ত তিনি পাল মহাশয়ের নিকট বসিলেন। সেই অবসরে তিনি আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। পাল মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যা বেলা ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া, সে সমুদয় বিবরণ প্রদান করিলেন। পাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল,—

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাল মহাশয়কে বলিলেন,—"নিয়োগী মহাশয়ের পুত্রের পীড়া ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এ যাত্রা সে আর রক্ষা পাইবে না।"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ! পীড়া বড়ই কঠিন হইয়াছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি যে, আপনার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। এ যাত্রা সে রক্ষা পাইলেও, কাস রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কন্যা-সম্প্রদান শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমি তাহা জানি। কিন্তু কি করিব! আমার কন্যা যখন ছয় মাসের, তখন হইতে নিয়োগীর সহিত আমার কথা হইয়াছে। তাহার এই ঘোর বিপদের সময় কোন কথা আমি বলিতে পারি না। নিয়োগীর সহিত বিবাদ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না। নিয়োগী-পুত্রের শরীর দিন দিন যেরূপ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই বোধ হয়, আমি আমার প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইব। তবে সে কথা এখন আর বৃথা তুলিয়া প্রয়োজন কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অন্য কোন স্থানে পাত্র স্থির করিয়াছেন?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"না, এখনও কোন স্থানে স্থির করিতে পারি নাই; তবে গোপনে অনুসন্ধান করিতেছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"আপনার ঘরের নিকট মদনমোহন বলিয়া ঐ যে ছোকরা থাকে, তাহার সহিত দিলে হয় না? ছোকরা শান্ত, সচ্চরিত্র, লেখা-পড়া জানে, দু-পয়সা উপার্জ্জনও করিতেছে।"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"কিছুতেই নয়! সে আমাদের স্বজাতি শুনিয়া আমিও প্রথম সেইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু গোপনে তাহার সমুদয় সন্ধান লইয়া এখন সে ইচ্ছা আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমরা লেখা-পড়া-জানা চাক্‌রে ভদ্র সদ্‌গোপ। মদনের বাপ স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিত। অতি কষ্টে সে ছেলেটিকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়াছে। চাষ করা যে নিতান্ত গর্হিত কাজ, লেখা-পড়া শিখিয়া মদন তাহা বুঝিয়াছে। সে জন্য বাপকে এখন সে একখানি মুদিখানার দোকান করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়!

পূর্বের কলঙ্ক ঘুচিবার নহে। আমি চাকুরে সদ্‌গোপ হইয়া, চাষী সদ্‌গোপের সহিত কন্যার বিবাহ কি করিয়া দিব ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বহস্তে চাষ করা কি নিতান্ত অন্যায় কাজ ?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আপনি নিজেই কেন বুঝিয়া দেখুন না ? চাষ করিলে মানুষ চাষা হয়, আর চাকরিতে মানুষ বাবু হয়। তাহার যত টাকা থাকুক না কেন, আপনার নিকট এক জন চাষা আসিলে নাক সিট্‌কাইয়া আপনি তাহার সহিত কথা কহিবেন না। কিন্তু সেইজাতীয় কোন লোক যদি চাকুরে হয়, তাহা হইলে, 'আসুন, আসুন, বাবু আসুন' বলিয়া আপনি তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইবেন। কেবল আপনি নহেন, দেশের সকল লোকেই এইরূপ করিয়া থাকে। আমাদের গ্রামে দুই জন চাঁড়াল আছে—এক জনের নাম মাধব আর এক জনের নাম পঞ্চু। দুই জনে একসঙ্গে পাঠশালায় লিখিয়াছিল। আলু, আম ও পাটের চাষ করিয়া মাধব বিলক্ষণ দু-পয়সা সঙ্গতি করিয়াছে। কিন্তু সে নিজে হাতে কোদালি-কুঠারি ধরিয়া পরিশ্রম করে। সে জন্য সকলে তাহাকে মাধব না বলিয়া মেদো চাঁড়াল বলে। পঞ্চু একটু ইংরেজী শিখিয়া পনর টাকা বেতনে রেলে টিকিট কাটা কাজ পাইয়াছে ; সে জন্য সকলে তাহাকে পঞ্চু বাবু বলে। চাকুরি না করিয়া সে যদি চাষের কাজ করিত, তাহা হইলে কেহ তাহাকে পঞ্চু বাবু বলিত না, সকলেই তাহাকে পেঁচো চাঁড়াল বলিত। এই জন্য হাড়ি বাগ্দী সকলেই আপন পুত্রদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়া, চাকুরে করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাহার না ইচ্ছা যে, তাহার ছেলে জেণ্টলম্যান হয় ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"সত্য বটে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা চিরকাল পুরুষ-পুরুষানুক্রমে অধ্যাপক পণ্ডিতের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাও এক্ষণে পুত্রদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়া জেণ্টলমান করিতেছেন।"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"আমাদের মধ্যে যেরূপ ভদ্র সদ্‌গোপ ও চাষী সদ্‌গোপ আছে, আপনাদের মধ্যেও সেইরূপ ভদ্র ও চাষী ব্রাহ্মণ আছে। হলধারী ব্রাহ্মণদিগকে বামন বলে ; বেহার অঞ্চলে তাহারা বাস করে। ভাল ব্রাহ্মণগণ যেরূপ তাহাদের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ চাষী সদ্‌গোপকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে বসিয়া, তাঁহার মুখ হইতে আমি এই সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিতেছিলাম। পাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি একেবারে বসিয়া পড়িলাম। সত্য বটে, আমার পিতা স্বহস্তে চাষ করিতেন। আর এ কথাও সত্য যে, চাষ ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকে মুদিখানার দোকান করিয়া দিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, চাষের কলঙ্ক দূর হইয়াছে ; আমরা এক্ষণে বাবু হইয়াছি। কিন্তু পাল মহাশয় গোপনে গোপনে এত সন্ধান লইবেন, তাহা আমি কি করিয়া জানিব। যাহা হউক, তাঁহার কন্যাকে লাভ করা সম্বন্ধে আমি এক্ষণে হতাশ হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তুমি হতাশ হইও না। শাস্ত্র হইতে বচন বাহির করিয়া পাল মহাশয়কে আমি বুঝাইয়া দিব যে, সকল সদ্‌গোপ একজাতি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শাস্ত্র হইতে এরূপ বচন বাহির করিতে পারিবেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমাদের শাস্ত্র মহাসাগর স্বরূপ। এমন জিনিস নাই, যা ইহার ভিতর হইতে বাহির হয় না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিলেন। তাহার অর্থ এই যে, সব টাকার খেলা! টাকা দিলে শাস্ত্রের ভিতর হইতে যাহা ইচ্ছা তাহাই বাহির করিয়া দিতে পারা যায়।

এই সময় বাহিরে একটু কাসির শব্দ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু চমকিত হইয়া বলিলেন,—"এঃ! গোঁপছাঁটা নিয়োগী আড়ালে দাঁড়াইয়া, আমাদের কথা শুনিতেছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে নিয়োগী মহাশয় আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"কি ঠাকুর! সকল সদ্‌গোপ একজাতি? তাহাদের মধ্যে ইতর-ভদ্র নাই?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ! আমার মত তাই। সকল সদ্‌গোপ একজাতি। চাষ ছাড়িয়া দিলেও সে সদ্‌গোপ থাকে, অন্য জাতি হয় না। তাহা ব্যতীত তোমরা সকলেই ব্রহ্মার পা হইতে বাহির হইয়াছ।"

নিয়োগী বলিলেন,—"আমরা ব্রহ্মার পা হইতে বাহির হইয়াছি? আর তে মরা?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য জাতি বিষয়ে তিনি নানারূপ প্রশ্ন করিলেন। যথাসাধ্য আমি সেই সমুদয় তর্কের উত্তর দিলাম। অবশেষে যখন দেখিলাম যে, তাঁহার ক্রোধ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে ও তিনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, তখন সে স্থান হইতে আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। যাইবার সময় নিয়োগী আমাকে বলিলেন,—"পালের কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে! বামন হইয়া চাঁদে হাত! পাল অন্য স্থানে বর খুঁজিতেছে! বটে! তোমার পালকেও আমি দেখিয়া লইব। রাত্রিতে জানালা দিয়া ঘরে রাক্ষস আসে? বটে? পালকে বলিও যে, রাক্ষসের উপর খোক্কোশ আছে।"

নবম অধ্যায়ঃ আবার সেই সবুজ রাক্ষস

এই কথা বলিয়া নিয়োগী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমিও আমার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনোদুঃখে সে রাত্রিতে আমি আর আহার করিলাম না। সে রাত্রি পাল মহাশয়ের নিকট মহাভারত পাঠ করিতেও যাইলাম না। ফল কথা, সেই দিন হইতে মহাভারত পাঠে আমার অরুচি জন্মিয়া গেল। পাল মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা,—তাঁহার গৃহে যাতায়াতও সেই দিন হইতে আমার অনেক কমিয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদিন রাত্রিকালে আমি শয়ন করিয়া আছি। অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত আছি। বাহির-বাটীতে আমার ঘর, আর ভিতর-বাটীতে পাল মহাশয়ের ঘর,—এই দুই ঘরের মাঝখানে যে দেয়াল, সেই দেয়ালের ঠিক গায়ে আমার বিছানা ছিল। সহসা পাল মহাশয়ের দিক্ হইতে সেই দেয়ালের গায়ে গুপ গুপ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শুইয়া শুইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে শব্দ করে?"

তাঁহার ঘর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে এস। বিশেষ প্রয়োজন আছে। গোল করিও না।"

আমি উঠিয়া প্রথমে ঘড়িতে দেখিলাম যে, রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, দ্বার খুলিয়া আমি বারেণ্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয়ও সেই সময় আপনার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, বারেণ্ডার দ্বারের খিল খুলিলেন। আমার দিকে সেই দ্বার শৃংখল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। পাল মহাশয় আমাকে সেই শৃংখল খুলিতে বলিলেন। আমি শৃংখল খুলিলাম। ভিতর-বাটী এবং বাহির-বাটী এক হইয়া গেল। এই সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে, লাঠি ধরিয়া কে এক জন অতি ধীরে ধীরে পাল মহাশয়ের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিতেছে, আর প্রদীপ হাতে লইয়া পাল মহাশয়ের গৃহিণী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। ভালরূপে দেখিয়া আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে নিয়োগীর পীড়িত পুত্র। শয্যাশায়ী মরণাপন্ন রোগী এত রাত্রিতে কেন সে স্থানে আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম।

পাল মহাশয় চুপি চুপি আমাকে বলিলেন,—"আস্তে আস্তে কথা কহিও। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার ঘরের ভিতর এস। তাহার পর সকল কথা তোমাকে বলিব।"

পাল মহাশয়ের আজ্ঞায় বারেণ্ডার দ্বারে খিল দিয়া, নিঃশব্দে আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পাঁচ ছয় পা গিয়াই পাল মহাশয়ের ঘরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়,—সর্বনাশ! চাহিয়া দেখি না তাঁহার ঘরের ভিতর সেই রাক্ষস! ঘরের মাঝখানে মাদুরের উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া রাক্ষস মহাশয় গট্ হইয়া বসিয়া আছেন! আরও আশ্চর্য্য কথা! লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া, পাল মহাশয়ের কন্যা সেই মাদুরের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে!

ভয়ে আমার পা থর থর কাঁপিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, আর কিছু নয়, পাল মহাশয় এই রাক্ষসকে আপনার জামাতা করিয়াছেন। জল-খাবার স্বরূপ আমার দেহটি তাহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত এই ঘোর রাত্রিতে তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। মহাভারত পাঠ করাইয়া, নিমন্ত্রণ করিয়া, অনেক দিন হইতে তিনি ইহার যোগাড় করিতেছেন। আমার প্রতি কেন যে তিনি এত কৃপা করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এখন আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি আরও ভাবিলাম যে, নিয়োগীদিগেরও ইহাতে যোগ আছে। তা না হইলে, যে লোক বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, সে কেন এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় এ স্থানে আসিবে! যাহা হউক, আমি তাঁহার ঘরের ভিতর আর প্রবেশ করিলাম না। প্রাণ লইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন,—"কোথা যাও!"

আমি তাঁহার পায়ে পড়িলাম। তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া আমি বলিলাম,—"আমি একেলা মায়ের একেলা ছেলে! দোহাই আপনার!"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"সে আবার কি!"

আমি বলিলাম,—"দোহাই আপনার। আপনার উনি জামাতা, উনি বোধ হয় বিভীষণের প্রপৌত্র। উনি দেবতা। আমাকে খাইয়া উনি সুখ পাইবেন না। উনি বরং আসিয়া টিপিয়া দেখুন, আমার গায়ে মাংস নাই, আমার গায়ে সব হাড়!"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"এ বলে কি!"

এই সময় গঙ্গদত্তর কথা আমার মনে পড়িল। আমি বলিলাম,—"আমাকে ছাড়িয়া দিন। রাক্ষস মহাশয়ের নিমিত্ত আমি ভাল মোটা তাজা মানুষ ডাকিয়া

জানিতেছি। তাহার কোমল মাংস ভক্ষণ করিয়া, রাক্ষস মহাশয় পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। জামাতার আদর করিয়া, আপনিও সন্তোষ লাভ করিবেন; আমাকে খাইয়া তাঁহার সুখ হইবে না। এ চাষার মাংস। স্বহস্তে আমরা চাষ করি। আমাদের মাংস শুষ্ক ও কঠিন,—ঠিক দড়ির মত। দোহাই আপনার!"

এত বিনয় বচনে আমি প্রাণ-ভিক্ষা চাহিলাম, তথাপি পাল মহাশয়ের দয়া হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া যেমন এক দিকে তাঁহার হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তেমনি অন্য দিকে লোক জড় করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে উদ্যত হইলাম। "কর কি!" এই কথা বলিয়া পাল মহাশয় আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। আর সেই সময় রাক্ষস উঠিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। নিমেষের মধ্যে সে আমাকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইল; তাহার পর, সে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। এক বার, আমাদের গ্রামে, কাজি বুড়ীর ধামা-ঢাকা বীজ মোরগ রাত্রিকালে আমি চুরি করিয়া খাইয়াছিলাম। জবাই করিবার সময়, আমার হাতে সেই মোরগ যেরূপ ঝট্‌পট্‌ করিয়াছিল, আজ রাক্ষসের হাতেও আমি সেইরূপ ঝট্‌পট্‌ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে হইল রাক্ষস, আর আমি হইলাম মানুষ। তাহার হাত হইতে আমি আপনাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। তাহার স্পর্শে আমার হাত পা অবশ হইয়া গেল। ক্রমে আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কম্পজ্বরের ন্যায় শরীর আমার কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁত লাগিয়া ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। আমি অচেতনপ্রায় হইলাম, আমার কণ্ঠ হইতে কেবল গোঁ গোঁ ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণভাবে আমি অজ্ঞান হই নাই, কারণ, তখনও আমি ভাবিতেছিলাম যে,—"হায় রে! শেষে রাক্ষসের আহার হইব বলিয়া কি বাপ-মা আমাকে এত বড় করিয়াছিলেন!"

দশম অধ্যায় ঃ আমার সাহস ও বিক্রম

কাজি বুড়ীর সেই বীজ মোরগের মত ঝট্‌পট্‌ করিতে করিতে, শরীর আমার অবশ হইয়া পড়িল। অবশেষে আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধহয়, অধিক্ষণ নহে। পুনরায় আমার জ্ঞান হইলে, চক্ষু চাহিয়া আমি দেখিলাম যে, মাদুরের উপর আমি শয়ন করিয়া আছি। পাল মহাশয়ের গৃহিণী আঁচল দিয়া আমার কপাল মুছাইতেছেন। তাঁহার কন্যা আমাকে বাতাস করিতেছে। নিকটে ঊনিশ কুড়ি বৎসর বয়স্ক এক সুশ্রী যুবক বসিয়া আছে। আর কিছু দূরে পাল মহাশয় নিজে বাক্সর ভিতর একটি শিশি তুলিয়া রাখিতেছেন। আমি তখন কোথায় আছি, প্রথম তাহা আমার স্মরণ হইল না। ক্রমে সকল কথা স্মরণ হইল। সভয় নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কিন্তু রাক্ষসকে সে ঘরে আর দেখিতে পাইলাম না।

আমাকে চেতন করিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় শিশি হইতে কি ঔষধ দিয়াছিলেন। সেই শিশি পুনরায় তিনি বাক্সর ভিতর তুলিয়া রাখিতেছিলেন। আমার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া, তিনি আমার নিকট আসিলেন।

তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী সেই সময় সে স্থান হইতে সরিয়া বসিলেন। আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"রা—রা—রা?"

সমুদয় প্রশ্নটি স্পষ্টরূপে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে রাক্ষস মহাশয় এখন কোথায়, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তোমাকে আর কি বলিব! তুমি মানুষ কি, কি,

তাহাই আমি বুঝিতে পারি না। রাক্ষস আবার কোথায়? আমার এত বয়স হইয়াছে; কিন্তু রাক্ষস আমি কখনও দেখি নাই। ইনি আমার পুত্র। বিপদে পড়িয়া আমার পুত্রকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। এই সে পরচুলের দাড়ি, গোঁপ, আর এই সে মুখস,—যাহা দেখিয়া তুমি এত ভয় পাইয়াছিলে।"

এই কথা বলিয়া, পাল মহাশয় প্রথম আমায় সেই সুশ্রী যুবককে দেখাইলেন, আর তাহার পর সেই পরচুল ও মুখস দেখাইলেন।

নিজের বড়াই করিতে নাই; কিন্তু স্বভাবতঃ আমি যে একজন সাহসী পুরুষ, সে পরিচয় বোধ হয়, আর আপনাদিগকে দিতে হইবে না। প্রকৃত রাক্ষস না হউক, রাক্ষসের মত তো বটে! সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের হাতে পড়িয়াও আমি ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাই আমার সাহসের যথেষ্ট পরিচয়। আপনারা হইলে ভয়ে হয় তো কত কি করিয়া ফেলিতেন। তাহার পর বলিলে হয় তো আপনারা বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু সত্য বলিতেছি যে, কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, রাক্ষসের মুখস আমি টিপিয়া দেখিলাম,—স্বচ্ছন্দে হাতে করিয়া টিপিয়া দেখিলাম। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, আমার কত সাহস!

যখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে বস্তুটা মুখস বটে; রাক্ষসের মুণ্ড বা অন্য কোন ভয়াবহ পদার্থ নহে, তখন আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিয়া আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি জন্য আপনার পুত্রকে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে? আর কেনই বা ইহাঁকে অশ্বত্থগাছ-পথে যাতায়াত করিতে হয়?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,— "সে অনেক কথা। বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিবার সময় নাই। আপাততঃ আমরা ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। শীঘ্র তাহার প্রতিকার না করিতে পারিলে, আমাদের সর্বনাশ হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিপদ কোথা হইতে আসিবে?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমার পুত্রের নাম মিহির। মিহির এক খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে সে ঘটনা ঘটিয়াছে। মিহির সে লোককে খুন করে নাই; কিন্তু সমুদয় দোষটি তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। সে জন্য এই দুই বৎসর নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, সে পথে পথে ফিরিতেছে। দুঃখের কথা বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়, বাবা আমার কতই না কষ্ট ভোগ করিতেছে। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে অতি গোপনে সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে। আমাদের নিকট আসিতে তাহাকে আমি বার বার মানা করিয়াছি। কিন্তু আমাকে, তাহার গর্ভধারিণীকে ও তাহার ভগিনীকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না। কিছু দিন পূর্বে রাত্রিকালে যখন সে অশ্বত্থ গাছ দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় তুমি তাহাকে দেখিয়াছিলে। পাছে কেহ সন্দেহ করে, সে জন্য আমার আজ্ঞায় আমার কন্যা তোমাকে সেই চিঠি লিখিয়াছিল। মিহির যদি আজ ধরা পড়ে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার ফাঁসী হইবে। কারণ, সে যে খুন করে নাই, সে যে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে যদি তুমি কোনওরূপ সহায়তা করিতে পার, সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি। আমি তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করি নাই। আমার গৃহিণী, আমার পুত্র ও আমার কন্যা, সকলের অনুরোধে আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কিন্তু সামান্য একটি মুখস ও পরচুলের দাড়ি দেখিয়া তোমার যখন এত ভয়, তখন তোমার দ্বারা যে কোন উপকার হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না। বরং আর একটু হইলেই, তুমি ভয়ে চীৎকার করিয়া সর্বনাশ করিতে। তোমার চীৎকারে পাড়ার লোক আমার বাড়ীতে আসিয়া জমা হইত। মিহিরের পলায়ন করিবার তখন আর কোন উপায় থাকিত না। সেই জন্য

তোমাকে ঘরের ভিতর আনিয়া তোমার মুখ চাপিয়া ধরিতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম।"

পাল মহাশয়ের ভর্ৎসনায় আমি অতিশয় লজ্জিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার কন্যা যে আমাকে ডাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিল, সে জন্য আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি এক জন বুদ্ধিমান্ লোক। এই প্রখর বুদ্ধিবলে ইঙ্গিতমাত্রে আমি সকল কথা বুঝিতে পারি। ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, পাল মহাশয়ের কন্যা আমার রূপে গুণে মোহিত হইয়া, আমাকে বিবাহ করিতে লালায়িত হইয়াছে। কেমন! আমার কথা সত্য নয়? আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়।

আর আমার সাহসেরও প্রশংসা করিতে হয়। পূর্বে সাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছি। এখন আমি ভাবিলাম যে, আরও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া এই কন্যার মন-প্রাণ আমি একেবারে কাড়িয়া লইব। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার কন্যার মুখপানে চাহিয়া আমি পাল মহাশয়কে বলিলাম,—"ঘরে তলোয়ার আছে? থাকে তো দিন্ আমি লড়াই করিব।"

পাল মহাশয় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তুমি পাগল না কি? কাহার সহিত তুমি লড়াই করিবে? পুলিসের সহিত লড়াই করিবে?"

আমার ভয় হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পুলিশ এ স্থানে কি করিয়া আসিবে? পুলিশ কি করিয়া জানিবে যে, আপনার পুত্র মিহির এ বাটীতে আসিয়াছে?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তাহাই তো ভয়! সেই বিপদেই তো এখন আমি পড়িয়াছি; আর সেই জন্যই তো তোমাকে আমি ডাকিয়াছি। কি করিব, কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। পুলিশের লোক এখনি হয় তো আসিয়া উপস্থিত হইবে। নিয়োগী থানায় খবর দিতে গিয়াছে।"

বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম,—"নিয়োগী!"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ, নিয়োগী। তাহার পুত্র বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বেচুর এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না। সেই কথা শুনিয়া, আমার উপর নিয়োগীর অতিশয় রাগ হইয়াছে। যখন বাসার কোন কোন লোকের নিকট তুমি রাক্ষসের গল্প করিয়াছিলে, নিয়োগী তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে ভূতও নয়, রাক্ষসও নয়,—সে আমার পুত্র মিহির ব্যতীত অন্য কেহ নয়। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, সে আমার বাটীতে গমনাগমন করিতেছে। কারণ নিয়োগী সেই খুনের কথা সমুদয় অবগত আছে। তাহার পুত্র ও আমার পুত্র,—হুগলীতে এক বাসায় থাকিয়া লেখা-পড়া করিত। সেই বাসাতেই এই খুন হয়। নিয়োগী-পুত্রের পরামর্শে ও সহায়তায় আমার পুত্র পলায়ন করে। তোমার মুখে রাক্ষসের কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত নিয়োগী বোধ হয়, চৌকি দিতেছিল। তাহার পর আজ রাত্রিতে মিহিরকে আসিতে দেখিয়া সে থানায় সংবাদ দিতে গিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি করিয়া জানিলেন যে, সে থানায় খবর দিতে গিয়াছে?"

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"নিয়োগীর পুত্র বেচু আসিয়া আমাকে এইমাত্র বলিয়া গেল। বেচু এখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। তথাপি লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে সে এই মাত্র আসিয়াছিল। তাহার পিতা যে ঘোর অন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা বোধ হয়, সে বুঝিতে পারিয়াছে। সে জন্য আমাকে সে সকল কথা বলিয়া গেল।"

একাদশ অধ্যায় : রাধারাণীর বুদ্ধি

আমি বলিলাম,—"মিহির এই বেলা অশ্বত্থ গাছ দিয়া পলায়ন করুক না কেন ?

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তাহার যো নাই। বেচু বলিয়া গেল যে, সদর দরজায় এক জন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। সে দিক্ দিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই। পশ্চিমে গলির রাস্তায় এই জানালার পার্শ্বে যে দিকে অশ্বত্থ গাছ রহিয়াছে, সে স্থানে নিয়োগীর বন্ধু সেই দালাল দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। দুই পথে দুই জনকে পাহারা রাখিয়া নিয়োগী থানায় গিয়াছে।"

আমি জানালার নিকট গিয়া ঈষৎ উঁকি মারিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, সত্য বটে,—সে স্থানে সেই দালাল দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি কেশবী আমলে এক জন ধ্বজাধারী ব্রাহ্ম ছিলেন, যিনি এক্ষণে গোঁড়া হিন্দু হইয়াছেন, ও যিনি এক্ষণে মুরগী ভক্ষণ করেন না।

জানালার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আমি বাটীর উত্তর ও পূর্ব দিক্ পানে চাহিয়া দেখিলাম। সেই দুই দিক একেবারে ভগ্ন; সে দুই দিক্ দিয়া পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। তাহার পর, আমি ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সিঁড়িও একেবারে ভগ্ন; ছাদে উঠিবার উপায় নাই। পলায়ন করিবার কোন উপায় আমি দেখিতে পাইলাম না।

মিহির এতক্ষণ মাতার নিকট বসিয়া ছিল। খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন দিয়াছিলেন। মিহির খাইতে অস্বীকার করিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে জেদ করিতেছিলেন। মাতার অনুরোধে মিহির সন্দেশ ভাঙিয়া, একটু মুখে দিয়া জল পান করিল। তাহার পর সে মাতাকে বুঝাইতে লাগিল।

মিহির বলিল,—"মা ! তুমি জননী ! আমার দেবতা। তোমার সাক্ষাতে আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি সে ছোকরাকে খুন করি নাই। দুই জনে আমরা এক ঘরে থাকিতাম। চিরকাল তাহাতে আমাতে বড় ভাব ছিল। বাবার সহিত তাহার বাপের মকদ্দমা আরম্ভ হইলেও তাহাতে আমাতে ভাব যায় নাই। তবে যে রাত্রিতে সে খুন হয়, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা তাহাতে আমাতে একটু বচসা হইয়াছিল। কিন্তু সে অন্য কথা লইয়া, মোকদ্দমার কথায় নয়। যাহা হউক, সে ঝগড়া কোন কাজের নয়, কথার তর্ক-বিতর্ক মাত্র। তাহার পর আমরা একসঙ্গে কত কথা কহিলাম, একসঙ্গে আহার করিলাম, একঘরে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় আমাকে একবার বাহিরে যাইতে হইল। বাহির হইতে আসিয়া পুনরায় ঘরের ভিতর যেই প্রবেশ করিয়াছি, আর সেই সময় বেণীর বিছানার নিকট হইতে কিরূপ একটা ঘড় ঘড় শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। যে ছোক্‌রা খুন হইয়াছে, তাহার নাম বেণী ছিল। আমি ভাবিলাম, বেণী বুঝি কিরূপ কুভাবে শয়ন করিয়াছে, তাই সে এইরূপ শব্দ করিতেছে। তাহাকে ঠেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিব, এই জন্য আমি সেই অন্ধকার ঘরে তাহার বিছানার দিকে যাইতে লাগিলাম। সহসা আমার পায়ে মানুষের গা ঠেকিয়া গেল। তখনও আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করি নাই। তখন আমি ভাবিলাম যে, বেণী ঘুমের ঘোরে তক্তপোষ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। 'বেণী' 'বেণী' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমি তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গিয়াছে, আর তাহার গলা দিয়া সেই ঘড় ঘড় শব্দ হইতেছে; আর সেই সময় আমার পায়ে জল অপেক্ষা ঘন কি সব লাগিয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। পাশের ঘরে নিয়োগী মহাশয়ের

পুত্র বেচু ও আর আর ছোকরা ছিল। কিন্তু আমার চীৎকার শুনিয়া, কেবল বেচু একেলা দৌড়িয়া আসিল। সঙ্গে সে দিয়াশিলাই আনিয়াছিল। সে দিয়াশিলাই জ্বালিল। সেই আলোতে বেণীকে আমি তাহার তক্তোপোষে শয়ন করাইলাম। আর সেই সময় দেখিলাম যে, তাহার বুকে কে ছুরি মারিয়াছে; বুক হইতে ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতেছে, তাহাতে আমার গা ও কাপড় রক্তে রক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের মেজেতে যে স্থানে বেণী পড়িয়া ছিল, সে স্থানেও অনেক রক্ত জমা হইয়াছিল। সেই রক্ত আমার পায়ে লাগিয়া গিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ঘরের ভিতর আসিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিল। বেচু মনে করিল যে, আমি বেণীকে খুন করিয়াছি। সেই জন্য বেচু আমাকে বলিল,—'চুপ চুপ! গোল করিও না। কিন্তু মিহির, এ কি তুমি করিয়াছ? বেণীকে তুমি খুন করিয়াছ? সন্ধ্যা বেলা তাহার সহিত তোমার ঝগড়া হইয়াছিল, সেই জন্য ইহাকে খুন করিয়াছ? না, ইহার বাপের কাছ হইতে যে এক শত টাকার নোট আসিয়াছে, তাহার জন্য তুমি ইহাকে খুন করিয়াছ?' আমি বলিলাম,—'ও কি কথা, বেচু! আমি ইহাকে খুন করিয়াছি! আমি যদি খুন করিব, তবে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে যাইব কেন?'—বেচু বলিল,—'দেখ, মিহির! তোমার সে কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না! তোমরা দুই জনে একঘরে থাক। তোমার সহিত কাল তাহার ঝগড়া হইয়াছিল, তোমার গায়ে রক্ত,—আর এ কি!' এই বলিয়া ঘরের মেজে হইতে বড় একখানি ছুরি সে তুলিয়া লইল। ছুরিখানি রক্তমাখা ছিল। সে ছুরি আমার। ঘরের এক পার্শ্বে ছোট টেবিল ছিল। তাহার উপর কাগজ, কলম, পুস্তক প্রভৃতির সহিত আমার সেই ছুরিখানিও থাকিত। ছুরিখানি হাতে লইয়া বেচু বলিল,—'আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। শীঘ্র তুমি পলায়ন কর।' আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। পলায়ন করিতে আমি উদ্যত হইলাম, তখন বেচু বলিল,—'ও কি কর! ওরূপ রক্তমাখা কাপড়ে বাহিরে যাইও না। এখনি তোমাকে চৌকিদারে ধরিবে।' এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া আপনার ঘরে গেল। আপনার একখানি কাপড় আনিয়া আমাকে দিল। সেই কাপড় পরিয়া আমি পলায়ন করিলাম। সে রাত্রিতে বেচু আমার অনেক উপকার করিয়াছে। আজও দেখ, সে আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মা! এখন বোধ হইতেছে যে, পলায়ন করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। যখন আমি অপরাধ করি নাই, তখন কি জন্য যে আমি পলায়ন করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আর কত দিন কাল কাটাইব! ইহা অপেক্ষা ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়া মরাই আমার পক্ষে ভাল। তোমাদিগকে না দেখিয়া আর পথে পথে ফিরিতে পারি না! আর কষ্ট ভোগ করিতে পারি, না, মা!'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। পাল মহাশয়ের কন্যা কাঁদিতে লাগিল। পাল মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল, আমারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মিহির পুনরায় বলিল,—"আজ আর পলাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহার জন্য আমি কিছু মাত্র দুঃখিত নই। পথে পথে আর বেড়াইতে পারি না।"

এইরূপ বলিতে বলিতে মিহির দেখিল যে, তাহার পিতা, মাতা ও ভগিনী সকলেই অতিশয় কাঁদিতেছেন। সে জন্য তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া সে পুনরায় বলিল,—"মা, কাঁদিও না! তুমি ভয় করিও না। ভগবান মাথার উপর আছেন। বিনাদোষে তিনি আমাকে ফাঁসী যাইতে দিবেন না।"

আমার নিজের সম্বন্ধে এই সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। মিহিরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠিল। কেন

বলিতে পারি না, কিন্তু এই সময় হইতে আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল।

পাল মহাশয় বলিলেন,—"প্রাণ থাকিতে তোমাকে আমি ধরা দিতে দিব না। পলাইবার কোন উপায় কি নাই ?"

এই সময় বাটীর নিম্নে অন্দর মহলের দরজায় সবলে কে আঘাত করিতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

শশব্যস্ত হইয়া সকলে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পাল মহাশয় বলিলেন,—"ঐ পুলিশ আসিয়াছে।"

পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। মিহির পুনরায় তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। মিহির বলিল,—"ভয় নাই মা! কাঁদিও না। অন্তর্য্যামী ভগবান জানেন যে, আমি কোন দোষে দোষী নই! তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।"

দরজায় অতি সবলে আঘাত হইতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

পাল মহাশয় বারেণ্ডায় গিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও? দরজা ভাঙ্গে কে?"

বাহির দিকে নীচে হইতে কে উত্তর দিল,—"আমরা পুলিশের লোক। দরজা খুলিয়া দাও।"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"রাত্রি প্রায় একটা বাজে। এ ঘোর রাত্রিতে আমি দরজা খুলিয়া দিতে পারি না। যদি তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে আসিও, তখন দ্বার খুলিয়া দিব। রাত্রিকালে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার আইন নাই।"

পুলিশের লোক উত্তর করিল,—"দ্বার খুলিয়া দাও। যদি না খুলিয়া দাও, তাহা হইলে দ্বার আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিব। তোমার ঘরে খুনী আসামী আছে।"

পাল মহাশয় বলিলেন,—"আমার ঘরে খুনী আসামী কোথা হইতে আসিবে? এ ঘোর রাত্রিতে আমি দ্বার খুলিয়া দিব না ;—তোমরা পুলিশের লোক হও আর যেই হও।"

তাহারা দ্বার যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইল! আর কোন উপায় নাই! মিহির এই-বার ধরা পড়িল! সর্ব্বনাশ হইল!"

মিহিরের এক হাত মা ধরিয়াছিলেন ও অপর হাত ভগিনী ধরিয়া ছিল। মিহিরকে মাঝখানে রাখিয়া, দুই জনে পার্শ্বে বসিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছিলেন।

পাল মহাশয়ের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া, ভগিনী সহসা মিহিরের হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতাকে সে বলিল,—"বাবা! নীচে গিয়া পুলিশের লোককে তুমি দরজা খুলিয়া দাও। আমি মনে মনে এক উপায় স্থির করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।"

কন্যার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

কন্যা ধীর-গম্ভীর স্বরে ভ্রাতাকে বলিল,—"দাদা, উঠ! মদন বাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার বিছানায় তুমি শয়ন কর। বারেণ্ডার দ্বারে ওদিক হইতে তুমি শিকল দিয়া দাও, এদিক হইতে সেই দ্বারে আমি খিল দিতেছি।"

পাল মহাশয়ের কন্যা তাহার পর মাদুরের উপর হইতে সেই রাক্ষসের মুখস ও সেই পরচুল তুলিয়া লইল। স্বহস্তে সেই মুখস ও সেই পরচুলের দাড়ি গোঁপ সে আমার মুখে পরাইয়া দিল।

সকলে তাহার অভিসন্ধি তখন বুঝিতে পারিল। পাল মহাশয় বলিলেন, "রাধারাণী মা! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধিবলে ও ভগবানের কৃপায় মিহির বোধ হয়, এবার নিষ্কৃতি পাইবে। মিহির! উঠ বাবা! শীঘ্র মদন বাবুর ঘরে তুমি গমন কর!"

পাল মহাশয়ের কন্যার নাম রাধারাণী।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ মদনের প্রতিজ্ঞা

বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া রাধারাণী মিহিরকে আমার ঘর দেখাইয়া দিল। ভিতর বাটী হইতে বাহির বাটীতে গমন করিয়া, মিহির প্রথম বারেণ্ডার দ্বারে শিকল দিয়া, তাহার পর, আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে ঘরেরও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। অবশেষে সে আমার বিছানায় শয়ন করিল।

দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় এখনও নীচে গমন করেন নাই। রাধারাণী সে জন্য পুনরায় তাঁহাকে বলিল, "বাবা! তুমি নীচে গিয়া পুলিশের লোককে দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বার খুলিতে কিন্তু একটু নলপত করিও। উপরে কেবল তোমার ঘরের দ্বার খোলা থাকুক। প্রদীপ নিবাইয়া মা ও আমি অন্য ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করি।"

পাল মহাশয় প্রথম বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুলিশের লোককে বলিলেন,—"আপনাদের আর কষ্ট করিতে হইবে না। এখনি নীচে গিয়া আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে তিনি নীচে নামিতে লাগিলেন।

পরচুল ও মুখস পরিয়া অবাক হইয়া এতক্ষণ আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। রাধারাণী স্বহস্তে আমার এই সাজ করিয়া দিয়াছিল। তাহার কোমল হস্তস্পর্শে শরীর আমার রোমাঞ্চ হইয়াছিল। সেই সুখে মুগ্ধ হইয়া, চিন্তা করিতে এতক্ষণ আমি সময় পাই নাই। কিন্তু এখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম,—"এ মন্দ কথা নয়! রাক্ষসের হাত হইতে কত কষ্টে পরিত্রাণ পাইলাম। এখন দেখিতেছি, আমার ফাঁসীর যোগাড় হইতেছে। নিয়োগী মহাশয় পুলিশকে নিশ্চয় বলিয়াছেন যে, রাক্ষসের সাজ সাজিয়া খুনী আসামী বাটীতে আগমন করে। সুতরাং পুলিশ আসিয়াই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহার পর, আমাকে থানায় লইয়া যাইবে। তাহার পর, আমার নামে মোকদ্দমা করিবে। তাহার পর, আমাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিবে। আমাকে দিয়া রাধারাণী ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটি সামান্য মেয়ে নয়!"

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মিহিরের সেই দুঃখের কাহিনী আমার স্মরণ হইল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—"ছি, মদন! তুমি না এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, আজ হইতে আর পাগলামি করিবে না? আর কখন কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবে না? আজ হইতে তুমি তোমার স্বভাব পরিবর্তন করিবে? ছি, মদন! তোমার কি লজ্জা নাই?"

এক দিনে সামান্য কথায় মানুষের চক্ষু ফুটিয়া যে চৈতন্য হয়, তাহা আপনারা অসম্ভব বিবেচনা করিবেন না। লালা বাবু তাহার দৃষ্টান্ত। কথিত

আছে যে, এক দিন লালা বাবু বিষয়কর্মে সাতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, তথাপি স্নান আহার করিতে তিনি যাইলেন না। বাটীর ভিতর হইতে কয়বার লোক তাঁহাকে ডাকিতে আসিল, তবুও তিনি উঠিলেন না। অবশেষে তাঁহার কন্যা আসিয়া বলিল,—"বাবা! বেলা গেল যে!" "বেলা গেল", এই দুইটি কথায় লালা বাবুর হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল।

মিহিরের কাহিনী শুনিয়া আমারও আজ সেইরূপ হইল। আমার স্বভাবে যে সমুদয় দোষ আছে, এত দিন তাহা আমি দেখি নাই। সে সমুদয় দোষ এখন আমার প্রত্যক্ষ হইল। তাহার পর আমি ভাবিতে লাগিলাম,—'সংসার কি ভয়ানক স্থান! মিহির সম্পূর্ণ নিরপরাধ; নিশ্চয় খুন করে নাই। তথাপি তাহাকে কত না কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! ধরা পড়িলে হয় তো তাহার ফাঁসীও হইবে। অন্তর্য্যামী ভগবান্ কেন এমন করিতেছেন? এ রহস্য আমি বুঝিতে পারি না। হে ঈশ্বর! তুমি জান; আমি কিছুই জানি না।"

এইরূপ ভাবিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে,—"আজ হইতে যথাসাধ্য সকল বিষয়ে আমি চুপ করিয়া থাকিব। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।"

ভ্রাতাকে আমার ঘর দেখাইয়া দিয়া, বারেণ্ডার দ্বারে ভিতর হইতে খিল দিয়া রাধারাণী পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"আপনি ভয় করিবেন না। আপনি যে দাদা নহেন, তাহা জানিতে পারিলেই পুলিশ আপনাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি শীঘ্র পরিচয় দিবেন না। যত বিলম্ব করিতে পারেন, ততই ভাল। কারণ, বিলম্ব হইলে দাদাকে সরাইতে আমরা সময় পাইব।"

রাধারাণীর মধুর বচনে আমার মন আশ্বাসিত হইল। আমিও তখন মনে মনে বুঝিয়া দেখিলাম যে, সত্য বটে; আমাকে কেন তাহারা ফাঁসী দিবে? আমি যে মিহির নই, জানিতে পারিলেই, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিবে। আমার নাম-ধাম প্রকাশ করিতে আমি যত পারি, তত বিলম্ব করিব।

রাধারাণী পুনরায় বলিল,—"আপনার এ ঘরে থাকা উচিত নহে। আপনাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে। আসুন!"

রাধারাণীর সহিত সে ঘর হইতে আমি বাহির হইলাম। চক্ষুর উপরে মুখসে দুইটি গোল ছিদ্র ছিল। তাহা পূর্ব্বে রাক্ষসের ভয়াবহ চক্ষু কোটর বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। সেই ছিদ্র দিয়া আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। তেতালার উঠিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে স্থানে সিঁড়ি ছিল, তাহার পার্শ্বে সামান্য একটু নিভৃত অন্ধকারময় স্থান ছিল। সে স্থানে যে ভগ্ন প্রাচীর আছে, তাহার কোণে রাধারাণী আমাকে বসিতে বলিল। আমি সেই কোণে বসিলাম। ঘর হইতে রাধারাণী মাদুরটি তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই মাদুর সে আড়াল করিয়া দিল। মাদুরের অন্তরালে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। নানারূপ আশ্বাসবাক্যে আমাকে প্রবোধ দিয়া রাধারাণী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

প্রাচীরের কোণে মাদুরের আড়ালে বসিয়া, শব্দ শুনিয়া, সমুদয় ঘটনা আমি বুঝিতে পারিলাম। পাল মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন; সে শব্দ আমি পাইলাম। অনেকগুলি লোক বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। সাত আট জন লোক, তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। পাল মহাশয়ের তিনটি ঘর আতি পাতি করিয়া তাহারা খুঁজিতে লাগিল; সে শব্দও আমি পাইলাম। তাহাদের অনুসন্ধান যে বৃথা

হইল, তাহাদের কথাবার্ত্তায় তাহাও বুঝিতে পারিলাম। অবশেষে দুই জন লোক আমার দিকে আসিতেছে, পদ-শব্দে তাহাও আমি বুঝিলাম।

যে স্থানে আমি লুক্কায়িত ছিলাম, সেই দুই জন লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোল লণ্ঠনের প্রখর আলোক তাহারা মাদুরের উপর ধরিল। তাহার পর, এক জন অগ্রসর হইয়া মাদুরটি সরাইয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ সেই দুই জন লোক এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আসামী পাইয়াছি! আসামী পাইয়াছি!"

সেই কথা শুনিয়া পুলিশের অন্যান্য লোক সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে এক জন তৎক্ষণাৎ আমার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। ঘরের ভিতর পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক জন পুলিশের লোক আমার মুখ হইতে সেই রাক্ষসের মুখস্ খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যিনি কর্ত্তা, তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "উঁ হুঁ! মুখস্ খুলিও না। এই অবস্থাতেই ইহাকে সাহেবের নিকট লইয়া যাইব।"

আমার ভয় হইয়াছিল যে, মুখস্ খুলিলে পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে! রাধারাণীর সমুদয় আয়োজন তাহা হইলে বৃথা হইত। নিয়োগী তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না বটে; কিন্তু পুলিশের লোক যখন আমাকে থানায় লইয়া যায়, সেই সময় বাহির-বাটীর যত বাসাড়ে তামাসা দেখিবার নিমিত্ত আপন আপন ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। নীচের বাসাড়েগণ নীচে ও দোতালার বাসাড়েগণ উপরের বারেণ্ডার রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলের সম্মুখ দিয়া পুলিশের লোক আমাকে লইয়া গেল। মুখস্ খুলিলে তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত। মুখসের চক্ষু-কোটর দিয়া আমি সকলকে দেখিলাম। নিয়োগীকে কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না। নিয়োগী জানিতেন না যে, তাহার পুত্র পাল মহাশয়কে গোপনে সংবাদ দিয়া, তাঁহার পরিশ্রম বিফল করিয়াছে। যেন এ ব্যাপারের কিছু জানেন না, পর দিন পাল মহাশয়কে তাহাই বলিবার নিমিত্ত, তিনি বোধ হয়, আপনার দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়াছিলেন। দালালকেও কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

আমি থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সাহেবের সম্মুখে আমার মুখস খোলা হইল। কিন্তু পরচুলের দাড়ি গোঁফ যেমন তেমনি রহিল। থানার সাহেব আমাকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি কোন উত্তর করিলাম না। আমাকে গারদে কয়েদ করিয়া রাখা হইল।

গারদে আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে বাহিরে নিয়োগীর গলার শব্দ পাইলাম। নিয়োগীর সহিত পুলিশের যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, মিহিরকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা ছিল। নিয়োগী সেই পুরস্কারের প্রার্থনা করিলেন। পুলিশের লোক বলিল যে,—"রও! আগে ইহার মোকদ্দমা হউক, তাহার পর তুমি সে পুরস্কার পাইবে।" সেই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

পুলিশের লোক পরদিন আমাকে আর একজন সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সে সাহেবেও আমাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির করিলাম না।

হুগলীতে সেই খুন হইয়াছিল। আমাকে হুগলীতে লইয়া গিয়া সে স্থানের পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সাহেব আজ্ঞা করিলেন। দুই জন পুলিশের লোক আমাকে হুগলীতে লইয়া চলিল। আমরা তিন জনে

রেলগাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আমার হাতে হাতকড়ি ছিল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে কৌশল করিয়া, আমি সেই পরচুলের দাড়ি গোঁফ খুলিয়া চুপি চুপি গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। পরক্ষণেই পুলিশের লোক আমার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে যে পরচুল, তা বোধ হয়, তাহারা জানিত না। তাহারা বলিল,—"তুই এক জন পাকা বদমায়েস!"

যথাসময়ে আমরা হুগলীর থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কলিকাতা পুলিশের লোক হুগলী পুলিশের হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। হুগলী থানার এক জন কর্ম্মচারী মিহিরকে জানিত। সে তখন থানায় উপস্থিত ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আসিয়া আমাকে দেখিয়া বলিল,—"মিহির পাল! এ কেন মিহির পাল হবে?"

এই কথা শুনিয়া থানার দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তুমি কে?"

এইবার আমার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। আমি বলিলাম,—"আমি মদন ঘোষ।"

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মদন ঘোষ আবার কে?"

নাম ধাম প্রভৃতি বলিয়া, আমি আমার সমুদয় পরিচয় প্রদান করিলাম। তাহা শুনিয়া, উপস্থিত সকল লোকেই ঘোরতর বিস্মিত হইল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কলিকাতা পুলিশ তোমাকে ধরিয়া আনিল কেন? আর মিহির বলিয়া তোমাকে এ স্থানে দিয়া গেল কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"পাল মহাশয় ও আমি এক বাটীতে বাস করি। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে। তামাসা ছলে রাক্ষসের মত মুখস্ পরিয়া, পাল মহাশয়ের পরিবারবর্গকে আমি ভয় দেখাইতে গিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় কলিকাতা পুলিশের লোক আমাকে মিহির মনে করিয়া ধৃত করিল।"

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকাতার থানায় তুমি আপনার পরিচয় প্রদান কর নাই কেন?"

আমি বলিলাম,—"ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম।"

যাহা হউক, হুগলীর পুলিশের লোক আমাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল না। সে স্থানের সাহেবের নিকট লইয়া গেল। আরও দুই দিন ধরিয়া ভালরূপে তদন্ত করিল। হুগলীর যে সমুদয় লোক মিহিরকে জানিত, তাহাদিগকে আনিয়া আমাকে দেখাইল। পাল মহাশয়ের গ্রামের কয়েক জন লোককে আনিয়া আমাকে দেখাইল। যখন সকলেই বলিল যে, আমি মিহির নই, তখন আমাকে তাহারা ছাড়িয়া দিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ নিয়োগী মহাশয়ের গান

তিন দিন পরে অপরাহ্ণে আমি আমার কলিকাতার বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, নিয়োগী আপনার ঘরের দ্বারের নিকট একটি কেরোসিন তেলের পুরাতন ও ভাঙ্গা বাক্সর উপর বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন। সকলে যে ভাবে সংবাদ-পত্র পাঠ করে, নিয়োগী সে ভাবে পাঠ করিতেছিলেন না; গীত গাহিবার ন্যায় সুর করিয়া গদ্য লেখা তিনি পাঠ করিতেছিলেন। যথা,—

ম-অ-অ-অহে-এ-এ-এশ-পা-আ-আ-আ-লে-এ-এ-এর ইত্যাদি।

সংবাদপত্রের যে কথাগুলি লইয়া তিনি মনের আনন্দে গান করিতেছিলেন, তাহা এইরূপ ছিল,—

"মহেশ পালের পুত্র মিহির দুই বৎসর পূর্বে হুগলীতে খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া ফেরার হইয়াছিল। মুখস্ পরিয়া ছদ্মবেশে মাঝে মাঝে সে পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিত। এই অবস্থায় সেদিন সে ধরা পড়িয়াছে।" ইত্যাদি।

মিহির পাল ধরা পড়িয়াছে। আনন্দে নিয়োগী মহাশয়ের মন একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি সেই গদ্য ভাষায় লিখিত সংবাদটি গীতের ন্যায় গাহিতেছিলেন। নিয়োগী এখনও জানিতে পারেন নাই যে, প্রকৃত মিহির সে রাত্রি ধরা পড়ে নাই, জাল মিহির ধরা পড়িয়াছিল।

আমাকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে মদন! এত দিন কোথায় ছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"সে সব কথা আপনাকে পরে বলিব। পাল মহাশয় কেমন আছেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"পাল মহাশয় এখানে নাই। যে রাত্রিতে তাঁহার পুত্র ধরা পড়িল, সেই রাত্রিতেই সপরিবারে তিনি এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের মোকদ্দমার তদ্বির করিবার নিমিত্ত তিনি বোধ হয়, হুগলী গিয়াছেন। ভাল কথা! তোমার ঘরের চাবি আমার কাছে আছে। তিনি আমাকে সেই চাবি দিয়া গিয়াছেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে চাবি লইয়া, আমি আমার ঘরে গমন করিলাম। পাল মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, বিছানায় শুইয়া সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম।

কয় দিন অনুপস্থিতির পর, আমি আফিস যাইলাম। আফিস হইতে আসিয়া বাসার সকলকে আমি পাল মহাশয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কেহই আমাকে বলিতে পারিল না। রবিবার দিন আমি পুনরায় হুগলীতে গিয়া, তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। সে অনুসন্ধান নিষ্ফল হইল। তাহার পর, আর এক দিন রবিবার তাঁহার গ্রামে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইলাম। কিন্তু সে স্থানেও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে বহু দিন ধরিয়া ক্রমাগত আমি তাঁহার অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে হতাশ হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

নিয়োগী মহাশয় ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, প্রকৃত মিহির ধরা পড়ে নাই; আমি যে মিহির সাজিয়া ধরা দিয়াছিলাম, সকল লোকেই ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিল। একদিকে প্রতিহিংসা ও পুরস্কার বিষয়ে নিয়োগী বিফলমনোরথ হইলেন; অপর দিকে তাঁহার পুত্র বেচুর ক্রমে আসন্নকাল উপস্থিত হইল।

একদিন বেলা নয়টার সময় আমি আফিস যাইতেছি, এমন সময় বেচু আমাকে তাহার নিকট ডাকিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

বেচু আমাকে বলিল,—"মদন বাবু! আপনাকে আমি একটি বড় গোপন কথা বলিব। সেই কথা বলিবার নিমিত্ত আজ কয় দিন ধরিয়া আমি সুযোগ খুঁজিতেছি; কিন্তু পিতার ভয়ে আমি বলিতে পারি নাই। আজ পিতা আমাদের গ্রামে গিয়াছেন। সেই জন্য আপনাকে ডাকিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি কথা?"

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল,—"আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, তিন চারি দিনের

মধ্যেই আমার মৃত্যু হইবে। আমার বড় ভয় হইতেছে যে, মৃত্যুর পর আমি ঈশ্বরের নিকট কি করিয়া দাঁড়াইব। ঘোর নরক! ঘোর নরক! ভাবিলে শরীর আমার শিহরিয়া উঠে।"

এই কথা বলিয়া, বেচু কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"বেচু বাবু! ঈশ্বর দয়াময়। মানুষের শরীরে যে সামান্য দয়া আছে, সে কেবল সেই দয়া-সাগরের এক বিন্দুমাত্র। যদি আপনি কোন পাপ করিয়া থাকেন, তাহার নিমিত্ত আন্তরিক অনুতাপ করুন। তাহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দয়াময় আপনাকে ক্ষমা করিবেন।"

নিয়োগী-পুত্র পুনরায় বলিল,—"দেখুন, মদন বাবু! এই আসন্ন কালে সকল বিষয় আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু করিয়াছি, ব্যোম জগতে সে সমুদয় যেন ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। আমার সমুদয় চিন্তা, কথা ও কাজের ফল আমার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। সে সমুদয় আমাকে ভোগ করিতে হইবে। কাজ করিলেই যে তাহার ফল আছে, মানুষ অনুক্ষণ তাহা দেখিতেছে। হায় হায়! তবু মানুষ কেন কুকর্ম করে! মদন বাবু! মানুষ আর যাহা করুক, মানুষ সত্য হইতে যেন বিচলিত না হয়। অন্য পাপ মানুষের বিরুদ্ধে, কিন্তু অসত্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। মনুষ্য-জীবন ছেলেখেলা নহে,—ধর্মও খেলা করিবার বস্তু নহে যে, তাহা লইয়া যে যা মনে করিবে, সে তাহাই করিবে। আমি সত্য বলিতেছি যে, পরকাল আছে, নরক আছে। এই মৃত্যুকালে আমি একান্ত মনে মানুষকে এই উপদেশ প্রদান করি যে, মানুষ যেন সত্য হইতে বিচলিত না হয়।"

তাহার কথা শুনিয়া, আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। আমিও যেন নরক প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। পাপীদিগের পরিত্রাহি ডাক আমারও যেন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। শিহরিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সত্য মিথ্যা কি, মোটা-মুটি তাহা আমি বুঝি। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে সত্য কি?"

বেচু উত্তর করিল,—"আপনি আমাকে বড় কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম বিষয়ে প্রকৃত সত্য কি, সকলে তাহা অনুভব করিতে পারে না; অনুভব করিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই।"

এইরূপ বলিয়া সে আমাকে তাহার নিজের বিশ্বাসের কথা বলিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিলাম। আমার বোধ হইল যে, পীড়িত হইয়া পর্য্যন্ত নিয়োগী-পুত্র একান্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরকে ডাকিয়াছে। কৃপা করিয়া তিনি তাহার চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তা না হইলে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এত অল্প বয়সে এরূপ জ্ঞান হয় না। প্রথম প্রথম তাহার মুখ দেখিয়া ও তাহার কথাবার্তা শুনিয়া, তাহার প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝিলাম যে, ক্রমাগত ভগবান্‌কে ডাকিয়া পিতৃদত্ত কলুষিত মনকে সে পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার নিকট বসিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, আমারও চক্ষু যেন উন্মুক্ত হইল। আমি রূপবান্, আমি গুণবান্ আমি বুদ্ধিমান্, আমি সাহসী পুরুষ,—আমার মনে এই প্রকার যে অভিমান ছিল, মুহূর্তমধ্যে সে সমুদয় ভাব আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইল। কীটস্য কীট,—সামান্য একটা অধম জীব বলিয়া, আমি আমাকে মনে করিতে লাগিলাম। বেচু ধর্ম-বিষয়ে যাহা আমাকে বলিল, সে সব কথা এ স্থানে বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শেষকালে সে আমাকে এই কয়টি কথা বলিল,—"মদনবাবু! প্রকৃত সত্য কি, তাহা আমি আপনাকে বলিলাম। কিন্তু এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। সে নিমিত্ত সাধারণ মনুষ্যকে আমার উপদেশ এই যে, যাহার যেরূপ বিশ্বাস, সে যেন

তদনুযায়ী কাজ করে। মনেএকরূপ বিশ্বাস, বাহিরে অন্যরূপ কাজ, এ যেন কেহ করে না। সেরূপ অসত্য কপট জীবনের ক্ষমা নাই; সেরূপ লোককে নিশ্চয় নরকে ডুবিতে হইবে।"

আমি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। বেচু পুনরায় আমাকে বলিল,—"যে কথা বলিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে ডাকিয়াছি, তাহা এখনও আপনাকে বলি নাই। বড় বিষম কথা। কি করিয়া আপনাকে বলিব, তাই ভাবিতেছি। আপনি অনুতাপের কথা বলিতেছিলেন। আজ এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ঘোর অনুতাপিত হৃদয়ে আমি ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। যখন সে দিন মিহিরের আগমন-সংবাদ পিতা পুলিশকে দিতে গেলেন, সেই জন্যই সে দিন মরিতে মরিতে অতি কষ্টে আমি পাল মহাশয়কে গিয়া সাবধান করিলাম। মিহিরের আমি সর্বনাশ করিয়াছি। আমি ভাবিলাম যে, নিরপরাধ মিহিরকে যে আমার সাক্ষাতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না।"

বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মিহিরের আপনি সর্বনাশ করিয়াছেন? মিহিরের আপনি কি করিয়াছেন?"

নিয়োগী পুত্র বলিল,—"যে খুনের জন্য মিহির পথে পথে ফিরিতেছে, যে খুনের জন্য তাহার ফাঁসি হইবার সম্ভাবনা, সে খুন সে করে নাই, সে খুন আমি করিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"কি!!! সত্য?"

নিয়োগী পুত্র উত্তর করিল,—"সম্পূর্ণ সত্য। মিহির, আমি আর সেই ছোক্‌রা,—তাহার নাম বেণী,—আরও তিন চারি জন, হুগলীতে এক বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতাম। সকলেই আমরা এক জাতি। আমরা সকলে পরস্পরের কুটুম্ব ও পরিচিত। মিহির ও বেণী এক ঘরে থাকিত। পাল মহাশয়ের সহিত বেণীর পিতার ভূমি সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়। কিন্তু তাহাতে মিহির ও বেণীতে যে সদ্ভাব ছিল, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পরীক্ষার টাকা ও অন্যান্য খরচের নিমিত্ত বেণীর পিতা এক শত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার সাক্ষাতে বেণী সেই টাকাগুলি বিছানায় আপনার শিয়র দেশে বালিশের নিম্নে রাখিয়া দিল। আমার পিতা ধনবান ব্যক্তি নহেন। খরচের টানাটানি আমার সর্বদাই থাকিত। সেই টাকাগুলি দেখিয়া আমার লোভ হইল। দৈবের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। সেই দিন রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া আমি বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় মিহির ও বেণী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া, আমিও আস্তে আস্তে আমার ঘরের দ্বার খুলিলাম। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, গাড়ু হাতে লইয়া মিহির বাহিরে গেল। আমি ভাবিলাম, উত্তম সুবিধা হইয়াছে। দেখি, বেণীর বালিশের নীচে হইতে নোটগুলি লইতে পারি কি না। এই মনে করিয়া আমি আস্তে আস্তে তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। যাহা হউক, নিঃশব্দে বেণীর বিছানার নিকট গিয়া, আমি নোটগুলি লইতে পারিলাম। নোট লইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছি, আর বেণী সেই সময় জাগিয়া উঠিল। 'চোর' এই কথা বলিয়া আমাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল।"

এত দূর বলিয়া বেচু আর বলিতে পারিল না। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অতি দ্রুতভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল। "জল!" এই কথা বলিয়া সে আমাকে গেলাশ দেখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি জলের গেলাশ লইয়া আমি তাহার মুখে ধরিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ বেচুর শেষ কথা

জল পান করিয়া বেচু কিছু সুস্থ হইল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সে বলিতে আরম্ভ করিল

"আমাকে ধরিয়া চোর চোর বলিয়া বেণী পুনরায় চীৎকার করিতে উদ্যত হইল। আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম ও সেখান হইতে পলায়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বেণী আমাকে সহজে ছাড়িল না। সেই ঘরের দেয়ালের নিকট সামান্য একটি মেজ ছিল। তাহার উপর বেণী ও মিহিরের পুস্তক, কাগজ-কলম ইত্যাদি থাকিত। মিহিরের বড় একখানি ছুরি ছিল। ছুরি-খানি সর্বদাই এই মেজের উপর পড়িয়া থাকিত। অন্ধকারে বেণীর সহিত জড়াজড়ি করিতে করিতে ক্রমে আমি সেই মেজের উপর গিয়া পড়িলাম। দৈবের ঘটনা। আমার দক্ষিণ হাতটি মেজস্থিত ঠিক সেই ছুরির উপর পড়িল। তখনও বেণী আমাকে সবলে ধরিয়াছিল। তাহাকে যে খুন করিব, সে ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু কোনরূপে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া, আমি সেই ছুরি তাহার বুকে মারিয়া বসিলাম। 'বাপ' ! বলিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। আমি পলায়ন করিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিলাম। হায় হায়! এক মিনিট পূর্বে আমি এক জন সাধু সচ্চরিত্রবান্ যুবক ছিলাম। এক মিনিটের মধ্যে আমি চোর, খুনে, নর-পিশাচ হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে মিহির ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলাম যে, বেণী মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহাকে তুলিতে গিয়া মিহিরের শরীর ও কাপড় রক্তে আরক্ত হইয়া গিয়াছে ও সেই স্থানে মিহিরের ছুরি পড়িয়া আছে। ইহা ব্যতীত সেই দিন বৈকাল বেলা বেণী ও মিহিরে কিছু বচসা হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম,—ভাল হইয়াছে। এ দোষ সম্পূর্ণরূপে মিহিরের উপর আরোপিত হইতে পারিবে, আর তাহা হইলে আমাকে কেহ সন্দেহ করিবে না। এইরূপ ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবার নিমিত্ত মিহিরকে আমি পরামর্শ দিলাম। মিহির সে সময় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে আমার কথামত কার্য্য করিল। আমার একখানা কাপড় পরিধান করিয়া সে পলায়ন করিল। তাহার পলায়ন, তাহার পরিত্যক্ত রক্তাক্ত কাপড়, তাহার রক্তাক্ত ছুরি, পূর্ব দিন বেণীর সহিত তাহার বিবাদ, এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পুলিশ তাহাকেই দোষী বলিয়া স্থির করিল, অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিল না। সে খুনের প্রকৃত বিবরণ এই আমি আপনাকে বলিলাম।"

আমার আফিস-গমন ঘুরিয়া গেল। বেচুকে আমি বলিলাম,—"এ রোগে আপনার মৃত্যু নিশ্চয়, তাহার অধিক বিলম্বও নাই। আজ হউক, কাল হউক, পরশ্ব হউক, শীঘ্রই আপনাকে ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইতে হইবে। নিজের এরূপ গুরুতর অপরাধ অন্যের ঘাড়ে দিয়া, কোন্ মুখে আপনি ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইবেন? অতএব যদি সময় থাকিতে যথার্থই আপনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এ সকল কথা কেবল আমাকে বলিলে হইবে না।"

বেচু জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে আর কি করিতে বলেন ?"

আমি উত্তর করিলাম,—"এ সকল কথা আপনাকে পুলিশের নিকট বলিতে হইবে।"

বেচু বলিল,—"তবে শীঘ্র পুলিশের লোককে আপনি ডাকিয়া আনুন। আমার পিতা প্রত্যাগমন করিতে না করিতে আপনি এ কাজ করুন। আমি যে বেণীকে খুন

করিয়াছি, তাহা তিনি জানেন না; এ কথা শুনিলে তিনি আমাকে কিছুতেই বলিতে দিবেন না।"

আমি তৎক্ষণাৎ থানায় দৌড়িয়া যাইলাম। থানার লোক আসিয়া নিয়োগী-পুত্রের সমুদয় বিবরণ লিখিয়া লইল। তাহার পর, পুলিশের কর্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বেণীর নিকট হইতে যে নোট তুমি লইয়াছিলে, তাহা কি তুমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছ?"

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল—"একখানি পঞ্চাশ টাকার ও পাঁচখানি দশ টাকার নোট ছিল। দশ টাকার পাঁচখানি নোট ভাংগাইয়া আমি খরচ করিয়াছি; কিন্তু পঞ্চাশ টাকার নোটখানি নম্বরী বলিয়া তাহা ভাংগাইতে আমি সাহস করি নাই। সে নোট এখনও আমার নিকট আছে।"

এই বলিয়া বেচু তাহার তোরংগের চাবি আমাকে দিল ও যে কোণে নোটখানি ছিল, তাহা আমাকে বলিয়া দিল। নোটখানি বাহির করিয়া আমি পুলিশের হাতে দিলাম। ইহার কিছু দিন পরে নম্বর দেখিয়া প্রমাণ হইল যে, ইহা বেণীর পিতার প্রেরিত সেই নোট বটে।

পুলিশ বেচুকে থানায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি ও বেচু দুই জনেই আপত্তি করিলাম। কিন্তু পুলিশ সে কথা শুনিল না। পাল্কি করিয়া বেচুকে তাহারা লইয়া চলিল। দুধ, জল, ঔষধ প্রভৃতি লইয়া, আমিও সংগে চলিলাম। থানা হইতে পুলিশ তাহাকে আদালতে লইয়া গেল। সাহেবের নিকট পুনরায় তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রদান করিতে হইল। সাহেব তাহাকে জেলখানার হাসপাতালে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। নিজের খরচে আমি উকীল দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু সে খুনী আসামী; জামিন হইল না।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নাড়া-চাড়া তাহার উপর ঘোরতর মনের আবেগ, এই সমুদয় কারণে আমি দেখিলাম যে, বেচুর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইয়া আসিতেছে। অপরাহ্নে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বৈলক্ষণ্য ঘটিল। এ অবস্থায় জেলখানায় তাহাকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে পুলিশ সাহস করিল না। পাল্কিতে আস্তে আস্তে তাহাকে লইয়া চলিল। দুইজন পুলিশ-কর্মচারী সংগে চলিল। পাল্কির উপর হাত রাখিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রোগীর মুখের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিয়া, আমিও সংগে সংগে চলিলাম। গড়ের মাঠে গিয়া রোগীর চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। এক নিভৃত বৃক্ষতলে আমি পাল্কি নামাইতে বলিলাম। তাহার পর ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, বেচুর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহার মুখে বিন্দু বিন্দু জল দিয়া ধীরে ধীরে ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম।

এবার আমার পানে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বেচু এই কয়টি কথা বলিল,—"মদন বাবু! আমি চলিলাম। রাধারাণীকে আপনি বিবাহ করিবেন। আপনি সংসারী হইবেন। সে দিন ধর্ম বিষয়ে অনেকগুলি কথা আপনাকে বলিয়াছি। আজ আর একটি কথা আপনাকে বলি। একখানি মহানির্বাণতন্ত্র ক্রয় করিবেন! বর্তমান-কালে মানবজাতির অবস্থা বুঝিয়া চরাচরের গুরু শ্রীশ্রীসদাশিব মনুষ্যজাতিকে এই মহারত্ন প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের নিকট এই তন্ত্র অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। তাহার পর, এই তন্ত্র অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন। তাহা করিলে আপনার ইহকালে সুখ ও পরকালে সদ্গতি হইবে। আর বিশেষ কথা এই যে, এই তন্ত্রের প্রভাবে অকালমৃত্যুজনিত মহা শোকে আপনার হৃদয় সন্তপ্ত হইবে না। সেই সদাশিব এক্ষণে আমার কণ্ঠে আসীন হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে আপনাকে আমি এই কথাগুলি বলিলাম।"

আহা! এই কথাগুলি বলিবার নিমিত্ত বেচু যেন এতক্ষণ জীবিত ছিল।

যাই এই কথাগুলি শেষ হইল, আর দেহ হইতে তাহার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

বেহারাগণ তাহার মৃতদেহ জেলখানায় লইয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলাম। আমি মনে করিলাম যে, মৃতদেহ দিবার অনুমতি হইলে, আমি লোক ডাকিয়া আনিব। এইরূপ মনে করিয়া বাহিরে আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিয়োগী মহাশয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় পৌঁছিয়া তিনি সমুদয় ঘটনা শুনিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি থানায়, ও থানা হইতে আদালতে গিয়াছিলেন। আদালত হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

মিহির মনে করিয়া, যে দিন পুলিশে আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, সেদিন হইতে আমার মনের ভাব পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর মুমূর্ষু বেচুর নিকট বসিয়া, তাহার কথাবার্তা শুনিয়া আমার চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। মনুষ্য-জীবন কিরূপ অনিত্য, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। আমি ভাবিলাম যে, নিয়োগী মহাশয় যেরূপ লোক হউন না কেন, আমি তাঁহার বিচার করিবার কে? মানুষ দোষে গুণে হইয়া থাকে। নিয়োগী মহাশয়েরও অনেক গুণ থাকিতে পারে,—যে গুণের পরিচয় আমি প্রাপ্ত হই নাই। দোষের ভাগ ত্যাগ করিয়া, মানুষের গুণের ভাগ গ্রহণ করাই যে ভাল, সকলকে আমি এই উপদেশ প্রদান করি। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব মনে স্থান দিও না। কাহাকেও ঘৃণা করিও না। কাহারও প্রতি হিংসা করিও না। অনেক সময়ে কু-চিন্তা উদয় হইতে পারে। অন্যের ভাল হইয়াছে শুনিয়া, মনে হিংসার উদয় হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। মনে কু-চিন্তা উদয় হইলে, ক্রমাগত ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকিবে যে,—"হে ঈশ্বর! আমার মন হইতে এরূপ চিন্তা দূর কর।"

এইরূপ ভাবিয়া আমি কাঁদিতে কাঁদিতে নিয়োগী মহাশয়কে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করিলাম। এরূপ ঘোর দুঃখ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার অন্তঃকরণ আর্দ্র হইল না; আমার প্রতি তাঁহার রাগ দূর হইল না। অন্ততঃ তাঁহার কোপ-দৃষ্টি দেখিয়া আমি তাহাই বুঝিলাম। যাহা হউক, তাঁহার পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত লোক ডাকিয়া আনিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। সে অনুমতি তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। গাড়ী করিয়া শীঘ্র আমি লোক ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহার পুত্রের সৎকার আমরাই করিলাম। দুই দিন পরে নিয়োগী মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ আমি পাই নাই। পাইতে ইচ্ছাও বড় করি না।

পাল মহাশয়ের ও তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধানে পুনরায় আমি প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সহিত যাহাদের আলাপ পরিচয় ছিল, একে একে সকলকে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার গ্রামে গিয়া একে একে গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আরও কত স্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান আমাকে বলিয়া দিতে পারিল না। মিহির নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, আর লুক্কায়িত থাকিবার আবশ্যক নাই, এই মর্মে দুইখানি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। তাহাতেও কোন ফল হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সহিত পুনরায় যে আমার দেখা হইবে, সে বিষয়ে আমি হতাশ হইলাম না। কারণ, পাল মহাশয় সম্পত্তিশালী লোক। এক দিন না এক দিন তাঁহাকে দেশে আসিতেই হইবে। তাহা ব্যতীত, কলিকাতার বাসা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। কলিকাতার সেই তিনটি ঘরে তাঁহার জিনিস পত্র আছে। তাহাতে চাবি দিয়া গিয়াছেন। এক দিন না এক দিন কেহ না কেহ সে দ্রব্যাদি লইতে আসিবে। এই প্রত্যাশায় আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায় : আশু কষ্ট পরে ইষ্ট

এইরূপে আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাস পড়িল। সে বৎসর দারুণ বর্ষা হইয়াছিল। পথঘাট জলে জলময় ও কাদায় কর্দমময় হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে চারিটার সময় আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় এক জন উৎকলবাসী আমাকে একখানি চিঠি আনিয়া দিল। সে পত্রে কেবল এই কয়টি কথা লেখা ছিল,—"অনুগ্রহ করিয়া অতি গোপনে এই লোকের সহিত শীঘ্র আসিবেন। আসিলে সকল কথা জানিতে পারিবেন।"

পাল মহাশয় ও মিহিরের জন্য সর্বদাই আমার মন উদ্বিগ্ন ছিল। চিঠিখানি পাইবামাত্র আমার মনে হইল যে, এইবার বোধ হয়, তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম। কালবিলম্ব না করিয়া, আমি সেই লোকের সহিত চলিলাম। কলিকাতার যে অংশে অতি ঘন বসতি, উড়িয়া আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেল। সংকীর্ণ গলির ভিতর সংকীর্ণতর গলি, তাহার ভিতর একখানি খোলার বাড়ীতে আমি প্রবেশ করিলাম। অতি কুৎসিত স্থান, দুর্গন্ধে নাড়ি উঠিয়া যায়। চারিদিক্ কাদায় ও ময়লায় পরিপূর্ণ। সেই বাটীতে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একখানি ঘর উড়িয়া আমাকে দেখাইয়া দিল। ঘরের মেজে নিতান্ত আর্দ্র, যেন জল সপ-সপ করিতেছিল। আমি দেখিলাম যে, সেই ভিজা মেজেতে সামান্য একটি মাদুরের উপর গেরুয়া পরিচ্ছদ পরিহিত এক যুবক পড়িয়া আছে। "কেও মিহির"—এই কথা বলিয়া আমি তাহার নিকট গিয়া বসিলাম।

মিহির আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। চিনিতে পারিলাম বটে; কিন্তু সে মিহির আর নাই; তাহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে; তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে, শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ বাহির হইতেছে। মধ্যে মাঝে অতি কষ্টের সহিত সে কাসিতেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধন করিতেও যেন তাহার বড় ক্লেশ হইতেছে। আমি পুনরায় বলিলাম,—"মিহির!"

মিহির মৃদুস্বরে বলিল,—"চুপ চুপ! আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, কেহ শুনিতে পাইলে এখনি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম,—"তবে তুমি এখনও সে কথা জান না? মিহির! সে ভয় আর কিছুমাত্র নাই! তুমি যে নিরপরাধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বেণীকে নিয়োগী-পত্র খুন করিয়াছিল; পুলিশের কাছে ও আদালতে সাহেবের কাছে, সে তাহা স্বীকার করিয়াছে। তোমার আর কোন ভয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া মিহির বলিল,—"আমাকে তুলিয়া বসাও। আমি উঠিতে পারি না।"

আমি মিহিরকে তুলিয়া বসাইলাম। আমার স্কন্ধে মাথা ও বক্ষঃস্থলে আপনার শরীর রাখিয়া, সে বসিয়া রহিল। তাহার পর, বেচুর আদ্যোপান্ত বিবরণ বার বার সে আমার মুখ হইতে শুনিল। সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহার রোগ ও যাতনার যেন অনেকটা উপশম হইল, আর তাহার শরীরে যেন একটু বল হইল।

তাহার পর, আমি তাহাকে বলিলাম,—"মিহির! ভাই! তোমাকে আর ক্ষণ-কালের জন্য আমি এ স্থানে রাখিতে পারি না। এ স্থানে সহজ মানুষ মরিয়া যায়। তুমি ভয়ানক জ্বর ভোগ করিতেছ। বুকেও বোধ হয়, কিছু রোগ হইয়া থাকিবে। অতএব তোমাকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইব।"

মিহির উত্তর করিল,—"কি করিয়া তাহা হইবে! আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। এই সন্ন্যাসীবেশে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, আজ দশ দিন

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই, আমি শ্যাম-বাজারে গদাধর মোড়লের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পরদিন হইতে এই বিষম জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়াছি। সেই অবধি বিছানায় পড়িয়া আছি;—না ঔষধ, না পথ্য। গাড়ীতে যাইতে পারিব না, পালকি করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু গাড়ী কি পালকি ভাড়া কোথায় পাইব যে, তোমার সহিত তোমার বাসায় যাইব? তবে তুমি যদি গদাধর মোড়লের নিকট একবার যাইতে পার, তাহা হইলে হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গদাধর মোড়ল কে?"

মিহির উত্তর করিল,—"তিনি বাবার বন্ধু, আমাদের স্বজাতি। কলিকাতায় তিনি ব্যবসায় করেন। শ্যামবাজারে তাঁহার বাসা, তোমার সহায়তায় যে রাত্রে আমি পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই, সেই দিন বাবার নিকট যাহা কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা তিনি আমাকে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এ টাকা ফুরাইয়া গেলে তুমি গদাধর মোড়লের নিকট যাইবে, যখন যাহা আবশ্যক হইবে, গদাধর তোমাকে দিবে। আমাকে কদাচ তুমি পত্র লিখিবে না। কারণ, সেই পত্রের অনুসরণে পুলিশে তোমার সন্ধান পাইতে পারে।"

একটু চুপ করিয়া মিহির পুনরায় বলিল,—"তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেও আমি গদাধর মোড়লকে পত্র লিখিতাম, পিতাকে লিখিতাম না। গদাধর মোড়ল পিতাকে আমার সংবাদ দিতেন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যে দিন বাটী যাইতে ইচ্ছা হইত, সে সংবাদও গদাধর মোড়লের দ্বারা পিতাকে জানাইতাম। পিতা, মাতা ও রাধারাণী সকলে আমার জন্য বসিয়া থাকিতেন। আমি উপস্থিত হইলে, জানালার গরাদে তুলিয়া, ঘরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত রাধারাণী পথ করিয়া দিত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে রাত্রি তুমি কিরূপে পলায়ন করিলে? আর তাহার পর এত দিন কোথায় ছিলে? তুমি যে নিরপরাধ, তাহা যখন প্রমাণ হইল, তখন আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। সে সংবাদ-পত্র তোমার হাতে পড়ে নাই?"

মিহির উত্তর করিল,—"না সে বিজ্ঞাপন আমি দেখি নাই। মৃত্যুকালে বেচু আপনার দোষ স্বীকার করিয়া, আমাকে যে খুনের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছে, সে কথা তোমার মুখ হইতে এইমাত্র শুনিলাম। সে রাত্রি পুলিশে তোমাকে লইয়া গেল। তাহার পর, বাসাড়েগণ যে যাহার ঘরে পুনরায় শয়ন করিল। আমি তোমার ঘর হইতে বাহির হইয়া, পুনরায় পিতা, মাতা ও ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার পর বাটীর সদর দরজা দিয়া পলায়ন করিলাম, অশ্বত্থ গাছ দিয়া নহে। দিন দুই কলিকাতার এক খোলার ঘরে লুক্কায়িত রহিলাম। তাহার পর, কাপড় ছোপাইয়া, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে সে বাটী হইতে বাহির হইলাম। একদল সন্ন্যাসীর সহিত প্রথম জগন্নাথ যাইলাম। তাহার পর, নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলাম। পিতা যা কিছু টাকা দিয়াছিলেন, সে সমুদয় খরচ হইয়া গিয়াছে। টাকার জন্য গদাধর মোড়লের নিকট গমন করিলাম। তাঁহার দেখা পাইলাম না। তাহার পর আজ নয় দিন পীড়িত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছি। সে রাত্রি পিতা আমাকে তোমার পরিচয় দিয়াছিলেন; তুমি কোন্ আফিসে কাজ কর, তাহাও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তাই আজ তোমাকে সংবাদ দিতে পারিলাম। তোমার বাসায়, কি গদাধর মোড়লের বাসায় লোক পাঠাইতে আমি সাহস করিতাম না। সে যাহা হউক, আমার হাতে এখন একটিও পয়সা নাই। গাড়ী কি পাল্‌কি ভাড়া কোথায় পাইব যে, তোমার বাসায় যাইব?"

আমি বলিলাম,—"সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। গদাধর মোড়ল বোধ হয়, তোমার পিতার ঠিকানা জানেন ?"

মিহির উত্তর করিল,—"বোধ হয় কেন! পিতার ঠিকানা তিনি নিশ্চয় জানেন।"

মিহিরকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইলাম। পরিষ্কৃত শুভ্র বসন পরাইয়া, তাহাকে পরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করাইলাম। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিয়া তাহাকে দেখাইলাম। ডাক্তার বলিলেন যে, মিহিরের পীড়া বড় কঠিন হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থলের দুই দিকেই প্রদাহ হইয়াছে। যাহা হউক, তাহার ঔষধ ও পথ্যের আয়োজন করিয়া, ভট্টাচার্য মহাশয়কে তাহার নিকট বসাইয়া, আমি সেই রাত্রিতেই গদাধর মোড়লের অনুসন্ধানে গমন করিলাম। এ স্থানে বলিয়া রাখি যে, যখন যেরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল, ভট্টাচার্য মহাশয়কে তাহার সমুদয় বিবরণ আমি প্রদান করিতেছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহ আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

গদাধর মোড়লের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। পাল মহাশয়ের তিনি বন্ধু বটেন ; কিন্তু মিহির যে নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, সে সংবাদ এ পর্য্যন্ত তিনি শ্রবণ করেন নাই। আমার মুখে সেই সমুদয় বিবরণ শুনিয়া, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু মিহিরের কঠিন পীড়া শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, পাল মহাশয় কাশীতে আছেন। সেই ঠিকানায় তৎক্ষণাৎ আমি বিস্তারিত ভাবে তারে খবর দিলাম। ডাক্তার খরচের নিমিত্ত অনেকগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া, মোড়ল মহাশয় সেই রাত্রিতেই আমার সঙ্গে মিহিরকে দেখিতে আসিলেন। মিহিরকে দেখিয়া তিনিও পাল মহাশয়কে স্বতন্ত্রভাবে তারে খবর দিলেন।

এক দিন পরে পাল মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মিহির যে নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, সে কথা তিনিও পূর্বে শ্রবণ করেন নাই। আমার তারের সংবাদে সে সুসমাচার তিনি প্রথম প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রের মুখ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পীড়ার জন্য সকলকেই ঘোরতর উৎকণ্ঠিত হইতে হইল। মিহিরের পীড়া ক্রমে এমনি কঠিন হইয়া উঠিল যে, দিন কয়েক তাহার বাঁচিবার আশা একেবারেই ছিল না। পাল মহাশয়, তাঁহার গৃহিণী, রাধারাণী, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর আমি—এই কয় জনে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মিহিরের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় মিহির এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

পীড়ার যখন একটু উপশম হইল, তখন মিহির একদিন আমার হাতটি ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল,—"ভাই! তুমি আমার ভাই।"

পাল মহাশয়, তাঁহার গৃহিণী ও রাধারাণী সকলেই মিহিরের বিছানার পার্শ্বে সেই সময় বসিয়াছিলেন। মিহিরের এই কথা শুনিয়া পাল মহাশয় বলিলেন,—"হাঁ, মিহির! মদন তোমার ভাই। মদনকে প্রথম আমি বুদ্ধি-শুদ্ধিহীন পাগল বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার স্বভাব দেখিতেছি, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ধীর-মধুর বাক্যে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। তাহার পর, মদন আমার যে উপকার করিয়াছে, জীবনে তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। সে রাত্রি তোমার পলায়ন, তাহার পর খুনী অভিযোগ হইতে তোমাকে অব্যাহতি দান, অবশেষে এই সংকট পীড়ায় তোমার জীবন রক্ষা,—এ সমুদয় মদনের সহায়তায় হইয়াছে। সে নিমিত্ত আমি বলিতেছি যে, তুমি আমার যেমন পুত্র, মদনও সেইরূপ আমার পুত্র। রাধারাণী মা! তুমি কি বল ?"

রাধারাণী বুঝিতে পারিল। লজ্জায় সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। তাহার পর, সে স্থান হইতে উঠিয়া সে পলায়ন করিল।

সেই দিন আমি মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মিহির! মুখস পরিয়া কলিকাতার জনাকীর্ণ পথ দিয়া তুমি কি করিয়া চলিতে? কেহ তোমাকে কিছু বলিত না?"

একটু হাসিয়া মিহির উত্তর করিল,—"তুমি পাগল! পথ চলিবার সময় আমি মুখস পরিতাম না। কেবল অশ্বত্থ গাছে উঠিবার সময় আমি মুখস পরিতাম। চোর মনে করিয়া কেহ আমার নিকট না আসে, লোকে ভূত মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করে, সেই জন্য গাছে উঠিবার সময় আমি মুখস পরিতাম। দুই একবার ভূত মনে করিয়া লোকে পলায়ন করিয়াও ছিল।"

খুনী অভিযোগ হইতে মিহির সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই। ভাল হইয়া হুগলীর কাছারিতে তাহাকে হাজির হইতে হইয়াছিল। সে স্থানে সামান্য একটু মোকদ্দমাও হইয়াছিল। এই বিচারের সময় আর একটি নূতন কথা বাহির হইয়া পড়িল। বেচুর সহিত আর দুইটি ছাত্র একঘরে শয়ন করিত। খুনের সময় তাহাদের এক জন জাগরিত ছিল। বেচুকে বেণীর ঘরে প্রবেশ করিতে ও কিছুক্ষণ পরে দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিতে সে দেখিয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক কথা সে অবগত ছিল। মিহিরের হইয়া সে সাক্ষ্য প্রদান করিল। যাহা হউক, অল্প দিনের মধ্যেই মিহির খালাস পাইল।

অধিক আর কিছুই বলিবার নাই। মিহির খালাস পাইলে, পাল মহাশয় তাহাকে লইয়া দেশে গমন করিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ও মিহির কলিকাতায় আসিয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহাদের গ্রামে গমন করিতাম। রাধারাণীর সহিত আমার যে বিবাহ হইবে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা হয় নাই। কিন্তু কি আমি, কি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কি আর আর লোক, সকলেই বুঝিল যে, সে তো হবেই, তবে আর আবশ্যক কি! আমার পিতা যে স্বহস্তে চাষ করিতেন, সে কথার কোনরূপ আর উল্লেখ হইল না। তবে এক দিন কথায় কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পাল মহাশয় বলিলেন যে,—"লোকের মনে কি কুসংস্কার! যাহাদের পরিশ্রমে ভূমি হইতে মনুষ্যের আহার আচ্ছাদন উৎপাদিত হয়, তাহাদিগকে লোকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করে! বড় মানুষের রাজভবন ও গাড়ী ঘোড়া হইতে সামান্য ভিখারীর একমুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তু কৃষকের পরিশ্রমেই উৎপন্ন হয়। ভারতের সমুদয় জাতির সম্বল—কৃষিকার্য্যের ফল। সুতরাং কৃষকেরা সাধারণের পূজ্য, তাহারা ঘৃণিত নহে। এ বিবেচনা যাহাদের নাই, তাহাদিগকে আমি আর কি বলিব!"

পাল মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"বিপদে পতিত হইয়া আমি আর একটি জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের নিকট আছেন। জলে যেমন মৎস্য ডুবিয়া থাকে, ঐশ্বরিক শক্তির ভিতর সেইরূপ আমরা ডুবিয়া আছি। সেই অনন্ত জ্ঞানসাগরে আমরা যে ডুবিয়া আছি, তাহা যদি ভালরূপে আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে মনুষ্য নানা জ্ঞান ও নানারূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু তিনি যে সর্বদাই আমাদের কাছে আছেন, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সেই জন্য সেই বিশ্বাত্মার সহিত নিজের আত্মা সংযোজিত করিয়া, মানুষ সেই অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি-সাগর হইতে নিজের সামান্য জ্ঞান ও শক্তি পরিপুষ্ট করিতে পারে না। তথাপি তিনি সর্বদাই আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। বিনা দোষে মিহিরকে যখন পথে পথে ফিরিতে হইয়াছিল, তখন ভগবানের অবিচারের উপর আমি কতই না দোষারোপ করিয়াছিলাম। কিন্তু

মিহিরের উপর সেই মিথ্যা অভিযোগ যদি আরোপিত না হইত, তাহা হইলে তাহার এক মাস পরেই বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইয়া যাইত। কারণ, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল। সে বিবাহ হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইত। যে চুরি করিতে পারে, যে খুন করিতে পারে, আমার কন্যা সেইরূপ লোকের হাতে পড়িত। তাহার পর, রোগগ্রস্ত লোকের হাতে পড়িয়া অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে বিধবা হইতে হইত। অতএব মিহিরকে দুই বৎসরের নিমিত্ত ক্লেশ দিয়া, দয়াময় ভগবান চিরজীবনের নিমিত্ত আমার কন্যাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

পুনরায় যখন মাঘ মাস আসিল, পুনরায় যখন শ্রীপঞ্চমীর সময় আসিল, তখন পাল মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিবাহের দিন ধার্য্য করিতে বলিলেন। তাহার পর, সে শুভকার্য্য,—অন্য লোকের যে ভাবে সম্পন্ন হয়, আমারও সেইভাবে হইল। পূর্ব্বের ন্যায় যদি আমার প্রাণে রস থাকিত, তাহা হইলে কিরূপে বাসর-ঘর হইল, কিরূপে শালী-শালাজগণ আমার সহিত তামাসা করিল, সে সব পরিচয় বিস্তারিত ভাবে আমি আপনাদিগকে প্রদান করিতাম। কিন্তু নিয়োগী-পুত্রের চিতাগ্নিতে সে রস আমার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রস নাই বটে, তবে মন আমার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কারণ, আমার রাধারাণী, রূপে গুণে লক্ষ্মী। সরস্বতী দেবীর বরে আমি একাধারে এই লক্ষ্মী-সরস্বতী লাভ করিয়াছি। সে দিন দেবীকে পূজা করিতে গিয়াছিলাম, তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পাইয়াছিলাম। তাহার পর, তাঁহার দ্বারা পাল মহাশয়কে পাইলাম। অবশেষে রাধারাণীকে লাভ করিলাম। সে দিন দেবীকে যদি অঞ্জলি দিতে না যাইতাম, তাহা হইলে এ সব যোগাযোগ হইত না। সেই জন্য বলি যে, মা সরস্বতীর কৃপায় আমি রাধারাণীকে লাভ করিয়াছি। রাধারাণীকে লাভ করিয়া, আজ, হে পাঠক! আপনাদের দাসানুদাস এই মদন ঘোষের বদন হাসিতে পূর্ণ হইয়াছে।

শেষভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ডাকিনীর নাচ

গড়গাড়ি মহাশয় বলিলেন,—

মদন ঘোষের গল্পটি শেষ হইবার পূর্বে মুণ্ডটির দিকে আমি চাহিয়াছিলাম। গল্প যত শেষ হইতে লাগিল, মুণ্ডটির নাসিকা ও চক্ষু ততই বিলীন হইতে লাগিল, আর ইহার বর্ণ ততই লোহিত হইতে লাগিল। অবশেষে গল্পটি যেই সমাপ্ত হইল, আর মুণ্ডটি তৎক্ষণাৎ রক্তমুক্তায় পরিণত হইল।

এরূপ যে হইবে, পূর্ব হইতেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সুতরাং শেষ মুণ্ডটিও যখন মুক্তা হইয়া গেল, তখন আমি বিস্মিত হইলাম না, মনে মনে দুঃখও করিলাম না। আমি ভাবিলাম যে, মা জগদম্বা যখন আমার প্রতি কৃপা করিলেন না, তখন নিশ্চয় আমার আয়ু শেষ হইয়াছে। ডাকিনীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না, আজ এই স্থানেই স্বহস্তে আমি আমার প্রাণ বিসর্জন করিব।

এইরূপ মনে করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পর যোড়হস্তে মাকে বলিলাম,—"মা! এ দীন হীন সন্তানকে তুমি দয়া করিলে না। তোমার মুণ্ডমালার মুণ্ডগণ ফাঁকি দিয়া আমার গল্প শুনিল। তাহারা আমার কোন উপকার করিল না। তোমার এ কলঙ্ক, মা, জগতে চিরকাল থাকিবে। তোমার শাণিত খড়্গ দ্বারা এই মুহূর্তে আমি আমার মুণ্ড কাটিয়া তোমার পায়ে সমর্পণ করিব। তাহাতে যদি মা, তোমার সন্তোষ হয়, তো তাহাই হউক!"

মায়ের হাত হইতে আমি খড়্গটি লইলাম। হাত দিয়া দেখিলাম যে, খড়্গ অতি সুতীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু এক কোপে নিজের মুণ্ড দেহ হইতে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। পূর্বে কেহ কেহ এরূপ করিয়াছিল, পুস্তকে তাহা আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিরূপে তাহারা করিয়াছিল? আমি দেখিলাম যে, নিজে নিজের মুণ্ড এক কোপে কাটিয়া ফেলিতে পারা যায় না। দুই হাতে খড়্গ ধারণ করিয়া যত বলেই কোপ মারি না কেন, মুণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। অবশেষে এই স্থির করিলাম যে, শয়ন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধরিয়া, বাম দিক হইতে নিজের গলদেশ কাটিতে আরম্ভ করি। যতক্ষণ হস্তে শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ কাটিয়া যাইব, তাহার পর যাহা হয় তাহা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি শয়ন করিলাম ও তাহার পর আমার গলদেশ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এক রতিও কাটিতে পারিলাম না। একবার বাম দিকে, একবার সম্মুখ দিকে, একবার দক্ষিণ দিকে, সকল দিকে খড়্গ রাখিয়া কাটিতে চেষ্টা করিলাম। খড়্গ অতি তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু একটু দাগ পর্যন্তও আমার গলায় পড়িল না। সবলে কোপ মারিয়া দেখিলাম, তাহাতেও কিছু হইল না।

বাহিরে ডাকিনীগণ খল খল হাসিয়া উঠিল; ভূমিকম্প বৃদ্ধের সহিত ডাকিনীগণ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ভূমিকম্প মহাশয় আমাকে বলিলেন,—"বিধাতার ভবিতব্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রজাপতির নির্বন্ধ এই যে, নারিকেলমুখী তোমার পত্নী আর তুমি

তাহার পতি। মা জগদম্বারও এইরূপ ইচ্ছা, বেতালগণেরও এই ইচ্ছা। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। লাউমুখী! শাঁকমুখী! শামুকমুখী! সকলে তোমরা বিবাহের আয়োজন কর। আমার হাতে শঙ্খ দাও, আমি নিজে শঙ্খ বাজাইব।"

মন্দিরটি ডাকিনীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। কেহ ফুলের মালা, কেহ বরণডালা, কেহ শঙ্খ লইয়া মায়ের সম্মুখে সকলে দাঁড়াইল। স্তম্ভিত হইয়া আমিও সেই ভিড়ের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শঙ্খ হাতে লইয়া ভূমিকম্প বলিলেন,—"এ বিবাহের আমি কন্যাকর্ত্তা এবং নিজে পুরোহিত হইব! কিন্তু কন্যা-সম্প্রদানের পূর্বে মায়ের সম্মুখে এস সকলে একবার প্রাণ ভরিয়া নৃত্য করি।"

এই বলিয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ভূমিকম্প মহাশয় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শঙ্খের শব্দে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার নৃত্যের বলে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে অন্য ডাকিনীগণ কেহ উলু দিতে দিতে, কেহ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য করিতে লাগিল। ঢাক ঢোল তুরী ভেরী দামামা দগড় প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দে জগৎ পরিপূর্ণ হইল।

নৃত্য প্রথম ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্রমে তাহার বেগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। বাষ্পীয় যন্ত্রের চক্রের ন্যায় ডাকিনীদিগের দেহ ক্রমে প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

ডাকিনীদিগের উলুধ্বনিতে, ভূমিকম্প মহাশয়ের শঙ্খধ্বনিনাদে, নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের ভীষণ কোলাহলে, আমার কর্ণে তালি লাগিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের দারুণ ঘূর্ণায়মান নৃত্যে আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাদের চক্রবৎ ঘূর্ণিত দেহ দর্শনে আমার মস্তক যেন প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

মস্তক ঘুরিয়া আমি ভূমিতে পতিত হই আর কি, এমন সময় কোথা হইতে দুইটি হস্ত আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। সেই হস্ত অবলম্বনে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, কাহার হস্ত দেখিবার নিমিত্ত আমি চাহিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম যে, মায়ের বাম হস্তস্থিত সেই নরমুণ্ড ও মুণ্ডমালার সমুদয় মুণ্ড মুণ্ড রূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নর-মুণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে; আর প্রতি মুণ্ডের গলদেশ হইতে দুইটি করিয়া হস্ত বাহির হইয়াছে। একটি মুণ্ডের দুইটি হস্ত আমাকে ধরিয়া আছে, ও অন্য মুণ্ডদিগের হস্তগুলি ডাকিনীদিগকে ধরিয়া আছে। আমাকে যে হস্তদ্বয় ধরিয়া-ছিল, তাহারা আমাকে স্থিরভাবে রাখিয়াছিল, কিন্তু অন্য মুণ্ডদিগের হস্তগুলি ডাকিনীদিগকে প্রবলবেগে ঘূর্ণিত করিতেছিল। পুতুল-বাজির পুতুলগণ যেরূপ মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, মুণ্ডমালার হস্ত দ্বারা ডাকিনীগণও সেইরূপ পরিচালিত হইতেছিল। বোঁ বোঁ, ভোঁ ভোঁ, তা থেই থেই, তা থেই থেই, হস্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ডাকিনীগণ কখন ঘুরিতেছিল, কখন নাচিতেছিল। ভূমিকম্পের নৃত্য ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হস্ত কর্তৃক পরিচালিত হইয়া তিনি শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিলেন। এত বেগে তিনি আমার চারি দিকে ঘুরিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন সর্বদাই এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, আমার এইরূপ বোধ হইল। দারুণ নৃত্যে, দারুণ কোলাহলে, আমার মস্তিষ্ক দধি-মন্থনের ন্যায় যেন মন্থিত হইতে লাগিল। আমার দারুণ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। ঘোর বেদনায় আমার মস্তক যেন খসিয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময় মুণ্ডমালার হস্ত দুইটি ভূমিকম্পের মস্তক ধরিয়া আমার দিকে কিছু অবনত করিল। শঙ্খের এক দিক্ ভূমিকম্পের মুখে রহিল, শঙ্খের পশ্চাৎ দিক্ আমার বক্ষঃস্থল ঈষৎ স্পর্শ করিল। এই সময় ভূমিকম্প-মহাশয় শঙ্খে সবলে ফুঁ দিলেন। এই সময় মুণ্ডমালার হস্ত দুইটি আমাকে ছাড়িয়া দিল। শঙ্খের পশ্চাৎ দিক্ হইতে প্রবল ঝটিকার ন্যায় বায়ু নির্গত হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে লাগিল। সেই প্রবল বায়ুবেগে আমার শরীর মন্দিরের দ্বার পথ হইয়া আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া শূন্যপথে আমার শরীর প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। নদ-নদী, বন-উপবন, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগরের উপর দিয়া আমার শরীর শূন্যপথে ছুটিতে লাগিল। দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার শরীর সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিল। সে দারুণ বেগে জ্ঞান-গোচর আর আমার কিছুমাত্র রহিল না। অবশেষে ঝুপ করিয়া আমি ভূমিতে পতিত হইলাম।

ভূমিতে পতিত হইবার পূর্বে আমি চক্ষু মুদিত করিয়াছিলাম। ভূমিতে পতিত হইয়াও আমি চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে, আমি আর জীবিত নাই, আমার হস্ত পদ অস্থি মজ্জা সমুদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম প্রথম আমি আমার মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, মস্তকটি চূর্ণ হইয়া ধূলার ন্যায় হইয়া যায় নাই। তাহার পর হাত দুইখানি দেখিলাম; দেখিলাম যে, হাত দুইখানিও যেমন তেমনি আছে, তবে কৃশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর পদদ্বয় নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। তাহাও ভগ্ন বলিয়া বোধ হইল না। অবশেষে কোথায় কোন্ দেশে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টি করিলাম। যাহা এখন আমার নয়নগোচর হইল, তাহা দর্শন করিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। আমি দেখিলাম যে, পাহাড়-পর্বত অথবা সাগর-মহাসাগরের উপর আমার শরীর পতিত হয় নাই, ঘরের ভিতর, তক্তপোষে, বিছানার উপর আমার শরীর পতিত হইয়াছে। অন্ততঃ চক্ষু চাহিয়া আমি দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর আমি শয়ন করিয়া আছি, আর আমার পদতলে সেই তক্তপোষের উপর, এক জন স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আমার কথাটি ফুরুলো

সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম যে, সেই নারিকেল-মুখী বুঝি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। অতি ধীরে ধীরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে ও! নারিকেলমুখী?"

স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর করিলেন না। আমি আরও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। স্ত্রীলোকটি মানুষের মত, ডাকিনীর মত নহে। তাহা দেখিয়া মন আমার অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সে স্ত্রীলোক যেন আমার পরিচিতা, যেন কোথায় তাহাকে আমি দেখিয়াছি, এইরূপ আমার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কে, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারিলাম না।

স্ত্রীলোকটিকে স্মরণ করিবার নিমিত্ত মনে মনে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় সেই ঘরে আর এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রবেশ করিলেন। আমার বিছানায় যিনি

বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শৈল! জামাতা এখন কেমন আছেন?"

এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র আমার সকল কথা স্মরণ হইল। শৈল আমার স্ত্রীর নাম। যে স্ত্রীলোকটি বিছানায় আমার পদতলে বসিয়া ছিলেন, তিনি আমার স্ত্রী। বৃদ্ধা আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী!

আমার স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, নিদ্রা অবসানে হয় তো জ্ঞান হইবে। কিন্তু কৈ? জ্ঞান তো হয় নাই। এই মাত্র নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বে-ছুট কথা বকিলেন।"

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবল! বাবা! এখন তুমি কেমন আছ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—"বালাই! কোথায় পড়িবে কেন? বাড়ীতে আছ। আমার বাড়ীতে আছ। তোমার শ্বশুরবাড়ীতে তুমি আছ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে ডাকিনী সব কোথায় গেল? তাহারা তো এখানে আসে নাই।"

শাশুড়ী উত্তর করিলেন,—"ছি বাবা! ও সব কথা ছাড়িয়া দাও। ঔষধ দিয়া দুষ্টগণ তোমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল। ডাকিনী এখানে কোথা হইতে আসিবে বাবা? ঐ দেখ, শৈল বসিয়া কাঁদিতেছে। ও সব, বেছুট কথা ছাড়িয়া দাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কত দিন আমি এ স্থানে আছি?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—"তোমার প্রতিবাসী বটকৃষ্ণকে তুমি পত্র লিখিতে বলিয়াছিলে। তাহার চিঠি পাইবামাত্র যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া আমি ও শৈল তোমার বাড়ীতে গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম যে, তোমার ভাই হতভাগা তোমার পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমার তখন জ্ঞান-গোচর কিছুই ছিল না। কিন্তু বামী গোয়ালিনীর মুখে ভিতরের কথা আমরা সব শুনিলাম। সত্য সত্য তুমি পাগল হও নাই। ওক্কুরের বন্ধু সেই পোড়ার-মুখো ডাক্তার কি তোমাকে খাইতে দিয়াছিল। সে ঔষধ খাইয়া তোমার ওরূপ হইয়াছিল। তোমার ভাই কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। আমরা নালিশ করিবার ভয় দেখাইলাম। তবে সে তোমাকে ছাড়িয়া দিল। সে স্থানে থাকিলে নিশ্চয় তোমাকে মারিয়া ফেলিত। মা'র পেটের ভাই যে এমন নিষ্ঠুর হয়, তা কখনও শুনি নাই। কিন্তু সে যাহা হউক, এখন তুমি কেমন আছ, বাবা? আমাদের চিনিতে পার? আজ তিন মাস তোমাকে আমরা এস্থানে আনিয়াছি। তাহার উপর আবার জ্বর-বিকার। বাঁচিবার আশা আর ছিল না। এক-চল্লিশ দিন যে কি করিয়া কাটিয়াছে, ভগবান্ তাহা জানেন। তিন মাস তুমি আমাদিগকে চিনিতে পার নাই। নারিকেল-মুখী, শাঁক-মুখী কত কি আমাদিগকে বলিতেছিলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে কি সত্য সত্য আমি ডাকিনীর হাতে পড়ি নাই?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—"বালাই! ডাকিনীর হাতে কেন পড়িবে? শৈল তোমাকে সকল কথা বলিবে। এখন শৈলের সহিত একটু কথাবার্তা কর। আজ তিন মাস বাছা আমার আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।"

এই কথা বলিয়া শাশুড়ী ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে আমি বুঝিলাম যে, সেই ডাক্তারের ঔষধ সেবন করিয়া সত্য-সত্যই আমি জ্ঞান-হত হইয়া গিয়াছিলাম। আমি কলিকাতা গমন করি নাই, আমি গির্জার উপরে পতিত হই নাই, সমুদ্রের ঝিনুকের ভিতরও আমি বাস করি

নাই, ডাকিনীদিগের সহিতও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমার গ্রামবাসীর পত্র পাইবামাত্র স্ত্রী ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাদের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ আমার গ্রামে গমন করেন, ও সে স্থান হইতে তাঁহারা আমাকে আমার শ্বশুরালয়ে আনয়ন করেন।

আমার শাশুড়ী, স্ত্রী ও আর সকলে বলিলেন বটে যে, সনাতন নস্কর ভূমিকম্প মহাশয়, গির্জা, সমুদ্র, সুন্দরবন, ডাকিনী ও কালীর মন্দির, এই সমুদয় সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, সে সমুদয় পীড়ার খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু সকলের কথা এখন পর্য্যন্ত আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। সে সমুদয় বিষয় আমি এত প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া আমি ভাবনা করিতেও পারি না।

আমার স্ত্রী বলিলেন যে, শ্বশুরালয়ে আগমনের পর আমি জ্বর-বিকার দ্বারা আক্রান্ত হই। এক-চল্লিশ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া সেই দিন সবে মাত্র আমার জ্ঞান হইয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, জ্বর-বিকার কাটিয়া গেলে আমার মস্তিষ্কের দোষও কাটিয়া যাইবে। প্রকৃত তাহাই হইল, সেই দিন হইতে আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল।

সে দিন আমার স্ত্রী আমাকে অধিক কথোপকথন করিতে দিলেন না। আমার ভ্রাতার বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী সে দিন সে কথার কোন উত্তর দিলেন না।

কিছু সুস্থ ও সবল হইলে, দুই চারি দিন পরে, পুনরায় আমি আমার ভ্রাতার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার গৃহিণী তখনও পরিষ্কার করিয়া কোন উত্তর করিলেন না। "আমি শুনিয়াছি যে, ওক্কুর কলিকাতায় আছে।" তখন তিনি কেবল এই কথা বলিলেন।

প্রায় এক মাস পরে, যখন আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলাম, তখন এক দিন আমার স্ত্রী আমাকে কলিকাতা যাইতে বলিলেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, "আমরা শুনিয়াছি যে, ওক্কুরের বড় বিপদ হইয়াছে। উচ্চ ছাদের উপর বসিয়া সে এক দিন মদ খাইতেছিল। সেই সময় নিকট দিয়া একটি চিল উড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া চিলের মত উড়িতে তাহার সাধ হইল। চিলের মত উড়িতে গিয়া সে ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার দুইটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডাক্তারে তাহার পা দুইটি কাটিয়া দিয়াছে। এখন সে হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে।"

এই কথা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ কলিকাতা গমন করিলাম। কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম যে, সত্যসত্যই অক্রুর হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে, আর তাহার পদদ্বয় কর্ত্তিত হইয়াছে। শ্বশুরালয়ে আমি যখন জ্বরবিকারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম, কলিকাতায় সেই সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি আরও জানিতে পারিলাম যে, পৈতৃক সম্পত্তির নিজের অংশ অক্রুর বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা সে অপব্যয় করিয়াছে। তাহার হাতে এখন আর একটি পয়সাও নাই।

কলিকাতায় থাকিয়া আমি অক্রুরের ভালরূপে চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। যখন সে একটু সুস্থ ও সবল হইল, তখন তাহাকে দুইটি কাঠের পা কিনিয়া দিলাম। তাহার পর তাহাকে আমার শ্বশুরালয়ে লইয়া আসিলাম। সম্পূর্ণরূপে সে আরোগ্যলাভ করিলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি আমার স্বগ্রামে গমন করিলাম। সে স্থানে কিছুদিন থাকিয়া একটি বয়স্থা কন্যা স্থির করিয়া তাহার বিবাহকার্য্য সমাধা করিলুম। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত, পৈতৃক সম্পত্তির আমার অংশের

উপস্বত্ব তাহাকে আমি দিয়াছি। পাছে বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে জন্য সম্পত্তি একেবারে তাহাকে আমি লিখিয়া দিই নাই। সে এখন গ্রামে দলের দলপতি হইয়াছে। কে কি খায়, কে কি করে, সর্বদা সে সেই সন্ধানে থাকে। লোককে একঘরে করিতে পারিলে, অথবা কাহারও কোনরূপ মন্দ করিতে পারিলে, সে পরম সন্তোষ লাভ করে। কিন্তু তাহার সংসারে সুখ নাই। তাহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল, কিন্তু একটিও বাঁচিয়া নাই। তাহার পর, স্ত্রীর সহিত তাহার সর্বদাই কলহ হয়। কলহ হইলে তাহার স্ত্রী সেই কাষ্ঠনির্মিত পা দুইখানি লুকাইয়া রাখে, তখন চলিতে না পারিয়া অক্রুর নিতান্ত বিপন্ন হয়। দুই হাতের সহায়তায় স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া তাহার হাতে-পায়ে পড়িতে থাকে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর তাহার স্ত্রী কাঠের পা দুইটি বাহির করিয়া দেয়।

স্বগ্রামে থাকিয়া যখন আমি কনিষ্ঠের বিবাহের আয়োজন করিতেছিলাম, তখন গুরুদেব এক মকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় আমার হাতে টাকা ছিল। সে বার আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। কোথায় কিরূপে তাঁহার স্বর্গলাভ হইল, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই।

যে ডাক্তার আমাকে বলপূর্বক ঔষধ দিয়া পাগল করিয়াছিল, ভ্রমক্রমে তাহার একমাত্র পুত্র ডাক্তারখানা হইতে কি ঔষধ খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। সেই শোকে তাহার স্ত্রী বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে। রাত্রি দিন তাঁহার চীৎকারে ও নানারূপ উপদ্রবে ডাক্তার বড়ই বিপন্ন হইয়াছে।

আমি এক্ষণে আমার শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছি। শ্বশুরের যে সম্পত্তি পাইয়াছি, তাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে আমার সংসার চলিয়া যায়। ভালরূপ লেখা-পড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে,—সত্য ও পরোপকার—ইহাই ধর্ম, ইহাই কর্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নোটে গাছটি মুড়ুলো

মহাদেব বাবুকে সম্বোধন করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন,—"আশুধারী মহাশয়! সুবল গড়গড়ি মহাশয়ের কাহিনী আপনারা শ্রবণ করিলেন। আজ সেই গল্প শেষ হইল। এক্ষণে আপনারা ইহার ভাল মন্দ বিচার করুন।"

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, বেতাল পঁচিশ, বত্রিশ সিংহাসন ও আরব্য উপন্যাসের পর এরূপ অদ্ভুত ঘটনা পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই।

তাহার পর, সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। সনাতন নস্কর, ভূমিকম্প-মহাশয়, গির্জা, সমুদ্র, ঝিনুক, সুন্দরবন, ব্যাঘ্র, ডাকিনী, কালীর মন্দির, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সত্য, অথবা পাগলের ভ্রান্তি, এই কথা লইয়া ঘোর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল।

হলধর বলিলেন,—"এ সমুদয় ঘটনা প্রকৃত ঘটে নাই। হয় পাগল অবস্থায় আর না হয় বিকার অবস্থায় গড়গড়ি মহাশয়ের মস্তিষ্কে এই সমুদয় অলীক দৃশ্য আবির্ভূত হইয়াছিল।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"এ সমুদয় ঘটনা সত্য ঘটিয়াছিল। এমন অদ্ভুত ঘটনা কখন মিথ্যা হইতে পারে না।"

হলধর উত্তর করিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় যদি শ্বশুরালয়ে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন, তাহা হইলে কি করিয়া তিনি কলিকাতা গমন করিলেন?"

দুই পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া অবশেষে মহাদেব বাবু ধীর-গম্ভীর স্বরে আপনার রায় প্রকাশ করিলেন।

মহাদেব বাবু বলিলেন,—"গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার জড় দেহ শ্বশুরালয়ে পড়িয়াছিল। নাক্ষত্রিক দেহ অবলম্বন করিয়া তিনি কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন।"

হলধর বলিলেন,—"সে কথা সম্ভব। তা হইতে পারে। সেই যারে বলে তাড়িত-দেহ। সেই তাড়িতদেহে গড়গড়ি মহাশয় এই সকল কাণ্ড করিয়াছিলেন।"

অদ্ভুত ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে আদ্যাধারী মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে সকলের মন হইতে সন্দেহ দূর হইল। প্রফুল্ল মনে সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

মজার গল্প

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা,

৩৮/২নং ভবাণীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী ইলেকট্রো-মেশিন প্রেসে" শ্রীনটবর চক্রবর্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১২ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মজার গল্প" পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল। এই আটটি "গল্প" বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলি যেমন রহস্য-পূর্ণ, তেমনি মনোমুগ্ধকর। এরূপ ধরণের মজাদার গল্পের অবতারণায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই সিদ্ধ-হস্ত। তাঁহার "কঙ্কাবতী" "ভূত ও মানুষ" প্রভৃতি পড়িয়া যাঁহারা কৌতূহলান্বিত আছেন, "মজার গল্প" পড়িয়া তাঁহাদের সে কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে—কি আরও বৃদ্ধি পাইবে, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারেন। এই গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে হাস্য করুণ নানারসে মন পরিপ্লুত হইবে। রসিক পাঠক রসের আস্বাদন গ্রহণ করুন—ইহাই আমাদের বাসনা। ইতি

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
৩০ শে চৈত্র
১৩১২ সাল।

প্রকাশক।

সোনা-করা জাদুগরের গল্প

আদি কথা

মন্ত্র পড়িয়া যাহারা কোন আশ্চর্য্য কাজ করিতে পারে, তাহাদিগকে জাদুগর বা গুণীলোক বলে। জাদুগর সত্য সত্য আছে কি না, সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই। তবে যাহারা জাদুগর সাজিয়া বেড়ায় তাহারা প্রায় অনেকেই জুয়াচোর, ফাঁকি দিয়া লোকের নিকট হইতে তাহারা টাকা উপার্জন করে। "সোনা করিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া অনেক সন্ন্যাসী ও ফকীর লোককে প্রতারণা করে। কোন লোকের বাটী গিয়া তাহারা বলে, "তোমার ঘরে যত রূপার গহনা ও টাকা আছে, সে সমুদয় আমার নিকট আনয়ন কর, মন্ত্রবলে ও দ্রব্যগুণে সেই রূপাকে আমি সোনা করিয়া দিব।" এক দিনে বড় মানুষ হইব, এই লোভে গৃহস্বামী ঘরের সমস্ত রূপার দ্রব্য ও নগদ টাকা তাহাকে প্রদান করেন। অবশেষে সন্ন্যাসী সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে।

কিন্তু লোককে যাহারা প্রতারণা করে, কখন তাহাদের ভাল হয় না। অসৎ লোকদিগকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কখন একটিও মিথ্যা কথা বলিব না, যে কাজ মিথ্যা আমার বিশ্বাস, সে কাজ কখনই করিব না, কখন অসৎ কাজ করিব না,—বালককাল হইতে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার,—ইতরের কাজ। মিথ্যাবাদী লোককে ভগবান্ নিদারুণ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া থাকেন।

মিথ্যাবাদী লোক কিরূপ ভগবানের কোপে পতিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোমাদের নিকট আজ আমি একটি গল্প করিব। গল্পটি সম্পূর্ণ সত্য। যে লোকটির গল্প আমি করিব, অতি প্রখর বুদ্ধি ও নানা বিদ্যায় তাঁহার মন বিভূষিত ছিল ; কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে তিনি গুটিকত মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন। সে জন্য এত বুদ্ধি এত বিদ্যা থাকিতেও, তাঁহার জীবনটি মাটী হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত জীবন তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হইল, কেবল সেই দিন তাঁহার দুঃখের শেষ হইল। পাছে মিথ্যা কথা মুখ দিয়া বাহির হয়, পাছে কোন কুকাজ করিয়া ফেলি, পাছে কোন নীচ চিন্তা মনে উদয় হয়, তাহার জন্য সর্বদা সাবধান হইতে হয়।

কিসে টাকা হয়, সে জন্য সকলেই চেষ্টা করিয়া থাকে। সীসা ও পারাকে রূপা এবং লৌহ ও তামাকে সোনা করিতে পারা যায়, অনেক কাল হইতে লোকের মনে এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে। এক পয়সার তামাকে সোনা করিতে পারিলে, অনায়াসে দশ টাকা লাভ হয়। অর্থোপার্জনের ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? সে জন্য তামাকে সোনা করিবার নিমিত্ত অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে চেষ্টা করিতেছে। সে কালে কত দেশে কত লোকে এই কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। যে বিদ্যা-বলে লোকে এই চেষ্টা করিত, সে কালে লোকে তাহাকে "আলকেমি" বলিত। "আলকেমি" বিদ্যা লইয়া লোকে কোথায় কি করিয়াছিল, সে কথা বলিতে গেলে একটি গল্প হয় ; কিন্তু আজ সে গল্পটি করিব না। আজ তোমাদিগের নিকট আমি বটগার সাহেবের গল্প করিব।

জীবনের প্রথম অবস্থায় ইনিও "আলকেমি" বিদ্যার চর্চা করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ তামাকে সোনা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২১৭ বৎসর পূর্বে বটগার জর্মণীদেশের অন্তর্গত প্রুশিয়া রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বারো বৎসর বয়সে কাজ শিখিবার নিমিত্ত তিনি এক ডাক্তারখানায় নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময়ে রসায়নশাস্ত্র ও "আলকেমি" একই বিদ্যা ছিল। অবসর পাইলেই বটগার "আলকেমি" বিদ্যার চর্চা করিতেন ; অর্থাৎ নানা বস্তুর সংযোগে তামা, লৌহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দিবারাত্রি নানাবস্তু আগুনে গলাইতে লাগিলেন। বটগারের প্রখর বুদ্ধি ও অসাধারণ বিদ্যা দেখিয়া ডাক্তারখানার স্বামীও তাঁহাকে এ কাজে সহায়তা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে বটগার সকলকে বলিলেন যে,—"আমি তামাকে সোনা করিবার উপায় করিয়াছি।" বটগার সত্য বলিতেছেন, কি মিথ্যা বলিতেছেন, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত একদিন তাঁহার প্রভুর অর্থাৎ ডাক্তারখানার স্বামীর সম্মুখে পরীক্ষা হইল। কি উপায়ে তাহা বলিতে পারা যায় না ; কিন্তু বটগার প্রভুর সম্মুখে সোনা প্রস্তুত করিলেন। লোককে ফাঁকি দিবার নিমিত্ত সচরাচর সন্ন্যাসিগণ এইরূপ একটি উপায় অবলম্বন করে। একটা ফাঁপা লৌহনির্মিত নল লইতে হয়। নলের ভিতর কিছু সোনা রাখিয়া তাহার মুখ মোমের দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। নলটি এখন ছড়ির ন্যায় দেখায়। ঘৃত, গন্ধক প্রভৃতি নানারূপ বাজে দ্রব্য মুচিতে রাখিয়া মুচিটি আগুনে বসাইতে হয়। আগুনের তাপে মুচির দ্রব্য যখন গলিয়া যায়, তখন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সেই লৌহনল দ্বারা মুচির দ্রব্য বার বার নাড়িতে হয়। যে মোমের দ্বারা নলের মুখ বন্ধ করা হইয়াছিল, আগুনের তাপে তাহা এখন গলিয়া যায় ; সুতরাং নলের ভিতর যে সোনা ছিল, তাহা এখন বাহির হইয়া মুচির ভিতর গিয়া পড়ে। আগুনের আরও প্রখর তাপে ঘৃত গন্ধক প্রভৃতি জ্বলিয়া যায়। ক্রমে মুচিতে সেই স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন সকলের নিশ্চয় বিশ্বাস হয় যে,—"হাঁ! এই সাধু স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে জানে বটে!" বটগার এই উপায়ে নিজের প্রভুকে ফাঁকি দিয়াছেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তির সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, বটগার সত্য সত্যই সোনা প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

চারিদিকে জনরব হইল যে, অমুক ডাক্তারখানার এক জন লোক সোনা করিতে পারে। "সোনা-করা" লোককে দেখিবার নিমিত্ত ডাক্তারখানার সম্মুখে ভিড় হইল। ক্রমে এই কথা প্রুশিয়া দেশের রাজার কানে উঠিল। তিনি বটগারকে ডাকিতে পাঠাইলেন। বটগার রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক খণ্ড সোনা নজর দিয়া বলিলেন,—"তামা হইতে এই স্বর্ণখণ্ড আমি প্রস্তুত করিয়াছি।" এই সময় নানা যুদ্ধে রাজার অনেক টাকা খরচ হইয়াছিল। তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। টাকার বড় খাঁকতি। রাজার মনে আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন যে, এই লোকের দ্বারা যত ইচ্ছা, তত সোনা প্রস্তুত করিতে পারিব। কোন এক দুর্গম দুর্গের ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া রাশি রাশি স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি বটগারকে আদেশ করিলেন। বটগার এখন অন্ধকার দেখিলেন। কেবল যে কেল্লার ভিতর কয়েদ থাকিতে হইবে, তাহা নহে।

সোনা প্রস্তুত যে সব ফাঁকি, সে কথা জানিতে পারিলে রাজা ফাঁসী দিবেন, কি কি করিবেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। সাক্ষণি (সাক্‌র্ষণি) দেশ অভিমুখে বটগার পলায়ন করিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া রাজা তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সাক্ষণি দেশের সীমায় উপস্থিত হইয়া বটগার সে দেশের অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সাক্ষণি দেশের অধিপতি তাঁহাকে রাজধানী ড্রেসডেন নগরে পাঠাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। ড্রেসডেন নগরে যাইবার নিমিত্ত বটগার যেই যাত্রা করিলেন, আর সেই সময় প্রুশিয়া দেশের সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা হউক, তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

বিলাতে এখন কার্ণেজি নামক এক জন সাহেব আছেন। ইনি বাল্যকালে মজুরি করিয়া দিনপাত করিতেন। তাহার পর বড় হইয়া আমেরিকা মহাদেশে লোহ হইতে ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া ইনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছেন। সেই সম্পত্তি হইতে পঁচাত্তর কোটি টাকা, অঙ্কে লিখিলে এইরূপ হয়,—৭৫,০০,০০,০০০—দীন-দরিদ্রদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত কোন হাঁসপাতালে তিনি দুই কোটি টাকা, দুঃখী ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কোন বিদ্যালয়ে এক কোটি টাকা, বৃদ্ধ পঙ্গুদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত কোন অনাথাশ্রমে এক কোটি টাকা, সাধারণের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কোন পুস্তকাগারে এক কোটি টাকা, এইরূপ নানা স্থানে নানা প্রকার সৎকার্য্যের তিনি অনুষ্ঠান করিতেছেন। কার্ণেজির মত লোকের অর্থলাভের বাসনা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিবে। তা না হইলে অর্থ-লালসা-শূন্য লোক পৃথিবীতে অতি বিরল। অর্থলাভের লালসা চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর এ লালসা সহজে কেহ মন হইতে দূর করিতে পারে না। দুই শত বৎসর পূর্বে যিনি সাক্ষণি দেশের অধিপতি ছিলেন, তিনিই আবার পোলাণ্ড দেশের রাজা ছিলেন। রাজা হইলে কি হয়, তাঁহারও ঘোরতর টাকার খাঁকতি ছিল। বিশেষতঃ এই সময়ে পোলাণ্ড দেশে বিদ্রোহানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত ছিল। সেই বিদ্রোহানল নির্বাণ করিবার নিমিত্ত টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং সাক্ষণাধিপতি যখন শুনিলেন যে, "সোনা-করা" বটগার প্রুশিয়া হইতে পলায়ন করিয়া, তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তখন আনন্দে তাঁহার মন প্রফুল্লিত হইল। তিনি মনে করিলেন যে, "আর ভাবনা নাই, এখন যত ইচ্ছা তত স্বর্ণ প্রস্তুত করাইব।" এইরূপ ভাবিয়া বটগারকে তিনি অতি সমাদরে রাজবাটীর নিকট বৃহৎ এক অট্টালিকায় স্থান প্রদান করিলেন, আর পঞ্চোপচারে তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত রাজকর্মচারী ও রাজভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন। নানারূপ সুখাদ্য ভোজনে ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধানে বটগারের সেবা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চারিদিকে পাহারাও নিযুক্ত হইল। বাটীর বাহিরে পাহারা, বাটীর ভিতরে পাহারা, শয়নঘরে পাহারা—রাত্রিদিন রক্ষকগণ বটগারকে চক্ষুর আড় করে না। বটগার ভাবিলেন যে, যে বিপদের ভয়ে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলাম, এখানেও সেই বিপদ!

ইতিমধ্যে বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত সাক্ষণ-অধিপতিকে সহসা পোলাণ্ড দেশে গমন করিতে হইল। যাইবার পূর্বে বটগারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহার অবকাশ হয় নাই। সে জন্য পোলাণ্ড দেশে উপস্থিত হইয়াই তিনি বটগারকে এক পত্র লিখিলেন,—"আমার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সোনা না করিলে আর চলে না। অতএব কি করিয়া সোনা করিতে হয়, তাহা তুমি আমাকে

বলিয়া দাও।" সেই সঙ্গে রাজকর্মচারীদিগকেও রাজা আজ্ঞা করিলেন যে, "যতক্ষণ না বটগার আমর আদেশ প্রতিপালন করে, ততক্ষণ তাহাকে বিধিমতে উৎপীড়িত করিবে।" রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে ভয়ংকর যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল।

শেষ কথা

ঘোরতর উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে বটগার রাঙ্গা রঙের আরকে পরিপূর্ণ একটি শিশি রাজকর্মচারিদিগের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"রাজাকে তোমরা এই শিশিটি দিবে। তাঁহাকে বলিবে যে, তিনি যেন শুদ্ধদেহ ও পবিত্র মনে নির্জন একটি গৃহে গমন করেন। তাহার ভিতর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই অগ্নির উত্তাপে লৌহ তাম্র অথবা অন্য নিকৃষ্ট ধাতু গলাইয়া তাহার উপর দুই তিন ফোঁটা এই লাল আরক ফেলিয়া দিলেই, সে দ্রবীভূত ধাতু তৎক্ষণাৎ সুবর্ণে পরিণত হইবে।" এমন বহুমূল্য আরক যে-সে লোকের হাতে রাজার নিকট প্রেরণ করিতে পারা যায় না। সে জন্য রাজকুমার নিজে তাহা লইয়া চলিলেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার সঙ্গে যেরূপ বহুসংখ্যক সৈন্য থাকিত, সেইরূপ এই শিশির সঙ্গেও অশ্বারোহী, পদাতি, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ প্রভৃতি নানাবিধ সৈন্য প্রেরিত হইল। যথাসময়ে শিশি গিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। স্নান করিয়া, বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, নিজে স্বয়ং রাজা ও রাজকুমার নির্জন একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া, প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে পর্বত-প্রমাণ তাম্ররাশি তাঁহারা দ্রবীভূত করিলেন। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সেই দ্রবীভূত ধাতুরাশির উপর দুই চারি বিন্দু সেই লাল আরক ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু হায়! সে তামার রাশি সোনা হইল না। যেমন তামা তেমনি তামা রহিল। তামা কেন সোনা হইল না, রাজা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল—"ও! মদ খাইয়া অপবিত্র আমোদ-প্রমোদে গত রাত্রি আমি অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সেই জন্য আমার পরিশ্রম বিফল হইয়া থাকিবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা অনেক পূজা-পাঠ করিলেন এবং যথাবিধি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবার নিমিত্ত পাদরিদিগের হস্তেও অনেক টাকা-কড়ি প্রদান করিলেন। পূজা-পাঠ ও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়া যখন সব পাপ কাটিয়া গেল, তখন পুনরায় সেই "সোনা-করা" কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনরায় আগুন জ্বালাইলেন, পুনরায় তাম্র গলাইলেন, পুনরায় তাহার উপর সেই আরক ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু হায়! এবারও সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল! তামা কিছুতেই সোনা হইল না। তামা তামাই রহিল। ক্রোধে রাজা অধীর হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে,—"বেটা সোনা করিতে জানে, কেবল দুষ্টামি করিয়া সে গুপ্তবিদ্যা আমার নিকট প্রকাশ করিতেছে না। ইহাকে যন্ত্রণা দিয়া সে গুপ্তবিদ্যা বাহির করিতে হইবে।" কথা বাহির করিবার নিমিত্ত সে কালে লোককে নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করা হইত। নখের ভিতর তীক্ষ্ণ সূচ প্রবিষ্ট করা হইত, সাঁড়াশী দ্বারা এক একটি করিয়া মুখ হইতে দন্ত উৎপাটিত করা হইত, সর্বশরীরে আগুনের ছেঁকা দেওয়া হইত, কলে ফেলিয়া মড় মড় শব্দে শরীরের হাড় ভাঙ্গা হইত। অসহ্য যন্ত্রণায় হতজ্ঞান হইয়া নির্দোষ লোকও স্বীকার করিত যে, আমি চোর বটে; নিরপরাধ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও বলিয়া ফেলিত যে, আমি ডাইনী বটে। এ দিকে রাজা রুষ্ট হইলেন, ও দিকে বটগারও বুঝিতে পারিলেন যে, আর

তাঁহার এ রাজ্যে বাস করা উচিত নহে। কোনমতে প্রহরীদিগকে ফাঁকি দিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া তিনি অষ্ট্রীয়া-রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সাক্ষণ দেশীয় সৈন্যও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়া-রাজ্যের ভিতর উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্তমনে এক স্থানে রাত্রিকালে বটগার নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই স্থানে সাক্ষণ সৈন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। অষ্ট্রীয়া-সম্রাটের দোহাই দিয়া বটগার প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। সাক্ষণ-সৈন্য তাঁহাকে ধৃত করিয়া পুনরায় ড্রেসডেন নগরে লইয়া আসিল। রাজার আজ্ঞায় এবার তাঁহাকে এক সুদৃঢ় কেল্লার ভিতর কয়েদীর ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই স্থানে রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, কর্কশ বচনে রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার ধনাগার শূন্য হইয়া আছে। দশ পল্টন সৈন্য অনেক দিন বেতন পায় নাই। সোনা তোমাকে নিশ্চয় প্রস্তুত করিতে হইবে। সোনা প্রস্তুত না করিলে আমি তোমাকে ফাঁসি দিব।"

প্রকৃত কথা এই যে, বটগার সোনা করিতে জানিতেন না। লোককে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে হউক, অথবা মান সম্ভ্রমের জন্য হউক, তিনি মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি সোনা করিতে জানি; সুতরাং রাজার জন্য তিনি সোনা প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, রাজা তাঁহাকে ফাঁসি দিলেন না, চোরের ন্যায় তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার কিছু দিন পূর্বে পোর্তুগাল দেশের লোক জাহাজে চড়িয়া ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে আসিয়াছিল। তাহার পর ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ আসিয়াছিল। পূর্ব অঞ্চল হইতে নানা দ্রব্য লইয়া এই সকল দেশের বণিক্‌গণ ব্যবসা করিতেছিল। চীন হইতে চীনের বাসন কেহ কেহ স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল। উৎকৃষ্ট চীনের বাসন দেখিতে অতি সুন্দর। এক প্রকার সাদা রঙের মাটি লইয়া চীনের লোকে রেকাবি, বাটী প্রভৃতি বাসন প্রস্তুত করে। সেই বাসন লাল নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের মসলা দ্বারা তাহারা অলঙ্কৃত করে : তাহার পর সেই বাসন আগুনে পোড়াইলে মৃত্তিকা গলিয়া এক প্রকার অসচ্ছ কাঁচে পরিণত হয়। লাল নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের অলঙ্কারে পরিশোভিত উজ্জ্বল মসৃণ শুভ্রবর্ণের বাসনগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। জর্মানি, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই বাসন সোনা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বটগারের একজন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন,—"বটগার! তুমি যে সোনা করিতে জান না, এখন সে কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। রাজা মনে করিতেছেন যে, তুমি সোনা করিতে জান, কেবল দুষ্টামি করিয়া তুমি সে বিদ্যা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতেছ না। তুমি রাজার কোপে পতিত হইয়াছ। চিরকাল তোমাকে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। তুমি পণ্ডিত লোক। রসায়ন শাস্ত্র তুমি ভালরূপ অবগত আছ। তুমি এক কাজ কর। চীন হইতে এখন যে মৃণ্ময় বাসন আমদানী হইতেছে, তাহার মূল্য সোনা অপেক্ষা অধিক। তুমি সেই বাসন প্রস্তুত কর। তাহা বেচিয়া রাজা অনেক টাকা পাইলে সন্তুষ্ট হইয়া কারাবাস হইতে তিনি মুক্ত করিয়া দিবেন।" বটগার বন্ধুর পরামর্শ মত কাজ করিলেন। নানারূপ মৃত্তিকা লইয়া তিনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজাও তাঁহাকে এ কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে নানাস্থান হইতে নানা বর্ণের নানা প্রকারের মৃত্তিকা আসিতে লাগিল। সেই মৃত্তিকা দিয়া পাত্র নির্মাণ করিয়া তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইয়া, তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন

মৃত্তিকায় চীনের মত বাসন প্রস্তুত হইল না। মৃচি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কোন স্থান হইতে এক প্রকার লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা আসিয়াছিল। বটগার সেই মৃত্তিকা দ্বারা পাত্র নির্মাণ করিয়া পোড়াইয়া দেখিলেন যে, তাহা হইতে লোহিত বর্ণের এক প্রকার চীনের বাসন প্রস্তুত হইতে পারে। বটগার সেইরূপ অনেক বাসন প্রস্তুত করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। তাহা বিক্রয় করিয়া রাজা অনেক টাকা পাইলেন। কিন্তু প্রকৃত চীনের বাসন শুভ্রবর্ণের হইয়া থাকে। সাদা রঙের বাসন যত মূল্যে বিক্রীত হয়, এ লাল রঙের বাসন তত মূল্যে বিক্রীত হয় না। সে জন্য বটগার সাদা রঙের বাসন প্রস্তুত করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজার যাহাতে টাকা হয়, সে জন্য বটগার দিবারাত্রি ঘোরতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রাজা তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিলেন না। কত বিনয় করিয়া, কত খেদ করিয়া বটগার রাজাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। একখানি চিঠিতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"মহারাজ! আপনার কার্য্যে আমি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। দিবারাত্রি আপনার জন্য পরিশ্রম করিতেছি! কোন পরিতোষিক আমি চাই না; আমি কেবল এই ভিক্ষা চাই যে, আর আমাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না। আমাকে মুক্ত করিয়া দিন। আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করুন। আমি আর পলায়ন করিব না। যত দিন দেহে আমার প্রাণ থাকিবে, তত দিন প্রাণপণে আমি আপনার জন্য পরিশ্রম করিব।" কিন্তু রাজা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দিবসে বটগার প্রহরিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, হইয়া থাকিতেন। রাত্রিকালে ঘরে তাঁহাকে চাবি দিয়া রাখা হইত।

যাহা হউক, বটগার শুভ্রবর্ণের চীনের বাসন প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানারূপ মৃত্তিকা ও নানারূপ মশলা দ্বারা পরীক্ষা হইতে লাগিল। দিবা রাত্রি পরীক্ষা চলিতে লাগিল। পরীক্ষার বিরাম নাই। ক্রমাগত পরীক্ষা না করিলে নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। শত শত পরীক্ষা বিফল হইয়াও যদি একটি সফল হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হয়। জর্মাণি দেশের নানাস্থান হইতে যে সমুদয় মৃত্তিকা ও প্রস্তর প্রেরিত হইত, তাহাদিগকে পোড়াইয়া বটগার সে শুভ্রবর্ণের চীনের বাসন প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। বিলাত প্রভৃতি দেশের লোক এই সময় কোঁকড়া কোঁকড়া সুদীর্ঘ পরচুল পরিধান করিত। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে Wig বলে। এক প্রকার শুভ্রবর্ণের মৃত্তিকাচূর্ণ মাখাইয়া এই পরচুলের শোভা আরও বৃদ্ধি করা হইত। প্রচলিত প্রথা অনুসারে বটগারও মাথায় পরচুল পরিধান করিতেন। এক দিন তাঁহার পরচুল মাথায় কিছু ভারি বোধ হইল! তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ আমার পরচুল এত ভারি কেন? এক জন উত্তর করিল,—"আজ ইহার উপর এক প্রকার নূতন মৃত্তিকাচূর্ণ লেপন করা হইয়াছে।" বটগার বলিলেন,—"কৈ, সে মাটী দেখি! সেই মৃত্তিকা দেখি!" সেই মৃত্তিকা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—"হয় তো এই মৃত্তিকা দ্বারা পাত্র নির্মাণ করিলে, শুভ্রবর্ণের চীনের বাসন প্রস্তুত হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইল। এই শুভ্র মৃত্তিকাকে কাওলিন Kaolin বলে। আমাদের দেশে ইহা সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় পাওয়া যায়। জর্মাণি দেশের যে অংশ হইতে ইহা আসিয়াছিল, রাজা সেই স্থান হইতে এই মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে আনাইলেন। চীনের বাসন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি প্রকাণ্ড এক কারখানা স্থাপিত করিলেন। অন্যান্য দেশের রাজাদিগের নিকট তিনি সংবাদ পাঠাইলেন যে,—"আমার নগরে উৎকৃষ্ট চীনের বাসন প্রস্তুত হইতেছে। এখন হইতে চীন হইতে আর সে বাসন আমদানী করিতে হইবে না।" ফল কথা, এই বাসন বেচিয়া রাজা সোনা করা অপেক্ষা অধিক

লাভ মনে করিলেন। কি মৃত্তিকা দিয়া পাত্র প্রস্তুত করিতে হয়, কেবল তাহা জানিলে হয় না। পাত্রগুলি নানাবর্ণের অলঙ্কারে বিভূষিত করিবার নিমিত্ত নানা উপাদানের আবশ্যক। বটগার রসায়নবিদ্যা বলে সেই সমুদয় মশলা আবিষ্কার করিলেন। বটগার আগাগোড়া সমুদয় কাজ করিতে লাগিলেন বটে; তাঁহার পরিশ্রমের ফলে রাজা বিপুল অর্থের অধীশ্বর হইলেন বটে; তথাপি তিনি তাঁহাকে কারখানায় কোনরূপ উচ্চপদ প্রদান করিলেন না। বটগারকে রাজা ঠিক ক্রীতদাস করিয়া রাখিলেন। স্বাধীনতার জন্য বটগার বিনয় বচনে কত বার প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু রাজা কিছুতেই তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন না। অবশেষে মনোদুঃখে বটগার মদ খাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন দিবারাত্রি সুরাপান করিয়া তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। কেবল মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক হইল। জীবনের প্রথম অবস্থায় বটগার যদি মিথ্যা কথা না বলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার এরূপ দুর্গতি হইত না।

ভানুমতী ও রুস্তম

প্রথম অধ্যায় : কুঁজো বর

সে কালে ইরাণদেশে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার ভানুমতী নামক এক কন্যা ব্যতীত অন্য সন্তান-সন্ততি ছিল না। রাজা ও রাণী ভানুমতীকে আপনাদিগের প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। কেবল পিতা মাতা নহে, ভানুমতীর রূপে-গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। দেশের সকল লোকেই ভানুমতীকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত।

ভানুমতী দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পদ্মের মুকুল প্রস্ফুটিত হইলে তাহার শোভায় সমুদয় সরোবর যেমন আলোকিত হয় ও তাহার সৌরভে যেমন চারি দিক আমোদিত হয়, ভানুমতীর রূপে সেইরূপ সমুদয় ইরাণরাজ্য যেন আলোকিত হইল এবং তাহার গুণের যশ সেইরূপ দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইল। কিন্তু তাহার বিবাহ দিতে রাজা বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এক দিন রাজা, রাণীকে বলিলেন,—"দেখ রাণী! ভানুমতী আমাদের নয়নের পুতলি। প্রাণ অপেক্ষা তাহাকে আমরা ভালবাসি। এক মুহূর্তের জন্য তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারি না। বিবাহ দিলেই তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইবে। তাহাকে তখন না দেখিয়া কি করিয়া আমরা বাঁচিব? ভানুমতী এখনও তেমন বড় হয় নাই। আরও কিছুদিন যাউক, তখন তাহার বিবাহের চেষ্টা করিব।"

কিন্তু দেশ-বিদেশের রাজা ও রাজপুত্রগণ সে কথা জানিত না। ভানুমতীর রূপ গুণের কথা তাহারা সকলেই শুনিয়াছিল। ভানুমতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত সকলেই লালায়িত হইল। সেইরূপ প্রার্থনা করিয়া অনেক রাজা ও অনেক রাজপুত্র ভানুমতীর পিতার নিকট দূত পাঠাইল। কিন্তু ভানুমতীর পিতা কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দূতদিগকে তিনি বলিলেন যে;—"আমার মেয়ের এখনও বয়স হয় নাই। আরও বড় না হইলে আমি কন্যার বিবাহ দিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি দূতদিগকে বিদায় করিলেন।

এই সময়ে নিশাপুর নামক দেশে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না। বয়সে তিনি বৃদ্ধ ছিলেন তাঁহার গায়ের বর্ণ ধান-সিদ্ধ হাঁড়ির তলার ন্যায় ছিল। তাঁহার মুখে সাত হাত লম্বা পাকা-দাড়ি ছিল। আর তাঁহার পিঠে বৃহৎ একটি কুঁজ ছিল।

রূপ ছিল না বটে; কিন্তু তাঁহার গুণ অনেক ছিল। যাহাকে গুণী অর্থাৎ জাদুগর বলে, তিনি তাই ছিলেন। তিনি নানারূপ মন্ত্র-তন্ত্র জানিতেন। সেই মন্ত্র বলে তিনি দিনকে রাত ও রাতকে দিন করিতে পারিতেন। মনুষ্যকে জন্তু করিতে পারিতেন ও জন্তুকে মানুষ করিতে পারিতেন। ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য, জিন, পরি সকলকে তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে ভূত, প্রেত, জিন, পরি সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিত।

ভানুমতীকে বিবাহ করিতে তাঁর সাধ হইল। তিনি ভাবিলেন যে,—"আমার গায়ের রঙ কিছু ময়লা, ফুটফুটে গৌরবর্ণ নয় বটে, দাড়িটি সাত হাত লম্বা,—আর শণের ন্যায় পাকাও বটে। আর পিঠের মাঝখানে বড় একটী বিলাতী কুমড়ার ন্যায় কুঁজও আছে বটে,—কিন্তু তা হইলে কি হয়, ভানুমতীকে আমি অনেক গহনা

দিব। গহনা পাইলে ভানুমতীর পিতা-মাতা ভুলিয়া যাইবে, ভানুমতীও আমাকে ভালবাসিবে। সংসারের নিয়ম এই।"

এইরূপ মনে করিয়া ভানুমতীর পিতার নিকট তিনি দূত পাঠাইলেন। যেমন ভানুমতীর রূপ-গুণের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, সেইরূপ নিশাপুরের কুঁজো রাজার সুখ্যাতিও দেশ-বিদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। ইরাণরাজ-সভায় যখন তাঁহার দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভানুমতীর পিতার প্রথম অতিশয় রাগ হইল। তিনি ভাবিলেন,—"বেটার একবার আস্পর্ধা দেখ! বামন হইয়া চাঁদে হাত! বেটার রূপ দেখিলে আমাদের ভয় হয়। কোন্ সাহসে সে ভানুমতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল?"

প্রথমে রাজা এইরূপ ভাবিলেন বটে; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার বড় ভয় হইল। কুঁজো রাজা কিরূপ তন্ত্র-মন্ত্র জানিত, ভানুমতীর পিতা তাহা জানিতেন। পাছে রাগিয়া সে ভানুমতীর কোন মন্দ করে, তাঁহার সেই ভয় হইল। কিন্তু এরূপ কুৎসিত কদাকার দুষ্টলোকের সহিত ভানুমতী হেন কন্যার তিনি কি করিয়া বিবাহ দিবেন? সে প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অন্যান্য রাজ-দূতকে তিনি, যে কথা বলিয়াছিলেন, নিশাপুরের দূতকেও তিনি সেই কথা বলিলেন। তাহা ছাড়া তাহাকে অনেক বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া মধুর বচনে বিদায় করিলেন।

দূত যখন নিশাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া কুঁজো রাজাকে সকল কথা বলিল, তখন ক্রোধে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি এমন সুপাত্র, তথাপি আমার সহিত ভানুমতীর বিবাহ দিবে না? আচ্ছা, আমি তাহাদিগকে খুব জব্দ করিব।"

এইরূপ ভাবিয়া কুঁজো রাজা আপনার গুরুর নিকট গমন করিলেন। নিবিড় বনের ভিতর মন্ত্রবলে বৃহৎ একটি কেল্লা নির্মাণ করিয়া গুরু তাহার ভিতর বাস করেন। গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কুঁজো রাজা বলিলেন,—"মহাশয়! ইরাণের রাজা আমার বড় অপমান করিয়াছে। ভানুমতী নামে তাহার এক কন্যা আছে। তাহাকে আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমার পিঠে কুঁজ ও মুখে সাত হাত পাকা দাড়ি আছে বলিয়া সে আমার কথায় সম্মত হয় নাই। ইরাণের রাজাকে দণ্ড দিতে হইবে। কিন্তু ভানুমতীকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না, যেমন করিয়া পারি, তাহাকে আমি বিবাহ করিব। এক্ষণে কি উপায়ে তাহাদিগকে আমি জব্দ করিতে পারি, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।"

গুরু হাসিয়া বলিলেন,—"তাহার ভাবনা কি। এই তুমি অঙ্গুরীটি লইয়া যাও। কোনরূপে ভানুমতীকে এই আঙটীটি দিবে। ভানুমতী নিজের অঙ্গুলিতে এই অঙ্গুরী পরিধান করিলে প্রাণে মরিবে না; কিন্তু বিলক্ষণ তামাসা হইবে! তাহাতে রাজা রাণী সকলেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িবে। তখন ভানুমতীকে ভাল করিবার নিমিত্ত তাহার বাপ-মা পায়ে ধরিয়া তোমার সহিত বিবাহ দিবে।"

আঙটী লইয়া কুঁজো রাজা নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সেস্থানে আসিয়া তিনি সহরের প্রধান জহুরীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। জহুরী আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন,—"রাজভাণ্ডার হইতে তোমাকে আমি অনেক মণি মুক্তা ও বহুমূল্য আভরণ প্রদান করিতেছি। সে সকল লইয়া তুমি ইরাণ দেশে গমন কর। ইরাণ রাজার বাড়ীতে গিয়া সেই সকল দ্রব্য তুমি অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিবে। কিন্তু আর যাহা বিক্রয় কর আর নাই কর, রাজকন্যা যাহাতে এই আঙটীটি নিজের হাতে পরিধান করে, তুমি সেই উপায় করিবে। রাজকন্যাকে যদি

তুমি আঙটী পরাইতে না পার, তাহা হইলে আমি তোমার পরিবারবর্গের মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

এই কথা বলিয়া কুঁজো রাজা তাহাকে সেই অঙ্গুরী ও রাজ-ভাণ্ডার হইতে অনেক মণি-মুক্তা ও নানারূপ অলঙ্কার প্রদান করিলেন। সেই সমুদয় লইয়া ভয়ে ভয়ে জহুরী ইরাণ দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। ইরাণ নগরে উপস্থিত হইয়া প্রথম সে সাধারণ লোককে সেই সমুদয় বহুমূল্য প্রস্তর ও গহনা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমে চারিদিকে জনরব হইল যে, কোন দেশ হইতে এক জহুরী আসিয়া অতি অল্প মূল্যে বহুমূল্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। সেই কথা ক্রমে রাজমন্ত্রিগণের কানে উঠিল। রাজমন্ত্রিগণ তাহার নিকট হইতে অনেক দ্রব্য ক্রয় করিল। রাজাও ক্রমে তাহার কথা শুনিলেন। জহুরীকে রাজা ডাকিতে পাঠাইলেন। এইবার জহুরী সর্বাপেক্ষা উত্তম উত্তম হীরা মাণিক মুক্তা বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি রাজভাণ্ডারে ছিল না। তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয় করিয়া জহুরীকে অন্তঃপুরে রাণী ও ভানুমতীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাণী ও ভানুমতী তাহার নিকট হইতে অনেক অলঙ্কার ক্রয় করিলেন। সকলের শেষে জহুরী সেই আঙটী বাহির করিল। বহুমূল্য হীরক সম্বলিত সেই আঙটীর গঠন ও চাকচিক্য দর্শন করিয়া ভানুমতী ঘোরতর আশ্চর্য্য হইলেন। শত মুখে সেই অঙ্গুরীর প্রশংসা করিয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। জহুরী উত্তর করিল,—"এ আঙটীর মূল্য নাই। আপনি রাজকন্যা, আপনি যদি এই আঙটী নিজের হাতে পরিধান করেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।" জহুরীকে নানারূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়া রাজকন্যা সেই অঙ্গুরী লইয়া আপনার হাতে পরিধান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নরমুণ্ডের হাসি

পরদিন প্রাতঃকালে রাজবাড়ীতে কোলাহল পড়িয়া গেল। রাজা ও রাণী ঘোর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নগরে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহার কারণ এই যে, সকালবেলা উঠিয়া সকলে দেখিল যে, রাজকন্যা ভানুমতীর কেবল মুখখানি ব্যতীত সর্বশরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর গড়িবার সময় লোকে যেরূপ প্রথম খড় দিয়া ঠাকুরের কাঠামো করিয়া লয়, ভানুমতীর হাত-পা বক্ষঃস্থল প্রভৃতি সমুদয় শরীর সেইরূপ খড়ের হইয়া গিয়াছে। ভানুমতীর মুখখানি কেবল রক্তমাংসের ছিল। সেই মুখ দিয়া ভানুমতী কথা কহিত ও খাইতে পারিত। খড়ের হাত-পা দিয়াও সে বিছানার উপর উঠিতে বসিতে পারিত; কিন্তু চলিতে ফিরিতে পারিত না।

রাজা ও রাণী কাঁদিতে লাগিলেন; কিন্তু কাঁদিলে আর কি হইবে! ডাক্তার-বৈদ্য আনিয়া ভানুমতীর যথাবিধি চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা কালেমেল ও বৈদ্যগণ মহাদেবচূর্ণ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিলেন, তথাপি কোনরূপ উপকার হইল না। ভানুমতীর শরীর যে খড়ের, সেই খড়েই রহিয়া গেল। বৈদ্যগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন; কিন্তু কি জন্য ভানুমতীর শরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজা গুণিগণকে আনিয়া ভানুমতীর চিকিৎসা করাইলেন। গুণিগণ অনেক ঝাড়ান কাড়ান করিল, ভানুমতীর শরীরে শত শত ফুৎকার দিল; তথাপি কিছুমাত্র উপকার হইল না। তাহার পর যাহারা ভূত নামাইতে জানে, রাজা তাহাদিগকে আনিয়া ভূত নামাইলেন।

অন্ধকার ঘরে ভূতগণ দুপ-দাপ করিতে লাগিল, দুই সের দুধ ও তিন সের সন্দেশ খাইয়া ফেলিল, নাকে কথা বলিয়া অনেক জড়িবুটির নাম করিল। কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না, ভানুমতীর শরীর যে খড়ের, সেই খড়ের রহিয়া গেল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রাজা শেষে আপনার রাজ্যের ভিতর সোনার চেঙড়া ফিরাইয়া দিলেন। সোনার চোঙড়া লইয়া রাজার লোকগণ নানা নগরে ও নানা গ্রামে ফিরিতে লাগিল, আর তাহার সহিত যে ঢুলি ছিল, সে এই বলিয়া ঢেট্‌রা দিতে লাগিল,—"রাজকন্যা ভানুমতীর মুখ ব্যতীত সর্বশরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে। যে রাজকন্যাকে ভাল করিতে পারিবে, রাজা তাহাকে অর্ধেক রাজ্য দিবেন ও রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন, ঢ্যাং, ঢ্যাং, ঢ্যাং।"

সোনার চেঙড়ার সহিত রাজার ঢেট্‌রা গ্রামে গ্রামে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সে সোনার চেঙড়া কেহই ধরিতে সাহস করিল না। মানুষের শরীর যদি সহসা খড় হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সুস্থ করা বড় সহজ কথা নহে। অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা পাইবার লোভ অনেকের হইল বটে; কিন্তু এ রোগের কথা পুথিতে লেখা নাই, ইহার ঔষধের নামও কেতাবে লেখা নাই।

ইরাণ দেশের লোক এখন সকলেই মুসলমান হইয়াছে। কিন্তু সে কালে এ স্থানের লোকে সূর্য্য ও অগ্নিকে পূজা করিত। সে কালে এ দেশে অনেক ব্রাহ্মণেরও বাস ছিল। ইরাণ দেশের কোন গ্রামে এই সময় এক ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। শিশু এক পুত্র রাখিয়া তাঁহার পতির মৃত্যু হইয়াছিল। বিধবা অতি কষ্টে সেই পুত্রটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সে শিশুপুত্রটির নাম ছিল রুস্তম। এক্ষণে সেই পুত্র যৌবনকালে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার বয়ঃক্রম আঠার বৎসর হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে অর্থোপার্জন করিতে পারে নাই। সুতরাং মাতা ও পুত্রের অতি কষ্টে দিনাতিপাত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সর্বদাই তাহাদিগকে উপবাস করিয়া দিনযাপন করিতে হইত।

এইরূপ একদিন তাঁহাদের ঘরে অন্ন ছিল না। মাতা পুত্র সে দিন উপবাস করিয়া রহিলেন। নিজের যত কষ্ট হউক আর না হউক, বৃদ্ধা মাতার কষ্ট দেখিয়া রুস্তম অতিশয় কাতর হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আপনার মাতাকে বলিলেন,—"মা! বিদেশে গিয়া অর্থোপার্জন করিবার নিমিত্ত আমি বার বার তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমাকে সে অনুমতি প্রদান কর নাই। কিন্তু মা! তোমার কষ্ট আমি আর দেখিতে পারি না। বৃদ্ধা মাতাকে প্রতিপালন করা পুত্রের কর্তব্য। তাহা যদি আমি না করি, তাহা হইলে ধর্মে পতিত হইব, সকলে আমাকে কাপুরুষ নরাধম বলিয়া জানিবে। এক্ষণে বিদেশে গিয়া অর্থোপার্জন করিতে মা, তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর। অনেক টাকা লইয়া শীঘ্রই আমি ঘরে ফিরিয়া আসিব। তখন দুই জনে সুখে স্বচ্ছন্দে চিরকাল যাপন করিব।"

মা প্রথম সে কথা শুনিয়া প্রাণসম পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া কি করিয়া তিনি প্রাণ ধরিবেন, তাহাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। কিন্তু পুত্রের বিনয়বাক্যে অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে রুস্তমকে তিনি বিদায় করিলেন।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট রুস্তম বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জেন্ড ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শরীরেও তাঁহার অপরিমিত বল ছিল। সেইজন্য প্রতিবাসিগণের অনুরোধে মাতা তাহার নাম রুস্তম রাখিয়াছিলেন। বাজ নামক এক প্রকার বৃক্ষের শাখা কাটিয়া তিনি মোটা এক ছড়ি প্রস্তুত করিলেন। সেই ছড়িগাছটি হাতে করিয়া তিনি পথ চলিতে

লাগিলেন। রাজধানীতে নানারূপ অর্থোপার্জনের উপায় আছে। সে নিমিত্ত তিনি রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পথ চলিতে চলিতে একদিন তিনি গ্রামের নিকট এক মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, সে স্থানে এক কৃষক একটি গাভীকে নিদারুণভাবে প্রহার করিতেছে। গাভী তাহার ক্ষেত্রে গিয়া কিছু শস্য খাইয়াছিল। এই অপরাধে দুর্বৃত্ত সেই গাভীকে বাঁধিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছিল। নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া গাভী পলাইতে পারিতেছিল না। প্রহারের যাতনায় তাহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। সেই সময় একটি কাক সেই কৃষকের একবার এ দিকে একবার ও দিকে উড়িয়া তাহাকে ঠোকরাইতে চেষ্টা করিতেছিল। গাভীর ক্লেশ দেখিয়া কাক হেন পক্ষীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্বৃত্ত কৃষকের হৃদয় ব্যথিত হয় নাই।

গাভীর যাতনা দেখিয়া রুস্তম দ্রুতবেগে কৃষকের নিকট অগ্রসর হইলেন ও গরুকে আর মারিতে নিষেধ করিলেন। কৃষক রুস্তমকে গালি দিয়া গরুকে আরও অধিক নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে লাগিল। রুস্তম আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সম্মুখে মাটীর উপর গোলাকার প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় কি পড়িয়া ছিল। রুস্তম সেই বস্তু তুলিয়া লইলেন ও তাহা দিয়া কৃষককে ছুঁড়িয়া মারিলেন। কৃষকের গায়ে তাহা লাগিল না, তথাপি সহসা সে ঘোরতর ভীত হইল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষুকোটর হইতে তাহার চক্ষু দুইটি যেন বাহির হইবার উপক্রম হইল। বিকট চীৎকার করিয়া সে রুদ্ধশ্বাসে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। রুস্তম আশ্চর্য্য হইলেন। কি জন্য কৃষক এত ভীত হইল তাহার কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যে স্থানে গোলাকার প্রস্তরখণ্ডটি পড়িয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে তাহা প্রকৃত প্রস্তর-খণ্ড নহে। তাহা নরমুণ্ড। রুস্তমকে দেখিয়া সেই নরমুণ্ড দুই পাটি ভীষণ দন্ত বাহির করিয়া খল খল শব্দে হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় অধ্যায় : সাদি ও তারা

যাহাকে ঢিল মনে করিয়াছিলেন, তাহা মানুষের মাথা হইল দেখিয়া রুস্তম বিস্মিত হইলেন। মুণ্ডের হাসি দেখিয়া রুস্তম আরও বিস্মিত হইলেন। অবশেষে তাহার কথা শুনিয়া রুস্তম আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

মুণ্ড বলিল,—"বেটা কৃষক যেমন গরুর উপর অত্যাচার করিতেছিল, আমি তেমনি তাহাকে দণ্ড দিয়াছি। আমার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া বেটা হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। আর সে এমন কাজ কখন করিবে না। কিন্তু আমি এস্থানে না থাকিলে তোমার দশা কি হইত? দুষ্ট কৃষক তোমাকে হয় তো মারিয়া ফেলিত।"

হাতের লাঠিগাছটি ঘুরাইয়া রুস্তম উত্তর করিল,—"আমাকে সে মারিয়া ফেলিত! এক লাঠির ঘায়ে আমি তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম। কিন্তু সে যাহা হউক তুমি কে? রক্তমাংসহীন কাটা-মুণ্ড যে কথা কয়, তাহা আমি জানিতাম না।"

মুণ্ড উত্তর করিল,—"আমি এক রাজার পুত্র, আর যে কাক কৃষককে ঠোক-রাইতেছিল, সে আমার ছোট ভগিনী। আমাদের কাকা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া মন্ত্রবলে আমাকে ও আমার ছোট ভগিনীকে কাক করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত

দিন আমরা এইরূপ হইয়া থাকি, কিন্তু রাত্রি হইলেই আমরা দুই জনেই পুনরায় মানুষ হই।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোন্ দেশের রাজপুত্র, আর তোমাদের কাকার নাম কি ?"

মুণ্ড উত্তর করিল,—"আমার পিতা নিশাপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহাকে মারিয়া আমাদের কাকা সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, আর আমাদিগকে এইরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। নিশাপুরের কুঁজো রাজার কথা তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। তিনিই আমাদের খুল্লতাত।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই ?"

মুণ্ড উত্তর করিল,—"কৃষক যখন নিষ্ঠুরভাবে গাভীকে প্রহার করিতেছিল, তখন ঢিল মনে করিয়া আমাকে লইয়া তুমি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলে। তাহার জন্য তোমার, আমার ও আমার ভগিনীর অনেক পুণ্য হইয়াছে। সেই পুণ্যফলে তোমার মঙ্গল হইবে ও আমাদেরও উদ্ধার হইবে।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি অতি দরিদ্র ও কাপুরুষ। একমাত্র মাতাকেও আমি প্রতিপালন করিতে পারি না। কি করিয়া আমার মঙ্গল হইবে ? আর কি উপায়ে বা তোমাদের উদ্ধার হইবে !"

মুণ্ড উত্তর করিল,—"এই দেশের রাজকন্যার নাম ভানুমতী। ভানুমতীর দেহকে আমাদের কাকা যাদুবলে খড়ের করিয়াছেন। ইরাণ দেশের রাজা সোনার চেঙড়া বাহির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ভানুমতীকে ভাল করিতে পারিবে, তাহাকে তিনি অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিবেন ও তাহার সহিত ভানুমতীর বিবাহ দিবেন। তুমি গিয়া সোনার চেঙড়া ধর তাহার পর সন্ধ্যা বেলা পুনরায় আমার নিকট আসিবে। ভানুমতী কি উপায়ে সুস্থ হইবে, তখন তোমাকে আমরা বলিয়া দিব।"

মুণ্ডের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রুস্তম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই গ্রামে সোনার চেঙড়া ও ঢেঁটরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঢুলি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল—"রাজকন্যা ভানুমতীর শরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে। যে তাহাকে ভাল করিতে পারিবে, রাজা তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবেন ও রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিবেন।"

রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ছেলেবুড়ো সকলেই সেই ঢেঁটরার কথা হাঁ করিয়া শুনিতেছিল ; কিন্তু কেহই সোনার চেঙড়া ধরিতে সাহস করিতেছিল না। ভিড় ঠেলিয়া রুস্তম অগ্রসর হইয়া সেই সোনার চেঙড়া ধরিলেন। সকল লোক আশ্চর্য্য হইল। অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণকুমার রাজকন্যাকে কিরূপে ভাল করিবে, এই কথা ভাবিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

রাজার সেনাগণ রুস্তমকে তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসাইয়া তাঁহাকে রাজসভায় লইয়া গেল। রুস্তমের রূপ দেখিয়া রাজা মনে করিলেন যে,—"যুবক আমার জামাতা হইবার উপযুক্ত পাত্র বটে ; কিন্তু কি করিয়া এ আমার কন্যাকে ভাল করিবে !"

তাহার পর রাজা প্রকাশ্যভাবে রুস্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার কন্যাকে ভাল করিতে পারিবে ? তুমি জান যে বড় বড় হাকিম বৈদ্য রোজা প্রভৃতি কেহই তাহাকে সুস্থ করিতে পারে নাই ?"

রুস্তম উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ, আমি রাজকন্যাকে নিশ্চয় ভাল করিতে পারিব।"

রাজা বলিলেন,—"যদি তুমি তাহাকে ভাল করিতে পার, তাহা হইলে তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব, আর আমি এই রাজ্যের অর্দ্ধেক তোমাকে প্রদান করিব। কিন্তু যদি ভাল করিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, তোমার মাথা আমি কাটিয়া ফেলিব।"

রুস্তম বলিলেন,—"যে আজ্ঞা। রাজকন্যাকে যদি ভাল করিতে না পারি, তাহা হইলে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবেন। এক্ষণে অনুমতি করুন যে, রাজকন্যার নিমিত্ত আমি ঔষধ আনিতে গমন করি।"

রাজা অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজসভা হইতে প্রস্থান করিয়া রুস্তম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। যে স্থানে কৃষক গরুকে প্রহার করিতেছিল ও যে স্থানে নরমুণ্ড ও কাকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্বে রুস্তম সেই প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, মুণ্ডটি এক গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া আছে ও কাক নিকটস্থ এক বৃক্ষ শাখায় বসিয়া আছে। সন্ধ্যা হইলে রাজপুত্র ও রাজকন্যা মানবদেহ প্রাপ্ত হইবে, সেই প্রতীক্ষায় রুস্তম সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। যেই অন্ধকার হইল, আর সেই সময়ে ষোড়শবর্ষীয় এক বালক ও দশম বর্ষীয়া এক বালিকা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে রুস্তম তাহাদিগকে ভালরূপ দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতেই রুস্তমের মন মোহিত হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন যে,—ইহারা প্রকৃতই রাজপুত্র ও রাজকন্যা বটে সাধারণের ঘরে এমন লাবণ্য হয় না। আহা! কোন প্রাণে কাকা ইহাদের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াছে?

ভাই ভগিনী দুইজনে রুস্তমের পার্শ্বে বসিল। রাজপুত্র বলিল,—"এই দেখ, পুনরায় আমরা মানুষ হইয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার সহিত আমাদের মিলন হইয়াছে। তোমার সহায়তায় আমাদের উদ্ধার হইবে। আমার নাম সাদি আর আমার ভগিনীর নাম সিতারা অর্থাৎ তারা। রাজকন্যার শরীর কি জন্য খড়ের হইয়াছে, আর কি উপায়ে সে আরোগ্য লাভ করিবে, আমি তাহা বলিতে পারি না। দাইয়ের নিকট হইতে তারা কিছু জাদু-বিদ্যা শিখিয়াছিল। তারা তোমাকে বলিয়া দিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায় : দ্বিতীয় অঙ্গুরী

রুস্তম, বালিকা তারার মুখপানে চাহিলেন। তারা বলিল,—"তুমি চলিয়া গেলে আমি নিশাপুরে উড়িয়া গিয়াছিলাম। সে স্থানে গিয়া আমি সকল কথা অবগত হইয়াছি। কাকা ভানুমতীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন ভানুমতীর পিতা সে কথায় সম্মত হয় নাই। সেই রাগে গুরুর সহায়তায় কাকা তাহার শরীর খড়ের করিয়াছেন। একমাত্র কাকার গুরু তাহাকে ভাল করিতে পারিবেন।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুরুর দেখা আমি কোথায় পাইব? তাহার পর গুরু আমার কথা শুনিবেন কেন?"

তারা বলিল,—"তুমি প্রথম নিশাপুর গমন কর। সেই নগরের আটটি দ্বার আছে। উত্তর দিকের দ্বারের নাম সমরখণ্ড-দ্বার। সেই দ্বারের বাহিরে বৃহৎ এক কেলু গাছ আছে। সেই কেলু গাছের মূলের নিকট তুমি অল্প খনন করিলে সুতীক্ষ্ণ এক খড়্গ পাইবে। সেই খড়্গ আমাদের পিতার তাহার নাম শমশের। নিশাপুর হইতে কিছু দূরে এক নিবিড় বন আছে। বনের ভিতর দুর্গ নির্ম্মাণ

করিয়া গরুড় তাহার ভিতর বাস করিতেছে। দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়া শমশের দ্বারা তুমি আঘাত করিবে। তখন দ্বার আপনা-আপনি খুলিয়া যাইবে। তাহার পর তুমি সেই দুর্বৃত্ত ওস্তাদ অর্থাৎ গরুড়ের নিকট উপস্থিত হইবে। শমশের খড়্গ তোমার হাতে থাকিলে, সে তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। শমশের তলোয়ারকে তোমার হাতে দেখিলেই সে ভয়ে জড় সড় হইবে। ভানুমতীকে ভাল করিবার উপায় তখন তাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে; না বলিলে শমশের দ্বারা তুমি তাহার গলা কাটিতে যাইবে।"

এইরূপ নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া রাজপুত্র সাদি ও রাজকন্যা তারা রুস্তমকে বিদায় করিলেন; অনেক দিন পথ পর্য্যটন করিয়া রুস্তম প্রথম নিশাপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের উত্তর দ্বারের বাহিরে তিনি সেই বৃহৎ কেলু গাছ দেখিতে পাইলেন। সেই কেলু গাছের মূলদেশ খনন করিতেই বহুমূল্য হীরা-মাণিক-জড়িত কোফতগিরি কারুকার্য্যে শোভিত সুতীক্ষ্ণ এক খড়্গ বাহির হইয়া পড়িল। অতি সাবধানে সেই খড়্গটি লইয়া রুস্তম পুনরায় পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তর মুখে ক্রমাগত পথ চলিয়া দুইদিন পরে তিনি এক গভীর কানন দেখিতে পাইলেন। নির্ভয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেক দূর গিয়া বনের ভিতর এক সুদৃঢ় দুর্গ তাঁহার নয়নগোচর হইল। দুর্গের প্রাচীর আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছিল। এই সময়ে বনের চারিদিকে অতি ভয়াবহ শব্দ হইতে লাগিল। বনের বৃক্ষগণ সকলেই, যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"ধর্ ধর্, মার্ মার্, কাট কাট।" কিন্তু রুস্তম তাহাতে ভয় পাইলেন না। আরও অগ্রসর হইয়া তিনি দুর্গের লৌহনির্মিত দ্বার দেখিতে পাইলেন। নিকটে গিয়া রুস্তম শমশের তলোয়ার দ্বারা দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। লৌহনির্মিত সেই দ্বার হইতে বজ্র-নিনাদের ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু সাত বার আঘাত করিতেই দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল।

নির্ভয়ে রুস্তম দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। দ্বারে আঘাত শুনিয়া গরুড় তাড়াতাড়ি সেই দিকে আসিতেছিল। গরুড়ের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া রুস্তমের এইবার ভয় হইল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সর্বশরীর শুষ্ক, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, গরুড়ের মূর্ত্তি অতি বিকট অতি ভয়াবহ। তাহাকে দেখিয়া রুস্তম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

গরুড় বলিল,—"দুষ্ট, কে রে তুই? কাহার এমন সাহস যে আমার দ্বারে আঘাত করে। রও, এখনি তোকে বাঁদর করিয়া বনে আমি ছাড়িয়া দিব।"

এই কথা বলিয়া গরুড় এক মুষ্টি ধূলি লইল। ধূলার উপর মন্ত্র পড়িয়া রুস্তমের শরীরে তাহা নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"দুষ্ট! এই মুহূর্ত্তে তুই বাঁদর হইয়া যা!"

কিন্তু শমশের খড়্গের গুণে রুস্তমের কিছুই হইল না, তাঁহার যেমন শরীর সেইরূপ শরীর রহিয়া গেল। তখন সেই খড়্গ উত্তোলন করিয়া তিনি গরুড়ের মস্তক ছেদন করিতে ধাবিত হইলেন। শমশের খড়্গের প্রতি গরুড়ের যেমন দৃষ্টি পড়িল, আর ভয়ে তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে তাহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। রুস্তমের পায়ে পড়িয়া তখন সে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি আমাকে বধ করিও না, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি করিব।"

রুস্তম বলিলেন,—"আচ্ছা! তোমাকে আমি বধ করিব না। কিন্তু রাজকন্যা ভানুমতীর শরীর কি উপায়ে পুনরায় পূর্বের মত হইবে, তাহা তোমাকে

বলিয়া দিতে হইবে, না বলিলে নিমিষের মধ্যে আমি তোমার গলা কাটিয়া ফেলিব।"

এই কথা শুনিয়া গুরু বলিল,—"নিশাপুরের কুঁজো রাজা আমার চেলা, আমি তাহার ওস্তাদ। আমার নিকট হইতে অঙ্গুরী লইয়া ভানুমতীকে সে পরিতে দিয়াছিল। সেই আঙটীর গুণে ভানুমতীর শরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে। এখন তোমাকে আমি আর একটি আংটী দিতেছি। সেই অঙ্গুরীটি ভানুমতীর দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিতে পরাইলেই তাহার শরীর পূর্বের ন্যায় রক্তমাংসের হইয়া যাইবে।"

এই কথা বলিয়া গুরু রুস্তমের হস্তে আর একটি আংটী প্রদান করিলেন। অঙ্গুরী পাইয়া রুস্তম ইরাণ-নগরের দিকে প্রত্যাগমন করিলেন। যথাকালে ইরাণ নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি রাজসভায় গমন করিলেন। রাজসভায় গিয়া, তিনি রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ ভানুমতীকে অদ্যই আমি ভাল করিব। রাজকন্যার নিকট আমাকে লইয়া চলুন।"

রুস্তমকে লইয়া সানন্দচিত্তে রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলেন। যে ঘরে ভানুমতী শয়ন করিয়াছিলেন সেই ঘরে সকলে গমন করিলেন। অগ্রসর হইয়া রুস্তম ভানুমতীর শয্যার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ভানুমতীর খড়ের দক্ষিণ হাতটি ধরিয়া তাহার খড়ের অঙ্গুলিতে তিনি সেই দ্বিতীয় আঙটী পরাইয়া দিলেন। আঙটী পরাইবামাত্র ভানুমতীর সেই খড়ের দেহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ভানুমতীর খড়ের দেহে আগুন লাগিয়া গেল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। জল আনিয়া সকলে সেই অগ্নি নির্বাণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। কেন এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল, রুস্তম তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। হতভম্বার ন্যায়, কিছুক্ষণের নিমিত্ত তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার জ্ঞান হইল। তিনি ভাবিলেন যে, এ স্থানে আর থাকা উচিত নহে। রাজা নিশ্চয় তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবেন। অগ্নি নির্বাণ করিতে সকলে যখন ব্যস্ত ছিল, সেই অবসরে রুস্তম রাজবাটী হইতে পলায়ন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় : শিশির ঔষধ

ভানুমতীর খড়ের শরীর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুন নিবাইতে সকলে ব্যস্ত হইল। সেই অবসরে রুস্তম সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

তাড়াতাড়ি সকলে জল আনিয়া আগুন নিবাইল। ভানুমতীর প্রাণ বাঁচিল। কিন্তু তাহার নাক, কান ও জিহ্বা পুড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য কথা এই যে, তাহার খড়ের হাত-পা একেবারে পুড়িয়া গেল না ; কিন্তু রক্ত-মাংসের নাক, কান ও জিহ্বা পুড়িয়া গেল।

রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন যে, "রাজ্য ও রাজকন্যার লোভে কোথা হইতে একটা জুয়াচোর আসিয়াছিল। শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া আন। এক্ষণেই আমি তাহাকে শূলিতে প্রদান করিব, অথবা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।" কিন্তু রুস্তমকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া রুস্তম রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন।

সহর হইতে বাহির হইয়াও তিনি অতি দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ধ্যার পূর্বে তিনি সেই প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যা হইলে সেই নরমুণ্ড ও কাক অর্থাৎ সাদি ও তারা, পুনরায় নরদেহ প্রাপ্ত হইল। রুস্তম তাহাদিগের নিকট গিয়া রাজবাটীর দুর্ঘটনার কথা সমুদয় বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া তারা বলিল,—"তোমাকে গুরুদ ফাঁকি দিয়াছে। ভানুমতীকে ভাল করিবার নিমিত্ত প্রকৃত উপায় তোমাকে বলিয়া দেয় নাই। যে আঙটী দিলে গায়ে আগুন লাগিয়া যায়, সেই আঙটী তোমাকে দিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, ভানুমতীর গায়ে আগুন লাগিয়া গেলে, রাজা, রাগে তোমাকে কাঁটিয়া ফেলিবেন। তখন আর শমশের তলোয়ার দেখাইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতে পারিবে না। যাহা হউক, শমশের তলোয়ার তোমার কাছে আছে তো?"

শমশের রুস্তমের কোমরে বাঁধা ছিল। তাহার উপর হাত দিয়া রুস্তম উত্তর করিলেন,—"হাঁ শমশের আমার কাছেই আছে।"

তারা বলিল,—"বেশ! তুমি পুনরায় সেই জাদুগর গুরুদর নিকট গমন কর। তাহাকে এখন বধ করা হইবে না। ভানুমতী ভাল না হইলে তাহাকে বধ করিও না। আপাততঃ ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে ভানুমতীর ঔষধ গ্রহণ কর।"

পরদিন প্রাতঃকাল হইবার পূর্বে, সাদি ও তারার নিকট হইতে বিদায় হইয়া রুস্তম চলিতে আরম্ভ করিলেন। যথা সময়ে তিনি গুরুদর বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন; বনের ভিতর পূর্বের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। কিন্তু রুস্তম সে শব্দে ভয় পাইলেন না। দুর্গের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্বের ন্যায় শমশের তলোয়ার দ্বারা তিনি তাহাতে ঘা মারিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল। দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রুস্তম গুরুদর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে তিনি এক অন্ধকারময় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন! ঘরটি নানারূপ শিশি, নানারূপ শুষ্ক জীবজন্তুর দেহ, নানারূপ গাছের ছাল ও মূলে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার মাঝখানে বসিয়া হাপরে আগুন জ্বালাইয়া গুরুদ মন্ত্রবলে ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিল।

রুস্তম গিয়া একেবারে গুরুদর ঝুঁটি ধরিলেন। ঝুঁটি টানিয়া তাহার মুণ্ড কাটিবার নিমিত্ত শমশের তলোয়ার উত্তোলন করিলেন। ভয়ে বিহ্বল হইয়া গুরুদ রুস্তমের পায়ে পড়িল। জোড়হাত করিয়া সে বলিতে লাগিল,—"আমার প্রাণবধ করিও না। জীবনের কাজ এখনও আমার শেষ হয় নাই। মানুষ কি উপায়ে অমর হইতে পারে, তাহার ঔষধ আমি বাহির করিতেছি। আবিষ্কার হইলে সে ঔষধ তোমাকে আমি দিব। দোহাই তোমার! আমাকে এখন বধ করিও না।"

রুস্তম বলিলেন,—"তোমাকে আর বিশ্বাস নাই। মিথ্যা আঙটী দিয়া তুমি আমার প্রাণবধের উপায় করিয়াছিলে। নিশ্চয় আমি তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

গুরুদ অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল,—"আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে ফাঁকি দিই নাই। আমি তোমাকে ঠিক ঔষধ দিয়াছিলাম। তবে কেন উপকার হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। আচ্ছা, কি হইয়াছে, তাহা তুমি আমাকে বল। বিনা অপরাধে আমাকে বধ করিও না।"

রুস্তম বলিলেন,—"তুমি আমাকে যে আঙটী দিয়াছিলে, ভানুমতীর দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিতে তাহা আমি পরাইয়া দিলাম। আঙটী পরাইবামাত্র ভানুমতীর খড়ের দেহ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর কি হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ, তৎক্ষণাৎ আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। ভানুমতী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে, তাহাও আমি জানি না।"

গুরুদ বলিলেন,—"ভানুমতী বাঁচিয়া আছে, মরে নাই। কি জন্য ভানুমতীর

দেহে আগুন লাগিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিয়াছি। তাহার দক্ষিণ হাতে আঙটী পরাইবার পূর্বে, তুমি তাহার বাম হাতের আঙটী খুলিয়া লইয়াছিলে? যে আঙটী আমি নিশাপুরের কুঁজো রাজাকে দিয়াছিলাম?"

রুস্তম উত্তর করিলেন,—"না, আমি সে আঙটী খুলিয়া লই নাই।"

গুরু বলিলেন,—"তবে সে তোমার দোষ। পূর্বের আঙটী না খুলিয়া তুমি তাহার হাতে নূতন আঙটী পরাইলে কেন? যাহা হউক, আমি তোমাকে এখন আর একটি ঔষধ দিতেছি। প্রথম ভানুমতীর বাম হাত হইতে তুমি সেই পূর্বের আঙটী খুলিয়া লইবে। দক্ষিণ হাতে যে নূতন আঙটী আছে, তাহা খুলিয়া লইবে না। তাহার পর ভানুমতীর দেহে এই ঔষধ সিঞ্চন করিবে। তাহা করিলেই ভানুমতী ভাল হইয়া যাইবে, তাহার খড়ের হাত পা রক্তমাংসের হইবে।"

এই বলিয়া গুরু রুস্তমের হাতে ছোট একটি শিশি প্রদান করিলেন। "এবার যদি ভানুমতী ভাল না হয়, তাহা হইলে পুনরায় আসিয়া তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।" এইরূপ ভয় দেখাইয়া রুস্তম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দুর্গ হইতে বাহির হইয়া রুস্তম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। যথা সময়ে তিনি ইরাণের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইবামাত্র রাজার সেনাগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রুস্তমকে দেখিয়া রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শূলিতে দিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন।

রুস্তম জোড়হাত করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আমাকে বধ করিলে আপনার কোন লাভ হইবে না; বরং আমি বাঁচিয়া থাকিলে আপনার কন্যা আরোগ্য লাভ করিবে। গতবারে আমি একটি ভুল করিয়াছিলাম, সে জন্য সে বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু এবার আমি ঠিক ঔষধ আনিয়াছি। সেই ঔষধে আপনার কন্যা যদি ভাল না হয়, তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।"

রুস্তমের আশ্বাসবাক্যে রাজা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলেন, তাঁহাকে লইয়া পাত্রমিত্রগণের সহিত পুনরায় তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্বের ন্যায় রুস্তম ভানুমতীর শয্যার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ভানুমতীর নাক, কান ও জিহ্বা যে পুড়িয়া গিয়াছে, পূর্বে তিনি তাহা জানিতেন না। চন্দ্রসম ভানুমতীর মুখমণ্ডল ঘোরতর বিশ্রী হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি সাতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইলেন।

যাহা হউক, ভানুমতীর বাম হাত হইতে তিনি কুঁজো রাজার আঙটী খুলিয়া লইলেন। দক্ষিণ হাত হইতে নূতন আঙটী তিনি খুলিলেন না। তাহার পর, ভানুমতীর অঙ্গে শিশির ঔষধ সিঞ্চন করিলেন। শিশির ঔষধ পড়িবামাত্র ভানুমতীর খড়ের দেহ রক্ত মাংসের দেহ হইয়া গেল। ভানুমতী পুনরায় মানুষের আকার পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাক, কান ও জিহ্বা সুস্থ হইল না। নাসিকা-কর্ণবিহীন মুখ অতি কদাকার অবস্থাতেই রহিয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায় : পক্ষিরাজ ঘোড়া

ভানুমতীর খড়ের দেহ রক্ত-মাংসের দেহ হইল দেখিয়া রাজার আনন্দ হইল। কিন্তু তাঁহার নাসিকা, কর্ণ ও জিহ্বার অবস্থা দেখিয়া রাজার হরিষে বিষাদ হইল।

রাজাকে সম্বোধন করিয়া রুস্তম বলিলেন,—"মহারাজ! ভয় করিবেন না। ভানুমতীর মুখ যাহাতে পূর্বের ন্যায় হয়, সেইরূপ উপায় করিবার নিমিত্ত আমি পুনরায় যাইতেছি। শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব।"

এই কথা বলিয়া রুস্তম রাজার নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনরায় সেই প্রান্তর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি হইলে পুনরায় সাদি ও তাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভানুমতীর সমুদয় বৃত্তান্ত তিনি তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করিলেন।

সেই সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া তারা বলিল,—"ভানুমতীর নাক, কান ও জিহ্বা ভাল করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। জাদুগর গুরুর নাক কাটিয়া তাহার রক্ত যদি ভানুমতীর নাক, কান, ও জিহ্বায় লাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সমুদয় স্থান সুস্থ হইয়া পূর্বের ন্যায় হয়।"

রুস্তম বলিলেন,—"প্রাণের ভয়েও জাদুগর-গুরু স্ব ইচ্ছায় আমার সহিত আসিবে না। কারণ, আপনার নাক কাটাইতে কে আর ইচ্ছা করে? তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিতে হইবে। তাহার দেহ শুষ্ক ও হাল্কা, কিছুদূর তাহাকে আমি ধরিয়া আনিতে পারি। কিন্তু এতদূর তাহাকে কি করিয়া আনিব?"

তারা বলিল,—"সে দিন নিশাপুরে যখন আমি দাই মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকে শমশের তলোয়ারের কথা, ভানুমতীর কথা, আর আমাদের উদ্ধারের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। আর সাদি! তোমার সেই পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। যখন আমাদের পিতাকে কাটিয়া কাকা জাদু-বলে আমাদিগকে মুণ্ড ও কাক করিয়া ফেলেন, তখন আমরা অতি শিশু ছিলাম, সেই জন্য তখন দাই-মা আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারেন নাই। দাই-মা বলিলেন যে, সাদির এখন বয়স হইয়াছে; এখন উদ্ধারের সময় আসিয়াছে। যাহা হউক সাদি! তোমার পক্ষিরাজ ঘোড়াটি তুমি রুস্তমকে প্রদান কর।"

রুস্তমের দিকে চাহিয়া সাদি বলিল,—"কাল প্রাতঃকালে তুমি এই বলিয়া আমার পক্ষিরাজ ঘোড়াকে ডাকিবে,—

স্বর্ণখুর পক্ষিরাজ অশ্ব মনোহর।
উড্ডাম ঈশ্বর আজ্ঞা আইস সত্বর॥

এই মন্ত্রটি পাঠ করিলেই তোমার নিকট আমার সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া আসিয়া যাইবে। পিতা আমাকে আদর করিয়া এই ঘোড়া দিয়াছিলেন। ঘোড়াকে তুমি চাবুক মারিবে না। যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবে, ঘোড়া আপনি তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইবে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তুমি জাদুগরের কেল্লায় গমন করিবে, তাহার পর তাহাকে ধরিয়া আপনার কোলের নিকট বসাইয়া তুমি ইরাণের রাজধানীতে উড়িয়া আসিবে।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত দিন ধরিয়া তোমরা কেবল আমার কাজ করিতেছ। কিন্তু তোমাদের উদ্ধারের উপায় কি?"

তারা উত্তর করিল,—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমাদের উদ্ধার তোমার এই কাজ হইতেই হইবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে যখন সাদি নরমুণ্ড ও তারা কাক হইয়া গেল, তখন রুস্তম সেই পক্ষিরাজ ঘোড়াকে স্মরণ করিলেন,—

স্বর্ণখুর পক্ষিরাজ অশ্ব মনোহর।
উড্ডাম ঈশ্বর আজ্ঞা আইস সত্বর॥

মন্ত্রটি উচ্চারণ করিবামাত্র আকাশপথে অতি সুন্দর এক অশ্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ঘোড়ার বর্ণ সবুজ ছিল, ইহার খুর চারিটি সোনার ছিল। পাখা দুইটিও সোনার ছিল ও নানারূপ বহুমূল্য প্রস্তরখচিত ছিল। রুস্তম ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিয়া জাদুগরের দুর্গে যাইবার নিমিত্ত মনন করিল। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া আকাশপথে বায়ুবেগে উড়িতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে জাদুগরের দুর্গের দ্বারে আসিয়া লাগিল। দ্বারের নিকট ঘোড়াকে রাখিয়া রুস্তম পূর্বের ন্যায় দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর গিয়া সম্মুখে জাদুগর গুরুকে দেখিতে পাইলেন। রুস্তম তাহার সহিত এবার আর কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন না। দুই হাতে একেবারে তাহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া চলিলেন। জাদুগরের দেহ শুষ্ক ও লঘু ছিল। রুস্তম অনায়াসেই তাহাকে বাহিরে আনিয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারিলেন। জাদুগর বিষম ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। রুস্তমের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত কোনরূপ চেষ্টা করিতে পারে নাই।

ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিয়া রুস্তম ইরাণ-রাজধানীতে গমন করিবার বাসনা করিলেন। ঘোড়া বায়ুবেগে উড়িয়া তৎক্ষণাৎ ইরাণ-রাজের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ও সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি পক্ষিরাজ ঘোড়া, রুস্তম ও জাদুগর-গুরুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জাদুগর-গুরুকে তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত রুস্তম রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞায় গুরুকে তৎক্ষণাৎ নিগড়-বন্ধনে আবদ্ধ করা হইল। কি জন্য জাদুগর-গুরুকে তিনি ধরিয়া আনিয়াছেন, রুস্তম তখন সে সমুদয় বৃত্তান্ত রাজার নিকট খুলিয়া বলিলেন। সেই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইলেন; তাহার পর শৃঙ্খলাবদ্ধ গুরুকে লইয়া সকলে ভানুমতীর ঘরে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রুস্তম তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা গুরুর নাকটি কাটিয়া ফেলিলেন। সেই কর্তিত নাসিকা হইতে নীল বর্ণের শোণিত বাহির হইতে লাগিল। সেই রক্ত লইয়া রুস্তম ভানুমতীর নাসিকায় কর্ণদ্বয়ে ও জিহ্বাতে লেপন করিয়া দিলেন। ভানুমতীর নাক কান ও জিহ্বা তৎক্ষণাৎ পূর্বের আকার ধারণ করিল। ভানুমতী এইবার সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেন। পূর্বের ন্যায় ভানুমতীর রূপে চারিদিক্ আলোকিত হইল।

রাজা, রাণী, মন্ত্রিগণ ও ইরাণ দেশের সমুদয় লোক আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। রাজা বলিলেন যে, "আজ রাত্রিতেই আমি রুস্তমের সহিত ভানুমতীর বিবাহ দিব।" নিজের মাতা, সাদি ও তারার অবস্থা স্মরণ করিয়া রুস্তম বিবাহ-কার্য্যে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত রাজাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা রুস্তমের সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাজা বলিলেন,—"তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ। এই শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নহে। আজ রাত্রিতেই ভানুমতীর সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

নাসিকা-হীন শৃঙ্খলাবদ্ধ জাদুগর-গুরুকে রাজা কারাগারে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর অতি সমারোহের সহিত তিনি বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞা, অবিলম্বেই সমুদয় আয়োজন হইয়া গেল। নগরের রাজপথ সমুদয় পরিষ্কৃত ও নবপল্লবে পরিশোভিত হইল। নগরবাসিগণ আপন আপন গৃহ যথাসাধ্য অলংকৃত করিল। চারিদিকে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, সমুদয় ইরাণ-নগর দীপমালায় আলোকিত হইল। ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভায় উপবেশন করিলেন। বর, কন্যা, পুরোহিত, রাজা প্রভৃতি যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হয় আর কি, এমন সময় সেই বিবাহসভায় সহসা বিষম ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। সেই ঝড়ে সমুদয় আলোক নিবিয়া গেল। বায়ুবলে ধূলিরাশি উঠিয়া

ঘোরতর অন্ধকার হইল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে পুনরায় ঝড় থামিয়া গেল। তখন পুনরায় আলোক জ্বালিয়া সকলে দেখিল যে, সভাস্থলে আর সকলেই আছেন, কেবল কন্যা ভানুমতী সে স্থানে নাই। চারিদিকে সকলে খুঁজিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি খুঁজিয়াও ভানুমতীর সন্ধান কেহ পাইল না। ভানুমতীকে কে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

সপ্তম অধ্যায়

ভানুমতীর কোন সন্ধান হইল না বটে; কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা ও অন্যান্য লোক সকলেই বুঝিলেন যে, এ কুঁজো রাজার চাতুরি, সেই জাদুবলে ভানুমতীকে সভা হইতে লইয়া গিয়াছে। রাজাকে আশ্বাস দিয়া রুস্তম বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না। কুঁজো রাজার গুরুকে যখন আমি পরাভব করিয়া বন্দী করিতে পারিয়াছি, তখন তাহাকেও পরাভব করিয়া আমি ভানুমতীকে উদ্ধার করিতে পারিব। ভানুমতীর সন্ধানে আমি এখনি চলিলাম। ভানুমতীকে লইয়া আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" এই কথা বলিয়া রুস্তম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভানুমতীকে সত্য সত্যই কুঁজো রাজা লইয়া গিয়াছিল। আকাশপথে বায়ুবেগে উড়িয়া ভানুমতীকে লইয়া মুহূর্তমধ্যে কুঁজো রাজা নিশাপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর ভানুমতীকে সে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল।

তাহার পর আপন ঘরে আসিয়া কুঁজো রাজা প্রথম সাবান দিয়া স্নান করিল। তাহার পর সুন্দর হইবার নিমিত্ত মুখে সে পাউডার মাখিল। পোড়া হাঁড়ীর উপর ঈষৎ চুণের দাগ লাগিলে যেরূপ দেখায়, তখন তাহার মুখ সেইরূপ দেখাইল। তাহার পর সে ভাল ভাল সাচ্চার পোষক পরিধান করিল। পাকা তাল হইতে স্থানে স্থানে খোসা ছাড়াইয়া লইলে যেরূপ দেখায়, জরির পোষাক পরিয়া তাহাকে সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। তাহার পর সে গায়ে নানারূপ সুগন্ধ লেপন করিল। তাহার পর সে বাক্স হইতে সামান্য একটি টুপি বাহির করিল। মাথা হইতে সাচ্চার টুপিটি খুলিয়া সেই সামান্য টুপিটি একবার সে পরিধান করিল। সেই টুপিটি পরিয়া আরসীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিল। তাহার পর সেই সামান্য টুপিটি মাথা হইতে খুলিয়া সে আপনার পকেটে রাখিল ও মাথায় পুনরায় সেই সাচ্চার টুপি পরিধান করিল।

যে ঘরে ভানুমতী আবদ্ধ ছিলেন, সাজ-গোজ করিয়া কুঁজো রাজা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে একখানি খাট ছিল। ভানুমতী সেই খাটের একপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, অবিরল ধারায় চক্ষুর জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কুঁজো রাজাকে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষুর জল মুছিয়া ফেলিলেন ও তাহার পর তিনি আরক্ত নয়নে তাহাকে বলিলেন,—"দুষ্ট! আমাকে তুই এখানে কেন আনিয়াছিস্? আমার বাবা এখন সসৈন্যে আসিয়া তোকে নিপাত করিবেন। যদি প্রাণের ভয় থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয়।"

কুঁজো রাজা বলিল,—"ছি ভাই! অত রাগ কেন? তোমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আনিয়াছি। আমার মত বর পৃথিবী খুঁজিয়া তুমি পাইবে না।"

ভানুমতী বলিলেন,—"তোরে আমি বিবাহ করিব? নরাধম! তোর বলিতে একটু লজ্জা হয় না? নিজের মুখ একবার আরসীতে গিয়া দেখ! মরণ আর কি! সাত হাত দাড়িতে আবার তেল মাখা হইয়াছে; দূর! দূর!"

কুঁজো রাজা উত্তর করিল,—"দাড়িতে তেল মাখি নাই, আতর মাখিয়াছি। যদি স্ব-ইচ্ছায় আমাকে তুমি বিবাহ না কর, তাহা হইলে জোর করিয়া তোমাকে আমি বিবাহ করিব। দেখি, কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে। তোমার বাপকে আমি ভয় করি না। এক ফুঁয়ে তোমার বাপকে আমি উড়াইয়া দিব।"

ভানুমতী বলিলেন,—"আমার বাপ যদি না পারেন, তাহা হইলে যে তোর গরুর নাক কাটিয়াছে, সে আমাকে উদ্ধার করিবে সে আসিয়া তোর দণ্ড করিবে।"

গরুর যে বন্দী হইয়াছে, কুঁজো রাজা তাহা শুনিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, ভানুমতীকে প্রথম বিবাহ করিয়া তাহার পর সে গরুরকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে। গরুর নাক কাটা গিয়াছে, এখন সেই কথা শুনিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ভানুমতীর সে বাম হাতটি ধরিল। বাম হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল,—"চল্ বাহিরে চল্, দালানে গিয়া সভা করিয়া পুরোহিত ডাকিয়া এখনি তোকে আমি বিবাহ করিব। তাহার পর দেখা যাইবে, কে কি করে।"

ভানুমতী আপনার হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আর দক্ষিণ হাত দিয়া তাহার মুখ আঁচড়াইয়া ও সেই সাত হাত দাড়ি ছিঁড়িয়া দিতে লাগিলেন। দাড়ি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শোণের ন্যায় চারিদিকে পড়িতে লাগিল। দাড়িটি কুঁজো রাজার বড় সখের ছিল। দাড়ি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িতে লাগিল, তাহা দেখিয়া কুঁজো রাজার বড় ভয় হইল। সে ভাবিল যে ভানুমতীর সহিত আর কিছুক্ষণ হুটোপুটি করিলে তাহার এমন যে তরিবৎ করা দাড়ি, তাহা সব ছিঁড়িয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া সে ভানুমতীর হাত ছাড়িয়া দিল, আর বলিল,—"রও। তোমাকে ধরিবার নিমিত্ত যাহাদের দাড়ি নাই, এমন সব লোক এখনি ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই কথা বলিয়া কুঁজো রাজা ঘোরতর রাগান্বিত হইয়া সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল। ভানুমতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দ্বারে খিল দিয়া দিলেন। ঘরে খিল দিয়া পুনরায় সেই খাটে আসিয়া বসিলেন। তাহার পর তিনি দেখিলেন যে, ভূমির উপর সামান্য একটি টুপি পড়িয়া রহিয়াছে। হুটোপুটি করিবার সময় কুঁজো রাজার পকেট হইতে টুপিটি পড়িয়া গিয়াছে। খাটের এক ধারে বসিয়া ভানুমতী টুপিটি নাড়িয়া নাড়িয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি টুপিটি আপনার মাথায় পরিলেন। স্ত্রীলোক! এত বিপদে পড়িয়াও স্ত্রীলোকের স্বভাবটুকু কোথায় যাইবে? ঘরে বড় একখানি আরসী ছিল। টুপি পরিয়া তাঁহাকে কেমন দেখাইতেছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত ভানুমতী আরসীর নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা। ভানুমতীর প্রতিবিম্ব আরসীর উপর পড়িল না। বিস্মিত হইয়া ভানুমতী ভাবিতে লাগিলেন,—"এ বড় অদ্ভুত কথা! কিছু পূর্বে আমার ছায়া আরসীর উপর পড়িয়াছিল। এখন আরসীর উপর আমার ছায়া পড়ে নাই কেন?" ভানুমতী মাথা হইতে টুপিটি খুলিয়া লইলেন, আর সেই মুহূর্তে আরসীতে তিনি আপনাকে দেখিতে পাইলেন। পুনরায় তিনি টুপি পরিলেন, আর সেই মুহূর্তে আরসী হইতে তাঁহার ছায়া অন্তর্হিত হইল। এইরূপ দুই চারিবার তিনি করিলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"হাঁ, বুঝিয়াছি! মাথায় এই টুপি পরিলে লোকে অদৃশ্য হইয়া যায়। টুপিটির গুণ এই।"

অতি সাবধানে টুপিটি লইয়া ভানুমতী পুনরায় খাটের উপর আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে লোকজন লইয়া কুঁজো রাজা বাহিরে দ্বার ঠেলিতে

লাগিল। ভানুমতী দ্বারে খিল দিয়াছিলেন। দ্বার সে সহজে খুলিতে পারিল না। কিন্তু জাদুবলের কাছে সামান্য একটা দ্বার কতক্ষণ বন্ধ থাকিতে পারে? মন্ত্রবলে কুঁজো রাজা তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সেই সময় ভানুমতী মাথায় সেই টুপিটি পরিধান করিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কুঁজো রাজা ও তাহার দাড়িহীন লোকগণ ভানুমতীকে দেখিতে পাইল না। সকলেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আশ্চর্য্য হইয়া কুঁজো রাজা আপনার পকেটে হাত দিয়া দেখিল, পকেটে সে টুপি নাই। ভানুমতীকে কেন দেখিতে পায় নাই, কুঁজো রাজা তাহা বুঝিতে পারিল। সকলকে সে বলিল,—"শীঘ্র দ্বার বন্ধ কর। ভানুমতী এই ঘরেই আছে। চারিদিকে হাত দিয়া সকলে অনুসন্ধান কর। চক্ষুতে দেখিতে না পাইলেও আমাদের হাতে সে ঠেকিয়া যাইবে।"

অষ্টম অধ্যায়

কিন্তু এ কথা বলিবার পূর্বে ও দ্বার বন্ধ করিবার পূর্বে, ভানুমতী লোকের পাশ দিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুঁজো রাজার লোকজন প্রথম ঘর আতি-পাতি করিয়া হাতড়াইতে লাগিল। ভানুমতীকে ঘরের ভিতর তাহারা পাইল না। তাহার পর সমস্ত বাড়ী তাহারা অনুসন্ধান করিল। কোন স্থানে তাহারা ভানুমতীকে পাইল না। কুঁজো রাজার বাটীর চারিদিকে ফুল ও ফলের বাগান ছিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া ভানুমতী বাগানের ভিতর গিয়া একটি ঝোপের ভিতর লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। সে জন্য কেহই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কুঁজো রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া চারিদিকে লোক পাঠাইল। ভানুমতীকে ধরিবার নিমিত্ত অশ্বারোহী পদাতী প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্য চারিদিকে ধাবিত হইল।

এ দিকে রুস্তম রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে সেই প্রান্তর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় তিনি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যক্রমে সাদি ও তারা তখনও মনুষ্যদেহে ছিল; তাহাদের নিকট গিয়া রুস্তম আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিলেন।

সাদি বলিল,—"এ যে আমাদের কাকার কর্ম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, শমশের তলোয়ারের গুণে তুমি তাহাকে পরাভব করিতে পারিবে। প্রাতঃকাল হইলে তুমি আমার পক্ষিরাজ ঘোড়াকে পুনরায় স্মরণ করিবে। কালবিলম্ব করা উচিত নহে। তুমি তাহার পিঠে বসিয়া নিশাপুরে গমন করিবে। কি উপায়ে তুমি ভানুমতীকে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে স্থানে গিয়া যেমন দেখিবে, সেইরূপ করিবে।"

তারা সেই কথায় সায় দিয়া বলিল,—"কিন্তু তুমি আমাদের কাকাকে বধ করিও না। তিনি আমাদের পিতাকে বধ করিয়াছেন সত্য; হাজার হউক তিনি আমাদের কাকা। ভানুমতীকে উদ্ধার করিয়া তুমি আমাদের দাই-মায়ের নিকট গমন করিবে! আমাদেরও উদ্ধারের সময় আসিয়াছে। কি উপায়ে আমরা কাকার জাদুবল হইতে নিষ্কৃতি পাইব, দাই-মা তাহা তোমাকে বলিয়া দিবেন।

অবিলম্বে প্রাতঃকাল হইল। রুস্তম পক্ষিরাজ ঘোড়াকে স্মরণ করিলেন,—

স্বর্ণখুর পক্ষিরাজ অশ্ব মনোহর।
উদ্ভাম ঈশ্বর আজ্ঞায় আইস সত্বর॥

এই মন্ত্র বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া পক্ষিরাজ ঘোড়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া রুস্তম ক্ষণকালের মধ্যে নিশাপুরে উপস্থিত হইলেন।

সেই ঝোপের ভিতর বসিয়া ভানুমতী সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন। প্রাতঃকাল হইল। মাথার চুল তাঁহার আলু থালু হইয়া গিয়াছিল। চুলগুলি কিছু পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত মস্তক হইতে তিনি একবার সেই টুপিটি খুলিলেন। সেই সময় দোতালার উপর জানালার নিকট কুঁজো রাজা দাঁড়াইয়াছিল। কুঁজো রাজা ভানুমতীকে দেখিতে পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভানুমতী আবার টুপিটি মাথায় পরিলেন, আর সেই মুহূর্তে তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

কুঁজো রাজা উপর হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে সেই ঝোপ অভিমুখে গমন করিল। ঝোপের নিকট উপস্থিত হইয়া যে স্থানে ভানুমতী বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে সে হাতড়াইতে লাগিল। অন্যমনস্ক হইয়া ভানুমতী বসিয়াছিলেন।

ভানুমতী তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সহসা কুঁজো রাজার হাত ভানুমতীর গায়ে ঠেকিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া ভানুমতী পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভানুমতীর টুপি গাছের ডালে লাগিয়া সেই স্থানে ঝুলিতে লাগিল। কুঁজো রাজা তখন ভানুমতীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল ও চুল ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। প্রাণপণে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ভানুমতী তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কুঁজো রাজা অতিশয় কুপিত হইল। রাগে তাহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইল। রাগে সে আপনার দন্ত কড়-মড় করিতে লাগিল। রাগে ভানুমতীকে কাটিবার চেষ্টা করিল। বাম হাতে ভানুমতীর চুল ধরিয়া, দক্ষিণ হাতে কোমর হইতে অসি বাহির করিয়া সে ভানুমতীর গলা কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। গলা কাটিবার নিমিত্ত সে খড়্গ উত্তোলন করিল। কোপ মারে আর কি! এমন সময় পক্ষিরাজ ঘোড়ার উপর রুস্তম সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শমশের তলোয়ারের পশ্চাৎ দিক্ দ্বারা রুস্তম কুঁজোর দক্ষিণ হাতে সবলে আঘাত করিলেন। কুঁজোর হাত হইতে অসি স্খলিত হইয়া দূরে গিয়া ভূমির উপর পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ রুস্তম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কুঁজোর সেই সাত হাত লম্বা দাড়ি ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শমশের তলোয়ার উত্তোলন করিয়া তিনি বলিলেন,—"দুর্বৃত্ত! এখন যদি তোমাকে কাটিয়া ফেলি, তাহা হইলে কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে।"

রুস্তমের হাতে শমশের খড়্গ দেখিয়া কুঁজো রাজা ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"শমশের তলোয়ার তুমি কোথা পাইলে? মৈনুক পরি আমার দাদাকে ইহা দিয়াছিল। দাদার মৃত্যুর পর আমি ইহার জন্য কত খুঁজিয়াছিলাম। তারার দাই-বেটী বোধ হয় ইহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যাহা হউক, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি আমার গলা কাটিয়া ফেল। আমি কিছু বলিব না।"

কুঁজো রাজাকে রুস্তম কাটিয়া ফেলিলেন না। একটা ঘরে তাহাকে তিনি কয়েদ করিয়া রাখিলেন। ভানুমতীকেও তিনি আর একটি সুন্দর ঘরে রাখিয়া দাস-দাসীদিগকে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। তাহার পর রুস্তম তারার দাই-মায়ের নিকট গমন করিয়া ভাই ভগ্নী কিরূপে কুঁজোর জাদু হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দাই-মা বলিলেন যে,—"কুঁজোর সাত হাত দাড়ি কাটিয়া সেই দাড়ি পোড়াইয়া সাদি ও তারার শরীরে লেপন করিলেই দুইজন উদ্ধার পাইবে।"

রুস্তম কুঁজো রাজার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভানুমতীকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার উপর আপনার পশ্চাৎ দিকে বসাইয়া তৎক্ষণাৎ ইরাণ নগরে গমন করিলেন। ভানুমতীকে পাইয়া ইরাণের রাজা, রাণী ও সমুদয় প্রজাবর্গ ঘোরতর আনন্দিত হইল। তাহার পর তিনি সেই প্রান্তরে আসিয়া নরমুণ্ডরূপধারী সাদি ও কাকরূপী তারাকে লইয়া নিশাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। সাদি ও তারাকে দাইয়ের বাটীতে রাখিয়া তিনি পুনরায় ইরাণ নগরে গিয়া কুঁজো রাজার গুরুকে লইয়া নিশাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। যে ঘরে কুঁজো রাজাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ঘরে গুরুকে লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। স্বভাবতই গুরু দেখিতে অতি কদাকার ছিল। নাসিকা ও কর্ণবিহীন হইয়া এখন আরও বিশ্রী হইয়াছিল। গুরুর দুরবস্থা দেখিয়া কুঁজো রাজা অনেক খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু রুস্তম তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—"দুঃখ করিতে হইবে না। তোমার দশাও ঐরূপ হইবে। পিঠে তোমার বৃহৎ কুঁজ আছে। তোমার কেবল এক দাড়ির গৌরব ছিল। সেই সাত হাত পাকা দাড়ি আজ কাটা যাইবে।"

কুঁজো রাজা রুস্তমের পায়ে পড়িয়া বলিল,—"তুমি আমাকে বধ কর, তুমি আমার গলা কাটিয়া ফেল, কিন্তু তুমি আমার দাড়ি কাটিও না। আহা! কত তরিবৎ করিয়া আমি আমার দাড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আর এই দাড়ির গুণেই আমার যত জাদুবিদ্যা। হায়! হায়! সে সাধের দাড়ি আজ আমার কাটা গেল।"

এই বলিয়া কুঁজো রাজা কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু তাহার ক্রন্দনে রুস্তম কর্ণপাত করিলেন না। নাপিত ডাকাইয়া তিনি তাহার দাড়ি কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেই দাড়ি পোড়াইয়া তাহার ভস্ম সাদি ও তারার গায়ে লেপন করিয়া দিলেন। সাদি ও তারা তৎক্ষণাৎ মানুষের আকৃতি প্রাপ্ত হইল। রুস্তম সাদিকে নিশাপুরের সিংহাসনে বসাইলেন। সাদি পুত্র-নির্বিশেষে সেই দেশের প্রজাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। সাদি আপনার পিতৃব্যকে বধ করিলেন না। গুরু ও তাহাকে তিনি কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে রুস্তম ইরাণ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বলিলেন,—"মহারাজ! ভানুমতীকে আমি প্রাণদান করিয়াছি। ভানুমতীকে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না। নিশাপুরের রাজা—আমার বন্ধু সাদির সহিত যদি তাহার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি পরম অনুগৃহীত হইব।" রাজা সে কথায় সম্মত হইলেন। অতি সমারোহে ভানুমতীর সহিত সাদির বিবাহ হইল। তারার রূপে রুস্তম মোহিত হইয়াছিলেন। ভানুমতী অপেক্ষা তারাকে তিনি অধিক ভালবাসিতেন। সেই জন্য তিনি ভানুমতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু দিন পরে তারার সহিত রুস্তমের বিবাহ হইল। ইরাণের অর্দ্ধেক ও নিশাপুরের কিয়দংশ লইয়া সমরখণ্ড নামক নূতন একটি রাজ্য সংস্থাপিত হইল। রুস্তম তাহার রাজা হইলেন। বৃদ্ধা মাতা ও তারাকে লইয়া রুস্তম, আর ভানুমতীকে লইয়া সাদি সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

জাপানের উপকথা

সূচনা

ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় জাতির এক্ষণে পতন অবস্থা। অনেক দিন পূর্বে কুভেয়ার নামক এক জন ফরাসি পণ্ডিত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই,—"যেমন একখানি ইটের উপর আর একখানি ইট রাখিয়া লোক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ একটি আবিষ্কৃত জ্ঞানের উপর আর একটি নূতন আবিষ্কৃত জ্ঞানের স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান কালের অদ্ভুত বিজ্ঞান শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। যে জাতিগণ এই নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে আয়ত্তাধীন করিয়াছে, তাহারা ধনে, মানে, পরাক্রমে উন্নত হইয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছে। যাহারা এই নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহারা দাস জাতিতে পরিণত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে।" আরব, তুর্ক, তাতার প্রভৃতি যে সমুদয় মুসলমান জাতির বাহুবলে পৃথিবী এক দিন কম্পিত হইয়াছিল, বিদ্যাবলে যে হিন্দুজাতি পৃথিবীর এক দিন অলঙ্কারস্বরূপ ছিল, শিল্প-কৌশলে যে চীনজাতি পৃথিবীতে এক দিন অজেয় ছিল, নূতন বিজ্ঞানকে অবহেলা করিয়া সেই সমুদয় জাতির আজ ঘোরতর অবনতি হইয়াছে। পূর্ব অঞ্চলে একমাত্র জাপানের লোক কেবল এই নূতন বিদ্যার আশ্রয় লইয়াছে। সেই বিদ্যাবলে জাপানের লোক প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াছে। জাপান,—এশিয়া মহাখণ্ডের যাবতীয় জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। বিশেষতঃ আমরা জাপানের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছি। জাপান যে কেবল আমাদের রাজার বন্ধু, তাহা নহে, জাপান আমাদের শিষ্য। কেবল তাহাও নহে, আমার বোধ হয় যে, জাপানের লোক বাঙ্গালি জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, সিংহলবাসীদের পূর্বপুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে গমন করিয়া সে স্থানে বাস করিয়াছিল। পূর্বকালে বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশ হইতে হিন্দু বণিকগণ সমুদ্রপথে গমন করিয়া যব, বালি, কাম্বোজ প্রভৃতি দ্বীপে ও নানা দেশে বাস করিয়াছিল। সেই সমুদয় দেশে এখনও হিন্দুদিগের কীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। জাপানেও যে হিন্দুগণ গিয়া বাস করিয়াছিল, নানা কারণে আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি; সুতরাং জাপানের সহিত আমাদের যতই সৌহার্দ্দ্য হয়, ততই ভাল। জাপান কোথায়, জাপানের লোক কিরূপ, তাহাদের আচার-ব্যবহার কিরূপ, এই সমুদয় বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। চীন ও জাপান সম্বন্ধে পূর্বে আমি কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আজ অন্য প্রকার বিবরণ প্রদান করিব। উপকথা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। সকল দেশেই মাতা, পিতা, পিতামহ, পিতামহীগণ,—বালকবালিকাদিগের নিকট উপকথা বলিয়া থাকেন। জাপানের পিতামহ পিতামহীগণ,—পৌত্রপৌত্রীগণের নিকট কিরূপ উপকথা বলিয়া থাকেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ আজ সেইরূপ একটি গল্প এ স্থানে প্রদান করিব।

গল্পারম্ভ : শিউতেন-দোজি রাক্ষস

জাপানের সম্রাটকে মিকাডো বলে। এক সহস্র বৎসর পূর্বে মুরাকোমি নামক সম্রাট মিকাডো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাপান দ্বীপপুঞ্জের ভিতর সুমিযোশি নামক এক প্রদেশ আছে। মুরাকোমি সম্রাটের শাসনকালে এই প্রদেশে ভয়ানক রাক্ষসের উপদ্রব হইয়াছিল। শিউতেন-দোজি নামক এক অতি নিষ্ঠুর রাক্ষসরাজ এই প্রদেশের বন্য অঞ্চলে বৃহৎ এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর বাস করিতে লাগিল। আপনার সহচর অন্যান্য ভীষণাকৃতি রাক্ষসগণের সহিত বাহির হইয়া সে গ্রামবাসীদিগের গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি গৃহপালিত জীবগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে মনুষ্যমাংসের আস্বাদ পাইয়া, সে নরনারী, বালক-বালিকা, শিশু-বৃদ্ধ—সকলকেই খাইতে লাগিল। মনুষ্যগণকে ধৃত করিয়া কিছু দিনের নিমিত্ত সে আপনার দুর্গে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিত। কারাবদ্ধ থাকিয়া সেই নরনারীগণকে কিছু দিনের নিমিত্ত তাহার সেবক-সেবিকার কাজ করিতে হইত। অবশেষে হৃষ্টপুষ্ট হইলে, তাহাদিগকে সে রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিত। জাপানের লোক সাফে নামক এক প্রকার উগ্র সুরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সুরাপান করিয়া রাক্ষস-রাজ শিউতেন-দোজি সর্বদাই উন্মত্ত অবস্থায় থাকিত। সেই অবস্থায় নর-মাংসের ঝোল, ঝাল, ভাজা, অম্বল, কারি, কাটলেট আহার করিয়া, সে পরম প্রীতিলাভ করিত। কিন্তু প্রতিদিন রাশি রাশি নর-মাংস ভোজন করিয়াও তাহার ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্ত হইত না। সে জন্য রাক্ষসরাজ সসৈন্যে প্রতিদিন মনুষ্য শিকারে বাহির হইত। আজ এ গ্রামে—কাল সে গ্রামে পড়িয়া, সে স্থানের অধিবাসিগণকে বন্ধন করিয়া সে আপনার দুর্গে লইয়া যাইত। বলা বাহুল্য যে, রাক্ষসের উপদ্রবে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। সে স্থানের লোকগণ রাক্ষসের জ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু নিকটে যতই মনুষ্যের অভাব হইতে লাগিল, দুষ্ট রাক্ষসগণ ততই অগ্রসর হইয়া দূরস্থিত গ্রাম-নগরসমূহ আক্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে কেবল যে সুমিযোশি প্রদেশ জনহীন হইয়া বিজন অরণ্যে পরিণত হইল, তাহা নহে, রাক্ষসের উপদ্রবে অন্যান্য প্রদেশও সেইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইবার উপক্রম হইল।

সাম্রাজ্য ছারখার হইতে বসিয়াছে দেখিয়া মিকাডো ঘোরতর চিন্তিত হইলেন। সম্রাট বৃদ্ধ ছিলেন; রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। আর শক্তি থাকিলেই বা কি হইবে? নানাপ্রকার মায়া অবলম্বন করিয়া শিউতেন-দোজি মনুষ্যদিগকে ধৃত ও সংহার করিত; মায়া-যুদ্ধে অন্যান্য রাক্ষসগণও তাহার সমকক্ষ ছিল না। সুতরাং সম্রাট একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। আমার সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল, জাপানে মানবকুল নির্ম্মূল হইয়া গেল, গহন কাননে পরিণত হইয়া জাপান রাক্ষসের বাসস্থান হইল,—এইরূপ চিন্তা করিয়া, সম্রাট সর্বদাই অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

মিনামোটো কুলপতি রাইকো

পাত্রমিত্র-সেনাপতিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, এক দিন সম্রাট সভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, পূর্বদিন দুর্বৃত্ত নিশাচরগণ প্রায় এক শত গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া, তাহাদের অধিবাসিগণকে বন্দী

করিয়া রাক্ষস-দুর্গে লইয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা কাঁদিতে লাগিলেন ; খেদ করিয়া আপনাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন ও কাতর বচনে মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। গণ্ডদেশে বামহস্ত রাখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে রাজা বলিতে লাগিলেন,—"ধিক আমাকে! পুত্রসম প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। হায় হায়! এই বিপুল জাপান সাম্রাজ্যের ভিতর এমন কি কোন বীর নাই যে, রাক্ষসকে বধ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতিকে রক্ষা করে।"

রাজার খেদোক্তি সভাসদগণ সকলেই শ্রবণ করিল। বড় বড় বীরগণ,—বড় বড় সেনাপতিগণ,—সকলেই মস্তক অবনত করিয়া নীরব হইয়া রহিল। মায়া-বিদ্যা-বিশারদ রাক্ষসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে কাহারও সাহস হইল না। মিনামোটো নামক ক্ষত্রিয়কুলের কুলপতি যোরিমিৎসু নামক যুবক আজ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট-পদে প্রণিপাত করিবার নিমিত্ত কোন দূরপ্রদেশ হইতে তিনি আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম যোরিমিৎসু ছিল বটে ; কিন্তু কাল-ক্রমে ইনি রাইকো অর্থাৎ মহাবীর নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এখন হইতে এই বিবরণে রাইকো নামেই ইনি অভিহিত হইবেন। রাইকো এখন যুবক ছিলেন ; তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ কি অষ্টাদশের অধিক হয় নাই। দেখিতে তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। শরীরের গঠন তাঁহার সুকোমল ছিল, বর্ণ উজ্জ্বল গঙ্গাজলী গোধূমের ন্যায় ছিল, গণ্ডদেশ দুইটি পূর্ণ ছিল, চক্ষু দুইটি বাদামের ন্যায় ঈষৎ বক্রভাবে সন্নিবেশিত ছিল, মস্তকের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ছিল। জনক রাজার গৃহে ধনুর্ভঙ্গের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেরূপ কোমলতা সকলে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, রাইকোর শরীরেও সেইরূপ কোমলতা ছিল। পুষ্পদলাচ্ছাদিত বজ্রের যেরূপ কোমলতা, রাইকোর দেহে সেইরূপ কোমলতা ছিল।

সম্রাটের খেদোক্তি শুনিয়া, রাইকো দণ্ডায়মান হইয়া, যোড় হস্তে নিবেদন করিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। রক্ষঃকুলের সহিত সংগ্রাম করিয়া, আমি তাহাদিগকে নিহত করিব।"

সম্রাট তাঁহার অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুমসদৃশ লাবণ্যবিশিষ্ট সুকুমার দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উত্তর করিলেন,—"পুত্র! তুমি ধন্য! এরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তুমি যে সাহস করিতেছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। কিন্তু তুমি বালক। যে কার্য্যে মহামহাবীরগণ প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেছে না, সে কার্য্যে তোমাকে আমি পাঠাইতে পারি না।"

অতি বিনীতভাবে রাইকো পুনরায় নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! মিনামোটো কুলোদ্ভূত ক্ষত্রিয়গণ স্বদেশের হিতসাধনে জীবনবিসর্জনে কখন পরাঙ্মুখ হয় না। রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে যদি বিজয়ী হইতে পারি, তাহা হইলে স্বদেশকে বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব ; আর যদি রণস্থলে একান্তই আমি পতিত হই, তাহা হইলে মানবের প্রার্থনীয় স্বর্গ আমার তৎক্ষণাৎ লাভ হইবে।"

সম্রাট,—রাইকোকে অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু অটল অচল ভাবে রাইকো বার বার তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সম্রাট বলিলেন,—"যদি তুমি একান্তই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিবে, তাহা হইলে আমিও সসৈন্যে তোমার সহিত গমন করিব। তোমাকে একেলা আমি দুরন্ত রাক্ষসের বিরুদ্ধে পাঠাইতে পারিব না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; কিন্তু জীবনের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, স্বদেশের ও স্বজাতির হিতের নিমিত্ত তাহা আমি বিসর্জন করিব।"

রাইকো উত্তর করিলেন,—"না মহারাজ! তাহা হইবে না। আমার সহিত আপনি যাইলে, অথবা সৈন্য প্রেরণ করিলে, কোন উপকার হইবে না। রাক্ষসগণ মায়াবলে যুদ্ধ করে, বাহুবলে তাহারা পরাজিত হইবে না। কৌশলে তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। সে জন্য মিনামোটো ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব তিন জন বীরকে কেবল সঙ্গে লইয়া, আমি রাক্ষসের বিরুদ্ধে গমন করিব।"

সম্রাটকে অগত্যা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। সম্রাটের নিকট বিদায় লইয়া, রাইকো প্রথম দেব-মন্দিরে গমন করিয়া, যথাবিধি পূজা দ্বারা দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। তাহার পর তাঁহার তিন জন সঙ্গী ও তিনি নিজে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। জাপানে সন্ন্যাসীদিগকে যমবাশি বলে। যমবাশিগণ কিছু-মাত্র সম্বল সঙ্গে না লইয়া পাহাড়-পর্বত পর্য্যটন করে। সাধু বলিয়া তাহাদিগের কেহ অনিষ্ট করে না; বরং গৃহস্থগণ আহারাদি প্রদান করিয়া, তাহাদের সন্তোষভাজন হইতে চেষ্টা করে। রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ স্কন্ধে একটি করিয়া ঝুলি লইলেন। ঝুলির ভিতর প্রত্যেকে লৌহনির্মিত বর্ম ও দুই হস্তে ধারণোপযোগী খড়্গ লুক্কায়িত রাখিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সঙ্গিগণের সহিত রাইকো, রাক্ষসের দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রাক্ষসের উপদ্রবের কথা লোকের মুখে ততই তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাক্ষসের দুর্গে যাইতেছেন শুনিয়া, সকলেই তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিল। সকলেই বলিল,—"দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণ সাধু-সন্ন্যাসী কাহাকেও মান্য করে না। একবার তাহাদের হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই, নিশ্চয় তাহারা খাইয়া ফেলিবে।"

রাইকো উত্তর করিলেন,—"আমাদের প্রাণ যায়,—তাহাও স্বীকার। হয় রাক্ষসগণকে আমরা নিহত করিব আর না হয়, রাক্ষসগণের হস্তে আমরা নিহত হইব। বৃদ্ধাবস্থায় জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া, রোগে নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া মৃত্যু অপেক্ষা পরহিতে জীবন বিসর্জন করাই শ্রেয়ঃ।"

লোককে এইরূপ উত্তর দিয়া, রাইকো ও তাঁহার বন্ধুগণ পথপর্য্যটন করিতে লাগিলেন। বহু দিন পথ চলিয়া ও নানাস্থান অতিক্রম করিয়া, ক্রমে তাঁহারা সুমিযোশি প্রদেশের ভিতর প্রবেশ করিলেন। রাক্ষস দ্বারা উপদ্রবের চিহ্ন সকল সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইল। ভয়বিহ্বল পলায়নপর সহস্র সহস্র লোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিল,—"যে রাক্ষসের ভয়ে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণ লইয়া আমরা পলায়ন করিতেছি, তোমরা সেই রাক্ষসের মুখে যাইতেছ! ছি ছি! এমন কাজ কখন করিও না। মিছামিছি কেন প্রাণ হারাইবে; ঘরে ফিরিয়া যাও।"

বলা বাহুল্য যে, রাইকো তাহাদের নিষেধ-বাক্য শুনিলেন না। তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে জনশূন্য ভস্মীভূত নগর ও গ্রাম তাঁহাদের নয়ন-পথে পতিত হইতে লাগিল। অবশেষে একখানি গ্রামে গিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। সে গ্রামে একটিও মানুষ কি গ্রাম্য পশু ছিল না; আর সে স্থানের সমুদয় গৃহ রাক্ষসেরা দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। গ্রামের পথঘাট ও ভস্মীভূত গৃহের প্রাঙ্গণ সমুদয় নর-শোণিতে প্লাবিত হইয়াছিল। এই স্থানে কোনরূপে রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহারা আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন হইতে আর তাঁহাদের জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহারা দেখিলেন যে, রাক্ষসের উপদ্রবে এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এখন একবারে জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

বন, উপবন, পর্বত, প্রান্তর, হ্রদ, নদী অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন। সেই জনশূন্য দেশে আহার অভাবে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইতে

লাগিল। ক্রমে তাঁহারা প্রস্তরপূর্ণ কণ্টকাবৃত এক পর্বত শ্রেণীর নিম্নে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে দূরে এক অত্যুচ্চ গিরিশিখরে রাক্ষসরাজার দুর্গ তাঁহাদের নয়নগোচর হইল, কিন্তু পথ ক্রমে এতই দুর্গম হইয়া উঠিল যে, আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পথ-শ্রান্তিতে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ব্যথিত হইয়া, তাঁহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আগে যাইতে আর তাঁহাদের পা উঠিল না। তাঁহারা সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় নিকটস্থ সামান্য একটি পর্বতের চূড়ায় তাঁহারা এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার শরীর ছিল, শুভ্রবর্ণের জটাজুটে তাঁহার মস্তক পরিশোভিত ছিল ও শুভ্রবর্ণের শ্মশ্রু দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল আবৃত ছিল। পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া রাইকোর সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার উজ্জ্বল দেহ ও প্রসন্নমূর্তি দেখিয়া রাইকো বিবেচনা করিলেন যে, ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

অতি সুমধুর স্বরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎসগণ! তোমরা কে? এই রাক্ষস-ভয়সঙ্কুল প্রদেশ দিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ?"

যোড় হস্তে রাইকো উত্তর করিলেন,—"প্রভো! এই দাসের নাম যোরিমিৎসু, কিন্তু রাইকো বলিয়া সকলে আমাকে সম্বোধন করে। দাস মিনামোটো ক্ষত্রিয়কুলের কুলপতি, আর ইঁহারা তাহার জ্ঞাতি ও বন্ধু। শিউতেনদোজি রাক্ষসের দুর্গে দাস গমন করিতেছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"পুত্র রাইকো! তোমাকে দেখিয়া আজ আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আমি মনুষ্য নহি, এই সুমিযোশি প্রদেশের আমি প্রদেশ-দেবতা। রাক্ষসের জ্বালায় যেরূপ এ প্রদেশের অধিবাসিগণ উৎপীড়িত হইয়াছে, আমি ও আমার অধীনস্থ যাবতীয় গ্রাম্য-দেবতাগণও সেইরূপ উৎপীড়িত হইয়াছেন। দেশ পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় লোক পলায়ন করিয়াছে। দিনান্তে আমাদিগকে একটি ফুল প্রদান করে, এমন লোক এ দেশে নাই। পূজা অভাবে আমাদের দেব-দেহ জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছে, অস্থিচর্মসার হইয়া আমরা পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি। অসামান্য সাহসসম্পন্ন নির্ম্মলচিত্ত মনুষ্যের সহায়তা ব্যতীত রাক্ষসের মায়াজাল আমরা ছিন্ন করিতে পারি না। বৎস রাইকো! তুমি সেই প্রকৃতির লোক। বহু দিন হইতে তোমার প্রতীক্ষায় আমি কালক্ষেপ করিতেছি।"

রাইকো বলিলেন,—"বাবা! তবে এক্ষণে আশীর্বাদ করুন, রাক্ষসের দুর্গে প্রবেশ করিয়া যেন দুর্বৃত্তদিগকে বধ করিতে সমর্থ হই।"

প্রদেশ-দেবতা বলিলেন,—"পুত্র রাইকো! বাহুবলে তুমি রাক্ষসগণকে বধ করিতে পারিবে না। কৌশলে তুমি তাহাদিগকে বধ করিবে। যখন তুমি রাক্ষসের দুর্গে প্রবেশ করিবে, অদৃশ্যভাবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমি ও যাবতীয় গ্রাম্যদেবতাগণ তোমাদের সহায়তা করিব। যাহা হউক, আজ তোমরা আমার অতিথি হইয়া এই স্থানে রাত্রিযাপন কর। পানভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, বিশ্রামে পথ-ক্লান্তি দূর করিয়া, কল্য প্রাতঃকালে পুনরায় পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইবে।"

এই কথা বলিবামাত্র সেই স্থানে চমৎকার এক অট্টালিকার আবির্ভাব হইল। অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ নানাপ্রকার সুখাদ্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন ও মণিমুক্তাখচিত পর্য্যঙ্কের উপর দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহারা পরম সুখে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাত হইলে প্রদেশ-দেবতা পুনরায় দর্শন দিয়া বলিলেন—"রাইকো! তোমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি ও গ্রাম্য-দেবতা অদৃশ্যভাবে তোমাদের নিকট থাকিব।

তাহা ব্যতীত আমি তোমাকে দুইটি অদ্ভুত সামগ্রী প্রদান করিতেছি। তাহাদের দ্বারা তোমার বিশেষ উপকার হইবে। প্রথম,—স্বর্ণ-নির্মিত এই টুপিটি তোমাকে আমি প্রদান করিলাম। উষ্ণীষের নিম্নে ঠিক মস্তকের উপর তুমি ইহা পরিধান করিবে। যতক্ষণ ইহা তোমার মস্তকে থাকিবে, ততক্ষণ রাক্ষসের শেল, শূল, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রের প্রহারে বিন্দুমাত্র তুমি আঘাতিত হইবে না। মায়া-অস্ত্রপ্রহারেও রাক্ষস তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহার পর তোমাকে এই ঔষধটি প্রদান করিলাম। রাক্ষস-রাজ সাকে নামক সুরা সর্বদাই পান করে। তাহার সুরার সহিত কোনরূপে এই ঔষধটি তুমি মিশাইয়া দিবে। ঔষধ-মিশ্রিত সুরা পান করিলে রাক্ষস হীনবল হইবে ও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। তখন তুমি তাহাকে অনায়াসেই বধ করিতে পারিবে।"

প্রদেশ-দেবতা রাইকোকে রাক্ষসের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আরও নানারূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর সেই কণ্টকময় দুর্গম পর্বতের উপর পথ দেখাইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। অবশেষে অপরাহ্ণে এক হ্রদের কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে প্রদেশ-দেবতা রাইকোর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। সেই হ্রদের কূল অনুসরণ করিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ রাক্ষসের দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, এক প্রবল স্রোতস্বতী নদী আসিয়া সেই হ্রদে পতিত হইয়াছে। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাইকো দেখিলেন যে, সেই নদীতীরে এক যুবতী ভদ্র-মহিলা বসিয়া রোদন করিতেছে। তাহার পরিধেয় বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। নিকটে গিয়া রাইকো তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহার পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনীকে রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিয়াছে। আপাততঃ তাহাকে দাসী করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু কিছু দিন পরে তাহাকেও রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিবে। সে দিন যে সমুদয় মানুষকে বধ করিয়া রাক্ষসগণ রন্ধন করিয়াছিল, তাহাদের রক্তেই তাহার বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। কাপড় ধৌত করিতে সে নদীকূলে আসিয়াছে। এইরূপে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া যুবতী রাইকোকে রাক্ষস-দুর্গে প্রবেশ করিতে বার বার নিষেধ করিল। কিন্তু রাইকো তাহার নিষেধ শুনিলেন না। অবশেষে যুবতী রাক্ষস-দুর্গে প্রবেশের পথ রাইকোকে দেখাইয়া দিল।

যথাসময়ে রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ দুর্গদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড লৌহনির্মিত দ্বার। পর্বতশিখরে অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা দুর্গটি বেষ্টিত ছিল। সেই প্রাচীরের নিম্নে জলপূর্ণ গভীর খাদ খনিত ছিল। কাহার সাধ্য যে বিনা অনুমতিতে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে। দুর্গ-দ্বারে বিকটাকার বহুসংখ্যক দানব প্রহরী-স্বরূপ নিযুক্ত ছিল। মুখমণ্ডল কাহারও জালার মত, কাহারও দন্ত হস্তি-দন্তের ন্যায়, কাহারও কর্ণ সূর্পের ন্যায়, কাহারও চক্ষু জ্বলন্ত মালসার ন্যায়। ফল কথা, তাহাদের ভীষণ আকৃতি দেখিলে মানুষের হৃৎকম্প হয়। সহসা চারি জন মনুষ্যকে দ্বারে দেখিয়া প্রহরিগণ বিস্মিত হইল। তাহার পর যখন রাইকো বলিলেন,—"আমরা সন্ন্যাসী, আজ রাত্রিতে তোমাদের প্রভুর নিকট আমরা আতিথ্য প্রার্থনা করি।" তখন তাহারা হাসি আর রাখিতে পারিল না। বিকট শব্দে হাস্য করিয়া তাহারা নানারূপ পরিহাস করিতে লাগিল। কেহ বা রাইকোর শরীর টিপিয়া আপনার মুখের ভিতর আপনার অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া ইঙ্গিত করিল যে,—"আজ রাত্রিতে তোমাদের কোমল মাংস ভক্ষণ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিব।"

সে সমুদয় বিদ্রূপের উপর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, রাইকো তাহাদের প্রভুকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক জন দানব দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজার নিকট সংবাদ দিল যে,—"মহারাজ! চারি জন কোমল-মাংসবিশিষ্ট অতি উপাদেয় খাদ্য অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে।"

সন্ন্যাসীদিগের তৎক্ষণাৎ ভিতরে আনিবার নিমিত্ত রাক্ষস-রাজ আদেশ করিল। ভিতরে গিয়া রাইকো দেখিলেন যে, শিউতেন-দোজি সিংহাসনে বসিয়া আছে। বহুসংখ্যক রাক্ষস নানারূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহাসনের নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অন্যান্য রাক্ষসের মূর্তি অতি ভয়ানক বটে; কিন্তু শিউতেন-দোজির আকৃতি—মূর্তি যেরূপ ভীষণ, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলে মানুষ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। কিন্তু রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ মিনামোটো-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। শিউতেন-দোজি রাক্ষসের বিকট মূর্তি দেখিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; কিন্তু রাজাকে যেরূপ সম্মান করা উচিত, তাহা তাঁহারা করিলেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা নয়বার কো-চৌ করিলেন, অর্থাৎ ভূমির উপর নয়বার মাথা ঠুকিলেন। তখন রাক্ষস-রাজ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কে, কোথা হইতে কি জন্য এ স্থানে আসিয়াছ?"

রাইকো উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! আমরা সন্ন্যাসী,—আমাদের ঘর-দ্বার নাই। এক তীর্থস্থান হইতে অন্য তীর্থস্থানে পর্য্যটন করিয়া আমরা জীবন অতিবাহিত করি। আজ কয়দিন এই প্রদেশে আমরা প্রবেশ করিয়াছি। জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অদ্য দূর হইতে মহারাজের এই অট্টালিকা দেখিয়া আপনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আজ রাত্রির নিমিত্ত মহারাজের আশ্রয় প্রার্থনা করি। সন্ন্যাসীদিগকে দীন-দুঃখী গৃহস্থও এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করে। ভরসা করি, মহারাজ আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ অন্ন ও একটু আশ্রয়স্থান দিতে কাতর হইবেন না।"

শিউতেন-দোজি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"স্বইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমার ভবনে অনেক লোক আগমন করে। সে সমুদয় লোককে আমি যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছি, তোমাদিগকেও আমি সেই ভাবে অভ্যর্থনা করিব।"

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত রাক্ষসগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীদিগের কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে, তাহা সকলেই বুঝিল। কল্য ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পাইবে, তাহা ভাবিয়া অনেকের মুখে লালা আসিয়া গেল।

শিউতেন-দোজি তখন অনুচরদিগকে অনুমতি করিলেন,—"আমার গৃহে আজ যাহা কিছু সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, সে সমুদয় আনয়ন কর। আজ আমি যথাবিধি অতিথিসৎকার করিব। অতিথির সহিত একত্রে আজ আমরা সকলে ভোজন করিব।"

ভোজনের আয়োজন হইল। ভিতর ও বাহির হইতে রাক্ষসগণ আসিয়া সারি সারি উপবিষ্ট হইল। অতি সমাদর করিয়া রাক্ষস-রাজ রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণকে আপনার দক্ষিণ ও বামদিকে বসাইলেন। পরিবেশকগণ সকলের সম্মুখে অনেকগুলি আচ্ছাদিত পাত্র রাখিয়া দিল। আচ্ছাদন খুলিয়া সকলে আহার করিতে আরম্ভ করিল।

আপনার পাত্রের আচ্ছাদন খুলিয়া রাইকো দেখিলেন যে, তাহার ভিতর একটি নরমুণ্ড ও নরপদ রহিয়াছে। সেই নরমুণ্ড হইতে তখনও রক্তধারা বিগলিত হইতেছিল। রাইকোর সঙ্গিগণকেও সেই প্রকার আহার প্রদত্ত হইয়াছিল।

রাক্ষসগণও কেবল নরমাংস ভোজন করিতেছিল। সেই কদর্য্য আহারীয় সামগ্রী দর্শন করিয়া রাইকো কিছুমাত্র ভয় কি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। প্রতিদিন যেন তাঁহারা নরমুণ্ডই ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এইরূপ মুখ ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা নরমাংস আহার করিলেন না। মুণ্ড ও পদ হইতে মাংস ছিঁড়িয়া, মুখের কাছে লইয়া কৌশলে ঝুলির ভিতর তাঁহারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-রাজ মনে করিয়াছিল যে, ইহারা যখন ভয়ে কাঁপিতে থাকিবে, তখন ইহাদিগকে লইয়া আমি নানারূপ কৌতুক করিব। সে আশায় সে বঞ্চিত হইল। মনুষ্য হইয়া পাতে নরমুণ্ড দেখিয়া ভয় পাইল না, আর তাহা অক্ষুণ্ণ চিত্তে আহার করিল, সে জন্য রাক্ষস-রাজ ঘোরতর বিস্মিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে রাইকো বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার অনুগ্রহে আজ পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমরা উদাসীন ভিখারী; এমন সুখাদ্য জনমে কখন ভক্ষণ করি নাই। ইহার বিনিময়ে কোনরূপ যে প্রত্যুপকার করি, সে শক্তি আমাদের নাই। তবে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয় আমরা অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি, মহারাজ সাকে-সুরা পান করিয়া থাকেন। চাউল হইতে প্রস্তুত সাকে-সুরা সুগন্ধযুক্ত নহে; কিন্তু এক প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট আছে, যাহা সাকের সহিত মিশ্রিত করিলে পরম উপাদেয় সুরাতে ইহা পরিণত হয়। এমন কি, দেবতাগণ যে সুধা পান করেন, ইহা সেই সুধার সমান হয়।"

শিউতেন-দোজি ও তাহার অনুচরগণ রাত্রিদিন অবিরত সাকে পান করিয়া উন্মত্ত অবস্থায় থাকিত; কিন্তু সাকের আস্বাদ ভাল নহে, কষ্টে ইহা পান করিতে হয়। যখন সে শুনিল যে, দ্রব্যগুণে সাকে-সুরাকে পরম উপাদেয় পেয় বস্তুতে পরিণত করিতে পারা যায়, তখন তাহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সুগন্ধযুক্ত সাকে-সুরাকে সুগন্ধযুক্ত সুমিষ্ট সুধায় পরিণত করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সে আদেশ করিল।

রাক্ষসের নৃত্য

জাপান শীতপ্রধান দেশ। উত্তাপের নিমিত্ত সেই ভোজনাগারেই অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। রাইকোর আদেশে সাকে-পূর্ণ লৌহকটাহ অগ্নির উপর বসান হইল। অগ্নির উত্তাপে সুরা ফুটিতে লাগিল। তখন রাইকো প্রদেশদেবতা প্রদত্ত সেই ঔষধ ফুটন্ত সুরার উপর নিক্ষেপ করিলেন। সুরার সহিত ঔষধ উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে, অগ্নি হইতে কড়া নামাইয়া সেই সুরা রাইকো রাক্ষসগণকে পান করিতে দিলেন। রাক্ষসরাজ তাহা পান করিয়া দেখিলেন যে, অতি সুমধুর সুরা—অমৃত বলিলেও চলে। সে যতই ইহা পান করিতে লাগিল, বার বার পানের পিপাসা ততই বাড়িতে লাগিল। পাত্রের পর পাত্র পান করিয়া, সে উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। অন্যান্য রাক্ষসগণও অমৃত তুল্য এই সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ সুরা পান করিলেন না। তাঁহারা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী, সে জন্য কেহ তাঁহাদিগকে পান করিবার নিমিত্ত অনুরোধও করিল না।

ঔষধ-মিশ্রিত সুরা পান করিয়া প্রথম অবস্থায় সকলের মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইল। আনন্দে বিমোহিত হইয়া শিউতেন-দোজি নর্তকীগণকে আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিল। বড় বড় মনুষ্যের যুবতী দুহিতাগণকে বলপূর্বক

আনিয়া সে নর্তকীরূপে নিয়োজিত করিয়াছিল। তাহাদিগের নৃত্য-গীতে কিছু দিনের নিমিত্ত পরিতোষ লাভ করিয়া অবশেষে সে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত ও পুনরায় নূতন যুবতীগণকে আনিয়া তাহাদের পদে নিযুক্ত করিত। সেবা করিবার নিমিত্ত যে সমুদয় ভদ্রমহিলা নিয়োজিত ছিল, তাহাদের সহিতও সে এইরূপ ব্যবহার করিত। নর্তকীগণ নাচিতে লাগিল, হাততালি দিয়া রাক্ষসরাজ তাল রাখিতে লাগিল। ক্রমে আনন্দে বিভোর হইয়া, সে নিজে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য রাক্ষসগণও সেই নৃত্যে যোগ প্রদান করিল। প্রথম মানবী নর্তকীদিগের রণু-ঝণু জগৎ স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তাহার পর রাক্ষস নর্তকদিগের গুপ-গাপ শব্দে জগৎ কম্পিত হইল। সাদামিটি নামক রাইকোর এক জন সঙ্গী চমৎকার নাচিতে জানিতেন। রাক্ষসদিগের মন হরণ করিবার নিমিত্ত রাইকোর আদেশে তিনিও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া রাক্ষসগণ ভূয়ো-ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল।

নৃত্যের সহিত অবিরত সুরাপানও চলিতেছিল। সুরা ও ঔষধের গুণে রাক্ষসগণ ক্রমেই নিস্তেজ, হীনবল ও হতজ্ঞান হইতে লাগিল। শিউতেন-দোজি রাক্ষস-রাজ সকলের অপেক্ষা অধিক সুরা পান করিয়াছিল। প্রথম সে অজ্ঞান হইয়া ভূতলশায়ী হইল। অনুচরগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া শয়নাগারে লইয়া গেল। তাহার পর রাক্ষসগণ পুনরায় সুরা পান ও নৃত্য আরম্ভ করিল। অবশেষে একে একে সমুদয় দানবগণ উন্মত্ত ও জ্ঞানহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

তখন রাইকো সাঙ্গগণের সহিত শিউতেন-দোজির শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে রাক্ষসরাজ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে, আর অনেকগুলি ভদ্র-ঘরের মানবী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে। কেহ বা তাহার পদসেবা করিতেছে, কেহ বা পাখা ব্যজন করিতেছে, কেহ বা তাহার মস্তক কণ্ডূয়ন করিতেছে। কারাবদ্ধ মানব ও মানবীগণ রাইকো ও তাঁহার সাঙ্গগণকে রাক্ষসদিগের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে দেখিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, ইঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন, ছদ্মবেশধারী রাক্ষস। সুতরাং রাইকো ও তাঁহার সাঙ্গগণকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা ঘোরতর ভীত হইল। কিন্তু রাইকো তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, তোমাদের মত আমরাও মানুষ। সম্রাট-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে আমরা আসিয়াছি।"

রাক্ষসের মুণ্ড

এই কথা বলিয়া রাইকো ও তাঁহার সাঙ্গগণ আপন আপন ঝুলি হইতে বর্ম ও খড়্গবাহির করিলেন। আপন আপন বর্ম সকলে পরিধান করিলেন। তাহার পর তাঁহারা দুই হস্তে ধারণের উপযোগী গুরু ও ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু এমন সময় ঘরের ভিতর সেই প্রদেশ-দেবতার আবির্ভাব হইল। হাত তুলিয়া তিনি রাইকোকে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"বৎস রাইকো! কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। রাক্ষসের বিষম মায়া! ইহার মস্তক ছেদন করিলেও তৎক্ষণাৎ ইহার মৃত্যু হইবে না। ইহার ছিন্ন মস্তক, ছিন্ন হস্ত ও ছিন্ন পদ তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত যুদ্ধে তোমরা জয়লাভ করিতে পারিবে না। অতএব এই রজ্জু দ্বারা প্রথম ইহার সর্বশরীর উত্তমরূপে খাটের সহিত বন্ধন কর। তাহার পর ইহার

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিল তিল করিয়া কর্তন করিবে।" এই কথা বলিয়া প্রদেশ-দেবতা রাইকোকে একগাছি মায়ারজ্জু প্রদান করিলেন। সেই রজ্জু দ্বারা রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ নিদ্রিত হতজ্ঞান রাক্ষসকে উত্তমরূপে খাটের সহিত বন্ধন করিলেন। তাহার পর খড়্গ উত্তোলন করিয়া এককোপে তাহার মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের মস্তক কাটিবামাত্র বজ্রনিনাদের ন্যায় ভীষণ শব্দে ঘর পরিপূর্ণ হইল। দুঃখের বিষয় যে, দেবদত্ত মায়া-রজ্জু দ্বারা রাইকো রাক্ষসের মস্তককে ভালরূপে খাটের সহিত বন্ধন করেন নাই। সে জন্য যেই তিনি রাক্ষসের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, আর সেই ছিন্ন মস্তক ঊর্ধ্বে ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। অবশেষে সেই ছিন্ন মস্তক হস্তি-দন্তের ন্যায় দন্ত বাহির করিয়া কড়-মড় শব্দ করিতে করিতে রাইকোর মস্তকের উপর পতিত হইল। রাইকোর মস্তকে লৌহ-নির্মিত সুদৃঢ় শিরোরক্ষক মুকুট ছিল। এক কামড়ে রাক্ষসের মুণ্ড তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। ছিন্ন মুণ্ডের কামড়ে রাইকোর মস্তকও সেইরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু ভাগ্যে তিনি ঠিক মাথার উপর প্রদেশ-দেবতা-প্রদত্ত সেই স্বর্ণ-টুপি পরিধান করিয়াছিলেন। রাক্ষসের দন্ত সে দেবদত্ত টুপিকে ভেদ করিতে পারিল না। তাহাতেই রাইকোর প্রাণ বাঁচিয়া গেল। এই সময় রাইকোর সঙ্গী অপর তিন বীর নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে সুনা নামক রাইকোর এক পরম সুহৃদ্ ছিলেন। ইতঃপূর্বে নানা যুদ্ধে সুনা রাইকোর সহায়তা করিয়াছেন। কোন স্থানে মাকড়শাসুর নামক এক দৈত্য কিছু দিনের নিমিত্ত অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। সুনার সাহায্যে রাইকো সেই পর্বতপ্রমাণ মাকড়শাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর আর এক স্থানে চরকাসুর নামক আর এক জন অসুরের উৎপাতে দেশ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। সে অসুরের শরীর ঠিক চরকার ন্যায় ছিল। আকাশের উপর দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান হইয়া চরকাসুর অকস্মাৎ আজ এ দেশে, কাল সে দেশে পতিত হইত ও বিদ্যুৎসম অগ্নিশিখার ন্যায় ভ্রমণ করিয়া নিমেষের মধ্যে সমুদয় দেশকে ছারখার করিত। তাহাকে বধ করিবার সময়ও সুনা রাইকোর বিশেষরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাইকোর বিপদ

রাইকোর মস্তকের উপর ছিন্ন মুণ্ডের দংশন যখন ব্যর্থ হইল, তখন মুণ্ড কিঞ্চিৎ নামিয়া রাইকোর বক্ষঃস্থল কামড়াইতে চেষ্টা করিল। রাইকোর বক্ষঃস্থল বর্ম দ্বারা রক্ষিত ছিল বটে, কিন্তু সে দেবদত্ত বর্ম নহে; সুতরাং রাক্ষসের তীক্ষ্ণ দন্ত অনায়াসে তাহা ভেদ করিতে পারিত। ছিন্ন মুণ্ডের বিপদ্‌ল বলে রাইকো ভূমির উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত হইতে খড়্গ স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দুই হাতে ছিন্ন মুণ্ডের কেশ ধরিয়া রাইকো তাহার বক্ষঃস্থল হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বৃথা হইল। মুহূর্তকাল আর বিলম্ব হইলে, মুণ্ডের দন্ত রাইকোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিত। এমন সময় প্রদেশ-দেবতা পুনর্বার আবির্ভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"সুনা! সুনা! দেখ কি! রাইকোর প্রাণরক্ষা কর।"

চকিতের মধ্যে সুনা রাইকোর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। চকিতের মধ্যে রাইকোর বিপদ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। চকিতের মধ্যে সবলে খড়্গ প্রহারে ছিন্ন মুণ্ডকে তিনি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন; তাহার পর বার বার খড়্গ প্রহারে তিনি মুণ্ডকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তখন মুণ্ডের আর কোন শক্তি রহিল না। রাইকোর প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

এ দিকে রাইকো ও সুনা যখন ছিন্ন মস্তকের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় ওদিকে রাক্ষসের হস্ত-পদ সহসা মত্ত হস্তিবলে রজ্জু হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিল; কিন্তু সে দেবদত্ত মায়া-রজ্জু। রাক্ষসের হস্ত-পদ সে রজ্জুকে ছিন্ন করিতে পারিল না। খাটসহ রজ্জু বারবার ছাদের নিকট উঠিয়া পুনরায় নিম্নে পতিত হইয়া সকলকে বধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু রাক্ষসের সে চেষ্টা বৃথা হইল। তাহার শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। মস্তকবিহীন রাক্ষস-শরীরে দৃষ্টিশক্তি ছিল না। খাট যেই নিম্নে পতিত হয়, আর রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হন। সেজন্য একবারও ঠিক তাঁহাদের মস্তকের উপর খাট পতিত হইল না। খাট যেই নিম্নে উপস্থিত হয়, আর রাইকোর দুইজন সঙ্গী খড়্গদ্বারা রাক্ষস শরীরের উপর কোপ মারিতে থাকেন। মুণ্ডকে তিল তিল করিয়া, রাইকো ও সুনা এই কার্য্যে যোগপ্রদান করিলেন। চারিজনের ক্রমান্বয়ে প্রহারে রাক্ষসের শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তখন আর তাহার কোন শক্তি রহিল না। রাক্ষসরাজ দুরাত্মা শিউতেন-দোজি এইরূপে রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল।

জয়লাভ

শয়নাগারের ভীষণ কোলাহলে অন্যান্য রাক্ষসও ক্রমে জাগরিত হইল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রবলবেগে তাহারা সেইস্থানে উপস্থিত হইল। রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত তাহাদের তুমুল-সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ভাগ্যে শয়নাগারের ন্যায় সঙ্কীর্ণ স্থানে এই যুদ্ধ হইল। সে জন্য দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই অল্পসংখ্যক মনুষ্য বহুসংখ্যক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন। রাক্ষসগণ চারিদিক হইতে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতে পারিল না। তাহা ব্যতীত দেবদত্ত ঔষধ মিশ্রিত সুরা সেবনে রাক্ষসগণ নিস্তেজ ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল ও সুরার উন্মত্ততায় তাহাদের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। যাহা হউক, তথাপি রাইকো ও তাঁহার বন্ধুগণকে সমস্ত রাত্রি সেই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ঠিক প্রভাতের সময় শেষ চারিজন রাক্ষস রাইকো ও তাঁহার বন্ধুগণের নিদারুণ খড়্গপ্রহারে হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

যে যুবতীগণ রাক্ষসরাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, এই ভয়ানক যুদ্ধের সময় তাহাদের কেহ কেহ রাইকোর সহায়তা করিয়াছিল, কেহ বা ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাহাদের সান্ত্বনা করিলেন। তাহার পর রাক্ষসের কারাগার কোথায়, তাহা দেখাইয়া দিতে বলিলেন। দুর্গের নিম্নে কিছু দূরে রাক্ষস-রাজের কারাগার ছিল। যুবতীগণ সুড়ঙ্গপথে রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণকে সেই স্থানে লইয়া গেল। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, দ্বারে প্রহরিস্বরূপ আর দুইজন রাক্ষস রহিয়াছে। তাহাদের সহিত পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। কিন্তু রাইকো ও তাঁহার বীরগণ অবিলম্বে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাইকো মনে করিলেন যে, জীয়ন্ত অবস্থায় এই দুই রাক্ষসকে আমি সম্রাটের নিকট লইয়া যাইব।

রাক্ষস দুইজনকে বন্ধন করিয়া তাঁহারা কারাগারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে বৃহৎসংখ্যক নরনারী কারাবদ্ধ ছিল। রাইকো তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তাহাদের আনন্দধ্বনিতে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। দুই হাত তুলিয়া

তাহারা রাইকোর প্রশংসা করিতে লাগিল। সে স্থান হইতে যুবতীগণ রাইকোকে আর একটি পর্বতগহ্বরে লইয়া গেল। সে স্থানে রাক্ষসেরা মনুষ্যগণকে আহার করিবার পূর্বে বধ করিত। সে স্থানের মৃত্তিকা নরশোণিতে সিক্ত হইয়াছিল, আর চারিদিকে স্তূপাকার হইয়া নরমুণ্ড, নর-অস্থি ও নর-কঙ্কাল পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া রাইকো ঘোরতর ক্রুদ্ধ হইলেন। বন্দী রাক্ষস দুইজনকে তৎক্ষণাৎ বধ করিবার নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা করিলেন। রাইকোর সঙ্গিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

রাইকোর মনস্কামনা এক্ষণে সিদ্ধ হইল। রাক্ষসের দুর্গে যত ধনরত্ন ছিল, তাহা লইয়া ও রাক্ষসকর্ত্তৃক ধৃত সহস্র সহস্র নর-নারীদিগকে লইয়া, রাইকো সম্রাটের রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। কখনও সাক্ষাৎভাবে কখনও অসাক্ষাৎভাবে প্রদেশ-দেবতা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। সূর্য্য সেই কয়দিন তাহাদের উপর সামান্যভাবে কেবল একটু মৃদু জ্যোতি ও উত্তাপবিশিষ্ট কিরণ বর্ষণ করিলেন। মনোহর গন্ধপূর্ণ বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথে বৃক্ষ সমুদয় তাঁহাদিগকে সুমিষ্ট ফল প্রদান করিল। নির্ঝর সকল সুশীতল বারি প্রদান করিয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। অন্তরীক্ষে থাকিয়া গ্রাম্যদেবতাগণ তাঁহাদের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বিজন সুমিযোশি প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা অন্যান্য জনাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন, তখন সে স্থানের অধিবাসিগণ কিরূপ সমারোহের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, সে কথা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। তাহার পর সম্রাটের সভায় উপস্থিত হইলে তিনি রাইকোর কিরূপ সম্মান ও সমাদর করিলেন, সে কথাও প্রকাশ করিয়া আর বলিতে হইবে না। দীপমালায় কয়েকদিন নগরের লোক আপন আপন গৃহ আলোকিত করিল। মহোৎসবে কিছুদিন নগর পূর্ণ হইল। অবশেষে সম্রাট, রাজকবিকে ডাকিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণের কীর্ত্তি সুমধুর ভাষায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। সেই বিবরণ হইতে এই গল্পটি সংগৃহীত হইল।

পূজার ভূত

প্রথম অধ্যায় : ভয়ংকর বাড়ী

আমার নাম তারক। কলিকাতায় আমি বোর্ডিংয়ে থাকি। পূজার সময় আমি বাড়ী আসিয়াছি। আমার নিজের বাড়ী নয়, মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতেই আমরা মানুষ হইয়াছি। আমি ও আমার ভগিনী প্রভা। শামীমাসী আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে। আমার মাকেও সে মানুষ করিয়াছিল। শামীমাসী সদ্‌গোপের মেয়ে।

সন্ধ্যার সময় আমরা শামীমাসীকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমি, প্রভা, আর আমার মামাতো ভাই ও ভগিনীগণ। আমি বলিলাম,—"শামীমাসী, আজ তোমাকে একটি গল্প বলিতে হইবে। কেমন মেঘ করিয়াছে। দেখ! কেমন অন্ধকার হইয়াছে। কেমন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আর বাতাসের একবার জোর দেখ। গাছের পাতার ভিতর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া চলিতেছে। যেন রাগিয়া কি বলিতেছে। এই অন্ধকারে এমন দুর্য্যোগের সময় ভূত-প্রেত সব বাহির হয়। বাপ রে! গা যেন শিহরিয়া উঠে।"

শামীমাসী বলিল,—"এই পূজার সময়—এইরূপ দুর্য্যোগের সময় তোমার মাকে লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। এখনও সে কথা মনে করিলে ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছিল শামীমাসী?"

শামী উত্তর করিল,—"না, সে কথা এখন তোমাদিগকে আমি বলিব না। তোমরা ছেলেমানুষ! সে কথা শুনিলে তোমাদের ভয় করিবে।"

আমরা সকলেই বলিলাম,—"সে কথা শুনিলে আমাদের ভয় করিবে না।"

যাহা হউক, অনেক জেদা-জেদের পর শামীমাসী সে গল্প বলিতে সম্মত হইল। শামীমাসী বলিল,—"তারক ও প্রভার মায়ের নাম সীতা ছিল। সীতার মা, অর্থাৎ তোমাদের মাতামহীর নাম তারামণি ছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলিয়া যান,—'শামী! আমার কাছে তুই সত্য কর যে, সীতাকে তুই কখন ছাড়িয়া যাবি না। সীতা পাঁচ বৎসরের শিশু, পৃথিবীতে তাহার আর কেহ নাই।"

সীতাকে আমি দিদিমণি বলিয়া ডাকিতাম। আমি বলিলাম,—"মাঠাক্‌রুণ! দাদাবাবু (অর্থাৎ তোমাদের মার ভাই) ও দিদিমণি কোথায় কাহার কাছে থাকিবে, তাহা আমি জানি না। দিদিমণি যাহদের কাছে থাকিবে, তাহারা যদি আমাকে ছাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তাহারা যদি আমাকে রাখে, তাহা হইলে তোমার গায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, দিদিমণিকে আমি কখন ছাড়িব না।"

তোমাদের মাতামহীর মৃত্যু হইল, তোমাদের মামা, যাহার এই বাড়ী, তিনি তখন বালক। লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত এক জন আত্মীয় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। সীতা তাহার মামার বাড়ীতে গেল। সীতার মামা আমাকে ছাড়াইলেন না। আমি দিদিমণিকে মানুষ করিতে লাগিলাম।

দিদিমণির মামারা এক সময়ে খুব বড়মানুষ ছিলেন। শুনিলাম যে, তাহার মাতামহ জগমোহন রায়চৌধুরী এক জন দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। দিদিমণিকে

লইয়া আমি যখন তাঁহার বাড়ীতে যাইলাম, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। দিদিমণির মামাও দেশে থাকিতেন না, পশ্চিমে কোথায় কর্ম করিতেন। দিদিমণিকে বাড়ীতে রাখিয়া তিনি সে স্থানে চলিয়া গেলেন। সে বাড়ী কি ভয়ঙ্কর! তিন মহল বাড়ী, বাহির বাড়ীতে, মাঝের বাড়ীতে, ভিতর বাড়ীতে, একতলায় দোতলায় কত যে ঘর, তাহা গণিতে পারা যায় না। কিন্তু সব ভোঁ ভোঁ, দেখিলেই যেন ভূতের বাড়ী বলিয়া মনে হয়; বাহিরের বাড়ীতে কি মাঝের বাড়ীতে জনপ্রাণী বাস করে না। এত বড় বাড়ীতে আমরা কেবল ছয় জন রহিলাম; (১) তোমার মায়ের পিসী অলক ঠাক্‌রুণ, তাঁহার বয়স প্রায় আশী হইয়াছিল, আর তিনি সম্পূর্ণ কালা ছিলেন। (২) আর একজন ব্রাহ্মণী, তাঁহার নাম সহচরী, তাঁহারও বয়স বড় কম হয় নাই। তিনি রন্ধন করিতেন। (৩) এক জন চাকর, তাহার নাম পিতেম। (৪) পিতেমের স্ত্রী, তাহার নাম বিলাসী। (৫) তাহার পর আমি ও (৬) তোমাদের মা, আমার দিদিমণি, সীতা। বাড়ীর ভিতর দোতলায় তিনটি ঘরে আমরা ছয় জনে বাস করিতে লাগিলাম। প্রথম অলক ঠাক্‌রুণ ও সহচরীর ঘর; তাহার পার্শ্বে আমার ও দিদিমণির ঘর। তাহার পার্শ্বে পিতেম ও বিলাসীর ঘর। পশ্চিম দিকে এই তিনটি ঘর ছিল। উত্তর ও পূর্বদিকে অনেক ঘর পড়িয়াছিল। বিলাসীর ঘরের পার্শ্বে আর একটি ঘর লইয়া আমি দিদিমণির খেলাঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। বাটীর চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আঁব, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি নানা গাছের বাগান ছিল। বাগানের ভিতর চারি পাঁচটি পুকুর ছিল। উত্তর দিক ভিন্ন বাটীর আর চারিদিকে গ্রাম ছিল। কিন্তু সে মিথ্যা গ্রাম, ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবে অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে; অনেক লোক ঘরদ্বার ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। বাটীর উত্তর দিকে মাঠ, যতদূর দেখিতে পাই, ততদূর মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

শ্মশানের ন্যায় সেই বাড়ীতে গিয়া আমি মনে করিলাম,—"ওমা! এ বাড়ীতে আমি কি করিয়া থাকিব, ভয়েই মরিয়া যাইব।"

"যাহা হউক, যেখানে আমার দিদিমণি, সেখানে সব ভাল,—সেইখানেই আলো,—সেইখানেই সুখ। দিদিমণির দৌড়াদৌড়ি, দিদিমণির খেলা, দিদিমণির কথা, দিদিমণির হাসিতে সেই শ্মশানভূমি,—যেন স্বর্গতুল্য হইল। এমন যে অলক-ঠাক্‌রুণ, যাহার গোমড়া মুখ দেখিলে ভয় হয়, দিদিমণিকে দেখিলে তাঁহারও মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হইত, তাঁহারও মুখে যেন একটু হাসি দেখা দিত। দিদিমণির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তেমন ফুটফুটে, দুধে আলতার রং আমি আর কোন মেয়ের দেখি নাই। কেমন পুরন্ত গাল দুইটি, কেমন ছোট্টো হাঁ টুকু। কেমন টুকটুকে ঠোঁট, কেমন পটল-চেরা ঢুলু ঢুলু উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন কাল কাল চক্ষুর পাতা, কেমন সরু সরু চকচকে রেশমের মত নরম চুল! হা কপাল! সে দিদিমণিকে ছাড়িয়া এখনও আমি প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছি। তারপর দিদিমণি যখন কথা কহিত, তখন প্রাণ যেন শীতল হইত, প্রাণের ভিতর দিদি আমার যেন সুধা ঢালিয়া দিত।

দিদিমণিকে লইয়া আমি সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। একবার এই সময় ঘোরতর দুর্যোগ করিয়াছিল। বাহিরে বাতাস হুহু করিয়া বহিতেছিল। দিদিমণিকে লইয়া আমি শুইয়া আছি। সহসা বাহির-বাড়ীতে বেহালার শব্দ হইল। রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম যে, এত রাত্রিতে আমাদের বাহির-বাড়ীতে বেহালা বাজায় কে? বাহির-বাড়ীতে তো কেহ বাস করে না।

পরদিন আমি বাহির-বাড়ীতে গিয়া চারি দিক দেখিলাম। জনপ্রাণীকেও সে

স্থানে দেখিতে পাইলাম না। পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ীর যেরূপ অবস্থা হয়, বাহির-বাড়ীর সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

সে দিন বিলাসীকে একবার একেলা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বিলাসী! কাল রাত্রিতে বাহির-বাটীতে বেহালা কে বাজাইতেছিল?"

আমার কথা শুনিয়া বিলাসীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে উত্তর করিল,—"বেহালা! বেহালা আবার কে বাজাইবে? ও বাতাসের শব্দ।"

বিলাসীর কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে আমার নিকট কোন বিষয় গোপন করিতেছে।

বিলাসী পুনরায় বলিল,—"যাহা হউক, দিদিমণিকে তুমি সদর-বাড়ীতে যাইতে দিও না। সাপ খোপ কি আছে না আছে, কাজ কি ওদিকে গিয়া।"

আরও কিছুদিন গত হইয়া গেল। একবার নয়, আরও অনেকবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যখনই রাত্রিকালে বাদলা ও দুর্য্যোগ হয়, তখনই বাহির-বাড়ীতে কে যেন প্রাণপণে বেহালা বাজায়। কেবল বেহালা নহে, সে বৎসর পূজার সময় মহা-অষ্টমীর রাত্রিতে বাহির-বাড়ীতে আমি শাঁকঘণ্টার শব্দও শুনিয়াছিলাম, ধূপ-ধুনার গন্ধও পাইয়াছিলাম। বলিদানের সময় যেমন এক জন ভক্ত বিকট স্বরে মা মা বলিয়া চীৎকার করে, সে শব্দ শুনিয়াছিলাম। এ সমুদয় ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত বৃদ্ধা সহচরীকে, পিতেমকে, বিলাসীকে আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে বলে নাই। "ও কিছু নয়," এই কথা বলিয়া সকলে প্রকৃত তত্ত্ব আমার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

এইরূপে সে স্থানে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। কত শতবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। মহা-ষ্টমীর দিন দুই প্রহরের সময় দিদিমণি, পিতেম ও বিলাসীর সহিত গ্রামের ভিতর পূজা দেখিতে গিয়াছিল। আমি বিদেশী লোক, আমাকে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, সেজন্য আমি তাহাদের সঙ্গে যাই নাই। পূজা দেখিয়া বেলা পাঁচটার সময় দিদিমণি ফিরিয়া আসিল। বিলাসী আমাকে বলিল,—"যদু ভড়ের বাড়ী পূজার এবার খুব ধুম। আহা! কি চমৎকার প্রতিমা করিয়াছে। আর শামীদিদি, ভড়গিন্নী তোমাকে অনেক করিয়া যাইতে বলিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, বিলাসী! তবে আমি একবার মাকে দেখিয়া আসি। তুই ভাই দেখিস, যেন দিদিমণি কোথাও না যায়।"

এই কথা বলিয়া আমি ভড়েদের বাড়ী ঠাকুর দেখিতে যাইলাম। ভড়গিন্নী আমাকে অনেক আদর করিলেন। অনেকগুলি খই মুড়কি, নারিকেল-সন্দেশ, রসকরা—আরও কত কি আমার কাপড়ে বাঁধিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আয় না ভাই

বাড়ী আসিয়া তাড়াতাড়ি আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। দিদিমণিকে সে স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

বিলাসী বলিল,—"বোধ হয় অলক ঠাকুরুণের ঘরে আছে।" রুদ্ধশ্বাসে সে ঘরে আমি দৌড়িয়া যাইলাম। অলক ঠাকুরুণ ও সহচরী দুইজনেই তখন সে

ঘরে ছিল। দিদিমণিকে দেখিতে না পাইয়া সহচরীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সহচরী উত্তর করিলেন,—"কৈ! সীতা ত এ ঘরে আসে নাই।"

এই কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উড়িয়া গেল। পুনরায় আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বিলাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম।

বিলাসী কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল,—"এইমাত্র আমার ঘরের বারান্ডায় সে খেলা করিতেছিল। ঘরের ভিতর আমি কাজ করিতেছিলাম। বোধ হয়, অন্য কোন ঘরে সে খেলা করিতেছে।"

এমন সময় পিতেম আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার কান্না ও বিলাসীকে ভর্ৎসনার শব্দ শুনিয়া সহচরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রদীপ হাতে লইয়া সকলে মিলিয়া আমরা বাড়ী আতিপাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম। ভিতর-বাড়ী খুঁজিয়া মাঝের বাড়ী, তাহার পর সদরবাড়ীর সকল ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম; কিন্তু কোন স্থানে দিদিমণিকে দেখিতে পাইলাম না। মাথা খুঁড়িয়া বুক চাপড়াইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, হয় গহনার জন্য দিদিমণিকে কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা পুষ্করিণীতে পড়িয়া সে ডুবিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ী ওলট-পালট করিয়া অবশেষে আমরা বাগান ও পুকুরের ধারগুলি মনোযোগের সহিত দেখিলাম। কিন্তু কোন স্থানে দিদিমণির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। শেষে পিতেম আমাকে বলিল,—"তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার মন কেমন করিয়াছিল, তোমাকে খুঁজিবার নিমিত্ত নিশ্চয় সে পূজা-বাড়ীর দিকে গিয়াছে। আমি এখনই তাহাকে আনিতেছি।" এই কথা বলিয়া পিতেম গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু তা বলিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের বাড়ী ও বাগানের উত্তর দিকে দূর পর্য্যন্ত মাঠ ছিল। দিদিমণিকে খুঁজিবার নিমিত্ত বিলাসী ও আমি সেই মাঠের দিকে যাইলাম। মেঘ করিয়াছিল, খুব অন্ধকার হইয়াছিল। তাহার উপর এখন আবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখে আমরা এক প্রকার সাদা কি দেখিতে পাইলাম। বিলাসীর বড় ভয় হইল। সে বলিল,—"দিদি, ঐ দেখ একটি শাকচুণী আসিতেছে। এখনি আমাদের খাইয়া ফেলিবে। আর গিয়া কাজ নাই। এস, বাড়ী ফিরিয়া যাই। এতক্ষণে দিদিমণি বাড়ী আসিয়া থাকিবে।"

কোন উত্তর না দিয়া বিলাসীর আমি হাত ধরিলাম, আর সেই সাদা জিনিসের দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। সেও অন্য দিক হইতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বিলাসী তাহাকে চিনিতে পারিল। সে আমাদের প্রতিবাসী এক জন কৃষক। কাপড় ঢাকা তাহার বুকের উপর কি ছিল। আমরা কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সে বলিল,—"তোমাদের মেয়েটি মাঠের মাঝখানে গাছতলায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কি করিয়া সে মাঠের মাঝখানে আসিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি দেখিতে পাইয়া এখন তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইতেছি।"

তাড়াতাড়ি দিদিমণিকে আমি তাহার কোল হইতে আপনার কোলে লইলাম। কিন্তু দিদিমণির সর্ব শরীরই ঠাণ্ডা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি ভাবিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তহার নাকে ও বুকে হাত দিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, নাক দিয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। আর বুক অল্প অল্প ধুক্-ধুক্ করিতেছে। তাহা দেখিয়া প্রাণে আমার কতকটা আশা হইল। তাড়াতাড়ি মাঠ পার হইয়া আমরা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত

হইলাম। অনেক তাপসেক করিতে করিতে দিদিমণির চেতনা হইল। সেই চন্দ্র-মুখে মধুর হাসি দেখা দিল, সুধামাখা দুই একটি কথা দিদিমণির মুখ হইতে বাহির হইল। অল্প গরম দুধ আনিয়া সহচরী তাহাকে খাইতে দিলেন। তাহার সেই পদ্ম চক্ষু দুইটি ঘুমে বুজিয়া গেল। সে রাত্রিতে দিদিমণিকে আমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

দূরে মাঠের মাঝখানে একেলা সে কি করিয়া গিয়াছিল, পরদিন সেই কথা দিদিমণিকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। দিদিমণি বলিলেন,—"বারেণ্ডায় আমি খেলা করিতেছিলাম। তাহার পর যে ঘরে আমার খেলা-ঘর আছে, আমি তাহার ভিতর যাইলাম। সেই ঘরের জানালার ধারে যেই দাঁড়াইয়াছি, আর দেখি না ঠিক তাহার নীচেতে বাগানে একটি মেয়ে রহিয়াছে। মেয়েটি আমার মত বড়, কিন্তু খুব সুন্দর। উপর দিকে আমার পানে চাহিয়া সে বলিল,—"সীতা! নেমে আয় না ভাই, আমরা দুই জনে খেলা করি।" আমি বলিলাম,—"না ভাই! এখন আমি নীচে নামিয়া যাইতে পারিব না। সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন নীচে নামিবার সময় নয়। বিলাসী আমাকে বকিবে, তাহার পর শামী আসিয়া আমাকে বকিবে। কাল সকালবেলা তুমি আসিও, দুই জনে তখন অনেকক্ষণ খেলা করিব।" মেয়েটি বলিল,—"এখনও তেমন সন্ধ্যা হয় নাই, এখনও অনেক আলো রহিয়াছে। এই দেখ আমার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তবুও দেখ আমি খেলা করিতেছি। আয় না ভাই।"

তবুও আমি নামিলাম না। নীচে নামিতে মেয়েটি আমাকে বার বার বলিতে লাগিল। শেষে সে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল, বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নীচে নামিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আমি তাহার কাছে যাইলাম। কিছুক্ষণ বাগানের ভিতর আমরা দুই জনে খেলা করিলাম। এক স্থানে অনেকগুলি রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়াছিল, তাহা আমরা তুলিলাম। সাদা টগর ফুল ফুটিয়া আর একটি গাছে আলো করিয়াছিল। নীচে হইতে যত পারিলাম, সেই টগর ফুলও আমরা তুলিলাম। কেমন করিয়া জানি না, তাহার পর বাগান পার হইয়া আমরা মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেমন করিয়া জানি না, সেই মেয়েটির সঙ্গে অনেক পথ চলিয়া ক্রমে মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে একটি গাছ ছিল। সেই গাছতলায় একটি মেয়ে-মানুষ বসিয়া কাঁদিতেছিল। আমার মাকে স্বপ্নের ন্যায় আমার মনে পড়ে। সে মেয়ে-মানুষটি ঠিক আমার মায়ের মত। সেই রকম রং, সেই রকম মুখ, সেই রকম চুল, সেই রকম কথা। আদর করিয়া তিনি আমাকে কোলে লইলেন, আমার মুখে তিনি কত চুমা খাইলেন। কোলে বসাইয়া আমার মাথায় তিনি হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর কি হইল, আর আমার মনে নাই।"

তৃতীয় অধ্যায় : বালিকা ভূত

দিদিমণির এই কথা শুনিয়া সহচরী পিতেমকে চক্ষু টিপিলেন। তাহার পর তিনি বিলাসীর গা টিপিলেন। ইহার মানে আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে মেয়েটি কে? সে তো বড় দুষ্ট মেয়ে দেখিতেছি। তাহাকে আর বাগানে আসিতে দেওয়া যাইবে না।"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া সহচরী বলিলেন,—"এ বিষয় অলক ঠাকুরদাদাকে জানাইতে হইবে। তিনি যেরূপ বলেন, সেইরূপ করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া সহচরী সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে, পিতেমকে ও বিলাসীকে অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে ডাকিতে পাঠাইলেন। দিদিমণিকে কোলে লইয়া আমি পিতেম ও বিলাসীর সঙ্গে সেই ঘরে যাইলাম। অলক ঠাক্‌রুণ থুড়ে-থুড়ে বুড়ী হইয়াছিলেন। তিনি অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হইয়া সহচরী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অলক ঠাকুরুণ তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, সে মেয়েটি মানুষ নহে। তাহার মা, যাঁহাকে সীতা গাছতলায় দেখিয়াছিল, তিনি অলক ঠাক্‌রুণের ভাইঝি, সীতার মাসী। অনেক দিন হইল তিনি ও তাঁহার কন্যা অপঘাত-মৃত্যুতে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গতি হয় নাই, এখন তাঁহারা এরূপ হইয়া আছেন। তাঁহারা সর্বদা, বিশেষতঃ ঝড় বাতাস বাদলার দিনে, আর এই পূজার সময়, বাড়ীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ান। পিতেম, বিলাসী আর তুমি শামী, তোমাদের সকলকে অলক ঠাক্‌রুণ বলিতেছেন যে, সীতাকে তোমরা খুব সাবধানে রাখিবে, নিমিষের নিমিত্ত তোমরা তাহাকে চক্ষের আড় করিবে না। সে মেয়েটা এবার যদি সীতাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আর তোমরা সীতাকে পাইবে না।"

এই কথা শুনিয়া আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। কি করিয়া মেয়েকে ভূতের হাত হইতে বাঁচাইব, সেই ভাবনায় আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। তোমার মামার তখনও কর্ম্ম-কাজ হয় নাই, এক দিন গিয়া দাঁড়াই, এক বেলা এক মুঠা কেহ সিদ্ধ ভাত দেয়, এমন স্থান ছিল না। কাদায় গলা ফেলিয়া দিদিমণিকে লইয়া কাজেই আমাকে সেই ভয়ানক বাড়ীতে থাকিতে হইল। কিন্তু সেই দিন হইতে দিদিমণিকে আমরা নিমিষের জন্যও চক্ষের আড় করিতাম না। হয় আমি, না হয় বিলাসী, না হয় পিতেম, কেহ না কেহ সর্বদা তাহার কাছে থাকিত। কিন্তু মাঝে মাঝে জানালায় দ্বারে দাঁড়াইয়া দিদিমণি আমাদিগকে বলিত,—"ঐ সেই মেয়েটি আসিয়াছে, ঐ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শামী, তুই আমাকে সুন্দর বলিস, কিন্তু ওর পানে একবার চাহিয়া দেখ। আহা! কি চমৎকার রূপ। কেবল ওর পানে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। ঐ দেখ, আবার আমাকে ডাকিতেছে। আমি যাইতেছি না বলিয়া আহা! মেয়েটি ঐ দেখ, কতই না কাঁদিতেছে। তাহার কাপড় সে আমাকে দেখাইতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, টস্ টস্ করিয়া তাহার কাপড় হইতে জল পড়িতেছে। এ আবার কি? হাত দিয়া সে আপনার মাথা আমাকে দেখাইতেছে। আহা! মেয়েটির মাথায় কে মারিয়াছে, মাথা হইতে গাল বহিয়া রক্ত পড়িতেছে। শামী! একবার আমাকে ছাড়িয়া দে। আমি উহার কাছে যাই, উহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনি। তুই উহার মাথায় ঔষধ দিয়া দিবি। আমার ঐ কাপড়খানি আমি উহাকে পরিতে দিব। যাই ভাই, যাই!"

এইরূপ বলিলে তাড়াতাড়ি আমি তোমার মাকে গিয়া কোলে লইতাম। উপর হইতে বাগানের দিকে আমি চাহিয়া দেখিতাম, কিন্তু আমি কিছু দেখিতে পাইতাম না। কি করিব! ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া, মেয়েকে কোলে লইয়া, ভয়ে জড়সড় হইয়া আমি বসিয়া থাকিতাম।

এইরূপে অতি কষ্টে আমরা সেই বাড়ীতে দিনপাত করিতে লাগিলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। এই সময় দিদিমণি সেই মেয়েটাকে ঘন ঘন দেখিতে লাগিল। বাগানের দিকে জানালা এখন আমি সর্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতাম। তথাপি দিদিমণি বলিত,—"শামী! জানালা খুলিয়া দে। মেয়েটি নীচে আসিয়াছে, সে আমাকে ডাকিতেছে। শামী! তোর পায়ে পড়ি, একবার জানালা খুলিয়া দে, একবার তাহাকে আমি দেখি।"

মহাষ্টমীর দিন মেয়েকে লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইলাম। সে দিন ভয়ানক দুর্য্যোগ হইয়াছিল। সীতাকে কোলে লইয়া আমি ঘরে বসিয়া ছিলাম। এখন আর বাহিরে নয়, সে দিন দিদিমণি সেই মেয়েটিকে বাড়ীর ভিতরেই দেখিতে লাগিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়াছিলাম। তথাপি দিদিমণি বলিতে লাগিল,—"ও শামী! মেয়েটি আজ বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে, ঘরের বাহিরে আমাদের ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ছাড়িয়া দে শামী! আমি একবার তাহার কাছে যাই। একবার তাহাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব।"

এই বলিয়া দিদিমণি হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। কি যে করি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মেয়ে লইয়া আমি অলক ঠাকুরুণের ঘরে যাইলাম। সে স্থানে সহচরী উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম,—"আজ বাছা, আমাদের খাওয়া দাওয়াতে কাজ নাই। সকলে মিলিয়া এস, আজ আমরা মেয়েকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকি। তা না করিলে, দিদিমণিকে আজ আমরা বাঁচাতে পারিব না, সেই দুষ্ট মেয়েটা আসিয়া দিদিমণিকে নিশ্চয় আজ লইয়া যাইবে।"

সহচরী অলক ঠাকুরুণকে সকল কথা বলিলেন। অলক ঠাকুরুণ আমার কথায় সম্মত হইলেন। পিতেম ও বিলাসীকে ডাকিয়া দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া দিদিমণিকে ঘিরিয়া, সকলে আমরা অলক ঠাকুরুণের ঘরে বসিয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্বে এই বিড়ম্বনা নিবারণের জন্য অনেক প্রতিকার করা হইয়াছিল। গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছিল, রোজা আনিয়া ঝাড়ান ও ভূত নামানো হইয়াছিল, দিদিমণির অষ্টাঙ্গে কবচ, মাদুলি ও নেকড়ার পুঁটুলি বাঁধা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায় : বিষম মহাষ্টমী

সকলে ঘিরিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সেই মহাষ্টমীর সমস্ত দিন দিদিমণি বড়ই ছট্‌ফট্ করিয়াছিল। "ঐ সেই মেয়েটি আসিতেছে, সে আমাকে ডাকিতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে; দাও আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তাহার কাছে যাই," এই বলিয়া দিদিমণি বার বার কাঁদিতেছিল, আর আমার কোল হইতে উঠিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া বার বার বাহিরে পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। অতি কষ্টে আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছিলাম।

সন্ধ্যার পর দিদিমণি ঘুমাইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার বুঝি আমাদের বিপদ কাটিয়া গেল, আর বুঝি কোন উপদ্রব হইবে না। কিন্তু আমরা কেহ নিদ্রা যাইলাম না, ঘরে দুইটা আলো জ্বালাইয়া সকলে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এমন সময় সহসা বাহির-বাটীতে সেই বেহালা বাজিয়া উঠিল। কেবল বেহালা নহে, তাহার সঙ্গে ঢাক-ঢোল, শাঁক-ঘণ্টা কাঁসর-ঘড়িও বাজিয়া উঠিল। সেই সকল বাজনা ছাপাইয়া বলিদানের সেই ভয়ানক মা মা চীৎকারে আমাদের যেন কানে তালা লাগিতে লাগিল, আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। হতভোম্বা হইয়া আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় ধড়মড় করিয়া দিদিমণি উঠিয়া বসিল। আমরা কিছু বলিতে না বলিতে চোঁ করিয়া সে দ্বারের নিকট গিয়া খিল খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর আমরা তাহাকে ধরিতে না ধরিতে রুদ্ধশ্বাসে বাহির-বাড়ীর পূজার দালানের দিকে সে দৌড়িল। "ও মা, কি হইল, সর্বনাশ

হইল।" এই কথা বলিতে বলিতে অলক ঠাকুরুণ ছাড়া আর সকলেই আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। দিদিমণি আমাদের আগে আগে গিয়া বাহির-বাড়ীর পূজার দালানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানের অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া আমরা জ্ঞানহারা হইলাম। এখন আর সে ভাঙ্গা জনশূন্য বাড়ী নাই। খুব ধুম-ধামের দুর্গোৎসব হইলে যেরূপ হয়, সে স্থানে এখন সেইরূপ হইয়াছে। দালানের মাঝখানে প্রতিমা রহিয়াছে—বৃহৎ প্রতিমা, নানা সাজে সুসজ্জিত। প্রতিমার চারিদিকে নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার আয়োজন রহিয়াছে। সম্মুখে পুরোহিতগণ বসিয়া আছেন। এক পার্শ্বে এক জন চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ধূপ-ধূনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে। দালানে, উঠানে, সকল স্থানে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ফল কথা, এমন ধুমধামের পূজা আমি কখন দেখি নাই।

দিদিমণি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দালান পার হইয়া দালানের পূর্বদিকে চলিয়া গেল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দালানের পূর্বদিকে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর এক জন বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। তাহার বামহাতে বেহালা, আর দক্ষিণ হাতে যা দিয়া বাজায় তাই ছিল। একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক মাটীতে বসিয়া বৃদ্ধের পা দুইখানি ধরিয়া কি বলিতেছেন। সেই স্ত্রীলোকের পার্শ্বে সাত আট বৎসরের এক বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল।

দিদিমণি বরাবর গিয়া সেই ঘরের দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। খপ করিয়া আমি গিয়া দিদিমণির হাত ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমরা সকলেই সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যে স্ত্রীলোক বৃদ্ধের পা ধরিয়া ছিলেন, তিনি এখন কাঁদ-কাঁদ মৃদু মধুর-স্বরে বলিলেন,—"বাবা, অপরাধ করিয়াছি সত্য! কিন্তু আমি তোমার কন্যা। শত অপরাধ করিলে, কন্যাকে ক্ষমা করিতে হয়। এই মেয়েটিকে লইয়া আমি এখন কোথায় যাই।"

বৃদ্ধ অতি নিষ্ঠুর ভাষায় বলিলেন,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোর আমি মুখ দেখিব না। কালামুখ লইয়া এ বাড়ী হইতে এখনই দূর হইয়া যা।"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন,—"বাবা! আমি কোনরূপ দুষ্কর্ম করি নাই, স্বামীর ঘরে গিয়াছি, এই মাত্র।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"তুই দূর হ, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।" স্ত্রীলোকটি অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, আমি দূর হইতেছি, কিন্তু আমার কন্যাটি তো কোন অপরাধ করে নাই! ইহাকে আমি তোমার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। পাতের হাতের দুইটি ভাত দিয়া ইহাকে প্রতিপালন করিও।"

সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন,—"তোর ঝাড় আমার এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। দূর দূর, এখনি দূর হ।"

স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা সত্বর দূর হইতেছে না, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ রাগে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া তিনি সেই বেহালার বাড়ী কন্যার মাথায় মারিয়া বসিলেন। কন্যার মাথা হইতে দর দর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। গাল বাহিয়া সেই রক্ত মাটীতে পড়িল।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া সেই স্ত্রীলোক তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার যেন আগুনের ফিন্‌কি বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"বাবা! তুমি এ কাজ করিলে!!! যাহা হউক, আমি তোমাকে কিছু বলিব না। কিন্তু আজ হইতে তোমার লক্ষ্মী ছাড়িল।"

এই কথা বলিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি সেই ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাহার পর দালানের ভিতর দিয়া উঠানে গিয়া নামিলেন। তাহার পর উঠান পার হইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

যেই তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন, আর বৃদ্ধ ভয়ানক চীৎকার করিয়া সেই তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। সেই সময় ঝাড় লণ্ঠন সব নিবিয়া গেল। প্রতিমা, পুরোহিত, লোক-জন সব অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ঢাকঢোলের কলরব সব থামিয়া গেল।

অন্ধকারে আমি পিতেমের কথা শুনিতে পাইলাম। পিতেম বলিল,—"শামী। সীতা তোমার কাছে কাছে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ, আমি তাহাকে ধরিয়া আছি।"

পিতেম পুনরায় বলিল,—"তবে চল, ঘরে চল।"

পঞ্চম অধ্যায় : পূর্ব-বিবরণ

সকলে পুনরায় অলক ঠাকুরুণের ঘরে যাইলাম। সীতা তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

কিন্তু সে রাত্রিতে আমাদের নিদ্রা হইল না। আমরা সকলে বসিয়া রহিলাম। পিতেম তখন আমাকে সকল কথা বলিল। পিতেম বলিল,—

"ঐ যে বৃদ্ধ দেখিলে, উনি বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। উঁহার নাম জগমোহন রায়চৌধুরী ছিল। উনি বড় দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। একবার যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন, তা সে ভালই হউক আর মন্দই হউক। পৃথিবীতে তাঁহার কেবল একটি সখ ছিল। বেহালা বাজাইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। সময় নাই, অসময় নাই, সর্বদাই তিনি বেহালা বাজাইতেন। বিশেষতঃ ঝড় বাতাস বাদলার রাত্রিতে তাঁহার সখটি কিছু প্রবল হইত। অলক ঠাকুরুণ তাঁহার ভগিনী। জগমোহন রায়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্র সীতার মামা, যিনি এখন পশ্চিমে কাজ করেন। বড় কন্যার নাম ছিল রামমণি, যাঁহার ভূতকে সীতা মাঠের মাঝখানে গাছতলায় দেখিয়াছিল। ছোট মেয়ের নাম ছিল তারামণি, তিনি সীতার মা। রায় চৌধুরী বড়মানুষ লোক, কোন পুরুষে কন্যা শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেন না। কিন্তু রামমণির এক তেজস্বী পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে,—"ঘর-জামাই হইয়া আমি কিছুতেই থাকিব না।" আপনার স্ত্রীকে তিনি নিজের বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ত্তা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শ্বশুর-জামাতায় ঘোর বাদ-বিসম্বাদ বাধিয়া গেল। অবশেষে কর্ত্তা এক দিন রামমণিকে ডাকিয়া জামাতার সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ইহাকে চাও—না আমাকে চাও।" রামমণি উত্তর করিলেন,—"বাবা! তুমি পিতা বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পতিই সর্বস্ব।" এই উত্তর শুনিয়া কর্ত্তা ঘোরতর রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"বটে! তবে এখনি আমার বাড়ী হইতে দূর হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আমি তোমার মুখ দেখিব না।" রামমণি শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। নয় দশ বৎসর স্বামীর ঘর করিলেন। তাঁহার একটি কন্যা হইল। সে কন্যাটির ভূত সীতাকে মাঠে লইয়া গিয়াছিল। নয় দশ বৎসর পরে রামমণির স্বামীর মৃত্যু হইল। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই। রামমণি ঘোর বিপদে পড়িলেন।

পিতাকে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। পিতা কোন উত্তর দিলেন না।

অবশেষে ভাবিলেন,—"পূজার সময় লোকের মন নরম হয়। এই পূজার সময় বাবার পায়ে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় ক্ষমা করিবেন।" পূজার সময় কন্যাকে লইয়া রামমণি পিতার বাটীতে আসিলেন। তাহার পর তোমরা এইমাত্র যাহা দেখিলে, অষ্টমীর দিন সত্য সত্যই সেই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। কন্যার হাত ধরিয়া রামমণি চলিয়া গেলেন। পক্ষাঘাত রোগ হইয়া কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে তুমুল ঝড় উঠিল, সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পর দিন সকলে দেখিল যে, রামমণি ও তাঁহার কন্যা দুইজনেই মাঠের মাঝখানে গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া আছেন। কর্ত্তা আরও কয়েক মাস জীবিত রহিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতেই আর তিনি কথা কহিতে পারেন নাই, কি উঠিয়া বসিতে পারেন নাই। সেই তাঁহার লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল। জমিদারী, টাকা কড়ি কিরূপে কোথায় যে উড়িয়া গেল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ঘর-জামাই রাখার অহংকারও সেই সঙ্গে দূর হইল। সে জন্য সীতার মাকে শ্বাশুড়ী পাঠাইতে আর কোন আপত্তি রহিল না। কর্ত্তা রামমণি ও তাঁহার কন্যা—তিন জনেই এখন ভূত হইয়া আছেন। কতবার গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই।"

পরদিন প্রাতঃকালে আমি ভাবিলাম যে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সেও স্বীকার ; তবু সীতাকে লইয়া সে বাড়ীতে আর আমি থাকিব না। সীতার ভাই, তোমার মামাকে আমি পত্র লিখিলাম। ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁহার একটি কর্ম্ম হইয়াছিল। তিনি আসিয়া আমাকে ও সীতাকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সীতার বিবাহ হইল। তাহার পর তুমি ও প্রভা হইলে। কিছুদিন পরে তোমার পিতার কাল হইল। অল্পদিন পরে দিদিমণিও তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। দিদিমণিকে হারাইয়া কি করিয়া আমি যে প্রাণ ধরিয়া আছি তাহাই আশ্চর্য্য। যাহাহউক, তোমাদের দুইজনকে পাইয়া আমি শোক অনেকটা নিবারণ করিতে পারিয়াছি। মা দুর্গা তোমাদিগকে আর যত ছেলে-পিলেকে বাঁচাইয়া রাখুন।

পিঠে-পার্বণে চীনে ভূত

প্রথম অধ্যায় : ইংগলা পিংগলা নাড়ী

রাধামাধব গুপ্ত তাঁহার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মাতুল ব্রহ্মদেশে কোন স্থানের ডাক্তার ছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। লোকের হাত পা কাটিয়া তিনি অনেক টাকা উপার্জন করিয়াছেন। সে টাকা তিনি খরচ করেন নাই, সঞ্চয় করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাকে এক জন ধনবান্ লোক বলিলেও বলিতে পারা যায়। বৃদ্ধ-বয়সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশে আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া প্রথম তিনি তীর্থদর্শন করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিয়াছেন। রাধামাধব সেই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

রাধামাধব নিজেও পাশ-করা ডাক্তার। কলিকাতায় নহে, অন্য কোন স্থানে তিনি ডাক্তারী করেন। প্রথম প্রথম সেই স্থানে তাঁহার কাজ ভালরূপ চলিয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাঁহার সেরূপ পসার নাই। এখন যাহা কিছু তিনি উপার্জন করেন, তাহাতে কষ্টে সৃষ্টে কেবল বাসা-খরচ চলে, কিছুই সঞ্চয় হয় না।

সে জন্য রাধামাধবের বড় ভাবনা হইয়াছে। তাঁহার চারিটি কন্যা। বড় কন্যাটি ত্রয়োদশ বৎসর পার হইয়াছে, আর রাখা যায় না। তাহার বিবাহ দিতে অন্ততঃ দুই হাজার টাকা খরচ হইবে। সে টাকা কোথা হইতে আসিবে?

বহুকাল পরে মাতুল দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য কাজ বটে। তাহা ব্যতীত রাধামাধব ভাবিলেন,—"মাতুল-মাতুলানীর পুত্র-কন্যা নাই, আমি তাঁহাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাঁহাকে আমি আমার বিপদের কথা জানাইব। এখন কিছু যদি তিনি আমাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

মাতুল-মাতুলানীকে তিনি প্রণাম করিলেন। রাধামাধবকে তাঁহারা অনেক আদর করিলেন। নানারূপ সুখাদ্যের আয়োজন করিয়া মাতুলানী তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। এইরূপে একদিন, দুইদিন, তিন দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু এখনও তিনি টাকার কথা তুলিতে পারিলেন না। সে কথা মুখে আনিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইল। অনেকবার সেই কথা ঠোঁটের আগায় আনিয়াও তিনি বলিতে পারিলেন না। লজ্জা ব্যতীত এ কথা না বলিবার আর একটি কারণ ছিল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুল-মাতুলানী দুই জনেরই শরীর সুস্থ নহে। দুই জনেরই শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। দুই জনেই সর্বদা অতি বিমর্ষভাবে থাকেন। মনে যেন সর্বদাই কিরূপ একটা ভয়—কিরূপ একটা দুশ্চিন্তা। রাধামাধব আরও দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুলের মস্তকটি মুণ্ডিত, তাঁহার মাথায় চুল নাই।

এক দিন তিনি মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বরমায় আপনি যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানের জলবায়ু কি ভাল ছিল না? আপনারা দুই জনেই অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন আপনাদের শরীরে কোন একটা রোগ আছে।"

মাতুল উত্তর করিলেন,—"না, আমাদের শরীরে কোন রোগ নাই।"

এইরূপ উত্তর দিয়া তিনি সে কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন। রাধামাধব সে সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেন ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। সে জন্য রাধামাধব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মামা-মামীর শরীরে রোগ না থাকুক, মনে কোনরূপ রোগ হইয়াছে। কোনরূপ একটা ভয় অথবা দুর্ভাবনায় তাঁহাদের শরীর এরূপ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।

পরদিন টাকাকড়ির কথা মামা নিজেই তুলিলেন। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন রাধামাধব! তুমি যে স্থানে ডাক্তারী কর, সে স্থানে দু'পয়সা হয় তো?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"প্রথম প্রথম বেশ দু'পয়সা হইত। তাহার পর কোথা হইতে সে স্থানে এক অবতার আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অবধি আমার আর বড় কিছু হয় না।"

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অবতার কিরূপ?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"গেরুয়া কাপড় পরা একটা লোক। সেও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। রোগীকে কখন ডাক্তারি, কখনও হোমিও-প্যাথি, কখন কবিরাজি, কখন হাকিমি, কখন স্বপনলব্ধ ভৌতিক ঔষধ প্রদান করে। নানা ভাবে পা রাখিয়া নানা ভঙ্গী করিয়া সে বসিতে জানে। রোগীর নিকট বসিয়া ইংগলা পিংগলা নাড়ী, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে গল্প করে। সে বলে যে,—'আমি ভূত নামাইতে পারি, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকিতে পারি।' যে পর্য্যন্ত এই অবতারটি সে স্থানে আসিয়াছে, সেই অবধি আমার পসার প্রতিপত্তি একেবারে গিয়াছে। বড় কন্যাটির বিবাহ না দিলে আর চলে না। কোথা যে টাকা পাইব, সে জন্য বড়ই দুর্ভাবনা হইয়াছে।"

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে লোকটি ভূত প্রেত সম্বন্ধে যে সমুদয় গল্প করে, তাহা কি মিথ্যা?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"সমুদয় মিথ্যা। ভূত আবার কোথায়? ভূত বলিয়া জগতে কোনরূপ বস্তু নাই।"

মাতুল বলিলেন,—"বটে! যদি দেখিতে পাও?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"এ বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করা সম্বন্ধে ইংরেজীতে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয় আমি পাঠ করিয়াছি। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মাকে আহ্বান করিতে হয়, বন্ধু-বান্ধবের সহিত তাহা করিয়া আমি অনেক দেখিয়াছি। যেখানে ভূত আছে বলিয়া শুনিয়াছি, একেলা নির্ভয়ে সে স্থানে রাত্রিযাপন করিয়াছি। ভূত দেখিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে একেলা শ্মশানে-মশানে অনেক ঘুরিয়াছি। এক দিন দুই দিন নয়, তিন বৎসর কাল এরূপ চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভূতের চিহ্নমাত্রও আমি দেখিতে পাই নাই। ভূতের গল্প সব অলীক। ভূত বলিয়া জগতে কিছুই নাই।"

মাতুল বলিলেন,—"যদি প্রত্যক্ষ তোমাকে দেখাইতে পারি?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"তাহা হইলে আপনার নিকট আমি চিরঋণী হইয়া থাকিব। পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। যদি ভূত দেখিতে পাই, তাহা হইলে পরকাল সম্বন্ধে আমার মনের সন্দেহ দূর হয়।"

মাতুল বলিলেন,—"না, তুমি ছেলে-মানুষ, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ। কাজ নাই, শেষে একটা বিপদ ঘটিবে।"

রাধামাধব মাতুলকে জোর করিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন যে,—"যদি যথার্থই আপনি আমাকে ভূত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে দেখাইতেই হইবে।

আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। আপনার কোন ভয় নাই। আমার মন রতিমাত্রও বিচলিত হইবে না।"

মামা-ভাগিনেয়তে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। মাতুল যখন দেখিলেন যে, রাধামাধব তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন তিনি বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস।"

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ হাতকাটা চিনেম্যান

রাধামাধবকে লইয়া মাতুল বড় একটা ঘরের দ্বারে গিয়া তালা খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাধামাধব দেখিলেন যে, দেয়ালের গায়ে দুই দিকে কাঠের আলমারী আছে। সেই আলমারীতে দুই স্তর কাঠের সেল্‌ফ আছে, আর তাহার উপর অনেকগুলি ছোট বড় শিশি রহিয়াছে। কোন শিশিতে মানুষের পা, কোনটিতে চক্ষু, কোনটিতে পাথুরী, কোনটিতে অস্থি, মনুষ্যদেহের নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে।

মাতুল বলিলেন,—"এ আমার বাই। আমি নিজহাতে যত কিছু কাটিয়াছি-কুটিয়াছি, তাহা আমি স্পিরিটে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল। আমার বাড়ীতে একবার আগুন লাগিয়া তাহার অধিকংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ঘরের পার্শ্বে একখানি কোচ ছিল। মাতুল বলিলেন,—"এই কোচের উপর তোমায় আমি বিছানা করিয়া দিতেছি। এই ঘরে একেলা শুইতে পারিবে? আমি একটি ল্যাম্প আনিয়া দিতেছি। ল্যাম্প জ্বলিতে থাকুক, অন্ধকারে থাকিয়া কাজ নাই।"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"স্বচ্ছন্দে আমি এই ঘরে একেলা শুইয়া থাকিব। অন্ধকার করিলেও আমার ভয় হইবে না।"

মাতুল বলিলেন,—"বেশ কথা! তুমি কিছু দেখিবে, কি না দেখিবে, সে কথা এখন তোমাকে বলিব না। এখন বলিলে পূর্ব হইতে তোমার মনে একটা সংস্কার জন্মিয়া যাইবে।

মাতুল নিজ হাতে কোচের উপর বিছানা করিয়া দিলেন। ঘরের পার্শ্বে ছোট একটি টেবেল ছিল। সেই টেবেলের উপর ল্যাম্প রাখিয়া তিনি বলিলেন, —"রাধামাধব! এখন আমি চলিলাম। পাশের ঘরেই আমি শয়ন করি। রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। আবশ্যক হইলে তুমি আমাকে ডাকিবে, আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইব।"

মাতুল প্রস্থান করিলে, রাধামাধব ঘরের দ্বার উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ঘরের অন্যান্য দ্বার-জানালা ভালরূপ বন্ধ আছে কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অবশেষে ল্যাম্পের আলোক কমাইয়া দিলেন। ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের সকল বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কোচের উপর রাধামাধব শয়ন করিলেন। কিন্তু এক ঘন্টা পরেই তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের ভিতর ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। সেই

দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, আলমারীর ধারে ধারে এক জন পুরুষমানুষ বেড়াইতেছে। নিজ হাতে রাধামাধব ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়াছিলেন। বাহির হইতে ঘরের ভিতর লোক আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

"এ মানুষ নহে—এ ভূত"—রাধামাধবের মনে নিশ্চয় এইরূপ বিশ্বাস হইল, ভয়ে প্রাণের ভিতর গুরুর গুরুর করিয়া উঠিল। সর্বশরীরে লোমাঞ্চ হইল। চীৎকার করিয়া ফেলেন আর কি।—এমন সময় মনকে দৃঢ় করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, —"পৃথিবীতে ভূত নাই, থাকিলেও তাহাকে আমি ভয় করি না। চিরকাল লোকের নিকট আমি এইরূপ মুখশোপট করিয়াছি। আজ যদি ভয়-বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সকলের নিকট আমি হাস্যাস্পদ হইব। অতএব প্রাণ থাকে অ র যায়, কিছুতেই আমি চীৎকার করিব না।"

রাধামাধব এইরূপ মনকে আশ্বাস দিয়া, ভূত কি করে, চুপ করিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন।

আলমারীর উপর যে সমুদয় শিশি সাজান ছিল, ভূত একে একে সেই সমুদয় শিশি অতি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। কোন শিশিটি বা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়াও দেখিতে লাগিল। ঘরের অপর পার্শ্ব হইতে শিশি দেখিতে দেখিতে ভূত রাধামাধবের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু নিকটবর্ত্তী হইলে রাধামাধব দেখিলেন যে, ভূতটির মাথা নেড়া। আরও একটু নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন যে, তাহার পশ্চাৎ দিকে লম্বা বেণী ঝুলিতেছে। বিনুনী দেখিয়া রাধামাধব ভাবিলেন যে,—"এঃ! এটা দেশী ভূত নহে, চীনে ভূত!" অর্থাৎ কি না কলিকাতায় যাহারা জুতা গড়ে ও সূত্রধরের কাজ করে, সেই চীন দেশের লোকের ভূত। আরও একটু নিকটে আসিলে তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া, রাধামাধবের মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, সে চীনে ভূত বটে। তাহার পোষাকও সেইরূপ ছিল। নিম্নদেহ নীলবর্ণের ঢিলা-ঢিলা ইজের দ্বারা ও ঊর্দ্ধদেশে সেই বর্ণের ঢিলা-ঢিলা ঘুন্টিওয়ালা জামার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

আলমারীর ধারে ধারে ঘরের দুই দিক্ ঘুরিয়া ভূত একে একে সমুদয় শিশিগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। যখন সমুদয় শিশি দেখা হইয়া গেল, তখন সে ঘোর দুঃখসূচক এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল; তাহার চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর কোচের নিকট আসিয়া রাধামাধবের সম্মুখে দাঁড়াইল ও অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে আপনার হাত দুইটি তুলিয়া যেন কি দেখাইল। হাত দুইটি নহে, দেড়টি হাত। রাধামাধব দেখিলেন যে, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি আছে। জামার আস্তিন কেবল কোণুই পর্য্যন্ত উঠিল। অবশিষ্ট ভাগ ঝুলিয়া পড়িল; কারণ, তাহার ভিতর হাত ছিল না। ভয়ে রাধামাধব অচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহার সর্বশরীর ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া ফেলেন আর কি!—এমন সময় ভূত অদৃশ্য হইয়া গেল।

মৃতদেহের ন্যায় রাধামাধব কিছুক্ষণের নিমিত্ত পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। প্রথমে তিনি ঘর হইতে পলায়ন করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা এখন পরিত্যাগ করিলেন। আরও কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত চুপ করিয়া তিনি শুইয়া রহিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পরলোকে ঠুঁটো চীন

প্রভাত হইলে রাধামাধব উঠিয়া, পুনরায় ঘরের দ্বার জানালাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, দ্বার-জানালা যে ভাবে তিনি বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই আছে। তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত বাহির হইতে যে কেহ আসিবে, সে উপায় ছিল না। ক্রমে মাতুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাতুল বলিলেন,—"রাত্রিতে তুমি যে কিছু দেখিয়াছ, তোমার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। তোমার মাতুলানীর ও আমার ইহাই রোগ ; ইহার জন্যই আমাদের শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে ও দিন দিন আমাদের আয়ুক্ষয় হইতেছে। ইহার জন্যই শীঘ্র আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইব। যাহা হউক, ইহার সবিশেষ বিবরণ আজ দিনের বেলা তোমাকে আমি প্রদান করিব।"

সেই দিন আহারের পর মামা-ভাগিনেয় এক স্থানে বসিয়া গল্পগাছা করিতে লাগিলেন। সেই সময় মাতুল বলিলেন,—"বর্মার যে স্থানে আমি কাজ করিতাম, সে স্থানের হাসপাতাল আমার অধীনে ছিল। নিম্নপদস্থ ডাক্তারগণ বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রচিকিৎসা করিতে বড় সুবিধা পান না, কিন্তু এই হাসপাতালে আমার সে সুবিধা ছিল। অঙ্গচ্ছেদনাদি অনেক বড় বড় অস্ত্রচিকিৎসা আমি করিয়াছি। কোন লোকের অঙ্গছেদন করিয়া, সেই কর্তিত অঙ্গটি স্পিরিটপূর্ণ শিশির ভিতর রাখা আমার বাই ছিল। যে ঘরে গত রাত্রিতে তুমি শয়ন করিয়াছিলে, সেই ঘরে সেইরূপ অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বর্মা চীনের নিকট, চীন দেশের অনেক লোক এ দেশে বাস করিয়াছে। এক দিন এক জন চীনেম্যান আমার হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে, তাহার দক্ষিণ হাতটির কোণুই পর্য্যন্ত পচিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে,—'হাতটি কাটিয়া না ফেলিলে কিছুতেই তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না।' প্রথম সে কথায় সে সম্মত হইল না। তাহার পর যখন দেখিল যে, হাত না কাটিলে তাহার প্রাণ কিছুতেই বাঁচিবে না, তখন সে অগত্যা সম্মত হইল। অজ্ঞান করিয়া কোণুই পর্য্যন্ত আমি তাহার হাত কাটিয়া ফেলিলাম। তাহার পর সেই হাত আমি যথারীতি সুরাপূর্ণ শিশিতে রাখিলাম। পুনরায় জ্ঞান হইবামাত্র চীনে রোগী আপনার কাটা হাত দেখিতে চাহিল। পাছে ভয় পায়, সে জন্য প্রথম আমি তাহাকে দেখাইতে চাহিলাম না। কিন্তু কাটা হাত দেখিবার জন্য সে এত কাতর হইল যে, তাহাকে না দেখাইয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। হাসপাতালের যে খাটের উপর সে শুইয়া ছিল, শিশিটি আপনার পার্শ্বে তাহার উপর রাখিয়া, বাম হাত দিয়া সে অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শিশিটি সে চার পাইয়ের নীচে রাখিয়া দিল। সেই দিন হইতে মুহূর্তের নিমিত্ত শিশিটি সে চক্ষুর আড় করিতে দিত না। আর দিনের মধ্যে অনেকবার তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া অতি স্নেহের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিত। কিছু দিন পরে সে আরোগ্য লাভ করিল। হাসপাতাল হইতে যাইবার পূর্বে আমি তামাসাচ্ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ডাক্তারকে বিদায় করিবে না ?'

চীনে উত্তর করিল,—"আমি দুঃখী লোক। আমি আপনাকে কি দিতে পারি ?"

আমি বলিলাম,—"তোমার হাতটি আমাকে প্রদান কর।"

তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল। সে বলিল,—'মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। হাতটি আমি আপনাকে দিতে পারিব না। আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন

দেহের সহিত এই হাতটিরও কবর দিতে হইবে। তা না করিলে পরলোকে আমাকে ঠুঁটো হইয়া বেড়াইতে হইবে। আমরা চীনের লোক, সেই জন্য হস্ত পদ অথবা মুণ্ডচ্ছেদনকে বড় ভয় করি। আমাদের বড় লোকেদের প্রাণদণ্ড হইলে, সেই জন্য তাঁহারা হারিকুরি করিয়া, অর্থাৎ স্বহস্তে পেট ফাঁড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। মুণ্ডচ্ছেদ করিতে তাঁহারা দেন না। আমি এই হাতটিকে নুণ দিয়া রাখিব। তাহা করিলে পচিয়া যাইবে না। আমার মৃত্যু হইলে আমার আত্মীয় স্বজন ইহাকেও দেহের সহিত গোর দিবেন।'

পুনরায় তামাসাচ্ছলে আমি বলিলাম,—'লবণ অপেক্ষা আরকে ইহা ভালরূপ থাকিবে। তাহার পর তোমার নিকট অপেক্ষা আমার নিকট হাতটি আরও ভাল অবস্থায় থাকিবে। কারণ, এরূপ বস্তু ভালরূপে রাখিবার নিমিত্ত আমার নিকট মশলা আছে। আর কিরূপে রাখিতে হয়, তাহাও আমি জানি। তোমার নিকট থাকিলে হাতটি নিশ্চয় পচিয়া যাইবে। পচা হাত লইয়া শেষে কি পরলোকে যাইবে?"

আমার কথাগুলি লোকটির মনে লাগিল। উৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল,—'আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয় স্বজনেরা আসিয়া হাতটি প্রার্থনা করিলে যদি ইহা ফিরিয়া দিতে আপনি প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতে পারি।'

আমার কুবুদ্ধি! আমি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। একবার নহে, লোকটি বার বার আমাকে তিন সত্য করাইল। তাহার পর শিশিটি আমার হাতে দিয়া সে প্রস্থান করিল। অন্যান্য শিশির সঙ্গে আমি সে শিশিটিও রাখিয়া দিলাম।

আমি যে বাড়িতে বাস করিতাম, তাহা কাষ্ঠনির্মিত ছিল। কিছুদিন পরে আমার বাড়ীতে আগুন লাগিল। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে, অনেকগুলি শিশিও আমার নষ্ট হইয়া গেল। তাহার মধ্যে চীনেম্যানের হাত-সম্বলিত শিশিটিও ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, চীনের কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম! তাহার হাতের কথা, অথবা আমার প্রতিজ্ঞার কথা,—একবারও আমার মনে উদয় হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়: ফিং ফোং ফা

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে দুইজন চীনেম্যান আসিয়া আমাকে বলিল,—'মোঙ্গ নামক যে চীনের হাত আপনি কাটিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে সেই হাতটি লইয়া কবরে দিতে সে বার বার অনুরোধ করিয়াছে। সেই হাতের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।'

আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল! হাতটি ফিরিয়া দিতে আমি বার বার তিন সত্য করিয়াছিলাম। সেই সত্য হইতে আজ আমি ভ্রষ্ট হইলাম। কি আর করিব? দৈবক্রমে হাতটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি সেই কথা তাহাদিগকে বলিলাম। বিরস বদনে তাহারা চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রিতে ঘরে শয়ন করিয়া, আমি নিদ্রা যাইতেছি। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘরে অল্প অল্প আলো জ্বলিতেছে। সহসা কে আমার চুল ধরিয়া শয্যা হইতে আমাকে তুলিয়া বসাইল! চকিত হইয়া আমি

চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে এক জন চীনে আমার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আরও দেখিলাম যে, সে আর কেহ নহে, সে সেই মোঙ্গ,—যাহার হাত আমি কাটিয়াছিলাম। ভয়ে বিহ্বল হইয়া আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কেবল গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল। খাটের এক পার্শ্বে তোমার মামী শয়ন করিয়া ছিলেন। সেই শব্দে তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনিও চীনাকে দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ আমার খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চীনে কুপিত কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া ঘোরতর ভর্ৎসনাসূচক ভঙ্গী করিয়া, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি অর্থাৎ কেবল বাহুটি আমাকে তুলিয়া দেখাইল। তাহার পর, সে ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে যে ঘরে শিশি থাকে, সেই ঘরে খুট-খাট শব্দ হইতে লাগিল। পরে অবগত হইয়াছি যে, প্রত্যেক শিশি নিরীক্ষণ করিয়া সে আপনার হাতের অনুসন্ধান করে। শিশিতে আপনার হাত দেখিতে না পাইয়া, তাহার পর বাড়ীর অন্যান্য ঘর সে পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে এইরূপ করিতেছে। প্রথম শয্যা হইতে সে আমাকে উত্তোলন করে, তাহার পর, কুপিত ও ভর্ৎসনার ভাবে সে আমাকে তাহার হাতের আধখানি দেখায়, তাহার পর শিশিগুলিকে দেখিয়া বেড়ায়, তাহার পর অন্যান্য ঘর অনুসন্ধান করে। রাত্রিকালে সহসা মাথার চুল ধরিয়া তুলিলে আমার বড় কষ্ট হয়। সেই জন্য মাথাটি আমি নেড়া করিয়াছি। এখন সে হাত ধরিয়া আমাকে উত্তোলন করে। যাহা হউক, তোমার মামী ও আমি এই রোগে আজ কয় বৎসর ভুগিতেছি। চাকর চাকরাণী আমার বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারে না। এখন যাহারা আছে, রাত্রিতে তাহাদের কেহ আমার বাড়ীতে থাকে না। এই রোগের জন্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি দেশে আসিয়াছি! কিন্তু চীনে ভূত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত আমি না করিয়াছি—এমন কাজ নাই। তন্ত্র, মন্ত্র, জড়ি, বুটি, কবচ, নাদলী, ঝাড়ান, কাড়ান, ভূত নামানো, চণ্ড নামানো, যাহা কিছু আছে, সব করিয়াছি। তাহার পর দেশে আসিয়া চীনের নামে শ্রাদ্ধ করিয়াছি, গয়াতে পিণ্ড দিয়াছি, গরীব দুঃখীকে দান করিয়াছি, এক তীর্থস্থান হইতে অন্য তীর্থস্থানে পলায়ন করিয়া বাস করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যেখানে যাই না কেন, চীনে ভূত সেইখানেই আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়। আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, শিশিগুলি যদি আমি সঙ্গে না লইয়া যাই, তাহা হইলে উপদ্রবের আর পরিসীমা থাকে না। রাত্রিতে আমাকে শয্যা হইতে তুলিবার পর যখন সে শিশি দেখিতে না পায়, তখন ঘোরতর কুপিত হইয়া সে আমার ঘরের দ্রব্যাদি ভাঙ্গিতে থাকে, বাড়ীতে ইট-পাটকেল বৃষ্টি করিতে থাকে, ঘরদ্বার বিশেষতঃ রান্নাঘরের হাঁড়ি-কুঁড়ি মল-মূত্রে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। সে জন্য যেখানে যাই না কেন, শিশিগুলি আমাকে সঙ্গে রাখিতে হয়। আর কোন উপায় নাই। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এখন মৃত্যু হইলেই আমি যেন বাঁচি।"

রাধামাধব মাতুলের কথাগুলি শুনিলেন। মাতুলকে নানারূপ আশ্বাস প্রদান করা ব্যতীত তখন তিনি আর কিছু বলিলেন না। তাহার পর রাত্রিকালে শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি যদি মামাকে এ দায় হইতে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে, তাঁহার প্রাণদান করা হইবে। কন্যার বিবাহের জন্য তখন আর আমাকে ভাবিতে হইবে না। কিন্তু এ রোগের ঔষধ কি?"

ভূত প্রেত সম্বন্ধে রাধামাধব যে সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, সে

সমুদয় পুস্তকের বিষয় সকল তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে,—"একস্থানে আমি পাঠ করিয়াছি যে, মৃত্যুকালে লোকের মনে যদি কোনরূপ একটা একান্ত বাসনা থাকে, তাহা হইলে সে লোকের আত্মার মুক্তি হয় না। সেই বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত সে পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রাদ্ধ, গয়াতে পিণ্ড অথবা দুঃখীদিগকে দান, এরূপ লোকের নামে করিলে সেই আবদ্ধ আত্মার উপকার হয়। কিন্তু এ সমুদয় কাজ মাতুল করিয়াছেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই।"

রাধামাধবের পুনরায় স্মরণ হইল,—"আর একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে, ভূতদিগের দৃষ্টিশক্তি প্রখর নহে, তাহাদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ নহে। তাহাদিগকে অনায়াসে প্রতারণা করিতে পারা যায়।"

রাধামাধব স্থির করিলেন,—"এই ভূতটাকে আমি ঠকাইতে চেষ্টা করিব।"

পরদিন রাধামাধব মাতুলকে বলিলেন,—"এ ঘোর বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি একটা উপায় ভাবিয়াছি। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি।"

মাতুল সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যাঁহারা কলিকাতার হাসপাতালে কাজ করেন, সেইরূপ ডাক্তারের সহিত রাধামাধব একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি একটি মড়ার হাত চাহিয়া লইলেন। হাতটি শিশিতে করিয়া মাতুলের অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া দিলেন। কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সে রাত্রি পুনরায় সেই কোচের উপর তিনি শয়ন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মাতুলের ঘরে তিনি ভূতের শব্দ পাইলেন। তাহার পর, চীনে ভূত যথারীতি সেই শিশির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি একে একে সমুদয় শিশিগুলি সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। যে শিশির ভিতর রাধামাধব সেই হাতটি রাখিয়াছিলেন, ভূত আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শিশির ভিতর হাত দেখিয়া আনন্দে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল। শিশিটি সে বাম হাতে তুলিয়া মনোযোগপূর্বক দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া রাগে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। রাগে সে শিশি দূরে ভূমির উপর নিক্ষেপ করিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল। ভূত অদৃশ্য হইল।

রাধামাধবের চেষ্টা বিফল হইল। ভূত প্রতারিত হইল না। কেন এরূপ হইল, রাধামাধব তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালী অথবা হিন্দুস্থানীর হস্ত দ্বারা ভূতকে ভুলাইতে পারা যাইবে না। আসল চীনেম্যানের হাত চাই। কিন্তু হাসপাতালে চীনেম্যানের হাত সহজে পাওয়া যায় না। তথাপি রাধামাধব নিরাশ হইলেন না। এইরূপ একটি হাতের জন্য বন্ধুদিগকে তিনি বলিয়া রাখিলেন। দৈবক্রমে এই সময় এক জন চীনে সূত্রধর তেতালার ভারা হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে একেবারে মরে নাই। তাহার একটি হাত চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই হাতটি ছেদন করা হইল। রাধামাধব সেই হাতটি পাইলেন। পূর্বের মত হাতটি শিশিতে রাখিয়া পুনরায় তিনি কোচের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর ভূত যথারীতি উপস্থিত হইয়া শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। হস্তসম্বলিত শিশি দেখিয়া আজও প্রথম তাহার মনে আনন্দ হইল। কিন্তু আজও সে পূর্বের ন্যায় কুপিত হইয়া শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল।

রাধামাধবের চেষ্টা এবারও বিফল হইল। কেন এমন হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে মাতুল ও তিনি হাতটি ভূমি হইতে

তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া মাতুল বলিলেন,—"ওঃ, বুঝিয়াছি। এটা বাম হাত। চীনে ভূতের দক্ষিণ হাত গিয়াছে। বাম হাত দেখিয়া সে জানিতে পারিয়াছে যে, এটা জাল হাত, তাহার নিজের হাত নহে। সেই জন্য সে রাগ করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।"

রাধামাধব বুঝিলেন যে, ইহাই প্রকৃত কারণ বটে। সেই দিন হইতে চীনেম্যানের দক্ষিণ হাতের জন্য তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক মাস গত হইয়া গেল। তথাপি এরূপ হাতের যোগাড় করিতে পারিলেন না। রোগে মৃত ব্যক্তির হাত হইলে চলিবে কি না, সেরূপ একটা সন্দেহ মাতুল ও ভাগিনেয়ের মনে উপস্থিত হইল। এমন সময় চীনের লড়াই আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে যে সমুদয় জাহাজ চীনদেশে গমন করে, সেইরূপ জাহাজের এক জন খালাসির সহিত রাধামাধব আলাপ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"আরকপূর্ণ একটি শিশি তোমাকে দিতেছি। অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছে, এরূপ চীনে পুরুষ মানুষের দক্ষিণ হাত যদি তুমি এই শিশির ভিতর করিয়া আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি একশত টাকা পুরস্কার দিব।"

খালাসি সম্মত হইল। অস্ত্রাঘাতে সে সময় অনেক চীনা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ হাতের যোগাড় করিতে খালাসিকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। দুই মাস পরে সেই আরকপূর্ণ শিশি করিয়া এক জন চীনেম্যানের দক্ষিণ হস্ত সে রাধামাধবকে আনিয়া দিল।

শিশিটি রাধামাধব অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া পূর্বের ন্যায় সেই ঘরে শয়ন করিয়া রহিলেন। পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে ভূত আসিয়া একে একে শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় আজও সে হস্তসম্বলিত শিশিটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু আজ তাহার মুখে ক্রোধের লক্ষণ উদয় হইল না; আজ সে ক্রোধে শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিল না। আনন্দের উপর আনন্দে আজ তাহার মুখশ্রী প্রফুল্ল হইতে প্রফুল্লতর হইতে লাগিল। অবশেষে শিশিটি হাতে লইয়া আনন্দে সে ঘরের ভিতর দুপ দাপ, দুপ দাপ নৃত্য করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে সে "ফিং ফাং ফোঁ, পিং পাং পোঁ," বলিয়া গান করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে শিশিটি হাতে করিয়া ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। রাধামাধব তাড়াতাড়ি মাতুলকে ডাকিয়া এই সুসমাচার প্রদান করিলেন। কিন্তু চীনে ভূত তখনও বাটী হইতে যায় নাই। মাঝের একটি ঘরে তখন, সে এক প্রকার চপর চপর শব্দ করিতেছিল। মাতুল, মাতুলানী ও রাধামাধব সেই ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দ্বারের ফাঁক দিয়া সকলে দেখিলেন যে, ঘরের মাঝখানে বসিয়া চীনে ভূত—থালা ও অনেকগুলি বাটি হইতে কি সব আহার করিতেছে। মাতুলানী তখন হাসিয়া বলিলেন,—"আজ পৌষ মাসের সংক্রান্তি। আজ আমি নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তাই মনে করিলাম যে—"আহা! এই চীনে ভূতটি প্রতিদিন আমাদের বাটীতে আসে; তাহাকে কিছু দিব না! তাই থালা ও বাটিতে নানারূপ পিঠে ও পরমান্ন তাহার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। মনের আনন্দে বসিয়া বসিয়া সে তাই খাইতেছে।"

পিষ্টকাদি আহার করিয়া চীনে ভূত পরম পরিতোষ লাভ করিল। তাহার পর সে চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে মাতুলের বাটীতে আর সে চীনে ভূতের উপদ্রব হয় নাই। মাতুল ও মাতুলানীর শরীর ও মন সুস্থ হইল। সেই দিন হইতে পরম সুখে তাঁহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন। মাতুল এখন মাথায় চুল রাখিয়াছেন।

রাধামাধবকে তিনি বলেন,—"তোমার বুদ্ধিবলে আমরা এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। আর তোমার ডাক্তারি করিতে হইবে না। সপরিবারে তুমি আমার বাটীতে আসিয়া বাস কর। আমি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। টাকার জন্য তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না।"

রাধামাধব এখন মাতুলের গৃহে বাস করিতেছেন। মাতুল ও তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা-জনিত স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া, পরম সুখে দিনযাপন করিতেছেন। যাহাতে স্বজাতি ও স্বদেশের হিত সাধিত হয়, সেইরূপ নানপ্রাকার পরীক্ষায় দুই জনে ব্যস্ত আছেন। সে দিন অতি ধুমধামের সহিত রাধামাধব সুপাত্র-হস্তে জ্যেষ্ঠ কন্যাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর এই পোষড়া পার্বণের সময় নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইবেন, সে জন্য মাতুল, মাতুলানী ও তিনি আয়োজন করিতেছেন। এই পোষড়ার সময় রাধামাধবের মাতুল যেরূপ ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, আর পুনরায় এই পোষড়ার সময় যেমন তাঁহারা মনের আনন্দে পিষ্ঠক প্রস্তুত করিতেছেন, সেইরূপ শত্রু-মিত্র সকলেই বিপদ হইতে উদ্ধার হউন, সকলেই সেইরূপ আনন্দমনে বন্ধুবান্ধবকে পিষ্টক পরমান্ন প্রভৃতি সুখাদ্য প্রদান করিয়া পরিতোষ করুন, ইহাই প্রার্থনা। আর তাঁহাদের এই পিষ্টক-ব্যাপারে গল্প-লেখককে তাঁহারা বঞ্চিত না করেন, ইহাও একান্ত প্রার্থনা।

বিদ্যাধরীর অরুচি

প্রথম অধ্যায়ঃ গোলাপীর হিংসা

গোলাপী ঝি বলিল—"দেখ বিদ্যাধরী! বাবুর মুখে তুমি আর চুণকালি দিও না। আমাদের বাবু এক জন বড় উকীল। নীলাম্বর ঘোষের নাম কে না জানে? তাঁর বাড়ীর ঝি হইয়া তুমি মুদির দোকানে একটু গুড়, উড়ের দোকানে একটি ফুলরী, ময়রার দোকানে একটু চিনির রস, রায় বামনীর কাছে একটু মোচার ঘণ্ট, যার তার কাছে যা তা জিনিস মাগিয়া বেড়াইলে বাবুর অপমান হয়। বাবুর কথা দূরে থাক্, আমাদের পর্য্যন্ত ঘাড় হেঁট হয়। তোমার মাগার জ্বালায় লোকের কাছে আমরা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না"

বিদ্যাধরী ফোঁস করিয়া বলিল,—"তোমরা সকল তাতেই আমার ছল ধর। মা আমাকে একটু ভালবাসেন, তাই সকলে তোমরা ফাটিয়া মর। আমার অরুচি, মুখে কিছু ভাল লাগে না। চড়াই পাখীর আহার। না খাইয়া যেন দাড়ি হইয়া যাইতেছি। গতর না থাকিলে পরের বাড়ী কাজ করিব কি করিয়া? তাই তেঁতুল দিয়া, গুড় দিয়া, যা দিয়া পারি এক মুঠা ভাত খাইতে চেষ্টা করি। আমি গরীব মানুষ। পয়সা কোথা পাইব যে, সন্দেশ, রসগোল্লা কিনিব? মুদি আমাকে ভালবাসে, তাই সে দিন সে আমাকে একটু গুড় দিয়াছিল। ময়রা আমাকে ভালবাসে, তাই সে দিন আমাকে শালপাতের ঠোঙা করিয়া রসগোল্লার খানিক রস দিয়াছিল। তাতে তোমরা হিংসায় ফাটিয়া মর কেন বল দেখি?"

পিতেম বলিল,—"তোমার অরুচি! পাথরটি টই-টুম্বর করিয়া বামুন ঠাকুর তোমাকে ভাত দেয়, তার পর দুই বার তিন বার তুমি ভাত চাহিয়া লও। এই ত তোমার অরুচি; এর উপর যদি রুচি থাকিত, তাহা হইলে ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতীশালের হাতী খাইতে। অনেক বাবুর বাড়ী চাকুরী করিয়াছি, অনেক ঝি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত মাগস্তড়ে বেহায়া ঝি কখনও দেখি নাই। বামুন ঠাকুর! তুমি বল দেখি, এ মাগি তিন জনের খোরাক একেলা খায় কি না।"

ছিদেম বলিল,—"দেখ বিদ্যাধরী! লোকের কাছে গিয়া যা তা মাগা ভাল নয়, তাতে মনিবের অপমান হয়। আমি রসুই করি, নিজে আমি তোমাকে ভাত দিই। সকলের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী তরকারী দিই। তোমার বাছা, আবার অরুচি কোথায়?"

গোলাপী বলিল,—"নোলা যদি সামলাইতে না পার, সন্দেশ-রসগোল্লা যদি খাইতে সাধ হয়, তাহা হইলে পয়সা দিয়া কিনিয়া খাও না কেন? তুমি গরীব, তোমার পয়সা নাই? তোমার গলায় অমন মোটা সোনার দানা, হাতে অমন মোটা তাগা! আর কতবার তুমি আমাকে বলিয়াছ যে, তোমার খোলার ঘরে তক্তোপোষের খুরোর নীচে তুমি ছয়শ টাকা হাঁড়ি করিয়া পুতিয়া রাখিয়াছ। সর্ব্বসুদ্ধ তোমার সেই যার নাম—হাজার টাকা আছে। বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত আমি চাকরাণীগিরি করিতেছি। আমার হাজারটা কড়া-কড়ি নাই। এই পিতেম ছেলে বেলা হইতে খানসামাগিরি করিতেছে। কত টাকা সে করিয়াছে? ছিদেম বামুন ঠাকুর দেশে জমি বাঁধা দিয়া বে করিয়াছে। এখনও সে, সে দেনা শোধ করিতে পারে নাই। তবে তার মেয়েটি বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই মেয়েটিকে বেচিয়া যদি সে কিছু সমস্থান করিতে পারে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার পৃথিবীতে কে আছে? এক দিন এক মুঠা ভাত দেয়, এমন আর কেহ নাই। কাজেই মাহিনাটি যাহা পাই, সেটি আমাকে রাখিতে হয়; ধার-ধোর দিয়া সেটিকে আমাকে বাড়াইতে হয়। তোমার ভাবনা কি বাছা! তোমার ভাই আছে, ভাই-পো আছে। অসময়ে তারা তোমার খোঁজ-খবর লইবে।"

ছিদেম বলিল,—"সকলের কাছে তুমি বল যে, তুমি না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছ। কিন্তু রোজ তুমি মোটা হইতেছ। তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"তুমি আমায় খুঁড়িলে। তোমার মা'গ মরুক, তোমার মেয়ে মরুক। মেয়ে বেচিয়া টাকা করিবার অহঙ্কার তোমার ঘুচুক।"

ছিদেম ব্রাহ্মণ বলিল,—"দেখলে পিতেম! দেখলে গোলাপী! আমি এমন কি বলিয়াছি যে, মাগী আমাকে এমন শক্ত গালি দিল। গিন্নি মায়ের মাগিগো ঝি, তাই জন্য এত অহঙ্কার! গিন্নি-মা বলেন যে, আমার মাথা ঘোরে, আমার বুক ধড় ধড় করে, আমার তিনশ ষাটীখানা ব্যারাম। বিদ্যাধরী সেই কথায় বাতাস দেয়। তাই গিন্নিমা ইহাকে এত ভালবাসেন কিন্তু সকল কথা যদি বলিয়া দিই, তাহা হইলে দুই দিন এখানে থাকিতে পারে না। হাঁ রে মাগী! সে দিন গিন্নি-মায়ের জন্য চা করিবার সময় এক থাবা চিনি কে মুখে দিয়াছিল? কড়ার এক পাশে সরের উপর একটু ছেঁদা করিয়া দুধ খাইবার জন্য সকলে আমরা এক একটি নল করিয়াছি। সেই নল দিয়া সকলে আমরা এক আধ ঢোঁক দুধ খাই-ই। কিন্তু সে দিন সমুদয় কড়া হইতে দুধের সরটুকু কে তুলিয়া খাইয়াছিল? সে দিন মাছ কুটিতে কুটিতে কে কই মাছের পেট থেকে ডিমটুকু বাহির করিয়া লইয়াছিল?"

গোলাপী বলিল,—"পূর্বে চাউল, দাল, তেল যাহা কিছু আমরা বাঁচাইতাম, সকলে ভাগ করিয়া লইতাম। এখন তুমি সেগুলি সব নিজে লও। এ কি ভাল? আমরা কি চাকরী করিতে আসি নাই? সে দিন মোচার ঘণ্টের জন্য উপর হইতে ভিজে ছোলা আর নারিকেল-কোরা আসিয়াছিল। তাহার অর্ধেকগুলি তুমি নিজে খাইলে। তার পর, এক দিন সকাল বেলা গিন্নির জন্য টাটকা গরম গরম জিলেপি আসিয়াছিল। তাহার পাশ হইতে পাপড়ি ভাঙিগয়া তুমি এতগুলি জমা করিলে। সবগুলি তুমি নিজে খাইলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী! তুইও দুই একটা পাপড়ি খা। কেন বাছা, আমাদের কি মুখ নাই? না—ভাল-মন্দ জিনিষ খাইতে আমাদের সাধ হয় না।"

নীলাম্বর ঘোষের রান্নাঘরে চারি জনে এইরূপ তুমুল বাক্‌যুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে ছিদেম ব্রাহ্মণ, পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি। একদিকে তিন জন, অন্য দিকে বিদ্যাধরী ঝি একা! সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যু কতক্ষণ বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে? বিদ্যাধরীকে শীঘ্রই পরাভব মানিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায় : পুরুষোত্তমের সৌভাগ্য

কাঁদিতে কাঁদিতে গিন্নি-মায়ের নিকট গিয়া বিদ্যাধরী বলিল,—"মা! বামুন ঠাকুর বলে যে, তোমার কোন ব্যায়রাম নাই,—সব ঠাট। তোমার মাথা ঘোরে না, তোমার বুক ধড় ধড় করে না! সোহাগ করিয়া তুমি বাবুর টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছ। তোমার অরুচি নাই, তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।"

গিন্নি বলিলেন,—"বটে! বামুনের তো আস্পর্ধা কম নয়, ছোট মুখে বড় কথা!"

বিদ্যাধরী বলিল,—"আমিও মা, সেই কথা বলি। আমি বলিলাম, দেখ বামুন ঠাকুর, মনিবকে অমন কথা বলিতে নাই, মাকে আমি অষ্টপ্রহর দেখিতেছি। তাঁর যে কত অসুখ, সে কথা আর বলিব কি! কেবল আমার সেবার জোরে তিনি বাঁচিয়া আছেন। এই কথা মা,—আমি যেই বলিয়াছি, আর পোড়ার-মুখো বামুন আমাকে কেবল ধরিয়া মারে নাই। কত গালি দিল, কত কুকথা সে যে আমাকে বলিল,—সে কথা মা, তোমাকে আমি আর কি বলিব! সে একা নয়। বাবুর সখের চাকর, পোড়ারমুখো পিতেম, আর আঁটকুড়ী গোলাপীও তার সঙ্গে যোগ দিল! তুমি আমায় মা, একটু ভালবাসো, সেই জন্য সকলের হিংসা। তা আমি মা! আর তোমার কাছে থাকিতে চাই না। তুমি মা, অন্য ঝি দেখিয়া লও।"

পরদিন নীলাম্বর বাবু ছিদেম ব্রাহ্মণকে ডিস্‌মিস্‌ করিলেন ও পিতেম এবং গোলাপীকে অনেক তিরস্কার করিলেন।

বিদ্যাধরী নিজে মনোনীত করিয়া আর এক জন ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল। এ ব্রাহ্মণের যেরূপ মুখশ্রী, লক্ষ লোকের মধ্যেও সেরূপ একটা মুখশ্রী হয় না। মুখমণ্ডলটি প্রকাণ্ড, কিন্তু যতটা দীর্ঘে, প্রস্থে ততটা নহে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু বসন্তের দাগে সমুদয় মুখখানি নানা আকারের গর্তে এত পূর্ণ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের প্রকৃত বর্ণ কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। গণ্ডদেশের উপর হাড় দুইটি এত উচ্চ হইয়া আছে যে, দুই পার্শ্বে চক্ষু দুইটি যেন দুইটি কূপের মত বোধ হয়। দুই চক্ষুর মাঝখানে নাসিকা অতি দীর্ঘ ও উচ্চ। মুখের হাঁ বৃহৎ পুষ্করিণীর ন্যায় প্রশস্ত। সে মুখের হাসি দেখিলে মানুষের আত্মা-প্রাণ শুকাইয়া যায়। চক্ষু ও চুলের বর্ণ তাম্রের ন্যায়; হাজার তেল মাখিলেও চুলের রুক্ষতা যায় না। ব্রাহ্মণের নাম পুরুষোত্তম, বাস উৎকল দেশে।

ঝগড়ার পর বিদ্যাধরী, কিছুদিন ধরিয়া মুদি ও ময়রা কাহার নিকট আর কিছু চায় নাই।

দুই দিন পরে সে পুরুষোত্তমকে বলিল,—"বামুন ঠাকুর! আমাকে তুমি যেমন তেমন ঝি মনে করিও না। এই দেখ, গলায় আমার কেমন সোনার দানা; এই দেখ, হাতে আমার মোটা তাগা। আর আমার ঘরে হাঁড়ি করিয়া ছয়শ টাকা আমি পুতিয়া রাখিয়াছি। কোন কুলে আমার কেহ নাই। আমি অধিক দিন বাঁচিব না। আমার বড় অরুচি। বৈকাল বেলা রোজ চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বর হয়। বাঁচিতে আমার সাধ নাই। মরণ হইলেই বাঁচি! কিন্তু পোড়া যম আমাকে ভুলিয়া আছে! আত্মহত্যা করিলে অগতি হইবে, তা না হইলে আমি কোন্ কালে আফিম খাইয়া, কি গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরিতাম। যাহা হউক, অধিক দিন আমি আর বাঁচিব না। আমার গহনা ও টাকাগুলি আমার মরণের পর তোমার মত কোন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে পায়, তাহাই আমার ইচ্ছা।"

পুরুষোত্তমের মুখ প্রফুল্ল হইল। সে বলিল,—"না, না;—তুমি এখন অনেক দিন বাঁচিবে। তোমার ব্যারাম তত কঠিন নয়। টাকা পাই না পাই,—মায়ের মত আমি তোমার সেবা করিব। সময় অসময়ে আমি তোমাকে দেখিব।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"সে আর অধিক দিন দেখিতে হইবে না। নিজের শরীর আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তা ছাড়া বাঁচিতে আর আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। টাকাগুলি তোমাকে আমি দিয়া যাব। বাবু উকিল; উইল কাহাকে বলে, তা আমি জানি। গিন্নির নামে বাবু উইল করিয়াছেন। একখানা কাগজে

লিখিলেই হইবে যে, অমুককে আমার টাকা গহনা দিয়া যাইলাম। তা করিলেই তুমি সব পাইবে। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিও না।"

সেই দিন হইতে পুরুষোত্তম যত মাছ, যত তরকারী বিদ্যাধরীর পাতে চাপাইতে লাগিল। পিতেম ও গোলাপী কিছু পায় না। সেজন্য তাহারা ক্রমাগত গজ গজ করিতে লাগিল, কিন্তু বাবুর তিরস্কারের ভয়ে প্রকাশ্য ঝগড়া করিতে পারিল না।

চারি পাঁচ দিন পরে বিদ্যাধরী একখানা কাগজ আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিল। পুরুষোত্তম সেই কাগজ কোন লোককে দিয়া পড়াইয়া দেখিল। বিদ্যাধরীর মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তি সে পাইবে, কাগজে এইরূপ লেখা ছিল। পুরুষোত্তম আরও জানিয়া দেখিল যে, এরূপ কাগজকে উইল বলে, এইরূপ উইল করিয়া লোক আপনার সম্পত্তি অন্য লোককে প্রদান করে।

পুরুষোত্তমের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সেই দিন হইতে গোয়ালিনীকে বলিয়া বিদ্যাধরীর জন্য সে এক পোয়া করিয়া দুধের রোজ করিয়া দিল। সেই দিন হইতে সে নিজের পয়সা দিয়া মেঠাই-মোণ্ডা প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস বিদ্যাধরীকে খাওয়াইতে লাগিল।

এক দিন বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার আর বিলম্ব নাই। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে,—'বিদ্যাধরী! দিন দিন তুই যেন পাখী হইয়া যাইতেছিস্। মুখে যেন তোর কালি মাড়িয়া দিয়াছে, বড় জোর আর তিন মাস।' আমি বলিলাম,—'কবিরাজ মহাশয়! বাঁচিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। নিজ হাতে বিষ খাইয়া মরিলে অগতি হইবে। ঔষধের সঙ্গে যদি একটু বিষ দিয়া আপনি আমাকে মারিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার বড় পুণ্য হয়।' কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—'না রে না! তা আর করিতে হইবে না। তোর নাড়ির গতিক যেরূপ, তাহাতে বড় জোর আর তিন মাস।"

পুরুষোত্তম বিদ্যাধরীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পূর্বে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়। রোগা হওয়া দূরে থাকুক, পুরুষোত্তমের নিকট হইতে ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্য পাইয়া দিন দিন সে যেন ফুলিয়া উঠিতেছিল। আজ তিন মাস পুরুষোত্তম তাহার সেবা করিতেছিল। আজ তিন মাস সে আপনার মাহিনা দেশে পাঠায় নাই। সমুদয় টাকা বিদ্যাধরীর জন্য খরচ করিয়াছিল।

আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। বিদ্যাধরী মরে না! ভাল ভাল জিনিস খাইয়া তাহার শরীরে বরং কান্তি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত বিদ্যাধরীর জন্য পুরুষোত্তমের পঁচিশ টাকা খরচ হইয়াছিল। পুরুষোত্তমের মনে খটকা জন্মিল।

তৃতীয় অধ্যায় : প্রাণ মুগরো গাছের শিকড়

এক দিকে পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি, অপর দিকে পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ও বিদ্যাধরী ঝি, ইহাদের মধ্যে সর্বদা ঝগড়া হইতে লাগিল। একদিন বিদ্যাধরীকে গোলাপী বলিল,—"তোমার কি বিবেচনা! আজ সকাল বেলা বাবুর জন্য তুমি সন্দেশ কিনিয়া আনিলে। বাবুকে দিবার পূর্বে, বামুন ঠাকুরকে তুমি দুইবার চাটিতে দিলে, তাহার পর সন্দেশটি তুমি নিজে দশবার চাটিলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী! তুই দুইবার চাট। কোন জিনিস পাইলে সকলকে ভাগ দিয়া খাইতে

হয়। আমিও ঝি, তুমিও ঝি। আমাকে ভাগ দিয়া না খাইলে তোমার অধর্ম হয়, তা জান? মাথার উপর ভগবান্ আছেন, তিনি এর বিচার করিবেন। আর এই চাবড়ামুখো বামুনের কি আক্কেল? আহা, মুখখানি তো নয়—যেন ডায়মনকাটা আড়াই হাত শীতলা। পোড়ারমুখো আর ঠাকুর খুঁজিয়া পায় নাই, জগন্নাথকে ঠাকুর করা হইয়াছে; না আছে নাক, না আছে কান। যে হাতে বিদ্যাধরীকে সব জিনিস দিস্, জগন্নাথের মত তোর সেই হাত ঠুঁটো হউক। মরণ আর কি?"

গোলাপীর গালিতে পুরুষোত্তমের শরীর জর্ জর্ হইল। এ দিকে বিদ্যাধরীর অরুচি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিদ্যাধরী বলে,—"বামুনঠাকুর, বড় অরুচি! যদি ক্ষীরমোহন পাই, তাহা হইলে বোধ হয় কষ্টে শ্রেষ্টে একটা খাইতে পারি।" আবার কোন কোন দিন সে বলে,—'সর-ভাজা বেচিতে আসিয়াছে। বড় অরুচি। একটু যদি সরভাজা পাই, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখি, খাইতে পারি কি না।' আবার কোন দিন বলে,—"বামুন ঠাকুর, শুনিয়াছি বাগবাজারে এক রকম সন্দেশ আছে, তাহার নাম 'আবার খাব', যদি আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বোধ হয় একটু রুচি হয়।" এইরূপ নিত্য নিত্য বিদ্যাধরীর আবদার। পুরুষোত্তম কি করিবে? যখন এত টাকা খরচ করিয়াছে, তখন বিদ্যাধরীর সঙ্গে সহসা চটাচটি করিতে পারে না। কাজেই সেই সমুদয় দ্রব্য তাহাকে আনিয়া দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যাধরীর মরণ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন সে তেলের কুপোর মত মোটা হইতে লাগিল। পুরুষোত্তম তাহার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখে আর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এক দিন পুরুষোত্তম মুদির দোকানে বসিয়া আছে। মুদি জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্রাহ্মণ ঠাকুর! তোমাদের বিদ্যাধরী ঝিয়ের অরুচি সারিয়াছে?"

পুরুষোত্তম উত্তর করিল,—"বিদ্যাধরীর অরুচি! আগে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়।"

"বটে!" এই কথা বলিয়া মুদি একটি নিশ্বাস ফেলিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুদি বলিল,—"বিদ্যাধরীর ব্যারাম বাড়িতেছে? কবিরাজ মহাশয় তাহার নাড়ী ধরিয়া বলিয়াছেন যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না। সেই জন্য আমার নিকট হইতে প্রতিদিন সে এক ছটাক ঘি লইয়া যায়, আর পানা করিয়া খাইবার জন্য রোজ সে আধ পোয়া বাতাসা লইয়া যায়।"

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—"দাম দিয়া?"

মুদি উত্তর করিল,—"না; আমার ছেলেকে সে বড় ভালবাসে। বিদ্যাধরীর যাহা কিছু আছে, সে আমার ছেলেকে দিয়া যাবে। আমার ছেলের নামে সে উইল করিয়াছে।"

পুরুষোত্তমের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। মুদি তাহার সচ্ছিদ্র বাক্স হইতে উইল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। পুরুষোত্তমও আপনার উইল আনিয়া মুদিকে দেখাইল। তখন ইহারা বুঝিল যে, সমুদয় বিদ্যাধরীর চালাকি; দানা, অনন্ত ও টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সে ফাঁকি দিয়া খাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে করিতে আরও প্রকাশ পাইল যে, ময়রাকে একখানি সেইরূপ উইল দিয়া বিদ্যাধরী অনেক টাকার সন্দেশ খাইয়াছে। গোয়ালাকে সেইরূপ একখানি উইল দিয়া দুধ, রাবড়ি ও মাখন খাইয়াছে। উড়ে দোকানদারকে উইল দিয়া, সে মুড়ির চাক্তি আর তেলেভাজা বেগুনি খাইয়াছে। এইরূপ সকলকে এক একখানি উইল দিয়া, অনেক লোকের নিকট হইতে সে অনেক দ্রব্য খাইয়াছে।

একটা সামান্য স্ত্রীলোক তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে—সেই লজ্জায় পুরুষোত্তম কাহাকেও কোন কথা বলিল না। বিশেষতঃ সে ভাবিল যে,—"মাগির কাছ হইতে

এ টাকা যেমন করিয়া হউক, আমায় আদায় করিতে হইবে। এ কথা লইয়া যদি আমি গোল করি, তাহা হইলে সকলে কেবল হাসিবে, আমার টাকা আদায় হইবে না।"

কিন্তু কিরূপে সে টাকা আদায় করিবে? ঝগড়া করিলে কোন ফল হইবে না; ফাঁকি দিয়া আদায় করিতে হইবে!

পুরুষোত্তম ভাবিতে লাগিল। দুই তিন দিন চিন্তা করিয়া এক দিন সন্ধ্যাবেলা বিদ্যাধরীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার জন্য কাল আমি যে মাছের ঝোল রান্ধিয়াছিলাম, তাহা খাইয়া তুমি কেমন আছ? পেট-জ্বালা বুকজ্বলা করিতেছে?"

বিদ্যাধরী বলিল,—"কেন, পেট-জ্বালা বুক-জ্বালা করিবে কেন? সে মাছের ঝোলে কি ছিল?"

পুরুষোত্তম উত্তর করিল, "এমন কিছুই নয়! তবে তুমি বলিয়াছিলে যে, মরণ হইলেই বাঁচি। তোমাকে যদি কেহ বিষ দিয়া মারে, তাহা হইলে তাহার অনেক পুণ্য হয়। মনে নাই? তুমি কবিরাজ মহাশয়ের কাছ হইতে সেই জন্য ঔষধ চাহিয়াছিলে? আমি ভাবিয়াছিলাম যে,—'আহা! বিদ্যাধরী রোগের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছে, বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তা আমি উহাকে একটু বিষ দিই, যাহাতে শীঘ্র উহার গঙ্গালাভ হয়! তাই আমাদের দেশের প্রাণমুগরো গাছের শিকড় বাটিয়া মাছের ঝোলের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলাম!"

বিদ্যাধরী যেন আকাশ হইতে পড়িল। শশব্যস্ত হইয়া সে বলিল,—"বলিস্ কি রে আঁটকুড়ির বেটা। আমাকে বিষ দিয়েছিস্! বলিস্ কি রে উনুনমুখো ডেক্‌রা বামুন!"

পুরুষোত্তম বলিল,—"তা তুমি তো নিজে আমাকে বার বার বলিয়াছ যে, এক তিল আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। এখন অমন কথা বলিলে চলিবে কেন?"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে সর্বনেশে! ওরে আঁটকুড়ো উড়ে বামুন! তোর মনে কি এই ছিল? ওঃ! আমার পেট জ্বলিয়া গেল, আমার বুক জ্বলিয়া গেল। প্রাণ যায়, ওমা! আমার প্রাণ যায়!"

এইরূপ বলিতে বলিতে বিদ্যাধরী সেইখানে ধড়াশ করিয়া শুইয়া পড়িল, আর কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমাগত বলিতে লাগিল,—"আমার পেট গেল, আমার বুক গেল, আমার প্রাণ যায়। ও গিন্নি-মা! তোমার বিদ্যাধরী ঝি যায়। শীঘ্র ডাক্তার লইয়া এস। ও পিতেম! ও গোলাপী! শীঘ্র আয় রে! সকলে মিলিয়া আমার প্রাণ বাঁচা রে। ও মা কালী! আমাকে বাঁচাও মা! তোমাকে জোড়া পাঁঠা দিব, মা। হে বাবা তারকনাথ! আমাকে বাঁচাও বাবা, গণ্ডি দিয়া আমি তোমার মন্দিরে গিয়া পূজা দিব বাবা!"

পাছে অধিক চীৎকার করে,—সে জন্য হাত দিয়া পুরুষোত্তম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। পুরুষোত্তম বলিল—"চুপ চুপ।"

বিদ্যাধরী পুনরায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল,—আর বলিল, "হাঁ রে আঁটকুড়ির বেটা! কি গাছের শিকড় দিয়াছিস? চুপ করিব? এখনি আমি থানায় যাইব। তোর হাতে হাতকড়ি দিয়া তোকে ফাঁসিকাটে ঝুলাইব। ও পিতেম! ওরে শীঘ্র পাহারাওয়ালাকে ডাক! এই আঁটকুড়ির বেটা আমাকে বিষ দিয়াছে। আমার টাকা পাইবে, সে জন্য বেটা আমাকে খুন করিয়াছে। ওঃ! পেট আমার জ্বলিয়া গেল! হায় হায়! আমার কি হইল!"

পুরুষোত্তম বলিল,—"চুপ চুপ! যদি তুমি একান্তই মরিতে না ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিষের কাটান করিতে আমি জানি। সে ঔষধ ডাক্তার বৈদ্য কেহই

জানে না। পুলীশের লোকে যদি আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ঔষধ তোমাকে কে দিবে? তাহা হইলে বেঘোরে তুমি মারা যাইবে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে আঁটকুড়ির বেটা! তবে সে ঔষধ শীঘ্র আনিয়া দে।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"সে ঔষধ আনিতে পাঁচ টাকা খরচ হইবে। আমার কাছে এখন একটি পয়সাও নাই! টাকা কোথায় পাইব যে, সে ঔষধ আনিব? আজ এক শিশি খাইলে আপাততঃ তোমার প্রাণটা বাঁচিবে। কিন্তু তাহার পর আরও পাঁচ ছয় শিশি খাইলে বিষটা নির্দোষ হইয়া তোমার শরীর হইতে যাইবে। আমি গরীব মানুষ! ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা আমি কোথায় পাইব! আগে যদি বলিতে যে, আমার মরিতে ইচ্ছা নাই, তাহা হইলে মাছের ঝোলের সহিত আমি বিষ দিতাম না।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে আঁটকুড়ির বেটা! আমি তোকে টাকা দিতেছি। তুই আমার প্রাণ বাঁচা। তুই আমার বাবা! তুই আমার প্রাণ রক্ষা কর। ও মা, আমার পেট জ্বলিয়া খাক হইয়া গেল।"

পেটে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদ্যাধরী ছোট এক অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই ঘর হইতে পাঁচটি টাকা আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—"যা বাবা, যা শীঘ্র যা। যা করিয়াছিস্ তা করিয়াছিস্! এখন আমার প্রাণ বাঁচা!"

পুরুষোত্তম বলিল,—"কোন ভয় নাই! ঔষধ খাইলে তুমি ভাল হইয়া যাইবে। কাহাকেও কোন কথা বলিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি। যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ খিড়কির দিকে কলের নীচে বসিয়া মাথায় ও পেটে একটু একটু জল দিতে থাকো।"

চতুর্থ অধ্যায় : গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ

এই কথা বলিয়া পুরুষোত্তম বাটী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যাধরীকে প্রকৃত সে বিষ দেয় নাই। আপনার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত সে এইরূপ ফন্দি করিয়াছিল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া সে চারি পয়সা দিয়া একটা শিশি কিনিল। রাস্তার কল হইতে শিশিটি জলে পরিপূর্ণ করিল। তাহার পর এক পয়সার সোডা কিনিয়া সেই জলের সহিত মিশ্রিত করিল। এইরূপে মিছামিছি একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সে বাটী প্রত্যাগমন করিল। মনে করিল যে, এবার পাঁচ টাকা আদায় হইল। আর পাঁচ ছয় শিশি ঔষধ দিতে পারিলেই তাহার সমুদয় টাকা আদায় হইবে।

পুরুষোত্তম যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছিল। সে দেখিল যে, রান্না ঘরের নিকট পিতেম ও গোলাপী বসিয়া সুড়-সুড় করিয়া কথা কহিতেছে। কয় মাস ধরিয়া পুরুষোত্তম অন্য চাকর-চাকরাণী-দিগকে বঞ্চিত করিয়া, বিদ্যাধরীকে অধিক মাছ ও তরকারী দিয়াছিল, সে জন্য তাহার উপর সকলের রাগ। বিষ প্রদানের কথা পাছে পিতেম কি গোলাপী শুনিয়া থাকে, সেই ভয়ে পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল।

তাহাকে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না। পিতেম তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"বামুন ঠাকুর! সর্বনাশ করিয়াছ। বিদ্যাধরীকে বিষ দিয়াছ। পুলিশের

লোক টের পাইলে এখনি তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর তোমার ফাঁসী হইবে।"

পুরুষোত্তমের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল,—"আমি সত্য সত্য তাহাকে বিষ দিই নাই। মিছামিছি করিয়া বলিয়াছি।"

পিতেম বলিল,—"সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? যদি বিষ দাও নাই, ঔষধ আনিবার জন্য তাহার নিকট হইতে পাঁচ টাকা লইয়াছ কেন? তবে বিদ্যাধরী উন্মাদ, পাগল হইয়াছে কেন?"

আশ্চর্য্য হইয়া পুরুষোত্তম বলিল,—"উন্মাদ পাগল হইয়াছে? আমি সত্য বলিতেছি, তাহাকে আমি পাগল হইবার ঔষধ দিই নাই।"

পিতেম বলিল,—"সে ভয়ানক উন্মাদ হইয়াছে। আমরা দুইজনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। অনেক কষ্টে তাহাকে আমরা একটু সুস্থ করিয়াছি। কিন্তু সুস্থ হইয়া সে আর এক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বরাবর উপরে গিয়া গিন্নি-মায়ের খাটে গিয়া শুইয়াছে। মা বাগানের কলতলায় কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। উপরে আসিয়া যদি তিনি দেখেন যে, বিদ্যাধরী তাঁহার বিছানায় শুইয়া আছে, তাহা হইলে আর রক্ষা রাখিবেন না। বাবুও এখনি বাড়ী আসিবেন। সকল কথা তখন প্রকাশ হইবে। তখন নিশ্চয় পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিবেন।"

পুরুষোত্তম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"দোহাই ভাই! আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা কর। এখন কি করিলে আমি রক্ষা পাই, তা বল ভাই।"

পিতেম উত্তর করিল,—"আমরা অনেক কষ্টে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহাকে গিন্নির খাট হইতে উঠাইতে পারি নাই। তুমি যদি পাঁজা করিয়া কোন-রূপে তাহাকে নীচে আনিতে পার, তাহা হইলে উপায় হইতে পারে। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। গিন্নি এখনি উপরে আসিবেন। নিজের বিছানায় বিদ্যাধরীকে দেখিলে তিনি আর রক্ষা রাখিবেন না।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"তবে আমি এখনি যাই।"

গোলাপী বলিল,—"না, অমনি গেলে হইবে না। তাহাকে পাঁজা করিয়া ধরিলেই চীৎকার করিয়া সে ফাটাইয়া দিবে। তাহার চীৎকারে গিন্নি দৌড়িয়া আসিবেন, তাহা হইলে সকল কথা প্রকাশ পাইবে।"

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি করি?"

গোলাপী ঘরের ভিতর হইতে একটি বড় থলি আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—"উপরে গিন্নির ঘরে গিয়া টপ করিয়া বিদ্যাধরীর মুখে এই থলিটি পরাইয়া দিবে। তাহার পর দুই হাতে পাঁজা করিয়া তাহাকে ধরিবে। কিন্তু সাবধান! মুখ হইতে থলি যেন সে খুলিতে না পারে। তাহার পর জোর করিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া আনিবে। তাহাকে যদি আমাদের কাছে আনিতে পার, তখন আমরা তাহাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিব।"

থলিটি হাতে লইয়া আর কোন কথা না বলিয়া পুরুষোত্তম তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। তাহার পর দ্রুতবেগে গিন্নির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে, তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। গিন্নির খাটের উপর যে শুইয়াছিল, পুরুষোত্তম নিকটে গিয়া সহসা তাহার মুখে থলিটি পরাইয়া দিল। মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে, দুই হাতে, কোমর পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি থলিটি টানিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে পাঁজা করিয়া ধরিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিল। সে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু থলির ভিতর হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না, থলির ভিতর হইতে ঘড় ঘড় আর

গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার হাত দুইটি আবদ্ধ ছিল। যথাসাধ্য পা দিয়া সে পুরুষোত্তমকে লাথি মারিতে লাগিল, আর ছটফট করিয়া যথাসাধ্য আপনাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু উড়ে বামুন নাছোড়বান্দা। কতক টানিয়া কতক হিঁচড়াইয়া পুরুষোত্তম তাহাকে সিঁড়ির নিকট পর্য্যন্ত আনিল। এমন সময় সে থলির ভিতর হইতে আপনার দুই হাতের কতকটা বাহির করিয়া ফেলিল।

সেই দুই হাতে পুরুষোত্তমকে প্রাণপণে খিমচাইতে আর থলি ভেদ করিয়া ভিতর হইতে পুরুষোত্তমকে কামড়াইতে লাগিল, আর দুই পায়ে লাথি মারিতে লাগিল। সিঁড়ির উপরে যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। তাহার আঁচড়ানি কামড়ানিতে পুরুষোত্তম বড়ই বিব্রত হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহাকে সিঁড়িতে নামাইতে পারিল না। দুই পা আগে যায়, আর এক পা পশ্চাতে গিয়া পড়ে। সিঁড়ির ঠিক উপরে তাহাকে লইয়া পুরুষোত্তম এইরূপ টানাটানি করিতেছে, এমন সময় সিঁড়ির একটু নিম্নে বাড়ীর কর্ত্তা-বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একে উড়ে ব্রাহ্মণের সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি গুণ-মোড়া আর একটা মূর্ত্তিকে লইয়া টানাহেঁচড়া করিতেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাবু ভাবিলেন, এ ভূত, না প্রেত, না পাগল, এ কি? ঘোরতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, —"এ কি! এ কি!"

চমকিত হইয়া পুরুষোত্তম বাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে দেখিল যে, দুইটা পৈঠার নীচে সিঁড়িতে স্বয়ং বাবু দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাহার ঠিক পশ্চাতে আলো হাতে করিয়া স্বয়ং বিদ্যাধরী ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বাবুর পশ্চাতে সিঁড়ির উপর বিদ্যাধরীকে দেখিয়া, পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সে চটমোড়া সেই স্ত্রীলোককে সেই স্থানে ফেলিয়া দ্রুতবেগে বাবুর পাশ দিয়া সিঁড়ি হইতে নামিল। নীচে নামিয়া তৎক্ষণাৎ সে বাটী হইতে পলায়ন করিল। আপনার মাহিনা কি কাপড়-চোপড় লইতে আর সে ফিরিয়া আসিল না। সে পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের আর কোন সন্ধান কেহ পায় নাই। পুরুষোত্তম যখন চলিয়া গেল, তখন বিদ্যাধরী ঝি, গোলাপী ঝি ও পিতেম চাকর সকলেই হাবা সাজিল। তাহারা বলিল,—"ব্রাহ্মণ কেন এরূপ কাজ করিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমরা জানি না।" সে জন্য এ ব্যাপার কেন যে ঘটিয়াছিল, নীলাম্বর বাবু এখনও তাহার সবিশেষ কারণ জানিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা এই যে, উড়ে ব্রাহ্মণ হয় পাগল হইয়াছিল, আর না হয় তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল।

যাহা হউক, নীলাম্বর বাবু তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকের মাথা হইতে থলিটি খুলিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, থলির ভিতর হইতে তাঁহার স্ত্রীর মুখ বাহির হইয়া পড়িল। গিন্নি তখন জ্ঞানশূন্য, মূর্চ্ছিত। অনেক কষ্টে পুনরায় তাঁহার চেতন হইল। তাহার পর, হিষ্টিরিয়া রোগ দ্বারা তিনি আক্রান্ত হইলেন। ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত নানা রোগে তিনি কষ্ট পাইলেন। ডাক্তার বৈদ্য দেখাইয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া, নীলাম্বর বাবু এখন তাঁহাকে ভাল করিয়াছেন। সকলে এখন সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন।

মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি

প্রথম অধ্যায় : আশ্চর্য্য ছবি

হৃষীকেশ রায় কলিকাতার আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ে বালকেরা ছবি আঁকিতে শিক্ষা করে। ছবি আঁকা ভিন্ন হৃষীকেশ ফটোগ্রাফ লইতে অর্থাৎ আলোক-যন্ত্রের সহায়তায় মানুষের চেহারা তুলিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মের ছুটি পাইয়া হৃষীকেশ বাটী আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস রামদেবপুর। পূর্বে এই গ্রামে অনেক লোকের বাস ছিল। ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে জনশূন্য প্রায় হইয়াছে। হৃষীকেশের পিতা দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় এক্ষণে গ্রামের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। তিনি নিজে অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া ধনবান হইয়াছেন।

নিকটস্থ কোন গ্রামের এক জন লোক তাঁহার শিশু পুত্রের ছবি তুলিবার নিমিত্ত হৃষীকেশকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চাকরের দ্বারা প্রথম চেহারা তুলিবার যন্ত্র ও ছবি আঁকিবার দ্রব্যাদি পূর্ণ বাক্স প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর বৈকাল বেলা নিজে বাইসাইকেলে অর্থাৎ চাকায় চড়িয়া সেই গ্রামে গমন করিলেন।

যথারীতি বালককে বসাইয়া যন্ত্রনিহিত কাচের উপর হৃষীকেশ বালকের ছায়া গ্রহণ করিলেন। কিরূপ ছবি উঠিল, তাহা দেখিবার নিমিত্ত যন্ত্র হইতে কাচখানি তিনি অতি সাবধানে বাহির করিলেন। আশ্চর্য্য! কাচের উপর বালকের মুখশ্রী অঙ্কিত হয় নাই। কাচের উপর এক পরমা সুন্দরী বালিকার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। নিকটে কোন বালিকা ছিল না। কাচের উপর বালিকার মুখশ্রী কি করিয়া উঠিল? এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন শুনে নাই। বিস্ময়ে হৃষীকেশ স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর এরূপ রূপও কেহ কখনও দর্শন করে নাই। ছবিতে সেই মুখশ্রী দেখিয়া হৃষীকেশের মন মোহিত হইল। এরূপ দেবকন্যা সমা বালিকা কি পৃথিবীতে আছে? মানুষের এরূপ অসামান্য রূপ কি হইতে পারে? যাই হউক, এই ছবির উপর আমি আমার প্রাণ সঁপিলাম। যদি পৃথিবীতে থাকে, যদি সে আমার স্বজাতি হয়, যদি আমি তাহাকে পাই, তাহা হইলে আমি সংসার-ধর্ম্ম করিব। নতুবা সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। গ্রীষ্ম বর্ষায় নানা ক্লেশে শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া অবশেষে সাদরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব।

"হৃষীকেশ! ছবি কি ভাল উঠে নাই?" বালকের পিতা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

চমকিত হইয়া হৃষীকেশ উত্তর করিলেন,—"না। আমার যন্ত্র বেকল হইয়া গিয়াছে। আজ আর ছবি হইবে না। আজ আমি বাড়ী যাই।"

এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বালিকার প্রতিবিম্বে অঙ্কিত সেই কাচখানি তিনি বাক্সের মধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। তাহার পর আপনার চাকার উপর চড়িলেন। যে চাকর তাঁহার যন্ত্রাদি লইয়া আসিতেছিল, তাহাকে তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন। গ্রামের বাহিরে এক নিভৃত স্থানে গাছতলায় চাকরের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া রহিলেন। চাকর সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলে তাহার নিকট হইতে ছবি আঁকিবার দ্রব্যাদিপূর্ণ বাক্সটি গ্রহণ করিয়া তাহার ভিতর হইতে

তুলি, নানাবিধ রং ও একখণ্ড গোলাকার ক্ষুদ্র হাতীর দাঁতের উপর তিনি সেই বালিকার ছবি আঁকিতে লাগিলেন। উপরে কাচ ও চারিধারে পিত্তলের গড়ন দ্বারা আবদ্ধ ছোট একখানি ছবি তাহার বাক্সর ভিতর ছিল। সেই ছবিখানি বাহির করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে হস্তি-দন্তে চিত্রিত বালিকার ছবিখানি তিনি সেই গড়নের ভিতর আবদ্ধ করিলেন। অবশেষে সূতা বাঁধিয়া বালিকার ছবিখানি তিনি আপনার গলায় পরিলেন। যন্ত্র ও দ্রব্যাদি সহিত চাকরকে আগে পাঠাইয়া সেই গাছতলায় তিনি পড়িয়া রহিলেন। হৃষীকেশের বয়স অধিক হয় নাই, ষোল কি সতের বৎসর। তথাপি সেই বালিকার জন্য তিনি পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন। গাছতলায় পড়িয়া কেবল তিনি তাহাকে ভাবিতে লাগিলেন। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত দিন ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থল হইতে তিনি সেই বালিকার ছবি বাহির করিয়া বার বার দেখিতে লাগিলেন। বালকের ছায়া গ্রহণের সময় কোথা হইতে বালিকার ছবি আসিল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নিশ্চয় এ দৈব ঘটনা। যদি দৈব ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় বালিকা কোন না কোন স্থানে আছে, আর নিশ্চয় বিধাতা তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘাসের উপর মাটীতে পড়িয়া হৃষীকেশ এইরূপ নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তথাপি হৃষীকেশ উঠিলেন না। ক্রমে অন্ধকার হইল তথাপি হৃষীকেশ উঠিলেন না। ক্রমাগত তিনি সেই বালিকার অপূর্ব মুখশ্রী ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইল। ঘোর অন্ধকার। সমস্ত পৃথিবী আমি এই বালিকাকে অন্বেষণ করিব। আমার এই প্রতিজ্ঞা যদি তাহাকে না পাই, তাহা হইলে এ ছার প্রাণ আমি বিসর্জন করিব। মনে মনে হৃষীকেশ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন। উঠিয়া দেখিলেন যে আকাশের পশ্চিম-উত্তর কোণে ঘোরতর মেঘ করিয়াছে, আর সেই কাল মেঘের কোলে চকমক করিয়া বিজলী খেলিতেছে, তাড়াতাড়ি তিনি আপনার চাকার উপর চড়িয়া গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যে গ্রামে তিনি গিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে বাটী যাইতে মাঝে একটি জলা আছে। তাহার মাঝখান দিয়া একটি পাকা রাস্তা গিয়াছে। এক ক্রোশ জলা পার হইয়া নিজের গ্রামে যাইতে হয়। রাত্রি নয়টার অধিক হইয়াছে। মাঠের পথে জনমানব নাই। হৃষীকেশ দ্রুতবেগে জলা পার হইতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধেক পথ পার হইয়াছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার চারিদিকে প্রবলবেগে ঘূর্ণি-বাতাস উত্থিত হইল। বায়ুর সোঁ সোঁ, বৃক্ষপত্র ও শুষ্ক ঘাসের খড় খড় শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু ও মুখ ধূলায় পূর্ণ হইয়া গেল। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে কে এক জন যেন শূন্য হইতে তাঁহার চাকার উপর পড়িল। তাঁহার পশ্চাতে চাকার উপর বসিয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। গলা ধরিয়া তাঁহার কানে চুপি চুপি বলিল,—

'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি।
সতী হাসে ফিকিফিকি॥'

অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া ভয়ে হৃষীকেশের প্রাণ উড়িয়া গেল। মূর্চ্ছিত হইয়া চাকা হইতে তিনি পতিতপ্রায় হইলেন। কিন্তু যে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়াছিল, সে দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ছিল। সে জন্য মাটীতে তিনি পড়িয়া গেলেন না। অজ্ঞান অবস্থায় হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু

তবুও তাঁহার চাকা মাটীতে পড়িয়া যায় নাই। পূর্বের ন্যায় চাকা বন বন করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। হৃষীকেশের ক্রমে একটু সংজ্ঞা হইল। বিদ্যুতের আলোকে তিনি দেখিলেন যে, যে তাঁহার গলা ধরিয়াছিল, তাহার দুই হাতে শাঁখা রহিয়াছে। তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে, সে স্ত্রীলোক। এ যে মানুষ নহে, তাহা তিনি পূর্বেই ঠিক করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, প্রেতিনী অথবা শঙ্খচূর্ণীর হাতে আজ আমি পড়িয়াছি। আমাকে নিশ্চয় এ মারিয়া ফেলিবে। প্রথম তিনি আপনার গলা হইতে ভূতিনীর হাত দুইটি ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। ভূতিনী হাত দুইটির দ্বারা তাঁহার গলা এত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল যে, তাঁহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আরব্য উপন্যাসের বৃদ্ধ পদ দ্বারা যেরূপ সিন্ধুবাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, ভূতিনী তাহার দুই হাত দিয়া হৃষীকেশের গলা সেইরূপে চাপিয়া ধরিল। ভূতিনীর হস্তদ্বয় হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া হৃষীকেশ চাকা হইতে লম্ফ প্রদানের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভূতিনী তাঁহাকে বলপূর্বক ধরিয়া ছিল ; সুতরাং সে চেষ্টাও বিফল হইল। আজ ভূতের হাতে নিশ্চয় প্রাণ হারাইলাম, এইরূপ ভাবিয়া হৃষীকেশ মুখে ধূলি মাড়িয়া দিল, তাঁহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার হৃৎ-পিণ্ড ধড় ধড় করিতে লাগিল, পুনরায় মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু যাহাতে জ্ঞানশূন্য না হইয়া পড়েন, সে জন্য মনকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিলেন। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া তিনি ভূতিনীকে বলিলেন,—"কে তুমি? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে এরূপ কষ্ট দিতেছ? আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

ভূতিনী হাসিয়া পুনরায় তাঁহার কানে কানে বলিল,—

মেঘের কোলে ঝিকিমিকি।
সতী হাসে ফিকি ফিকি ॥

তাহার পর গানের সুর ধরিয়া ভূতিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—

ঘর ঘর ঘর চাকা ঘোরে।
ভাল বেসেছেন বঁধু মোরে ॥
বঁধুর গলায় ছবি দোলে।
বঁধুকে আমি নিয়েছি কোলে ॥

চাকা বন বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ভূতিনী সেই চাকার উপর বসিয়া নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে সুর করিয়া সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে মেঘে ঝিকি মিকি।
ডুলির ভিতর ব'সে ক'নে হাসে ফিকি ফিকি ॥
বিয়ের সম্বন্ধ মামা করে, খুড়ো নয়কো রাজি।
হিঁদুর ঘরে বিয়ের মামলা বিচার করেন কাজি ॥
লাল কাপড়ে ময়ূর আঁকা হাতে রাঙ্গা কড়।
বিয়ের সময় ছান্‌লা তলায় উঠলো বড় ঝড় ॥
বিয়ের পরে বাসর-ঘরে ক'নে বেটী যান।
পাড়ার মেয়ে এসে করে শিব ঠাকুরের গান ॥

ডাকাত সাজে বুড়ো কাজি দেড়ে থানাদার।
চকচকানি টাকা পেয়ে খুলে দিলাম দ্বার ॥
জলার ভিতর আছি ভাই নাইকো আমার গতি।
যতদিন না বঁধুর সঙ্গে মিলবে পুন সতী ॥
যাও বঁধু সেই ক'নের কাছে গলায় ছবি যার।
উলু উলু উলু উলু উলু পাঁচবার ॥

উলু দিতে দিতে ভূতিনী চাকার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল ও অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল। হৃষীকেশের চাকা আপনার বেগে বেগে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক পাশ হইয়া পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে চীৎকার করিয়া হৃষীকেশ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

নিকটে কয়েক ঘর মুসলমানের বাস ছিল। হৃষীকেশের চীৎকার শুনিয়া তাহাদের চারি পাঁচজন লোক বাহিরে আসিল। মূর্চ্ছিত হৃষীকেশকে দেখিয়া তাহারা চিনিতে পারিল। মুখে-হাতে জল দিয়া বাতাস করিয়া তাহারা তাঁহাকে চেতন করিল। তাঁহার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কি হইয়াছিল, কেন তিনি চীৎকার করিয়াছিলেন, কেন তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন, সে সব প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেবল বিজ-বিজ করিয়া বকিতে লাগিলেন। এক জন মুসলমান বলিল,—"ঝিকি মিকি, ফিকি ফিকি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারা যায় না।"

সকলে বলিল,—"নিশ্চয় জলার পেতনী ইঁহাকে ধরিয়াছিল। চল, ইঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

এই বলিয়া তাহারা হৃষীকেশকে বাড়ী লইয়া গেল। হৃষীকেশের মাতা ছিলেন না। সংসারে ছিলেন কেবল পিতা, বড় ভ্রাতৃবধূ ও তাঁহার একটি শিশু-পুত্র। তাঁহার মাতার কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরও অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন। যাহার মাতা নাই, সংসারে তাহার কেহ নাই।

হৃষীকেশের কেহ খোঁজ-খবর বড় লইল না। পিতা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি হইয়াছে ?"

হৃষীকেশ বিজ-বিজ করিয়া কি বলিলেন। তাহা শুনিয়া পিতা বলিলেন,—"ঝিক মিক ফিক ফিক আবার কি ?"

এই বলিয়া পিতা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রির শেষভাগে হৃষীকেশ শয্যা হইতে উঠিলেন। ছবিখানি বুকের উপর রাখিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া তিনি গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। পিতা লোক দ্বারা তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু হৃষীকেশের কোন সন্ধান হইল না।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রায় মহাশয়ের পরিবার

হৃষীকেশের পিতা,—দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় উগ্রস্বভাববিশিষ্ট লোক, সর্বদাই তিনি রাগিয়া থাকেন। নিজে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, সেই অহঙ্কারে তাঁহার মেজাজ সর্বদাই গরম হইয়া থাকে। তাঁহার কটুবাক্যে সকলেই বিরক্ত। পাড়াপ্রতিবাসী আত্মীয়-স্বজন কাহারও সহিত তাঁহার সদ্ভাব নাই, এমন কি, তাঁহার পুত্রদিগের সহিতও তাঁহার সম্প্রীতি ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র-বধূ তাঁহার তাড়নায় সর্বদাই জর্জরীভূত। অল্প বয়সে তিনি বিধবা

হইয়াছেন। কিন্তু শিশু-পুত্রটির লালনপালনে ব্যস্ত থাকিয়া তিনি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছেন। পুত্রটির বয়স এক্ষণে পাঁচ বৎসর। তাহার নাম বিনয়। বিনয় অতি সুবোধ ও শান্ত বালক। পিতামহ সংসারে কখনও কাহাকেও ভালবাসেন নাই। এক মাত্র বিনয়ের প্রতি কেবল তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল। এক বিনয় ভিন্ন আর কেহ তাঁহার নিকট যাইতে অথবা তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিত না।

কিন্তু আজ বিনয়ের উপরও তাঁহার রাগ হইয়াছে। বিনয় কোন দোষ করে নাই, বিনয়ের মাতাও কোনও দোষ করে নাই। দোষ করিয়াছিলেন, বিনয়ের মাতামহ মৃত্যুঞ্জয় নস্কর। বিনয়ের মাতার এক অবিবাহিতা ভগিনী আছে, তাহার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি রায় মহাশয় অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন। হৃষীকেশের সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য রায় মহাশয় ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার পিতা সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বৈবাহিককে তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে,—"তোমার ধন থাকিলে কি হইবে? আমার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে তুমি একদিনও সুখী কর নাই। আমার জামাতা,—তোমার পুত্র—তাহার সহিত তোমার সদ্ভাব ছিল না। তোমার তর্জন-গর্জনে সে অল্প বয়সে মরিয়া গেল, আমার কন্যা বিধবা হইল। তাহাকেও তুমি একদিনের জন্যও সুখে রাখ নাই। আমার যদি অবস্থা ভাল হইত, তাহা হইলে তোমার বাড়ীতে একদিনের জন্য বিধবা কন্যাকে আমি থাকিতে দিতাম না। বিনয় ও তাহাকে আনিয়া আমার ঘরে রাখিতাম। আমার কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা সুলক্ষণা,—লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা। চিরদুঃখিনী হইবার জন্য তোমার বাড়ীতে তাহাকে আমি পাঠাইতে পারি না।"

নস্কর মহাশয়ের এই উত্তর শুনিয়া রায় মহাশয়ের মন রাগে পরিপূর্ণ হইল। সেই কথা লইয়া পুত্রবধূকে তিনি সর্বদাই ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। যখন হৃষীকেশ বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহার রাগের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন যে, সরূপা সুলক্ষণা অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ দিলে পুত্র দেশত্যাগী হইত না। এইরূপ ভাবিয়া পুত্রবধূকে তিনি দিবারাত্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পুত্র হৃষীকেশের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় স্নেহমমতা ছিল, তাহা নহে। ক্রোধে অভিভূত হইবার, লোককে গালি দিবার একটি কারণ পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। অহোরাত্রি তিরস্কারের জ্বালায় পুত্রবধূর জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন আহার না করিয়া একদিন তিনি অবিরল ধারায় চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। রায় মহাশয়ের রাগ তাহাতে আরও বৃদ্ধি হইল। পুত্রবধূর প্রতি নানারূপ নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন,—"তোমার পিতার দোষে আমার পুত্র বিবাগী হইয়া গেল। তোমার পিতা বলে যে, তোমাকে এখানে থাকিতে দিতে তাহার ইচ্ছা নাই। পুত্র লইয়া তুমি আমার বাটী হইতে দূর হও।"

বিধবা পুত্রবধূ, কর্ত্তার নিষ্ঠুর বাক্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না। শিশু-পুত্রটির হাত ধরিয়া তিনি বাটী হইতে বাহির হইলেন, তাহার পর অতি কষ্টে পিতার ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা বলিলেন যে,—"মা! যদি আমাদের একমুঠা জোটে, তাহা হইলে তাহার আধমুঠা তোমাকে ও তোমার পুত্রকে আমরা দিব। সে নরাধমের বাড়ীতে আর তোমার গিয়া কাজ নাই।"

বড় পুত্র জীবিত নাই, কনিষ্ঠ পুত্র দেশত্যাগী হইয়াছে। বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রকে তিনি তাড়াইয়া দিলেন। রায় মহাশয়ের সংসার শূন্য বোধ হইল। কতক রাগে, কতক মনের খেদে, তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে ষাটি বৎসরেরও অধিক। কিন্তু টাকায় কি না হয়? নিকটস্থ

একখানি গ্রামে চতুর্ভুজ হড় নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। কন্যা বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ লাভ করিবেন, এইরূপ আশা করিয়া, কন্যাকে তিনি বড় করিতেছিলেন। অনেক টাকা দিয়া রায় মহাশয় তাঁহার পনর বৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিলেন। হড় মহাশয়কে কেবল যে তিনি নগদ টাকা দিলেন তাহা নহে, তাঁহার কন্যাকে প্রচুর অলঙ্কার প্রদান করিলেন। কন্যার যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকেই সমুদয় সম্পত্তি দিয়া যাইবেন, সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। আর সপরিবার হড় মহাশয়কে চিরকাল প্রতিপালন করিতেও স্বীকৃত হইলেন। সে জন্য বিবাহের পর কন্যার পিতা হড় মহাশয়, কন্যার মাতা, কন্যার ভ্রাতা বৃন্দাবন ও ভ্রাতার স্ত্রী সকলে আসিয়া রায় মহাশয়ের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয়ের সংসার পুনরায় জাজ্বল্যমান হইল।

কিন্তু বিধাতা কপালে সুখ না লিখিলে সুখ হয় না। এক বৎসর পরে, ঠিক পূজার পূর্বে রায় মহাশয়ের নব বিবাহিতা পত্নী সহসা রোগগ্রস্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। রায় মহাশয়ের পুনরায় গৃহশূন্য হইল। পত্নীর পরলোক হইল বটে, কিন্তু হড়বংশ রায় মহাশয়ের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। মনের দুঃখে রায় মহাশয় বলিলেন যে,—"আমার পুত্র পুত্র-বধূ কেহই আমার অসময়ে মুখপানে চাহিয়া দেখিল না। পুত্র, পুত্রবধূ অথবা পৌত্রকে আমি আমার সম্পত্তির এক পয়সা দিয়া যাইব না। যাহারা আমার সেব-শুশ্রূষা করিবে, তাহাদিগকে আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি দিয়া যাইব।"

এই কথা শুনিয়া হড়-বংশের মন পুলকিত হইল। বড় হড়, ছোট হড়, হড়নী ও হড়-বৌ সকলে একান্ত মনে রায় মহাশয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় বলিলেন বটে, কিন্তু বিনয়কে তিনি একেবারে ভুলিয়া যান নাই। পৃথিবীতে যদি কখন কাহাকেও তিনি ভালবাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিনয়কে তিনি ভালবাসিতেন। শান্ত সুবোধ বিনয়ও পিতামহকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। হড়গণ যে নিতান্ত স্বার্থপর, রায় মহাশয় তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার টাকা পাইবার লোভে তাহারা যে তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া আছে, তাহাদের মনে যে অনুমাত্র স্নেহ-মমতা নাই, তাহাও তিনি জানিতেন। সে জন্য সর্বদাই তাঁহার মন উদাস থাকিত। শিশু বিনয় ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন প্রাণী যে তাঁহাকে ভালবাসে না, এই বৃদ্ধ বয়সে সর্বদাই তাঁহার মনে সেই চিন্তা উদয় হইত। সংসার সর্বদাই তিনি শূন্য দেখিতেন। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যখন পৃথিবীর সমুদয় সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, তখন আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতায় মানুষ অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করে। রায় মহাশয় দোল-দুর্গোৎসব করেন বটে; কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরে ভক্তি তাঁহার ছিল না। ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসজনিত যে শান্তি, সে শান্তির আস্বাদ তিনি একেবারেই জানেন না। তাহার পর এত টাকা থাকিতেও সাংসারিক সুখ তাঁহার একেবারেই নাই। দ্বিতীয় পত্নীবিয়োগের পর এক বৎসরকাল তিনি অতি দুঃখে কাটাইলেন। তাহার পর বিনয়কে কাছে আনিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। হড়গণ এ প্রস্তাবে যতদূর সাধ্য আপত্তি করিলেন। কিন্তু রায় মহাশয় তাহাদের কথা শুনিলেন না। তিনি বিনয়কে আনিতে পাঠাইলেন। কিন্তু পুত্রবধূকে আসিতে মানা করিলেন। তাহার পিতা আমাকে কটু কথা বলিয়াছেন, তাহার পিতার দোষে আমার পুত্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, সে পুত্রবধূর মুখ আমি দেখিব না।

বিনয়ের মাতা ভাবিলেন যে,—"আমার পিতার অবস্থা ভাল নহে। এ স্থলে বিনয় থাকিলে, তাহার লেখা-পড়া হইবে না। পিতামহের নিকট থাকিলে, বিনয়ের

প্রতি তাঁহার স্নেহ হইবে। তাহা হইলে হড়দিগকে তিনি সমুদয় বিষয় দিয়া যাইবেন না, বিনয়কে হয় তো কিছু দিবেন।"

এইরূপ ভাবিয়া পুত্রের হিতার্থে তিনি বিনয়কে পিতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিনয়কে পাইয়া রায় মহাশয়ের মন অনেকটা শান্তিলাভ করিল। বিনয়ের সহিত গল্প করিয়া, বিনয়কে অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি যেরূপ আনন্দ পাইলেন, এরূপ আনন্দ জীবনে তিনি কখন উপভোগ করেন নাই। হড়-বংশের হৃদয় হিংসায় ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনয়কে বাড়ীতে আনিবার অতি অল্প দিন পরে রায় মহাশয় ঘোরতর পীড়িত হইলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার পীড়া কঠিন হয় নাই। কিন্তু বড় হড় ছোট হড় প্রভৃতির কৃত্রিম আদরে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া হড়গণ সর্বদা বলিত,—"কোন ভয় নাই। সেবা করিয়া আমরা তোমাকে ভাল করিব।"

রায় মহাশয় এই সকল আশ্বাস বাক্য একবার, দুই বার, তিনবার চুপ করিয়া শুনিলেন। তাহার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"ভয় নাই! ভয় কে করিয়াছে? মৃত্যুভয়ে কবে তোমাদিগের নিকট আমি কাঁদিয়াছি?"

হড় মহাশয় উত্তর করিলেন,—"না না, আমরা এমন কোন কথা বলি নাই। তবে কথা এই যে, পীড়া কঠিন নহে, শীঘ্রই তুমি আরোগ্যলাভ করিবে।"

সকলে যাহা বলে, রায় মহাশয় কখন তাহা করেন না। সকলে যেরূপে ইচ্ছা করে, তাহার ঠিক বিপরীত কাজ করা তাঁহার স্বভাব। হড় মহাশয় যখন বলিলেন যে, তুমি শীঘ্র ভাল হইবে, তখন রায় মহাশয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তবে আমি শীঘ্র ভাল হইব না। শীঘ্র ভাল হইব! বটে! দেখি কে আমাকে শীঘ্র ভাল করিতে পারে।'

এইরূপ করিয়া তিনি নানারূপ অত্যাচার ও কুপথ্য করিতে লাগিলেন। দুই চারিদিনের মধ্যে তাঁহার পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। সকলে তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন। অজ্ঞান অভিভূত হইয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন। তিন দিন পরে সামান্য ভাবে তাঁহার একটু চৈতন্য হইল। চক্ষু চাহিয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত তিনি এদিক ওদিক ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদুস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিনয়! বিনয় কোথা?"

হড়নী তখন তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—"বিনয় বালক! পাছে গোলমাল করে, সেই জন্য তোমার নিকট তাহাকে আমরা আসিতে দিই না।"

রায় মহাশয় পুনরায় মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুমি এ ঘর হইতে এখন যাও; বিনয়কে পাঠাইয়া দাও।"

হড়নী বাহিরে গিয়া হড় মহাশয়কে বলিলেন। হড় মহাশয় রোগীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। "ভগবানের কৃপায় আজ যদি তুমি একটু ভাল আছ, তাহা হইলে আর অত্যাচার করা উচিত নহে। বিনয় আসিলে তাহার সহিত তুমি কথা কহিবে। এই দুর্বল অবস্থায় কথা কহিলে পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি হইবে।"

রায় মহাশয় কিছুতেই শুনিলেন না। অগত্যা হড় মহাশয় বিনয়কে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনয় পিতামহের শয্যার নিকট বসিল। তাহার পর কাঁদ-কাঁদ মুখে সে বলিল,—"ঠাকুরদাদা! তোমার কাছে ইহারা আমাকে আসিতে দেয় না। একবার তোমার সহিত দেখা করিব, তুমি কেমন আছ তাহা দেখিব, সেই জন্য কতবার আমি এই ঘরের নিকট আসিয়াছিলাম। আমাকে গালি

দিয়া ইহারা তাড়াইয়া দিয়াছিল। বুড়ো হড় মহাশয়ের ছেলে বৃন্দাবন দাদা বলে, টাকার ভাগ লইব, তাই ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা! কবে আমি তোমার কাছে টাকা চাহিয়াছি ঠাকুরদাদা! তুমি একটি করিয়া পয়সা দিতে, তাহাই আমি লইতাম। টাকা তো তুমি আমাকে দাও নাই।"

তৃতীয় অধ্যায় : বিনয়

রায় মহাশয় বিনয়ের হাতটি ধরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহারা আর কি বলে?"

বালক উত্তর করিল,—"ডাক্তার বলিয়াছে, তুমি বাঁচিবে না; সে জন্য ইহাদের বড় আমোদ হইয়াছে, ঠাকুরদাদা! উইল কাহাকে বলে?"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"কেন, সে কথায় তোমার কাজ কি?"

বিনয় উত্তর করিল,—"সে দিন হড় মহাশয় ও হড় ঝিমাতে কথা হইতেছিল। তোমার যত টাকা-কড়ি আছে, তুমি নাকি উইল করিয়া সব ইহাদিগকে দিয়াছ? তাই হড় মহাশয় বলিতেছিলেন যে, তুমি মরিয়া গেলে এই টাকা দিয়া তিনি জমি কিনিবেন। হড়-ঝিমা বলিলেন, না, প্রথম তিনি তাবিজ গড়াইবেন। বৃন্দাবন দাদা বলিলেন, তিনি একটা ঘোড়া কিনিবেন।"

ঈষৎ হাসিয়া রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হড়-বৌ কি বলিল?"

বালক উত্তর করিল,—"হড় দিদি কিছুই বলেন নাই। তিনি চুপ করিয়াছিলেন।"

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তারে কি বলিয়াছে?"

বিনয় উত্তর করিল,—"দুই বেলা ডাক্তার যখন তোমাকে দেখিয়া যান, তখন হড় মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়! এ বেলা কেমন দেখিলেন? কি রকম বোধ হয়? ডাক্তার বলেন,—আর বড় জোর দুই দিন। তখন ইঁহারা খুব আহ্লাদিত হন। দুই দিন পরে তোমার কিছু হয় নাই বলিয়া সকলে বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাদা বলিলেন, বুড়ো কি কাঠপরাণী! মরিতে চায় না। কিন্তু ঠাকুরদাদা! তোমার যদি কিছু হয়, তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব? মা বলিয়াছেন যে, মামার বাড়ীতে থাকিলে আমার লেখাপড়া হইবে না।"

রায় মহাশয় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"বটে, ইহারা আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে? ভাল। কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ যাত্রা আমি কিছুতেই মরিব না।

এইরূপে চিন্তা করিয়া বিনয়কে তিনি বলিলেন,—"বিনয়! আমি মরিব না। তোমার ভয় নাই। আজ রাত্রিতে তুমি একটি কাজ করিতে পারিবে? যদি তোমার ভয় না করে, তাহা হইলে আমি বলি।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কাজ, ঠাকুরদাদা? তোমাকে সকলে রাগী বলে, ভয়ে তোমার কাছে কেহ আসে না। কিন্তু আমি,—ঠাকুরদাদা, তোমাকে খুব ভালবাসি। তুমি যে কাজ বলিবে, সেই কাজ আমি করিব।"

এই বলিয়া বিনয় স্নেহের সহিত পিতামহের মাথার নিকট আপন মাথাটি রাখিল।

পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দালানে ঠাকুর গড়া কতদূর হইয়াছে?"

বিনয় উত্তর করিল,—"কুমার আসিয়া খড়ের দুর্গা, গণেশ, কার্তিক,—এই

সব করিয়া গিয়াছে। তাহার পর তোমার ব্যারাম হইল, সেই জন্য আর কিছু হয় নাই।"

পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর দেওয়ালে বাঁধা আছে?"

বিনয় উত্তর করিল,—"ঠাকুরের পিছনে দালানের দেওয়ালের গায়ে মোটা গজাল পোঁতা আছে। ঠাকুরের পিছনে বাঁশে মোটা দড়ি বাঁধা আছে। সেই দড়ি দেওয়ালের গজালের সহিত বাঁধা আছে।

রায় মহাশয় বলিলেন,—"বেশ! রাত্রিতে চুপি চুপি দালানে গিয়া সেই দড়ি কাটিয়া, ঠাকুর ফেলিয়া দিতে পার?"

বিনয় বলিল,—"দালানে ভূত নাই তো?"

পিতামহ উত্তর করিলেন,—"না, দালানে ভূত নাই। যদি তোমার ভয় হয়, তবে কাজ নাই। কিন্তু দড়ি কাটিয়া ঠাকুর যদি ফেলিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি ভাল হইব। তা না করিলে হয় তো আমি মরিয়া যাইব।"

বিনয় বলিল,—"তবে আমি নিশ্চয় তা করিব, দালানে ভূত থাকুক আর নাই থাকুক, আমি নিশ্চয় তা করিব। আমি ঝিয়ের কাছে শুই! কাজ কর্ম সারিয়া ঝি অনেক রাত্রিতে ঘরে আসে। কিন্তু যেমন করিয়া পারি, আজ রাত্রিতে আমি জাগিয়া থাকিব। তাহার পর ঝি ঘুমাইলে আমি বাহির-বাটীতে দালানে গিয়া দড়ি কাটিয়া ঠাকুর ফেলিয়া দিব। কিন্তু ঠাকুরদাদা! আমি ছুরি কোথায় পাইব?"

খাটের নিম্নে একটি বাক্স ছিল। পিতামহ,—বিনয়কে সেই বাক্সটি আনিতে বলিলেন। শয়ন করিয়াই অতি কষ্টে তিনি বাক্সটি খুলিলেন। তাহার ভিতরে বৃহৎ একখানি চাকু ছুরি ছিল। বিনয়কে সেই ছুরিখানি দিলেন। বিনয় একবার খুলিয়া তাহার পর মুড়িয়া রাখিল। রায় মহাশয় তাহার পর বাক্স হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিলেন ও দিয়াসলাই জ্বালাইয়া তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন। পিতামহের আদেশে বিনয় তাহার পর সে ছাইগুলি জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। যে উইলে রায় মহাশয় হড়দিগকে আপনার সম্পত্তি দিয়াছিলেন, সেই উইল এইরূপে তিনি ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। উইল রেজেষ্টারি করা হয় নাই।

তাহার পর রায় মহাশয় বলিলেন,—"ছুরি লুকাইয়া রাখ। ঠাকুর ফেলার কথা কাহাকেও বলিও না। আজ তবে যাও, কাল সকালবেলা পুনরায় আমার সঙ্গে দেখা করিও।"

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। ঝি তবুও ঘরে আসিল না। নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল। অনেক কষ্টে কিছুক্ষণের নিমিত্ত বিনয় জাগরিত রহিল। কিন্তু আর পারিল না, কে যেন তাহার চক্ষু দুইটি বলপূর্বক চাপিয়া দিল। কতক্ষণ বিনয় নিদ্রা গিয়াছিল, তাহা সে ঠিক বলিতে পারে না। কিন্তু সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে ভাবিতে লাগিল। পিতামহের আদেশ ক্রমে ক্রমে তাহার স্মরণ হইল। তখন তাহার ভয় হইল। সে ভাবিল,—"ঐ যা! সকাল বুঝি হইয়া গিয়াছে!"

বিনয় কান পাতিয়া কিছুক্ষণ শুনিল,—চারিদিক্ নিস্তব্ধ, মানুষের সাড়া-শব্দ নাই। জানালার দিকে চাহিয়া দেখিল,—সব অন্ধকার। হাত বাড়াইয়া দেখিল,—ঝি কাছে শুইয়া আছে, অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। তখনও রাত্রি আছে, সকাল হয় নাই।

বিনয় আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিল। বালিশের নীচে হইতে ছুরিখানি লইল। ধীরে ধীরে ঘরের দ্বার খুলিল। অন্ধকার রাত্রি। ভয়ে বালকের সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বাহিরবাটীতে দালানে যাইতে বার বার চমকিত হইল। ঐবুঝি

কে দাঁড়াইয়া আছে! ঐ বুঝি কে হাত বাড়াইতেছে, এ বস্তু সে বস্তু দূর হইতে দেখিয়া, বার বার তাহার এইরূপ ভয় মনে উদয় হইল। একবার তাহার মুখ দিয়া চীৎকার বাহির হইবার উপক্রম হইল। পুনরায় ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার নিমিত্ত একবার তাহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে ভাবিল যে,—ঠাকুরের দড়ি না কাটিলে ঠাকুরদাদা বাঁচিবেন না।—এইরূপ ভাবিয়া সে মনকে স্থির করিল। পাছে মুখ দিয়া চীৎকার বাহির হয়, সে জন্য দন্ত দ্বারা নিম্ন-ওষ্ঠ সে কামড়াইয়া রহিল। ভয়ে তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। বুকের শব্দ সে নিজে শুনিতে পাইতেছিল। এ শব্দ পাছে আর কেহ শুনিতে পায়, সে জন্য বাম হাতে সে বুক চাপিয়া রহিল। ঠাকুরদাদাকে আমি বাঁচাইব, ঠাকুরদাদাকে আমি বাঁচাইব,—এই কথা বার বার সে মনে মনে বলিয়া ভয় ও ভাবনা ভুলিতে চেষ্টা করিল।

আস্তে আস্তে বিনয় দালানে গিয়া উঠিল। অর্ধনির্মিত প্রতিমার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। একদিকে প্রতিমার পশ্চাৎদিগের বাঁশের সহিত ও অপরদিকে দালানের প্রাচীরে গজালের সহিত যে রজ্জু বাঁধা ছিল, চাকু খুলিয়া বিনয় তাহা কাটিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বিনয় সাত বৎসরের শিশু। রজ্জু উচ্চে বাঁধা ছিল। রজ্জু সে নাগাল পাইল না। এত কষ্ট সব আমার বৃথা হইল। ঠাকুরদাদাকে আমি বাঁচাইতে পারিলাম না! ভয় ভুলিয়া বিনয়ের মন এক্ষণে দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। কি করি! সেই অন্ধকারে প্রতিমার পশ্চাতে একাকী দাঁড়াইয়া বিনয় ভাবিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল যে, দালানের নিম্নে এক পার্শ্বে একটি পুরাতন কাঠের বাক্স পড়িয়া আছে। বৃন্দাবন তাহার উপর কখন কখন বসিয়া তামাকের ধূম পান করেন। অতি কষ্টে সেই বাক্সটি বিনয় দালানে আনিল। তাহার উপর দাঁড়াইয়া তবুও সে দড়ির নাগাল পাইল না। বিনয় পুনরায় ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া পুনরায় প্রাঙ্গণে গিয়া দুইখানি ইট লইয়া আসিল। বাক্সের উপর ইট রাখিয়া তাহার পর সেই ইটের উপর দাঁড়াইয়া বিনয় দড়ি কাটিতে সমর্থ হইল। কিন্তু দড়ি অতিশয় স্থূল ছিল। পাছে ইন্দুরে কাটে, সেই জন্য তাহার উপর আলকাতরার লেপ ছিল। সেই আলকাতরা শুষ্ক হইয়া দড়ি অতিশয় কঠিন হইয়াছিল। দড়ির উপর ছুরিটি সবলে রাখিয়া একবার উপরে একবার নীচে তুলিতে লাগিল। তাহার শিশু-হাত—দড়ি দুই খণ্ড হইতে কিছু বিলম্ব হইল। কিন্তু যেই রজ্জু ছিন্ন হইল, আর হুড়মুড় করিয়া প্রতিমা উপুড় হইয়া পড়িল। সেই সময় ইট দুইখানিও বিনয়ের পা হইতে সরিয়া গেল। বিনয় মাটীতে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়া সে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইল। কতক্ষণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে বলিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহার চেতনা হইল, তখনও রাত্রি অবসান হয় নাই। ধড় ফড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল। আমি এখানে কি করিয়া আসিলাম, প্রথম তাহার সেই চিন্তা হইল। তাহার পরে যখন তাহার সকল কথা স্মরণ হইল, তখন পাছে কেহ দেখিতে পায়, তাহার সেই ভয় হইল। পিতামহ তাহাকে এ কথা গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন। ছুরিখানি একটু দূরে পড়িয়া ছিল, মাটীতে হাত বুলাইয়া বিনয় তাহা খুঁজিতে লাগিল। অল্প অনুসন্ধানের পর সে তাহা পাইল। বিনয় তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে আপনার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিল।

চতুর্থ অধ্যায় : রায় মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা

পরদিন প্রাতঃকালে বিনয়ের উঠিতে বিলম্ব হইয়াছিল। শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া সে পিতামহের নিকট যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তাঁহার মুখ

দেখিয়া বিনয় বিস্মিত হইল। আনন্দে তাঁহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়াছে। তাহার পর, হড় মহাশয়ের মুখে সেইরূপ আহ্লাদের লক্ষণ দেখিতে পাইল। বৃন্দাবনের মুখেও সেইরূপ আনন্দের চিহ্ন। হড়-বৌয়ের মুখেও সেইরূপ প্রীতি-প্রফুল্লতার লক্ষণ। তাহার পর, বড় হড় বড় হড়নীর সঙ্গে, ছোট হড় ছোট হড়নীর সঙ্গে ফুসফুস করিয়া কথা ও হাসি হইতে লাগিল। কিসের এত আনন্দ? বিনয় তাহা স্থির করিতে পারিল না। একবার হড় মহাশয় হড়নীকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"বল হরি! হরিবোল! এবার আর সন্দেহ নাই।" ইহার অর্থ কি? বিনয় কিছু বুঝিতে পারিল না।

অল্পক্ষণ পরে ঝিকে নিভৃতে পাইয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"হড় মহাশয় এত আমোদ করিতেছেন কেন?"

ঝি উত্তর করিল,—"কর্তা আর রক্ষা পাইবেন না, আজ কি কাল। এক ধামা টাকা পাইলে কার না আনন্দ হয়? যার যেমন কপাল! বাপ-মায়ের আমি এক পয়সা পাই নাই, আর ইহারা পরের ধনে রাজা হইল। আহ্লাদে তাই সব ফুটিফাটা হইতেছে।"

কাঁদ-কাঁদ মুখে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরদাদার ব্যারাম বাড়িয়াছে?"

ঝি উত্তর করিল,—"তা জানি না। তবে কাল রাত্রিতে ঠাকুর পড়িয়া গিয়াছে।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর পড়িয়া গিয়াছে? ঠাকুরদাদার তাহাতে কি হইয়াছে?"

ঝি উত্তর করিল,—"তুমি ছেলেমানুষ, তুমি সে সব কথা কিছু বুঝিবে না।"

বিনয় তবু ঝিকে ছাড়িল না। বার বার সে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে ঝি বিরক্ত হইয়া বলিল,—"জান না, এ বাটীতে আধগড়া ঠাকুর পড়িয়া গেলে মানুষ মরিয়া যায়? প্রথমবার যখন পড়িয়া গিয়াছিল, তখন কর্তার পিসী মরিয়াছিলেন। তাহার পর আর একবার ঠাকুর পড়িয়াছিল, তাহাতে তোমার ঠাকুরমা গিয়াছিলেন। তাহার পর আর একবার পড়িয়াছিল, তাহাতে তোমার বাবা মরিয়াছিলেন। তাহার পর আর একবার পড়িয়াছিল, তাহাতে কর্তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, হড় মহাশয়ের মেয়ে মরিয়াছিলেন। সেই জন্য খুব মোটা দড়ি দিয়া ঠাকুর বাঁধা থাকে, আর পাছে ইন্দুর কাটে, সেই জন্য দড়ির উপর আলকাতরা মাখানো থাকে। এত সাবধানেও যখন ঠাকুর পড়িয়াছে, তখন আর রক্ষা নাই। মা এবারে কর্তাকে না লইয়া ছাড়িবেন না।"

বিনয় ভাবিতে লাগিল—তবে ঠাকুরদাদা আমাকে দড়ি কাটিতে বলিলেন কেন?

কিছুক্ষণ পরে রায় মহাশয় বিনয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। ঘর হইতে আর সকলকে বাহির করিয়া দিয়া তিনি বিনয়কে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। পিতামহের নিকট গিয়া ছল-ছল চক্ষে বিনয় বলিল,—"ঠাকুরদাদা! তবে তুমি আমাকে ঠাকুর ফেলিয়া দিতে কেন বলিয়াছিলে? সকলে বলিতেছে যে, ঠাকুর যখন পড়িয়া গিয়াছে, তখন আর কর্তা কিছুতেই বাঁচবেন না।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"সে যাহা হউক, হড়েরা এখন কি করিতেছে, তাহা বল?"

বিনয় উত্তর করিল,—"ঠাকুর পড়িয়া গিয়াছে, তুমি আর নিশ্চয় বাঁচিবে না, সে জন্য তাঁহারা চুপি চুপি কথা কহিতেছেন, আর খুব আমোদ করিতেছেন।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"বটে।" রায় মহাশয় পুনরায় হাসিয়া বলিলেন,—"বিনয়! তোমার কোন ভয় নাই, ঠাকুর যদি আপনি পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে হয় তো বাঁচিতাম না। কিন্তু ঠাকুর আপনি পড়ে নাই, তুমি ফেলিয়াছ। আমি খুব

ভাল আছি। এবার আমি মরিব না। এই দেখ, আজ আমি উঠিয়া বসিতে পারিয়াছি।"

ঠাকুরদাদার আশ্বাস-বাক্য শ্রবণে বিনয়ের মন আহ্লাদে পূর্ণ হইল। চক্ষু মুছিয়া পিতামহের সহিত সে গল্প করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পিতামহ বলিলেন,—"আমি মরিয়া গেলে টাকা পাইবে, সেই জন্য হড়েরা আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিল। সর্বদাই আমার মৃত্যু কামনা করিতেছিল। আমি এবার মরিব না। তাহারা টাকা পাইবে না। খুব জব্দ হইবে। বিনয়! তুমি খুব সাহসের সহিত কাজ করিয়াছ। এবার পূজার সময় তুমি যাহা চাইবে, তাহা আমি তোমাকে দিব। পূজার সময় তুমি কি লইবে, এখন হইতে তাহা ভাবিয়া রাখ।"

রায় মহাশয়কে দেখিবার নিমিত্ত সে দিন যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন তাঁহার প্রতীক্ষায় হড়-বংশ উৎফুল্ল মুখে নীচে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রোগীকে দেখিবার ডাক্তার যখন নীচে আসিলেন, তখন হড় মহাশয় ঘোরতর আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন মহাশয়! আজ কেমন দেখিলেন? আর অধিক বিলম্ব নাই, না? আজ রাত্রি কি কাটিবে বলিয়া বোধ হয়? এত বড় একটা লোকের কাল হইলে, তাহার সব যোগাড় করা আবশ্যক, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ঈষৎ হাসিয়া ডাক্তার উত্তর করিলেন,—"আজ রোগীর অবস্থা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তাহার নাড়ী কিছু দুর্বল আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ আর গোলযোগ নাই। রোগীর কোনরূপ পীড়া আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ যাত্রা ইনি রক্ষা পাইলেন।"

হড় মহাশয় একেবারে বসিয়া পড়িলেন। বৃন্দাবনের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল।

রায় মহাশয় দুর্বল রহিলেন বটে, কিন্তু দুই চারিদিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার পীড়ার জন্য পূজার আয়োজন সমুদয় বন্ধ হইয়াছিল। এত বড় রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রায় মহাশয় মনের আনন্দে এবার ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব করিতে মানস করিলেন। চারিদিকে সেইরূপ আয়োজন হইতে লাগিল।

পূজার পঞ্চমীর দিন রায় মহাশয় বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিনয়, আমি বলিয়াছিলাম যে, পূজার সময় তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই আমি তোমাকে দিব। তোমার কি চাই, তাহা এখন বল দেখি?"

বিনয় উত্তর করিল,—"আগে তুমি বল যে, আমি যাহা চাহিব, তাহাই তুমি দিবে? তবে আমি বলিব।"

পিতামহ বলিলেন,—"হাঁ, তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই আমি তোমাকে দিব।"

বিনয় বলিল,—"আমি আমার মাকে চাই। আমার মায়ের উপর আর কখন তুমি রাগ করিবে না। মাকে বকিবে না, আমি তাই চাই। এই পূজার সময় আমার মাকে আনিবে, মায়ের বাবাকে আনিবে, মায়ের মাকে আনিবে, অন্নপূর্ণা মাসীকে আনিবে, আমি এই সব চাই।"

এবার রোগ হইতে উঠিয়া আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া, রায় মহাশয়ের স্বভাব সম্পূর্ণরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। সংসারে সুখ নাই, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, ধন ঐশ্বর্য্য নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু, এইরূপ তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল। ধনের অহংকার তিনি মন হইতে একেবারে দূর করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উগ্র মূর্তির পরিবর্তে প্রসন্ন মূর্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। আর কখন কটুবাক্য বলিব না, কাহারও মনে দুঃখ দিব না, মনে মনে তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া-

ছিলেন। হড়েরা তাঁহার মৃত্যু কামনা করিয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের প্রতি তাঁহার মনে ঘৃণা জন্মিয়াছিল; কিন্তু সে বিদ্বেষও মন হইতে দূর করিতে তিনি যথ সাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। হড়দিগের সহিতও তিনি মিষ্টভাবে কথোপকথন করিতেন।

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আম্মা মাসীর বিবাহ হইয়াছে?"

বিনয় উত্তর করিল,—"না, এখনও তাঁর বিয়ে হয় নাই। আমার মায়ের বাবার টাকা নাই, তাই এখনও তাঁর বিয়ে হয় নাই।"

রায় মহাশয় নিরুদ্দেশ পুত্রকে স্মরণ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা আমি আজই তোমার মা, তোমার সেখানকার ঠাকুরদাদা, দিদিমা ও তোমার আম্মামাসীকে আনিতে পাঠাইব।"

পঞ্চম অধ্যায় : আম্মামাসীর স্বপ্ন

রায় মহাশয় তাঁহার বৈবাহিককে মিনতি করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। তিনি বলিলেন যে,"আমি মরিয়া বাঁচিয়াছি। আমার অপরাধ সমুদয় ক্ষমা করিবেন," ইত্যাদি।

বিনয়ের মাতামহ, মাতামহী, মাতা ও মাসী গাড়ী করিয়া রায় মহাশয়ের বাটীতে আসিতেছিলেন। মাতামহের নাম মৃত্যুঞ্জয় নস্কর। যে জলায় হৃষীকেশ ভূত দেখিয়াছিলেন, সেই জলা পার হইয়া আসিতে হয়। সন্ধ্যার সময় গাড়ী জলার অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। জলার মধ্যে কিছু দূর অগ্রসর হইলে ঘোড়া অকস্মাৎ ক্ষেপিয়া উঠিল। গাড়ী সহিত ঘোড়া দুইটি রাস্তার পার্শ্বে এক গর্তে গিয়া পড়িল। আরোহীদিগের শরীরে বিশেষ কোনরূপ আঘাত লাগিল না বটে, কিন্তু গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। বিনয়ের মাতামহ বলিলেন,—"এ গাড়ী আর চলিবে না। রামদেবপুর আর অধিক দূর নহে। জলাটা পার হইলেই আমরা সেখানে গিয়া পেঁাছিব। এই রাস্তাটুকু চল আমরা হাঁটিয়া যাই।"

জলার মাঝখানে তাঁহারা গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে জনপ্রাণী ছিল না। এই সময় তাঁহাদের বাম দিকে জলার উপর মেঘ নামিয়া যেন ভূমি স্পর্শ করিল। ভূমি হইতে অল্প উচ্চে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আকাশ হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বাম দিকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মেঘ ঘনীভূত হইয়া মানুষের আকার ধারণ করিল। মেঘনির্মিত সেই মানুষ হাত দুইটি দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের শাঁখায় তাহার হাত দুইটি অলঙ্কৃত ছিল। বিদ্যুতের আলোকে এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহার পর সেই মেঘের মানুষ দুলিতে দুলিতে সুর করিয়া সেই সমুদয় পূর্বকথা বলিতে লাগিল;—

"টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে মেঘে ঝিকি মিকি।
ডুলির ভিতর ব'সে ক'নে হাসে ফিকি ফিকি॥
বিয়ের সম্বন্ধ মামা করে খুড়ো নয়কো রাজি।
হিন্দুর ঘরের বিয়ের মামলা বিচার করেন কাজি॥
লাল-কাপড়ে ময়ূর আঁকা হাতে রাঙ্গা কড়।
বিয়ের সময় ছানলাতলায় উঠলো বড় ঝড়॥

বিয়ের পরে বাসরঘরে ক'নে বৌটি যান।
পাড়ার মেয়ে এসে করে শিব-ঠাকুরের গান ॥
ডাকাত সাজে বুড়ো কাজি দেড়ে থানাদার।
চক্‌চকানি টাকা পেয়ে খুলে দিলাম দ্বার ॥
জলার ভিতর আছি তাই নাইকো আমার গতি।
যত দিন না বঁধুর সঙ্গে মিলবে পুন সতী ॥
যাও ক'নে সেই বঁধুর কাছে গলায় ছবি দিয়ে।
বেলগাছেতে ব'সে আছে পথটি পানে চেয়ে ॥"

জলার মধ্যে ক্রমে ক্রমে সেই মেঘ-মূর্তি মেঘের সহিত ও সেই সুরটি বাতাসের সহিত মিশাইয়া গেল।

সকলের শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, ও কি? ঐ শব্দ শুনিয়া আমার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে।"

নস্কর মহাশয় বলিলেন, "ও কিছু নহে, চল।"

সকলে দ্রুতবেগে জলা পার হইতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, যে, যাহা তাঁহারা শুনিলেন, তাহা মানুষের স্বর নহে। গ্রামে প্রবেশ করিয়া মুসলমান-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, যে,—"জলার ভিতর একটু উচ্চ ভূমিতে একটা শেওড়াগাছ আছে। সেই গাছে একটা পেতিনী বাস করে। কখন সে গীত গায়, কখন সে ক্রন্দন করে। তাহার ভয়ে জলার পথ দিয়া রাত্রিকালে লোক একেলা যাতায়াত করে না।"

নস্কর মহাশয় সপরিবারে রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয় তাঁহার বিশেষরূপ সমাদর করিলেন। হড়গণও তাঁহাদের মৌখিক অভ্যর্থনা করিলেন। বিনয়ের মাতা পুত্রকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। রায় মহাশয়ের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ও তাঁহার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

আহারাদির পর বিনয়ের মাতা, বিনয় ও অন্নপূর্ণা এক ঘরে শয়ন করিলেন। ঘোর রাত্রিতে বিনয়ের মাতার সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিকটে কে ফোঁশ ফোঁশ করিয়া কাঁদিতেছে, সেইরূপ একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আম্মা! কাঁদিতেছিস? কেন, কি হইয়াছে?"

অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিল না। বিনয়ের মাতা উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। তিনি দেখিলেন, যে, অন্নপূর্ণা ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। মেঘের ন্যায় তাহার দীর্ঘ কেশপুঞ্জ মুখে ও পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। সেই কেশের ভিতর দিয়া, তাহার রূপরাশি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিনয়ের মাতা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"আম্মা! বিধাতা কি তোর রূপে রতিমাত্রও খুঁত রাখেন নাই? কি হইয়াছে? কাঁদিতেছিস কেন?"

অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিল না। বার বার তাহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সে বলিল,—"আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

"কি স্বপ্ন দেখিয়াছিস?" ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিল না। অবশেষে প্রদীপ নিবাইয়া সকলে শয়ন করিলেন। পুনরায় কিছুক্ষণ পরে বিনয়ের মাতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুনরায় তিনি দেখিলেন যে, অন্নপূর্ণা বসিয়া কাঁদিতেছে। বার বার জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে,—"আমি আবার স্বপ্ন দেখিয়াছি," কিন্তু কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সে কথা সে বলিল না।

পুনরায় সকলে শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাত্রিতে তিনবার ঐরূপে অন্নপূর্ণা স্বপ্ন দেখিল ও উঠিয়া কাঁদিল। কিন্তু কি স্বপ্ন সে দেখিল, ভগিনীকে তাহা বলিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে বিনয়ের মাতা রাত্রির বিবরণ সকলকে প্রদান করিলেন। বেলা প্রায় নয়টার সময় হড়-বৌ ও অন্নপূর্ণা এক ঘরে বসিয়া ছিল। অন্নপূর্ণার বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। হড়-বৌ অর্থাৎ বৃন্দাবনের স্ত্রী তাহা অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড়। সমবয়স্কা বলিলেও বলা যাইতে পারে। হড়-বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, আহা, কাল রাত্রিতে তুই কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলি, তাহা আমাকে বলিবিনি ভাই ?"

অন্নপূর্ণা কিছুতেই প্রথমে সম্মত হইল না। অবশেষে হড়-বৌ যখন বলিলেন,—"স্বপ্ন কাহারও সাক্ষাতে না বলিলে কি হয়, তা জানিস্ ? কুস্বপ্ন দেখিয়া লোকের সাক্ষাতে না বলিলে কুস্বপ্ন সত্য হইয়া যায়।"

অন্নপূর্ণার ভয় হইল। সে বলিল,—"তোমাকে আমি বলিতে পারি। কিন্তু তুমি কাহারও সাক্ষাতে বলিবে না বল !"

হড়-বৌ সেইরূপ অঙ্গীকার করিল। তখন অন্নপূর্ণা পূর্ব-রাত্রির স্বপ্নকথা তাহাকে বলিতে লাগিল।

"আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, আমি যেন মামার বাড়ী থাকি। আমার সত্যকার মামার বাড়ী নহে, স্বপ্নের মামার বাড়ী। মামা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন। সত্যকার মামা নহেন, স্বপ্নের মামা। আমার কাকা আসিয়া কিন্তু কোথা হইতে স্বপ্নের মামাকে বলিলেন,—'অন্নপূর্ণার বিবাহ তুমি অমুক স্থানে দিতে পারিবে না। তাহা করিলে আমাদের জাতি-কুল সব নষ্ট হইবে। আমি আর এক স্থানে সম্বন্ধ করিয়াছি। সেই স্থানে আমি তাহার বিবাহ দিব। এই কথা লইয়া মামা-কাকার ঝগড়া হইল। কাজি কাহাকে বলে, তা জানি না। বোধ হয়, সাহেব। কাকা গিয়া কাজির কাছে নালীশ করিলেন। কাজি বিচার করিয়া বলিলেন যে, এ বরের সহিতও বিবাহ হইবে না, ও বরের সহিতও বিবাহ হইবে না। কন্যাকে আমি নিজে নিকে করিব।—সাহেব আমাকে নিকা করিবে, এই কথা শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল ; আমার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল, আমার ঘুম ভাঙিগয়া গেল ; ঘুম ভাঙিগয়াও অনেকক্ষণ সব কথা সত্য বলিয়া বোধ হইল। আমি বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম !"

স্বপ্ন-কথা শুনিয়া হড়-বৌ হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ তো ! সাহেবের বিবি হইবি, তাহার জন্য আবার কান্না কি ? শুনিয়াছি, তুই তিনবার উঠিয়া কাঁদিয়াছিলি। দ্বিতীয়বার কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলি ?"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"আশ্চর্য্য কথা, ভাই, আমি পুনরায় সেই স্বপ্নের আরও খানিকটা দেখিলাম। কাজি যখন বলিল যে, কন্যাকে আমি নিজে বিবাহ করিব, তখন মামা ও খুড়ো দুই জনেরই ভয় হইল। খুড়ো যে স্থানে বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, দুই জনে পরামর্শ করিয়া আমাকে সেই বরের বাড়ীতে চুপি চুপি পাঠাইয়া দিলেন। আজকার মত রাত্রিতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘের কোলে চিক চিক করিয়া বিদ্যুৎ খেলিতেছে, সেই সময় তাঁহারা আমাকে ডুলি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ডুলিতে বসিয়া যখন নির্ভয় হইলাম, তখন মুখ পোড়া কাজির বিচার শুনিয়া আমি অল্প অল্প হাসিতে লাগিলাম। ক্রমে আমি সেই বরের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। কে জানে কেন, ভাই, কাল রাত্রিতে যখন এই বাড়ীতে আমরা আসিলাম, তখন আমার বোধ হইল, সে যেন এই বাড়ী। কিন্তু সে বাড়ীর ইট সব ছোট ছোট ছিল, আর ঘরে জানালা ছিল না বলিলেও হয়।

তাহার পর আমার বিবাহ হইল। অতিশয় ঝড় উঠিল। পুনরায় ভয়ে আমার ঘুম ভাঙিগয়া গেল। আমি বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।"

হড়-বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল ?"

"দিদি পুনরায় উঠিলেন। প্রদীপ জ্বালিলেন। কেন আমি কাঁদিতেছি, বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে কিছু বলিলাম না। তাহার পর পুনরায় আমরা সকলে শুইলাম। সেই স্বপ্ন পুনরায় আমি দেখিলাম। আমি একখানি লাল চেলি কাপড় পরিয়াছিলাম। তাহার উপর সাদা পাখী ছিল। বাসরঘর হইল। যে ঘরে কাল রাত্রিতে আমরা শুইয়াছিলাম, আমার যেন বোধ হয় যে, সেই ঘরে বাসর হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে ঘরে বড় বড় জানালা আছে, তখন দুইটি কেবল ছোট জানালা ছিল। সিঁড়ির দুই ধারে তক্তা ছিল। সেই তক্তা ফেলিয়া দিলেই সিঁড়ি বন্ধ হইয়া যায়। বাসর-ঘরে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া গান করিতে লাগিল। শিবের কি করিয়া বিবাহ হইয়াছিল, শিবের শাশুড়ী মেনকা কিরূপে বরণ করিয়াছিল, শিবের পাঁচ মাথায় একেবারে মালা দিবার নিমিত্ত দুর্গা কিরূপে দশ হাত বাহির করিলেন, এক জন মেয়ে সেই গীত গাহিয়াছিল। তাহার পর বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। মশালের আলোতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। ডাকাতদিগের হৈ-হৈ শব্দে কানে তালা লাগিতে লাগিল। ভয়ে আমি কাঁপিতে লাগিলাম। পুনরায় আমার ঘুম ভাঙিগয়া গেল।"

হড়-বৌ জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহার পর কি হইল ?"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল,—"দিদি পুনরায় উঠিলেন। আমাকে অনেক বকিতে লাগিলেন। পুনরায় আমরা সকলে শয়ন করিলাম। তাহার পর সকাল হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ভাই! কাল পথে যখন আমাদের গাড়ী ভাঙিগয়া গেল, হাঁটিয়া মাঠ পার হইতেছিলাম, তখন সেই মাঠের মাঝখানে আমরা ভয় পাইয়াছিলাম ; কা'ল ভূতে আমার এই স্বপ্নের কথা বলিয়াছিল। তাহার পর শেষ রাত্রিতে স্বপ্নেও যেন আমি সেই ছড়াটি শুনিতেছিলাম। সে ছড়াটি আমার মনে গাঁথিয়া গিয়াছে।"

এই কথা বলিয়া অন্নপূর্ণা জলার সেই ছড়া হড়-বৌকে শুনাইল। বলা বাহুল্য যে, হড়-বৌ তৎক্ষণাৎ সেই স্বপ্নের কথা সকলকে গিয়া বলিল। স্বপ্নের কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা লজ্জায় ঘরে লুকাইয়া রহিল।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বেলগাছে পাগল

সন্ধ্যা হইয়াছে। দোতালার একটি ঘরে অন্নপূর্ণা একাকী বসিয়া আছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বিনয় সেই ঘরে আসিয়া বলিল,—"কাল জলায় তোমরা কি দেখিয়াছিলে ? ভূতে না কি গান করিতেছিল ? গানটি হড় দিদিকে তুমি বলিয়াছ। আমাকে একবার বল না মাসী !"

অন্নপূর্ণা প্রথম কিছুতেই সম্মত হইল না। কিন্তু বিনয় তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। অন্নপূর্ণা বলিতে আরম্ভ করিল ;—

"টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে মেঘে ঝিকি মিকি।
ডুলির ভিতর ব'সে ক'নে হাসে ফিকি ফিকি ॥

অন্নপূর্ণা যেই এই কথা বলিয়াছে, আর বাহির হইতে কে বলিয়া উঠিল ;—

"কালো মেঘে ঝিকি মিকি।
সতী হাসে ফিকি ফিকি ॥

অন্নপূর্ণা চমকিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বিনয় বলিল,—"বাহিরে কে কি বলিতেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দুই জনে কান পাতিয়া রহিল। আর কোন সাড়া-শব্দ পাইল না। তখন অন্নপূর্ণা পুনরায় বলিল,—

"বিয়ের সম্বন্ধ মামা করে খুড়ো নয়কো রাজি।
হিঁদুর ঘরে বিয়ের মামলা বিচার করেন কাজি ॥"

পুনরায় বাহির হইতে সেই শব্দ আসিল,—

"কালো মেঘে ঝিকি মিকি।
সতী হাসে ফিকি ফিকি ॥"

নিকটে এক ঘরে রায় মহাশয় ছিলেন। জানালার ধারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলিলেন,—"কে ও? বেলগাছে কে ও?"

অন্নপূর্ণা ও বিনয় যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের ঠিক পার্শ্বে অতি নিকটে একটি বেলগাছ ছিল। সেই বেলগাছের উপর হইতে কে বলিল,—

"কালো মেঘে ঝিকি মিকি।
সতী হাসে ফিকি ফিকি ॥"

রায় মহাশয় বলিল,—"কি?"
বেলগাছ হইতে পুনরায় বলিল,—

"কালো মেঘে ঝিকি মিকি।
সতী হাসে ফিকি ফিকি ॥"

রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি বারেণ্ডায় আসিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলেন,—"বৃন্দাবন! হড় মহাশয়। নস্কর মহাশয়! শীঘ্র আপনারা বাহিরে যান। বেলগাছে কে উঠিয়াছে। উহাকে কিছু বলিবেন না, আস্তে আস্তে আমার কাছে লইয়া আসুন।"

পূজাবাড়ী। চারিদিকে অনেক লোক ছিল। বাটীর বাহিরে বেলগাছের দিকে সকলে দৌড়িল। রায় মহাশয় দোতালার জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বৃন্দাবন তাঁহাকে বলিল,—"কে এক জন বেলগাছে উঠিয়াছে; বোধ হয় পাগল! ঝিকি মিকি ফিকি ফিকি—কি সব আবল-তাবল বকিতেছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"আস্তে আস্তে উহাকে নামাইয়া আমার কাছে লইয়া আইস।"

নীচে মানুষের গোলমাল শুনিয়া অন্নপূর্ণার সাহস হইল। কি হইতেছে,

তাহা দেখিবার নিমিত্ত সেও আপনার ঘরের জানালা খুলিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। ঘরের আলো দ্বারা অন্নপূর্ণার মুখ আলোকিত হইল। বেলগাছে যে মানুষ উঠিয়াছিল, অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"ঐ সে! ঐ সে! ঐ সে! ঐ সে!"

এই কথা বলিয়া বেলগাছ হইতে সে নীচে পড়িয়া গেল। গাছ হইতে পড়িয়া একেবারে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া সকলে বাড়ীর ভিতর আনিল। রায় মহাশয় ততক্ষণ নীচে আসিয়া সকলকে বলিলেন,—"তোমরা গোল করিও না; এ আমার কনিষ্ঠ পুত্র হৃষীকেশ। ইহাকে উপরে আমার ঘরে লইয়া চল।"

হৃষীকেশকে সকলে উপরে লইয়া গেল। মুখে হাতে জল দিয়া বাতাস করিয়া সকলে তাঁহার চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। পৈতার সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র একখানি গোল আরসির ন্যায় তাহার বুকে কি ঝুলিতেছিল। পৈতা হইতে সেই বস্তু খুলিয়া বৃন্দাবন রায় মহাশয়ের হাতে ছিল। রায় মহাশয় আলোতে তাহা ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া নস্কর মহাশয়ের হাতে দিলেন। নস্কর মহাশয় একবার তাহা দেখিলেন, দুইবার দেখিলেন, চক্ষু মুছিয়া পুনরায় তাহা দেখিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—"আশ্চর্য্য কথা! এ যে আমার অন্নপূর্ণার ছবি।"

সকলে একে একে সেই ছবি দেখিলেন। সকলেই ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হৃষীকেশ অন্নপূর্ণাকে কখন দেখে নাই; অন্নপূর্ণার ছবি কেহ কখন তুলে নাই; তবে এ ছবি কোথা হইতে আসিল!

ক্রমে হৃষীকেশের জ্ঞান হইল। চক্ষু চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"কৈ, সে কৈ? আজি এক বৎসর দেশে দেশে যাহার আমি অন্বেষণ করিতেছি, সে কৈ?"

কিছুক্ষণের জন্য রায় মহাশয় ও নস্কর মহাশয় দুই জনে চুপি চুপি কি কথা হইল। নস্কর মহাশয় ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি অন্নপূর্ণাকে লইয়া আসিলেন। লজ্জায় অধোবদন হইয়া অন্নপূর্ণা হৃষীকেশের সম্মুখে দাঁড়াইল।

হৃষীকেশ বলিলেন,—"সেই মুখ, সেই ফুল, সেই রূপ, ময়ূর আঁকা সেই লাল কাপড়, হাতে সেই রাঙ্গা কড়!"

কাপড়খানি সেকেলে ধরণের চেলি। রায় মহাশয় সেই দিন অন্নপূর্ণাকে দিয়াছিলেন।

হৃষীকেশ ক্রমে সুস্থ হইলেন। পুরুষগণ ঘর হইতে চলিয়া গেলে, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন। ছবি তুলিতে গিয়া কিরূপে অন্নপূর্ণার ছবি উঠিয়াছিল, পথের চাকার উপর কিরূপে পেতনী উঠিয়াছিল, কিরূপে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া দেশে দেশে তিনি অন্নপূর্ণাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার মুখে,—"কালো মেঘে ঝিকি মিকি,—সতী হাসে ফিকি ফিকি," এই কথা ভিন্ন অন্য কথা ছিল না, সেই সমুদয় পরিচয় তিনি বিনয়ের মাতা ও আর সকলকে দিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—"আমি ঠিক পাগল হই নাই, আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু অন্য কথা আমি বলিতে পারিতাম না; অন্য কথা বলিতে গেলেই ঐ কথাটি আপনা আপনি আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কিছুতেই আমি তাহা নিবারণ করিতে পারিতাম না। অন্নপূর্ণার ছবি সর্বদাই আমার বুকের উপর রাখিতাম। পাছে সেই ছবিটি আমি হারাই বা কেহ কাড়িয়া লয়, সেই ভয়ে আমি সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতাম। বৌ-দিদি! আমি যদি জানিতাম যে, অন্নপূর্ণা তোমার ভগিনী, তাহা হইলে আমাকে দেশে দেশে বেড়াইতে

হইত না। তাহার জন্য কত যে আমি কষ্ট পাইয়াছি, সে কথা তোমাদিগকে আর কি বলিব ?"

সপ্তম অধ্যায় ঃ পূর্বকথা

রায় মহাশয়, হড় মহাশয় ও নস্কর মহাশয় অন্য ঘরে গিয়া বসিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন,—"বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা। বাবার মুখে আমি আমার এক পূর্ব-পুরুষের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। সেই সমুদায় কথা আজ আমার মনে পড়িয়া গেল। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা কখন দেখি নাই—শুনি নাই ; গল্পের পুস্তকেও পাঠ করি নাই ! আমার প্রপিতামহের এক ভ্রাতার নাম হৃষীকেশ ছিল। যখন আমি পুত্রের সেই নাম রাখি, তখন সে কথা আমি একেবারেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। কেন যে পুত্রের নাম আমি হৃষীকেশ রাখিয়াছিলাম, সে কথা আমি বলিতে পারি না। আর তুমি নস্কর, কন্যার নাম কেন অন্নপূর্ণা রাখিয়াছিলে, তাহাও বোধ হয় বলিতে পার না।"

নস্কর মহাশয় স্বীকার করিলেন যে, তিনি তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। রায় মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"আমার প্রপিতামহের ভ্রাতা যে হৃষীকেশ ছিলেন, তাঁহার সহিত অন্নপূর্ণা নামে এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল ; বিবাহ অদ্ভুতভাবে হইয়াছিল ; তাহার পর সেই বিবাহের রাত্রিতে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। সে ঘটনার কথা বাবার মুখে আমি এইরূপ শুনিয়াছিলাম। হুগলীতে এক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাহার ঘরে পিতামাতাহীন অবিবাহিতা অন্নপূর্ণা-নাম্নী এক ভাগিনেয়ী থাকিত। কন্যা উচ্চকুলোদ্ভবা। মাতুল কন্যাকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। কন্যার খুড়া সেই সমাচার পাইয়া মাতুলের নিকট আসিয়া আপত্তি করেন। আমার প্রপিতামহের ভ্রাতা, হৃষীকেশের সহিত তিনি সেই কন্যার সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। খুড়া ও মাতুল দুই জনের এই কন্যা লইয়া ঘোরতর বিবাদ হয়। হুগলী তখন মুসলমানদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। খুড়া গিয়া কাজির নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। কন্যা অতি রূপবতী ছিল। কাজি কন্যাকে দেখিলেন, উভয় পক্ষের বাদানুবাদও শুনিলেন। অবশেষে তিনি এই মীমাংসা করিলেন,—"খুড়ার বরের সহিত এ কন্যার বিবাহ হইবে না, মাতুলের বরের সহিতও হইবে না। এ কন্যাকে আমি নিজে বিবাহ করিব।" মাতুল ও খুড়া দুই জনেই বিপদে পড়িলেন ; দুই জনেরই জাতি যাইতে বসিল। তখন পরস্পরে বিবাদ ভুলিয়া কিসে এ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার প্রপিতামহ ক্ষমতাবান লোক ছিলেন। অবশেষে কন্যা তাঁহার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত দুই জনে স্থির করিলেন, অন্ধকার রাত্রি, যখন ঘনঘটায় আকাশ আচ্ছাদিত হইয়াছিল, যখন সেই কাল মেঘের কোলে বিজলী চিক চিক করিতেছিল, যখন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, সেই সময় তাঁহারা চুপি চুপি ডুলি করিয়া কন্যা লইয়া পলায়ন করিলেন ও যথাসময়ে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধান করিয়া কাজি তাহা জানিতে পারিল ; প্রকাশ্যভাবে বলপূর্বক আমাদের বাটী হইতে কন্যা লইয়া যাইতে কিন্তু সে সাহস করিল না। হুগলীতে সেই সময় হাঁসাই নামে এক জন থানাদার ছিল। আমাদের বাড়ী লুণ্ঠন ও কন্যাহরণ করিবার নিমিত্ত কাজি থানাদারের সহিত পরামর্শ করিল। কিছু দিন পরে কন্যার সহিত হৃষীকেশের বিবাহ হইল। কন্যার কপাল বড় মন্দ। শুনিয়াছি যে, ছাদনাতলায় যখন স্ত্রী-আচার হইতেছিল, সেই সময় ভয়ানক ঝড়

হইয়াছিল। তাহার পর যখন বাসর-ঘরে মেয়েরা বর-কন্যা লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছিল, সেই সময় আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। যশোদা নামে এক গোয়ালিনী এই পাড়ায় থাকিত। ডাকাতদিগকে সে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। আমাদের দোতলা কোটা-বাড়ী ছিল। সে কালের সেই ছোট ছোট ইটের গাঁথুনি ছিল। উপরে উঠিবার জন্য চাপা সিঁড়ি ছিল। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ সেই চাপা সিঁড়ি বন্ধ করিয়া মেয়েদের ছাদের উপর ইট ছুড়িতে বলিলেন। তাহার পর আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ, আমার প্রপিতামহ ও তাঁহার ভ্রাতা হৃষীকেশ ও বিবাহে নিমন্ত্রিত কয়েক ব্যক্তি ডাকাতদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাঁহারা দস্যুদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। দস্যুগণ কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল ও বাড়ীর লোকদিগকে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, ডাকাতের দল কাজি ও থানাদার কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল। বর হৃষীকেশের উপর কাজির রাগ ছিল। ডাকাতগণ হৃষীকেশকে একেবারে মারিয়া ফেলিল; ইতিমধ্যে গ্রামের লোক আসিয়া বাহিরে ডাকাতদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক গ্রামবাসী একত্র হইয়াছে দেখিয়া, ডাকাতগণ ভয়ে পলায়ন করিল। কাজির মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। কন্যা অন্নপূর্ণাকে হরণ করিবার অবসর তাহারা পাইল না। কিন্তু বিবাহের রাত্রেই অন্নপূর্ণা বিধবা হইলেন। তাঁহার তখন বয়স কেবল চতুর্দ্দশ বৎসর। সেই বালিকা কন্যা পরদিন সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। ময়ূর-অঙ্কিত লাল চেলী—যেরূপ চেলী কাল আমি তোমার কন্যাকে দিয়াছি,—সেইরূপ চেলী পরিধান করিয়া স্বামীর মস্তক আপনার কোলে লইয়া সতী চিতার উপর বসিলেন। চিতায় বসিয়া আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহকে তিনি বলিলেন,—'বাবা! কাঁদিও না। যিনি আমার স্বামী হইয়াছেন, ইনি পুনরায় তোমার ঘরে জন্মগ্রহণ করিবেন, আর আমি পুনরায় তাঁহার পত্নী হইব। সেবার এরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবে না। সেবার সুখস্বচ্ছন্দে আমরা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিব।' এই বলিয়া সতী স্বর্গে গমন করিলেন। যশোদা গোয়ালিনী মনের খেদে কিছু দিন পরে জলার মাঝখানে এক গাছে গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল। প্রবাদ আছে যে, সে সেই অবধি ভূত হইয়া আছে; হৃষীকেশ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। আড়াই বৎসর পূর্বে মুসলমানেরা যখন তাহাকে বাটী লইয়া আসিল, তখন সে বীজ বীজ করিয়া কেবল বলিতেছিল,—'কালো মেঘে ঝিকিমিকি, সতী হাসে ফিকি ফিকি।' আজ সন্ধ্যেবেলা বেলগাছে উঠিয়া সে সেই কথা বলিতেছিল। তাহাতেই আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। ফল কথা, আমার প্রপিতামহের ভ্রাতা এ সেই হৃষীকেশ, আর নস্কর!—তোমার এই কন্যাও সেই অন্নপূর্ণা!"

রায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া হড় ও নস্কর মহাশয় ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, কিছুক্ষণ পূর্বে অন্নপূর্ণার সহিত হৃষীকেশের বিবাহ দিতে নস্কর মহাশয় সম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পূর্ব-ইতিহাস শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। বহুকাল হইতে অন্নপূর্ণাকে যে হৃষীকেশের পত্নীরূপে বিধাতা নিয়োজিত করিয়াছেন, নস্কর মহাশয় এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলেন।

তাহার পর রায় মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"বিনয়কে আমি ঘরে আনিয়াছি। বিনয়ের মাতাকেও আনিয়াছি। হৃষীকেশকে পুনরায় আমি পাইলাম। অন্নপূর্ণার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। এ সমুদয় কারণে হড় মহাশয় আপনি দুঃখ করিবেন না। আপনার জন্য আমি স্বতন্ত্র একখানি বাড়ী করিয়া দিব। যত বিঘা নিষ্কর

ব্রহ্মোত্তর ভূমি দিলে আপনার সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়, তত বিঘা ভূমি আমি কিনিয়া দিব। আপনার গৃহিণী ও পুত্রবধূর সাধ মিটাইয়া আমি অলঙ্কার দিব। আর কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত বৃন্দাবনকে আমি একটি সুন্দর ঘোড়া কিনিয়া দিব। কেমন ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন ত ?"

রায় মহাশয় তাঁহার জামাতা ছিলেন। সে নিমিত্ত হড় মহাশয় তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"নস্কর! তোমার পুত্র নাই, কেবল এই দুইটি কন্যা। দুইটি কন্যাকে আমি লইলাম। তুমি ও তোমার গৃহিণী চিরকাল আমার ঘরে থাকিবে। আর কোন ভয় নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, জিব কাটিয়া ফেলিব সেও স্বীকার, তথাপি আর কাহারও মনে অণুমাত্র দুঃখ দিব না।"

নস্কর মহাশয় বৈবাহিকের সহিত আনন্দে "সেকহ্যাণ্ড" করিলেন।

সেবার রায় মহাশয়ের বাড়ীতে অতি ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব হইল। অনেক লোককে তিনি কাপড় দিলেন ও অনেক ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীকে তিনি ভোজন করাইলেন। নানারূপ নৃত্য-গীত দর্শন ও শ্রবণে সহস্র সহস্র লোক আনন্দ লাভ করিল।

পূজার পর যখন বিবাহের কাল পুনরায় উপস্থিত হইল, তখন শুভদিনে ও শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে অতি সমারোহে অন্নপূর্ণার সহিত হৃষীকেশের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। নস্কর মহাশয়, হড় মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন।

বিবাহের কিছু দিন পরে এক দিন হৃষীকেশ বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা! আজ সন্ধ্যাবেলা চল, সেই জলাতে যাই। যশোদা গোয়ালিনী এখনও ভূত হইয়া আছে কি না, চল গিয়া দেখি। তোমার ভয় করিবে না তো ?"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন,—"তোমার সহিত যাইব, তাহাতে আর ভয় কি ? দেখ, যে দিন তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া বিবাহের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সে দিন স্বপ্নে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার পূর্বে বাপের বাড়ী থাকিতে তোমাকে আমি অনেকবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। বেলগাছে তুমি পাতার ভিতর ছিলে, আর তখন অন্ধকার হইয়াছিল, তা না হইলে তোমাকেও আমি চিনিতে পারিতাম। তোমার সঙ্গে বাঘের মুখে যাইতেও আমার ভয় হয় না।"

সন্ধ্যার পর দুই জনে চুপি চুপি জলায় গমন করিলেন। জলার মাঝখানে গিয়া পথের উপর দাঁড়াইলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল ; দুই দিকেই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন। সহসা আকাশ কালো মেঘে আচ্ছাদিত হইল। মেঘের কোলে চিকিমিকি বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আকাশ হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই সময় অল্পদূরে তাঁহাদের সম্মুখে জলার ভিতর হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল বাষ্প উত্থিত হইতে লাগিল। সেই বাষ্প ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অগ্নিশিখা সদৃশ উজ্জ্বল স্ত্রী আকারে পরিণত হইল। সেই স্ত্রীমূর্ত্তি একবার দক্ষিণদিকে একবার বামদিকে দুলিতে লাগিল। দুলিতে দুলিতে সুর করিয়া সে বলিতে লাগিল,—

"পতি সঙ্গে আকাশেতে সতী থাকে সুখে।
যশোদা পেতিনী হেথা থাকে মনোদুখে ॥
যশোদার দুঃখ দেখি সতী দুখ পায়।
পতি সঙ্গে সতী পুন আইল ধরায় ॥

যশোদা আঁকিল ছবি কলের ভিতর।
কন্যা অন্বেষিতে বর গেল দেশান্তর ॥
গাছে বর ঘরে কন্যা করে শুভদৃষ্টি।
কালো মেঘ থেকে পড়ে টিপি টিপি বৃষ্টি ॥
মেঘের কোলে চক্‌চকাতি করে ঝিকিমিকি।
বরের হাত ধ'রে ক'নে হাসে ফিকিফিকি ॥
যশোদার পাপমুখে সতীর কৃপায়।
ড্যাং-ড্যাঙাতে ড্যাং-ড্যাঙাতে স্বর্গে চলে যায় ॥'

এই কথা বলিতে বলিতে সেই উজ্জ্বল স্ত্রীমূর্ত্তি ক্রমে আকাশে উঠিতে লাগিল। এ দিকে যেমন তাহার কথাও শেষ হইল, আর ও দিকে সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি মেঘের সহিত মিলিয়া গেল। আশ্চর্য্য হইয়া হৃষীকেশ ও আম্মা আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা কিছু দেখিতে পাইলেন না।

অবশেষে হৃষীকেশ বলিলেন,—"কি অদ্ভুত ব্যাপার!"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"বড়ই অদ্ভুত! কি অন্ধকার! চল আমরা বাড়ী যাই, এখানে দাঁড়াইয়া আর ভিজিবার আবশ্যক নাই।"

পথে যাইতে যাইতে হৃষীকেশ বলিলেন,—"তোমার ছবি লইয়া তোমার অন্বেষণে যখন আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি, তখন কোন স্থানে এক মহাত্মার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নানা বিষয়ে তিনি আমাকে উপদেশ প্রদান করেন। ভগবান অতি নির্দ্দয়; মায়াতে ভুলাইয়া অগণিত জীবকে নানারূপ ক্লেশ প্রদান করিতেছেন;—এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। আমার সন্দেহ-ভঞ্জনের নিমিত্ত কিছুক্ষণের জন্য তিনি আমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি দেখিলাম যে, ভগবান প্রকৃতই কৃপাসিন্ধু। তাঁহার সেই দয়ার অণুমাত্র লাভ করিয়া দাতা দীনের দুঃখ দূর করেন। পিতা-মাতা পুত্র-কন্যাকে স্নেহ-মমতা করেন, পতি পত্নীকে ও পত্নী পতিকে ভালবাসেন। আমাদিগের বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদের মনে ভালবাসা প্রদান করেন নাই। এই জগৎ অনন্ত সমুদ্রকূলে বালুকারাশির তুলনায় সামান্য একটি বালুকা কণা যেরূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী সেইরূপ। আমি দেখিলাম যে, আমাদের প্রকৃত বাসস্থান এখানে নহে।

আমাদের প্রকৃত বাসভূমি অন্যস্থানে। সে স্থানে শোক নাই, তাপ নাই। যাহাদিগকে আমরা এখানে ভালবাসি, সে স্থানে পুনরায় তাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। শিক্ষার নিমিত্ত জীব মাঝে মাঝে জড়শরীর ধারণ করিয়া, পৃথিবীর ন্যায় স্থানে জন্মগ্রহণ করে। আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলের নিমিত্ত, পরের উপকারের নিমিত্ত, অথবা জগতের হিতের নিমিত্তও মাঝে মাঝে লোক জড়জগতে পুনরাগমন করে। যশোদা গোয়ালিনী পেতনী হইয়াছিল। এইমাত্র সে নিজে বলিল যে, আমাদের পুনরাগমনে সে নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। অন্নপূর্ণা! সত্য এবং পরোপকার ইহা অপেক্ষা ধর্ম নাই।"

এক ঠ্যাঙা ছক্কু

প্রথম অধ্যায়

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছক্কু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল॥

কিনু বাবু ছোট একটি চালাঘর করিয়াছেন। তাহার নাম যোগ-মন্দির। বন্ধুবান্ধব লইয়া সেই ঘরে তিনি গাঁজার ধূম পান করেন। পাল-পার্বণে আমোদটা কিছু অধিক মাত্রায় হয়। আজ মহাষ্টমী, দুই বোতল মদ আসিয়াছে। আমোদ করিবার নিমিত্ত বদন ও নবদ্বীপ কিনুর বাড়ীতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বে ঠক্ করিয়া ছক্কুও সেই স্থানে চলিয়াছেন।

ছক্কুকে দেখিয়া পাড়ার ছেলেদের আনন্দ হইল। হাততালি দিয়া দূর হইতে তাহারা বলিতে লাগিল;—

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছক্কু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল॥

ছক্কু ক্ষেপিয়া উঠিলেন। প্রথমে তিনি অনেক গালি দিলেন। তাহার পর ঢিল ছুড়িয়া বালকদিগকে মারিতে লাগিলেন। বালকেরা আরও একটু দূরে গিয়া বলিতে লাগিল—

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছক্কু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল॥

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ছক্কু যোগ-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "শালারা—গরুখেকোর—বেটারা!" এইরূপ গালি দিয়া মনের আগুন তিনি নিবাইতে লাগিলেন।

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে ভাই?"

ছক্কু উত্তর করিলেন,—"ঐ ছোঁড়ারা! শালারা।"

বদন বলিলেন,—"এক গেলাস মাল টানিলে এখনি রাগ ভাল হইয়া যাইবে।"

সন্ধ্যা হইল। তিন ছিলিম গাঁজায় ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার পর আসল জিনিসটি আরম্ভ হইল। মন একটু সুস্থ হইলে, ছক্কু বলিলেন,—"এই মহাষ্টমীর দিন একটু মদ না খাইলে হিঁদুয়ানী বজায় থাকে না।"

কিনু বলিলেন,—"সুরা অতি পবিত্র সামগ্রী, দ্রবীভূত তারা।"

নবদ্বীপ বলিলেন,—"মা এই তিন দিন মর্ত্যে আসিয়াছেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া লোকের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের আরাধনাই ঠিক। গাঁজা উৎসর্গ করিয়া শিবকে ও সুরা দিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিলাম। আমরা প্রসাদ পাইলাম।"

বদন বলিলেন,—"ভালরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সাক্ষাৎ হইয়া মা পূজা গ্রহণ করেন। মন্ত্রের এমনি গুণ।"

ছকু বলিলেন,—"মন্ত্রের গুণ! ও কথা আর বলিও না ভাই! কেবল দেবীর প্রতিমা নহে, মন্ত্রবলে দেবীর বাহন সিংহ ও মহিষাসুর পর্য্যন্ত সজীব হইয়াছিল। কলিকাতায় আমার শ্বশুর চক্রধর রায়ের বাটীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই হিঁড়িকেই আমার পা কাটা গিয়াছে।"

বদন বলিলেন,—"তুমি না যকের টাকা পাইয়াছিলে? সেই জন্য তোমার না পা কাটা গিয়াছে? মহিষাসুর কি করিয়াছিল?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"সে ভাই অনেক কথা। বলিলে বিশ্বাস করিবে না।"

নবদ্বীপ বলিলেন,—"মহাষ্টমীর রাত্রি। মা পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। অগণিত ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। অদ্ভুত গল্প শুনিবার সময় ঠিক এই।"

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাধবের অপমান

গল্পটি বলিতে কিনুও অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ সাধ্য সাধনার পর ছকু বলিতে আরম্ভ করিলেন। ছকু বলিলেন,—"চক্রধর রায় মহাশয়ের কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় টাকা ধার দিয়া কখন এক পয়সা সুদ না ছাড়িয়া, লোকের বাড়ী বাঁধা রাখিয়া, তাহার পর তাহাদের ভদ্রাসন বেচিয়া ধনবান হইয়াছিলেন। রাঘব হালদার নামে এক জন বড় মানুষের ছেলে বদখেয়ালীতে সমুদয় বিষয় নষ্ট করিয়া রায় মহাশয়ের নিকট আপনার বাড়ী বাঁধা রাখিয়াছিল। তাহার পর সে জাল জুয়াচুরী আরম্ভ করিল। কাবুলী চাকর রাখিয়া তাহাদের দ্বারা সে ডাকাইতি করাইত। অবশেষে জাল করার অপরাধে তাহার দ্বীপান্তর হইল। আমার শ্বশুর মহাশয় তাহার বাড়ী অতি অল্প মূল্যে কিনিয়া লইলেন। কলিকাতা সহরের উত্তর ধারে বৃহৎ বাড়ী, অনেক জমি, চারি দিকে বাগান, প্রাচীর দিয়া ঘেরা। আমি সেই শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতাম।

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পত্নীবিয়োগ হইলেও?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই, পত্নীবিয়োগ হইলেও কিছু দিন আমি সে স্থানে ছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সে এক প্রকার নরক ভোগ হইয়াছিল। শ্বশুরের রাগে আর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর গঞ্জনায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়াছিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী পরম রূপবতী ছিলেন।"

নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার স্ত্রী, তাঁর কি প্রকার রূপ ছিল?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কেমন গর্ভে জন্ম। রং কিন্তু একটু কাল ছিল। চক্‌চকে কাল, বার্ণিস জুতার মত, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে মনে হইত যেন কাল বিজলী খেলিয়া গেল।"

বদন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর?"

ছকু বলিলেন,—"আমার শ্বশুরদের পাড়ায় মাধব নামে এক জন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নানা বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। বিলাতী ধরণে তিনি ভূত নামাইতে পারিতেন, গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ ভাল করিতেন। আর সেই বিলাতী ভেলকী—যাহাকে হিপনটিশ্যাম বলে, তাহাও তিনি জানিতেন।"

নবদ্বীপ একটু ইংরাজী জানিতেন। তিনি বলিলেন, হিপনটিসম (hypnotism) বলে। তাহার পর?"

ছকু বলিলেন,—"আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে একঘ'রে করিলেন। কিন্তু

কলিকাতায় কে কাহাকে একঘ'রে করিতে পারে? অনেকে তাঁহার পক্ষ হইল। আমার শ্বশুরের আরও রাগ হইল। কিসে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, সর্বদা সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের প্রিয় পাত্র হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিলাম। শ্বশুর প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করেন। অনেককে নিমন্ত্রণ করেন। সকলের কান মলিয়া প্রণামী আদায় করেন। পূজা করিয়া বিলক্ষণ দু'পয়সা তিনি উপার্জন করিতেন। যে যেমন প্রণামী দিত, তাহার সেইরূপ আদর হইত। এক টাকার কম প্রণামী দিলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে তিনি একটি নারিকেল নাড়ুও দিতেন না। শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া পূজার সময় মাধবকে আমি নিমন্ত্রণ করিলাম। মাধব দুই টাকা প্রণামী দিলেন। পাড়ার অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাকে ভোজনে বসাইলাম। এমন সময় সেই স্থানে শ্বশুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণদের সম্মুখে একটু দূরে থপ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর মাধবের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"ও কে? ও যে বড় ব্রাহ্মণদের সহিত বসিয়াছে! ওর জাত গিয়াছে! তুমি এখনি উঠিয়া যাও।"

মাধব বলিলেন,—"তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?"

কান খুঁটিতে খুঁটিতে শ্বশুর বলিলেন,—"কি বলিলে?"

মাধব পুনরায় বলিলেন,—"তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?"

শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাকে কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে?"

মাধব উত্তর করিলেন,—"আপনার জামাতা।"

শ্বশুর বলিলেন,—"মাথা নাই তার আবার মাথাব্যথা। আমার কন্যা কোথায় যে আমার জামাতা! এখনি উঠিয়া যাও, নতুবা গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইব!"

আর কোন কথা না বলিয়া মাধব উঠিয়া গেলেন। দুই চারি জন ব্যতীত তাঁহার সহিত প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেল। যাইবার সময় মাধব বলিয়া গেলেন,—"যদি বিদ্যাবল থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আপনি ইহার প্রতিফল পাইবেন।"

তৃতীয় অধ্যায় : সর্বাঙ্গসুন্দরী

মাধবকে অপমান করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের ঘোরতর আনন্দ হইল। বাড়ীর ভিতর গিয়া বিছানায় বসিয়া তিনি ডুকুরে ডুকুরে হাসিতে লাগিলেন।

নীচের একটি ঘরে আমি বাস করিতাম। আমিও আমার ঘরে গিয়া ক্রমাগত হাসিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্বে একবার হাসিতে হাসিতে আমার ঘাড়টি খটট্ করিয়া উঠিল। আর সেই সঙ্গে আমার মাথা হালকি হইয়া গেল, যেন শিক শোলার মত বোধ হইতে লাগিল। হাসিবার নিমিত্ত মুখ যে হাঁ করিয়াছিলাম, সেইরূপ হাঁ রহিয়া গেল। মুখ বুজিতে পারিলাম না। কথা কহিতে পারিলাম না। শুনিয়াছিলাম যে, হাই তুলিতে গিয়া অনেকের চলের হাড় নড়িয়া এইরূপ হয়। আমি মনে করিলাম যে, আমারও তাহাই হইল।

"ছকু! ছকু কোথায়? এখনও তুমি ঘরের ভিতর। সখের যাত্রা হইবে তাহার সব যোগাড় কর।" এই কথা বলিতে বলিতে শ্বশুর মহাশয় আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার মুখের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াই তিনি ঘোরতর ভীত হইলেন। ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি সাহসী পুরুষ ছিলেন। পলাইলেন না। পুনর্বার আমার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সর্বনাশ! এ কি হইয়াছে! তোমার নিজের মুখ কোথায় গেল। সর্বাঙ্গসুন্দরীর মাথা তোমার ঘাড়ের উপর কি করিয়া আসিল?"

সর্বাঙ্গসুন্দরী আমার পরলোকগতা স্ত্রীর নাম ছিল। আমার নিজের মুণ্ড আমার স্কন্ধে নাই। সে স্থানে তাহার মুণ্ড বসিয়াছে। হাসিতে হাসিতে ঘাড় কেন যে খুটে করিয়াছিল, এখন তাহার কারণ বুঝিলাম। মুখ আমার হাঁ হইয়া ছিল। আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না। উত্তর না পাইয়া, শ্বশুর মহাশয় সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাড়ীর ভিতর গিয়া তিনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আনিলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণীও আমার ঘাড়ের উপর তাঁহার কন্যার মুখ দেখিয়া প্রথম ভয়ে ব্যাকুলিতা হইলেন ও সে স্থান হইতে পলাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু রায় মহাশয় তাঁহার হাত ধরিয়া রাখিলেন, যাইতে দিলেন না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহার পর আমার দ্বারের নিকট মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। কন্যার শোক এখন তাঁহার উথলিয়া পড়িল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"ওগো মাগো! যদি ভূত হইয়া দেখা দিলি, তো সর্বশরীরে দেখা দিলি না কেন? পরের ধড়ের উপর নিজের মুণ্ড বসাইলি কেন। ওগো মা গো! তুই আমার যে বড় সাধের মেয়ে ছিলি। তোর যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। সেই জন্য আমরা যে তোর সর্বাঙ্গসুন্দরী নাম রাখিয়াছিলাম।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী একটু চুপ করিলে, শ্বশুর মহাশয় আমাকে বলিলেন,—"তোমাকে এ অবস্থায় দেখিলে ভয়ে লোক সব পলাইয়া যাইবে। সন্ধ্যার পর অনেকে নিমন্ত্রণে আসিবে। তাহাদের প্রণামী তাহা হইলে আমি পাইব না। যাত্রাও তাহা হইলে হইবে না। অতএব তুমি আজ রাত্রিতে এই ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাক। কাল প্রাতঃকালে রোজা আনাইয়া তোমার ঝাড়ান কাড়ান করাইব। যাহাতে এ মুখ গিয়া পুনরায় তোমার নিজের মুখ হয়, সে চেষ্টা করিব।"

আমি হাঁ বুজিতে পারিলাম না। কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। শাশুড়ীর হাত ধরিয়া শ্বশুর মহাশয় চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে, আরসিখানি লইয়া আমি মুখ দেখিলাম। আশ্চর্য্য কথা! আমার কাঁধের উপর আমার নিজের মস্তক নাই। আমার মৃত স্ত্রীর মস্তক রহিয়াছে। আহা! সেই রং, সেই দাঁত, সেই মধুর হাসি, সেই মুখশ্রী, আমার মুণ্ডের পরিবর্তে তাহার মুণ্ড আমার স্কন্ধে বসিয়াছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধি আমার নিজের ছিল। বলা বাহুল্য যে, আমার ঘোরতর ভাবনা হইল। এই মুণ্ড যদি আমার কাঁধে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আমার দশা যে কি হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।"

কিনু বলিলেন,—"ঘোর বিপদের কথা বটে। তাহার পর?"

চতুর্থ অধ্যায় : দুরন্ত মহিষাসুর

ছকু বলিলেন,—"ছোট ঘরটিতে মনের দুঃখে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর আরতি হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের প্রণামীর টাকা ঝমাৎ ঝমাৎ শব্দে পড়িতে লাগিল। আরও অধিক রাত্রি হইল। সখের যাত্রা আরম্ভ হইল। বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইল। যাত্রাদলের বালকেরা কেহ ছোঁড়া, কেহ ছুঁড়ী সাজিয়া কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া চিল চেঁচাইতে লাগিল। এমন সময় সহসা দালানে প্রতিমাখানি দুলিতে লাগিল। গান বন্ধ হইয়া গেল। যত লোক শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। কার্তিকের ময়ূর ভয়ঙ্কর ক্যাঁ ক্যাঁ রবে বাড়ী যেন ফাটাইয়া দিল। সহসা দেবীর সিংহ বজ্রনিনাদের ন্যায় গর্জন করিয়া অসুরকে ছাড়িয়া দূরে

গিয়া বসিল। যে বল্লম দ্বারা অসুরকে মা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, এখন তিনি সেই বল্লমটি তুলিয়া লইলেন। অসুর উঠিয়া দাঁড়াইল। আসল মহিষাসুর! হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ-বিশিষ্ট ভয়াবহ অরণ্যবাসী অর্ণা।

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিপরীত বক্রাকার শৃঙ্গ পাতিয়া মহিষ গা ঝাড়া দিল। তাহার পর শিং পাতিয়া ভীষণ গর্জন করিতে করিতে লোকদিগকে তাড়া করিল। শিঙে তুলিয়া আমার শ্বশুরকে দূরে একটি তাকিয়ার উপর ফেলিয়া দিল। অজ্ঞান হইয়া শ্বশুর মহাশয় সেই তাকিয়ার উপর পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর লাফ দিয়া উঠানে যাত্রাদলের মাঝখানে গিয়া পড়িল। সম্মুখের খুর দিয়া সব বিছানা দূরে নিক্ষেপ করিল। খুর দিয়া প্রাঙ্গণের মাটী খুঁড়িতে লাগিল, তাহার পর শিং পাতিয়া মাথা নীচে করিয়া দুরন্ত মহিষ একবার এ দিকে একবার ও দিকে লোক সকলকে তাড়া করিতে লাগিল। বাপ রে মা রে চীৎকার করিয়া লোক সব পরস্পরের ঘাড়ে গিয়া পড়িতে লাগিল। কাহারও মাথায় ভয়ানক চোট লাগিল। যাত্রাদলের ছেলেদের কান্নায় বাড়ী পরিপূরিত হইল। দোতলার উপর বারাণ্ডায় বসিয়া স্ত্রীলোকেরা যাত্রা শুনিতেছিল। 'মা গো, কি হইল গো' বলিয়া তাহারা কাঁদিয়া উঠিল। কচি ছেলেরা সব চ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া বাড়ী ফাটাইয়া দিল। দেবীর পাদপদ্মের নিকট সিংহ বসিয়া ভীষণ মেঘগর্জনের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল। কার্তিককে পৃষ্ঠে করিয়া মাথা তুলিয়া ময়ূর পুনরায় ক্যাঁ ক্যাঁ করিতে লাগিল। মহিষ গাঁ গাঁ শব্দ করিয়া একটা ঢাকের ভিতর শিং প্রবিষ্ট করিয়া দিল। তাহার পর মাথা তুলিয়া ঢাকটি দশ হাত দূরে ফেলিয়া দিল। পুনরায় শিং পাতিয়া মাথা নীচে করিয়া একবার এ দিক একবার ও দিক প্রবলবেগে দৌড়িতে লাগিল। তখন তাহার খুরের দড় দড় শব্দে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিয়াছিলাম, আজ আমার শ্বশুরবাড়ীতে সেই দক্ষযজ্ঞ হইতে লাগিল। শৃঙ্গে তুলিয়া মহিষ শত শত লোককে দূরে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কাহারও সে প্রাণবধ করিল না। লোক সব রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। বাদ্যকরদিগের ঢাক ঢোল, যাত্রাওয়ালাদিগের বিলাতি যন্ত্র ভাঙিগয়া চুরিয়া একাকার করিয়া দিল। দোল-মঞ্চে ঝড় লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, সে সব ভাঙিগয়া চুরমার করিয়া ফেলিল।

বাহিরে ভয়ানক কোলাহল হইতেছে। ঘরের ভিতর একাকী আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। ব্যাপারখানা কি জানিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলাম। মহিষের ভয়ে কতক লোক আশে পাশে লুকাইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া "বাপ রে! আবার রাক্ষস আসিয়াছে!" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সকলে পলায়ন করিল। মহিষ আমাকে তাড়া করিল। ভয়ে আমি ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বাটী নীরব হইল। আস্তে আস্তে আমি দ্বার খুলিয়া উঁকি মারিলাম। মহিষ নাই, বাটীতে জনপ্রাণী নাই। আরও আগে গিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের ঝাড় লণ্ঠন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। ভগ্ন ঢাক ঢোল ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র পড়িয়া আছে। দালানের প্রতিমার নিকট লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। মায়ের প্রতিমা পূর্বে যেরূপ ছিল—এখনও ঠিক সেইরূপ ছিল। শ্বশুর মহাশয় তখনও তাকিয়ার উপর পড়িয়া ছিলেন। আমি তাঁহার মাথাটি তুলিলাম। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর "বাপ! মহিষাসুর!" এই কথা বলিয়া তিনি বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আমি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। তক্তপোষের উপর আমি শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু নিদ্রা হইল না। কি করিয়া পুনরায় নিজের মুণ্ড ফিরিয়া পাইব, কেবল সেইকথা ভাবিতে লাগিলাম। টং টং টং করিয়া রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

ঘরে আমার প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সহসা প্রদীপ নিবিয়া গেল। নিবিড় অন্ধকারে ঘর পরিপূর্ণ হইল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটি সাদা চক্ষু আর দুই পাটী দাঁত জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।

আমি মনে করিলাম, এ আবার কি? কি কুক্ষণেই আজ প্রভাত হইয়াছিল। সপ্তমী পূজার দিন, কোথায় আমোদ প্রমোদ করিব, তাহা না হইয়া বিপদের উপর বিপদ। ভয়ের উপর ভয়। ঘোর আতঙ্কে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। আবার ভাবিলাম,—ভয় করি—কেন? আমার নিজের মুণ্ড নাই, পরের মুণ্ড আমার ঘাড়ে। এরূপ অবস্থায় কালযাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।"

কিনু বলিলেন,—"তা বটে! তোমার কিন্তু খুব সাহস। তাহার পর কি হইল?"

পঞ্চম অধ্যায় : যকের ধন

ছকু বলিলেন,—"দাঁতওয়ালা সেই মূর্তি লোহার ন্যায় কঠিন হাত বাহির করিয়া আমার দুই গালে দুইটি চড় মারিল। তখন আমার চলের হাড় নড়িয়া গেল। ঠিক আমার নহে, আমার ঘাড়ে যে মুণ্ড ছিল, তাহার মুখ বুজিয়া গেল। সেই মুখ দিয়া এখন কথা কহিতে পারিলাম।

দাঁতওয়ালা বলিল,—'আমি ভূত!'

আমার মনে এখন ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। আমি বলিলাম,—"বটে! মহাশয়, ভূত?"

ভূত বলিল,—"এস, তোমার ঘাড়টি ভাঙিয়া দিই।"

আমি বলিলাম,—"এ আমার মস্তক নহে, অন্য লোকের।"

ভূত পুনরায় বলিল,—"সংপ্রতি আমি ভূত হইয়াছি। ভূতগিরি করিতে এখনও ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারি নাই। আজ ভোর হইলে কি যে কি করিব তাহাই ভাবিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন?"

ভূত উত্তর করিল,—"আমরা হাওয়া। রাত্রি হইলে আমরা মানুষের আকার ধারণ করিয়া ভূতগিরি করি। ভোর হইলে আবার পুনরায় হাওয়া হইয়া যাই। কি করিয়া পুনরায় হাওয়া হইতে হয়, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। দিন হইলেও আমাকে এইরূপ মানুষের আকার ধরিয়া থাকিতে হইবে।"

আমি বলিলাম,—"তা কি হয়! তাহা হইলে লোক সব ভয় পাইবে, কাজকর্ম সব বন্ধ হইয়া যাইবে।"

ভূত বলিল,—"তবে এক কর্ম কর। তোমার ঘাড়ে যে মুণ্ডটি রহিয়াছে, ঐটি আমাকে দাও, ও পুরাতন ভূত, কি করিয়া পুনরায় হাওয়া হইতে হয়, ও আমাকে বলিয়া দিবে।"

আমি বলিলাম,—"আমার নিজের মুণ্ড ফিরিয়া না পাইলে এ মুণ্ড কি করিয়া দিব?"

ভূত বলিল,—"কেন, কবন্ধকাটা হইয়া থাকিবে। সাধুভাষায় যাহাকে কবন্ধ বলে।"

আমি বলিলাম,—"জীয়ন্ত শরীরে তাহা হয় না।"

ভূত বলিল,—"তোমার মুণ্ড খিড়কীর বাগানে চালতে তলায় পোঁতা আছে। সাবল লইয়া আমার সঙ্গে চল; আমি দেখাইয়া দিব।"

সাবল লইয়া আমি ভূতের সংগে চলিলাম। পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর চারিদিকে বাগান ছিল, আর সেই বাগান উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পূর্বদিকে প্রাচীরের ধারে একটি চালতে গাছ ছিল। সেই গাছের অনেকগুলি ডাল প্রাচীরের উপর পড়িয়াছিল। চালতে তলার এক স্থান ভূত আমাকে দেখাইয়া দিল। সাবল দিয়া সেই স্থান আমি খুঁড়িতে লাগিলাম। অল্প খুঁড়িতে সরা ঢাকা এক হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। সরা খুলিয়া দেখি যে, তাহার ভিতর আমার মুণ্ড! আমার স্কন্ধ হইতে ভূত তখন সর্বাংগসুন্দরীর মুণ্ড তুলিয়া লইয়া আবার আমার নিজের মুণ্ড সেই স্থানে বসাইয়া দিল। নিজের মুণ্ড যদি না পাইতাম, তাহা হইলে কি করিয়া যে গাঁজা খাইতাম, তাহাই ভাবি। সে হাঁ করা দাঁত বাহির করা মুখ দিয়া গাঁজায় দম দিতে পারিতাম না।"

কিনু বলিলেন,—"আশ্চর্য্য! তাহার পর।"

ছকু বলিলেন,—"ভূত তখন হাওয়া হইয়া গেল। কিন্তু হাওয়া হইবার পূর্বে সে আমাকে আর একটু খুঁড়িতে বলিয়া গেল। আর একটু খুঁড়িয়া প্রায় এক ঝুড়ি মাটী আমি তুলিয়া ফেলিলাম। তাহার পর দেখি যে, নিম্নে বৃহৎ একটি কাঠের বাক্স রহিয়াছে, আর সেই বাক্সের উপর প্রকাণ্ড এক ব্যাঙ বসিয়া আছেন, ব্যাঙের গা হইতে এক প্রকার লালা নির্গত হইতেছে। আর সেই লালা আগুনের মত জ্বলিতেছে।

লাফ দিয়া ব্যাঙ গর্তের উপর গিয়া বসিল। আমি ভাবিলাম যে, ভূতের কল্যাণে আমি আমার নিজের মুণ্ড ফিরিয়া পাইলাম। ভূত আমাকে বোধ হয় যকের ধন দিয়া গেল। যকের টাকায় শুনিয়াছি সাপ থাকে, ভূত মহাশয় সাপ লইয়া গিয়াছেন। আহারের নিমিত্ত সাপ ব্যাঙটি যোগাড় করিয়াছিলেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সাবলের চাড়া দিয়া বাক্সর ডালা আমি খুলিলাম। তখন আমার যে কি আনন্দ হইল, তাহা তোমাদিগকে আর কি বলিব। বাক্সটি টাকায় পরিপূর্ণ ছিল। চক্‌চকে নূতন টাকা। কেবল এক ধারে এক তাড়া কাগজ ছিল।

ব্যাঙের আলোতে আমি দুই চারিটি টাকা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছি, এমন সময় আমার শ্বশুর মহাশয় দোতালায় তাঁহার শয়নঘরের জানালা হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"কেও! চালতে তলায় কেও!"

আমি তাড়াতাড়ি বাক্সর উপর মাটী চাপা দিতে লাগিলাম। ব্যাঙ দুই চারি লাফে সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল। ব্যাঙ অভাবে চালতেতলা অন্ধকারময় হইয়া গেল।

সেই জন্য ভাই, ছোঁড়ারা আমায় ক্ষেপায়;

বলে,—ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছকু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল॥

কিনু বলিলেন,—"ছোঁড়াদের বড় অন্যায়। তোমার ঠ্যাঙটি কি করিয়া গেল?"

ছকু বলিলেন,—"আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও সেই সময় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন,—"কোথায় কে?"

শ্বশুর উত্তর করিলেন,—"চাল্‌তে তলায় একটা আলোর মত কি দেখিলাম। এখন নিবিয়া গিয়াছে।"

শাশুড়ী বলিলেন,—"হয় ত আলেয়া!"

শ্বশুর বলিলেন,—"আলেয়া নয়, হয় ত চোর। ভোজালে দাও, দেখিয়া আসি।"

তাড়াতাড়ি গর্তটি পরিপূর্ণ করিয়া আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। নিজের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলাম। ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতঃকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি বাহিরে আসিলাম। শ্বশুর ভাংগা ঝাড় লণ্ঠন ও বাদ্য যন্ত্র প্রভৃতি দেখিতেছিলেন। আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন,—"এই যে, তুমি তোমার নিজের মাথা পাইয়াছ।" তাহার পর পুনরায় তিনি বলিলেন,—"এই সকল বাদ্য যন্ত্রের দাম আমাকে দিতে হইবে। মোদো মহিষাসুর সাজিয়া আমার জিনিসপত্র ভাংগিয়াছে, তাহার নামে আমি নালিশ করিব। তাহাকে জেলে পচাইব।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না। নিজের ঘরে আসিয়া যকের টাকার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সত্য সত্য কি আমার কপাল ফিরিয়াছে?

ষষ্ঠ অধ্যায় : ছকুর ঠ্যাঙ

সমস্ত দিন কেবল ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান যদি যকের ধন আমাকে দিলেন, তাহা হইলে কি করিয়া ইহা লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করি। কত উপায় ভাবিলাম। কিন্তু কোনটি মনের মত হইল না। একবার ভাবিলাম যে, শ্বশুর যদি এই ধনের অর্দ্ধেক ভাগ আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গিয়া বলি। কিন্তু রায় মহাশয়ের প্রকৃতি আমি ভালরূপ জানিতাম। তিনি নিশ্চয় বলিবেন যে,—"এ আমার টাকা, আমি এই স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিলাম! তোমাকে ইহার ভাগ দিব কেন?"

সমস্ত দিন ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার পূর্বে বাজার হইতে একটি আঁধারে লণ্ঠন কিনিয়া আনিলাম। সে দিন মহাষ্টমী, সে রাত্রিতে বাড়ীতে কোন নাচ গাওনা ছিল না। যকের ধন ঠিক আছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত রাত্রি দুইটার সময় লণ্ঠনটি হাতে লইয়া পুনরায় সেই চালতেতলায় উপস্থিত হইলাম। হাত দিয়া মাটী সরাইতে সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময়ে দোতালার উপর জানালার ধারে দাঁড়াইয়া শ্বশুর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "সেই চোর বেটা আজ আবার বুঝি আসিয়াছে। ভোজালে দাও।"

আর আমি বিলম্ব করিলাম না। মাটী যেমন ছিল, তাড়াতাড়ি সেইরূপ করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। নিজের ঘরে আসিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া এক উপায় স্থির করিলাম। তাহার পর সেই দিন ভোরে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া শ্বশুরের বাড়ী হইতে পলায়ন করিলাম।

নিকটে একখানি খোলার বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীর লোকদিগের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। সে স্থানে গিয়া আমি রহিলাম। আমার শ্বশুরের বাগানের পূর্বদিকে প্রাচীরের বাহিরে একটি গলি ছিল। এ স্থানে লোকের অধিক বাস ছিল না। রাত্রিকালে এ গলিতে লোকের বড় যাতায়াত ছিল না। দিনের বেলা দুই তিন বার সেই গলিতে গিয়া বাহির হইতে বাগানের প্রাচীর ও সেই চালতেগাছ দেখিয়া আসিলাম। চালতা বৃক্ষের নিম্নদেশে ডাল ছিল। দুই তিনটি শাখা প্রাচীরের উপর পড়িয়াছিল। সেই ডাল ধরিয়া প্রাচীরের উপর হইতে বাগানের ভিতর সহজে নামিতে পারিব। কিন্তু বাহির হইতে প্রাচীরে কি করিয়া উঠিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে দুইটি

বাঁশ পড়িয়া আছে দেখিলাম, মনে করিলাম, এই বাঁশের সহায়তায় আমি প্রাচীরের উপর উঠিব।

নবমী পূজার দিন সন্ধ্যার পর ঘোর বাদলা উপস্থিত হইল। আকাশ নিবিড় মেঘে ঢাকিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোকে পৃথিবী আলোকিত হইতে লাগিল। আমি মনে ভাবিলাম যে, ভালই হইয়াছে। এ দুর্য্যোগে কেহ ঘর হইতে বাহির হইতে পারিবে না। অনায়াসে আমি বাক্সটি আনিতে পারিব।

রাত্রি তিনটার সময় খোলার ঘর হইতে বাহির হইলাম। প্রাচীরের গায়ে বাঁশ দিয়া উপরে উঠিলাম। চালতে গাছের ডাল ধরিয়া নীচে নামিলাম। হাত দিয়া মাটী খুঁড়িয়া বাক্স বাহির করিলাম। বাক্স গর্ত্তর উপর তুলিলাম। কিন্তু সর্বনাশ! বাক্স অতিশয় ভারি। কি করিয়া ইহা লইয়া গাছে উঠিব, কি করিয়া প্রাচীর পার হইয়া গলিতে গিয়া নামিব! এ বুদ্ধি পূর্বে আমার যোগায় নাই।

যাহা হউক, অতি কষ্টে বাক্স আমি মাথায় তুলিলাম। এক হাতে বাক্স ধরিয়া অপর হাত দিয়া চালতে গাছের উপর উঠিতে লাগিলাম। ভাগ্যক্রমে গাছের ডালগুলি সুবিধামত ছিল। তাই উঠিতে পারিলাম। একটি ডালের উপর উঠিলাম। দুইটি ডালের উপর উঠিলাম। প্রাচীরের মাথা আর অল্প দূরে আছে, আর দুই তিনটা ডাল পার হইলেই, তাহার উপর গিয়া উঠিতে পারি, এমন সময় বিদ্যুতের আলোকে দিনের ন্যায় চারিদিক আলোকিত হইল। সেই সময় হঠাৎ করিয়া শ্বশুর-বাটীর খিড়কীদ্বার কে খুলিয়া ফেলিল। পুনরায় আর একবার বিদ্যুৎ হইল। ঘোর বিপদ। আমি দেখিলাম যে, দক্ষিণ হাতে ভোজালে, আর বাম হাতে লণ্ঠন লইয়া মশ মশ করিয়া শ্বশুর মহাশয় সেই চালতেতলার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিতেছেন।

ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমার হাত পা অবশ হইয়া গেল। গাছ হইতে আমি পড়িয়া যাই আর কি। যাহা হউক, আমি নিজে পড়িলাম না। কিন্তু বাক্সটি ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। ডালটি ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। চকচকে টাকা সব চারিদিকে ছত্রাকার হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

শ্বশুর শাশুড়ী চালতে তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে একটি কাগজের তাড়া দেখিয়া শ্বশুর মহাশয় প্রথম তাহাই কুড়াইয়া লইলেন। লণ্ঠনের আলোতে কাগজগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কি কাগজ?"

শ্বশুর উত্তর করিলেন,—"নোট; এক একখানি হাজার টাকার নোট, অনেকগুলি আছে।"

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বাক্স, এ নোট, এ সব টাকা কোথা হইতে আসিল?"

শ্বশুর উত্তর করিলেন,—"এ বাড়ী পূর্বে এক জন বড় মানুষের ছেলের ছিল। নিজের বিষয় উড়াইয়া সে কাবুলী চাকর দ্বারা ডাকাতি করাইত। চোরাই মাল সে বোধ হয়, এই স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিল। আমরা এইবার বড় মানুষ হইব।"

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাক্স খুঁড়িয়া তুলিতে চোর আসিয়াছিল?"

শ্বশুর উত্তর করিলেন,—"চোর নয়, জামাই বেটার কাণ্ড। যদি এখন পাই, তাহা হইলে এই ভোজালে দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া তাহাকে কাটি, আর এই গর্ত্তের ভিতর পুতিয়া রাখি।"

এই কথা বলিয়া তিনি গাছের দিকে লণ্ঠনটি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পাতার ভিতর এতক্ষণ চুপ করিয়া আমি লুক্কায়িত ছিলাম। আর থাকিতে

পারিলাম না। ডাল ধরিয়া প্রাচীরের উপর গিয়া উঠিলাম। তাহার পর বাঁশ ধরিয়া তাড়াতাড়ি নামিবার চেষ্টা করিলাম। বাঁশ পড়িয়া গেল। আমি সবলে নীচে গলিতে গিয়া পড়িলাম। আমার দক্ষিণ পায়ের হাড় ভাঙিগয়া চর্ম্ম-ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তথাপি বুকে হাঁটিয়া আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিলাম। বুকে হাঁটিয়া ক্রমে সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর আগে যাইতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরে এক জন পাহারা-ওয়ালা আমাকে দেখিতে পাইল। তাহার পর কি হইল, তাহা আমি জানি না। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

তিন দিন পরে একবার আমার জ্ঞান হইল। দেখিলাম যে, আমি হাস-পাতালে পড়িয়া আছি। আর জানিতে পারিলাম যে, করাত দিয়া ডাক্তারে আমার দক্ষিণ পা কাটিয়া ফেলিয়াছে। আমার জ্ঞান অধিকক্ষণ রহিল না, প্রবল জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইলাম। জ্বরের উপর বিকার হইল। জ্ঞানগোচরশূন্য হইয়া পঁচিশ দিন আমি এখন যাই তখন যাই হইয়া পড়িয়া রহিলাম। পঁচিশ দিন পরে পুনরায় আমার জ্ঞান হইল। কিন্তু আরও দুই মাস আমাকে হাস-পাতালে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইল।

হাসপাতাল হইতে বাহির হইবার পূর্বে, এক জন বাঙ্গালী ডাক্তার আমাকে একখানি খবরের কাগজ দিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে, চক্রধর রায়ের সাত বৎসর কারাবাস হইয়াছে।

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"জাল নোট, মেকি টাকা বাজারে চালাইতেছিলেন।"

বদন বলিলেন,—"তবে সে বাক্সতে কেবল জাল নোট আর মেকি টাকা ছিল ?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"হুঁ! বাক্সটি মেকি টাকায় পরিপূর্ণ ছিল। নোট-গুলিও সব জাল। পূর্বে যাহার ঐ বাড়ী ছিল, সে এই কাজ করিত।"

নবদ্বীপ বলিলেন,—"উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে।"

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভূত, মহিষাসুর—এ সব কি করিয়া হইয়াছিল ?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"মাধব হিপনটিশ্যাম করিয়াছিল।"

বদন বলিলেন,—"গেলাসে ঢালো।"

কিনু বলিলেন,—"তামাক সাজো।"

ছকু বলিলেন,—"তামাক সাজিতেছি, কিন্তু তোমাদিগকে একটা কথা বলি, আমার পা কাটা গিয়াছে সত্য, কিন্তু আমি সুপুরুষ। তথাপি কেহ আমাকে কন্যা দিতে চায় না। তোমরা প্রাণের বন্ধু! তোমরাও কিছু করিলে না। এখন বঙ্গবাসীর পাঠকগণ আমার একমাত্র ভরসা। পাঠকগণ! যদি কাহারও অবিবাহিতা কন্যা থাকে, যদি আমা হেন সু-পাত্রকে ঘর-জামাই রাখিতে সাধ থাকে, তাহা হইলে এই আমি মজুদ আছি ; এই দেখুন আমার সুন্দর ত্রিভঙ্গমুরারি বংশধারী চেহারা।"

ডমরু-চরিত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ডমরু-চরিত কথা অমৃত সমান।
স্বয়ং ডমরু ভণে শুনে ভাগ্যবান্ ॥

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৩০ সাল।

কাপড়ে বাঁধা ১।০ কাগজে বাঁধা ১

কলিকাতা ৩৮।২ নং ভবানী চরণ দত্ত ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেসিন যন্ত্রে" শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : সূচনা

ডমরুধর বলিলেন,—"এই যে দুর্গোৎসবটী, এটী তোমরা সামান্য জ্ঞান করিও না। কিন্তু এখনকার বাবুদের সে বোধ নাই। বাবুরা এখন হাওয়াখোর হইয়াছেন। দেশে হাওয়া নাই, বিদেশে গমন করিয়া বাবুরা হাওয়া সেবন করেন, আর বাপ-পিতামহের পূজার দালান ছুঁচো-চামচীকাতে অপরিষ্কার করে।"

লম্বোদর বলিলেন,—"সত্য কথা! সেকালে পূজার সময় লোকে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিত। বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইত। যাহার যেমন ক্ষমতা মায়ের পূজা করিত, গরীব দুঃখীরা অন্ততঃ একশরা খয়ে-মুড়কি ও দুইটা নারিকেল-নাড়ু পাইত।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় পূজা করা এক নূতন ব্যবসা হইয়াছে। একটী প্রতিমা খাড়া করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকে লোক নিমন্ত্রণ করে, পরে তাহাদের কান মলিয়া প্রণামি আদায় করে। পূজা করিয়া অনেকে দুই পয়সা উপার্জন করে।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তাহাতে আর দোষ কি? পূজার সময় আমি আমার আবাদের প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করি। ভক্তিভাবে মায়ের পাদপদ্মে তাহারা যদি কিছু প্রণামি প্রদান করে, তাহাতে আর আপত্তি কি? যাহা হউক, বিলক্ষণ ঠেকিয়া এই দুর্গোৎসবটী আরম্ভ করিয়াছি। আমি এখন বুঝিয়াছি যে, ভগবতীর আরাধনা করিলে ধন-সম্পদ হয়।"

পুরোহিত বলিলেন,—"তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং, তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ। হে দেবী! তুমি যাহার প্রতি কৃপা কর, জনপদে সে পূজিত হয়; তাহার ধন ও যশ হয়, তাহার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে।"

কলিকাতার দক্ষিণে একখানি গ্রামে ডমরুধরের বাস। প্রথম বয়সে তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। অনেক কৌশল করিয়া, সাধ্যমতে একটি পয়সাও খরচ না করিয়া তিনি এখন প্রভূত ধনশালী হইয়াছেন। অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে সুন্দরবনের আবাদে তাঁহার এখন বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে। ডমরুধর এখন পাকা ইমারতে বাস করেন। পূজার পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার পর দালানে, যেস্থানে প্রতিমা হইয়াছে, সেই স্থানে গল্পগাছা প্রসঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—"হাঁ! মা আমাকে ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই বিপদে পড়িয়া, একান্ত মনে মাকে ডাকিয়া আমি বলিয়াছিলাম, 'মা! তুমি আমাকে এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। তাহা করিলে প্রতি বৎসর আমি তোমার পূজা করিব'।"

লম্বোদর বলিলেন,—"তুমি তো কেবল তিন বৎসর পূজা করিতেছ। এ তিন বৎসরের ভিতর তোমাকে তো কোন বিপদে পড়িতে দেখি নাই। বরং তিন বৎসর পূর্ব্বে এই বৃদ্ধবয়সে তুমি নূতন পত্নী লাভ করিয়াছ।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিলাম। তৃতীয় পক্ষ বিবাহের সময় আমি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলাম। গ্রামের লোক, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব কেহই সে কথা জানে না। মুখ ফুটিয়া আজ পর্য্যন্ত কাহারও

নিকট সে কথা আমি প্রকাশ করি নাই। মা জগদম্বা আমাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতি লোকের ভক্তি ক্রমে লোপ হইতেছে। কলেরা ম্যালেরিয়া বসন্ত প্লেগ তো আছেই, মায়ের প্রতি ভক্তির অভাবে এখন আবার ফ্লো রোগ দেখা দিয়াছে, ঘুনসুত রোগও আসিয়াছে। জগদম্বার প্রতি ভক্তি থাকলে লোকের এ সব বিপদ হয় না।"

পুরোহিত অপরিস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"দুর্গে! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি॥
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা,
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

হে দুর্গে! বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে জীবগণের ভয় তুমি দূর কর। সুস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাদের মঙ্গল কর। হে দারিদ্র্যদুঃখহারিণি! সর্বপ্রকার উপকার করিবার নিমিত্ত তুমি ভিন্ন দয়ার্দ্রচিত্তা আর কে আছে?"

লম্বোদর বলিলেন,—"কিন্তু বিপদটা কি? কি বিপদে তুমি পড়িয়াছিলে?"

ডমরুধর বলিলেন,—"এতদিন পরে সে বিপদের কথা আজ আমি প্রকাশ করিতেছি, শুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঠিক কন্দর্প পুরুষ কি?

ডমরুধর বলিলেন,—"আমার তৃতীয় বিবাহের সময় এ বিপদ ঘটিয়াছিল। আমার বয়স তখন পঁয়ষট্টি বৎসর। এত বয়সে লোক বিবাহ করে না। তবে আমার ছেলে-বেটা মানুষ হইল না। আমি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম। কোথায় সে চলিয়া গেল। সে একটি স্বতন্ত্র গল্প।"

শংকর ঘোষ বলিলেন,—"সে গল্প আর একদিন হইবে।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তাহার পর বিবাহ না করিলে গৃহ শূন্য হইয়া থাকে; কিন্তু বিবাহ করিলেও কি হয়, তা জান তো, লম্বোদর?"

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—"খ্যাচ, খ্যাচ, রাত্রি দিন খ্যাচ খ্যাচ।"

ডমরুধর বলিলেন,—"হাঁ, তুমি ভুক্তভোগী। ঘটনাচক্রে আমার এই বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। আমডাঙ্গার মাঠে আমার যে বৃহৎ বাগান আছে, সে বৎসর বৈশাখ মাসে সেই বাগানে গিয়া আমি ডাব পাড়াইতেছিলাম। দুই চারি দিন পূর্বে আমার পুরাতন উড়ে মালী দেশে গিয়াছিল, ভাইপোকে তাহার স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল। সে আমাকে কখন দেখে নাই, আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। উদ্ধব ঘোষের জামাতা সেই ছোঁড়ার সহিত সড় করিয়া চোর বলিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর মারিতে মারিতে কুতবপুরের মহকুমাতে আমাকে লইয়া গেল। কিন্তু সে আবার একটী স্বতন্ত্র গল্প।"

শংকর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বিপদ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"রাম রাম! এ সামান্য কথা। ইহা অপেক্ষা ঘোরতর সংকটে আমি পড়িয়াছিলাম। সেই সংকট হইতে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—"কুতবপুরে ঘটকীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পুনরায় বিবাহ করিতে সে আমাকে প্রবৃত্তি দিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। টাকায় কি না হয়? বাঁশপুরে এক বয়স্কা কন্যার সহিত বিবাহ স্থির হইল। তিনিই আমার বর্ত্তমান গৃহিণী।"

লম্বোদর বলিলেন,—"সে কথা আমরা জানি, আমরা বরযাত্র গিয়াছিলাম।"

ডমরুধর বলিলেন,—"কন্যার মাতা পিতা অর্থহীন বটে, কিন্তু আমার নিকট হইতে নগদ টাকা চাহিলেন না। তবে ঘটকী বলিল যে, বিবাহের সমুদয় খরচা আমাকে দিতে হইবে এবং কন্যার শরীরে যেখানে যা ধরে, সেইরূপ অলঙ্কার দিতে হইবে। তোমরা জান যে, আমি কখন একটি পয়সা বাজে খরচা করি না। লোক পাছে অলস হইয়া পড়ে সেই ভয়ে ভিখারীকে কখন মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করি না। সেকরার পেট ভরাইতে প্রথম আমি সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম যে, গহনার পরিবর্ত্তে কন্যার আঁচলে নোট বাঁধিয়া দিব। কিন্তু কন্যার মাতা পিতা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর, তাহার পর আমাকে দেখিয়া কেহ বলে না যে, ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প-পুরুষ। নিজের কথা নিজে বলিতে ক্ষতি নাই,—এই দেখ, আমার দেহের বর্ণটি ঠিক যেন দময়ন্তীর পোড়া শোউল মাছ। দাঁত একটীও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নাই, মুখে ঠোঁটের দুই পাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে। এইসব কথা ভাবিয়া গহনা দিতে আমি সম্মত হইলাম। যতদূর সাধ্য সাদা-মাটা পেটা সোনার গহনা গড়াইলাম; কিন্তু তাহাতেও আমার অনেক টাকা খরচ হইল। ফর্দ্দ অনেক। একবাক্স গহনা হইল।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"তা বটে। কিন্তু বিপদটা কি?"

ডমরুধর বলিলেন,—"ব্যস্ত হইও না। শুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গাছে-ঝোলা সাধু

ডমরুধর বলিলেন,—"গ্রামের প্রান্তভাগে বিন্দী গোয়ালিনীর যে ভিটা আছে, সে জমি আমার। কিছুদিন পূর্ব্বে বিন্দী মরিয়া গিয়াছিল। তাহার চালাঘরখানি তখনও ছিল। দুইজন চেলা সঙ্গে কোথা হইতে এক সাধু আসিয়া সেই চালা-ঘরে আশ্রয় লইল। সে সাধুকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, তাহাকে সকলেই জান। সাধুর দুইটী চক্ষু অন্ধ। চেলারা বলিল যে, তাহার বয়স পাঁচশত তিপ্পান্ন বৎসর। চালাঘরের সম্মুখে যে আমগাছ আছে, চেলারা তাহার ডালে সাধুর দুই পা বাঁধিয়া দিত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল নীচের দিকে মুখ করিয়া সাধু ঝুলিয়া থাকিত। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। যাহারা বি-এ, এম-এ, পাস করিয়াছে, সেই ছোঁড়ারা আসিয়া সাধুর কেহ পা টিপিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সকলেই পাদোদক খাইতে লাগিল। একখানি হুজুগে ইংরেজী কাগজের লোক আসিয়া সাধুকে দর্শন করিল ও তাহাদের কাগজে সাধুর মহিমা গান করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল। ফল কথা, দেশের লোকের ভক্তি একেবারে উথলিয়া পড়িল। সাধুর মাথার নিম্নে চেলারা একটি ধামা রাখিল; সেই ধামায় পয়সা-বৃষ্টি হইতে লাগিল।"

লম্বোদর বলিলেন,—"তুমিও সেই হুজুগে দু' পয়সা লাভ করিয়াছিলে।"

ডমরুধর বলিলেন,—"সে জমি আমার, সে চালা আমার, সে আমগাছ আমার ; কেন আমি লাভ করিব না ? আমি সাধুকে গিয়া বলিলাম,—"ঠাকুর ! সন্ন্যাসী মোহান্তের প্রতি আমার যে ভক্তি নাই, তাহা নহে। তবে কি জান, আমি বিষয়ী লোক। তুমি আমার জমিতে আস্তানা গাড়িয়াছ। দু'পয়সা বিলক্ষণ তোমার আমদানি হইতেছে। ভূস্বামীকে ট্যাক্স দিতে হইবে।"

সাধু উত্তর করিলেন,—"আমরা উদাসীন। আমি নিজে বায়ু ভক্ষণ করি। চেলারা এখনও যৎকিঞ্চিৎ আহার করে। দীন দুঃখীকে আমরা কিছু দান করি। কোন পরিব্রাজক আসিলে তাহার সেবায় কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করি। সেজন্য পুণ্যাত্মা ভক্তগণ যাহা প্রদান করে, আমার শিষ্যদ্বয় এ স্থানে খরচের জন্য তাহার অর্দ্ধেক রাখিয়া, অবশিষ্ট ধন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে দিয়া আসিবে।" বলা বাহুল্য যে, আহ্লাদসহকারে আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কোনদিন চারি টাকা কোনদিন পাঁচ টাকা আমার লাভ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল। যাহাতে তাহার পসার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয়, দেশের যত উজবুক যাহাতে তাহার গোঁড়া হয়, সেজন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় সন্ন্যাসীটীকে আমি পুষিয়া রাখিব। কিন্তু একটা হুজুগ লইয়া বাঙ্গালী অধিক দিন থাকিতে পারে না। হুজুগ একটু পুরাতন হইলেই বাঙালী পুনরায় নূতন হুজুগের সৃষ্টি করে। অথবা এই বঙ্গভূমির মাটির গুণে আপনা হইতেই নূতন হুজুগের উৎপত্তি হয়। এই সময় এ স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরে পাঁচগেছে গ্রামে রসিক মণ্ডলের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার স্কন্ধে মাকাল ঠাকুর অধিষ্ঠান হইলেন। রসিক মণ্ডল জাতিতে পোদ। মাকালঠাকুরের ভরে সেই কন্যা লোককে ঔষধ দিতে লাগিল। দেবদত্ত ঔষধের গুণে অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ, পঙ্গুর পা হইতে লাগিল। বোবার কথা ফুটিতে লাগিল। কতকগুলি সুস্থ লোককে কানা খোঁড়া, হাবা, কালা, জোরো অম্বুলে সাজাইতে হয়, তা না করিলে এ কাজে পসার হয় না। তুলসীর মালা গলায় দিয়া সেই ইংরাজী কাগজের লেখকও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তিতে গদগদ হইয়া কত কি তাহাদের কাগজে লিখিয়া বসিল। বি-এ, এম-এ পাস করা ছোঁড়ারা আবার সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া সেই পোদ ছুঁড়ীর পাদক-জল খাইতে গেল। কাতারে কাতারে সেই গ্রামে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। রসিক মণ্ডলের ঘরে টাকা পয়সা আর ধরে না। আমার সন্ন্যাসীর আস্তানা ভোঁ ভোঁ হইয়া গেল। রসিক মণ্ডলের মত আমার কেন বুদ্ধি যোগায় নাই, আমি কেন সেইরূপ ফন্দি করি নাই, আমি কেন একটা ছোট ছুঁড়ীকে জাহির করি নাই, সেই আপশোসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপ দুঃখে আছি, এমন সময় একজন চেলা সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া আমার বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। সন্ন্যাসী বলিল যে, নিভৃতে তোমার সহিত কোন কথা আছে। আমি, সন্ন্যাসী ও তাহার চেলা এক ঘরে যাইলাম। সন্ন্যাসী বলিল যে, ট্যাক্স বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সে জন্য নিশ্চয় তোমার মনে সন্তাপ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখ করিও না, অন্য উপায়ে তোমাকে আমি বিপুল ধনের অধিকারী করিব। একটি টাকা দাও দেখি !

সন্ন্যাসীর হাতে আমি একটী টাকা দিলাম। সেই টাকাটীকে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ করিয়া দুইটী টাকা সন্ন্যাসী আমার হাতে দিল। তাহার পর সন্ন্যাসীর আদেশে ভিতর হইতে একটী মোহর আনিয়া দিলাম, তাহাও ডবল করিয়া দুইটী

মোহর সন্ন্যাসী আমার হাতে দিল। শেষে একখানি দশ টাকার নোটও ডবল করিয়া আমার হাতে দিল।

তাহার পর সন্ন্যাসী আমাকে বলিল,—"এ কাজ অধিক পরিমাণে করিতে গেলে পূজা-পাঠের আবশ্যক। তোমার ঘরে যত টাকা, মোহর, নোট, সোনা রূপা আছে, পূজা-পাঠ করিয়া সমুদয় আমি ডবল করিয়া দিব।"

আমি উত্তর করিলাম,—"সন্ন্যাসীঠাকুর! আমি নিতান্ত বোকা নই। এরূপ বুজরুকির কথা আমি অনেক শুনিয়াছি। গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দুই-একটী টাকা অথবা নোট ডবল করিয়া তোমরা গৃহস্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন কর। তোমাদের কুহকে পড়িয়া গৃহস্বামী ঘরের সমুদয় টাকা-কড়ি গহনা-পত্র আনিয়া দেয়। হাঁড়ী অথবা বাক্সের ভিতর সেগুলি বন্ধ করিয়া তোমরা পূজা কর। পূজা সমাপ্ত করিয়া সাত দিন কি আট দিন পরে গৃহস্বামীকে খুলিয়া দেখিতে বল। সেই অবসরে তোমরা চম্পট দাও। সাত আট দিন পরে গৃহস্বামী খুলিয়া দেখে যে হাঁড়ী ঢন ঢন। বাজিকরের ও-চালাকি আমার কাছে খাটিবে না।"

সন্ন্যাসী বলিল,—"পূজা-পাঠ করিয়া আমি চলিয়া যাইব না। তোমার ঘরে তুমি আমাকে বন্ধ করিয়া রাখিও। আর দেখ আমি অন্ধ। কাহারও সহায়তা ভিন্ন দুই পা চলিতে পারি না। পলাইব কি করিয়া? পূজার দিন কোন শিষ্যকে আমি এ স্থানে আসিতে দিব না। সাত আট দিন পরে তোমাকে টাকাকড়ি খুলিয়া দেখিতে বলিব না; পূজা সমাপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ তুমি খুলিয়া দেখিবে যে, সমুদয় সম্পত্তি দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে।"

সন্ন্যাসীর এরূপ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। সন্ন্যাসী শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থির করিল। পূজা ও হোমের উপকরণের ফর্দ্দ দিল। সে সমুদয় আমি সংগ্রহ করিলাম। বাড়ীর দোতালায় নিভৃত একটী ঘরে পূজার আয়োজন করিলাম। ঘরে টাকা, মোহর, নোট যত ছিল ও বিবাহের নিমিত্ত যে গহনা গড়াইয়াছিলাম, সে সমুদয় বৃহৎ একটী বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া পূজার স্থানে লইয়া যাইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: চিত্রগুপ্তের গলায় দড়ি—মোটা দড়ি নয়

নির্দ্ধারিত দিন সন্ধ্যার সময় কেবল সন্ন্যাসী ও আমি সেই ঘরে গিয়া উপবেশন করিলাম। সন্ন্যাসী পাছে কোনরূপে পলায়ন করে, সেজন্য ঘরের দ্বারে চাকরকে কুলুপ দিয়া বন্ধ করিতে বলিলাম এবং একটু দূরে তাহাকে সতর্কভাবে পাহারা দিতে আদেশ করিলাম। সন্ন্যাসী ঘট স্থাপন করিল। দধি, পিঠালি ও সিন্দুর দিয়া ঘটে কি সব অঙ্কন করিল। তাহার পর ফট্ বষট্ শ্রীং ঐং এইরূপ কত কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল। অবশেষে হোম করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে স্বাহা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঘৃত দিয়া সন্ন্যাসী আপনার থলি হাতড়াইয়া একটী টিনের কৌটা বাহির করিল। সেই কৌটাতে এক প্রকার সবুজ রঙের গুঁড়া ছিল। হরিৎ বর্ণের সেই চূর্ণ সন্ন্যাসী আগুনে ফেলিয়া দিল।

ঘর সবুজ বর্ণের ধূমে পরিপূর্ণ হইল। আমার নিদ্রার আবেশ হইল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার সন্ন্যাসী বেটা একটা কাণ্ড করিবে, আমাকে অজ্ঞান করিয়া আমার টাকাকড়ি লইয়া কোনরূপে পলায়ন করিবে। উঠিয়া, দ্বারে ধাক্কা

মারিয়া আমার চাকরকে ডাকিব এইরূপ মানস করিলাম। আমি উঠিতে পারিলাম না। আমার হাত-পা অবশ অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল। হঠাৎ আমার মাথা হইতে "আমি" বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার শরীরটী তৎক্ষণাৎ মাটীর উপর শুইয়া পড়িল। শরীর হইতে যে "আমি" বাহির হইয়াছি, তাহার দিকে তখন চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে সে "আমি" অতি ক্ষুদ্র, ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মত, আর সে শরীর বায়ু দিয়া গঠিত। সেই ক্ষুদ্রশরীরে আমি উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলাম। মনে করিলাম যে, ঔষধের ধূমে সন্ন্যাসী আমাকে হত্যা করিয়াছে, মৃত্যুর পর লোকের যে লিঙ্গশরীর থাকে, তাহাই এখন যমের বাড়ী যাইতেছে।

ছাদ ফুঁড়িয়া আমি উপরে উঠিয়া পড়িলাম। সোঁ সোঁ করিয়া আকাশ-পথে চলিলাম। দূর-দূর-দূর—কতদূর উপরে উঠিয়া পড়িলাম, তাহা বলিতে পারি না। মেঘ পার হইয়া যাইলাম, চন্দ্রলোক পার হইয়া যাইলাম, সূর্য্যলোকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলাম। দেখিলাম যে, আকাশ বুড়ী এক কদম-গাছতলায় বসিয়া, আঁশবঁটি দিয়া সূর্য্যটীকে কুটি কুটি করিয়া কাটিতেছে, আর ছোট ছোট সেই সূর্য্য-খণ্ডগুলি আকাশ-পটে জুড়িয়া দিতেছে। তখন আমি ভাবিলাম,—"ওঃ! নক্ষত্র এই প্রকারে হয় বটে! তবে এই যে নক্ষত্র সব, ইহারা সূর্য্যখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে খণ্ডগুলি বুড়ী আকাশ-পটে ভাল করিয়া জুড়িয়া দিতে পারে না, আলগা হইয়া সেইগুলি খসিয়া পড়ে। তখন লোকে বলে,—"নক্ষত্র পাত হইল।" কিছুক্ষণ পরে আমার ভয় হইল যে,—সূর্য্যটী তো গেল, পৃথিবীতে পুনরায় দিন হইবে কি করিয়া? আকাশ-বুড়ী আমার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিল,—"ভোরে ভোরে উঠিয়া আকাশে ঝাড়ু দিয়া সমুদয় নক্ষত্রগুলি আমি একত্র করিব। সেইগুলি জুড়িয়া পুনরায় আস্ত সূর্য্য করিয়া প্রাতঃকালে উদয় হইতে পাঠাইব। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আঁশবটি দিয়া সূর্য্য কাটিয়া নক্ষত্র করি, সকালবেলা আবার সেইগুলি জুড়িয়া আস্ত সূর্য্য প্রস্তুত করি। আমার এই কাজ।"

আকাশ-বুড়ীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া, আমি ভাবিলাম যে, নভোমণ্ডলের সমুদয় ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া পুনরায় আমি শূন্যপথে সোঁ সোঁ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সর্বনাশ! কিছুদূর গিয়া দেখি যে, দুইটা বিকটাকার যমদূত আমার মত আর একটা সূক্ষ্ম শরীরকে লইয়া যাইতেছে। আমার বড় ভয় হইল। সে স্থানে মেঘ নাই যে, তাহার ভিতর লুকাইব। পলাইবার সময় পাইলাম না। খপ করিয়া তাহারা আমাকে ধরিয়া ফেলিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল,—'তুই বেটা কে রে? সত্য যুগের রাজা হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন বেওয়ারিশ হইয়া আর কাহারও এখানে বেড়াইবার হুকুম নাই। নিশ্চয় তুমি বেটা কুম্ভিপাক অথবা রৌরব নরকের ফেরারি আসামী।' এই বলিয়া তাহারা আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া চলিল।

ক্রমে আমরা যমপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যম দরবার করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে স্তূপাকার খাতাপত্রের সহিত চিত্রগুপ্ত, সম্মুখে ডাণ্ডস হাতে ভীষণমূর্ত্তি যমদূতের পাল। আমাদের দুইজনকে যমদূতেরা সেই রাজসভায় হাজির করিল। প্রথমে অপর লোকটীর বিচার আরম্ভ হইল।

চিত্রগুপ্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম?"

সে উত্তর করিল,—"আমার নাম বৃন্দাবন গুঁই।"

তাহার পর কোথায় নিবাস, কি জাতি প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া খাতা-পত্র দেখিয়া যমকে চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—"মহাশয়! এ লোকটী অতি ধার্মিক, অতি পুণ্যবান্। পৃথিবীতে বসিয়া এ বার মাসে তের পার্বণ করিত, দীন-দুঃখীর প্রতি সর্বদা দয়া করিত, সত্য ও পরোপকার ইহার ব্রত ছিল।"

এই কথা শুনিয়া যম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—"চিত্রগুপ্ত! তোমাকে আমি বারবার বলিয়াছি যে, পৃথিবীতে গিয়া মানুষ কি কাজ করিয়াছে, কি কাজ না করিয়াছে, তাহার আমি বিচার করি না। মানুষ কি খাইয়াছে, কি না খাইয়াছে, তাহার আমি বিচার করি। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা করিলে এখন মানুষের পাপ হয় না, অশাস্ত্রীয় খাদ্য খাইলে মানুষের পাপ হয়। তবে শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র মতে সংশোধন করিয়া খাইলে দোষ হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব বলিয়াছেন,—

'গো-মেষাশ্ব-মহিষক-গোধাজোষ্ট্র-মৃগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্॥

গোমাংস, মেষমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, গোধামাংস, ছাগমাংস, উষ্ট্রমাংস ও মৃগমাংস—এই অষ্টবিধ মাংসকে মহামাংস বলে। এই সকল মাংসই দেবতাদিগের প্রীতিদায়ক। 'ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে' অথবা 'ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু' এই মন্ত্রে সংশোধন করিয়া লইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও এই সমুদয় মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। মৃগমাংসের ভিতর শূকরের মাংসও ধরিয়া লইতে হইবে। তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাকে কলামাংস বলে, শিব তাহা খাইতেও অনুমতি দিয়াছেন। আর দেখ, চিত্রগুপ্ত! তুমি এ কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দাও। পৃথিবীতে তোমার বংশধর কায়স্থগণ কি করিতেছে, একবার চাহিয়া দেখ। উড়ে গয়লার মত এক এক গাছা সূতা অনেকে গলায় পরিতেছে। ব্রাহ্মণকে তাহারা আর প্রণাম করে না। ইংরেজী পড়িয়া তাহাদের মেজাজ আগুন হইয়া গিয়াছে। তাই বলি যে, চিত্রগুপ্ত! তুমিও ইংরেজী পড়। ইংরেজী পড়িয়া তোমার হেড গরম কর। হেড গরম করিয়া তুমিও গলায় দড়ি দাও। মোটা দড়ি নয়। বুঝিয়াছ তো? গলায় দড়ি দিয়া 'চিত্রবর্মা' নাম গ্রহণ কর।"

এই কথা বলিয়া যম নিজে সেই লোকটীকে জেরা করিতে লাগিলেন,—"কেমন হে বাপু! কখনও বিলাতি বিস্কুট খাইয়াছিলে?"

সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞা না।"

যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিলাতি পাণি? যাহা খুলিতে ফট্ করিয়া শব্দ হয়? যাহার জল বিজবিজ করে?"

সে উত্তর করিল,—"আজ্ঞা না।"

যম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য করিয়া বল, কোনরূপ অশাস্ত্রীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে কি না?"

সে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞা একবার ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খাইয়া ফেলিয়াছিলাম।"

যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"সর্বনাশ! করিয়াছ কি! একাদশীর দিন পুঁইশাক! ওরে! এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর্। ইহার পূর্ব পুরুষ, যাহারা স্বর্গে আছে, তাহাদিগকেও সেই নরকে নিক্ষেপ কর্। পরে ইহার বংশধরগণের চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্তও সেই নরকে যাইবে। চিত্রগুপ্ত! আমার এই আদেশ তোমার খাতায় লিখিয়া রাখ।"

যমের এই বিচার দেখিয়া আমি তো অবাক। এইবার আমার বিচার। কিন্তু

আমার বিচার আরম্ভ হইতে না হইতে আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—"মহারাজ! আমি কখনও একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই।"

আমার কথায় যম চমৎকৃত হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তিনি বলিলেন,—"সাধু সাধু! এই লোকটী একাদশীর দিন পুঁইশাক খায় নাই। সাধু, সাধু! এই মহাত্মার শুভাগমনে আমার যমালয় পবিত্র হইল। যমনীকে শীঘ্র শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাদিগকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন,—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী-কলকলিত, পরিজাত-পরিশোভিত কোকিল-কুহরিত, অপ্সরাপদ-নূপুর-ঝুনঝুনিত হীরা-মাণিক-খচিত নূতন একটী স্বর্গ নির্মাণ করিতে বল।"

চিত্রগুপ্তের—ওঁ থুরি! চিত্রবর্মার হিংসা হইল। তিনি বলিলেন,—"মহাশয়! পৃথিবীতে লোকটীর এখনও আয়ু শেষ হয় না। স্থূল দেহের রক্তমাংসের আঁষটে গন্ধ এখনও ইহার সূক্ষ্ম শরীরে রহিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া যম চটিয়া আগুন হইলেন। আমার আদর লোপ হইল। তিনি বলিলেন,—"কি! সাদা সাদা গোল গোল হাঁসের ডিমের গন্ধ গায়ে! মার, ইহার মাথায় দশ ঘা ডাঙ্গস মার।"

যম বলিবামাত্র তাঁহার একজন দূত আমার মাথায় এক ঘা ডাঙ্গস মারিল। বলিব কি হে, মাথায় আমার যেন ঠিক বজ্রাঘাত হইল। যাতনায় ত্রাহি মধুসূদন বলিয়া আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম। সেই এক ঘা ডাঙ্গসে যমপুরী হইতে আকাশপথে অনেক নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। দমাস করিয়া আর এক ডাঙ্গসের ঘা! শূন্যপথে আরও নীচে আসিয়া পড়িলাম। আর এক ঘা! আরও নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। এইরূপ দশম আঘাতে পৃথিবীতে আসিয়া আমার বাড়ীর ছাদ ফুঁড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর পুনরায় সেই পূজার ঘরে আসিয়া পড়িল।

নিজের বাড়ীতে সেই পূজার ঘরে আসিয়া ক্ষুদ্র মাথায় ক্ষুদ্র হাত বুলাইতে লাগিলাম। প্রহারের চোটে চক্ষুতে সরিষা-ফুল দেখিতেছিলাম। অনেকক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি যে, "আমি" বসিয়া আছি। অর্থাৎ আমার সেই বড় শরীর আসনে বসিয়া আছে, আর সন্ন্যাসীর শরীর মাটীতে পড়িয়া আছে। কি হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, যে সবুজ গুঁড়ার ধূম দিয়া আমার শরীর হইতে প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, আর সকল কোষ বাহির করিয়া, সন্ন্যাসী আপনার সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা আমার স্থূল অন্নময় কোষ অধিকার করিয়াছে। আমার শরীর বটে, কিন্তু ঐ যে আসনে বসিয়া আছে, ও আমি নই, ও সন্ন্যাসী। সূক্ষ্ম শরীরে মুখ দিয়া আমি সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন করিতে পারিলাম না। সেজন্য নিরুপায় হইয়া আমি সন্ন্যাসীর দেহে প্রবেশ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ভমরুধরের তপস্যা

সন্ন্যাসীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। তাহার পর ক্রোধে আমি সন্ন্যাসীকে বলিলাম,—"ভণ্ড! আমার শরীর ছাড়িয়া নিজের শরীরে পুনরায় প্রবেশ কর্।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিল,—"এ পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতে-ছিলাম। ভোগ-বাসনা এখনও আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই। মানস করিয়াছিলাম যে, কোন যুবা ধনবান লোকের শরীর আশ্রয় করিব। সেরূপ লোকের যোগাড় করিতে

পারি নাই। কাজেই তোমার জীর্ণ শরীরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমার এই শরীর দ্বারা এখন সুখাদ্য ভক্ষণ করিব, নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিব। তোমার বিবাহসম্বন্ধ হইয়াছে। তোমার শরীরে আমি বিবাহ করিব। তোমার গৃহিণীকে লইয়া ঘরকন্না করিব। মিছামিছি তুমি গোল করিও না। লোকের নিজের যেরূপ অধ্যাস হয় অর্থাৎ শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে হয়, অন্য লোকেরও সেইরূপ হয়। তোমার শরীর দেখিয়া সকলে বলিবে যে, এই ডমরুধর; আমার শরীর দেখিয়া সকলে বলিবে যে, এই সন্ন্যাসী। কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, আমার আত্মা তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও তোমার আত্মা আমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ও হস্তামলকের গল্প শুনিয়া থাকিবে। আজ তাই হইয়াছে। শরীর ভাগ কেবল একটু "হের ফের।"

ক্রোধে অধীর হইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে আমি সন্ন্যাসীর গলা টিপিয়া ধরিলাম। কিন্তু তখন আমি পাঁচ শত তিপ্পান্ন বৎসরের পুরাতন সন্ন্যাসীর শরীরে ছিলাম। তাহার উপর আবার দুই চক্ষু অন্ধ। সন্ন্যাসীর আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। হাসিয়া সে দূরে আমাকে ফেলিয়া দিল।

আমার দেহধারী সন্ন্যাসী পুনরায় বলিল,—"যদি গোলমাল কর, তাহা হইলে তোমার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। তোমার চাকরের দ্বারাই তোমাকে আমি এই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব। ঐ অন্ধ ও বৃদ্ধ শরীর লইয়া তখন তুমি কি করিয়া দিন যাপন করিবে? আমার শিষ্যদ্বয় এ ব্যাপার অবগত আছে, তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তাহাদের সহিত আস্তে আস্তে আমার আস্তানায় গমন কর। প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল তাহারা তোমাকে নীচের দিকে মুখ করিয়া ঝুলাইবে। সমস্ত দিন তুমি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ঘোর রাত্রিতে চুপি চুপি আহার করিবে। যতদিন তোমার ঐ বর্তমান শরীর জীবিত থাকে, তত দিন তোমাকে আমি খাইতে দিব।"

আর উপায় কি? আমি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসীর দুই জন চেলা আসিয়া আমার দুই হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অন্ধ দুইটী চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। বিন্দী গোয়ালিনীর চালা ঘরে তাহারা আমাকে লইয়া গেল। সে রাত্রি মাটির উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যুষে চেলা দুই জন আমার দুই পায়ে দড়ি বাঁধিয়া আমগাছের ডালে ঝুলাইয়া দিল। এক ঘণ্টাকাল অধোমুখে আমি ঝুলিতে লাগিলাম। সে যে কি যাতনা, তাহা আর তোমাদিগকে কি বলিব। অন্ধ, তা না হইলে চক্ষু দুইটি ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইত। সন্ন্যাসীর গায়ের বর্ণও কাল ছিল, তা না হইলে মুখ লাল হইয়া যাইত। ঘোর কষ্ট! ঘোর কষ্ট! কেন যে দম আটকাইয়া মরিয়া যাই নাই, তাহাই আশ্চর্য্য!

লম্বোদর প্রভৃতি একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—"ঈশ্! তুমি ত সামান্য বিপদে পড় নাই!"

ডমরুধর বলিলেন,—"হাঁ! আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম। কেবল মা দুর্গার কৃপায় আমি সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম!"

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—"এক ঘণ্টা পরে তাহারা আমাকে গাছ হইতে নামাইয়া লইল। তাহার পর সমস্ত দিন তাহারা আমাকে জলটুকু পর্য্যন্ত খাইতে দিল না। তাহারা কিন্তু একে একে আমার বাড়ীতে গিয়া আহার করিয়া আসিল। আসিয়া বলিল যে,—'ডমরু বাবুর বাড়ীতে আজ খুব ঘটা। পাঁচ ছয়টা খাসি কাটা হইয়াছে। নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রামশুদ্ধকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন মহাসমারোহের সহিত সকলকে ভোজন করাইবেন।"

লম্বোদর বলিলেন,—"হাঁ! সেই সময় দিনকত তোমার বাড়ীতে খুব ধুম হইয়াছিল। প্রতিদিন ষোড়শ উপাচারে তোমার বাড়ীতে আমরা ভোজন করিয়াছিলাম! তখন তোমার সেই শরীরটীকে 'তুমি' বলিয়াই আমরা মনে করিয়াছিলাম। সহসা তোমার মতিগতির কিরূপে পরিবর্তন হইল, তাহা ভাবিয়া সকলে আমরা আশ্চয্যান্বিত হইয়াছিলাম। তোমার কেনারাম চাকর ও চেলা দুই জন বলিল যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার সমুদয় সম্পত্তি ডবল করিয়া দিয়াছিলেন, সেই আহ্লাদে তুমি মত্ত হস্ত হইয়াছ। কেহ কেহ বলিল যে, নূতন বিবাহের আমোদে আটখানা হইয়া তুমি এত টাকা খরচ করিতেছ। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, সে তুমি নও, তোমার শরীরে অধিষ্ঠিত সন্ন্যাসী!"

ডমরুধর বলিলেন,—"আমি বৃথা টাকা খরচ করিব? আমি সে পাত্র নই। 'আমি সাজিয়া সন্ন্যাসী বেটা আমার সম্পত্তি নষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিয়া বুক আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ঘোর রাত্রিতে এক জন চেলা আমার জন্য খাবার লইয়া আসিল। পোলাও, কালিয়া, কুর্মা, কোপ্তা, কাটলেট, সন্দেশ, রসগোল্লা, খাজা, গজা, বেদানা, অঙ্গুর, সেব প্রভৃতি সামগ্রী! ঈষৎ হাসিয়া চেলা বলিল,—'আপনার প্রতি ডমরু বাবুর বড় ভক্তি! উঠুন, আহার করুন।' কিন্তু ছাই আমি আর খাইব কি! আমার সর্বনাশ করিয়া সেই সমুদয় সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল।"

পর দিন প্রাতঃকালে পুনরায় আমাকে তাহারা গাছে ঝুলাইয়া দিল। তাহার পর সমস্ত দিন অনশনে রাখিয়া গভীর রাত্রিতে আমাকে খাবার দিল। প্রতিদিন এই ভাবে চলিতে লাগিল। ওদিকে আমার নিজ বাটীতে ধুমধামের সীমা-পরিসীমা নাই। প্রতি দিন যজ্ঞ। দিনের বেলা সাধারণ লোকের ভোজন, রাত্রিতে বন্ধু-বান্ধবের ফিষ্টি। শুনিলাম, ঐ ফিষ্টিতে সন্ন্যাসী বন্ধুবান্ধবের সহিত কিছু উচ্চরকমের স্ফূর্তি করিতেছিল। সেরি শ্যাম্পেন প্রভৃতি বহুমূল্য মদ চলিতেছিল। কেবল আমার টাকার শ্রাদ্ধ!

ক্রমে শ্রাবণ মাস আসিল। আমার বিবাহের জন্য যে শুভদিন স্থির হইয়াছিল, সেই দিন নিকটবর্তী হইল। যে শরীরে আমি অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা অন্ধ বটে, কিন্তু কান তো অন্ধ ছিল না; কয়দিন আগে থাকিতে রোশন-চৌকির বাজনা আমার কানে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার পর বিবাহের পূর্ব দিনে ইংরাজি বাজনা, দেশী বাজনা, ঢাক ঢোল সানাইয়ের রোলে ও লোকের কোলাহলে আমার কান ছেঁদা হইয়া গেল। শুনিলাম যে "ডমরুবাবু" মহাসমারোহের সহিত বিবাহ করিতে যাইবেন।

পাছে কোন যমদূতের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পাছে বেওয়ারিস আসামী বলিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, পাছে পুনরায় আমার মাথায় ডাণ্ডস মারে, সেই ভয়ে এত দিন সন্ন্যাসীর শরীর হইতে আমার সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিতে চেষ্টা করি নাই। কিন্তু একে আমার টাকার শ্রাদ্ধ, তাহার উপর সন্ন্যাসী আমার শরীরে আমার জন্য মনোনীত কন্যাকে গিয়া বিবাহ করিবে, এই দুঃখে মনের ভিতর আমার দাবানল জ্বলিতে লাগিল। সে দিন চেলা দুই জন যখন গাছ হইতে আমাকে নামাইয়া চলিয়া গেল, তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসীর শরীর হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অবশেষে কৃতকার্য্য হইলাম, সন্ন্যাসীর শরীর অন্ধ, কিন্তু আমার লিঙ্গ শরীর অন্ধ নহে। অনেক দিন পরে পৃথিবীর বস্তুসমূহ দেখিয়া মনে আমার আনন্দ হইল। সন্ন্যাসীর দেহ বিন্দীর চালা ঘরে ফেলিয়া সূক্ষ্ম শরীরে আমি আমার নিজের বাটীতে গমন করিলাম। সে স্থানের ঘোর ঘটা দেখিয়া বুক আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গৃহটী সুসজ্জিত

হইয়াছে, কোন স্থানে বাজনাওয়ালারা বসিয়া আছে, কোন স্থানে রোশনাইয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে, বরযাত্রিদিগের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ল্যান্টোকেলাস গাড়ি আসিয়াছে। বরের জন্য চারি ঘোড়ার গাড়ি আসিয়াছে। আমাদের গ্রাম হইতে কন্যার গ্রাম সাত ক্রোশ। পথ ভাল নহে—মেটে রাস্তা, কিন্তু শুনিলাম যে, অনেক টাকা খরচ করিয়া 'ডমরু বাবু' সে রাস্তা মেরামত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ছাল ছাড়ান বাঘ

এইরূপে চারিদিকে আমি দেখিয়া বেড়াইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সূক্ষ্মশরীর অতি ক্ষুদ্র, হাওয়া দিয়া গঠিত, সূক্ষ্মশরীর কেহ দেখিতে পায় না। একে যমদূতের ভয়, তাহার উপর আবার এই সমুদয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! সে স্থানে আমি অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম,—"দূর কর! বনে গিয়া বসিয়া থাকি। সুন্দর বনে মনুষ্যের অধিক বাস নাই, যমদূতদিগের সে দিকে বড় যাতায়াত নাই, সেই সুন্দরবনে গিয়া বসিয়া থাকি।"

বায়ুবেগে সুন্দরবনের দিকে চলিলাম। প্রথম আমি আমার আবাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আমার কোন কর্মচারীকে দেখিতে পাইলাম না। কেহ মাছ, কেহ ঘৃত, কেহ মধু, কেহ পাঁঠা লইয়া তাহারা 'আমার' বিবাহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সে স্থান হইতে আমি গভীর বনে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, এক গাঙের ধারে একখানি নৌকা লাগিয়া আছে, উপরে পাঁচ ছয়জন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছে। তাহাদের সঙ্গে মুগুর হাতে একজন ফকীর আছে। মন্ত্র পড়িয়া ফকীর বাঘদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নির্ভয়ে কাঠুরিয়াগণ কাঠ কাটিতেছে। সেই স্থানে গিয়া আমি একটি শুষ্ক কাঠের উপর উপবেশন করিলাম। বলা বাহুল্য যে, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না।

এই স্থানে বসিয়া মনের বেদনায় আমি কাঁদিতে লাগিলাম। অশ্রুজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। না এদিক্, না ওদিক্, না মরা, না বাঁচা, আমার অবস্থা ভাবিয়া আমি আকুল হইলাম। আজ 'আমি' সাজিয়া সন্ন্যাসী আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে, বাসর-ঘরে সন্ন্যাসী গান করিবে, তাহার পর ফুলশয্যা হইবে,—ওঃ! আর আমার প্রাণে সয় না। হায় হায়! আমার সব গেল। হঠাৎ এই সময় মা দুর্গাকে আমার স্মরণ হইল। প্রাণ ভরিয়া মাকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"মা! তুমি জগতের মা! তোমার এই অভাগা পুত্রের প্রতি তুমি কৃপা কর। মহিষাসুরের হাত হইতে দেবতাদিগকে তুমি পরিত্রাণ করিয়াছিলে, সন্ন্যাসীর হাত হইতে তুমি আমাকে নিস্তার কর। মনসা লক্ষ্মীর কখন পূজা করি নাই, ঘেঁটু পূজাও করি নাই, কোন দেবতার পূজা করি নাই। কিন্তু এখন হইতে, মা প্রতি বৎসর তোমার পূজা করিব। অকালে তোমার পূজা করিয়া রামচন্দ্র বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। আমিও মা! সেইরূপ অকালে তোমার পূজা করিব। তুমি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" ব্রজের নন্দ ঘোষের স্বজাতি কলিকাতার হরিভক্ত গোয়ালা মহাপ্রভুরা কসাইকে যখন নবপ্রসূত গোবৎস বিক্রয় করেন, কসাই যখন শিশু বৎসের গলায় দড়ি দিয়া হিচড়াইয়া লইয়া যায়, তখন সেই দুধের বাছুরটি নিদারুণ কাতরকণ্ঠে যেরূপ মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, সেইরূপ কাতর স্বরে আমিও মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম।

জগদম্বার মহিমা কে জানে! প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কৃপা

করেন। জগদম্বা আমার প্রতি কৃপা করিলেন। বন হইতে হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া কাঠুরিয়াদিগের মাঝখানে পড়িল। সুন্দরবনের মানুষখেগো প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র। শরীরটী হরিদ্রাবর্ণের লোমে আচ্ছাদিত, তাহার উপর কাল কাল ডোরা। এ তোমার চিতে বাঘ নয়, গুল বাঘ নয়, এ বাবা, টাইগার! ইংরাজিতে যাহাকে রয়াল টাইগার বলে, এ সেই আসল রয়াল টাইগার!

এক চাপড়ে একজন কাঠুরিয়াকে বাঘ ভূতলশায়ী করিল, ফকীরের মন্ত্রে তাহার মুখ বন্ধ ছিল, মুখে করিয়া তাহাকে সে ধরিতে পারিল না। সেই স্থানে শুইয়া থাবা দিয়া মানুষটাকে পিঠে তুলিতে চেষ্টা করিল। না মোটা না সরু নিকটে একটা গাছ ছিল। বাঘের দীর্ঘ লাঙ্গুলটী সেই গাছের পাশে পড়িয়াছিল। একজন কাঠুরিয়ার একবার উপস্থিত বুদ্ধি দেখ! বাঘের লাঙ্গুলটী লইয়া সে সেই গাছে এক পাক দিয়া দিল, তাহার পর লেজের আগাটি সে টানিয়া ধরিল।

বাঘের ভয় হইল। বাঘ মনে করিল,—"মানুষ ধরিয়া মানুষ খাইয়া বুড়া হইলাম, আমার লেজ লইয়া কখন কেহ টানাটানি করে নাই। আজ বাপধন। তোমাদের একি নূতন কাণ্ড!" পলায়ন করিতে বাঘ চেষ্টা করিল। একবার, দুইবার, তিনবার বিষম বল প্রকাশ করিয়া বাঘ পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পলাইতে পারিল না। অসুরের মত বাঘ যেরূপ বল প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইল যে, যাঃ! লেজটী বা ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু দৈবের ঘটনা একবার দেখ! এত টানাটানিতেও বাঘের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল না। তবে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি মাংসের দগদগে গেটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম্ম নাই! পাকা আমের নীচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটী সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতার হিন্দু কসাই মহাশয়েরা জীয়ন্ত পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে চর্ম্মবিহীন পাঁঠার শরীর যেরূপ হয়, বাঘের শরীরও সেইরূপ হইল। মাংসের বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল।

ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ ঘোরতর বিস্মিত হইয়া এক দৃষ্টে হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বাঘের লাঙ্গুল লইয়া গাছে যে পাক দিয়াছিল, লেজ ফেলিয়া সেও সেই দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। বাঘশূন্য ব্যাঘ্রচর্ম্ম সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। আমার কি মতি হইল, গরম গরম সেই বাঘছালের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। ব্যাঘ্র চর্ম্মের ভিতর আমার সূক্ষ্ম শরীর প্রবিষ্ট হইবামাত্র ছালটা সজীব হইল। গা ঝাড়া দিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গাছ হইতে লাঙ্গুলটী সরাইয়া লইলাম। পাছে ফের পাক দেয়! তাহার পর দুই একবার আস্ফালন করিলাম। পূর্বে তো অবাক হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এখন দশগুণ অবাক হইয়া ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ দৌড়িয়া নৌকায় গিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর মাঝখানে লইয়া দ্রুতবেগে ভাটার স্রোতে তাহারা পলায়ন করিল।

এখন এই নূতন শরীরের প্রতি একবার আমি চাহিয়া দেখিলাম। এখন আমি সুন্দরবনের কেঁদোবাঘ হইয়াছি—সেই যারে বলে রয়াল টাইগার! ভাবিলাম যে,—এ মন্দ কথা নয়, এখন যাই, এই শরীরে বিবাহ-আসরে গিয়া উপস্থিত হই। এখন দেখি, সন্ন্যাসী বেটা কেমন করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ করে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি দৌড়িলাম। কখন নিবিড় বনের ভিতর দিয়া চলিলাম, কখন লোকের আবাদের ধার দিয়া চলিলাম। সাঁতার দিয়া অথবা লম্ফ দিয়া শত শত নদী-নালা পার হইলাম। যে গ্রামে কন্যার বাড়ী, সন্ধ্যার সময় তাহার এক ক্রোশ

দূরে গিয়া পেঁাছিলাম। দূর হইতে আলো দেখিয়া ও বাজনা-বাদ্যের শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে, ঐ বর আসিতেছে। সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলাম। আলুম করিয়া এক লাফ দিয়া প্রথম বাদ্যকরদিগের ভিতর পড়িলাম, কালো কালো বিলাতী সাহেবেরা কোট-পেন্টু পিঁধে যাহারা বিলাতী বাজা বাজাইতেছিল, তাহারা আমার সেই মেঘগর্জনের ন্যায় আলুম শব্দ শুনিয়া আর আমার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আপন আপন যন্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ঢাকী ঢুলীদের ত কথাই নাই। তাহাদের কেহ পলাইল, কেহ কেহ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যাহারা আলো প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছিল, তাহারাও সকলে পলায়ন করিল। তাহার পর পুনরায় আলুম করিয়া আমি বরযাত্রদিগের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। টপ টপ করিয়া তাহারা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল ও যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

লম্বোদর বলিলেন,—"আমিও বরযাত্র গিয়াছিলাম। আমি একটি গাছে গিয়া উঠিয়াছিলাম।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে আমার পা ভাঙিগয়া গিয়াছিল। শেষে কেলেহাঁড়ী মাথায় দিয়া সমস্ত রাত্রি একটা পুষ্করিণীতে গা ডুবাইয়া বসিয়া রহিলাম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের গলায় কফ

ডমরুধর বলিলেন,—"তাহার পর লম্ফ দিয়া একেবারে আমি বরের চারি ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া, উঠিলাম। ঘোর ত্রাসে সন্ন্যাসীর হৃৎকম্প হইল। আমার শরীর হইতে ফট করিয়া সে সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিল। আপনার সূক্ষ্ম শরীর লইয়া কোথায় যে সে পলায়ন করিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই দিন হইতে তাহাকে অথবা তাহার চেলা দুইজনকে আর কখন আমি দেখি নাই। বিন্দীর চালায় তাহার দেহটীও আমি দেখিতে পাই নাই।

আমি দেখিলাম যে, গাড়ীর উপর আমার দেহটী পড়িয়া রহিয়াছে। বাঘ ছাল হইতে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ আমি নিজদেহে প্রবেশ করিলাম। গাড়ীর গদিতে বাঘছালখানি পাতিয়া তাহার উপর আমি গঠ হইয়া বসিলাম। নিজের শরীর পুনরায় পাইয়া আনন্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। কন্যার জন্য যে সমুদয় গহনা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সম্মুখে দেখিলাম যে সেই গহনার বাক্সটী রহিয়াছে। পরে শুনিলাম যে, ঘটকীর পরামর্শে সন্ন্যাসী এই গহনার বাক্স সঙ্গে আনিয়াছিল।

এখন বিবাহ-বাড়ীতে যাইতে হইবে। কিন্তু নিকটে জনপ্রাণী ছিল না। একেলা বিবাহ-বাড়ীতে যাইতে পারি না। গাড়ী হইতে নামিলাম। পথ হইতে একটী ঢোল লইয়া নিজেই ঢ্যাং ঢ্যাং করিয়া বাজাইতে লাগিলাম। যে তিন চারি জন ঢাকী ঢুলী বাঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে তাহাদের চেতনা হইল। পিট পিট করিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া তাহারা উঠিয়া বসিল। অন্য বাদ্যকর কেহ আসিল না। পরে শুনিলাম যে, তাহারা প্রাণপণে দৌড়িয়া একেবারে কলিকাতা গিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। ভালই হইয়াছিল। তাহাদিগকে টাকা দিতে হয় নাই। বিবাহের পর দিন, কন্যা লইয়া যখন নিজ গ্রামে আমি প্রত্যাগমন করি, তখন তাহাদের যন্ত্রগুলি আমি কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম।

কিছুদিন পরে যখন তাহারা আসিল, তখন অনেক কষ্টে আমার নিকট হইতে যন্ত্রগুলি বাহির করিল। টাকা আর চাহিবে কোন লজ্জায় ?

আমার কেনারাম চাকর ও দুই চারিজন বরযাত্র ক্রমে আসিয়া জুটিল। প্রথম তাহারা মনে করিয়াছিল যে, নিকটে মানুষ আনিবার নিমিত্ত বাঘ স্বয়ং ঢোল বাজাইতেছে। যাহা হউক, সেই দুই চারি জন বরযাত্র ও দুই চারি জন বাদ্যকর লইয়া আমি বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অধিক কথায় প্রয়োজন কি? প্রথম তো কন্যা সম্প্রদান হইল। তাহার পর আমাকে সকলে ছাদনাতলায় লইয়া গেল। এক পাল স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাড়কা রাক্ষসীর মত এক মাগী প্রথম আমার এক কান মলিয়া দিল, আর বলিল,—"বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তি রক্ষে।" পুনরায় আর এক কান মলিয়া বলিল,—"বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তি রক্ষে।" এইরূপে একবার এ কান একবার সে কান মলিতে লাগিল এবং ঐ কথা বলিতে লাগিল। মাগীর হাত কি কড়া। আমি মনে করিলাম যে, সাঁড়াশি দিয়া বুঝি আমার কান ছিঁড়িয়া লইতেছে। তার দেখাদেখি, নয় দশ বৎসরের একটা ফচকে ছুঁড়ি ডিঙ্গি দিয়া আমার কান টানিতে লাগিল আর ঐ কথা বলিতে লাগিল। আমার আর সহ্য হইল না। আমি বলিলাম,—"নে নে! তোর আর অত ফচকুমিতে কাজ নাই, আমি তোর পিতেমোর বয়সি।"

কিন্তু এই সময়ে আবার এক বিপত্তি ঘটিল। বরণ-ডালা হস্তে আমার শাশুড়ি ঠাকুরাণী বরণ করিতে আসিলেন। আমার মুখপানে একবার কটাক্ষ করিয়াই তিনি অজ্ঞান! বরণ-ডালা ফেলিয়া, কন্যার হাত ধরিয়া, প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে গিয়া মাটীর উপর তিনি শুইয়া পড়িলেন। সেই স্থানে শুইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নার সুরে তিনি বলিলেন,—"ও গো, মা গো, ও পোড়া বাঁদরের হাতে তোরে কি করিয়া দিব গো! ও গো মা গো! ও বুড়ো ডেকরার হাতে কি করিয়া তোকে দিব গো! ঘরে যে কালীঘাটের কালীর পট আছে, যা এক পয়সা দিয়া কিনিয়াছিলাম, তার মত তোর যে মুখখানি গো! তুই যে আমার কেলেসোনা গো!" ইত্যাদি। কালীঘাটের পটের মত মুখ বটে! কন্যাকে বাড়ী আনিয়া যখন ভাল করিয়া প্রথম তাঁহার মুখ দেখিলাম, তখন আমার মনে হইল যে, ইনি মানুষ নহেন, কালীঘাটের মা কালীর বাচ্ছা।

হুড়তে পুড়তে এই সময় ঘটকী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঘটকী বলিল,—"শীঘ্র গহনার বাক্স লইয়া এস।"

কেনা চাকরের নিকট গহনার বাক্স আমি রাখিয়াছিলাম। গহনার বাক্স সে লইয়া আসিল। আমার নিকট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া ঘটকী কন্যার গায়ে গহনা পরাইতে বসিল। বাম হাতে তাগা, জসম, তাবিজ, বজিু, চুড়ি ও বালা পরাইল। কন্যার কালো গায়ে সোনা ঝকমক করিতে লাগিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী চক্ষুর জলের ভিতর দিয়া আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্নার সুর ক্রমে ঢিলে হইয়া আসিল, আমার রূপবর্ণনাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। এখন তিনি বলিলেন,—"ওগো মা গো! কালীঘাটের কালী ঠাকুরের মত তোর যে মুখখানি গো।" এবার এই পর্য্যন্ত হইল।

যখন অপর হস্তে সমুদয় গহণা পরানো হইল, তখন তিনি বলিলেন,—"ওগো মা গো! কালীঘাটের কালী ঠাকুরের মত—।" এবার এই পর্য্যন্ত হইল।

যখন গলায় গহণা পরানো হইল, তখন চক্ষু মুছিয়া একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। তাহার পর কান্নার সুরে বলিলেন,—"ওগো মা গো! কালীঘাটের—।" এবার এই পর্য্যন্ত।

এইরূপে ক্রমেই কান্নার সুর মৃদু ও ছন্দ পাপড়িভাঙ্গা হইয়া আসিল। অবশেষে কন্যা যখন সমুদয় ভূষণে ভূষিত হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, দুইবার চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"তা হউক! আমার এলোকেশী সুখে থাকিবে।"

শুভদিনে শুভক্ষণে আমার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন কন্যা লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি—সেই তাড়কা রাক্ষসীর বোল সকলে যেন লুফিয়া লইল। সেই দিন হইতে সকলে আমার স্ত্রীর নাম রাখিল "পিত্তি-রক্ষে।" কেবল স্ত্রীর কেন? আমি একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া খরচ-পত্র করি বলিয়া কেহ আমার নাম করে না। আড়ালে সকলে আমাকেও "পিত্তি-রক্ষে" বলে। আমার গৃহিণী ঘোষেদের গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন। ছোঁড়ারা তাঁহাকে "পিত্তি-রক্ষে" বলে ক্ষেপাইত। সে জন্য এখন ভোরে ভোরে তিনি বসুদের গঙ্গায় স্নান করেন। কিন্তু যাই বল আর যাই কও, আমাদের কাটী গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য, তেমন আর কোন গঙ্গার নয়; হরিদ্বার, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের গঙ্গা কোথায় লাগে!

সন্ন্যাসী আমার কত টাকা নষ্ট করিয়াছিল? সে কথায় এখন আর প্রয়োজন কি? কিন্তু চিরকাল আমি কপালে-পুরুষ, আমার সৌভাগ্যক্রমে এই সময় স্বদেশী হিড়িকটি পড়িল। আমি এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিলাম। পূর্বদেশের এক ছোকরাকে চারিদিকে বক্তৃতা করিতে পাঠাইলাম। তাহার বক্তৃতার ধমকে শত শত গরীব কেরাণী স্ত্রীর গহনা বেচিয়া সেয়ার কিনিল; শত শত দীনদরিদ্র লোকও ঘটি-বাটি বেচিয়া আমার নিকট টাকা পাঠাইল। তারপর—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ—গলায় কিরূপ কফ বসিয়াছে। লম্বোদর বলিলেন,—"কফ কাশীতে আবশ্যক কি? স্পষ্ট বল না কেন যে, সমুদয় টাকাগুলি তুমি হাম করিয়াছ। তাহার পর, দেশ-শুদ্ধ লোক এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে।"

ডমরুধর বলিলেন,—"ভাগ্যবান পুরুষদিগের টাকা একদিক দিয়া যায়, অন্যদিক দিয়া আসে। যাহা হউক, মা দুর্গা আমাকে সেই সন্ন্যাসী-সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রতি বৎসর আমি মা দশভূজার পূজা করি।"

পুরোহিত বলিলেন,—

"যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথা পরমাপদঃ॥

দেবগণ বলিলেন,—"হে মহেশ্বরি! যদি আমাদিগকে বর দিবে, তবে ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিও।"

মন্তব্য। "পিত্তিরক্ষে" বলিয়াছেন যে—"পাঠকদিগের যদি আমার গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। সে বাঘছাল আমার ঘরে আছে। আমি তাঁহাদিগকে দেখাইব। তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইবে।"

দ্বিতীয় গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্ব্বকাহিনী

ডমরুধর বলিলেন,—"পূজার সময় সন্ন্যাসী-সংকটের গল্পে আমার সম্বন্ধে আরও দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার একটু পূর্ব্বকাহিনী না বলিলে তোমরা সে সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারিবে না। আজ যদি কৃত্তিবাস, কাশীদাস থাকিতেন, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি, আমার বীরত্ব, আমার কীর্ত্তির বিষয়ে তাঁহারা ছড়া বাঁধিতেন। ঘরে ঘরে লোকে তাহা পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইত। আর, যাত্রায় যাহারা দূতী সাজে, হাত নাড়িয়া নাড়িয়া তাহারা আমার বিষয়ে গান করিত। এক দিন রেলগাড়ীতে যাইবার সময় শুনিয়াছিলাম যে, কে এক জন মাইকেল ছিলেন। কে এক জন আবার তাঁহার জীবন-চরিত লিখিয়াছিলেন। এ বৎসর আমার বাগানে অনেক কাঁচাকলা হইয়াছে। খরিদ্দার নাই, যিনি মাইকেলের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, তিনি যদি আমার বিষয়ে সেইরূপ একখানি পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি তের পণ কাঁচাকলা দিতে সম্মত আছি।

আমার পিতা জমিদারী কাছারীতে মুহুরিগিরি করিতেন। যৎসামান্য যাহা বেতন পাইতেন, অতি কষ্টে তাহাতে আমাদের দিনপাত হইত। মাতা-পিতা থাকিতে আমার প্রথম নম্বরের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের পরলোকগমনে কলিকাতায় হর ঘোষের কাপড়ের দোকানে কাজ করিতাম। মাহিনা পাঁচ টাকা আর খাওয়া। যে বাড়ীতে বাবুর বাসা ছিল, তাহার নীচের এক সেঁতালে ঘরে আমি থাকিতাম। বাবুর এক চাকরাণী ব্যতীত অন্য চাকর ছিল না। তাঁহার গৃহিণী স্বয়ং রন্ধন করিতেন। রান্না হইত—অন্ততঃ আমার ও ঝিয়ের জন্য—মুসুর দাল ও বেগুন বা আলু বা কুমড়া ভাজা। মুসুর দালে কেবল একটু হলুদের রং দেখিতে পাইতাম, দালের সম্পর্ক তাহাতে থাকিত কি না সন্দেহ। তাহার পর বলিহারি যাই গৃহিণীর হাত! কি করিয়া যে তিনি সেরূপ ঝিঁঝির পাতের ন্যায় বেগুণ কুটিতেন তাহাই আশ্চর্য্য। অভ্রের চেয়ে বোধ হয় পাতলা। বাজারে যে চিংড়িমাছ বিক্রয় হইত না, যাহার বর্ণ লাল হইয়া যাইত, বেলা একটার সময় কালে-ভদ্রে সেই চিংড়ি মাছ আসিত। তাহার গন্ধে পাড়ার লোককে নাকে কাপড় দিতে হইত। সেই চিংড়ি মাছের ধড়গুলি বাবু ও তাঁহার গৃহিণী খাইতেন। মাথা-গুলি আমাদের জন্য ঝাল দিয়া রান্না হইত। যে দিন চিংড়ি মাছ হইত, সেদিন আমাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না। সেই পচা চিংড়ি অমৃত জ্ঞান করিয়া আমরা খাইতাম। দুইবার ভাত চাহিয়া লইতাম। অধিক ভাত খরচ হইত বলিয়া চিংড়ি কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর একগাঁট তেঁতুল ট্যাঁকে করিয়া আমি ভাত খাইতে বসিতাম। তাহা দিয়া কোনরূপে ভাত উদরস্থ করিতাম। যাহা হউক, এই স্থানে যাহা আমি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, পরে তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, টাকা উপার্জন করিলেই টাকা থাকে না ; টাকা খরচ না করিলেই টাকা থাকে।

আমার বোধ হয় রাক্ষসগণ। আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স, তখন আমার প্রথম গৃহিণীর কাল হইল। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। তাহার পর দশ

বৎসর পর্য্যন্ত আমার আর বিবাহ হইল না। আমার অবস্থা সেই ; লোকে বিবাহ দিবে কেন ?

এই সময় পাশের বাড়ী আমাদের এক স্বজাতি ভাড়া লইলেন। তাহার নাম প্রহ্লাদ সেন। দোতালায় সপরিবারে তিনি বাস করিলেন। একজন আত্মীয়কে নীচের দুইটি ঘর ভাড়া দিলেন। তাঁহার নাম গোলক দে। প্রহ্লাদ বাবু কোন বণিকের আফিসে কাজ করিতেন। অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, তবে টাকাকড়ি কি গহনাপত্র কিছুই ছিল না। গোলক বাবু সরকারী আফিসে অল্প টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করিতেন। তাঁহার পুত্র পশ্চিমে কোথায় কাজ করিতেন, কলিকাতায় তিনি ও তাঁহার গৃহিণী থাকিতেন।

প্রহ্লাদবাবুর গৃহিণী, তাঁহার মাতা, এক বিধবা ভগিনী, দুই শিশু-পুত্র ও এক কন্যা,তাঁহার পরিবার এই ছিল। এই সময়ে কন্যাটির বয়স দশ কি এগার ছিল। আমি তাহাকে যখন প্রথম দেখিলাম, তখন অকস্মাৎ আমার মনে উদয় হইল—কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিল যে, ডমরুধর! এই কন্যাটি তোমার দ্বিতীয় পক্ষ হইবে। তোমার জন্যই বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া কন্যার পিতার নিকট কথা উত্থাপন করি? বয়স তখন আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর, রূপ আমার এই,অবস্থা আমার এই—কথা উত্থাপন করিলে তিনি হয়ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু বিধাতার ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? এই সময় এক ঘটনা ঘটিল, কন্যাটি নিদারুণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইল। এই সূত্রে পাশের বাড়ীতে আমি যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। "আপনার কন্যা আজ কেমন আছে?" দুইবেলা প্রহ্লাদবাবুকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহাদের জন্য কিছু কাজকর্মও করিতে লাগিলাম। প্রয়োজন হইলে ঔষধ আনিয়া দিতাম ও ডাক্তারের বাড়ী যাইতাম। নিজের পয়সা দিয়া বড়বাজার হইতে ছাড়ানো বেদানা আনিয়া দিতাম। ডাক্তারের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গিয়া দুই তিনবার কন্যাটিকেও দেখিলাম। কন্যাটির রূপ ছিল না, তথাপি তাহাকে দেখিয়া আমার মন আরও মোহিত হইয়া গেল। এইরূপ আত্মীয়তার গুণে প্রহ্লাদবাবুর সহিত আমার অনেকটা সৌহার্দ্য জন্মিল। শুনিলাম যে, কন্যাটির নাম মালতী। কেমন সুন্দর নাম দেখিয়াছ? নামটি শুনিলে কান জুড়ায়।

ভগবানের কৃপায় মালতী আরোগ্যলাভ করিল। আমাদের ঝিকে মাঝে মাঝে দুই একটি সন্দেশ, দুই একটি রসগোল্লা, দুই একখানি জিলেপি দিয়া বশ করিলাম, ক্রমে তাহার দ্বারা প্রহ্লাদবাবুর মাতা, স্ত্রী ও বিধবা ভগিনীর নিকট কথা উত্থাপন করাইলাম। প্রহ্লাদবাবুর ভগিনী সংসারের কর্ত্রী। যা বলিয়াছিলাম,—সে কথা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—"কি! ঐ জলার ভূতটার সঙ্গে মালতীর বিবাহ দিব? পোড়া কপাল!"

কিন্তু কন্যার বিবাহের নিমিত্ত প্রহ্লাদবাবু বিব্রত ছিলেন। তাঁহার টাকা ছিল না। কি করিয়া কন্যাদায় হইতে তিনি উদ্ধার হইবেন, সর্বদাই তাহা ভাবিতেছিলেন। সুতরাং ঝি যে প্রস্তাব করিয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"পুরুষমানুষের পক্ষে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স কিছু অধিক নহে। তাহার পর রূপে কি করে গুণ থাকিলেই হইল। মালতীর পীড়ার সময় সে আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, ডমরুধর মন্দ লোক নহে। কিন্তু কথা এই যে, সে সামান্য বেতনে কাপড়ের দোকানে কাজ করে। পরিবার প্রতিপালন সে কি করিয়া করিবে?"

এ বিষয়ে পূর্ব হইতেই আমি ঝিকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। আমার অবস্থা

সম্বন্ধে যখন কথা উঠিল, তখন ঝি বলিল যে, "দেশে ডমরুবাবুর অনেক জমি আছে, তাহাতে অনেক ধান হয়। আম-কাঁঠাল-নারিকেলেরও অনেক বাগান আছে।" বলা বাহুল্য যে, এ সব কথা সমুদয় মিথ্যা। এ সময়ে আমার কিছুই ছিল না। কন্যার মাতা, পিতা ও পিতামহী এক প্রকার সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রহ্লাদবাবুর ভগিনী ক্রমাগত আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন যে,—হবু জামাতার যদি এত সম্পত্তি আছে, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ পাঁচশত টাকার গহনা দিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। পাঁচশত টাকা দূরে থাকুক, তখন আমার পাঁচশত কড়া কড়ি ছিল না।

কিন্তু মালতী পয়মন্ত কন্যা। এই সময় সহসা আমার ভাগ্য খুলিয়া গেল। অভাবনীয় ঘটনাক্রমে অকস্মাৎ আমি দেড় হাজারের অধিক টাকা পাইলাম। আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার সৌভাগ্যের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি আমার গ্রামে যাইলাম। তেরশত টাকা কোন স্থানে লুক্কায়িত রাখিলাম। দুইশত টাকা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া প্রহ্লাদবাবুর কন্যাকে আমি পাঁচশত টাকার গহনা দিতে স্বীকৃত হইলাম। বিবাহের সমুদয় আয়োজন হইল। এ বিবাহে কোন বিড়ম্বনা ঘটে নাই। শুভদিনে আমার দ্বিতীয় বারের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কন্যার নিমিত্ত পাঁচশত টাকার গহনা আমি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এই পাঁচশত টাকার গহনা আমি একশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : একশত মোহর

ইহার পর ছয় মাস পরম সুখে অতিবাহিত হইয়া গেল। পাশেই শ্বশুর-বাড়ী। সে স্থানে সর্বদাই আমার নিমন্ত্রণ হইত। আমার আদরের সীমা ছিল না। যখন আহার করিতে বসিতাম, তখন এটা খাই কি সেটা খাই, সর্বদাই এই গোলে পড়িতাম। এত দ্রব্য তাঁহারা আমার সম্মুখে দিতেন।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। একদিন বেলা নয়টার সময় আহার করিয়া দোকানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার শ্বশুরবাড়ীর নীচের তলায় ঠিক আমার ঘরের পাশের ঘরে একটা ভয়ানক কোলাহল পড়িয়া গেল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর নীচের তলায় গোলোকবাবু নামে আমাদের একজন স্বজাতি বাস করিতেন। এ বাড়ীতে আমার ঘর, সে বাড়ীতে তাঁহার ঘর, ঠিক গায়ে গায়ে ছিল। এ বাড়ীতে আমার ঘর যেরূপ স্যাঁতসেঁতে কদর্য্য ছিল, গোলোকবাবুর ঘর সেইরূপ ছিল না। তাঁহার ঘরটি খটখটে শুষ্ক ফিট-ফাট ছিল। তিনি নিজে সরকারী আফিসে কাজ করিতেন, পশ্চিমে কোথায় তাঁহার পুত্র কাজ করিত। তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। গোলোকবাবুর বয়স হইয়াছিল। কলিকাতায় কেবল তিনি নিজে ও তাঁহার বয়স্কা গৃহিণী থাকিতেন। গোলোকবাবুর ঘরেই এই কোলাহল হইয়াছিল।

গোল শুনিয়া আমি আমার শ্বশুরবাড়ীতে দৌড়িয়া যাইলাম, মনে করিলাম, হয় তো কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর সমুদয় লোক নীচে আসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া মালতী উপরে পলায়ন করিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা টানিয়া দিলেন। আমার শ্বশুর-মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, গোলোকবাবুর পুত্র মাঝে মাঝে পিতার নিকট টাকা

পাঠাইতেন। পিতা সেই টাকায় মোহর গাঁথাইয়া তাঁহার ঘরের প্রাচীরের গায়ে যে আলমারি আছে, একটি বগলি অর্থাৎ থলি করিয়া তাহার ভিতর রাখিয়া দিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি একশত মোহর গাঁথাইয়া আলমারির ভিতর রাখিয়াছিলেন। ঘরের প্রাচীরের গায়ে আলমারি, তাহাতে চারিটী তক্তার খোপ ছিল, সম্মুখে কাঠের কপাট ছিল, কপাট সর্বদা চাবি-বন্ধ থাকিত। গোলোকবাবুর এই একশত মোহর চুরি গিয়াছিল। তাহার জন্যই এ গোলমাল। গোলোকবাবু মনের দুঃখে নীরবে বসিয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতেছেন। কবে চুরি গিয়াছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তিনি বলিলেন যে, এক বৎসর পূর্বে ঐ মোহর গুলি তিনি আলমারির ভিতর রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আর তিনি নূতন মোহর ক্রয় করিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন যে, এ ঘরে কেবল তিনি ও তাঁহার স্ত্রী থাকেন, অন্য কেহ এ ঘরে প্রবেশ করে না। সেজন্য কাহাকেও তিনি সন্দেহ করিতে পারেন না। আমার শ্বশুরমহাশয় পুলিসে খবর দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। আমি বলিলাম যে,—"কখন কবে চুরি গিয়াছে, তাহার কোন ঠিক নাই, কাহারও প্রতি গোলোকবাবুর সন্দেহ হয় না, তখন মিছামিছি পুলিসে আর সংবাদ দিয়া কি হইবে?" পুলিসে আর সংবাদ দেওয়া হইল না।

সন্ধ্যার পর যখন আমি দোকান হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমার শ্বশুর প্রহ্লাদবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ডমরুধর! বড় বিপদের কথা। পাশের বাড়ীতে তুমি যে ঘরে বাস কর, আর এ বাড়ীতে গোলোকবাবু যে ঘরে বাস করেন, এই দুই ঘরের কেবল একটি প্রাচীর, দুই ঘরের কড়ি সেই এক দেওয়ালের উপর। গোলোকবাবুর ঘরে যে স্থানে সে আলমারি আছে, সে স্থানের দেওয়ালটি কাজেই অতিশয় পাতলা। আজ তিনি আলমারির ভিতর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, যে স্থানে তিনি মোহর রাখিয়াছিলেন, তাঁহার হাত লাগিতেই সেই স্থানের দেওয়ালটি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন যে, সে স্থানে দেওয়ালে ইট ছিল না, কেবল একটু বালি খাম ছিল। সেই বালি ভাঙ্গিয়া প্রাচীরে ফুটা হইয়া গেল। দুই ঘরের এক দেওয়াল, সুতরাং সেই ছিদ্র তোমার ঘরেও হইল। তোমার উপর এখন বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। যদি মোহরগুলি তুমি বাপু লইয়া থাক, তাহা হইলে আস্তে আস্তে ফিরিয়া দাও। তাহা হইলে সকল কথা মিটিয়া যাইবে। তা না হইলে বড় গোলমাল হইবে।"

এই কথা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। আমি বলিলাম,—"সে কি মহাশয়! আমি ভদ্রসন্তান, আমি চোর নই। তাহার পর আপনি আমার শ্বশুর। আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না।"

তাহার পর গোলোকবাবু নিজে এবং তাঁহার গৃহিণী আমাকে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন,—"বাপু! ভুলভ্রান্তিক্রমে যদি মোহরগুলি তোমার হাতে পড়িয়া থাকে, তামাসা করিয়া যদি রাখিয়া থাক, তাহা হইলে ফিরিয়া দাও, তোমার পায়ে পড়ি, মোহরগুলি ফিরিয়া দাও।"

তাঁহাদের উপর আমি রাগিয়া উঠিলাম যে,—"আমাকে আপনারা চোর বলেন! আপনারা ভাল মানুষ নহেন।" ইত্যাদি।

ক্রমে এ কথা আমার মনিব হর ঘোষের কানে উঠিল। মোহর ফিরিয়া দিতে তিনিও আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"মহাশয়! আজ কয় বৎসর আপনার দোকানে কাজ করিতেছি, আর কয় বৎসর আপনার বাটীতে বাস করিতেছি। একটা পয়সা কখন কি আপনার লইয়াছি? আমার প্রতি সন্দেহ হয় এমন কাজ কখন কি আমি করিয়াছি?"

দিনকয়েক বিলক্ষণ গোল চলিল। দেখ, লম্বোদর! মানুষ হাজার বুদ্ধিমান হউক, এরূপ কাজে একটা-না-একটা ভুল করে। আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। এ অনেক দিনের কথা হইল, এখন আর প্রকাশ করিতে দোষ নাই। প্রকৃত ঘটনা এই হইয়াছিল,—মশার দৌরাত্ম্যে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইত না। অনেক কষ্টে পাঁচসিকা দিয়া একটি মশারি কিনিয়াছিলাম। মশারিটী খাটাইবার নিমিত্ত দেওয়ালে একদিন পেরেক মারিতেছিলাম। পেরেক মারিতে হঠাৎ দেওয়ালের কতকটা বালি ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই স্থানটিতে একটি ছিদ্র হইল। ছিদ্রের ভিতর আমি হাত দিলাম। হাতে কি এক ভারী দ্রব্য ঠেকিয়া গেল। বাহির করিয়া দেখিলাম যে, মোহরপূর্ণ এক বগলি। তৎক্ষণাৎ আমি আমার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার পর পুনরায় গর্ত্তের ভিতর হাত দিয়া দেখিলাম যে, তাহার অপর পার্শ্বে কাঠ, হাতে সেই কাঠ ঠেকিয়া গেল। তখন ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার পর প্রকাশ হইল যে, আমার ঘরের ও গোলোকবাবুর ঘরে এক প্রাচীর, প্রাচীরের অপর পার্শ্বে গোলোকবাবুর ঘরে আলমারি, আমার হাতে আলমারির কপাট ঠেকিয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, মোহরগুলি পাইয়া আমার যেন স্বর্গলাভ হইল। চুপি চুপি সেইগুলি গণিতে লাগিলাম। পাছে শব্দ হয়, সেজন্য একটি একটি করিয়া গণিলাম একশত মোহর। চিরকাল পরিশ্রম করিলেও কখন আমি এত টাকা উপার্জন করিতে পারিতাম না। দেখিলাম যে, এ সে কালের মোহর নহে, বিলাতি মোহর, যাহাকে লোকে গিনি বলে। পরদিন একটু বালি ও চূণ আনিয়া দেওয়ালের ছিদ্রটি বুজাইয়া দিলাম। তাহার পর বাজারে গিয়া মোহরগুলি বিক্রয় করিলাম। পনর শত টাকার অধিক হইল। দেশে গিয়া তেরশত টাকা কোন এক নিভৃত স্থানে পুতিয়া রাখিলাম। বিবাহের নিমিত্ত বাকী টাকা কাছে রাখিয়া দিলাম। মোহর যে গিয়াছে, ভাগ্যে গোলোকবাবু ছয় মাস পর্য্যন্ত দেখেন নাই। যে সময় মোহর আমার হস্তগত হইয়াছিল, সে সময় যদি তিনি খোঁজ করিতেন, তাহা হইলে আমার আর বিবাহ হইত না।

বলিতেছিলাম যে, এই মোহর সম্বন্ধে আমি একটি ভুল করিয়াছিলাম। বড়বাজারে আমাদের কাপড়ের দোকানের পার্শ্বে এক পোদ্দারের দোকান ছিল। সেই দোকানে আমি মোহরগুলি বিক্রয় করিয়াছিলাম। একটু দূরে গিয়া যদি এ কাজ করিতাম, তাহা হইলে আর বিশেষ কোন গণ্ডগোল হইত না। পাশেই দোকান, সেজন্য পোদ্দারের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আমার মনিব হর ঘোষ মহাশয় আমি যে মোহর বেচিয়াছিলাম, তাহা জানিতে পারিলেন। প্রহ্লাদবাবুকে তিনি বলিয়া দিলেন। সকলে জটলা করিয়া আমাকে মোহর বিক্রয়ের টাকা গোলোকবাবুকে দিতে বলিলেন। আমি বলিলাম যে,—"এ মোহর আমার মায়ের ছিল। মৃত্যুকালে মা আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহে ও অন্যান্য বিষয়ে মোহর বিক্রয়ের টাকা আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। সে টাকা এখন আমি কোথায় পাইব, আর যদি থাকিত, তাহা হইলে কেনই বা দিব?"

অবশ্য আমার এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। যখন নিতান্ত আমার নিকট হইতে তাঁহারা টাকা আদায় করিতে পারিলেন না, তখন আমাকে পুলিশে দিবার নিমিত্ত তাঁহারা স্থির করিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম,—"তাহাতে ক্ষতি কি? এক বৎসর কি দুই বৎসর যদি আমার জেল হয়, তাহা হইলে মেয়াদ খাটিয়া পরে সেই টাকা লইয়া কোনরূপ ব্যবসা করিব। আর এখন যদি টাকাগুলি দিয়া দিই, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? ভগবান আমাকে মোহরগুলি দিয়াছেন। সে টাকা ফিরিয়া দিলে আমার মহাপাতক হইবে।"

কিন্তু আমাকে পুলিশে দেওয়া হইল না। আমার শাশুড়ি ঠাকুরাণী কাঁদিয়া-কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিলেন! অবশেষে সকলে মিলিয়া আমার নিকট হইতে গোলোকবাবুর পুত্রের নামে এক হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলেন। আর আমি মালতীকে যে গহনাগুলি দিয়াছিলাম, প্রহ্লাদবাবু সেগুলি গোলোকবাবুকে দিয়া দিলেন। তাঁহারা আরও অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আমার বিবাহের সময় যে জমি-জোরাত বাগান-বাগিচার কথা বলিয়াছিলাম, সে সমুদয় মিথ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সুন্দরবনের অদ্ভুত জীব

আমার নিকট হইতে ইঁহারা যখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম,—"যত পার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লও। উপুড় হস্ত কখন আমি করিব না। নালিশ করিবে? ডিক্রী করিবে? ডিক্রী ধুইয়া খাইও। কি বেচিয়া লইবে বাপু?"

বস্তুতঃ এ হ্যাণ্ডনোটের একটি পয়সাও আমাকে দিতে হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে গোলোকবাবু কর্মত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। সে স্থানে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। টাকা সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র অনেকবার আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তর আমি দিই নাই; দাঁড়াও! একবারেই যে টাকা আমাকে দিতে হয় নাই, তাহা নহে। দুইটা ছুঁড়ী! সে কথা পরে বলিব।

হর ঘোষ আমাকে দোকান হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। সেজন্য আমি দুঃখিত হইলাম না। মনে জানি যে, আমার সেই তেরশত টাকা আছে। পূর্বেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, সেই টাকা দিয়া হয় জমিদারী কিনিব আর না হয় ব্যবসা করিব, কিন্তু যতদিন ঐ হ্যাণ্ডনোটের ভয় থাকিবে, ততদিন কিছু করিব না।

আমার শ্বশুরমহাশয় বলিলেন,—"তোমাকে আর আমার বাড়ীতে আসিতে দিব না। আজ হইতে জানিলাম যে, আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে। তোমার মুখ দেখিলেও পাপ হয়, আর জন্মে অনেক পাপ করিয়াছিলাম, সেজন্য তোমা হেন ইতরের হাতে আমি কন্যা দিয়াছি। তোমার ঘরে আমি কন্যা পাঠাইব না।"

আমি ভাবিলাম যে,—"বটে, এখন আমার পুঁজি হইয়াছে, কি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়, হর ঘোষের বাড়ীতে তাহা আমি শিখিয়াছি। যেমন করিয়া পারি, আমি ধনবান হইব, টাকা হইলে কেহ তখন জিজ্ঞাসা করে না যে, অমুক কি করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়াছে। জাল করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, যেমন করিয়া লোক বড়মানুষ হউক না কেন, অমুকের টাকা আছে, এই কথা শুনিলেই ইতর-ভদ্র সকলেই গিয়া তাহার পদলেহন করে, সকলেই তাহার পায়ে তৈল মর্দন করে, রও একবার আমার টাকা হউক, তখন দেখিব যে, তুমি বাছাধন আমার বাড়ীতে ফ্যান চাটিতে যাও কি না।" অবশ্য এসব মনের চিন্তা প্রকাশ করিলাম না, কিন্তু যথাকালে আমার সে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল।

আমার শ্বশুরমহাশয়ের রাগের আর একটি কারণ ছিল, মালতীকে আমি যে পাঁচশত টাকার গহনা দিয়াছিলাম, তাহা একশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিলাম। দুইখানি ব্যতীত সমুদয় অলঙ্কার কেমিক্যাল সোনার অর্থাৎ গিল্টির গহনা ছিল। সুতরাং গহনাগুলি পাইয়া গোলোকবাবুর বিশেষ লাভ হয় নাই।

হর ঘোষের দোকান হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন আমি সুন্দরবনের এক

আবাদে চাকরী করিয়াছিলাম। সেই সময় আবাদ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা জন্মিল। কিছুদিন পরে যখন হ্যাণ্ডনোটের ভয় যাইল, তখন নিজের জন্য আমি একটি আবাদ খুঁজিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে শুনিলাম যে, দূরে নিবিড় বনের নিকট এক আবাদ সুলভমূল্যে বিক্রয় হইবে। যাঁহার আবাদ, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদয় তত্ত্ব আমি অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন যে, এই আবাদ তিনি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। নোণাজল প্রবেশ নিবারণের নিমিত্ত ইহাতে তিনি ভেড়ি অর্থাৎ বাঁধ বাঁধিয়াছিলেন, পানীয় জলের নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, বন পরিষ্কার করিয়াছিলেন, দুই চারি ঘর প্রজাও বসাইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাহার বাঁধ কয়েক স্থানে ভাঙ্গিয়া গেল, আবাদের ভিতর নোণাজল প্রবেশ করিল, প্রজাগণ পলায়ন করিল, সে আবাদ পুনরায় বনে আবৃত হইয়া পড়িল। পুনরায় উঠিত করিবার টাকা তাঁহার নাই। সেজন্য তিনি আবাদ বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন। এই সম্পত্তি তিনি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে এক হাজার টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিবেন। আমি একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সে স্থান দেখিতে যাইলাম। কিন্তু বাঘের ভয়ে নৌকা হইতে নীচে নামিলাম না। এ অঞ্চলে তখন অধিক আবাদ হয় নাই, চারিদিক বনে আবৃত ছিল, সেজন্য বিলক্ষণ বাঘের ভয় ছিল। নৌকার উপর হইতে স্থানটি দেখিয়া আমার মনোনীত হইল। মনে ভাবিলাম যে, একটু বিপদের আশংকা না থাকিলে এরূপ সম্পত্তি হাজার টাকায় পাওয়া যায় না। মোহর প্রদান করিয়া ভগবান আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। আমার পড়তা খুলিয়া গিয়াছে। একটু যত্ন করিলেই এই আবাদে পরে সোনা ফলিবে। আরও ভাবিলাম যে, আমার কাছে পূর্ব হইতেই তেরশত টাকা ছিল। তাহার পর আবাদে কাজ করিয়া আরও পাঁচশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। এক হাজার টাকা দিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিলে আমার কাছে আটশত টাকা থাকিবে। ভেড়ি বাঁধিতে, বন কাটিতে, প্রজা বসাইতে এই আটশত টাকা খরচ করিব। তাহার পর মাছের তেলে মাছ ভাজিব, অর্থাৎ ইহার আয় হইতেই বাকী ভূমি উঠিত করিব। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বিষয় আমি ক্রয় করিলাম। তাহার পর শুন বিপত্তির কথা।

আবাদে কাজ করিবার সময় একজন সাঁইয়ের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। মন্ত্রবলে যাহারা বাঘ দূর করিতে পারে, এরূপ লোককে সাঁই বলে। বড়গোছের একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। তাহাতে ছয়জন মাঝি ছিল। আবাদে কোথায় কি করিতে হইবে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সাঁই ও আমি যাত্রা করিলাম। আমার আবাদের পাশেই এক গাঙ ছিল। এই নদী দিয়া পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নৌকা যাতায়াত করিত। আমি, সাঁই ও তিনজন মাঝি লাঠিসোটা লইয়া নৌকা হইতে নামিলাম। আবাদের এদিক্-ওদিক্ কিয়ৎপরিমাণে ভ্রমণ করিলাম। অনেক ভূমি বনে আবৃত, সকল স্থান দেখিতে পারিলাম না। যে যে স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিলাম। পুষ্করিণীটি উচ্চ ভূমিতে ছিল, তবুও কতক পরিমাণে তাহার ভিতর জোয়ারের নোণাজল প্রবেশ করিয়াছিল। যে কয়জন কৃষক বাস করিয়াছিল, একখানি ব্যতীত আর সকলের ঘর ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। সেই একখানি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা হইল। কিন্তু একটু আগে গিয়া দেখিলাম যে, একটি মৃত ব্যাঘ্র সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতে লাগিলাম। আমার সাঁই বলিল যে, এ ব্যাঘ্রটিকে অন্য কোন সাঁই মন্ত্রবলে বধ করিয়া থাকিবে। কারণ, ইহার শরীরে গুলী অথবা অন্য কোন অস্ত্র-চিহ্ন নাই।

তাহার পর কৃষকের ভগ্নগৃহ অভিমুখে আমরা গমন করিলাম। এ ঘরখানির চারিদিকে প্রাচীর ও উপরে চাল ছিল, কিন্তু ঘরের দ্বারে আগড় অথবা কপাট ছিল না, যেই আমরা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছি, আর ঘরের ভিতরে বন্ বন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। প্রথম মনে করিলাম যে, লক্ষ লক্ষ মৌমাছির গুন্‌গুন্‌ রব। ভিতরে হয় তো বৃহৎ একটি চাক হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কালো কালো চড়াই পাখীর ন্যায় শত শত কি সব দেওয়ালের গায়ে বসিয়া আছে। তাহাদের সর্বশরীর কালো, কিন্তু পেটগুলি রক্তবর্ণের। তাহাদের দুইটি করিয়া ডানা আছে, উড়িবার নিমিত্ত ডানাগুলি নাড়িতেছে। তাহাতেই এরূপ বন্ বন্ শব্দ হইতেছে, রক্তবর্ণের কোন দ্রব্য খাইয়া পেট পূর্ণ করিয়াছে, সেজন্য উড়িতে পারিতেছে না। এ কি জীব? কিছুই আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে জীব হউক, এই জীবই রক্তপান করিয়া ব্যাঘ্রটিকে বধ করিয়া থাকিবে। এই সময়ে সাঁই এক বড় নির্বোধের কাজ করিয়া বসিল, লাঠি দ্বারা মাটীতে আঘাত করিয়া শব্দ করিল। গুটিদশ জীব যাহারা সম্পূর্ণভাবে উদর পূর্ণ করিয়া রক্তপান করে নাই, প্রাচীরের গা হইতে উড্ডীয়মান হইল। সাঁই সকলের অগ্রে ছিল, জীব কয়টি তাহার গায়ে আসিয়া বসিল, প্রাণ গেল প্রাণ গেল বলিয়া সাঁই দৌড়িল, দশহাত যাইতে না যাইতে সাঁই ভূতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মশার মাংস

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—আমরা দেখিলাম যে, সাঁইয়ের গায়ে দশ-বারটি কালো জীব বসিয়াছে। যাতনায় সাঁই ছট্‌ফট্ করিতেছে। লাঠি দিয়া আমি সেই জীবগুলিকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম। আমার লাঠির আঘাতে সাঁইয়ের দেহ হইতে তিনটি জীব উড্ডীয়মান হইল। তাহাদের একটি আমার গায়ে বসিতে আসিল। সবলে তাহার উপর আমি লাঠি মারিলাম। লাঠির আঘাতে জীবটি মৃত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। আমি তাহার মৃতদেহ তুলিয়া লইলাম। ইতিমধ্যে আর দুইটি জীব একজন মাঝির গায়ে গিয়া বসিল। মাঝি চীৎকার করিয়া উঠিল। দশ-বার হাত দৌড়িয়া গিয়া সেও মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আমি সাঁইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, সাঁই জীবিত নাই, সাঁই মরিয়া গিয়াছে। আমি বুঝিলাম যে, এ জীব কেবল যে রক্তপান করে, তাহা নহে, ইহার ভয়ানক বিষও আছে। তখন অবশিষ্ট দুইজন মাঝির সহিত আমি দৌড়িয়া নৌকায় গিয়া উঠিলাম ও তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

নৌকায় বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। মনে করিলাম যে, মোহর বিক্রয়ের টাকাগুলি বুঝি জলাঞ্জলি দিলাম, পাপের ধন বুঝি প্রায়শ্চিত্তে গেল। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি কেন সে লোক এক হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছে। যে জীবটিকে লাঠি দিয়া মারিয়াছিলাম, যাহার মৃতদেহ আমি তুলিয়া লইয়াছিলাম, তাহা এখন পর্য্যন্ত আমার হাতেই ছিল। নৌকার উপর রাখিয়া সেইটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আমি ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম যে,—সে অন্য কোন জীব নহে, বৃহৎ মশা! চড়াই পাখীর ন্যায় বৃহৎ মশা! মশা যে এত বড় হয়, তাহা কখন শুনি নাই। শরীরটি চড়াই পাখীর ন্যায় বড়,

শুঁড়টি বৃহৎ জোঁকের ন্যায়। ডাক্তারেরা যেরূপ ছুরি দিয়া ফোঁড়া কাটে শুঁড়ের আগায় সেইরূপ ধারালো পদার্থ আছে। জীব-জন্তু অথবা মানুষের গায়ে বসিয়া প্রথম সেই ছুরি দিয়া কতক চর্ম ও মাংস কাটিয়া লয়। তারপর সেই স্থানে শুঁড় বসাইয়া রক্তপান করে। কেবল যে রক্তপান করিয়া জীবজন্তুর প্রাণ বিনষ্ট করে তাহা নহে, ইহাদের ভয়ানক বিষ আছে, সেই বিষে অপর প্রাণী ধড়ফড় করিয়া মরিয়া যায়।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করিয়া জানিলে যে, সে জীব কোন নূতন প্রকার পক্ষী নহে ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"পক্ষীদের দুইটি পা থাকে, ইহার ছয়টি পা ; পক্ষীদের ডানায় পালক ছিল না; পক্ষীদের ঠোঁট থাকে, ঠোঁটের স্থানে ইহার শুঁড় ছিল; পক্ষীদের শরীরে হাড় থাকে, ইহার শরীর কাদার ন্যায় নরম। সেইজন্য আমি স্থির করিলাম যে, ইহা পক্ষী নহে, মশা।"

লম্বোদর বলিলেন,—"মশা যে এত বড় হয়, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"কেন বিশ্বাস হইবে না ? হস্তী বৃহৎ মশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মশার শুঁড় আছে, হস্তীরও শুঁড় আছে। তবে হস্তী যদি রক্তপান করিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে অপর কোন জীব জীবিত থাকিত না। সেই জন্য হাতী গাছপালা খাইয়া প্রাণধারণ করে।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তাহা ভিন্ন আমি এ কথার প্রমাণ রাখিয়াছি। যেমন সেই বাঘের ছালখানি ঘরে রাখিয়াছি, সেইরূপ এই মশার প্রমাণস্বরূপ আমি জোঁক রাখিয়াছি। আমাদের গ্রামের নিকট যে বিল আছে, মশার শুঁড়টি কাটিয়া আমি সেই বিলে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সেই শুঁড় হইতে এখন অনেক বড় বড় জোঁক হইয়াছে। আমার কথায় তোমাদের প্রত্যয় না হয়, জলায় একবার নামিয়া দেখ। প্রমাণ ছাড়া আমি কথা বলি না।"

লম্বোদর বলিলেন,—"মশার শুঁড় পচিয়া জোঁক হইতে পারে না।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"কেন হইবে না ? স্বেদ হইতে স্বেদজ জীব হয়। বাদা বনের পাতা পচিয়া চিংড়ি মাছ হয়। কোন বি-এ অথবা এম-এ অথবা কি একটা পাশ করা লোক কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একখানা বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পুদিনা গাছ সম্বন্ধে তাহাতে তিনি এরূপ লিখিয়াছিলেন,—একখণ্ড দড়িতে গুড় মাখাইয়া বাহিরে বাঁধিয়া দিবে। গুড়ের লোভে তাহাতে মাছি বসিয়া মলত্যাগ করিবে। মাছির মল-মূত্রে দড়িটি যখন পূর্ণ হইবে, তখন সেই দড়ি রোপণ করিবে। তাহা হইতে পুদিনা গাছ উৎপন্ন হইবে। মক্ষিকার বিষ্ঠায় যদি পুদিনা গাছ হইতে পারে, তাহা হইলে মশার শুঁড় হইতে জোঁক হইবে না কেন ?"

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—যাহা হউক, আমার বড়ই চিন্তা হইল। এত কষ্টের টাকা সব বৃথায় গেল, তাহা ভাবিয়া আমার মন আকুল হইল। কিন্তু আমি সহজে কোন কাজে হতাশ হই না। গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বৃহৎ একটি মশারি প্রস্তুত করিলাম। কাপড়ের মশারি নহে, নেটের মশারি নহে, জেলেরা যে জাল দিয়া মাছ ধরে, সেই জালের মশারি। তাহার পর পাঁচজন সাঁওতালকে চাকর রাখিলাম। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সেই পাঁচজন সাঁওতাল সঙ্গে লইয়া পুনরায় আবাদে গমন করিলাম। ধীরে ধীরে আমরা নৌকা হইতে নামিলাম। চারি কোণে চারিটি বাঁশ দিয়া চারিজন মাঝি ভিতর হইতে মশারি উচ্চ করিয়া ধরিল। তীর ধনু হাতে লইয়া চারিপার্শ্বে

চারিজন সাঁওতাল দাঁড়াইল। একজন সাঁওতালের সহিত আমি মশারির মাঝখানে রহিলাম। মশারির ভিতর থাকিয়া আমরা দশজন আবাদের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অধিক দূর যাইতে হয় নাই। বৃহৎ মশকগণ বোধ হয় অনেক দিন উপবাসী ছিল। মানুষের গন্ধ পাইয়া পালে পালে তাহারা মশারির গায়ে আসিয়া বসিল। কিন্তু মশারির ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সাঁওতাল পাঁচজন ক্রমাগত তাহাদিগকে তীর দিয়া বধ করিতে লাগিল। সেদিন আমরা আড়াই হাজার মশা মারিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ বন্ধ করিয়া পুনরায় নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। সাঁওতালগণ একঝুড়ি মৃত মশা সঙ্গে আনিয়াছিল। শুঁড়, ডানা ও পা ফেলিয়া দিয়া সাঁওতালরা মশা পোড়াইয়া ভক্ষণ করিল। তাহারা বলিল যে, ইহার মাংস অতি উপাদেয়, ঠিক বাদুড়ের মাংসের মত। আমাকে একটু চাকিয়া দেখিতে বলিল, কিন্তু আমার রুচি হইল না।

পরদিন আমরা দুই হাজার মশা বধ করিলাম, তাহার পরদিন ষোল শত, তাহার পরদিন বার শত, এইরূপ প্রতিদিন মশার সংখ্যা কম হইতে লাগিল। পঁয়ত্রিশ দিনে মশা একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। হয় আমরা সমুদয় মশা মারিয়া ফেলিলাম, আর না হয় অবশিষ্ট মশা নিবিড় বনে পলায়ন করিল। সেই অবধি আমার আবাদে এ বৃহৎ জাতীয় মশার উপদ্রব হয় নাই। মশার হাত হইতে অর্থাৎ শুঁড় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমি আবাদের চারিদিকে পুনরায় ভেড়ি বাঁধাইলাম। বন কাটাইয়া ও পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়া কয়েক ঘর প্রজা বসাইলাম। এই সমুদয় কাজ করিতে আমার আটশত টাকা খরচ হইয়া গেল। তখন দেখিলাম যে, আরও হাজার টাকা খরচ না করিলে কিছুই হইবে না। সে হাজার টাকা কোথায় পাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শূন্যপথে লোহার সিন্দুক

আমাদের গ্রাম হইতে সাত ক্রোশ দূরে কচপুরের স্বরূপ সরকেলের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। কাপড়ের দোকানে যখন কাজ করিতাম, তখন তিনি আমাদের খরিদ্দার ছিলেন। কাপড়ের দাম লইয়া তিনি বড় হেঁচড়া-হেঁচড়ি কচলা-কচলি করিতেন না। তিন সত্য করিয়া ধর্মের দোহাই দিয়া আমি তাঁহাকে বলিতাম যে, "আপনার নিকট হইতে কখনও আমি এক আনার অধিক লাভ করিব না।" কিন্তু ফলে তাঁহাকে বিলক্ষণ ঠকাইতাম। আমি ব্যবসাদারের চাকর ছিলাম। দোকানদারের রীতি এই। আলাপী লোকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে, আলাপী লোককে ঠকাইতে দোকানদারের বিলক্ষণ সুবিধা হয়। বড়বাজারে বসিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার মিথ্যাকথা বলিতাম; শত শত লোককে আমরা ঠকাইতাম। না ঠকাইলে আমাদের কাজ চলে না। এই সূত্রে সরকেলমহাশয়ের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সরকেলমহাশয়ের একটু জমিদারী আছে, তাহা ব্যতীত তিনি তেজারতি করেন। আমি ভাবিলাম যে, তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া আমি আমার আবাদের পতিত ভূমি উঠিত করিব।

এইরূপ মনে করিয়া আমি সরকেলমহাশয়ের ভবনে গমন করিলাম। আবাদ বাঁধা রাখিয়া তাঁহার নিকট এক হাজার টাকা ঋণ চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে, "আবাদ না দেখিয়া টাকা দিতে পারি না।" একজন গোমস্তাকে আমার আবাদ দেখিতে পাঠাইলেন। সাতদিন পরে পুনরায় আমাকে যাইতে

বলিলেন। এই সময় আমি দেখিলাম যে, সেই গ্রামে দুইজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সরকেলমহাশয়ের বাড়ীর বাহিরে তাঁহারা আড্ডা গাড়িয়াছেন। তাহাদের সহিত তিনটি ঘোড়া ও বৃহৎ এক কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত কালীর প্রতিমা আছে। দিনের মধ্যে তিনবার শঙ্খ ও শিংগা বাজাইয়া তাঁহারা দেবীর পূজা করেন। সমস্ত দিন অনেক লোক আসিয়া প্রতিমা দর্শন করে। খুব ধুম। যে পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী মহাশয়েরা এই গ্রামে আসিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত সরকেলমহাশয় তাঁহাদের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন। ইহার অনেক বৎসর পরে আমি নিজে সন্ন্যাসি-সংকটে পড়িয়াছিলাম তখনও এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সন্ন্যাসি-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তখন যদি কিছু অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে সরকেলমহাশয়কে সাবধান করিতাম।

সাতদিন পরে পুনরায় আমি সরকেলমহাশয়ের বাটী গমন করিলাম। সন্ধ্যাবেলা পেঁাছিলাম। সেজন্য টাকা-কড়ি সম্বন্ধে সে রাত্রি কোন কথাবার্ত্তা হইল না। সরকেলমহাশয়ের দুই মহল কোটাবাড়ী। পূর্বদিকে অন্তঃপুর, পশ্চিমদিকে সদরবাটী। সদরবাটীর উত্তর দিকে পূজার দালান। আহারাদি করিয়া আমি পূজার দালানে শয়ন করিলাম, পথশ্রমে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি বোধ হয় তখন একটা, এমন সময় ভিতরবাড়ীতে দুম্ দুম্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। আমার নিদ্রাভংগ হইল। ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু লোকের সাড়া-শব্দ কিছুই পাইলাম না। শব্দটাও ডাকাতপড়া শব্দের ন্যায় নহে। আমার বোধ হইল, যেন একটা ভারী বস্তু এক সিঁড়ি হইতে অপর সিঁড়িতে সবলে লাফাইয়া উপরতালা হইতে নীচের তালায় নামিতেছে। প্রথম মনে করিলাম যে, সরকেলমহাশয় বুঝি কোন বস্তু এই প্রকারে উপর হইতে নীচে আনিতেছেন। রথের সময় পুরুষোত্তমে জগন্নাথের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া উড়ে পাণ্ডারা যেরূপ মন্দিরের এক পৈঠা হইতে অপর পৈঠায় নামায়, সরকেলমহাশয় বুঝি সেইরূপ কোন ভারী বস্তু নামাইতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর ভিতর কোলাহল পড়িয়া গেল। সরকেলমহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, টাকাকড়িপূর্ণ তাঁহার লোহার সিন্দুক কে লইয়া যাইতেছে। তাহার পর স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া বলিল যে, ভূতে লোহার সিন্দুক লইয়া যাইতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু পরে শুনিলাম যে, সিন্দুক আপনা আপনি উপর ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। আপনা আপনি সিঁড়ির এক পৈঠা হইতে অপর পৈঠায় নামিতেছিল। লোহার সিন্দুক যখন উপর হইতে নীচে নামিতেছিল, তখন সরকেলমহাশয় একবার তাহার আংটা ধরিয়াছিলেন। পরমুহূর্তে পায়ের উপর লোহার সিন্দুক পড়িয়া তাঁহার পা ছেঁচিয়া গিয়াছিল। তখন সরকেলমহাশয় অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া রহিলেন। সিন্দুক নীচে নামিয়া ভিতরবাড়ীর দরজায় সবলে দুম দুম শব্দে আঘাত করিল। ভিতরবাড়ীর দরজা ভাংগিয়া গেল। সিন্দুক সদরবাড়ীর উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে, মাটী হইতে চারি-পাঁচ হাত উপরে শূন্যপথে সিন্দুক আপনা আপনি সদরদ্বার অভিমুখে গমন করিতেছে। তাড়াতাড়ি দালান হইতে নামিয়া আমি একটি আংটা ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। সেই সময়ে সরকেলমহাশয়ের দারোয়ান রামগোপাল সিংও আসিয়া সিন্দুকের অপর পার্শ্বের আংটা ধরিয়া ফেলিল। সিন্দুক তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া দ্বারবানের পা ছেঁচিয়া দিল। সে মাটীতে পড়িয়া, 'জান গিয়া জান গিয়া' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভাগ্যে আমার পায়ে পড়ে নাই। আমার পায়ে পড়িলে আমি মারা যাইতাম। এ নিশ্চয়ই ভৌতিক ব্যাপার, এইরূপ বুঝিয়া আমি আর সিন্দুক ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম না।

সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া সিন্দুক গুরুভাবে তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল। তিন ঘায়ে সদর দরজা ভাঙিগয়া ফেলিল। সদরদ্বার ভাঙিগয়া সিন্দুক শূন্যপথে গ্রাম পার হইয়া মাঠের দিকে যাইতে লাগিল। গভীর রাত্রিতে ভয়ানক শব্দ শুনিয়া গ্রামের লোক মনে করিল যে, সরকেলমহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। লাঠি-সোটা লইয়া প্রতিবেশিগণ দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু তখন সিন্দুক গ্রামের প্রান্তভাগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সরকেলমহাশয়ের গৃহে ও নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগের গৃহে হাতা, বেড়ি, কড়া, দা, কুড়ুল, ছুরি, কাঁচি যাহা কিছু লোহার দ্রব্য ছিল, সমুদয় বাহির হইয়া সন্ সন্ শব্দে শূন্যপথে সিন্দুকের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা বলিলে তোমরা হয় তো বিশ্বাস করিবে না, অতএব চুপ করিয়া থাকাই ভাল।"

লম্বোদর বলিলেন,—"বিশ্বাস করি না করি বলই না ছাই।"

ডমরুধর বলিলেন,—"বাঘের ছালের ভিতর প্রবেশ করিয়া যখন তোমাদের সম্মুখে লম্ফঝম্ফ করিয়াছিলাম, তখন তো বিশ্বাস করিয়াছিলে। তখন পুকুরে গিয়া কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়াছিলে!"

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—"বাঘ দেখি নাই। বাঘ বাঘ বলিয়া একটা গোল পড়িয়াছিল, তাহা শুনিয়াই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পলায়ন করিয়াছিলাম।"

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—"না না,—বিশ্বাস করিব না কেন? তাহার পর কি হইল বল।"

উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণও অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন। তখন ডমরুধর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমার কোমরে তখন বড় একথোলে চাবি থাকিত। কিন্তু তখন কেবল আমার দুইটি বাক্স ছিল। লোকে মনে করিবে যে, ইহার অনেক টাকা আছে, টাকা রাখিতে স্থান হয় না, তাই অনেক বাক্স করিতে হইয়াছে, ঐ চাবিগুলি সেই সব বাক্সের। দেখ লম্বোদর! সত্য সত্য লোকের টাকা না থাকুক, একটা জনরব উঠিলেই হইল যে, অমুকের অনেক টাকা আছে। কাহাকেও একটি পয়সা দিতে হয় না। মুখবন্ধ গুড়ের কলসীর নিকট কত মাছি থাকে। তাহারা একফোঁটাও গুড় খাইতে পায় না, তথাপি আশেপাশে ভ্যান্ ভ্যান্ করে। সেইরূপ যদি লোকে শুনিতে পায় যে, অমুকের অনেক টাকা আছে, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোক তাহার আশে-পাশে আসিয়া ভ্যান্ ভ্যান্ করে, সে হাই তুলিলে তুড়ি দেয়। বিশেষতঃ আমার হাই। আমার হাই তোলা দেখিলে মানুষের প্রাণ শীতল হয়। হাই তুলিয়া একবার সকলকে দেখাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সন্ন্যাসীর কালীঠাকুর

সকলে মনে করিবে যে, আমার অনেক টাকা আছে, সেইজন্য বৃহৎ চাবির থোলো সর্বদা আমি কোমরে পরিতাম। চারি-পাঁচটী ঘুনসি একত্র পাকাইয়া মোটা দড়ির ন্যায় করিয়া, চাবির থোলো তাহাতে বাঁধিয়া আমি কোমরে পড়িয়াছিলাম।

যখন লোকের হাতা, বেড়ি, খন্তা, কুড়ুল সন্ সন্ শব্দে আইরণচেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল, তখন আমার চাবির থোলেতে টান ধরিল। সহজ অবস্থায় চাবির থোলো ঝুলিয়া থাকে, এখন সোজা সটান হইয়া লোহার সিন্দুকের পশ্চাতে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার পশ্চাৎ দিকের কোমরের মাংসে ঘুনসি বসিয়া গেল, আমার ঘোর যাতনা হইল, আমি ভাবিলাম যে, কোমর পর্য্যন্ত

কাটিয়া আমার শরীর বা দুইখানা হইয়া যায়। একটু আলগা করিবার নিমিত্ত আমি চাবির খোলোটী ধরিতে যাইলাম। যেই ছুঁইয়াছি, আর আমার হাতে যেন হাজার সূচ ফুটিয়া গেল। চাবি হইতে আমি হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। চাবি আমাকে মাঠের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। "আমার প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ বাঁচাও" বলিয়া আমি গ্রামের লোককে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু এ 'ভূতের কাণ্ড' এইরূপ মনে করিয়া সকলে পলায়ন করিল, আপন ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

চাবির খোলো আমাকে মাঠের দিকে লইয়া চলিল। মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, আগে অনেক দূরে তিনটী ঘোড়া যাইতেছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, সেজন্য অনেকটা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দুইটা ঘোড়ার উপর দুইজন সন্ন্যাসী চড়িয়াছে, তৃতীয় ঘোড়ার উপর সেই প্রস্তরের কালীমূর্তি ও পূজার আসবাব বোঝাই আছে। তাহার পশ্চাতে প্রায় পাঁচশত হাত দূরে মাটী হইতে চারি-পাঁচ হাত উপরে শূন্যপথে লোহার সিন্দুক যাইতেছে। সিন্দুক হইতে প্রায় দুইশত হাত পশ্চাতে হাতা, বেড়ি, কড়া, খন্তা, দা, কুড়ুল, লৌহনির্মিত দ্রব্যসমূহ সেইরূপ শূন্যপথে যাইতেছে। তাহার প্রায় দুইশত হাত দূরে চাবির খোলো আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কাণ্ডখানা কি, তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তখন আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি, কোমর কাটিয়া শরীরটি দুইখানা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভাবিবার চিন্তিবার তখন সময় ছিল না।

মাঠের উপর দিয়া প্রায় একক্রোশ পথ এই ভাবে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার পর সহসা দুম করিয়া শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলাম যে দূরে সিন্দুকটি মাটীতে পড়িয়াছে, তাহার শব্দ। আরও নিরীক্ষণ করিলাম যে, সিন্দুকের অগ্রে ঘোড়া তিনটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সন্ন্যাসী দুইজন ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়াছে, আর তৃতীয় ঘোড়া হইতে কালীর প্রতিমাটিও নামাইয়া নীচে মাটীর উপর সিংহাসনে রাখিয়াছে।

সিন্দুকটি যেই মাটীতে পড়িল, আর তাহার পরক্ষণেই হাতা, বেড়ি, খন্তা, কুড়ুল প্রভৃতি ঝুপঝাপ ঠুনঠান করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার পরক্ষণেই আমার চাবি পূর্বের ন্যায় কোমরে ঝুলিয়া পড়িল। কোমরে ঘুনসির টান আর রহিল না। তখন আমার ধড়ে প্রাণ আসিল, তখন যথানিয়মে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি সুস্থির হইলাম। সেই স্থানে আমি প্রায় একঘণ্টা পড়িয়া রহিলাম। একঘণ্টা পরে যখন আমি পুনরায় চাহিয়া দেখিলাম, তখন দেখিলাম যে, দূরে সে ঘোড়াও নাই, সে সন্ন্যাসীও নাই; অনেকক্ষণ পরে অতি সাবধানে, অতি ধীরে ধীরে, অতি ভয়ে ভয়ে আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম যে, সন্ন্যাসী দুইজন লোহার সিন্দুকটি কোনরূপে ভাঙিগয়াছে অথবা খুলিয়াছে। তাহার ভিতর টাকাকড়ি, গহনা-পত্র যাহা কিছু ছিল সে সমুদয় লইয়া গিয়াছে। চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়াছড়ি হইয়া আছে। দুই চারিখানি কাগজে ষ্ট্যাম্প দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে সব দলিলপত্র। তাহাতে আমি হাত দিলাম না। অন্য একতাড়া কাগজ তুলিয়া দেখিলাম যে, সে কোম্পানীর কাগজ, তাহা আমি ফেলিয়া দিলাম। আর একতাড়া কাগজ পাইলাম, তাহা কি? লম্বোদর! সেদিন তোমাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি ভাগ্যবান্ পুরুষ। আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। কাগজ তাড়াটি একটু খুলিয়া দেখিলাম যে, সে সব নোট। তাহার পর দৌড়। বেলা নয়টার সময় বাড়ীতে পৌঁছিয়া, তবে হাঁপ ছাড়িলাম।

লম্বোদর বলিলেন,—"এ সমুদয় তোমার আজগুবি গল্প। এ অনেক দিনের

কথা, কিন্তু আমরা সেই সময় শুনিয়াছিলাম যে, সরকেলমহাশয়ের বাড়ী যথার্থই চুরি হইয়াছিল এবং সে চোরগণ তোমার অপরিচিত লোক ছিল না।"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"সমুদয় মিথ্যাকথা, হিংসায় লোকে কি না বলে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ : চুম্বকের সার

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—"বাড়ীতে আসিয়া নোটগুলি গণিয়া দেখিলাম যে, দুইশত দশ টাকার নোট, মোট দুই হাজার টাকা। আর ঋণের প্রয়োজন কি? সরকেলমহাশয়কে আমি এক পত্র লিখিলাম যে,—"সেদিন আপনার বাড়ীতে গিয়া ভূতের হাতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম। আপনার টাকায় আমার প্রয়োজন নাই।"

তাহার পর সেই টাকা দিয়া আমি সমুদয় আবাদটি উঠিত করিলাম। এখন সেই স্থানে সোনা ফলিতেছে। তাহার লাভ হইতে ক্রমে ক্রমে আমি আরও অনেক আবাদ ক্রয় করিলাম। আমি ছাই-মুঠা ধরিলে সোণা-মুঠা হইয়া যায়। সে অঞ্চলে এখন অনেক লোকের আবাদ হইয়াছে। বহুদূর পর্য্যন্ত এখন লোকের বাস হইয়াছে। নদীতে খেয়া বসিয়াছে, মাঝে মাঝে হাট বসিয়াছে। গ্রীষ্মকালে কোন কোন স্থানে বরফের কুলফি বিক্রয় হয়। শীতকালে হিন্দুস্থানীরা ফুলুরি ফেরি করিয়া বেড়ায়। যে সাঁওতালগণ মশা মারিতে আমার সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি জমি দিয়াছি, তাহারা আমার প্রজা হইয়াছে। তাহাদিগের দেখাদেখি আরও অনেক সাঁওতাল নিকটস্থ আবাদসমূহে বাস করিয়াছে।

এখন আমার কিরূপ সম্পত্তি হইয়াছে, কিরূপ জনসাধারণের নিকট আমি গণ্যমান্য হইয়াছি, তাহা তোমরা অবগত আছ। শ্বশুর প্রহ্লাদবাবু সম্বন্ধে আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। মালতীকে আপনা হইতে তিনি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিজে, তাঁহার পুত্রগণ, তাঁহার ভগিনী কতবার যে আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। এখন মালতী জীবিত নাই। এখন অবশ্য তাঁহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। শুনিয়াছি যে, এখন সংসারে তাঁহাদের আর কেহ নাই। দেশে গিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে সে সংসার মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে।"

লম্বোদর বলিলেন,—"অনেক কথা তো শুনিলাম। তুমি বলিলে যে, সরকেলমহাশয়ের বাড়ী চুরি হয় নাই, আর সে চোরগণকে তুমি দ্বার খুলিয়া দাও নাই। তবে সন্ন্যাসী দুইজন কি করিয়াছিল যে, লোহার সিন্দুক ও অন্যান্য লোহা-লক্কড়ে টান ধরিয়াছিল?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন যে,—"আমি যখন কাপড়ের দোকানে কাজ করিতাম, তখন কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর সে স্থানে পুঁথি পড়া হইত। মহাভারত রামায়ণের পর একজন আরব্য উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক রাজপুত্রের গল্প শুনিয়াছিলাম। জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রপথে তিনি দেশ-বিদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। অবশেষে ঝড়ে তাড়িত হইয়া তাঁহার জাহাজ এক কৃষ্ণবর্ণের পর্বতের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। জাহাজের যত পেরেক ছিল, সব খুলিয়া সেই পর্বতে গিয়া লাগিল। জাহাজ জলমগ্ন হইল। আমার বোধ হয়, সন্ন্যাসীদের যে বৃহৎ কালীমূর্ত্তি ছিল, তাহা চুম্বক পাথরে গঠিত। কিন্তু সে সামান্য চুম্বক পাথর নহে। চোলাই করা চুম্বক পাথরের সার। সিংহাসনটি এরূপ পদার্থে গঠিত, যাহা ভেদ করিয়া চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণশক্তি দূরে যাইতে পারেনা। প্রথম কয়দিন সন্ন্যাসী দুইজন দেবীকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিল। সে নিমিত্ত সে কয়দিন

লৌহদ্রব্যে টান ধরে নাই। শেষদিন গভীর রাত্রিতে তাহারা দেবীকে সিংহাসন হইতে নিম্নে রাখিয়াছিল, আর সেই সময় নিকটস্থ লৌহনির্মিত দ্রব্য আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে রাত্রিতে প্রথম আমি দেখিয়াছিলাম যে, তৃতীয় ঘোড়ার উপর বলদের ছালার ন্যায় তাহারা দুইদিকে দুই প্রকার বোঝা রাখিয়াছিল। বোধ হয়, একদিকে প্রতিমা, অপর দিকে সিংহাসন ও পূজার সামগ্রী রাখিয়াছিল। সিংহাসন হইতে মূর্তি পৃথক ছিল, সেজন্য তখনও লোহার দ্রব্যে টান ছিল; তাহার পর মাঠে প্রতিমা নামাইয়া সেই সিংহাসনে বসাইয়াছিল, আর প্রতিমার আকর্ষণশক্তি লোপ হইয়াছিল। তাহার পর সিংহাসনের উপর মূর্তি রাখিয়া ঘোড়ার উপর সেইভাবে বোঝাই দিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। আমার বোধ হয় লৌহদ্রব্যসমূহ এই কারণে শূন্যপথে ভ্রমণ করিয়াছিল।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে গল্পটি করিলে, উহার কোন প্রমাণ আছে?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"প্রমাণ নাই? নিশ্চয় আছে। সে চাবির খোলা এখনও আমার ঘরে আছে। বল তো এখনি আনিয়া দেখাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ : কুম্ভীর-বিভ্রাট

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুনিয়াছি যে, সুন্দরবনে নদীনালায় অনেক কুমীর আছে। তোমার আবাদে কুমীর কিরূপ?"

ডমরুধর বলিলেন,—"কুমীর! আমার আবাদের কাছে যে নদী আছে, কুমীরে তাহা পরিপূর্ণ। খেজুর গাছের মত নদীতে তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়, অথবা কিনারায় উঠিয়া পালে পালে তাহারা রৌদ্র পোহায়। গরুটা, মানুষটা, ভেড়াটা, ছাগলটা, বাগে পাইলেই লইয়া যায়। কিন্তু এ সব কুমীরকে আমরা গ্রাহ্য করি না। একবার আমার আবাদের নিকট এক বিষম কুমীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। গন্ধমাদন পর্বতে কালনিমের পুকুরে যে কুমীর হনুমানকে ধরিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক, গঙ্গাদেবী যে মকরের পীঠে বসিয়া বায়ু সেবন করেন, সে মকরকে ঐ কুমীর একগালে খাইতে পারে। পর্বতপ্রমাণ যে গজ সেকালে বহুকাল ধরিয়া কচ্ছপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সে গজ-কচ্ছপকে এ কুমীর নস্য করিতে পারে। ইহার দেহ বৃহৎ, তালগাছের ন্যায় বড়, ইহার উদর এই দালানটির মত, অন্যান্য কুমীর জীব-জন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এ কুমীরটা আস্ত গরু, আস্ত মহিষ গিলিয়া ফেলিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁদ দিয়া মানুষ ও গরু-বাছুর লইয়া যাইত। লাঙ্গুলে জল আনিয়া দেওয়াল ভিজাইয়া গর্ত করিত। ইহার জ্বালায় নিকটস্থ আবাদের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রজাগণ পাছে আবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করে, আমাদের সেই ভয় হইল, তাহার পর লাঙ্গুলের আঘাতে নৌকা ডুবাইয়া আরোহীদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে নিমিত্ত এ পথ দিয়া নৌকায় যাতায়াত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই ভয়ানক কুম্ভীরের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাই এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আমার আবাদের নিকট একখানি নৌকা ডুবাইয়া তাহার আরোহীদিগকে একে একে আমাদের সমক্ষে সে গিলিয়া ফেলিল। এই নৌকায় এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে সপরিবারে পূর্বদেশে যাইতেছিলেন। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার গৃহিণীর সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তোমরা জান যে, কুমীরের পেটে মাংস হজম হয়, গহনা পরিপাক পায় না। কুমীর যখন সেই স্ত্রীলোককে গিলিয়া ফেলিল, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদয় হইল,

—চিরকাল আমি কপালে পুরুষ; যদি এই কুমীরটাকে আমি মারিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পেট চিরিয়া এই গহনাগুলি বাহির করিব, অন্ততঃ পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। বড় একটি জাহাজের নঙ্গর কিনিয়া উকো ঘষিয়া তাহাতে ধার করিলাম, তাহার পর যে কাছিতে মানোয়ারি জাহাজ বাঁধা থাকে, সেইরূপ এক কাছি ক্রয় করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া আমি আবাদে ফিরিয়া আসিলাম। আবাদে আসিয়া শুনিলাম যে, কুমীর আর একটা মানুষ খাইয়াছে। চারিদিন পূর্বে এক সাঁওতালনী এক ঝুড়ি বেগুণ মাথায় লইয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল। সে যেই নদীর ধারে গিয়াছে, আর কুমীর তাহাকে ধরিয়া বেগুণের ঝুড়ির সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে সাঁওতাল প্রজাগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; বলিতেছে যে, আবাদ ছাড়িয়া তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে।

আবাদে আসিয়া নঙ্গরটিকে আমি বঁড়শী করিলাম। তাহাতে জাহাজের কাছি বাঁধিয়া দিলাম, মাছ ধরিবার জন্য লোকে যে হাতসূতা ব্যবহার করে, বৃহৎ পরিমাণে এও সেইরূপ হাতসূতার ন্যায় হইল। নঙ্গরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে এক মহিষের বাছুর গাঁথিয়া নদীর জলের নিকট বাঁধিয়া দিলাম। কাছির অন্যদিক্ এক গাছে পাক দিয়া রাখিলাম, তাহার পর পঞ্চাশ জন সবল লোককে নিকটে লুক্কায়িত রাখিলাম। বেলা তিনটার সময় আমাদের এই সমুদয় আয়োজন সমাপ্ত হইল।

বঁড়শীতে মহিষের বাছুর বিঁধিয়া দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণ আমরা একেবারে বধ করি নাই। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সে গাঁ গাঁ শব্দে ডাকিতে লাগিল, তাহার ডাক শুনিয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে সেই প্রকাণ্ড কুমীর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার লেজের ঝাপটে পর্বতপ্রমাণ এক ঢেউ উঠিল, সেই ঢেউয়ে বাছুরটি ডুবিয়া গেল তখন আর আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরক্ষণেই কাছিতে টান পড়িল। তখন আমরা বুঝিলাম যে, নঙ্গরবিদ্ধ বাছুরকে কুমীর গিলিয়াছে, বঁড়শীর ন্যায় নঙ্গর কুমীরের মুখে বিঁধিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। ভাগ্যে গাছে পাক দিয়া রাখিয়াছিলাম, তা না হইলে কুমীরের বলে এই পঞ্চাশ জন লোককে নদীতে গিয়া পড়িতে হইত। আমরা সেই রাক্ষস কুমীরকে বঁড়শীতে গাঁথিয়াছি, ঐ কথা শুনিয়া চারিদিকের আবাদ হইতে অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল। প্রায় পাঁচশত লোক সেই রশি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দারুণ আসুরিক বলে কুমীর সেই পাঁচশত লোকের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কখন আমাদের ভয় হইল যে, তাহার বিপুল বলে নঙ্গর বা ভাঙ্গিয়া যায়, কখন ভয় হইল যে, সে জাহাজের দড়া বা ছিঁড়িয়া যায়। কখন ভয় হইল, গাছ উৎপাটিত হইয়া নদীতে গিয়া বা পড়ে। নিশ্চয় একটা না একটা বিভ্রাট ঘটিত, যদি না সাঁওতালগণ কুমীরের মস্তকে ক্রমাগত তীরবর্ষণ করিত, যদি না নিকটস্থ দুইটি আবাদের লোক বন্দুক আনিয়া কুমীরের মাথায় গুলী মারিত। তীর ও গুলী খাইয়া কুমীর মাঝে মাঝে জলমগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নিঃশ্বাস লইবার জন্য পুনরায় তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে হইল। সেই সময় লোক তীর ও গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। কুমীরের রক্তে নদীর জল বহুদূর পর্য্যন্ত লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কুমীরের সহিত আমাদের এইরূপ যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃকালে কুম্ভীর হীনবল হইয়া পড়িল। বেলা নয়টার সময় তাহার মৃতদেহ জলে ডুবিয়া গেল। তখন অতি কষ্টে তাহাকে আমরা টানিয়া উপরে তুলিলাম।

বড় বড় ছোরা বড় বড় কাস্তে আনিয়া তাহার পেট চিরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে রাক্ষস কুমীরের পেট অতি কঠিন ছিল। আমাদের সমুদয় অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে করাত আনাইয়া করাতের দ্বারা তাহার উদর কাটাইলাম। কিন্তু পেট চিরিয়া তাহার পেটের ভিতর যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলে ?"

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলে ?"

অন্যান্য শ্রোতৃগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলে ?"

ডমরুধর বলিলেন,—"বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে সেই সাঁওতাল মাগী চারদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুণের ঝুড়িটি সে উপুর করিয়াছে, সেই বেগুণগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুণ বেচিতেছে।"

শঙ্কর ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুমীরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুণ বেচিতেছিল ?"

ডমরুধর বলিলেন,—"হাঁ ভাই! কুমীরের পেটের ভিতর সেই ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুণ বেচিতেছিল।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহাকে সে বেগুণ বেচিতেছিল ? কুমীরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথা ?"

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—"তোমার এক কথা! কাহাকে সে বেগুণ বেচিতেছিল, সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না। সমুদয় গহনাগুলি সে নিজের গায়ে পরিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম,—"মাগী! ও গহনা আমার। অনেক টাকা খরচ করিয়া আমি কুমীর ধরিয়াছি, ও গহনা খুলিয়া দে।" কেঁউ মেউ করিয়া মাগী আমার সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার পুত্রগণ ও তাহার জ্ঞাতি-ভাইগণ কাঁড়বাঁশ ও লাঠিসোটা লইয়া আমাকে মারিতে দৌড়িল। আমার প্রজাগণ কেহই আমার পক্ষ হইল না। সুতরাং আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সাঁওতালগণ সে মাগীকে ঘরে লইয়া গেল। দিনকয়েক শূকর মারিয়া ও মদ খাইয়া তাহারা আমোদ-প্রমোদ করিল। পূর্বদেশীয় সে ভদ্রমহিলার একখানি গহনাও আমি পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে, কপালে পুরুষের ভাগ্যও সকল সময় প্রসন্ন হয় না।"

লম্বোদর বলিলেন,—"এত আজগুবি গল্প তুমি কোথায় পাও বল দেখি ?"

ডমরুধর বলিলেন,—"এতক্ষণ হাঁ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে গল্পটি শুনিতেছিলে। যেই হইয়া গেল, তাই এখন বলিতেছ যে, আজগুবি গল্প। কলির ধর্ম বটে!"

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কুমীরের গল্প যে সত্য, তাহার কোন প্রমাণ আছে ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"প্রমাণ ? নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কোমরের ব্যথার জন্য এই দেখ সেই কুমীরের দাঁত আমি পরিয়া আছি।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কুমীর যদি তালগাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তাহার দাঁত এত ছোট কেন ? ঠিক অন্য কুমীরের দাঁতের মত কেন ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"অনেক মানুষ খাইয়া সে কুমীরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।"

তৃতীয় গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : নন্দীর ক্রোধ

ডমরুধরের পূজার দালান। প্রতিমা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে ডমরুধর, তাঁহার পুরোহিত ও বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন।

ডমরুধর বলিলেন,—"কলিকাতায় একবার এক খোলার ঘরের আগড়ের উপর একখানি কাজগ দেখিলাম। তাহাতে লেখা ছিল—ভাগ্যগণনা ⁄০ এক আনা।"

গণৎকারের নিকট আমি গমন করিলাম। অনেক কচলা-কচলি করিয়া শেষে এক পয়সায় রফা হইল। দৈবজ্ঞ হাত দেখিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আমার একবার হাই উঠিল। তোমরা আমার হাই অনেকবার দেখিয়াছ।

প্রথম হইতেই আমার রূপ দেখিয়া গণৎকার মোহিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার সহিত যখন দর কসাকসি করি, তখন তাঁহার মন আরও প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখন আমার হাই দেখিয়া তিনি একেবারে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অধিক আর গণিতে-গাঁথিতে হইল না। হাতটি ধরিয়াই তিনি বলিলেন,—"মহাশয় মনুষ্য নহেন। মহাশয় কার্ত্তিকেয়, যাঁহাকে ষড়ানন বলে, মা দুর্গার কনিষ্ঠ পুত্র। অবতার হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার প্রতি কি কোনরূপ অভিশাপ হইয়াছিল?"

দৈবজ্ঞ উত্তর করিলেন,—"না, তাহা নহে। বিবাহ করিবার নিমিত্ত একদিন আপনি মায়ের নিকট আব্দার করিয়াছিলেন। ভগবতী বলিলেন,—বাছা, এ দেবলোকে তোমাকে কেহ কন্যা প্রদান করিবে না। যদি বিবাহ করিতে সাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীতে গিয়া অবতীর্ণ হও।"

দৈবজ্ঞ আরও বলিলেন,—"পৃথিবীতে আপনি আসিয়াছেন, কিন্তু একটু সাবধানে থাকিবেন। মা দশভূজা আপনাকে ভালবাসেন, সেজন্য আপনার প্রতি নন্দীর একটু ঈর্ষা আছে। ছল পাইলে সে আপনাকে দুঃখ দিবে।"

দেখ লম্বোদর, ঐ যে ময়ূরের উপর যিনি বসিয়া আছেন, উনি আর কেহ নহেন, উনি আমি স্বয়ং। অবতার হইলে দেবতারা আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকেন, আমিও সেই জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া আছি। আর তোমরাও আমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছ না।

লম্বোদর বলিলেন,—"হাঁ, কার্ত্তিকের মত তোমার রূপ বটে!"

ডমরুধর বলিলেন,—"ঠাট্টা কর, আর যাই কর। গণৎকার যাহা বলিয়াছে, তাহা ঠিক। নন্দীর কোপে পড়িয়া কয়মাস যে আমি ঘোরতর কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা তো আর মিথ্যা নহে?"

লম্বোদর বলিলেন,—"আবার বুঝি একটা আজগুবি গল্প হইবে?"

ডমরুধর রাগিয়া বলিলেন,—"তোমার যদি শুনতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে কানে আঙ্গুল দিয়া থাক।"

তাহার পর পাঁচজনের অনুরোধে ডমরুধর এইরূপে গল্পটি বলিতে লাগিলেন,—

গত বৎসর নবমী পূজার দিন। রাত্রি শেষ হইয়াছে। বাহির বাড়ীতে কিরূপ

একটা খুটখাট শব্দ হইতে লাগিল। দু'পয়সা আমার সংগতি আছে। কাজেই আমাকে সর্বদা সতর্ক ও শংকিত থাকিতে হয়। আমি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখি যে দালানের প্রতিমার সম্মুখে একটা বিকটাকার মর্দ্দ পূজার সমুদয় দ্রব্যাদি লইয়া গাঁঠরি বাঁধিতেছে। পূজার সমুদয় উপকরণ যাহা তখন দালানে ছিল, মায় বেশ্যাবাড়ীর মৃত্তিকাটুকু পর্য্যন্ত, সমস্ত দ্রব্য সে বাঁধিয়া লইতেছে। তাহার নিকটে একটা ত্রিশূল পড়িয়া ছিল। বুঁচকি বাঁধিয়া ত্রিশূলের আগায় আটকাইয়া সে কাঁধে তুলিবার উপক্রম করিল।

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, অবতার হইলে দেবতাদের আত্মবিস্মৃতি হয়। আমি যে ভগবতীর পুত্র কার্ত্তিক, রাগের ধমকে সে কথা একেবারে ভুলিয়া যাইলাম। সেই লোকটাকে গালি দিয়া আমি বলিলাম,—"বদমায়েস চোর! পূজার দ্রব্য চুরি করিতেছিস।"

সে লোকটা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। পোঁটলার এক দিক ধরিয়া আমি টানিতে লাগিলাম। ঈষৎ হাসিয়া পোঁটলার অপর দিক ধরিয়া সে টানিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—"পোঁটলা ছাড়িয়া দে।" সে উত্তর করিল,—"দিয়া নিলে কি হয় তা জান? কালীঘাটের কুকুর হয়।" আমি বলিলাম,—"কবে তোকে এ সব জিনিষ আমি দিয়াছি?"

দুইজনে বিষম টানাটানি চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বল অধিক, তাহার সহিত আমি পারিলাম না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাহার হাতে এক কামড় মারিলাম।

সে লোকটি বলিল,—"ছি! তোমার এখনও দুষ্টুমি যায় নাই। দেবতারা পৃথিবীতে আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন না। ইন্দ্র শূকর হইয়া ছানা-পোনা লইয়া সুখে কালযাপন করিতেছিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রামচন্দ্রকে অনেক কৌশল করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-পৌত্রদিগের পদভরে মেদিনী টলটলায়মানা হইয়াছিল। আমার বাবাঠাকুরও অতি কষ্টে কোঁচিনীদিগের ক্ষেত্রে জলসেচন করিয়াছিলেন। সেজন্য কোঁচিনী ছুঁড়িরা টিটকারি দিয়া বলিয়াছিল,—

'দুই শরা জল ছেঁচিয়া কোমরে দিলে হাত।
এমনি করিয়া খাবে তুমি কোঁচিনী পাড়ার ভাত?'

কৈলাসে মা আমার কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে বাবাকে আমরা পুনরায় স্বস্থানে লইয়া গিয়াছিলাম। দাদাঠাকুর, তোমাকেও একটু কষ্ট দিতে হইবে, তবে তোমার বিবাহের সাধ মিটিবে। সেজন্য আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি,—ছয় মাস কাল তুমি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবে। ছয় মাস কাল তুমি নানা বিপদে পতিত হইবে। তুমি যেমন ফোকলা মুখে আমার হাতে কামড় মারিলে, সেইরূপ আর একজনের হাতে কামড় মারিয়া তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : টাকে ঠোকর

এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। যে বুদ্ধির দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়া দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলাম, সেই

দেববুদ্ধি আমার লোপ হইয়া গেল। আমি ঠিক মনুষ্যের মত নিমেষপূর্ণ নয়নে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া পড়িলাম।

লম্বোদর প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিলে?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"বলিব কি ভাই আর আশ্চর্য্য কথা! আমি দেখিলাম যে, স্বয়ং মহাদেব গণেশের হাত ধরিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার স্কন্ধে কিন্তু কার্ত্তিক নাই। কি করিয়া শিব কার্ত্তিককে লইবেন? ডমরুরূপে এইমাত্র কার্ত্তিক নন্দীর সহিত পোঁটলা কাড়াকাড়ি করিতেছিলেন। পশ্চাতে দেবী ছলছল নয়নে দণ্ডায়মানা আছেন। উঠানে সজ্জিত দোলা রহিয়াছে। উড়ে ভূতগণ দোলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—নন্দী কেঁাঠি গলা, দের হউচি ঠিকে জলদি কর। ইত্যাদি।

দেবী মহাদেবের কানে চুপি চুপি কি বলিলেন। কি বলিলেন, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বোধ হয় পৃথিবীতে আমাকে আরও অনেক দিন রাখিয়া শিক্ষা দিতে তাঁহারা পরামর্শ করিলেন। দুরন্ত বালককে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা-পিতাকে কঠিন হইতে হয়।

আমি এখন সকল কথা বুঝিলাম, গত বৎসর নবমী পূজার দিন ৫৮ দণ্ড নবমী ছিল। দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে দশমী পড়িয়াছিল; সেই শুভক্ষণে মা কৈলাস পর্বতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। গত বৎসর মা দোলায় গমন করিয়াছিলেন। সেজন্য মহামারী হইয়াছিল। উঠানে দোলা রাখিয়া উড়ে বেহারা ভূতগণ সেই জন্য কিচির-মিচির করিতেছিল।

প্রথম আমি নন্দীদাদার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তখন অবশ্য নন্দীদাদা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করি নাই। তিনি বলিলেন,—"একথাবা থুতু তুমি আমার হাতে দিয়াছ, তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না।"

তাহার পর শিবের পায়ে পড়িয়া আমি স্তব করিতে লাগিলাম। সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলিলেন,—"নন্দীর শাপ আমি মোচন করিতে পারি না। অন্য বর প্রার্থনা কর।"

কি বর প্রার্থনা করিব, তখন আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি বলিলাম,—"ভগবান। যদি বর দিবেন, তাহা হইলে আপনার একটি ভূত আমাকে প্রদান করুন।"

হাসিয়া শিব বলিলেন,—"ছোটখাটো ভাল মানুষ একটি ভূত তোমার নিকট আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তাহাকে তুমি অধিক দিন রাখিতে পারিবে না।"

তাহার পর দেবীর পাদপদ্ম পড়িয়া আমি স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বলিলেন,—"ডমরুধর! তুমি আমার পরম ভক্ত। সেজন্য সশরীরে তোমার পূজা গ্রহণ করিতে আমরা আসিয়াছিলাম। এ বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র লোক আমার পূজা করে। কিন্তু তাহাদের অনেকে মুর্গি ভক্ষণ করে। সেজন্য তাহাদের পূজা আমি গ্রহণ করি না। তোমার মাথার মাঝখানে যদি টাক না থাকিত, তাহা হইলে তুমি টিকি রাখিতে। দেখ, আগামী বৎসরে তুমি অতি সংক্ষেপে আমার পূজা করিবে। এত দ্রব্যাদি দিলে নন্দী বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

পুনরায় আমি ফাঁপরে পড়িলাম। কি চাহিব, তাহা খুঁজিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি বলিলাম,—"মা! সুন্দরবনে আমার আবাদে মৃগনাভি হরিণের চাষ করিবার নিমিত্ত স্বদেশী কোম্পানী খুলিব মনে করিতেছি।

ভেড়ার পালের ন্যায় বাঙ্গালার লোক যেন টাকা প্রদান করে, আমি এই বর প্রার্থনা করি।"

দেবী বলিলেন,—"কৈলাস পর্বতের নিকট তুষারবৃত হিমাচলে কস্তুরী হরিণ বাস করে। সুন্দরবনে সে হরিণ জীবিত থাকিবে কেন?"

আমি বলিলাম,—"যে কাজ সম্ভব, যে কাজে লাভ হইতে পারে, সে কাজে বাঙ্গালী বড় হস্তক্ষেপ করে না। উদ্ভট বিষয়েই বাঙ্গালী টাকা প্রদান করে।"

দেবীর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে,এমন সময় নন্দী তাহার দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলের উল্টা পিঠের গাঁট দিয়া আমার মাথায় টাকের উপর তিনটী ঠোকর মারিল। সেই ঠোকরের আঘাতে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

ডমরুধরের দালানে চতুর্ভুজ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক বসিয়া গল্প শুনিতেছিলেন। লম্বোদর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, চতুর্ভুজ! তুমি তো বি-এ পাস করিয়াছ, অনেক লেখা-পড়া শিখিয়াছ। ডমরুধর শিব ও দুর্গার স্তবের কথা বলিলেন। তুমি একটা স্তোত্র বল দেখি, শুনি।"

চতুর্ভুজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"শিব-দুর্গার স্তোত্র এই, ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপনায় স্বাহা। ওঁ অপনায় স্বাহা।"

পুরোহিত হাসিয়া বলিলেন,—"ও স্তোত্র নহে।"

তাহার পর তিনি অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ-গরাভরণম্। রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥" ইত্যাদি। পুনরায়—

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে। নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥" ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—"কিছুক্ষণ পরে আমার চৈতন্য হইল। আমি উঠিয়া বসিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, মহাদেব নাই, দুর্গা নাই, নন্দী নাই, দোলা নাই, সে স্থানে কেহই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য! আছে কেবল আর একটি "আমি।" সেই টাক, সেই পাকা চুল, সেই কৃষ্ণ বর্ণ, সেই নাক, সেই মুখ, ফলকথা—হুবহু সেই আমি। প্রতিমার একপার্শ্বে একটি আমি বসিয়া আছি, প্রতিমার অপরপার্শ্বে আর একটি আমি বসিয়া আছি, কোন আমিটি প্রকৃত আমি, তাহা আমি ঠিক করিতে পারিলাম না। একদিকের আমি অন্য দিকের আমিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়ের নাম?" সে উত্তর করিল,—"ডমরুধর।" পুনরায় অপর আমি এ দিকের আমিকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। সেও সেইরূপ উত্তর করিল, ফলকথা, এ আমিও যা করে ও যা বলে, ও আমিও তাই করে ও তাই বলে।

তখন আমার সকল কথা হৃদয়ঙ্গম হইল। সেবার সন্ন্যাসী-সঙ্কটে আমার লিঙ্গশরীর বাহির হইয়া যমালয়ে গিয়াছিল। শুনিয়াছি যে, আমাদের শরীর অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ প্রভৃতি কয়েকটি কোষ দ্বারা গঠিত। একবার লিঙ্গশরীর বাহির হইয়াছিল বলিয়া কোষগুলির বাঁধন কিছু আলগা হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য দুই একটী কোষ বাহির হইয়া আর একটি ডমরুধরের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন উপায় কি? লোকে একটা আমির ভাত-কাপড় যোগাইতে পারে না। তা যোগাইবার যেন আমার সঙ্গতি আছে, কিন্তু একটা আমির পেট

কামড়াইলে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। একসঙ্গে দুইটা আমির পেট যদি কামড়ায়, তখন আমি কি করিব ?

একটা আমি অপরটাকে বলিল,—"তুই চলিয়া যা, আমি প্রকৃত ডমরুধর, তুই জাল ডমরুধর।" অপরটাও সেই সেই কথা বলিল। দুই আমিতে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় প্রভাত হইল। প্রভাত হইবামাত্র আমি একটা হইয়া যাইলাম। তখন আমার ধড়ে প্রাণ আসিল।

পাছে পুনরায় দুইটা হইয়া যাই, সেই দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন আমি মগ্ন রহিলাম। বিজয়া দশমীর পূজার পর পুরোহিতঠাকুর যখন আমাকে মন্ত্র পড়াইলেন,—আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভবতি দেহি মে,—তখন আমার সুবল ঘোষের কথা মনে পড়িল। দুর্গোৎসব করিয়া, ভক্তিতে গদগদ হইয়া সুবল নিজেই ঠাকুরের সম্মুখে প্রাণপণ যতনে শঙ্খ বাজাইলেন। শঙ্খ বাজাইতে গিয়া সুবলের গোগগোল বাহির হইয়া পড়িল। সেজন্য দশমীর দিন সুবল অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া, হাতযোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—

'ধন চাই না মা, যশ চাই না মা,
চাই না পুত্তুর বর।
শঙ্খ বাজাতে গিয়া বেরিয়েছে গোগগোল,
তাই রক্ষা কর ॥'

প্রতিমা বিসর্জন হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় আমি এক সহস্র দুর্গানাম লিখিলাম। পাড়ার ছেলেরা আমাকে নমস্কার করিয়া গেল। আহারাদি করিয়া যথাসময়ে দোতালায় আমার ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম। সিদ্ধি খাইয়া শরীর একটু গরম হইয়াছিল। সেজন্য আমার নিদ্রা হইল না। বিছানা হইতে উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাড়ীর বাহিরে বাগানে আমার জানালার নীচে ও কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? সেই আর একটা আমি! হাত নাড়িয়া তাহাকে আমি বলিলাম,—"যা, চলিয়া যা।" নীচের আমিও উপরের আমিকে সেই কথা বলিল। উপরের আমি নীচে নামিলাম। খিড়কিদ্বার খুলিয়া আমি বাগানে যাইলাম। ও মা! দেখি না নীচের আমিটা উপরে গিয়া ঠিক আমার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। এ আমিটা একবার উপরে, একবার নীচে, ও আমিটা একবার উপরে, একবার নীচে, কতবার যে এইরূপ হইল, তাহা বলিতে পারি না। তৃতীয় পক্ষে এলোকেশীর সহিত আমার কি প্রকারে বিবাহ হইয়াছিল, গত বৎসর সে কথা তোমাদের নিকট বলিয়াছি। আমি এলোকেশীকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এইমাত্র যখন আমি নীচে গিয়াছিলাম, তখন তোমার ঘরে আর একটা কে আসিয়াছিল।" এলোকেশী বলিল,—"মুখপোড়া, বুড়ো ডেকরা! এখনি ঝাঁটাপেটা করিব।" এলোকেশীর স্বভাবটা কিছু উগ্র। তাহাতে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

জানালা বন্ধ করিয়া আমি পুনরায় শয়ন করিলাম। পরদিন রাত্রিতেও সেইরূপ হইল। প্রতি রাত্রিতে সেইরূপ উপরে একটা, নীচে একটা, দুইটা আমির উপদ্রব হইল। আমি ভাবিলাম যে, প্রতি রাত্রিতে আমার "ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম" হইতে লাগিল, এ তো ভাল কথা নহে!

চতুর্ভুজ বলিলেন,—"এবার আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। আমি জানি—

'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥'

পুরোহিত বলিলেন,—"সকল প্রাণীর সৌন্দর্য্য লইয়া ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

'যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহত্যেতি বিশ্রুতা।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কার্ত্তিকের কাঁধে বাঘ

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—দুইটা আমির উপদ্রবে আমি জ্বালাতন হইলাম। দিনকতক সুন্দরবনে আমার আবাদে গিয়া বাস করি, এইরূপ মনন করিয়া আমি সুন্দরবনে আবাদে গমন করিলাম। এই সময় সেই স্থানে এক বাঘের উপদ্রব হইয়াছিল। গরু বাছুর মানুষ খাইয়া সকলকে বড় জ্বালাতন করিয়াছিল। মন্ত্রবলে বাঘের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত একদিন বৈকাল বেলা আমি এক ফকিরের নিকট গমন করিতেছিলাম। পথে নানাস্থানে শুষ্ক ঘাস ও বৃক্ষপত্র পড়িয়াছিল। একস্থানে শুষ্কপত্রের ভিতর ছিদ্রের ন্যায় কি একটা দেখিতে পাইলাম। নিকটে যাইবামাত্র হুস করিয়া আমি এক গভীর গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া যাইলাম। সর্বনাশ! দেখি না, সেই গর্ত্তের ভিতর প্রকাণ্ড এক কেঁদো বাঘ রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল কথা আমি বুঝিতে পারিলাম। বাঘ ধরিবার নিমিত্ত ধাঙ্গড় রেওতগণ গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার উপর পাতানাতা চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। বাঘ সেই গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিল। আর উঠিতে পারিতেছিল না। আমিও সেই গর্ত্তে পড়িয়া যাইলাম।

গর্ত্তে পড়িয়া ব্যাঘ্রের বিকট বদন দর্শন করিয়া আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। আমি মনে করিলাম যে, ক্ষুধার্ত বাঘ এইবার আমাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। প্রাণ ভরিয়া আমি মাকে ডাকিতে লাগিলাম। করাতি কলে ইঁদুর পড়িলে যেরূপ ছটফট করে, প্রাণভয়ে গর্ত্তের ভিতর আমি সেইরূপ ছটফট করিতে লাগিলাম। বলিব কি ভাই, আমার উপর মা দুর্গার কৃপা! এক আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি আমাকে রক্ষা করিলেন। আমি যেরূপ ফাঁদে পড়িয়াছিলাম, ব্যাঘ্রও সেইরূপ ফাঁদে পড়িয়াছিল। ফাঁদে পড়িয়া আমার যেরূপ ভয় হইয়াছিল, তাহারও সেইরূপ ভয় হইয়াছিল। আমাকে ভক্ষণ না করিয়া, এক লম্ফ দিয়া সে আমার কাঁধের উপর উঠিল। আমার কাঁধে চড়িয়া যখন সে কতকটা উচ্চ হইল, তখন আর একলাফে সে গর্ত্তের উপর দিয়া উঠিল। তাহার পর বনে পলায়ন করিল।

সন্ধ্যার পর ধাঙ্গড়েরা আসিয়া গর্ত্তের ভিতর হইতে আমাকে উঠাইল। তাহাদের সঙ্গে আমি বাসায় গমন করিলাম। আমি তখনও বাহিরে, কিন্তু দূর হইতে দেখিলাম যে, আর একটা 'আমি' বাসার ভিতর গট হইয়া বসিয়া আছি। আবার বাহিরে একটা আমি, ভিতরে একটা আমি। আবার 'ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম।'

বনবাসী হইয়াও আমি সে উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না। তবে আর এ স্থানে থাকিয়া কি হইবে? তাহা ছাড়া আর একটা 'আমি' সহসা যদি এই বনে আসিতে পারে, তাহা হইলে সে আমার গৃহেও থাকিতে পারে। সে স্থানে সে 'আমিটা' কি করিতেছি না করিতেছি, তাহার ঠিক কি? সেজন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আমি মানস করিলাম।

সুন্দরবন হইতে আমাদের বাড়ী আসিতে হইলে অনেক দূর নৌকায় আসিতে হয়, তাহার পর সালতি। গ্রীষ্মকালে যে স্থানে সালতি লাগে, সে স্থান হইতে আমাদের গ্রাম পাঁচ ক্রোশ। সন্ধ্যার সময় সেই স্থানে আসিয়া আমার সালতি লাগিল। বাকী পাঁচ ক্রোশ পথ আমি হাঁটিয়া চলিলাম। ভেড়িতে এক-জনেরা মাছ ধরিতেছিল। তাহাদের নিকট হইতে একটি ভেটকি মাছ চাহিয়া লইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ছোটখাটো ভালমানুষ ভূত

ভেটকি মাছটা হাতে লইয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম। সকলেই জানে যে, মাছ দেখিলে ভূতের লোভ হয়। দুই ক্রোশ পথ গিয়াছি, রাত্রি প্রায় একপ্রহর হইয়াছে। এমন সময় একটি ভূত আমার সঙ্গ লইল। "দেঁনা, দেঁনা," "মাছ দেঁনা" বলিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, আমার বিলক্ষণ ভয় হইল। কিন্তু ভূতকে মাছ দিলে আর রক্ষা নাই। তৎক্ষণাৎ সে মানুষের প্রাণবধ করে। সেজন্য তাহার কথা আমি শুনিলাম না, তাহাকে আমি মাছ দিলাম না। কিছুদূর গিয়াছি, এমন সময় আর একটা ভূত আসিয়া জুটিল। একটা আমার ডানদিকে, আর একটা আমার বামদিকে, আমার দুইপাশে দুইটা ভূত, হাত পাতিয়া "দেঁনা, দেঁনা" বলিতে বলিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে আমি মাছ দিলাম না। অবশেষে তাহারা আর লোভ সামলাইতে পারিল না। মাছের মাথার দিক কানকোতে হাত দিয়া আমি ধরিয়াছিলাম, মাছের অপর দিক তাহারা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। অপর দিক ধরিয়া তাহারা মাছটি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। আমি মাছের কানকো ধরিয়া, তাহারা মাছের লেজার দিক ধরিয়া; সেই মাঠের মাঝখানে ঘোরতর টানাটানি হইতে লাগিল। কিন্তু আমি একা, ভূত হইল দুইজন। দুই-জনের সঙ্গে আমি কতক্ষণ টানাটানি করিতে পারি? ক্রমে আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন নিরুপায় হইয়া একটা ভূতের হাতে আমি কামড় মারিলাম। বলিব কি হে, ভূতের হাতের কথা। ঠিক যেন কাঠের উপর কামড় মারিলাম। তাহার পর দুর্গন্ধ। সেইরূপ ভয়ানক দুর্গন্ধ মানুষের নাকে কখনও প্রবেশ করে নাই।

আমার দাঁত নাই সত্য, কিন্তু সেই ফোকলা মুখের এক কামড়েই ভূত দুইটি পলায়ন করিল। তখন আমার মুখে দুর্গন্ধ! দুর্গন্ধে আমি ক্রমাগত উদ্গার করিতে লাগিলাম। সেইখানে বসিয়া ন্যাকার ন্যাকার ন্যাকার! মনে হইল পেটের নাড়িভুঁড়ি বুঝি বাহির হইয়া গেল। নিশ্চয় বুঝিলাম যে, এইবার আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি সেই স্থানে চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম ও নন্দীর অভিশাপের কথা ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে কে যেন আমার মাথায় ও মুখে জল দিতেছে এইরূপ বোধ হইল। তাহাতে শরীর কিঞ্চিত সুস্থ হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম,—কি আশ্চর্য্য, এ আবার কি? দেখিলাম যে, ছোটখাটো একটি নূতন ভূত আসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। তৎক্ষণাৎ ভূতটি কিছুদূরে পলায়ন করিল। আমার মাছটি সে চুরি করে নাই। মাছটি সেই স্থানে পড়িয়া ছিল। মাছটি লইয়া ধীরে ধীরে আমি আমাদের গ্রাম অভিমুখে আসিতে লাগিলাম।

নূতন ভূতটি দূরে দূরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। সে আমার

নিকট হইতে মাছ চাহিল না। কোন কথাই বলিল না। দেখিলাম, সে অতি ভালমানুষ ভূত। আরও দেখিলাম যে, অতি ভীত স্বভাবের ভূত। একবার আমি কাসিলাম, আর অমনি সে ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। একবার আমি হাঁচিলাম, আর অমনি সে পলায়ন করিল। একবার একখানি গ্রামে কুকুর ডাকিয়া উঠিল, অমনি সে গ্রাম হইতে অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে একেবারে আমাকে ছাড়িয়া গেল না। ভয় পাইয়া একবার পলায়ন করে, তাহার পর পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ ভীরু স্বভাবের ভূত কখনও দেখি নাই। তখন আমি বুঝিলাম, মহাদেব যে আমাকে একটি ছোটখাটো ভালমানুষ ভূত দিবেন বলিয়াছিলেন, এটী সেই ভূত।

অবশেষে আমি তাহাকে বলিলাম,—"দেখ ভালমানুষ ভূত! তুমি আমার উপকার করিয়াছ, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ। আমার সহিত তুমি চল দুইখানা ভাজামাছ তোমাকে আমি প্রদান করিব।

ঘরে গিয়া এলোকেশীকে আমি মাছটি দিলাম। রান্নাঘরে এলোকেশী মাছ ভাজিতে লাগিল। কতকগুলি মাছ যেই ভাজা হইয়াছে, আর রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া ভূতটি হাত বাড়াইল। তাহার হাতে চারিখানি মাছ দিলাম, আর তাহাকে আমি বলিলাম,—"পুনরায় কাল এস, তোমাকে ভাল মাছ দিব।"

পরদিন বৈকালবেলা খুদিরাম মণ্ডলের পুষ্করিণীতে চুপি চুপি হাতসুতা ফেলিয়া একটি রুইমাছ ধরিলাম। সন্ধ্যার সময় মাছটি আনিয়া এলোকেশীকে দিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমি নিজের পুকুরের মাছ খরচ করি না, তাহা আমি বিক্রয় করি। সন্ধ্যার পর এলোকেশী যখন মাছ ভাজিতেছিল, তখন আমি রান্নাঘরে গমন করিলাম। আমার সাড়া পাইয়া ভূতটি ঘুলঘুলি দিয়া হাত বাড়াইল। তাহার হাতে আমি মাছ দিলাম। এইরূপ প্রতিদিন খুদিরামের পুকুর হইতে গোপনে মাছ ধরিয়া ভূতটিকে আমি খাইতে দিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : এলোকেশীর রূপমাধুরী

একদিন এলোকেশী সহসা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাছ ভাজিবার সময়, প্রতিদিন তুমি রান্নাঘরে এস কেন? দিনের বেলা না আনিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পুকুর হইতে তুমি মাছ লইয়া এস কেন? ঘুলঘুলির নিকট গিয়া কাহার সহিত তুমি চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কর? দুর্লভীকে মাছ দাও বুঝি?"

দুর্লভী বাগ্দিনীকে তোমরা সকলেই জান। হাসিতে হাসিতে একদিন তাহাকে দুই একটা তামাসা করিয়াছিলাম। আমি এমন কার্ত্তিক পুরুষ। সেজন্য আমার স্ত্রীর মনে সর্বদা সন্দেহ।

আমি বলিলাম,—"এলোকেশী! ও দুর্লভী নয়। আবাদ হইতে এবার আমি একটি ভূত আনিয়াছি। আমি মনে করিয়াছি যে, ভূতটি ভালরূপে পোষ মানিলে উহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইব। যাহারা ঘোড়ার নাচ করে, তাহাদিগের নিকট ভূতটি বিক্রয় করিব। অনেক টাকা পাইব। কিন্তু এ ভূতটি বড় ভীরু ভূত। তুমি ঘুলঘুলির নিকট যাইও না। তোমার চেহারা দেখিলে সে ভয়ে পলাইবে।" গত বৎসর সন্ন্যাসীসংকটের গল্প বলিবার সময় আমি এলোকেশীর রূপের পরিচয় দিয়াছিলাম। আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাই, তা না হ'লে এলোকেশীকে দেখিলে ভীমসেনও বোধ হয় আতঙ্কে পলায়ন করেন।

এলোকেশীর মুখ হাঁড়ি হইল। মাছ ভাজিতে লাগিল, আর গজর গজর

করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমার রূপ দেখিলে ভূত ভয়ে পলাইবে। আমার রূপ দেখিলে ভূত পলাইবে। বটে!"

পরদিন সন্ধ্যার সময় নবাই ঘোষের পুষ্করিণী হইতে বড় একটা মিরগেল মাছ ধরিয়া আমি এলোকেশীকে দিলাম। এলোকেশী সেই মাছ যখন ভাজিতেছিল, সেই সময় যথারীতি আমি রান্নাঘরে গমন করিলাম। ভূতটি যথারীতি ঘুলঘুলি-পথে হাত বাড়াইল। মাছ লইয়া যেমন তাহাকে আমি দিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে গিয়া এলোকেশী বলিয়া উঠিল,—"দুর্লভ! হারামজাদি! তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়!"

ভূতটি একবার মাত্র এলোকেশীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। এলোকেশীর সেই অদ্ভুত মুখশ্রী দেখিয়া আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাসে সে স্থান হইতে সে পলায়ন করিল।

'করিলে কি! করিলে কি!' এই কথা বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইলাম, তৎক্ষণাৎ বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিলাম, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ভূতটিকে ফিরাইয়া আনিব। বাগানে গিয়া দেখিলাম যে, ভূতটি অতি দ্রুতবেগে আমার বাগানের ঈশান কোণের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। সেই স্থানে খেজুর গাছের ন্যায় এক অপূর্ব্ব গাছ ছিল। সে গাছটিতে আমি রস কাটিতে দিতাম না, সে গাছটিকে স্বতন্ত্র ভাবে আমি ঘিরিয়া রাখিতাম। প্রাণভয়ে ভূতটি সেই গাছটির উপর উঠিল। আমি ভাবিলাম, —যাঃ! এইবার ভূতটির প্রাণ বিনষ্ট হইল। এমন আমার সখের ভূত, এইবার মারা গেল। মহাদেব হয় তো আমার উপর রাগ করিবেন।

বিস্ময়ে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভূতের প্রাণ বিনষ্ট হইবে? খেজুর গাছের উপর উঠিয়া ভূত মারা পড়িবে। ভূত কি কখন মারা যায়?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"পুরোহিতমহাশয়! আপনি সাদাসিধে লোক; আপনি এ সব কথা বুঝিতে পারিবেন না। এ সামান্য খেজুর গাছ নহে। এক-বার একজন ধাঙ্গড়ের সঙ্গে আমি সুন্দরবনের ভিতর বেড়াইতেছিলাম। এক-স্থানে এক গাছের নিম্নে স্তূপীকৃত হাড় পড়িয়াছিল। প্রথম মনে করিলাম, মানুষের অস্থি, ব্যাঘ্রগণ বোধ হয় মানুষ ধরিয়া এই স্থানে আনিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহার পর আরও নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে সব বানরের হাড়। গাছটি দেখিলাম যে, হেঁতালও নহে, খেজুরও নহে, খেজুরের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষ। কিন্তু খেজুর গাছের পাতাগুলি যেমন উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পাতা সেরূপ ছিল না, ইহার যাবতীয় কাঁচা পাতা নিম্নমুখ হইয়া গাছের গায়ে লাগিয়াছিল। গাছের মাথায় কাঁদি কাঁদি সোনার বর্ণের অতি চমৎকার ফল ফলিয়াছিল। সেই ফল পাড়িতে ধাঙ্গড়কে আমি গাছের উপর উঠিতে বলিলাম। ধাঙ্গড় গাছে উঠিল; পাতার ভিতর দিয়া যেই গাছের মাথার নিকট উঠিয়াছে, আর পাতাগুলি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সময় ধাঙ্গড়ও 'প্রাণ গেল, প্রাণ গেল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার পর ধাঙ্গড়ের চর্ম্মাবৃত ভগ্ন হাড়গুলি নীচে পড়িতে লাগিল। তাহার পাতাগুলি পুনরায় নিম্নমুখ হইয়া গাছের গায়ে আসিয়া লাগিল। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, এই ভয়াবহ বৃক্ষ ধাঙ্গড়ের রক্ত-মাংস মায় হাড়ের রস পর্য্যন্ত চুষিয়া খাইয়াছে।"

চতুর্ভুজ বলিলেন,—'পুস্তকে পড়িয়াছি যে, কয়েক প্রকার উদ্ভিদ আছে,

তাহারা পোকা-মাকড় ধরিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু জীব-জন্তু ধরিয়া খায়, বানর ধরিয়া খায়, মানুষ ধরিয়া খায়, এরূপ বৃক্ষের কথা কখন শুনি নাই।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তলায় অনেক-গুলি সে গাছের বীজ পড়িয়াছিল। আমি গুটিকতক বীজ আনিয়া আমার বাগানের এককোণে পুতিয়াছিলাম। তাহা হইতে একটি গাছ হইয়াছিল। সে গাছ আমি সর্বদা ঘিরিয়া রাখিতাম। কাহাকেও তাহার নিকটে যাইতে দিতাম না। ভূত যখন সেই গাছের উপর গিয়া উঠিল, তখন আমি তাহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিলাম।"

ক্রমে যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। যেই ভূত গাছের মাথার নিকট গিয়া উঠিল, আর সেই সময় পাতাগুলি সোজা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল, ভূতের সর্ব শরীর ঢাকিয়া ফেলিল, ভূতের কৃষ্ণবর্ণ রক্ত গাছের গা দিয়া দরদর ধারায় বাহিয়া পড়িল। অবশেষে ভূতের খোসাটি নিম্নে পতিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : মা তুমি কে?

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভূতের খোসা। সে কিরূপ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—ভূতের অস্থি-মাংস-রক্ত সমুদয় এই ভয়ংকর গাছ চুষিয়া খাইয়াছিল। ছারপোকার খোসা দেখিয়াছ? মটর-মুসুরির খোসা দেখিয়াছ? ভূতের খোসাও সেইরূপ। তবে অনেক বড়। যাহা হউক, পরদিন এই দুরন্ত গাছটিকে আমি কাটিয়া ফেলিলাম, তা না হইলে তোমাদিগকে আমি দেখাইতে পারিতাম।

সে রাত্রে এলোকেশীর সহিত আমার তুমুল ঝগড়া হইল। আমি বলিলাম যে,—"দুর্লভী দুর্লভী করিয়া করিয়া তুমি পাগল হইয়াছিলে। এমন সুন্দর ভূতটিকে তুমি তাড়াইলে, ভূতঘ্ন পাপে তুমি কলুষিত হইলে, আমার অনেক টাকা তুমি লোকসান করিলে।"

এইরূপ ঝগড়া হইতেছে, এমন সময় আমি একবার জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম যে, দ্বিতীয় আমি যথারীতি বাগানে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাকে দেখাইয়া আমি এলোকেশীকে গঞ্জনা দিবার নিমিত্ত বলিলাম,—"তুমি দুর্লভী দুর্লভী বল, দেখ দেখি ঐ নীচেতে কে? তোমারও যে—ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম।"

এই কথা বলিবামাত্র এলোকেশীর সর্ব শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল। নিকটে একটা মুড়া ঝাড়ু পড়িয়াছিল। তাহা লইয়া এলোকেশী আমাকে সবলে প্রহার করিতে লাগিল। আমার সর্বশরীরে যেন বিষের জ্বালা ধরিল। গায়ে খেঁগরা কাটি ফুটিয়া যাইতে লাগিল। "আর নয়, আর নয়" বলিয়া আমি যত চীৎকার করি, এলোকেশী ততই আমাকে প্রহার করে। মাথার টাক হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রহারের চোটে ক্ষতবিক্ষত হইল। জানালা দিয়া একবার নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, সেই বাগানের আমিও ঝাঁটার আঘাতে ব্যথিত হইয়া গায়ে হাত বুলাইতেছি। তাহার পর দেখি না যে, দুই আমি একসঙ্গে ঘরের ভিতর রহিয়াছি। তাহার পর দেখি না যে, একটি আমি আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের ন্যায় ধোঁয়ার মত হইয়া গেল। তাহার পর সেই ধূমটি সোঁৎ করিয়া আমার নাকের ভিতর প্রবেশ করিল। এতদিন আমি দুইখানা হইয়াছিলাম। আজ এলোকেশীর ঝাঁটার আঘাতে পুনরায় আমি একখানা হইলাম।

এলোকেশীর এই অমানুষিক কাজ দেখিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। প্রহারের জ্বালা আমি ভুলিয়া যাইলাম। গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাতে এলোকেশীর পায়ে পড়িয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, তুমি কে বল ?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অজা-যুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া

আমার এইরূপ বিনয়বাক্যে এলোকেশী কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইল না। দ্বিগুণ-ভাবে পুনরায় প্রহার আরম্ভ করিল। এই প্রহারে আর একটি আমার উপকার হইল। নন্দীর অভিশাপ মোচন হইয়া গেল। আমার আত্মবিস্মৃতি কিয়ৎপরিমাণে ঘুচিয়া গেল। আমি কে, তখন বুঝিতে পারিলাম। যোড়হাতে তখন আমি মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম—"মা ! আমি অপরাধ করিয়াছি। বিবাহের সাধ আমার মিটিয়া গিয়াছে। আর ঝাঁটা-পেটা হইতে পারি না। আমাকে কৈলাস পর্বতে লইয়া চল। সেস্থানে চিরকাল আমি আইবুড়ো হইয়া থাকিব। চামুণ্ডারূপিণী এলোকেশীর সহিত আর আমি সংসারধর্ম করিতে চাই না।"

মা কোন উত্তর দিলেন না। আমি শুনিয়াছিলাম যে, শৈশবকালে কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয়টি নক্ষত্র আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন আমি তাঁহাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"জননীগণ ! যখন নিঃসহায় অবস্থায় শরবনে আমি পড়িয়াছিলাম, তখন তোমরা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলে। ছয় জনের স্তন্যপান করিবার নিমিত্ত ছয়টি মুখ আমি বাহির করিয়াছিলাম। দুর্দান্ত এলোকেশীর খেঙরার প্রহার আর আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার শরীর জরজর হইয়া গেল। তোমরা আমাকে রক্ষা কর।"

আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি ভাই, তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল,—"পৃথিবীতে তোমার আরও একশত বৎসর পরমায়ু আছে। বৎস ! সুখে এই স্থানে এখন থাক। আরও একশত বৎসর এলোকেশীকে লইয়া ঘরকন্না কর। তাহার পর কৈলাসে গমন করিও।"

এলোকেশী এই সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর তাহার হাত চলিল না। সেজন্য সে যাত্রা আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

দেখ লম্বোদর ভায়া ! মা দুর্গা কি বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার মনে আছে তো ? অতি সংক্ষেপে তিনি আমাকে পূজা করিতে বলিলেন। এ বৎসর পূজার কোন উপকরণ আমি ক্রয় করিব না। গণেশের ইন্দুরের কাপড়টুকু পর্য্যন্ত দিব না। সমুদয় গঙ্গাজল দিয়া সারিব। মায়ের আজ্ঞা ! তাহা ব্যতীত আমাদের এই ঘোষেদের কাটিগঙ্গার জল অতি পবিত্র। তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য পদার্থ পৃথিবীতে আর কি আছে ?

পুরোহিত বলিলেন,—"তোমার পূজা তাহা হইলে এ বৎসর ঋষিশ্রাদ্ধের ন্যায় হইবে।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঋষিশ্রাদ্ধ কিরূপ ?"

পুরোহিত উত্তর করিলেন,—"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে। দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ॥" দুইটা ছাগলে বিবাদ হইলে যখন তারা আরক্ত নয়নে শৃঙ্গ তুলিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন বোধ হয়, এবার বুঝি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবে। কিন্তু শেষে কেবলমাত্র একটি ঠুস্। ঋষিদিগের শ্রাদ্ধে বিশ জন ব্রাহ্মণে ক্রমাগত কলার খোলা কাটিতে থাকেন। মনে হয়, কত ধুমধাম

না হইবে। কিন্তু ঐ খোলা কাটাই সার। এ দুর্গোৎসবেও দেখিতেছি, কেবল প্রতিমা, ঢোল ও গঙ্গাজল।"

ডমরুধর বলিলেন,—"মায়ের আজ্ঞা। ভাল মনে করিয়া দিয়াছেন। আমি আমার আবাদের দুইজন ধাঙ্গড়কে তাহাদের সেই চেপটা মাদল আনিয়া পূজার সময় বাজাইতে বলিয়াছি। তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে না। দুইবেলা দুই মুঠা ভাত দিলেই হইবে। পূজার কয়দিন আমার বাড়ীতে রান্না হইবে না। পূজার কয়দিন লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আমরা চালাইব। লম্বোদর ভায়া! তুমি সেই কয়দিন আমার ধাঙ্গড় দুইজনকে দুইটি করিয়া ভাত দিও। বুঝিয়াছ তো?"

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—"বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, কিন্তু এ পূজা তোমার না করিলে কি নয়?"

মুখ কুঞ্চিত করিয়া নাকিসুরে ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"তুমি তো বলিলে! কিন্তু পূজা যদি না করি, তাহা হইলে লোকের কাছ হইতে প্রণামীটি কি করিয়া আদায় করি? পুরোহিত অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"কার্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রং সুতপ্রদম্।
ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্পনিসূদনম্॥"

চতুর্থ গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ডমরুধরের শব-সাধনা

ডমরুধরের পূজার দালান। প্রতিমা প্রস্তুত। পঞ্চমীর দিন। পূর্বের মতই প্রতিমার পার্শ্বে বসিয়া ডমরুধর বন্ধুবর্গের সহিত গল্পগাছা করিতেছেন।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার প্রতিমায় এ বৎসর ব্যাঘ্র কেন? কার্তিকের ওরূপ বেশ কেন?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"ও কথা আর কেন বল ভাই! যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তা আমিই জানি।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছিল?"

লম্বোদর বলিলেন,—"আবার বুঝি একটা আজগুবি গল্পের সূচনা হইতেছে!"

ডমরুধর বলিলেন—"তোমাদের শুনিয়া কাজ কি। আমি বলিতে চাই না।"

সকলের কৌতূহল জন্মিল। বলিবার নিমিত্ত সকলে সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর ডমরুধর বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সন্ন্যাসী-হাঙ্গামায় পড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর আকাশে ভ্রমণ করিয়াছিল। অবশেষে যমালয়ে গিয়া প্রথমে মান্য তাহার পর অমান্য হইয়াছিল। সে গল্প পূর্বে আমি বলিয়াছি। সেই অবধি সশরীরে আকাশ-ভ্রমণ করিতে আমার বড় সাধ হইয়াছিল।

যতদূর চলে, মায়ের পূজা আমি গঙ্গাজল দিয়া সারি। গঙ্গাজলে মা যত পরিতোষ লাভ করেন, এমন আর কিছুতেই নয়। বিশেষতঃ আমাদের কাটি-গঙ্গার জল। কিন্তু পূজার জন্য প্রজাদের নিকট হইতে আমি ঘৃত, মধু, পাঁঠা প্রভৃতি আদায় করি। তাহা আনিবার নিমিত্ত এই আশ্বিন মাসে আমি সুন্দরবনে আমার আবাদে গিয়াছিলাম।

একদিন বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময় দুই জন ফকির পীর গোরাচাঁদের গান করিতে আসিল। গান গাহিয়া বার্ষিক চাহিল। আমার কাছারি হইতে পূজার সময় তাহারা চারি আনা বার্ষিক পায়। এবার সে বার্ষিক আমি বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রথম তাহারা অনেক মিনতি করিল। শেষে যখন দেখিল যে, তাহাদের বচনে আমি ভিজিবার ছেলে নই, তখন আমাকে অভিশাপ দিয়া গেল—"পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র তোমাকে গ্রাস করুক।"

শুনিলাম যে, পীর গোরাচাঁদ এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র চড়িয়া সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অনেক ধন ছিল। যাহাকে তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই ফলিত।

আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, সিদ্ধ হওয়া ব্যবসাটি তবে মন্দ নহে। আমিও সিদ্ধ হইব। আমি ডমরুধর; আমার অসাধ্য কি আছে?

সিদ্ধ হইবার সহজ উপায় সকলের নিকট জানিয়া লইলাম। তাহারা বলিল, গভীর রাত্রিতে শ্মশানে গিয়া মড়ার পিঠে বসিয়া জপ করিতে হয়। বাঘ ভাল্লুক ভূত প্রেত আসিয়া ভয় প্রদর্শন করে। ভয় করিলেই বিপদ্, না ভয় করিলে দেবী

স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন। ভূত প্রেতদিগের নিমিত্ত সঙ্গে মদ ও মুড়ি-কড়াই ভাজা লইয়া যাইতে হয়।

আমি ভাবিলাম, এ তো সহজ কথা। মড়াকে আবার ভয় কি? মড়া আমি গুলিয়া খাইতে পারি! বাঘকেও আমার ভয় নাই। মন্ত্রবলে আমি বাঘের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারি। ভূতকেও আমার ভয় নাই। মাছ লইয়া ভূতের সঙ্গে একবার কাড়াকাড়ি করিয়াছিলাম। শেষে ভূতের হাতে কামড় মারিয়াছিলাম। আমার দাঁত নাই, তাই, দাঁত থাকিলে ভূতের হাতে এখনও ঘা থাকিত। তাহার পর একটি ভূত পুষিয়াছিলাম। এলোকেশী যদি সব পণ্ড না করিত, তাহা হইলে পোষা ভূতটি এখনও আমার কাছে থাকিত।

দুই চারি দিন পরে সে স্থানে একটি লোক মরিয়া গেল। সে মজুরি করিতে আসিয়াছিল। আপনার লোক কেহ ছিল না। তাহার মৃতদেহ লোকে গাঙে ফেলিয়া দিল। কুম্ভীরে খাইতে না খাইতে আমি মড়াটিকে টানিয়া উপরে তুলিলাম। তাহার পর যে স্থানে লোকে মড়া পোড়ায়, সেই স্থানে রাখিয়া আসিলাম। এক বোতল মদ ও কিছু মুড়ি-কড়াইভাজা সংগ্রহ করিলাম।

গভীর রাত্রিতে একাকী শ্মশানে গমন করিলাম। মড়াটির মুখে মদ ও মুড়ি-কড়াইভাজা দিলাম। কুড় কুড় করিয়া খাইতে লাগিল। তাহাকে উপুড় করিয়া পিঠে বসিয়া আমি কঠোর তপ আরম্ভ করিলাম। তোমাদের ও সব জপের মন্ত্র আমি জানি না। হিড়িং বিড়িং আমি মানি না। কেবল দেবীর পাদপদ্ম আমি ধ্যান করিতে লাগিলাম।

প্রথম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। অবিরত বিদ্যুতের ঝলকে পৃথিবী ঝলসিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন বজ্রনিনাদে পৃথিবী কম্পিত হইল। আমি ভীত হইলাম না। চক্ষু বুজিয়া মায়ের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

তাহার পর বন্য মহিষ আসিল। আমার সম্মুখে লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিল। শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল। আমি ভয় করিলাম না। চক্ষু মুদিত করিয়া মায়ের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

ব্যাঘ্র আসিল। তাহার গভীর গর্জনে বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি চক্ষু চাহিলাম না। এক মনে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

ভূত প্রেত দানা দৈত্য আসিল। আমার সম্মুখে নাচিতে লাগিল। খিল্ খিল্ হাসিতে চারিদিক পূর্ণ করিল। আমি ভয় পাইলাম না, চক্ষু চাহিলাম না, কেবল বলিলাম,—"ঐ মদ মুড়ি-কড়াইভাজা আছে। খাও, খাইয়া ঘরে যাও।" তাহার পর পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের সিদ্ধিলাভ

এইরূপ কত যে বিভীষিকা হইল, সে কথা তোমাদিগকে কি আর বলিব! অবশেষে আমার পরলোকগতা মাতা আসিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাছা, ডমরুধর! অনেক তপ করিয়াছ, আর কাজ নাই, এখন ঘরে চল, এখানে বসিয়া থাকিলে অসুখ করিবে!" আমি কোন উত্তর করিলাম না।

তাহার পর আমার স্ত্রী এলোকেশী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—"ঘরে চল্! না গেলে এখনি কান ধরিয়া লইয়া যাইব।" তোমরা সকলেই জান যে, এলোকেশীকে আমি যমের মত ভয় করি। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রথম আমার হৃৎকম্প হইয়াছিল।

কিন্তু আমার স্মরণ হইল যে, এ সব মিথ্যা। তখন আমি পুনরায় ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার সে কঠোর তপ যখন কেহ কিছুতেই ভঙ্গ করিতে পারিল না, তখন মা দুর্গা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিলেন,—"ডমরুধর! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।"

আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, ঠিক যেমন এই প্রতিমা, দেবী সেই বেশে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। মা দশভুজা, দক্ষিণে গণেশ ও লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী ও কার্তিক, নিম্নে সিংহ ও অসুর।

মায়ের সেই উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলাম। মনের উপরও যেন ছানি পড়িয়া গেল। কি বর চাহিব, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার দুরদৃষ্ট! তা না হইলে কাছে লক্ষ্মী ছিলেন। যদি ধন চাহিতাম, এত ধন তিনি দিতেন যে, রাখিতে ঘরে স্থান হইত না। কাছে সরস্বতী ছিলেন, যদি বিদ্যা চাহিতাম, তাহা হইলে আমিও একটা বি-এ, এম-এ পাস করা ফোচকে ছোঁড়া হইতে পারিতাম।

কিন্তু সে জ্ঞান আমার হইল না। কার্তিকের ময়ূরটি দেখিয়া আকাশ ভ্রমণের সাধ আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম,—"যদি বর দিবেই, তবে কার্তিকের ময়ূরটি আমাকে প্রদান কর। উহার পিঠে চড়িয়া আমি আকাশ-ভ্রমণ করিব।"

দেবী বলিলেন,—"ছি বাছা, ও কথা বলিও না। কার্তিক ছেলেমানুষ। তাহার ময়ূরটি দিলে সে কাঁদিবে।"

আমি উত্তর করিলাম,—"অন্য বর চাই না মা! নিদেন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একদিনের জন্য ময়ূরটিকে দাও, মা! তাহার পিঠে চড়িয়া সমস্ত দিন আকাশ-ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাবেলা তোমাদের ময়ূর তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব। যদি না দাও, তবে পুনরায় আমি এই তপে বসিলাম।"

দেবীর ভয় হইল। তিনি বলিলেন,—"না বাছা! আর তপস্যা করিও না। তোমার তপে পৃথিবী তাপিত হইয়াছে। আর তপ করিলে মহাপ্রলয়ের অনল উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ ভস্ম হইয়া যাইবে।"

এই কথা বলিয়া কার্ত্তিকের সহিত দেবী চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা বাছা, একদিনের জন্য কার্ত্তিক তোমাকে ময়ূরটি প্রদান করিবে। আমার সিংহের একটি বাচ্চা দিয়া কার্ত্তিককে আমি ভুলাইয়া রাখিব। কিন্তু ডমরুধর! সন্ধ্যা হইলেই ময়ূরকে তুমি ছাড়িয়া দিবে। না ছাড়িয়া দিলে, সে তোমাকে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, ক্ষীর, দধিসমুদ্র পারে স্বাদুসমুদ্রে লইয়া ফেলিবে। সে সমুদ্রে তুমি হাবুডুবু খাইয়া মরিবে।"

এইরূপ সাবধান করিয়া দেবী আমাকে ময়ূরটি প্রদান করিলেন। কার্ত্তিককে সিংহশাবক দিলেন। সিংহের বাচ্চাটি কোলে লইয়া কার্ত্তিক কৈলাসে গমন করিলেন। প্রতিমায় যেরূপ গঠিত হয়, কার্ত্তিকের ময়ূর প্রকৃত সেরূপ নহে। সে ময়ূর কিরূপ, খড়ি দিয়া এই শানের উপর আমি তোমাদিগকে আঁকিয়া দেখাই।

ময়ূরের ছবি দেখিতে সকলে তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ছবি দেখিয়া লম্বোদর একটু হাসিলেন,—কুপিত হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—"হাসিও না। এ তোমাদের পৃথিবীর ক্যাঁক-কেঁকে প্যাকম-ধরা ময়ূর নহে। এ আসল কার্ত্তিকের কৈলাসি ময়ূর।"

তাহার পর ডমরুধর পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন,—গণেশ, লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া আমি ময়ূরের পিঠে চড়িয়া বসিলাম। তাহাকে

আকাশের দিকে চালাইতে চেষ্টা করিলাম। ময়ূর উপরে উঠিল না। তখন দেবী হাসিয়া বলিলেন,—"মন্ত্র না পড়িলে নরলোককে লইয়া ময়ূর উপরে উঠিবে না। শূন্যে আরোহণ করিবার সময় তুমি এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে,—

'জয় কৈলাসবাসিনী মহেশগৃহিণী গণেশজননী।'

তাহার পর সন্ধ্যাবেলা তোমার বাসার উপরে আসিয়া এই মন্ত্রটি বলিবে,—

'জয় কৈলাসবাসিনী ত্র্যম্বকগৃহিণী ষড়াননজননী।'

দ্বিতীয় মন্ত্রটি অতি সাবধানে স্মরণ করিয়া রাখিবে। বাসার উপর আসিয়া এই মন্ত্রপাঠ না করিলে ময়ূর তোমাকে সপ্তদ্বীপ সাত সমুদ্র তের নদী পারে লোকালোক পর্বতের ওধারে সূর্য্যের অগম্য তিমিরপূর্ণ গভীর গহ্বরে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম,—"মন্ত্রটি অতি সহজ। কেন মনে করিয়া রাখিতে পারিব না? তবে দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ গন্ধবজগৃহিণী কথাটা কিছু কঠিন।"

দেবী হাসিয়া বলিলেন,—"গন্ধবজগৃহিণী নহে, ত্র্যম্বকগৃহিণী।"

আমি বলিলাম,—"এইবার আমি ভাল করিয়া স্মরণ রাখিব, গন্ধবজ নহে ত্র্যম্বক।"

দেখ লম্বোদর, এই স্থানে তোমাদের একটা কথা আমি বলিয়া রাখি। প্রতিমায় এই যে কার্ত্তিক সকলে করে, এ-কেলে কার্ত্তিক নহে, এ সে-কেলে কার্ত্তিক। লম্বা কোঁচা গুঁফো ধেড়ে কার্ত্তিক কি বাপু! এই কি তোমাদের ভক্তি! ছি! এখনকার কার্ত্তিক ছেলে-মানুষ। মোজা ইজের কোট টুপি পরা। সিংহশাবক কোলে কার্ত্তিককে আমি এইরূপ দেখিয়াছিলাম। প্রতিমায়ও তাই করিয়াছি।

প্রতিমা সহিত দেবী অন্তর্ধান হইলেন। আমি প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করিলাম,—

'জয় কৈলাসবাসিনী মহেশগৃহিণী গণেশজননী।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পিং মহাশয়

ময়ূর তৎক্ষণাৎ উপরে উঠিল। অনেক অনেক উপরে উঠিল। রেলগাড়ী বা কি? তড়িদ্গতি বা কি? তাহা অপেক্ষা দ্রুতবেগে শূন্যপথে চলিতে লাগিল। চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক ধ্রুবলোক পার হইয়া গেল। কোটি কোটি যোজন পরে শেষে আমি পিঙের আকাশে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিং! সে কি?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—পিং কি? পিং এইরূপ—বলিয়া তিনি পিং-এর চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন।

লম্বোদর বলিলেন,—"তা যেন দেখিলাম। কিন্তু পিং কে?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—কি গেরো! পিং কে, তা আমি কি করিয়া জানিব? পিং আমার জাতি নয়, জ্ঞাতি নয় যে, তাহার পরিচয় আমি তোমাকে দিব। প্রাণ গেলেও আমি মিথ্যা কথা বলিব না। আমার সে স্বভাব নয়।

ছোট একখণ্ড কালো মেঘের উপর পিং বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট গমন করিলাম। দেখ লম্বোদর। তোমরা আমাকে কালো কুৎসিত কদাকার বলিয়া উপহাস কর। কিন্তু পিং আমার রূপের মর্য্যাদা জানেন। আমাকে দেখিবামাত্র পিং কি বলিলেন শুন।

পিং বলিলেন,—"আহা, মহাশয়ের কি রূপ! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার ভিতর

হইতে খড়ি মাটীর আভা বাহির হইতেছে। তাহা দেখিয়া আমার উস্কোখুস্কো পালক-আবৃত কাক ভুষণ্ডীকে মনে হইল। বহুকালের প্রাচীন ছেঁড়াপড়া বাঁশের ঝোড়ার ন্যায় মহাশয়ের অস্থি-পিঞ্জর দেখা যাইতেছে। দধিপুচ্ছ শৃগালের পর্বত-গহ্বরের ন্যায় আপনার দন্তশূন্য মুখগহ্বর। তাহার দুই ধারে কি দুইটি কাক বসিয়াছিল? ঐ যে ঠোঁটের দুই কোণে শুভ্রবর্ণের কি রহিয়াছে? আপনার টোল-পড়া গাল দুইটি দেখিয়া হনুমানের চড়-প্রহারিত রাবণ-মাতুল কালনেমির গণ্ডদেশ আমার স্মরণ হইল। পক্কচুল-পরিবেষ্টিত মস্তকের মধ্যস্থিত বিস্তৃত টাক দেখিয়া আমার মনে হইল, বিধাতা বুঝি পূর্ণচন্দ্রটিকে বসাইয়া তাহার চারিদিকে শুভ্রবর্ণের মেঘ গাঁথিয়া দিয়াছেন। ফলকথা, মহাশয়কে যখন দূরে দেখিলাম, তখন মনে করিলাম যে, ময়ূরে চড়িয়া টাক-চূড়ামণি কেলে-কার্ত্তিক জগৎ আঁধার করিয়া আসিতেছেন।"

পিণ্ডের সুমিষ্ট স্তবে প্রীতিলাভ করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, —"আমি আকাশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি। ইহার পর দেখিবার আর কি আছে?"

পিং উত্তর করিলেন,—"সমুদ্রকূলে বালুকারেণুর ন্যায় ইহার পর আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। কিন্তু ব্রহ্মার কোন অণ্ডই আপনার দেখিবার উপযুক্ত নহে। যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের ওপারে আপনি গিয়া অশ্বাণ্ড দর্শন করুন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"অশ্বাণ্ড! সে কিরূপ? সে কোথায়?"

পিং উত্তর করিলেন,—"অল্পদিন হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট গিয়া যম আবেদন করিলেন যে,—'বঙ্গদেশের বিটলে কপট স্বদেশভক্তগণ শীঘ্রই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের প্রেতকে আমার আলয়ে আমি স্থান দিতে পারিব না। তাহাদের কুহকে পড়িলে আমি উৎসন্ন যাইব। ছেলেখেকো বক্তারাও শীঘ্র প্রেত হবে। তাহাদিগকে আমি স্থান দিব না। আমার ছেলেগুলি তাহা হইলে গোল্লায় যাইবে। স্বদেশী প্রবঞ্চকদিগের প্রেতকেও আমি স্থান দিতে পারিব না। আমার আলয়ে আসিয়া তাহারা হয়তো কোম্পানী খুলিয়া বসিবে। তখন যমনীকে হাতের খাড়ু বেচিয়া শেয়ার কিনিতে হইবে। তাহার মহাপ্রভুরা এককড়া কাণাকড়িও উপঢ়ৌকন করিবেন না। ইহাদের জন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে স্থান হইবে না। আপনারা ইহার ব্যবস্থা করুন।' ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইন্দ্রের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবাকে এক ডিম্ব প্রসব করিতে বলিলেন। বিশ্বসংসারের ওপারে এই অণ্ড আছে। ইহাতে বিটলে স্বদেশভক্ত, ছেলে-খেকো বক্তা ও স্বদেশী প্রবঞ্চকগণের প্রেত বাস করে। মহাশয় গিয়া অশ্বাণ্ড দর্শন করুন।"

পিং আরও বলিলেন যে, অশ্বাণ্ডের দ্বারে এক প্রহরী আছে। প্রহরী আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহার উত্তরে কি বলিতে হইবে, পিং আমাকে শিখাইয়া দিলেন।

পিণ্ডের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় আমি শূন্যপথে চলিতে লাগিলাম। সমুদ্রকূলে বালুকারেণুর ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পার হইয়া যাইলাম। অবশেষে বিশ্ব-সংসারের ওপারে দূর হইতে অশ্বাণ্ড দেখিতে পাইলাম। পরে নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে, দ্বারে ভীষণ মূর্ত্তি প্রহরী বসিয়া আছে।

চীৎকার করিয়া প্রহরী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হু কামস দার?" (Who comes there?)

আমি উত্তর করিলাম,—"ফ্রেণ্ড।" (friend) প্রহরী বলিল,—"পাস ফ্রেণ্ড, অল ওয়েল।" (Pass friend all well)

এই বলিয়া প্রহরী দ্বার ছাড়িয়া দিল। অশ্বাণ্ডের ভিতর আমি প্রবেশ

করিলাম। আমি দেখিলাম যে, ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অশ্বাণ্ড ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম দিয়া গঠিত নহে। ইহা সম্পূর্ণ অন্ধকার দিয়া নির্মিত।

দূরে দূরে বহু দূরে গিয়া বিটলে স্বদেশ ভক্তদিগের দেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই প্রেতদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এক প্রহরী নিযুক্ত আছে। প্রহরী তাহাদিগকে বৃহৎ অট্টালিকার ভিতর বন্ধ করিয়া রাখে। আমাকে দেখাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সে বাহির করিল।

পৃথিবীতে ইহাদের শরীর নুদুর-নাদুর থাকে। এখানে ইহাদের এইরূপ মূর্ত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইহারা সর্বনাশ করিয়াছে। শত শত বাঙ্গালী যুবকের অন্নলাভের পথ রোধ করিয়াছে। সাধারণের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। প্রহরী আমাকে বলিল,—"সত্বর এ স্থান হইতে আপনি প্রস্থান করুন। আপনার যে এমন অপূর্ব রূপ, ইহাদের বাতাস লাগিলে সে সব মাটী হইয়া যাইবে। আপনাকে আরও এক বিষয়ে সাবধান করি। কিছুদূরে আপনি ছেলেখেকো বক্তাদিগের প্রেতগণকে দেখিতে পাইবেন। তাহাদের বক্তৃতা যেন আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। গো অশ্ব মেষ মহিষ খর শূকর বিড়াল কুকুর ইন্দুর বাঁদরের মৃত পচিত দেহ উদ্ভূত চর্বি-সম্ভূত, অবিকৃত বিশুদ্ধ, পবিত্র, পূয়রূপে বিভূষিত গলিত মড়াগন্ধে আমোদিত, ময়রা মহলে সমাদৃত সর্বত্র প্রচলিত ঘৃত সদৃশ আপনার হৃদয় কোমল। তাহাদের বক্তৃতা-উত্তাপে আপনার হৃদয় গলিয়া যাইবে। তখন আপনি যা নয়—তাই করিয়া বসিবেন।

সভয়ে এ স্থান হইতে আমি পলায়ন করিলাম। দূরে কোটি কোটি যোজন দূরে আমি এক ছেলেখেকো বক্তা দেখিতে পাইলাম। একাকী দাঁড়াইয়া ইনি বক্তৃতা করিতেছিলেন।

বক্তৃতাবলে ইনি অনেক অপোগণ্ড শিশুর ইহকাল-পরকাল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনেক সংসার ছারেখারে দিয়াছিলেন। কানে আঙ্গুল দিয়া ইহাঁর নিকট আমি গমন করিলাম। ইহাঁর অপর কেহ শ্রোতা ছিল না। কিন্তু এক-খণ্ড অন্ধকারের উপর দাঁড়াইয়া রাত্রিদিন ইনি বক্তৃতা করেন। শুনিলাম যে পাতালে অসুরদিগের কানের পোকা হইলে, তাহারা ইহাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আগমন করে। পাঁচ মিনিট কাল ইহাঁর বক্তৃতা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই কানের পোকা ধড়-ফড় করিয়া বাহির হইয়া যায়।

এ স্থান হইতে বিদায় হইয়া আরও কোটি কোটি যোজন দূরে স্বদেশী প্রবঞ্চকদিগের দেশে উপস্থিত হইলাম। অনেকগুলি এই জাতীয় প্রেত দর্শন করিলাম। তাহাদের একজন পৃথিবীতে থাকিতে অনেক ব্যবসা করিয়াছিলেন, অনেক কোম্পানী খুলিয়া ছিলেন, অনেক লোকের টাকা ফাঁকি দিয়াছিলেন। অবশেষে এক বীমা-অফিস খুলিয়া মুটে-মজুরের টাকাও উদরস্থ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি হাত ও পা বাহির করিয়া এই মহাপ্রভু এক্ষণে আমাকে ধরিতে আসিলেন।

ইহাঁর বীমা-আফিসে আমি অর্থ প্রদান করি,—সেই ইচ্ছায় তিনি আমাকে ধরিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এ সব কার্য্যে আমিও একজন ঘুণ। আমি ধরা দিলাম না। সত্বর সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

বেলা তখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে আমাকে বাসায় পৌঁছিতে হইবে। তা না হইলে ময়ূর আমাকে সপ্তদ্বীপের ওপারে স্বাদুসমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। সেজন্য পৃথিবীর দিকে ময়ূরকে পরিচালিত করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জিলেট জিলেকি সিলেমেল

নিম্নদিকে নামিতে নামিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমিও দুই তিন-বার স্বদেশভক্ত হইয়া সভা করিয়াছিলাম, বক্তৃতা করিয়াছিলাম, স্বদেশের হিতের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার পর চাঁদার টাকাগুলি নিজে হাম করিয়াছিলাম। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের পর আমিও এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া অনেক রাঁড়ী বালতি গরীব কেরাণীর মস্তকে হস্ত বুলাইয়াছিলাম। তবে প্রেত হইয়া আমাকেও কি ঐ অশ্বাণ্ডে গমন করিতে হইবে? কিন্তু তাহার পর আমার স্মরণ হইল যে, যম অবগত আছেন, আমি মুরগী খাই না, একাদশীর দিন পুঁই-শাক ভক্ষণ করি না। সুতরাং সেই পুণ্যবলে অনায়াসে আমি সত্য-লোক, ব্রহ্ম-লোক—যেখানে ইচ্ছা সেইখানে গিয়া বাস করিতে পারিব। যদি ধর্ম্ম শিখিতে চায় তো টিকিদারেরা আমার কাছে আসুক।

হু হু শব্দে ময়ূর পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইল। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র পার হইয়া আমি ক্রমাগত নিম্নে নামিতে লাগিলাম। অবশেষে সূর্য্য-মণ্ডল পার হইলাম। সে স্থান হইতে পৃথিবী দেখিলাম,—অতি ক্ষুদ্র এক নক্ষত্রের ন্যায় ঝিকমিক করিতেছে। ময়ূরের দুই পার্শ্বে আমার দুইটি পা ঝুলিতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে কি একটা আসিয়া আমার বাম পায়ে কামড় মারিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। চকিত হইয়া আমি সেই দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম যে, অতি বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গিমা করিয়া চাকার ন্যায় কি একটা গড়াইয়া গেল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, চাকার ন্যায় ওটা কি? আমার পায়ে কামড় মারিল কেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে বুঝিতে পারিলাম। আমার রূপে জগৎ আলো করিয়া শূন্যপথে আমি আসিতেছিলাম। চাকার ন্যায় ওটা রাহু। আমাকে পূর্ণিমার চন্দ্র মনে করিয়া সে গ্রহণ লাগাইতে আসিয়াছিল। পূর্ণিমার পর প্রতিপদে চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া সে লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। তারপর আমি যে পূর্ণচন্দ্র তার আর প্রতিপদ হয় না। যাহা হউক, হতজ্ঞান হইয়া সে আগে থাকিতে আমাকে গিলিতে আসিয়াছিল। ভাগ্যে আমার গায়ে মাংস নাই, কেবল হাড়, তাই সে কামড় বসাইতে পারিল না। মুখ সিঁটকে চলিয়া গেল। রাহুর দুই চারিটা দাঁত ভাঙিয়া গেল কি না তা বলিতে পারি না। আমার শরীর যদি সুস্বাদু হইত, তাহা হইলে আমার গ্রহণটী সর্ব-গ্রাস হইত। সাপ যেরূপ আস্তে আস্তে ভেককে ভক্ষণ করে, রাহুও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে আমাকে পেটস্থ করিত। চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় আমার আর মুক্তি হইত না। চিরকাল আমাকে রাহুর—সর্বনাশ! রাহুর পেট নাই। আমাকে সর্বগ্রাস করিয়া সে গালের ভিতর এক কশে রাখিত কি কোথায় রাখিত, জানি না। কিন্তু লম্বোদর! তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতে না।

লম্বোদর বলিলেন,—"ইশ, তাই তো।"

সকলে বলিলেন,—"ইশ, তাই তো।"

ময়ূর এই ঘটনার পর নক্ষত্রবেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইল। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আমি সমুদ্রের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সুন্দরবনের উপর আসিলাম। ময়ূর আমার বাসার দিকে ধাবিত হইল। তখনও ভূমি হইতে প্রায় একক্রোশ উচ্চে শূন্যপথে ময়ূর উড়িতেছিল। আমি ভাবিলাম, এ স্থান হইতে আমার বাসা প্রায় আর দুই ক্রোশ আছে, বাসার ঠিক

উপরে যাইলেই সেই দ্বিতীয় মন্ত্রটি পড়িব। তখন ময়ূর আমাকে ধীরে ধীরে আমার বাসায় নামাইয়া দিবে।

কিন্তু সে দ্বিতীয় মন্ত্রটি কি? সর্বনাশ! আমি সে মন্ত্রটি ভুলিয়া গিয়াছি। মন্ত্রটি মনে করিতে না পারিলে ময়ূর আমাকে সাত সমুদ্র তের নদী পারে লইয়া লোকালোক পর্বতের ওপারে অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া স্বস্থানে চলিয়া যাইবে। তাহা ভাবিয়া প্রাণ আমার আকুল হইল। মন্ত্রটি কি? গুম্বজ? না, তা নয়! জলটুঙ্গী? না, তা নয়, ঝাপড়দা-মাকড়দা? না, তাও নয়। তবে কি? এ কথা নয় সে কথা, সেকথা নয় এ কথা—ক্রমাগত ভাবিয়া মন্ত্রটি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার একটি বর্ণও আমার মনে উদয় হইল না। এমন কি, হতভম্ব হইয়া আমি দুর্গা নামটি পর্য্যন্ত মনে করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম যে, যাঃ ডমরুধর! এইবার তোমার সব লীলা-খেলা ফুরাইল। যাহা হউক, অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে আমার মনে হইল যে, মন্ত্রটিতে জ আছে, ল আছে আর ক আছে। তাহার পর সেই অক্ষর কয়টি যোড়তাড় করিয়া স্থির করিলাম যে, মন্ত্রটি বোধ হয় এইরূপ হইবে,—

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি?"

ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

লম্বোদর বলিলেন,—"এতও তুমি জান। এ কোন ভাষা?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"তা জানি না ভাই, এ ভিন্ন আমার আর কিছু তখন মনে হইল না।"

মন্ত্রটি এইরূপে ঠিক করিয়া আমি ভাবিলাম, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি; উচ্চৈঃস্বরে আমি বলিলাম,—

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

সেই কিচ-মিচ শব্দ শুনিয়া ময়ূর ভাবিল,—'কৈলাস পর্বতে ভূত-প্রেত-দানা দৈত্যের সহিত আমার বাস। অনেক তন্ত্র-মন্ত্র শুনিয়াছি। এরূপ বিদঘুটে কখনও শুনি নাই। এ লোকটার ভাবগতিক ভাল নহে। বাসায় লইয়া গিয়া আমাকে হয় তো এইরূপ ভীষণ পালকহর্ষণ মন্ত্রবলে খাঁচায় পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। আগে থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল।' এইরূপ ভাবিয়া গাঝাড়া দিয়া ময়ূর আমাকে শূন্য দেশে ফেলিয়া দিল। তাহার পর শোঁ শোঁ করিয়া কৈলাস পর্বতের দিকে উড়িয়া গেল। আমি তখন ভূমি হইতে প্রায় এককোশ উচ্চে আজকাল উড়োকল হইতে মানুষ যেমন পড়ে, আমিও সেইরূপ হু হু শব্দে শিশার ন্যায় নীচে পড়িতে লাগিলাম। হু হু, হু হু, হু হু, কানে আমার বাতাস লাগিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার আমার দফা রফা হইল। হুহু হুহু শব্দে পড়িতে লাগিলাম, অবশেষে থপ করিয়া কাদার ন্যায় কি একটা কোমল বস্তুর উপর পড়িলাম।

কোমল বস্তুর উপর পড়িলাম, সেজন্য আমার অস্থি মাংস চূর্ণ হইয়া গেল না, সেজন্য আমার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। যখন আমার হৃদয়ের ধড়ফড়ানি কিছু স্থির হইল, তখন আমি এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু স্থির হইল। আমি দেখিলাম যে, পর্বতপ্রমাণ প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্রের মুখগহ্বরে আমি পতিত হইয়াছি। ব্যাঘ্রটি বৃদ্ধ হইয়াছিল। সেজন্য তাহার দন্ত ছিল না। দাঁত থাকিলে শূলসদৃশ দন্তে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইত। আমার সকল কথা মনে হইল। পীর গোরাচাঁদের ফকীরদিগের অভিশাপে আমি

পড়িয়াছি। এ সেই পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র। যে বাঘ চড়িয়া তিনি দেশভ্রমণ করিতেন। তোমার যে-সে ব্যাঘ্র নহে। এ রয়েল টাইগারের বাবা। এ মহারাজ ব্যাঘ্র।

লোকে বলে যে, ঘুমন্ত সিংহ হা করিয়া থাকিলে, তাহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে না। সে ঠিক কথা নহে। রাজসাপ নামে এক প্রকার সর্প আছে। সে সাপ হা করিয়া থাকিলে তাহার মুখে অন্যান্য সাপ প্রবেশ করে। এ বৃদ্ধ ব্যাঘ্র তাহাই করে। আকাশ-পাতাল জুড়িয়া হা করিয়া থাকে। আর ইহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে। আমি বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা বন্য মহিষ, চারিটা হরিণ ও দুইটা বরাহ ইহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন ব্যাঘ্র একেবারে কোঁৎ করিয়া আমাদের সকলকে গিলিয়া ফেলিল।

ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর ঘোর অন্ধকার। আমি বিরস বদনে তাহার এক-কোণে গিয়া বসিলাম। বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'এখন করি কি? আর রক্ষা নাই। এখনি হজম হইয়া যাইব। আমার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। দুই চারি-দিন পরে একছটাক মল হইয়া বাহির হইব।'

নিতান্ত সংকটে পড়িলে মানুষের অনেক বুদ্ধি জোগায়। একবার কোন ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, জীবের উদর হইতে এক প্রকার অম্লরস বাহির হয়; তাহাতেই খাদ্য গলিয়া পরিপাক পায়। তোমরা জান যে, আমার অম্বলের রোগ আছে, আর সেজন্য আমি সর্বদা কাঁচা সোডা ব্যবহার করি। ভাগ্যক্রমে আমার পকেটে কাগজে মোড়া খানিকটা কাঁচা সোডা ছিল, সেই সোডা উত্তমরূপে আমি গায়ে মাখিয়া বসিয়া রহিলাম। ব্যাঘ্রের পেট হইতে অম্লরস বাহির হইয়া মহিষ, হরিণ, শূকর সব গলিয়া পরিপাক হইয়া গেল, কিন্তু সোডার প্রভাবে আমার শরীর গলিয়া গেল না, আপাততঃ আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

তা যেন হইল। কিন্তু সে আর কয়দিন? ব্যাঘ্রের উদর হইতে বাহির না হইতে পারিলে মৃত্যু নিশ্চয়, আজ হউক, কাল হউক, মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু কি করিয়া বাহির হইব? মা দুর্গার নাম এখন আমার মনে হইল। একান্ত মনে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। পীর গোরাচাঁদকে অনেক সিন্নি মানিলাম। মা ভগবতীর ও পীর সাহেবের আমার প্রতি কৃপা হইল। বাঘের পেটের ভিতর এককোণে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমাকে বলিয়া দিল,—তোমার পকেটে কাগজ ও পেনসিল রহিয়াছে, আবাদের কর্মচারীকে পত্র লেখ না কেন?

আমার তখন ভরসা হইল। পকেট হইতে কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া আমি আমার কর্মচারীকে এইরূপ এক চিঠি লিখিলাম,—"পীর গোরাচাঁদের কোপে আমি পড়িয়াছি। তাঁহার ব্যাঘ্র আমায় গ্রাস করিয়াছে। সেই ব্যাঘ্রের উদরে আমি আছি। যদি কোনরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।"

আমার কর্মচারী বুদ্ধিমান লোক। আমার চিঠি পাইবামাত্র সে দুই জোয়ারের পথে যে স্থানে ডাক্তারখানা আছে, সে স্থানে চলিয়া গেল। ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে বমন হয়, এরূপ ঔষধ একসের ক্রয় করিল। ইংরেজীতে ইহাকে টারটার এমিটিক বলে। আবাদে ফিরিয়া সেই ঔষধ কাপড়ে রাখিয়া এক ছাগলের গলায় বাঁধিয়া দিল। তাহার পর যে স্থানে পীর গোরা-চাঁদের ব্যাঘ্র বাস করে, সেই স্থানে ছাগল ছাড়িয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, ভ্যা ভ্যা করিতে করিতে ছাগল আপনা আপনি ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ধাঙ্গড়ের ঘরে কন্দর্প পুরুষ

প্রায় দুই ঘন্টা পরে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। প্রথম ব্যাঘ্রের পেট কামড়াইতে লাগিল। পেটের কামড়ে ব্যাঘ্র অস্থির হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বৃদ্ধ হইলে কি হয়, পেটের কামড়ে সহস্র যুবা ব্যাঘ্রের বলে সে এখন লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। ব্যথা যখন কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, তখন যে দিকে তাহার দুই চক্ষু গেল, সেই দিকে ঘোড়-দৌড়ের অশ্ববেগে সে ছুটিয়া চলিল। ছোট ছোট গাং লাফ দিয়া ও বড় বড় গাং সাঁতার দিয়া পার হইতে লাগিল। ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিল। হাঁ করিয়া দৌড়িতেছিল, সেজন্য পেটের ভিতর বসিয়া আমি কতক কতক দেখিতে পাইতেছিলাম। বন পার হইল, নদী নালা খাল বিল অনেক পার হইয়া গেল। পেটের কামড়ে সমস্ত রাত্রি দৌড়িল, সমস্ত দিন দৌড়িল, পুনরায় আর এক রাত্রি দৌড়িল। সুন্দর-বনের এলাকা পার হইয়া গ্রামসমূহের নিকট মাঠ দিয়া ধাবিত হইল। অবশেষে দ্বিতীয় দিনের বেলা তিনটার সময় বমন করিতে আরম্ভ করিল। শৈশবকালে মাংসপ্রাশনের সময় হইতে যত মহিষ হরিণ শূকর প্রভৃতি খাইয়াছিল, তাহাদের হাড়গোড় সমুদয় বমন করিয়া ফেলিল। উদ্গারের সহিত আমাকে সে বাহির করিয়া ফেলিল।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আমার দিকে সে দুই একবার কটমট করিয়া চাহিল। মনে মনে ভাবিল,—"এ লোকটকে গিলিয়া ভাল কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম। যেমন রূপ —তেমনি গুণ, না আছে রস না আছে কষ! কালো চামড়া মোড়া কেবল খান-কতক হাড়। এর চেয়ে যদি দশ মণ পাথুরে কয়লা গিলিতাম, তাহা হইলে কাজ হইত।"

এই প্রকার চিন্তা করিয়া ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পশু! সে আমার রূপের মহিমা কি বুঝিবে?

লম্বোদর বলিলেন,—"তা সব হইল। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর হইতে তোমার কর্ম্মচারীর নিকট সে চিঠি তুমি কি করিয়া পাঠাইলে?"

কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নীরব থাকিয়া ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'দেখ লম্বো-দর! সকল কথার খোঁচ ধরিও না। এইমাত্র তোমাকে আমি বলিতে পারি যে, বাঘের পেটের ভিতর ডাকঘর নাই, সে স্থানে টিকিট বিক্রয় হয় না, সে স্থানে মনিঅর্ডার হয় না। তিরিক্ষি মেজাজ ডাকবাবু সেখানে বসিয়া নাই।' পত্র প্রেরণের সমস্যা এইরূপে হেলায় মীমাংসা করিয়া ডমরুধর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—বাঘের পেটে কয়দিন আমার উদরে অন্নজল যায় নাই। আমি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিলাম। ব্যাঘ্র চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের নিমিত্ত সেই স্থানে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলাম। নিকটে একখানি গ্রাম দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানি ছোট, কেবল ইতরলোকের বাস। গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, সে স্থান হইতে আমার আবাদ অনেক দূর, কেহ তাহার নামও জানে না। বরং আমার গ্রাম নিকট, সাত-আট ক্রোশ মাত্র। তপস্যা করিতে যখন আমি বনে গমন করি, তখন টাকাকড়ি সঙ্গে লইয়া যাই নাই। সে নিমিত্ত নৌকা অথবা শালতি ভাড়া করিতে পারিলাম না। পদব্রজেই আমার গ্রাম অভিমুখে আমি চলিলাম।

আকাশভ্রমণে, অনাহারে, নানারূপ ভাবনা-চিন্তায় আমার পা আর উঠে না। তাহার পর বর্ষার শেষ। নদী-নালা জলে ও মাঠ-ঘাট কাদা-কিচায় পরিপূর্ণ। বড়ই

কষ্ট হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে এক মাঠের মাঝখানে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এখন কোথায় যাই। আর একটু আগে গিয়া মাঠের মাঝখানে নারিকেলপাতায় আচ্ছাদিত সামান্য একখানি চালা দেখিতে পাইলাম। সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জনমানবকে সে চালায় দেখিতে পাইলাম না। প্রাঙ্গণে শসা গাছের এক মাচা ছিল। অনেকগুলি দুধে-শসা তাহা হইতে ঝুলিতেছিল। পেট ভরিয়া আমি সেই শসার অাতি খাইলাম। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আমি চালার ভিতর প্রবেশ করিলাম। গোটা-কতক মেটে হাঁড়ী ভিন্ন তাহার ভিতর আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। চালার একপার্শ্বে ছেঁচা বাঁশ দিয়া গঠিত একটি তক্তপোষের মত ছিল। তাহার উপরে একটি ছেঁড়া মাদুর ও একটা ময়লা চিরকুট বালিশ ছিল। ঘোর ক্লান্তিতে কাতর হইয়া আমি তাহার উপর শুইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার হইল। সেই সময় কে একজন চালার ভিতর প্রবেশ করিল। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া একটা কেরোসিনের ডিবে প্রজ্জ্বলিত করিল। তখন আমি দেখিলাম যে, সে একটা কালো স্ত্রীলোক। তাহার হাতে শাঁখা আছে, পায়ে প্রায় পাঁচসের ওজনের কাঁসার বাঁকমল আছে। মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে অনেক ধাঙ্গড় মজুর কারিতে আসে। আমি বুঝিলাম যে, স্ত্রীলোকটা ধাঙ্গড়ানী। প্রথম আমি একটু গলার সাড়া দিলাম। সে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর আমি উঠিয়া বসিলাম। তাহাকে বলিলাম যে,—বাঘের মুখ হইতে আমি অতি কষ্টে বাঁচিয়া সে স্থানে আসিয়াছি। আর পথ চলিতে পারি না। রাত্রিযাপনের নিমিত্ত তাহারা যদি একটু স্থান প্রদান করে, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।

সাধে কি এলোকেশীর মনে সর্বদা আমার প্রতি সন্দেহ! আমার গায়ের বর্ণটি কৃষ্ণঠাকুরের চেয়ে কালো। বাঘ মিথ্যাকথা বলে নাই—শরীরের ভিতর কেবল খানকতক হাড়। মাথার মাঝখানে কিন্তু এমন চকচকে টাক কার আছে? প্রকাণ্ড টাক। টাকের চারিদিকে পাকা চুল, মুখের দুই পাশে সাদা ফেকো। দাঁত একটিও নাই। তথাপি আমার কিরূপ একটা শ্রী-ছাঁদ আছে, কিরূপ একটা লাবণ্য আছে যে, তাতে রাহুরও ভুল হয়। আর মাগীগুলোও আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে। অবাক হইয়া ধাঙ্গড় মাগী আমার টাক পানে চায়, আর মুচকে মুচকে হাসে। শেষে সে কেবল দুইটি কথা বলিল,—"মাঝি আসুক।" তোমাদের যেমন 'বাবু', ইহাদের সেইরূপ সম্মানসূচক উপাধি "মাঝি।"

কিছুক্ষণ পরে একটা হোঁৎকা মিনসে চালার ভিতর প্রবেশ করিল। তোমরা আমাকে কালো বল, কিন্তু তার রঙের তুলনায় আমি তো ফিট্ গৌরবর্ণ। সে আসিয়া যেই আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, আর বামহাতে আমার মাথা নোওয়াইয়া দক্ষিণ হাতে আমার পিঠে বজ্রসম দুইটা কিল বসাইয়া দিল। গন্ধ পাইয়া আমি বুঝিলাম যে, ধাঙ্গড় মদ খাইয়াছিল।

তাহার পর বলিল,—"এতদিন পরে বেটাকে আজ ধরিয়াছি। ফাঁক পাইলেই আসে-যায়, ধরিতে আর পারি না। আজ বেটাকে ধরিয়াছি ইয়ারকি দিতে জায়গা পাও না, আমার ঘরে ইয়ারকি! হাড় গুঁড়া করিয়া ঐখানে আজ পুঁতিব!"

এই কথা বলিয়া সে পুনরায় আর দুইটা কিল মারিল।

আমি বলিলাম,—"আমি বিদেশী লোক। তোমার ঘরে আমি কখনও আসি নাই; আজ বিপদে পড়িয়া এ স্থানে আসিয়াছি।"

ধাঙ্গড় বলিল,—"বিদেশী লোক! গ্রীষ্মকালে মোড়লদের পুকুরে ফেটিজালে কে মাছ ধরিতেছিল? মাঝিনীকে কে একরাশি চুনোমাছ দিয়াছিল? কেন দিয়াছিলি, তা কি আমি বুঝিতে পারি নাই?"

এই কথা বলিয়া আবার দুইটা কিল মারিল।

আমি বলিলাম,—আমি কখনও ফেটিজালে মাছ ধরি নাই। আমি ভদ্রলোক। মিছামিছি বিনা দোষে আমাকে মার কেন?

ধাংগড় বলিল,—"ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের ঐ রকম টাক হয়! ভদ্রলোকের ঐ রকম কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা হয়! আর মাঝিনীর পসন্দ; আমাকে পসন্দ হয় না, তোকে পসন্দ!"

এই কথা বলিয়া সে পুনরায় আরও দুইটা কিল মারিল।"

আমি দেখিলাম যে, কথা কহিলেই দুইটা করিয়া কিল খাইতে হয়। তাহার পর, দারুণ প্রহার বরং সহ্য হয়, কিন্তু সে যে আমাকে কুৎসিত বলিল, সে কথা আমার প্রাণে সহ্য হইল না। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু নীরব থাকিয়াও নিস্তার পাইলাম না। সে আমাকে উত্তম মধ্যম অধম বিলক্ষণ প্রহার করিল; তাহার পর আমার কাপড়-চোপড় কাড়িয়া লইয়া উলংগ করিয়া গলা টিপিয়া সে স্থান হইতে বাহির করিয়া দিল। কেবলমাত্র প্রাণে সে আমাকে মারিল না। আমি উঠিতে পড়িতে উঠিতে পড়িতে মাঠের আল দিয়া চলিলাম। অতি ক্লেশে বহুদূরে একখানি গ্রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। এক তো রাত্রি হইয়াছে, তাহার পর উলংগ, এ অবস্থায় সে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম না। মনে করিলাম যে, প্রাতঃকালে কাহারও নিকট হইতে একখানি ছেঁড়া-খোঁড়া গামছা চাহিয়া লইব। সেইখানি পরিয়া আপনার গ্রামে যাইব।

নিকটে একটি বাগান দেখিতে পাইলাম। নারিকেল গাছ-বেষ্টিত শান-বাঁধা ঘাটবিশিষ্ট তাহার ভিতর একটি পুষ্করিণী ছিল। দারুণ প্রহারে শরীরে আমার বিষম বেদনা হইয়াছিল। ঘাটের চাতালে আমি শয়ন করিলাম। ঘোর ক্লেশে নিদারুণ প্রহারে শরীরে আর আমার কিছু ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কখন রাত্রি অবসান হইয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সহসা "ভূত! ভূত!" চীৎকার শুনিয়া আমার নিদ্রাভংগ হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, প্রাতঃকাল হইয়াছে; সূর্য্য উদয় হইয়াছে। অন্য দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, জনকয়েক স্ত্রীলোক সেই পুষ্করিণীতে জল লইতে আসিয়াছিল। সেই উলংগ অবস্থায় আমাকে দেখিয়া "ভূত! ভূত!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে। তাহাদের কোমর হইতে কলসী পড়িয়া ভাংগিয়া গেল। কিছুদূরে মাঠ হইতে কয়েক জন পুরুষমানুষ "কি হইয়াছে, কি হইয়াছে" বলিয়া দৌড়িয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ ভমরুধরের মেমের পোষাক

আমি ভাবিলাম, আবার বা প্রহার খাইতে হয়। সেই ভয়ে আমি রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। "ঐ যাইতেছে, ঐ যাইতেছে", বলিয়া কেহ কেহ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিছুদূরে গিয়া আমি আর দৌড়িতে পারিলাম না। এক স্থানে নিবিড় ভেরাণ্ডার বেড়া ছিল। তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আমি লুক্কাইত রহিলাম। আমায় আর দেখিতে না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। যাইতে যাইতে একজন বলিল,—"ভূত কি কখন ধরা যায়? ভূত হাওয়া। এতক্ষণ কোন্ কালে বাতাসের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।"

বেড়ার পার্শ্বে আমি বসিয়া হাঁপাইতেছিলাম; কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম যে, বেড়ার বাহিরে ছোট একটি তাঁবু রহিয়াছে। তাহার ভিতরে ও বাহিরে জন দুই পুরুষ ও ঘাগরা-পরা তিনজন

স্ত্রীলোক রহিয়াছে। নিকটে চারি-পাঁচটি বালক-বালিকা খেলা করিতেছে। একটু দূরে সম্মুখের পা-বাঁধা একটা টাটু ঘোড়া চরিতেছে। যাহাদিগকে বেদিয়া বা হা-ঘরে কঞ্জর বলে, আমি বুঝিলাম যে, ইহারা সেই জাতি। ইহাদের ঘর-দ্বার নাই। আজ এখানে, কাল সেখানে গিয়া ইহারা জীবনযাপন করে। ভিক্ষা করিয়া অথবা চুরি করিয়া অথবা জরী বুটি বেচিয়া ইহারা দিনপাত করে। ইহারা খোট্টা কথা বলে। বাজারে তুমি একশত টাকায়ও রামচন্দ্র অথবা আকবরি মোহর কিনিতে পাইবে না। কিন্তু ইহাদের নিকট দুই তিন টাকায় পাওয়া যায়। সে মোহর পূজা করিলে ঘরে মা-লক্ষ্মী অচলা অটলা বিরাজ করেন। স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করিতেছিল। বেলা দশটার সময়ে সকলে আহার করিয়া গ্রাম অভিমুখে চলিয়া গেল। ঘরে কেবল এক বুড়ি রহিল। বাহিরে বসিয়া বুড়ি আপনার মনে চুবড়ী বুনিতে লাগিল। যাইবার পূর্বে এক স্ত্রীলোক তাহার কন্যার ছোট একটি সালুর ঘাঘরা শুষ্ক হইবার নিমিত্ত আমার নিকট ভেরেণ্ডা গাছে ঝুলাইয়া দিল।

সকলে চলিয়া গেলে সেই ঘাগরার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। খুব করিয়া ঘাগরাটি বেড়ার ভিতর টানিয়া লইলাম। ঘাগরাটি চুরি করিয়া আমি পরিধান করিলাম। আমার হাঁটু পর্য্যন্ত হইল। তাহার পর অন্যদিক দিয়া চুপে চুপে বেড়ার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমি পলায়ন করিলাম। আমার গ্রাম কোন দিকে, দিনের বেলা এখন অনেকটা বুঝিয়াছিলাম। হন হন করিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীর দুর্বল, তাহার উপর প্রহারের বেদনা; অধিক দ্রুতবেগে যাইতে পারিলাম না। লাল ঘাগরা পরিয়া আমাকে মন্দ দেখায় নাই। যাহার শ্রী আছে, সে যা পরিধান করুক না কেন, তাহাতেই তাকে ভাল দেখায়। যাহারা বাঁদর খেলায়, তাহাদের সহিত যেরূপ লাল ঘাগরা পরা একটা বাঁদরের মেম থাকে, আমাকেও সেইরূপ মেমের মত দেখাইল। আমার গায়ের রং একটু কালো, কেবল এই প্রভেদ! আমাকে ভাল দেখাইলে কি হয়, এরূপ মেম সাজিয়া পাঁচজনের সম্মুখে বাহির হইতে লজ্জা করে। সে জন্য আমি কোন গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম না। সেজন্য লোক দেখিলে তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম। এই কারণে গ্রামে পেঁছিতে আমার অনেক বিলম্ব হইল। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আমাদের গ্রামের নিকট মাঠে আসিয়া আমি উপস্থিত হইলাম।

আমি ভাবিলাম, এ বেশে দিনের বেলা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিব না। পাঁচজনে দেখিলে হাসিবে। দুর্লভী বাগ্দিনীকে তোমরা সকলেই জান। মন্দ নয়—না? যাহার জন্য ও-বৎসর গৃহিণী আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন? তাহার মেটে ঘরটি গ্রামের শেষে এককোণে। আমি মনে করিলাম, কিছুক্ষণ তাহার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকি। তাহার পর সন্ধ্যার সময় গা-ঢাকা অন্ধকার হইলে আস্তে আস্তে বাটী যাইব, এইরূপ মনে করিয়া চুপে চুপে তাহার ঘরে আমি প্রবেশ করিলাম, প্রথমে সে আঁউমাউ করিয়া উঠিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—"ভয় নাই! চুপ কর, বড় বিপদে পড়িয়া তোর ঘরে আসিয়াছি। গোল করিসনে। পূজার সময় তোকে একখানা কাপড় দিব।"

আমি ভাবিয়াছিলাম, কেহ আমাকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু তা নয়। পরীক্ষিৎ ঘোষের কেষ্টা নামে সেই দুষ্ট এঁচোড়ে পাকা ছেলেটা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। পরীক্ষিৎ ঘোষ আমার নিকট হইতে দশ টাকা ধার লইয়াছিল। দেড়শত টাকা সুদ দিয়াছিল। তাহার পর যখন সে আসল পরিশোধ করিল, তখন তাহাকে হাতে রাখিবার নিমিত্ত খতখানি ফিরিয়া দিলাম না। তাহার বিপক্ষে আদালতে একবার মিথ্যা সাক্ষ্যও দিয়াছিলাম। মোকদ্দমায় মিথ্যা বলিতে দোষ নাই। সেই অবধি আমার উপর তাহার আক্রোশ। তাহার ছেলেটাও পথে-ঘাটে

আমাকে দেখিতে পাইলে দূর হইতে ক্ষেপায়, সে বলে,—"টাকচাঁদ, টাক-বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর—ডুরুর ডুরুর ডুরুর।" ডুরুর ডুরুর মানে ডমরু। আমার নামটা ছোঁড়া সংক্ষেপ করিয়াছে।

পরীক্ষিৎ ঘোষের কাছে তাহার ছেলের দৌরাত্ম্যের বিষয় একবার আমি নালিশ করিয়াছিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেষ্টা কি আপনার দিকে চাহিয়া ও সব কথা বলে?"

ছোঁড়া কি করে, মনে মনে চিন্তা করিয়া আমি উত্তর করিলাম,—"না। সে আমার দিকে চাহিয়া বলে না। কখনও উপর দিকে চাহিয়া এ সব কথা বলে, কখনও বা গাছপালার দিকে চাহিয়া বলে, কখন বা আকাশপানে দুইটা পা করিয়া মাটীর দিকে মুখ করিয়া, দুই হাতের উপর ভর দিয়া চলিতে চলিতে ঐ সব কথা বলে।"

পরীক্ষিৎ ঘোষ বলিল,—"তবে?"

সে "তবে"র আমি আর উত্তর দিতে পারিলাম না।

কেষ্টা তাড়াতাড়ি গিয়া আপনার বাপকে সংবাদ দিল। আমি তা জানিতাম না। পরীক্ষিৎ ঘোষ আসিয়া দুর্লভীর ঘরের দ্বারে শিকল দিয়া দিল। দুর্লভীকে আর আমাকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিল। তাহার পর পাড়ার লোককে সংবাদ দিল। দুর্লভীর ঘরে আমাকে দেখিবার নিমিত্ত মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো পাড়া-সুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়িল!

জাহ্নবী সাঁই বলিলেন,—"আমিও দেখিতে গিয়াছিলাম।"

গণপতি ভড় বলিলেন,—"আমিও গিয়াছিলাম!"

পুঁটীরাম চাকী বলিলেন,—"আমিও গিয়াছিলাম।"

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—"আমিও গিয়াছিলাম।"

লম্বোদর বলিলেন,—"আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। বাড়ী থাকিলে আমিও যাইতাম।"

ক্রুদ্ধ হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—"যাইতে বই কি। তুমি না গেলে কি চলে?"

দুর্লভীর ঘরের সম্মুখ দিকে দুইপার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট জানালা আছে। ঘরের পশ্চাৎ দিকের প্রাচীরেও সেইরূপ ছোট জানালা আছে। সম্মুখ দিকের দুইটি জানালা দিয়া লোক সব উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। সে দুইটি জানালায় ভিড় করিয়া লোকে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কেষ্টার বন্ধু জন পাঁচ ছয় ছোঁড়া চালে উঠিয়া খড় ফাঁক করিয়া উপর হইতে উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। পশ্চাৎ দিকের জানালাটা কিছু উচ্চ ছিল। মাটীতে দাঁড়াইয়া তাহা দিয়া দেখিতে পারা যায় না। কেষ্টা ছোঁড়ার একবার বদমায়েসি শুনুন। কোথা হইতে একটা টুল চাহিয়া আনিল। লোককে সেই টুলের উপর দাঁড় করাইয়া ঘরের ভিতর আমাকে ও দুর্লভীকে দেখাইতে লাগিল।

পুঁটিরাম চাকী বলিলেন,—"অমনি দেখায় নি। এক পয়সা করিয়া টুলের ভাড়া লইয়াছিল। দেখিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া আমার নিকট হইতে সে চারি পয়সা লইয়াছিল।"

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—"চারি পয়সা! আমাকে সাত পয়সা দিতে হইয়াছিল।"

ডমরুধর মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"কি দেখিবার জন্য পয়সা খরচ করিয়াছিলে? আমাকে কি তোমরা কখনও দেখ নাই? আমি কি আলিপুরের বাগানের সিংহ না বাঘ না কি, যে, আমাকে দেখিবার জন্য তোমাদের এত হুড়াহুড়ি?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ : এলোকেশীর মুড়ো খেঙরা

দেখিতে দেখিতে কে একজন বলিয়া বসিল,—"এলোকেশী ঠাকুরাণীকে সংবাদ দাও। তিনি আসিয়া কর্তাটিকে একবার দেখুন।"

তখন আমার হৃৎকম্প হইল। একে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাহার উগ্রচণ্ডা—সর্বদাই রণমূর্তি। আবার তাহার উপর আমি এক কন্দর্প পুরুষ। সর্বদাই এলোকেশীর সন্দেহ। এ অবস্থায় আমাকে দেখিলে এলোকেশী যে আমার কি হাল করিবেন, তাই ভাবিয়া আকুল হইলাম।

সেই হতভাগা ছোঁড়া কেষ্টা, বলিতে না-বলিতে আমার বাড়ীতে সংবাদ দিল। এলোকেশীর গায়ের রং আমা অপেক্ষা কাল। রাগে এখন তাঁহার মুখটী অনেক দিনের ভুষোপড়া ধানসিদ্ধ হাঁড়ীর ন্যায় হইল। ভীম যেরূপ ঘণ্টাওয়ালা লোহার গদা লইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, এলোকেশীও সেইরূপ মুড়ো খেঙরা লইয়া দুর্লভীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এলোকেশীকে দেখিয়া লোকে পথ ছাড়িয়া দিল। দ্বারের শিকল খুলিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পর—বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা। "পোড়ার মুখো বুড়ো ডেক্‌রা! রঃ! আজি তোর ভূত ছাড়াইব"—এই কথা বলিয়া আমার মাথার টাক হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত সেই মুড়ো খেঙরা দিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এলোকেশীর নব্য বয়স; ধাঙ্গড়ের কিল বা কি! এলোকেশীর এক এক ঘা খেঙরা ভীমের গদার ন্যায় আমার গায়ে পড়িতে লাগিল। আমি যত বলি—আর নয়! আর নয়! যথেষ্ট হইয়াছে,—ততই খেঙরার প্রহারে আমার পিঠ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মাথার টাকে ও পিঠে সেই মুড়ো খেঙরার অনেক কাঠি ফুটিয়া গেল।

কেষ্টাকে মন্দ বলি, কিন্তু এই দুঃসময়ে সে আমার বন্ধু হইল। আমার নাকাল দেখিয়া আমোদে আটখানা হইয়া সে ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গগণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল,—'টাক-চাঁদ, টাক-বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর, ডমরু তোর ডমরু।'

তখন এলোকেশী আমাকে ছাড়িয়া—"তবে রে আঁটকুড়ীর বেটারা!" বলিয়া তাহাদের মারিতে দৌড়িলেন। আমি অব্যাহতি পাইলাম, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। দুর্লভী তখন আপনার খেঙরা লইয়া আমাকে বলিল,—"তুই যেমন, ঠাকুর তোর তেমনি খ'র করিয়াছেন। আমার মন ভুলাইতে রাঙা ঘাঘরা পরিয়া সাজ-গোজ করিয়া আসা হইয়াছে, এখন আমি একবার ঝাড়াই।" এই কথা বলিয়া সেও যা-কত আমার পিঠে বসাইয়া দিল।

কত কিল কত খেঙরা আর সহ্য করিব! আমার পিঠ তো আর পাথরের নয়! আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। দুর্লভীর ঘর হইতে যখন বাহির হই, তখন এলোকেশী বলিলেন,—"এখনও হইয়াছে কি! চল ঘরে চল। আজ তোর আমি হাড়ীর হাল করিব। খেঙরার চোটে তোর ভূত ছাড়াইব।"

সেই ভয়ে আমি বাড়ী যাইলাম না। আমার খিড়কির বাগানে এক গাছ ঠেস দিয়া বিরস বদনে বসিয়া রহিলাম। বসিয়া বসিয়া মা ভগবতীকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"মা! আমি তোমার ভক্ত, দুর্গোৎসব আসিতেছে, মা! আমি তোমার পূজা করিব। তুমি দেখিয়াছ, আমার দালানে তোমার প্রতিমা গড়া হইতেছে। তবে কেন মা আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল। বাড়ী যাইতে আমার সাহস হইল না, গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে একটু একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্ন দেখি যে, এলোকেশী বুঝি শূর্পণখার বেশ ধরিয়া আমার নাক কাটিতে আসিতেছে। অথবা তাড়কা রাক্ষসী হইয়া আমাকে চর্বণ করিতেছেন। প্রহারে শরীর জ্বর জ্বর হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভিজা মাটীর উপরেই শুইয়া পড়িলাম। একটু নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময় কে যেন আমাকে ডাকিল,"ডমরুধর! বাছা ডমরুধর!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অমৃত কুণ্ডের জল

চমকিত হইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিলাম যে, স্বয়ং মা দুর্গা একখানি চৌকীর উপর আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন। এ তোমার দশ-হেতে হরিতাল রঙে গর্জন তৈলে ব্যাড়বেড়ে রাঙতা-পরা দুর্গা নয়। এ কৈলাস পর্বতের আসল মা দুর্গা; সুন্দর পরিচ্ছদে ও বহুমূল্য রত্ন-আভরণে ভূষিত করিয়া কুবের ইঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

যোড়হাতে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলাম। মা বলিলেন,—"ডমরুধর! তুমি বড় অপরাধ করিয়াছ। যে মন্ত্র তোমাকে আমি শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া ও কি উদ্ভট কথা সব বলিয়াছিলে? 'জিলেট জিলেকি সিলেমেল্ কিলেকিট কিলেকিশ' কি বাছা? এরূপ মন্ত্র বেদে কোরাণে বাইবেলে কোন স্থানে আমি দেখি নাই। পিড়িং ফিড়িং দুম বলিলেও একদিন কথা থাকিত। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমার এত দুর্গতি হইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে হাঁ কর।"

আমি হাঁ করিলাম! দেবী আমার মুখে একটু অমৃত কুণ্ডের জল ঢালিয়া দিলেন। তাহাতে আমার সর্বশরীরের ব্যথা দূর হইল। যেন নূতন জীবন নূতন শরীর আমি প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পর মা আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, —"যাও বাছা। এখন ঘরে যাও। এলোকেশী আর তোমাকে কিছু বলিবে না।"

এই কথা বলিয়া মা অন্তর্ধান হইলেন। আমি বাড়ী আসিলাম। মায়ের বরে এলোকেশীর প্রসন্ন বদন দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।

ডমরুধরের গল্প শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। পুরোহিত বলিলেন,— "ধন্য ডমরুধর! তুমি ধন্য!"

গণপতি ভড় বলিলেন,—"ডমরু কি বিপদেই না পড়িয়াছিলেন।"

পুঁটিরাম চাকী বলিলেন,—"কেবল পুণ্যবলে ডমরুধর রক্ষা পাইয়াছেন।"

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—"চমৎকার গল্প।"

লম্বোদর বলিলেন,—"অতি চমৎকার! বন্ধুদিগের পুস্তক সমালোচনা করিবার সময় কোন কোন লেখক যেরূপ প্রেমে মজিয়া রসে ভিজিয়া ভাবে গেঁজিয়া বলেন,—মরি মরি! আহা মরি! এও সেই আহা মরি!"

রুক্ষ কটাক্ষে ডমরুধর একবার লম্বোদরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না।

অবশেষে ডমরুধর বলিলেন,—"পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্রের উদরে যখন ছিলাম, তখন মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম যে, এ বিপদ হইতে মা যদি আমাকে পরিত্রাণ করেন, তাহা হইলে মাকে আমি ব্যাঘ্রবাহিনীরূপে পূজা করিব। আমার আদেশে সেইজন্য কারিগর সিংহ স্থানে ব্যাঘ্র গড়িয়াছে।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে গল্পটি করিলে, কি করিয়া জানিব যে, তাহা সত্য ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"এই আমার পায়ে এখনও রাহুর কামড়ের দাগ রহিয়াছে।" সত্য সত্যই ডমরুধরের পায়ে একটা দাগ আছে, তা দেখিয়া সকলে অবাক !

তখন লম্বোদর বলিলেন,—"জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।"

পঞ্চম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ স্বদেশী-কোম্পানী

ডমরুধরের প্রথম উপাখ্যানে চিত্রগুপ্ত, যম, যমনী, পুঁইশাক, এলোকেশী এলোকেশীর মাতা প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। এলোকেশী ডমরুধরের তৃতীয় পক্ষের পত্নী। সেই উপাখ্যান পাঠের ফল এইরূপ,—

'ডমরুচরিত পড় রে ভাই ক'রে একান্ত ভক্তি।
ইহকালে পাবে সুখ পরকালে মুক্তি ॥
চিত্রগুপ্তর গলায় দড়ি যমনী বাজায় শাঁক।
পুঁইশাকের নামে যমের সিঁটকে উঠলো নাক ॥
ঝক মক করে সোণার গহনা এলোকেশীর গায়।
আড়নয়নে শাশুড়ী ঠাকরুণ পিটির পিটির চায় ॥
পয়সা দিয়া ডমরুচরিত কিনে রাখ ঘরে।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে ইহার বরে ॥

বর্তমান ডমরু উপাখ্যানের ফলও সেইরূপ, বরং অধিক।

প্রতি বৎসর পূজার সময় ডমরুধর বন্ধুবান্ধবের সহিত নানারূপ গল্প করেন। পঞ্চমীর দিন বৈকালে তাঁহার পূজার দালানে লম্বোদর, গজানন, হলধর প্রভৃতি বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রতিমার নিকট তিনি বসিয়া আছেন। ডমরুধরের মুখের দিকে চাহিয়া লম্বোদর বলিলেন,—"এবার পুনরায় স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া তুমি অনেকগুলি টাকা উপার্জন করিয়াছ!"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! স্বদেশী কোম্পানী বৃথা যায় না। কিছু না কিছু দিয়া যায়। কিন্তু ভাই, সম্প্রতি আমি এক ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম। সে বিপদ হইতে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার প্রতি মায়ের অসীম কৃপা। বলিতে গেলে আমি মা দুর্গার বরপুত্র।"

লম্বোদর বলিলেন,—"সে-বার স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া তুমি অনেক রাড়ী ভুঁড়ী গরীব দুঃখীর টাকা হাম করিয়াছিলে। এবার মোকদ্দমা হইয়াছিল জানি। কি হইয়াছিল বল দেখি।"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"মোকদ্দমা স্বদেশী কোম্পানীর প্রধান অঙ্গ। স্বদেশী কোম্পানী খুলিলে সকলকেই মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়। যাহা হউক, এখন সব চুকিয়া গিয়াছে। এই নূতন স্বদেশী কোম্পানীর বৃত্তান্ত এখন আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি, শুন।"

ডমরুধর এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

গত বৎসর পূজার পর একদিন বেলা দশটার সময় আমি বাহিরে বসিয়া আছি, এমন সময় ব্যাগ হাতে করিয়া এক ছোকরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর। রং অল্প গৌরবর্ণ। কালো কালো গোঁপ আছে। দেখিতে সুশ্রী। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া বোধ হইল।

ব্যাগ হইতে চারিটি শিশি সে বাহির করিয়া বলিল,—"এইটি ম্যালেরিয়া

জ্বরের আরক, এইটি অজীর্ণ রোগের ঔষধ, এইটি বহুমূত্র রোগের ব্রহ্মাস্ত্র ; আর এইটি মুখে মাখিলে রং ফরসা হয়। প্রতি শিশির মূল্য একটাকা, চারিটি টাকা আমাকে প্রদান করুন।"

আমি বলিলাম,—"ঔষধে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি বোকা লোকদিগের নিকট গমন কর। তোমার একটীও ঔষধ আমি ক্রয় করিব না।"

আমার কথা শুনিয়া সে চলিয়া গেল না। অতি সুমিষ্ট স্বরে সে ঔষধের গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সে বলিল,—"আমি তিনটা পাস দিয়াছি। যে বিদ্যা শিখিলে নানা পদার্থ মিশাইয়া উত্তম উত্তম নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পারা যায়, আমি সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। সেই বিদ্যাবলে আমি এইসব ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাদের গুণ অলৌকিক। দিন কয়েক ব্যবহার করিলেই আপনার শরীরে কান্তি ফুটিয়া পড়িবে। আপনি নব-যৌবন প্রাপ্ত হইবেন।"

উত্তর করিলাম,—"আমার ম্যালেরিয়া জ্বর নাই, অজীর্ণ ও বহুমূত্র রোগ নাই। বৃদ্ধ হইয়াছি, রং ফরসা হইবার সাধ নাই। তাহা ব্যতীত আমি বৃথা একটি পয়সাও খরচ করি না। তোমার ঔষধ আমি ক্রয় করিব না।"

আমাদের দুইজনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। কিন্তু সে ছোকরা নাছোড়বন্দা। এমনি সুমিষ্ট ভাষায় সে বক্তৃতা করিতে লাগিল যে, ক্রমে আমার মন ভিজিয়া আসিল। অবশেষে সে বলিল,—"আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু মন আপনার বৃদ্ধ হয় নাই। মনটী আপনার নবযৌবনে ঢল ঢল করিতেছে। আর কোন ঔষধ লউন আর নাই লউন, আপনাকে এই রং ফরসা হইবার ঔষধটি লইতে হইবে। দিনকতক মুখে মাখিয়া দেখুন। আপনি ফুট গৌরবর্ণ হইয়া পড়িবেন। সুন্দর সুকুমার কুড়ি বৎসরের যুবক হইবেন।"

ছেলেবেলা হইতে ফরসা হইবার আমার সাধ ছিল। অনেক সাবাং মাখিয়াছিলাম। কিছুতে কিছু হয় নাই। মনে মনে ভাবিলাম,—"এই ঔষধটা পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন? যদি আমার রং ফরসা হয়, তাহা হইলে দুর্লভী বাগদিনী আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইবে।"

শিশির মূল্য একটাকা, কিন্তু সে আমাকে আট আনায় দিল। মূল্য লইয়া সে কিছুদূরে গিয়াছে, এমন সময় আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল। —"আমি ডমরুধর! সুমিষ্ট বক্তৃতা করিয়া আমাকে ঠকাইয়া এ আট আনা লইয়া গেল। এ সামান্য ছোকরা নয়। ইহা দ্বারা কি কোনরূপ কাজ করিতে পারা যায় না?"

এইরূপ ভাবিয়া আমি তাহাকে ডাকিলাম। অনেক আদর করিয়া আমার নিকট বসাইলাম। আমি বলিলাম,—"বাপু! তোমার নাম কি?"

সে উত্তর করিল,—"আমার নাম শঙ্কর ঘোষ।"

তাহার বাড়ী কোথায়, সে কি কাজ করে, প্রভৃতি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি তিনটা পাস দিয়াছ। পাঁচ দ্রব্য মিশাইয়া নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পার। ঔষধ বেচিয়া কি হইবে? কোন একটা লাভের বস্তু প্রস্তুত করিতে পার না?"

কিছুক্ষণ নীরবে সে চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল,—"কল্য আসিয়া আপনার এ কথার উত্তর দিব।"

পরদিন সে একরাশি এঁটেল মাটী ও চারি পাঁচখানি ধবধবে চিক্কন কাগজ আনিয়া আমাকে দেখাইল। সে বলিল,—"এঁটেল মাটী হইতে আমি এই কাগজ প্রস্তুত করিয়াছি। এক টাকার এঁটেল মাটী হইতে দশ টাকার কাগজ হইবে। নয় টাকা লাভ থাকিবে। প্রথম প্রথম যাহা অল্প খরচ হইবে, তাহা যদি আপনি প্রদান

করেন, তাহা হইলে আমরা এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিব। লাভ অর্দ্ধেক আপনার অর্দ্ধেক আমার।"

এঁটেল মাটী ও কাগজ দেখিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। স্বদেশী কোম্পানী সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। ভাবিলাম যে, এ কাজ হালাগুলো বাঙ্গালীর উপযুক্ত বটে। তাহার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

চারি পাঁচ দিন পরে আমরা দুইজনে কলিকাতা গমন করিলাম। ভালরূপ একটা স্বদেশী কোম্পানী খুলিতে হইলে দুই-চারিজন বড়লোকের নাম আবশ্যক। আমরা তাহার যোগাড় করিলাম। একটি মিটিং হইল। এঁটেল মাটী ও কাগজের নমুনা দেখিয়া বড়লোকেরা ঘোরতর আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন বলিলেন,—"এঁটেল মাটী দিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, খড়িমাটী দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।"

শঙ্কর ঘোষ উত্তর করিলেন,—"খড়িমাটী দিয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক পড়ে।"

কাগজ সম্বন্ধে ইঁহার এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া অন্য সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেই যাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল কালেজের ছোঁড়াগুলো আনন্দে হাততালি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়, আমরা সেইরূপ দুইজন বক্তার যোগাড় করিয়াছিলাম। তাঁহারা ইজের দিয়া কোমর আঁটিয়া রাখেন। তাঁহাদের একজন বক্তৃতা করিলেন—

আমাদের কোম্পানীর নাম হইল,—"গ্রাণ্ড স্বদেশী কোম্পানী লিমিটেড।" কয়েকজন বড়লোক ও উগ্র বক্তা ডাইরেক্টর বা পরিচালক হইলেন। কারণ, এই সকল বড়লোক ও বক্তারা সকল প্রকার কারুকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে হুনুহর। ইঁহারা না জানেন, এমন বিষয় নাই। শঙ্কর ঘোষ ইংরাজী ও বাঙ্গালায় কোম্পানীর বিবরণ প্রদান করিয়া কাগজ ছাপাইলেন ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, যে ব্যক্তি একশত টাকার শেয়ার বা অংশ কিনিবে, প্রতিমাসে লাভস্বরূপ তাহাকে পচিশ টাকা প্রদান করা হইবে।

দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটী হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতার বাঙ্গালিরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।

প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। হুড় হুড় করিয়া টাকা আসিতে লাগিল। আমি কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। টাকা সব আমার কাছে আসিতে লাগিল।

কয়েক মাস গত হইয়া গেল। এঁটেল মাটী দিয়া শঙ্কর ঘোষ একখানিও কাগজ প্রস্তুত করিলেন না। মাসে যে পঁচিশ টাকা লাভ দিবার কথা ছিল, তাহার একটি পয়সাও কেহ পাইল না। আসল টাকার মুখও কেহ দেখিতে পাইল না। জনকয়েক আমাদের নামে নালিশ করিল। শঙ্কর ঘোষ চমৎকার এক হিসাবের বহি প্রস্তুত করিয়া কাছারীতে দাখিল করিলেন। লাভ দূরে থাকুক, হিসাবে লোকসান প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোম্পানী "লিমিটেড" ছিল। মোকদ্দমা ফাঁস হইয়া গেল। আমাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগিল না।

অনেকগুলি টাকা লোকে দিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সে টাকাগুলি সমু-

দয় আমি লইলাম। শঙ্কর ঘোষ ভাগ চাহিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"হিসাবের বহি তুমি নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়াছ। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে, লোকসান হইয়াছে। কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোথা হইতে আসিবে। বরং যাহা লোকসান হইয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া যাও।"

আমার কথা শুনিয়া শঙ্কর ঘোষ ঘোরতর রাগান্বিত হইল। "তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে; তোমাকে আমি দেখিয়া লইব,"—আমাকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে চলিয়া গেল। আমার দ্বিতীয় স্বদেশী কোম্পানীর বৃত্তান্ত এই।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বলিলে যে সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছিলে। আমরা পাড়ায় থাকি। কোন বিপদের কথা আমরা তো শুনি নাই।"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"সে বিপদের কথা আজ পর্য্যন্ত আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। আজ তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি শুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ছিকু ডাক্তার

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—"ফাঁকতালে অনেকগুলি টাকা লাভ করিয়া মন আমার প্রফুল্ল হইল। শরীরটি নাদুর-নুদুর নধর হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম দুর্লভীকে দেখাইয়া আসি। সেবার এই বাগদিনী সম্বন্ধে কি হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। সুন্দরবনের আবাদ হইতে আমি বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলাম। পথে এক বেটা সাঁওতাল আমার কাপড় কাড়িয়া লইয়া আমাকে উলঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিল। কোন স্থানে একদল বেদিয়া তাঁবু ফেলিয়াছিল। তাহাদের ছোট একটি লাল ঘাঘরা বেড়ার গায়ে শুকাইতেছিল। সেই ঘাঘরা চুরি করিয়া আমি পরিধান করিলাম। আমি মনে করিলাম যে, এরূপ বেশে দিনের বেলা গ্রামে প্রবেশ করিব না, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুর্লভীর ঘরে লুকাইয়া থাকিব। তাহার ঘরে যেই প্রবেশ করিয়াছি, আর কেষ্টা ছোঁড়ার বাপ আসিয়া দ্বারে শিকল দিয়া দিল। কেষ্টা গ্রামের লোককে ডাকিয়া আনিয়া, আমাকে দেখাইল। "রাঙা ঘাঘরা পরিয়া পোড়ার মুখো ডেকরা বুড়ো আমার মন ভুলাইতে আসিয়াছে,"—এইরূপ গালি দিয়া দুর্লভী আমাকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। তাহার পর এলোকেশী আসিয়া আমাকে ঝাঁটার দ্বারা প্রহার করিলেন। এ সব কথা তোমাদিগকে আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সেই অবধি দুর্লভী আমার সহিত কথা কয় না। পথে দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। যখন কন্দর্প পুরুষের ন্যায় আমার নাদুর-নুদুর নধর শরীর হইল, তখন আমি মনে করিলাম যে, চুপি চুপি দুর্লভীকে দেখাইয়া আসি,—যেন এলোকেশী জানিতে না পারেন।

দুর্লভীর ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, সে কয়দিন জ্বরে পড়িয়া আছে। তাহার বোন-ঝি সেবা করিতে আসিয়াছে। বোন-ঝির নাম চঞ্চলা। পাঁচ ক্রোশ দূরে ঝিঁঝিরডাঙ্গা নামক গ্রামে তাদের বাস। সে বিধবা। বয়স প্রায় ত্রিশ। রং কালো বটে, কিন্তু দেখিতে মন্দ নহে। আমি মনে করিলাম,—ইহার সহিত ভাব করিতে হইবে। তাহা করিলে দুর্লভীর হিংসা হইবে। আমার উপর আর তাহার রাগ থাকিবে না।

রং ফরসা হইবার জন্য শঙ্কর ঘোষ আমাকে যে ঔষধ বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা আমি ব্যবহার করি নাই। সেই ঔষধ দুর্লভীকে আমি খাইতে দিলাম।

তাহা খাইয়া দুর্লভীর পেট ছাড়িয়া দিল, দুর্লভী মৃতপ্রায় হইল। গ্রামের সকলে আমাকে ছি ছি করিতে লাগিল। পুলীশে সংবাদ দিবে বলিয়া কেষ্টার বাপ আমাকে ভয় দেখাইল।

চণ্ডলা বলিল যে, তাহাদের গ্রামে ভিকু ডাক্তার নামক এক ভাল চিকিৎসক আছেন, তাঁহাকে আনিলে তাহার মাসী ভাল হইবে। আমার ঔষধ খাইয়া দুর্লভীর প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, সেজন্য ভয়ে আমি খরচ দিতে সম্মত হইলাম। ব্যাগ হাতে করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে ঝিঁঝিরডাঙ্গা হইতে ভিকু ডাক্তার পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রদান করেন।

শুনিলাম যে, ভিকু কলিকাতায় কোন ডাক্তারখানায় ছয় মাস কম্পাউণ্ডারি করিয়াছিলেন। একবার কোন রোগীকে কৃমির ঔষধের পরিবর্ত্তে কুচিলা বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। রোগীর তাহাতে মৃত্যু হইয়াছিল। সেজন্য ভিকুর ছয় মাস কারাবাস হইয়াছিল। এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভিকু এখন স্বগ্রামে আসিয়া ডাক্তার হইয়াছেন।

ভিকুর বয়স চল্লিশের অধিক। শরীর কাহিল। রং ময়লা, তবে কালো নহে। সচরাচর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের বিশেষতঃ হাতুড়েদের যেরূপ হয়, ভিকুর মুখ দিয়াও সেইরূপ চড়বড় করিয়া কথার যেন খৈ ফুটিতে থাকে। দুর্লভীকে দেখিয়া ভিকু বলিলেন,—"কোন ভয় নাই, সরিষাপ্রমাণ এক বড়িতে ইহাকে আমি ভাল করিব। এ বা কি রোগ! আমি কত অসাধ্য রোগ ভাল করিয়াছি। কত মরা মানুষকে জীবন প্রদান করিয়াছি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া ভিকু নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ভিকু বলিলেন,—"নেহালা গ্রামের ত্রিলোচন সরকেলের পেট ক্রমে ক্রমে ফুলিতে লাগিল; পেট ফুলিয়া ক্রমে জালার মত হইল। কত ডাক্তার কত বৈদ্য আসিল। কেহ বলিল উদরী, কেহ বলিল টিউমার। কত ঔষধ তিনি খাইলেন। কিছুতে কিছু হইল না। অবশেষে তাঁহার লোকেরা আমাকে লইয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পেটটি দেখিলাম। অবশেষে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের ঘরে মাছ ধরিবার সুতা বঁড়শী আছে? তাহারা সুতা বঁড়শী আনিয়া দিল। বঁড়শীতে হোমিওপ্যাথিক গুলির টোপ করিয়া সুতা সহিত রোগীকে গিলিতে বলিলাম। মুখের বাহিরে সুতাটির অপর দিক ধরিয়া আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সুতা যেই একটু নড়িয়া উঠিল, আর সেই সময় আমি টান মারিলাম। বলিব কি মহাশয়! ধামার মত প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ তাঁহার পেট হইতে আমি বাহির করিলাম। জলের সহিত সামান্য শিশুকচ্ছপ সরকেলমহাশয় ভক্ষণ করিয়াছিলেন। উদরে সেই কচ্ছপ ক্রমে বড় হইয়া তাঁহার জীবন সংশয় করিয়াছিল। আমার চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হইলেন।

"আর একবার রাত্রি দুপ্রহরের সময় আমি ঝিল গ্রামের শ্মশানঘাটের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। দেখিলাম যে, সে স্থানে কয়েকটি ভূত কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া কমিটী করিতেছে। আমি একটু দূরে বসিয়া ব্যাগ হইতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বাহির করিলাম। দিয়াশলাই জ্বালিয়া তাহার আলোকে ভূতের ঔষধ দেখিলাম। তাহার পর যেই ঔষধের শিশি বাহির করিয়াছি, আর তাহার গন্ধ পাইয়াই ভূতেরা রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। একটু বিলম্ব করিলে আমার ঔষধের গুণে তাহারা ভস্ম হইয়া যাইত। ভূতের ছাই দিয়া হিষ্টিরিয়া রোগের চমৎকার ঔষধ আমি প্রস্তুত করিতে পারিতাম।"

ভিকু ডাক্তার আরও বলিলেন যে,—"ভূতগণ যখন পলায়ন করিল, তখন আমি

সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, তাহারা এক মড়া ভক্ষণ করিতেছিল। মড়ার হাত-পা সর্ব শরীর তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছিল, কেবল মুখটি অবশিষ্ট ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুলি বাহির করিয়া তাহার মুখে দিলাম। মুখে গুলি দিবামাত্র সে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর আশ্চর্য্য কথা কি বলিব মহাশয়! আমার ঔষধের গুণে তাহার শরীর গজাইতে লাগিল। প্রথম গলা হইল, তাহার পর বক্ষঃস্থল হইল, তাহার পর উদর হইল, তাহার পর হাত-পা হইল। সে উঠিয়া বসিল। তখন আমি বুঝিলাম যে, সে হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী নহে। সে রাত্রি আমি তাহাকে আমার বাটীতে লইয়া যাইলাম। পরদিন সে আপনার দেশে চলিয়া গেল। এখানে থাকিলে আপনাদিগকে দেখাইতাম। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ আছে বটে, কিন্তু ঠিক ঔষধটি ধরা বড় কঠিন। অনেক দেখিয়া-শুনিয়া আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা হইয়াছে। রোগীর চেহারা দেখিলেই আমি ঠিক ঔষধ ধরিতে পারি। আমার হাতে একটিও রোগী মারা পড়ে না। সেজন্য কলিকাতার হোমরা-চোমরা ডাক্তারগণ, যাঁহারা ষোল টাকা বত্রিশ টাকা ভিজিট গ্রহণ করেন তাঁহাদের যখন হালে পানি পায় না, তখন তাঁহারা বলেন, ঝিঁঝিরডাঙ্গার ভিকু ডাক্তারকে লইয়া এস, তিনি না হইলে এ রোগের ঔষধ কেহ ঠিক করিতে পারিবে না। সেজন্য মাঝে মাঝে আমাকে কলিকাতায় যাইতে হয়।"

ভিকু পুনরায় বলিলেন,—"আমি আর একটি চমৎকার ঔষধ বাহির করিয়াছি। যে ঔষধে প্রজাপতি দক্ষের গলায় ছাগলের মুণ্ড জোড়া লাগিয়াছিল, ইহা সেই ঔষধ। হাত-পা এমন কি মানুষের মাথা কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেলেও, আমি এক বড়িতে পুনরায় জুড়িয়া দিতে পারি।"

ভিকু নানারূপ গল্প করিলেন। অবাক হইয়া সকলে তাঁহার গল্প শুনিতে লাগিল। সকলে মনে করিল যে, ইঁহার তুল্য বিচক্ষণ ডাক্তার জগতে নাই।

দুর্লভীর চিকিৎসার জন্য আমি তাঁহাকে এক টাকা দিতে চাহিলাম। কিন্তু প্রথমে তিনি কিছুতেই তাহা লইলেন না। তিনি বলিলেন,—"আমি পাঁচ ক্রোশ পথ হইতে আসিয়াছি। চারি টাকা লইব।"

অনেক কচলাকচলির পর আমি বলিলাম যে,—"আপাততঃ আপনি এক টাকা লউন, রোগী ভাল হইলে পরে আর তিন টাকা দিব।"

এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি এক টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্লভী ভাল হইল। কিন্তু তাহার পর ডাক্তারকে ঘোড়ার ডিম! রোগ ভাল হইলে অনেকেই ডাক্তার-বৈদ্যকে কলা দেখায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চঞ্চলার গাই গরু

দুর্লভী ভাল হইলে চঞ্চলা আপনার গ্রামে চলিয়া গেল। কিন্তু চঞ্চলার সহিত সদ্ভাব করিতে আমার বাসনা হইয়াছিল। তাহাদের গ্রাম অনেক দূর। সর্বদা আমি যাইতে পারিতাম না। কেবল মাঝে মাঝে যাইতাম। সেই গ্রামের পাশ দিয়া বড় রাস্তা গিয়াছে। তাহার উপর দিয়া গরুর গাড়ী সর্বদা যায়। দুই-চারিটা পয়সা দিয়া তাহার উপর বসিয়া কখন কখন কতক দূর যাইতাম। ফিরতি ঘোড়ার গাড়ীতেও দুই একবার গিয়াছিলাম। এ পথে দুই তিনবার মোটর গাড়ী দেখিয়াছিলাম। স্বদেশী কোম্পানী স্থাপনের সময় বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শঙ্কর ঘোষ মোটর গাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন।

সেই সময় আমি মোটর গাড়ী চড়িয়াছিলাম। কিন্তু অতি বেগে গমন করে। আমার ভয় হইয়াছিল। মোটর গাড়ী টানিবার নিমিত্ত ঘোড়া থাকে না। তবে ইহার ভিতর কোনরূপ বিলাতি জন্তু-জানোয়ার থাকে কি না, তাহা আমি জানি না।

মাঝে মাঝে চণ্ডলাদের গ্রামে গিয়া তাহাদের দাওয়াতে আমি বসিতাম। চণ্ডলার মা নাই, কেবল বাপ আছে। তাহার নাম সহদেব বাগ্দী। সহদেব মজুরি করে। চণ্ডলার একটি গাই গরু আছে। তাহার দুধ সে বিক্রয় করে।

চণ্ডলার দাওয়াতে বসিয়া আমি গল্প-গাছা করিতাম। কখন কখন দুই-একটা রসের কথাও বলিতাম। তখন হাসিয়া সে নুটিপুটি হইত। পাড়ার মাগীদের সে ডাকিয়া আনিত। আমার দিকে চক্ষু ঠারিয়া সকলে হাসিয়া নুটি-পুটি হইত। আমাকে দেখিলে লোকের আনন্দ হয়। মাগীদের তো কথাই নাই। আমার রূপ দেখিয়া তাহাদের মন ভুলিয়া যায়। মাগীগুলো আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে।

চণ্ডলাকে দশ পয়সা দিয়া একখানি গামছা কিনিয়া দিয়াছিলাম। গামছা পাইয়া তাহার আহ্লাদ হইয়াছিল, আমি মনে ভাবিলাম,—দুর্লভী একবার এই কথা শুনিলে হয়। তাহা হইলে সে আর মুখ হাঁড়ী করিয়া থাকিবে না।

লম্বোদর। এইবার ভাই সেই ঘোর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এইবার সেই গ্রামে আমাকে প্রায় একমাস কয়েদ থাকিতে হইয়াছিল।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কবে ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"আজ পঞ্চমী, ইহার তিনটা পঞ্চমী আগে, প্রায় দুই মাসের কথা।"

লম্বোদর বলিলেন,—"সে কি করিয়া হইবে। তুমি বলিতেছ যে দুই মাস পূর্বে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার পর এক মাস তুমি সেই গ্রামে কয়েদ হইয়াছিলে। কিন্তু গত ছয় মাস ধরিয়া তুমি গ্রাম হইতে কোন স্থানে গমন কর নাই। এই ছয় মাস প্রতিদিন তোমাকে আমরা দেখিয়াছি।"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"সকলই জগদম্বার মায়া। তাঁহার মায়াতে তোমরা আচ্ছন্ন হইয়াছিলে।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্ঘটনাটা কি ?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"তাহা বলিতেছি শুন।"

প্রায় দুই মাসের কথা হইল। একদিন রাত্রিতে আমি ঘরে শুইয়াছিলাম। শেষ রাত্রিতে ঘুম ভাঙিগয়া গেল। আর নিদ্রা হইল না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলাম। চণ্ডলার জন্য একখানি নয়হাতি কাপড় কিনিয়াছিলাম। মনে করিলাম, বিছানায় আর বৃথা পড়িয়া থাকিব না। কাপড়খানি তাহাকে দিয়া আসি। এলোকেশীর ভয়ে কাপড়খানি এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। কাপড়খানি লইয়া চণ্ডলাদের গ্রাম অভিমুখে আমি হাঁটিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে সকাল হইয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের পরে বড় রাস্তায় গিয়া উঠিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় চণ্ডলাদের গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম। চণ্ডলার পিতা সহদেবের সহিত বড় রাস্তায় সাক্ষাৎ হইল। চণ্ডলার গাই গরুর দড়ি ধরিয়া বড় রাস্তার উপর দিয়া সে তাহাকে মাঠে লইয়া যাইতেছিল। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি কিছুদূর চলিলাম, অন্যমনস্ক হইয়া আমরা দুইজনে যাইতেছি, পশ্চাতে যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইয়াছিল, তাহার কিছুই শুনিতে পাই নাই। সহসা পশ্চাৎ হইতে এক মোটর গাড়ী আমার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়ীর চাকায় আমার কোমর পর্য্যন্ত কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেল। আমার দুইটা কাটা পা গাড়ীর চাকায় কিরূপে

আটকাইয়া গেল। কোমর হইতে আমার পা দুইটি লইয়া মোটর গাড়ী অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

লম্বোদর প্রভৃতি সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। সকলে বলিয়া উঠিলেন—"বল কি হে? সত্য?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই, সত্য।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর?"

ডমরুধর বলিলেন,—"রাস্তায় ধূলায় আমার ধড়টি পড়িয়া কাটা ছাগলের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তখনও আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায় নাই। তখনও সম্পূর্ণ আমি জ্ঞানহারা হই নাই। আমি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, সহদেব বাগ্দী হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় যে, তাহাকে আঘাত লাগে নাই। সে চঞ্চলার গরুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। গরুটিও পথে পড়িয়া ছিল। গাড়ীর আর একটি চাকায় তাহারও কোমর পর্য্যন্ত কাটিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছিল। তাহার কোমর ও পা কিন্তু গাড়ীর চাকায় লাগিয়া যায় নাই। একদিকে গরুর ধড় ও অপরদিকে তাহার কোমর ও পা রাস্তার উপর পড়িয়াছিল। বিষণ্ণ বদনে সহদেব তাহাই দেখিতেছিল।

সেই পথ দিয়া ভিকু ডাক্তার ব্যাগ হাতে লইয়া চিকিৎসা করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দৌড়িয়া আসিলেন। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া আমার কোমর ও পা দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই গরুর কোমর ও পা আমার শরীরে তিনি জুড়িয়া দিলেন। তাহার পর ব্যাগ খুলিয়া দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুলি আমার মুখে দিলেন। ঔষধের গুণে সেই গরুর কোমর ও পা আমার শরীরে জুড়িয়া গেল। তাহার পর আর দুইটি বড়ি তিনি আমার মুখে দিলেন। তাহা খাইয়া আমি শরীরে বল পাইলাম। কিন্তু মানুষের মত গরুর দুই পায়ে আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। গরুর দুই পা আর আমার দুই হাত মাটীতে পাতিয়া চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আমাকে দাঁড়াইতে হইল।

ইতিমধ্যে সে স্থানে অনেক লোক একত্র হইয়াছিল। এই অবস্থায় সকলে আমাকে গ্রামের ভিতর লইয়া গেল। সে স্থানে গিয়া ভিকু ডাক্তার বলিলেন,—"ডমরুবাবু! তুমি আমার পাওনা টাকা দাও নাই। আমাকে ফাঁকি দিয়াছিলে। কিন্তু এখন তোমার এই শরীরটি আমার হইল। গরুর কোমর তোমার শরীরে যদি আমি না জুড়িয়া দিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন কালে তুমি মরিয়া যাইতে। দুইদিন পরে তোমার ধড়টি পচিয়া যাইত, অথবা পুড়িয়া ছাই হইত। অতএব তোমার এই শরীরটি এখন আমার। আমার চাষ আছে। যতদিন বাঁচিবে, তত-দিন আমার ক্ষেত্রে তোমায় কাজ করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া আমার গলায় গরুর দড়ি দিয়া তিনি টানিতে লাগিলেন।

চঞ্চলার পিতা সহদেব তাঁহার হাত হইতে দড়ি কাড়িয়া লইল। সে বলিল,—"ভাল রে ভাল! ইনি তোমার? সে কিরূপ কথা? ইঁহার আধখানা চঞ্চলার গাই। এখনও ইঁহার দুধ হইবে। আমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া দিব না।"

আমাকে লইয়া দুইজনে বিবাদ বাধিয়া গেল। এ বলে ইনি আমার প্রাপ্য, ও বলে আমার প্রাপ্য। ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে গ্রামের লোক সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিল। দিনের বেলা আমাকে ভিকু ডাক্তারের নিকট থাকিতে হইবে। সমস্ত দিন তিনি আমাকে খাটাইয়া লইবেন। রাত্রি-কালে আমি চঞ্চলার গোয়ালে বাঁধা থাকিব। প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমার দুধ দুহিয়া ভিকু ডাক্তারের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইয়া দিবে। একবেলা ভিকু ডাক্তার আমাকে খাইতে দিবেন, অন্য বেলা সহদেব বাগদী আমাকে খাইতে দিবে।

প্রথম দিন আর আমাকে কোন কাজ করিতে হয় নাই। সেদিন চঞ্চলার গোয়ালে খোঁটায় আমি বাঁধা রহিলাম, পাছে হাত দিয়া দড়ি খুলিয়া আমি পলায়ন করি, সেজন্য হাত দুইটিও তাহারা বাঁধিয়া রাখিল। ইহার পর প্রতি রাত্রিতে তাহারা এইভাবে আমাকে বাঁধিয়া রাখিত, সন্ধ্যাবেলা চঞ্চলা আমাকে দুইটি মুড়ি খাইতে দিত। যতদিন ইহাদের নিকট ছিলাম, ততদিন দুই বেলা দুইটি মুড়ি আমার আহার ছিল। একবেলা ভিকু ডাক্তার দিত, অন্য বেলা চঞ্চলা দিত। আমার দাঁত নাই, মুড়ি চিবাইতে পারিতাম না। প্রাণধারণের নিমিত্ত কোনরূপে গিলিয়া ফেলিতাম।

পরদিন প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমার দুধ দোহন করিল। প্রায় দুই সের দুধ হইল। তাহার পর সে বাছুর ছাড়িয়া দিল, বাছুর আমার দুধ খাইতে লাগিল ও মাঝে মাঝে বাছুর আমার পেটে মাথার হুড়ো মারিতে লাগল। তাহার গুঁতোতে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। ভাগ্যক্রমে এই সময় ভিকু ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"ডমরুবাবুর ঐ পেট এখন আমার। পেট আমার ভাগে পড়িয়াছে। পেটে আমি বাছুরকে মারিতে দিব না। তাহার চুঁতে যদি ডমরুবাবুর নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের নামে আমি নালিশ করিব।" সেইদিন হইতে চঞ্চলা বাছুরের দড়ি টানিয়া রাখিত। বাছুর আমার পেটে আর হুড়ো মারিতে পারিত না।

দুধ দোহন হইলে ভিকু ডাক্তার আমাকে তাঁহার ক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। কৃষককে বলিলেন যে,—"একটা গরুর সহিত ইহাকে লাঙ্গলে জুড়িয়া দাও।"

কৃষক তাহাই করিল। মানুষের হাত কোমল তাহাতে ক্ষুর নাই। কিন্তু এখন আমাকে দুইটি হাত মাটিতে পাতিয়া গরুর ন্যায় চলিতে হইয়াছিল। আমার হাতে কাঁটা খোঁচা ফুটিয়া যাইতে লাগিল। ঘোরতর কষ্টে আমার চক্ষু দুইটি জলে ভাসিয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, আমার নদুদুর-নাদুর নধর শরীরটি এইবার মাটি হইয়া গেল। আমার সঙ্গী বলদের সহিত সমান ভাবে আমি ক্ষেত্রের উপর লাঙ্গল কাঁধে করিয়া চলিতে পারিতেছিলাম না, সেজন্য কৃষক আমার লাঙ্গুলে সবলে মোচড় দিতে লাগিল। এমন সময় সহদেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহদেব বলিল,—"ও কি! তুমি উহার লেজ মলিতে পারিবে না। লেজ তোমাদের নহে, লেজ আমাদের ভাগে পড়িয়াছে।"

কৃষক আর আমার লাঙ্গুল মর্দ্দন করিল না বটে, কিন্তু আমার পিঠে ছড়ি মারিতে লাগিল। ফলকথা, আমার দুঃখের আর সীমা রহিল না। সন্ধ্যাবেলা ভিকু ডাক্তার আমাকে চঞ্চলার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। চঞ্চলা আমাকে তাহার গোয়ালে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমার দুধ দুহিয়া পুনরায় আমাকে ভিকু ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিল। পুনরায় আমাকে লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া ক্ষেত চষিতে হইল।

প্রতিদিন এইরূপ হইতে লাগিল। মনের দুঃখে রাত্রিদিন আমি কাঁদিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম যে, হায় হায়! স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া দেশের লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া যে এত টাকা উপার্জন করিলাম, সে সব বৃথা হইল। এলোকেশী অথবা তোমরা বন্ধু-বান্ধব কেহ আমার কোন সন্ধান লইলে না, সেজন্য আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

লম্বোদর বলিলেন,—"আজ ছয়মাস প্রতিদিন দুইবেলা তোমাকে দেখিতেছি। তোমার আবার সন্ধান কি লইব? কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, সে সব জগদম্বার মায়া। তবে আমরা আর কি বলিব?"

ডমরুধর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—দিন দিন আমি দুর্বল হইয়া পড়িতে

লাগিলাম। আমার সে নদুদুর-নাদুর নধর শরীর শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যাইলাম। ভালরূপ লাঙ্গলও টানিতে পারি না, দুধও দিতে পারি না। প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমাকে যথারীতি দুহিতে আসিল। কিছুমাত্র দুধ হইল না। পিতাকে গিয়া সে সেই কথা জানাইল। সহদেব বলিল যে,—'কাল প্রাতঃকালে আমি দুহিয়া দেখিব।' পরদিন প্রাতঃকালে সে নিজে আমাকে দুহিতে আসিল। একফোঁটাও দুধ বাহির হইল না। তখন সে বিড় বিড় করিয়া আপনা-আপনি বলিল,—'পুনরায় বাছুর না হইলে দুধ হইবে না, তাহার যোগাড় করিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। একে লাঙ্গল টানিয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। তাহার উপর আবার বাছুরের যোগাড়!

সে রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। ক্রমাগত আমি মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"মা! চিরকাল তুমি আমাকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। সন্ন্যাসীর হাত হইতে, বাঘের মুখ হইতে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। এখন কেন মা! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?"

এইরূপ স্তব-স্তুতি মিনতি করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। সহসা কে যেন আমার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—"ভয় নাই বাছা, ভয় নাই! শীঘ্রই তোমাকে আমি এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব। গত বৎসর তোমার পূজায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছিল। সেই পাপের জন্য তোমাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

মা যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শঙ্কর ঘোষ আসিয়া বলিল,—"তুমি আমাকে টাকা ফাঁকি দিয়াছ। চল, তোমাকে আমি পুলিশে দিব।"

এই বলিয়া সে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিল। সে সংবাদ পাইয়া ভিকু ডাক্তার দৌড়িয়া আসিলেন,—তিনি বলিলেন,—"ধড়টি আমি রক্ষা করিয়াছি। এ ধড় আমার সম্পত্তি।"

এই কথা বলিয়া তিনি আমার বাম হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। গোলমাল শুনিয়া চঞ্চলা সে স্থানে দৌড়িয়া আসিল। সে বলিল,—"ইহার নীচের দিকটা আমার। আমার গাইগরু।"

এই বলিয়া সে আমার পশ্চাৎ দিকের দক্ষিণ পায়ের খুর ধরিয়া টানিতে লাগিল।

এমন সময় "হু হু" পালকির শব্দ হইল। আমি ও অপর সকলে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। এলোকেশী ঠাকুরাণী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পালকি হইতে নামিলেন। আমার নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন,—"ইনি আমার স্বামী। তোমরা ছাড়িয়া দাও। ইঁহাকে আমি বাড়ী লইয়া যাইব। বাড়ী গিয়া ঝাঁটা-পেটা করিয়া ইঁহার ভূত ছাড়াইব।"

এই কথা বলিয়া তিনি আমার পশ্চাৎ দিকের বাম পায়ের খুর ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। আপন আপন দিক কেহই ছাড়িয়া দিল না। একদিকে শঙ্কর ঘোষ ও ভিকু ডাক্তার আমার দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। অপর দিকে চঞ্চলা ও এলোকেশী দুই খুর ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহাদের টানাটানিতে আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও" বলিয়া আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কেহই ছাড়িল না।

অবশেষে তাহাদের টানাটানিতে আমার শরীর হইতে ফস করিয়া চঞ্চলার গাই-গরুর কোমর ও পা খসিয়া পৃথক হইয়া গেল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ অজ্ঞান হইয়াছিলাম, তাহা জানি না; যখন আমার জ্ঞান হইল,

তখন আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, আমি আমার ঘরে শয়ন করিয়া আছি। আমি উঠিয়া বসিলাম। পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, মানুষের দুইটি পা, গরুর পা নহে। তাহাতে লোম নাই, খুর নাই, কেবল মানুষের পায়ের পাতা। ফলকথা, আমার পা। শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, আমার নদুর-নাদুর নধর শরীর যেরূপ ছিল, সেইরূপ রহিয়াছে। শুষ্ক হইয়া যায় নাই। ঘরের ভিতর শঙ্কর ঘোষ অথবা ভিকু ডাক্তার অথবা চঞ্চলা, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম যে, এলোকেশী বাক্স খুলিয়া কাপড় বাহির করিতেছিলেন।

আমি জাগরিত হইয়াছি দেখিয়া এলোকেশী বলিলেন,—"কাল রাত্রিতে ওরূপ বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলে কেন? চঞ্চলা কে?"

আমি কোন উত্তর করিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে,—সকলই জগদম্বার মায়া! সমুদয় মায়ের লীলা!

ষষ্ঠ গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সাহেবের সাজ

ডমরুধরের বাস কলিকাতার দক্ষিণ, যেস্থানে অনেক কাটি-গঙ্গা আছে। প্রথম অবস্থায় ইনি দরিদ্র ছিলেন। নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এক্ষণে ধনবান হইয়াছেন। এলোকেশী ইঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। ডমরুধর বৃদ্ধ, সুপুরুষ নহেন। তথাপি এলোকেশীর সর্বদাই সন্দেহ। গত বৎসর দুর্লভী বাগ্দিনী ডমরুধরকে ঝাঁটাপেটা করিয়াছিল। সেই উপলক্ষে এলোকেশীও তাঁহাকে উত্তম-মধ্যম দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ডমরুধর সন্ন্যাসী-বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সেই অবধি ইনি দুর্গোৎসব করেন। সুন্দরবনে ডমরুধরের আবাদ আছে। প্রজাদিগের নিকট হইতে চাউল, ঘৃত, মধু, মৎস্য প্রভৃতি আদায় করেন। প্রতিমাটি গড়া হয়, কিন্তু পূজার উপকরণ,—প্রায় সমস্তই কাটি-গঙ্গার জল। আজ পূজার পঞ্চমীর দিন, দালানে প্রতিমার পার্শ্বে বন্ধুগণের সহিত বসিয়া ডমরুধর গল্প-গাছা করিতেছেন।

লম্বোদর বলিলেন,—"এবার তুমি মরিয়া বাঁচিয়াছ, যে ভয়ানক রোগ হইয়াছিল, তাহাতে পূজার সময় তোমার গল্প যে আবার শুনিব, সে আশা আমরা করি নাই।"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! এবার আমি মরিয়া বাঁচিয়াছি। মা দুর্গার আমি বরপুত্র। সেবার সন্ন্যাসি-বিভ্রাট হইতে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় গত বৎসর বাঘের মুখ হইতে আমি বাঁচিয়াছিলাম। এবার উৎকট রোগ হইতে তিনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন। সমুদয় দুর্ঘটনা নষ্টচন্দ্র দেখিয়া ঘটিয়াছিল।

আধকড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নষ্টচন্দ্র দেখিয়া কি হইয়াছিল?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—সে কথা এতদিন আমি প্রকাশ করি নাই। কি হইয়াছিল তাহা শুন। এবার আমি নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলাম। নষ্টচন্দ্র দেখিলে চুরি করিতে হয়। মনে করিলাম যে,দুর্লভীর উঠানে যে শশা গাছের মাচা আছে তাহা হইতে শসা চুরি করিয়া আনি। বাহিরে যাহাই বলুক, কিন্তু দুর্লভীর মনটা আমার উপর আছে। শসা চুরি করিতে গিয়া যদি ধরা পড়ি, এলোকেশী যদি কিছু বলেন, তাহা হইলে আমি বলিব যে, নষ্টচন্দ্র দেখিয়া চুরি না করিলে কলঙ্ক হয়।

চুপে চুপে আমি শসা চুরি করিতে যাইলাম। কিন্তু দূর হইতে দেখিলাম যে, দুর্লভী কেরোসিনের ডিবে জ্বালাইয়া ঠেঙা হাতে করিয়া দাওয়াতে বসিয়া আছে। তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া অগ্রসর হইতে আমি সাহস করিলাম না।

সে রাত্রি আমার চুরি করা হইল না। মনে করিলাম যে, আজ রাত্রিতে না হউক, তিন দিনের মধ্যে কিছু চুরি করিলেই নষ্টচন্দ্রের দোষ কাটিয়া যাইবে। কোথায় কি চুরি করি, রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া তাহা ভাবিতে লাগিলাম। দুর্লভীর বাড়ীর পার্শ্বে গদাই ঘোষের পুষ্করিণী আছে। তাহাতে অনেক মাছ আছে। গদাই ঘোষ দুর্লভীর জিম্মায় পুষ্করিণীটি রাখিয়াছে। মনে করিলাম যে, কাল বৈকালবেলা ছিপ ফেলিয়া সেই পুষ্করিণী হইতে মাছ চুরি করিব।

সুন্দরবনে আমার আবাদের নিকট একবার জনকয়েক সাহেব শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একটি টুপি ফেলিয়া গিয়াছিলেন। টুপিটি কুড়াইয়া আমি বাড়ী আনিয়াছিলাম। পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেই টুপিটি বগলে লইয়া ছিপ হাতে করিয়া আমি গদাই ঘোষের পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইলাম ; যে ধার দিয়া লোক গতায়ত করে, তাহার বিপরীত দিকে এক কোণ বনে পূর্ণ ছিল। ঝোপের ভিতর গিয়া আমি সাহেবদের সেই কালো রঙের ধুচুনির মত লম্বা টুপিটি মাথায় দিলাম। আজকালের বাবুদের মত গায়ে আমি জামা পরি না। কোমরে কেবল ধুতি ছিল। আমি ভাবিলাম যে, আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। সকলে মনে করিবে যে, সাহেব মাছ ধরিতে আসিয়াছে। সাহেব দেখিলে কেহ কিছু বলিবে না।

নিকটের জল—নাল-ফুল ও কলমি শাকের গাছে পূর্ণ ছিল। কেবল এক স্থানে একটু ফাঁক ছিল। ময়দার টোপ গাঁথিয়া আমি সেই পরিষ্কার স্থানে ছিপ ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পর বোধ হইল যেন মাছে ঠোকরাইল। আমি টান মারিলাম। বঁড়সি জলের ভিতর নাল গাছে লাগিয়া গেল। অনেক টানাটানি করিলাম, অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। তখন বুঝিলাম যে, জলে নামিয়া না খুলিলে আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু কাপড় ভিজিয়া যাইবে, জলে কি করিয়া নামি! চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কেহ কোথাও নাই। কাপড় খুলিয়া উলঙ্গ হইয়া জলে নামিলাম। একবুক জল হইল। অতি কষ্টে নাল গাছের ডাঁটা হইতে বঁড়শি খুলিয়া উপরে উঠিয়া কাপড় পরিতে যাই —সর্বনাশ! যে স্থানে কাপড় রাখিয়া গিয়াছিলাম সে স্থানে কাপড় নাই। বনের ভিতর চারিদিকে অনেক খুঁজিলাম, কাপড় দেখিতে পাইলাম না।

তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয় নাই। সে উলঙ্গ অবস্থায় আমি বাটী ফিরিয়া যাইতে পারি না। কি করিব। চার করিয়া পুনরায় ছিপ ফেলিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এ সেই কেষ্টা ছোঁড়ার কর্ম্ম, সে আমার টাকের বর্ণনা করিয়া আমাকে ক্ষেপায়। সে দূর হইতে আমাকে বলে—টাক-চাঁদ, টাক-বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর।

কেষ্টা ছোঁড়ার অগম্য স্থান নাই। যখন জলে নামিয়া, পিছন ফিরিয়া এক মনে আমি বঁড়শি খুলিতেছিলাম, সেই সময় সে আমার কাপড় লইয়া গিয়াছে। কেবল তাহা নহে। সে দুর্লভীকে গিয়া সংবাদ দিয়াছিল। কারণ, অল্পক্ষণ পরেই দুর্লভী ও হিরী বাগ্দিনী আসিয়া পুষ্করিণীর অপর পাড়ে দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া দুর্লভী বলিল,—"একটা সাহেব!"

হিরী বাগ্দিনী বলিল,—"সাহেবটার গায়ের রং কালো মিশমিশে। যাহারা পাখী মারিতে আসে, সেই সাহেব।"

দুর্লভী বলিল,—"তা নয়। ওটা নেঙটা গোরা।"

হিরী বলিল,—"সর্বনাশ! নেঙটা গোরা! তবে আমি পলাই ; যাকে বলে ব্রাণ্ডি, তাই উহারা খায়।"

দুর্লভী বলিল,—"চল, গদাই ঘোষকে গিয়া বলি।"

আমি ভাবিলাম,—"ঘোর বিপদ হইল। সমস্ত গ্রামের লোককে সঙ্গে লইয়া গদাই ঘোষ হয় তো এখনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মাথায় কেবল এক সাহেবি টুপি। এ অবস্থায় সকলে হয় তো আমাকে এলোকেশীর নিকট ধরিয়া লইয়া যাইবে। সাহেবের পোষাক পরিয়া দুর্লভীর ঘরের নিকট আমি গিয়াছিলাম, তাহা শুনিলে এলোকেশী আর রক্ষা রাখিবেন না

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারিকেলের বোরা

ছিপগাছটা আমি ফেলিয়া দিলাম। প্রথম বনের ভিতর দিয়া, তাহার পর পুকুরপারের নীচে দিয়া দুর্লভীর ঘরের পশ্চাৎদিকে উপস্থিত হইলাম। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম যে, তাহার ঘরে কেহ নাই। দ্বারটি কেবল ভেজানো আছে। চুপ করিয়া আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের ভিতর অন্ধকার। চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। একখানি কাপড় কি একখানি গামছা দেখিতে পাইলাম না। কি করি টুপি মাথায় দিয়া উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের এককোণে বসিয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে একটু অন্ধকার হইলে পলায়ন করিব। আর যদি দুর্লভী দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার সাহেবের পোষাক দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ হইবে।

ওদিকে যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। গদাই ঘোষ গ্রামের চৌকিদার ও অন্যান্য লোক লইয়া পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইল। মহা গোল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইলাম। ভয়ে সর্বশরীর আমার কাঁপিতে লাগিল। পুকুরের সেই কোণে বনের ভিতর তাহারা অনেক অনুসন্ধান করিল। ছিপ দেখিতে পাইল। কিন্তু সাহেবকে তাহারা দেখিতে পাইল না। হতাশ হইয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তখন দুর্লভী আসিয়া আপনার দাওয়া বা পিঁড়িতে বসিল।

এমন সময় রসিকের মা আসিয়া বলিল,—'দুর্লভী! আমাকে শসা দিবি বলিয়াছিলি, কৈ দে।'

দুর্লভী বলিল,—"শসা তুলিয়া রাখিয়াছি। ঘরের বাম কোণে ডালায় আছে, গিয়া লও।"

আমি ঘরের বাম কোণে বসিয়াছিলাম। আমার ভয় হইল। কোণের দিকে আরও ঘেঁসিয়া বসিলাম। রসিকের মা ঘরের ভিতর আসিয়া কোণের কাছে অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিল। সহসা ঝনাৎ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাম হাত আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। আমার গায়ে তাহার হাত ঠেকিয়া গেল।

সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ঘরের ভিতর একটা ভূত বসিয়া আছে। সে আমার হাতে কামড় মারিয়াছে। আমার আঙ্গুলগুলা চিবাইতেছে। এখন আমার সর্বশরীর খাইয়া ফেলিবে।

পরে শুনিলাম, ঘরে যে দুর্লভী করাতে ইঁদুরকল পাতিয়া রাখিয়াছিল, রসিকের মায়ের হাত তাহাতে পড়িয়া গিয়াছিল। কি হইয়াছে, কি হইয়াছে বলিয়া দুর্লভী দৌড়িয়া আসিল। দ্বারের নিকট তাহাকে ঠেলিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন দুর্লভী আমাকে দেখিতে পাইল। কিন্তু চিনিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"ভূত নহে, ভূত নহে, এ সেই নেঙটা গোরা; এতক্ষণে নেঙটা গোরা আমার ঘরের ভিতর বসিয়াছিল।"

তাহার চীৎকার শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি আর বাটী পলাইতে অবসর পাইলাম না। কিছু আগে পথের বামদিকে বিন্দু ব্রাহ্মণীর ঘর। বিন্দু ব্রাহ্মণী তখন গোয়ালে বসিয়া ঘুঁটে ধরাইয়া ধোঁয়া করিতেছিল। তাহার সেই একখানি মেটে ঘরের দ্বার খোলা ছিল। তাড়াতাড়ি আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

ঘরের ভিতর মিটমিট করিয়া এক কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল। বিন্দু ব্রাহ্মণীর কেহ নাই। একলা সে সেই ঘরে বাস করে। তাহার অনেকগুলি

নারিকেল, আম, কাঁঠাল ও আতা গাছ আছে। তাহার ফল বেচিয়া সে দিনপাত করে।

আমি দেখিলাম যে, ঘরের এককোণে অনেকগুলি নারিকেল স্তূপাকার হইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে পাঁচ বোরা বা গুণের থলি নারিকেল পূর্ণ করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া বিন্দু সারি সারি উচ্চভাবে বসাইয়া রাখিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাহিরে গোল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, নেঙটা গোরা এই-দিকে আসিয়াছে। এস, বিন্দুর ঘরের ভিতর দেখি। হয় তো এই ঘরের ভিতর সে বসিয়া আছে। আমি তখন মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম যে,—'মা! নষ্টচন্দ্র দেখিলে লোককে কি এত সাজা দিতে হয়? প্রতি বৎসর আমি তোমার পূজা করি, এ বিপদ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

তোমাদিগকে আমি বার বার বলিয়াছি যে, আমার উপর মায়ের অপার কৃপা। মা তৎক্ষণাৎ আমার মনে বুদ্ধি দিলেন। নিকটে একটি খালি বোরা পড়িয়াছিল। সেই বোরার মুখে আমি আমার মাথা গলাইয়া দিলাম, তাহার পর টানিয়া আমর সর্ব শরীর পা পর্য্যন্ত তাহা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলাম। অবশেষে নারিকেলপূর্ণ থলির ন্যায় অপর পাঁচটি বোরার পার্শ্বে আমিও বসিয়া রহিলাম। তিন চারিজন গ্রামবাসী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিল যে, নেঙটা গোরা ঘরের ভিতর নাই। কেবল ছয়টি নারিকেলপূর্ণ থলি সারি সারি বসিয়া আছে।

ঘরের ভিতর নেঙটা গোরাকে দেখিতে না পাইয়া সকলের ভয় হইল। একজন বলিল,—'তাহাকে এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি। তবে এখন কোথায় গেল? এ নেঙটা গোরা নহে; এই বর্ষাকালে জল-কাদায় নেঙটা গোরা কোথা হইতে আসিবে? তাহার পর নেঙটা গোরা এত মিশমিশে কালো হয় না। এ নেঙটা গোরা নহে, এ নেঙটা ভূত।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বলাই চিন্তির বিবরণ

ভূতের কথা শুনিয়া সকলে ভয়ে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। বিন্দু আপনার দাওয়াতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বলিল যে, কি কপাল করিয়া যে পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আজ রাত্রিতে ভূতে আমাকে খাইয়া ফেলিবে। যাহা হউক, এমন সময় একখানি গরুর গাড়ী লইয়া বলাই চিন্তি বিন্দুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলাই জাতিতে সদ্‌গোপ। আমাদের গ্রাম হইতে আধক্রোশ মাঠ পারে আমডাংগায় তাহার বাস। বিন্দুর ফল-পাকড় সে হাটে বিক্রয় করে।

বলাই বলিল,—"মা ঠাকুরাণি! গাড়ী লইয়া আমি নিশ্চিন্তপুরে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি। নারিকেল দিবে বলিয়াছিলে, কই দাও। আজ আমার বাড়ীতে রাখিয়া দিব। কাল ভোরে ভোরে হাটে লইয়া যাইব।"

বিন্দু বলিল,—"ঘরের ভিতর বোরা করিয়া আমি একশত নারিকেল রাখিয়াছি। আজ তাহা লইয়া যাও। বাকী পরে দিব।"

আমি সম্মুখেই বসিয়াছিলাম। আমার থলিটি সে প্রথম তুলিয়া লইল। পা দুইটি আমি থলির ভিতর গুটাইয়া লইলাম। 'সব ঝুনো', একবার বোঁটা দেখে, এই কথা বলিয়া সে আমাকে গাড়ীর সম্মুখভাগে বসাইয়া দিল। তাহার

পর আর পাঁচটি নারিকেলের থলি আনিয়া আমার পশ্চাতে উচ্চভাবেই বসাইয়া দিল।

নারিকেল লইয়া বলাই গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। বাড়ী যাইতেছে, সেজন্য গরু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। গ্রাম পার হইয়া মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীর ভিতর বসিয়া থলির ভিতর যে স্থানে আমার চক্ষু দুইটি ছিল, সেই দুইটি স্থানে আঙ্গুল দিয়া আমি অল্প ফাঁক করিয়া লইলাম। তাহার পর থলির ভিতর হইতে আমি আমার হাত দুইটি বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম। এমন সময় আমার মাথা দিয়া বলাইয়ের পিঠে ঢু লাগিয়া গেল। বলাই আপনা-আপনি বলিল,—'সম্মুখের থলিটা নড়িতেছে। এখনি পড়িয়া যাইবে। ভাল করিয়া রাখি।'

এই কথা বলিয়া সে গাড়ী থামাইল ও বাম পার্শ্বে নামিয়া পড়িল। সেই অবসরে আমিও দক্ষিণ পাশ দিয়া নামিয়া পড়িলাম। বলাই ভাবিল যে, থলিটা পড়িয়া গেল। গরুর সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া সে আমাকে তুলিতে আসিল। তাহার পর সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল। নিশ্চয় সে মনে মনে ভাবিয়াছিল যে,—এতকাল নারিকেল বেচিতেছি, নারিকেল-পূর্ণ বোরার ভিতর হইতে কালো কালো দুইটা পা বাহির হইতে কখনও দেখি নাই। সেই কালো কালো পা দুইটা দিয়া নারিকেলের বোরা যে ছুটিয়া পলায়, তাহাও কখনও দেখি নাই।

কিছুকাল সে সেই পা-ওয়ালা বোরার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর "বাপ" এইরূপ শব্দ করিয়া মাঠের মাঝখানে গাড়ী ফেলিয়া অ-পথ দিয়া ক্ষেত্রের আলি দিয়া পুনরায় আমাদের গ্রামের দিকে দৌড়িল। কিন্তু সে যে আমার ভয়ে সোজা পথ দিয়া আসিতে সাহস করে নাই, তখন তাহা আমি জানিতাম না। পাছে সে আসিয়া আমাকে ধরে, সেজন্য শরীর হইতে বোরা খুলিবার নিমিত্ত আমি আর দাঁড়াইলাম না। গুণে আবদ্ধ শরীরেই যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সোজাপথে আমি গ্রাম অভিমুখে দৌড়িলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে নেকো পালের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গুণের ঈষৎ ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, তাহার দোকান খোলা রহিয়াছে, দোকানে আলো জ্বলিতেছে। অনেকগুলি লোকের কথাবার্ত্তা আমার কানে প্রবেশ করিল। দেখিলাম যে, দোকানের সম্মুখে একখানি খালি পাল্কি রহিয়াছে। এমন সময় একজন মানুষের সহিত আমার ধাক্কা লাগিয়া গেল। সেও পড়িয়া গেল, আমিও পড়িয়া যাইলাম। তাড়াতাড়ি আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেও উঠিয়া পাছে চীৎকার করে, সেজন্য পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা বনে গিয়া আমি প্রবেশ করিলাম। বন দিয়া আরও কিছুদূর গিয়া মেনী গোয়ালা-ছুঁড়ীর ঘরের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হই। শরীর হইতে গুণটা খুলিয়া কোমরে জড়াইলাম। গুণ হইতে একটু সুতা বাহির করিয়া কোমরে বাঁধিলাম। এখনও আমার মাথায় সেই সাহেবী টুপি ছিল। তাহার পর হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক আমি দেখিতে লাগিলাম।

টুপিটি এখন আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর দেখিলাম যে, নেকোর দোকানের সম্মুখে সে পাল্কি নাই। কিন্তু সে স্থানে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়াছে। তাহারা সকলেই বলাই চিন্তির বিবরণ শুনিতেছে। বলাই বলিতেছে,—"বিন্দু ঠাকুরাণীর নারিকেলের বোরার ভিতর ভূত ছিল। ভূত লইয়া আমি গাড়ীতে বোঝাই করিয়াছিলাম। মাঠের মাঝখানে সে আমার ঘাড় ভাঙিয়া রক্ত খাইবার উপক্রম করিয়াছিল। অতি কষ্টে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।"

এমন সময় কেষ্টা ছোঁড়া সেই স্থানে আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার ঠাকুরমা কোথায়? অনেকক্ষণ হইল তেল লইতে আমার ঠাকুরমা দোকানে আসিয়াছিলেন। আমার ঠাকুরমা কোথায়?"

কিছুদিন পূর্বে কেষ্টা আমার বাগানে বাতাবি লেবু চুরি করিয়াছিল। সেজন্য তাহাকে পুলিশে দিতে আমি উদ্যত হইয়াছিলাম। অনেক মিনতি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু বলিয়া দিয়াছিলাম যে, পুনরায় যদি সে আমার কোন বস্তু চুরি করে, অথবা আমাকে ক্ষেপায়, তাহা হইলে তাহার নামে আমি নালিশ করিব। আজ আমার কাপড় লইয়া সে কোথায় ফেলিয়া দিয়াছিল। পাছে আমি নালিশ করি, সেই ভয়ে সে কাহারও নিকট আমার নাম করে নাই। "ঐ পুকুরে কে মাছ ধরিতেছে" দুর্লভীকে কেবল এই কথা বলিয়া সে সরিয়া পড়িয়াছিল।

এখন কেষ্টার ঠাকুরমা কোথায় গেল? কেষ্টার বাপ ও প্রতিবেশিগণ লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ক্রমে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সকলে বলিল যে, নেঙটা ভূত কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছে। গোল শুনিয়া মেনী গোয়ালা-ছুড়ী ঘর হইতে বাহির হইল। মেনীর বয়স দশ বৎসর। ছয় বৎসর বয়স্ক একটি ভাই ব্যতীত সংসারে তাহার আর কেহ নাই। কয় বৎসর হইল, তাহাদের বাপ ও মা মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মাসী কলিকাতায় এক বাবুর বাড়ীতে চাকরাণী ছিল। মাসী ইহাদিগকে টাকা দিত। মাসীও এখন মরিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মেনী ও ভিলে

মেনীর ছয় বৎসর বয়স্ক ভাইয়ের নাম ভিলে। ভিলের হাত ধরিয়া মেনী ঘর হইতে বাহির হইল। পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। আমি যে বনের ভিতর বসিয়াছিলাম, কেষ্টার ঠাকুরমাকে অনুসন্ধান করিতে পাছে লোকে সেই স্থানে আসে, সেই ভয়ে মেনীর ঘর খালি পাইয়া আমি তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। মনে করিলাম যে, গোলটা একটু মিটিলে মেনী ও তাহার ভাই নিদ্রিত হইলে আস্তে আস্তে আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব; গুণ পরিয়া বাহির হইলে লোকে আমাকে সন্দেহ করিবে।

ভিলের হাত ধরিয়া মেনী পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। সুগন্ধী গোয়ালিনী ও অন্যান্য লোক পথ দিয়া যাইতেছিল। মেনী জিজ্ঞাসা করিল,—"গন্ধী মাসি! কি হইয়াছে? চারিদিকে এত গোল কেন?"

সুগন্ধী উত্তর করিল,—"আর বাছা, বলিব কি, সর্বনাশ হইয়াছে! কোথা হইতে একটা নেঙটা গোরা ভূত আসিয়াছে। বলাই চিন্তিকে সে খাইতে গিয়াছিল। তাহাকে খাইতে না পাইয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি বলি যে, সে কেষ্টার ঠাকুরমাকে খাইবে না। সেটা গোরা ভূত, কেষ্টার ঠাকুরমাকে মেম করিবে, সেই জন্য তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

ভূতের নাম শুনিয়া মেনী তাড়াতাড়ি ভাইকে লইয়া ঘরে আসিল ও ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দুইজনে শয়ন করিল। আমি ঘরের এককোণে বসিয়া রহিলাম।

ভিলে বলিল,—"দিদি! রায়েদের বাড়ী হইতে আর ভাত আন না কেন? কাল কেবল একটা তাল খাইয়া আমরা ছিলাম। আমাকে সমস্ত দিয়াছিলে, তুমি

কেবল একটুখানি খাইয়াছিলে। আজ আমরা কিছুই খাই নাই। রায়েদের বাড়ী হইতে কবে ভাত আনিবে ?"

মেনী কেনারাম রায়ের শিশু-পুত্রকে লইত, তাঁহারা দুইবেলা দুইটি ভাত দিতেন। বাড়ীতে আনিয়া সেই ভাত ভাই-ভগিনীতে ভাগ করিয়া খাইত। আজ দুইদিন হইল রায়ের শিশুপুত্র এক সোঁ-পোকা ধরিয়াছিল, মেনী তাহা দেখে নাই, সেজন্য মেনীকে তাঁহারা ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

মেনী উত্তর করিল,—"রায়েদের খোকা সোঁ-পোকা ধরিয়াছিল। সেজন্য তাঁহারা আর আমাকে ভাত দিবেন না।"

ভিলে বলিল,—"তবে দিদি, আমাদের কি হবে? ভাত কোথা হইতে আসিবে? ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।"

মেনী উত্তর করিল,—"দেখ ভিলু! পাড়ার লোকের নিকট হইতে কাল তোমাকে দুইটি ভাত আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু চাউলের দাম বাড়িয়াছে, রোজ রোজ লোকে দিবে কেন? আমাদের দশা কি হইবে, তাহাই এখন ভাবিতেছি।"

ভিলে বলিল,—"তবে দিদি কি হবে, ভাত না খাইয়া আর আমি থাকিতে পারি না। আজ সমস্ত দিন কিছু খাই নাই, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।"

মেনী বলিল,—"আর বৎসর ভড়েদের বাড়ী তুমি দুর্গা ঠাকুর দেখিয়াছিলে! সেই দশ হাত আর কত রাঙতা? ভড়েরা তোমাকে মুড়কি ও নাড়িকেল নাড়ু দিয়াছিল? পূজা হইয়া গেলে বোসেদের গঙ্গায় তাহারা ঠাকুর বিসর্জন করিয়াছিল, মা দুর্গা বোসেদের গঙ্গার ভিতর আছেন। কাল যদি তোমাকে দুইটি ভাত দিতে না পারি তাহা হইলে আমরা দুইজনে বোসেদের গঙ্গায় যাইব। তোমাকে কোলে লইয়া আমি জলে ঝাঁপ দিব; জলের ভিতর মা দুর্গা আছেন; তাঁহার কাছে আমরা যাইব। তিনি আমাদিগকে অনেক ভাত দিবেন, আমাদের সকল দুঃখ ঘুচাইবেন।"

ঘরের কোণে বসিয়া ভাই-ভগিনীর কথোপকথন আমি শুনিতেছিলাম। অল্পক্ষণ পরে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি তখন কেবল নয়টা হইয়াছিল, আমার বাড়ীর দ্বার বন্ধ হয় নাই। চুপি চুপি ঘরের ভিতর গিয়া গুণ ফেলিয়া কাপড় পড়িলাম। তাহার পর এলোকেশীর মুখে শুনিলাম যে, কেষ্টার ঠাকুরমাকে লোকে তখনও খুঁজিয়া পায় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের হীরক লাভ

মেনী গোয়ালা-চুঁড়ীর ঘর ঠিক আমার বাগানের পাশে। ঐ স্থানটাতে আমার বাগানে একটু খোঁচ হইয়া আছে। মেনী ও তাহার ভাই মরিয়া গেলে ঐ ভূমিটুকু আমি লইব। তাহা হইলে আমার বাগানের খোঁচটি ঘুচিয়া যাইবে। তাহারা সত্য সত্যই বোসেদের গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিবে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত পরদিন প্রাতঃকালে বেলা দশটার সময় আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। পথে দেখিলাম যে, কেষ্টাদের বাড়ীতে হুঁ হুঁ করিয়া একখানা পাল্কী আসিয়া লাগিল, পাল্কীর ভিতর হইতে কেষ্টার ঠাকুরমা বুড়ী বাহির হইল; তাহার পর লাঠি ধরিয়া ঠুক ঠুক করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

বুড়ী কোথায় গিয়াছিল ও কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি সে স্থানে যাইলাম। শুনিলাম যে, গোবর্ধনপুর হইতে একজনদের বৌ লইয়া

একখানা পাল্কী নিশ্চিন্তপুরে গিয়াছিল। বৌ রাখিয়া খালি পাল্কী সন্ধ্যার পর ফিরিয়া যাইতেছিল। নেকোর দোকানে পাল্কী রাখিয়া বেহারাগণ তামাক খাইতেছিল। সেই সময় কেষ্টার ঠাকুরমা তেল লইতে দোকানে আসিতেছিল। বোরার ভিতর থাকিয়া যে নেঙটা ভূতটা বলাই চিন্তিকে খাইতে গিয়াছিল, সেই ভূতটা আসিয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু দোকানে অনেক লোক দেখিয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া যাইতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সে বাতাসে মিশিয়া গেল। কেষ্টার ঠাকুরমা উঠিয়া ঘোরতর ভয়বিহ্বল হইয়া, সম্মুখে একখানা পাল্কী ও তাহার দ্বার খোলা দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর দ্বার বন্ধ করিয়া পাল্কীর ভিতর সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বেহারাগণ তাহা জানিতে পারে নাই। বলাই চিন্তির নিকট ভূতের গল্প শুনিয়া তাড়াতাড়ি পাল্কী তুলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাহারা গোবর্ধনপুর পেঁৗছিল। সেই স্থানে গিয়া পাল্কীর ভিতর বুড়ীকে দেখিতে পাইল। কিন্তু ভূতের ভয়ে সে রাত্রিতে বুড়ীকে ফিরিয়া আনিতে পারিল না। কারণ, এ সামান্য ভূত নহে, এ নেঙটা গোরা ভূত! আজ প্রাতঃকালে বুড়ীকে বাড়ী ফিরিয়া আনিল। আমি ভাবিলাম যে, সামান্য একটা সাহেবের টুপি পরিয়াছিলাম, তাহাতে কি কাণ্ড না হইল। এ সব নষ্টচন্দ্রের খেলা!

গোয়ালা-চুঁড়ী মেনীর বাড়ী গিয়া দেখিলাম যে, যাহারা শিশি-বোতল ক্রয় করে, সেইরূপ একটা লোক সে স্থানে বসিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা বোতল ও একটা শিশি আনিয়া মেনী তাহাকে দেখাইতেছে। শিশির ভিতর ছোট একখণ্ড কাচের ন্যায় কি ছিল। ভিলে তাহা বাহির করিয়া খেলা করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, সেই ক্ষুদ্র কাচটাতে পল কাটা আছে, আর সেই পল হইতে নানা বর্ণের আভা বাহির হইতেছে। আমি ভাবিলাম যে, এরূপ কাচ ইহাদের ঘরে কোথা হইতে আসিল, যে স্থান হইতে আসুক, এ সামান্য কাচ নহে। বোতল ও শিশির লোকটা মেনীকে চারিটি পয়সা দিল। ভিলের নিকট হইতে আমি কাচখণ্ড চাহিলাম। ভিলে দিতে সম্মত হইল না। দুই পয়সা দিয়া তাহা আমি কিনিতে চাহিলাম। তখন মেনী বলিল,—"দাও, দাদা, দাও। কাচটুকু লইয়া তুমি কি করিবে? ডমরুবাবু দুই পয়সা দিলে আমাদের ছয় পয়সা হইবে। ছয় পয়সার চাউল কিনলে দুইদিন তোমাকে পেট ভরিয়া ভাত দিতে পারিব।"।

ভিলে বলিল,—"বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। আমি কলাপাতা কাটিয়া আনি?"

মেনী বলিল,—"না ভাই, এখন নয়। রও, আগে নেকোর দোকান হইতে চাউল কিনিয়া আনি, ভাত রাঁধি, তখন কলাপাতা কাটিয়া আনিও।"

শিশি-বোতল লইয়া লোকটা চলিয়া গেল। কাচখণ্ড লইয়া আমিও বাটী আসিলাম। মনে করিলাম, কখনই এ সামান্য কাচ নহে। এবার কলিকাতা গিয়া কোন জহুরীকে দেখাইব।

কিন্তু সেইদিন বৈকালবেলা আমি বিষম গোলযোগে পড়িলাম। কলিকাতা হইতে একটী লোক আসিয়াছিল। সে কেষ্টার বাপ, গ্রামের চৌকিদার, শিশি-বোতল ক্রেতা; মেনী, ভিলে ও অন্যান্য গ্রামবাসীকে সঙ্গে করিয়া আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতার সেই লোকটা বলিল,—"আমি যোগেশবাবুর সরকার। আমার বাবুর বাড়ীতে এই বালিকার মাসী চাকরাণী ছিল। যোগেশবাবুর স্ত্রী ঘোরতর পীড়িতা হইয়াছিলেন। ইহার মাসী তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছিল। যোগেশবাবুর স্ত্রীর কানে দুইটী হীরার টপ ছিল। কিছুদিন পূর্বে একটী টপ হারাইয়া গিয়াছিল। ভালরূপ জোড়া মিলাইতে না পারিয়া অপর টপটী তাঁহার বাক্সে তিনি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ইহার মাসীকে তিনি সেই

টপটী দিয়াছিলেন। তাহার সোণাটুকু ইহার মাসী বোধ হয় বেচিয়া ফেলিয়াছিল। কাচ মনে করিয়া হীরকখণ্ড শিশির ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মূল্য চারিশত টাকা। আপনি দুই পয়সায় তাহা ফাঁকি দিয়া লইয়াছেন। যে টপটী হারাইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাহা মিলিয়াছে। সেজন্য জোড়া মিলাইবার নিমিত্ত এই বালিকা ও তাহার ভ্রাতাকে চারিশত টাকা দিয়া হীরকখণ্ড লইতে বাবু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। হীরকখণ্ড আপনি আমাকে প্রদান করুন।"

পয়সা দিয়া কিনিয়াছি, কেন আমি দিব, এইরূপ বলিয়া প্রথম আমি দিতে সম্মত হই নাই। কিন্তু পরে বুঝিলাম যে, যোগেশবাবু আমাকে সহজে ছাড়িবেন না। চিরকাল মামলা মোকদ্দমা করিয়া আসিতেছি। মামলা মোকদ্দমা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি বুঝিলাম যে, মোকদ্দমা হইলে হীরা আমি রাখিতে পারিব না, চাই কি আমার সাজা হইলেও হইতে পারে। ফলকথা, হীরা আমাকে ফিরিয়া দিতে হইল। যোগেশবাবু হীরার মূল্য চারিশত টাকা মেনী ও ভিলের নামে একস্থানে জমা রাখিয়াছেন। এক্ষণে প্রতি মাসে তিনি তাহাদিগকে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেছেন।

হীরকও গেল, বাগানের খোঁচটীও ভাঙ্গিল না। মনে আমার ঘোরতর দুঃখ হইল। মা দুর্গাকে ভর্ৎসনা করিয়া আমি বলিতে লাগিলাম,—"মা! কেন আমার এরূপ হরিষে বিষাদ করিলে? চারি শত টাকা আমার হাতে দিয়া কেন আবার কাড়িয়া হইলে? এবার হইতে আর মা, তোমার আমি পূজা করিব না।"

পূজা করিব না শুনিয়া মা দুর্গার বোধ হয় রাগ হইল। আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পরদিন তিনি জ্বরাসুরকে প্রেরণ করিলেন। কম্প দিয়া আমার জ্বর আসিল। একদিন গেল, দুই দিন গেল, জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তিন দিনে আমি বেচু ভুঞাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। বেচু জাতিতে কৈবর্ত। প্রথম সে চাষ করিত, এখন কবিরাজ হইয়াছে। চারি পাঁচখানা গ্রামে বেচুর বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। আমার হাত দেখিয়া বেচু শ্লোক পড়িয়া বলিল,—

"কম্প দিয়া জ্বর আসে কম্প দেয় নাড়ী।
ধড় ফড় ক'রে রোগী যায় যম-বাড়ী॥

ইহাকে বিষ-বড়ি দিতে হইবে।"

এলোকেশী নিকটে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"সে কি! তিন দিনের জ্বরে বিষ-বড়ি?"

বেচু বলিল,—"এ সামান্য বিষ-বড়ি নয়। এ নূতন ঔষধ সম্প্রতি আমি নিজে মনগড়া করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে কোন দোষ নাই। ইহার গুণ অনেক। এই দেখ, আমি নিজে আস্ত দুইটা খাইয়া ফেলি।"

এই কথা বলিয়া বেচু নিজে দুইটা বড়ি গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর মধুর সহিত খলে মাড়িয়া আমাকে ক'টা বড়ি খাইতে দিল।

বেচু চলিয়া গেল। তিন ঘণ্টা পরে তাহার ঔষধের গুণ প্রকাশিত হইল। আমার চক্ষু দুইটী লাল হইয়া উঠিল। বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। প্রাণ যায় আর কি! এলোকেশীর মেজাজটা কড়া বটে, কিন্তু শরীরে অনেক গুণ আছে। মাটিতে পড়িয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

ডমরুধরের বন্ধু আধকড়ি বলিলেন,—"হাঁ, সেই সময় আমি তোমার বাড়ীতে

আসিয়াছিলাম। তোমার সেই অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমি বেচু ভূঞাকে ডাকিতে যাইলাম। বেচু ঘরে ছিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম যে, সে এক পানা-পুকুরের জলে গা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। তাহার চক্ষু দুইটী জবাফুলের ন্যায় হইয়াছে। পানা-পুকুরের পচা পাঁক তুলিয়া মাথায় দিতেছে। আমি বলিলাম,—'বেচু! করিয়াছ কি? ডমরুধরকে তুমি কি ঔষধ দিয়াছ? তোমার ঔষধ খাইয়া ডমরুধর মারা পড়িতে বসিয়াছে।' মাথায় কাদা দিতে দিতে বাজখাঁই স্বরে বেচু উত্তর করিল,—'বাড়ি খাইয়া আমিই বা কোন ভাল আছি।' আমি বুঝিলাম যে, সে অবস্থায় তাহাকে আর কোন কথা বলা বৃথা। পুনরায় তোমার বাটীতে আসিয়া মাথায় অনেক জল দিয়া সে যাত্রা তোমার প্রাণ আমরা রক্ষা করিলাম।"

ডমরুধর বলিলেন,—বেচুর ঔষধ হইতে প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু জ্বর আমার গেল না। পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। তোমরা সকলেই আমাকে দেখিতে আসিতে। তোমরা সকলেই মনে করিয়াছিলে যে, সে যাত্রা আমি আর রক্ষা পাইব না। একদিন রাঘব ও নকুল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিছানার দুইপার্শ্বে দুইজনে বসিয়া আমাকে অনেক আশ্বাস ও ভরসা দিতে লাগিলেন।

রাঘব বলিলেন,—"দেখুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অঙ্গদ মজুমদারকে আপনি জানিতেন? তাহার শরীরটী ঠিক ডমরুধরের মত ছিল। এইরূপ কাটি কাটি হাত, এইরূপ কাটি কাটি পা, শরীরে চর্বি একটুও ছিল না। তাহার পীড়াটিও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। চিতার উপর তাহাকে শোয়াইয়া যখন আমরা আগুন দিলাম, তখন সেই আগুনের তাতে তাহার শরীরটী শট্‌কে উঠিল। ধনুকের মত হইয়া তাহার মাজাটা চিতার উপর উঠিয়া পড়িল। কাঠ সব পুড়িয়া গেল। কিন্তু অঙ্গ পুড়িল না।

তাহাকে আমরা জলে ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু আমরা স্নান করিয়া উঠিতে না উঠিতে, পাঁচ ছয়টা কুকুর ও শৃগাল আসিয়া জলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল। ডমরুবাবু, তোমার শরীরটিও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু তোমার ভয় নাই। আমরা অধিক কাঠ দিয়া দেখিব। তবে নিতান্তই যদি তুমি পুড়িয়া না যাও, তাহা হইলে কাজেই তোমাকে আধপোড়া করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।"

নকুল ভট্টাচার্য্য আমাকে বলিলেন,—"তোমার পুরোহিতের বাড়ী এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ। মন্ত্র পড়াইতে রাত্রিতে যদি আমাকে ঘাটে যাইতে হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ আমাকে দিয়া করাইতে হইবে। নিজের পুরোহিতকে দিয়া করাইতে পারিবে না। তুমি সে কথা বাড়ীতে বলিয়া রাখ। মৃত্যু হইয়া গেলে আর কথা বলিতে পারিবে না,—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥

এলোকেশী পাশের ঘরে বসিয়া এইসব কথা শুনিতেছিলেন। সহসা খেঙরা হস্তে উগ্রচণ্ডার ন্যায় রণমূর্তিতে আসিয়া সপ্ করিয়া এক ঘা নকুলের পিঠে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর আর এক ঘা রাঘবের মাথায়। ঘর হইতে দুইজনে পলাইলেন। এলোকেশী তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া আরও দুই চারি ঘা বসাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের বুকে প্যাঁচ

ঈষৎ হাস্য করিয়া আমি বলিলাম,—"এলোকেশী! তুমি এখন যাহা করিলে, তাহাতে আমার অর্ধেক রোগ ভাল হইয়া গেল। আর আমাকে কোনরূপ ঔষধ খাইতে হইবে না।" এলোকেশী সে কথা শুনিলেন না। পরদিন গোবর্ধনপুরে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়া আমার নাড়ী দেখিলেন, জিহ্বা দেখিলেন, পেট টিপিয়া দেখিলেন। বুকের উপর বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির ডগা দিয়া অনেক ঠোকাঠুকি করিলেন। তাহার পর আমার বুকে চোঙ বসাইলেন। চোঙের অন্যদিকে কান দিয়া তিনি বলিলেন,—"এখানে একটা প্যাঁচ আছে।" এইরূপ তিন চারিটা প্যাঁচের কথা তিনি বলিলেন। প্যাঁচ আছে শুনিয়া আমার মনে ভরসা হইল। আমি ভাবিলাম যে, আমার বুকে যখন এতগুলি প্যাঁচ আছে, তখন আমি মরিব না, বহুকাল আমি বাঁচিব।

ডাক্তার তাহার পর পুলটিস ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। খাইবার নিমিত্ত আমাকে সাবু দিতে বলিলেন। সাবুর নাম শুনিয়া আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—"কি! সাবুদানা? বিলাতী জিনিষ। তাহা আমি কখনই খাইব না। চিরকাল আমি পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু। অখাদ্য খাইয়া আমি অধর্ম করিতে পারিব না। ডাক্তারবাবু! আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কয়েক বৎসর পূর্বে সন্ন্যাসী-বিভ্রাটে পড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর যমের বাড়ী গিয়াছিল। যখন আমার বিচার হয়, তখন আমি যমকে বলিয়াছিলাম যে, একাদশীর দিন কখন আমি পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই। যম সেই কথা শুনিয়া প্রসন্নবদনে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে পুলকিত মনে বলিলেন,—সাধু সাধু সাধু! এই মহাত্মা একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করেন না। ইঁহার পদার্পণে আজ আমার যমপুরী পবিত্র হইল। শীঘ্র তোমরা যমনীকে শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাগণকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী-কলকলিত, পারিজাত-পরিশোভিত, কোকিল-কুহরিত, ভ্রমর-গুঞ্জরিত, অপ্সরা-পদ-নূপুর-ঝঙ্কৃনিত, হীরা-মাণিক-খচিত, নূতন এক স্বর্গ নির্মাণ করিতে বল।' শুনিলেন ডাক্তারবাবু! খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিলে কত ফল হয়? আমি আশ্চর্য্য হই যে, টিকিনাড়ারা এখানে-ওখানে যায় কেন, ধর্মকথা শিখিতে আমার কাছে আসে না কেন?"

আমি পুনরায় বলিলাম,—"ডাক্তারবাবু! বুকে আমি তোমার ও জগদ্দল পাথর মসুনের পুলটিস চাপাইব না, তোমার ঔষধও আমি খাইব না। কেবল আমি মা দুর্গাকে ডাকিব, আর আমাদের কাটিগঙ্গার জল খাইব। আমাদের কাটিগঙ্গার জল মকরধ্বজের বাবা।"

আমি কাহারও কথা শুনিলাম না। সেইদিন হইতে আমি কেবল কাটিগঙ্গার জল খাইতে লাগিলাম। সেই রাত্রিতে মা দুর্গা শিয়রে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"ডমরুধর! বাছা! তুমি আমার বরপুত্র। কেন তুমি বলিয়াছিলে যে, আর আমার পূজা করিবে না? সেই জন্য তোমাকে এই রোগ দিয়াছি। কিন্তু ভয় নাই, তোমাকে আমি রোগ হইতে মুক্ত করিলাম। তাহার পর আরও একটু নূতন বুদ্ধি তোমাকে আমি দিলাম। এই বুদ্ধিটুকু তুমি খেলাইবে। তাহা হইলে হীরাখণ্ড হাতছাড়া হইয়া তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার দশগুণ তোমার লাভ হইবে। কিন্তু বাছা, তোমার পূজায় আমি যে তৃপ্তিলাভ করি, বঙ্গদেশে কাহারও পূজায় সেরূপ তৃপ্তিলাভ করি না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের নূতন বুদ্ধি

সেই দিন হইতে আমার রোগ দূর হইয়া গেল। জ্বর গেল। দিন দিন শরীরে বল পাইতে লাগিলাম। রোগের পর আমার যেন নূতন শরীর হইল। এখন মা যে নূতন বুদ্ধিটুকু আমাকে দিয়াছেন, তাহা খেলাইয়া হীরকের দশগুণ টাকা আদায় করিতে আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

একদিন বসিয়া বুদ্ধি খেলাইতেছি এমন সময় আমার মনে কোন বিষয় উদয় হইল। আমি একটু হাসিয়া ফেলিলাম। এলোকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন, —"হাসিতেছ কেন?" আমি বলিলাম,—"চুপ কর। বুদ্ধি পাকিয়া আসিতেছে।"

খুলনা জেলায় বাঘেরহাটের নিকট নীলামে আমি এক মহল কিনিয়াছিলাম। তাহা লইয়া আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ত্রিশঙ্কুবাবুর সহিত মোকদ্দমা চলিতেছিল। অন্য বিষয়ে আমি টাকা খরচ করি না বটে, কিন্তু মোকদ্দমার জন্য টাকা খরচ করিতে কখনও কাতর হই না। এক একটা দলিল জাল করাইতে আমি পাঁচশত টাকা ব্যয় করি। এক এক জন মিথ্যা সাক্ষীকে আমি পাঁচ হইতে দশ টাকা দিয়া বশ করি। মিথ্যা মোকদ্দমা আমি যেমন সাজাইতে পারি, মিথ্যা সাক্ষীদিগকে আমি যেমন শিখাইতে পারি, এমন আর কেহ পারে না। আদালতে হলফ করিয়া আমি নিজে যখন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করি, তখন কোন উকীল জেরা করিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না। ত্রিশঙ্কুবাবু আমার সহিত পারিবেন কেন? দুটা আদালতে তিনি হারিয়া গিয়াছিলেন।

মহলের একস্থানে বনের ভিতর প্রাচীন ইটে গাঁথা একটী প্রাচীর ও শানের চাতাল ছিল। সেই চাতালের কথা আমার মনে পড়িল। আমি কলিকাতায় যাইলাম। কোন লোককে টাকা দিয়া একখানি তামার পাতে সে কালের বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি কথা খোদিত করাইলাম। তাহা লইয়া ঘিটুটুকু ধাঙ্গড়ের সহিত আমি বাঘেরহাট মহলে গমন করিলাম। ঘিটটুকে সেই চাতালের উপর সপরিবারে বাস করিতে বলিলাম। গাছের ডালপালা দিয়া তাহার উপর সে এক ঝুপড়ি প্রস্তুত করিল। ত্রিশঙ্কুবাবু বন্দুক লইয়া একটী কুকুরের সহিত প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেই পথ দিয়া গমন করেন। আমি টোপ ফেলিলাম। ত্রিশঙ্কুবাবু এখন কি করেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি খুলনায় আসিয়া বাসা ভাড়া করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিশঙ্কুবাবু মহলের নিকট সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঘিটটু ধাঙ্গড়ের বৃদ্ধ মাতা ছোট একখানি তামার পাত মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ত্রিশঙ্কুবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর হাতে ওটা কি?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"জানি না বাবু কি! উনুন করিবার নিমিত্ত চাতালের শান খুঁড়িতে খুঁড়িতে এইটা আমি পাইয়াছি।"

ত্রিশঙ্কুবাবু হাতে করিয়া দেখিলেন। পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় তাহাতে যে কথাগুলি লেখা ছিল তাহার একটু দেখিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। এক টাকা দিয়া তামার পাতটী বৃদ্ধার নিকট হইতে তিনি কিনিয়া লইলেন। তাহার পরদিন খুলনার বাসায় তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"ডমরুধরবাবু, সামান্য ঐ মহলটা লইয়া মিছামিছি আর মোকদ্দমা কেন? আপনারও টাকা খরচ হইতেছে, আমারও টাকা খরচ হইতেছে। দুইশত টাকায় আপনি মহলটী কিনিয়াছেন, পাঁচশত টাকায় মহলটী আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

আমি উত্তর করিলাম,—"মহলটীর জন্য আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমি উহা ছাড়িব না।"

ত্রিশঙ্কুবাবু মূল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার, চারি হাজার পর্য্যন্ত উঠিলেন। তথাপি আমি সম্মত হইলাম না। চারি হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়া তিনি বলিলেন,—"আর আমি পারি না। আর আমার ক্ষমতা নাই।"

অবশেষে সাড়ে চারি হাজার টাকায় আমি তাঁহাকে মহলটী বিক্রয় করিলাম। ধাঙ্গড়দিগকে লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পরে শুনিলাম যে, ত্রিশঙ্কুবাবু প্রায় বিশ হাত গভীর করিয়া সেই চাতাল ও নিকটবর্ত্তী স্থান খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছিল। মাটীর ভিতর হইতে একটী পয়সাও বাহির হয় নাই।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? কি পাইবেন তিনি আশা করিয়াছিলেন?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় সেই তাম্রফলকে লেখা ছিল—

বিসমিল্লা। আমি মহম্মদ তাহির প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছিলাম। এক্ষণে পীর খাঞ্জে আলি সাহেব হইয়া মুসলমান হইয়াছি। আমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ আছে। তাহাদের বংশধরগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এই চাতালের দশহাত নিম্নে আমি এক লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা পুঁতিয়া রাখিলাম। এই অর্থ জিন্দাগাজী সাহেবের আশ্রয়ে রাখিলাম। যখন আমার ব্রাহ্মণ বংশধরগণ নিতান্ত দরিদ্র হইবে, তখন তিনি এই অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিবেন। ইতি ১৫ই জিলহিজ্জা ৮৬২ হিজরি।"

ঐ তাম্রপত্র আমি লেখাইয়া আনিয়াছিলাম। ত্রিশঙ্কুবাবুকে দেখাইবার নিমিত্ত আমি ধাঙ্গড় বুড়ীকে দিয়াছিলাম। মায়ের কৃপায় বুদ্ধি খেলাইয়া হীরার দশগুণ মূল্য আমি লাভ করিলাম।

লম্বোদর বলিলেন,—"ভাদ্র মাসে ভূত ভূত বলিয়া গ্রামে একটা গোল উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তুমি যে তার গোঁসাই, তাহা জানিতাম না।"

সকলে বলিল,—"ধন্য ডমরুধর, ধন্য তুমি।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তাই তোমাদের সকলকেই আমি বলি, মা দুর্গাকে তোমরা ভক্তি কর। মা দুর্গা তোমাদিগকে ধন দিবেন, মান দিবেন, সব দিবেন। আর হাওয়াখোর বাবুদের আমি বলি যে, মায়ের পূজা ছাড়িয়া বিদেশে তোমরা হাওয়া খাইতে যাইও না। ঘরে থাকিয়া ভক্তিভাবে মায়ের পূজা কর। যত হাওয়া চাও, মা তোমাদিগকে দিবেন। ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পেট ভরিয়া হাওয়া খাইতে পারিবে।"

সপ্তম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : জিলেট মন্ত্র

পূজার পঞ্চমীর দিন ডমরুধর যথারীতি বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া আছেন। হাঁ করিয়া তিনি বলিলেন,—"তোমরা একবার আমার মুখের ভিতরটা ভাল করিয়া দেখ।" সকলে দেখিলেন। লম্বোদর বলিলেন,—"তোমার মুখের ভিতর কি আছে? কিছুই নাই। ফোকলা মুখ। তিমির গিরিগহ্বরের ন্যায়।" ডমরু উত্তর করিলেন,—"তোমাদের পাপ চক্ষু তৈলপেশী বলদের ঠুলি দ্বারা আবৃত। তোমরা দেখিবে কেবল অন্ধকার।"

গজানন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তোমার মুখের ভিতর কি আছে?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"আমার জিহ্বা ও কণ্ঠে সরস্বতী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি মা দুর্গার বরপুত্র। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে যে দেবতাগুলি আগমন করেন, একে একে সকলের আরাধনা করিয়া আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। কার্ত্তিকের বরে আমার কন্দর্পের ন্যায় রূপ হইয়াছে। মা সরস্বতীর বরে আমি এত বড় বিদ্বান হইয়াছি। মেঘনাদবধ কে লিখিয়াছে জান?"

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—"কেন? মাইকেল মধুসূদন দত্ত।"

ডমরুধর বলিলেন,—"হাঁ, সকলের তাই বিশ্বাস। কিন্তু কলিকাতায় যখন আমি চাকরী করিতাম, তখন সন্ধ্যার পর সাহেবী পোষাক পরিয়া কে আমার নিকট আসিত? দুই ঘন্টাকাল আমি যাহা বলিতাম, কে তাহা লিখিয়া লইত? সে লোকটি অপর কেহ নয়, সে লোকটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মেঘনাদবধ কাব্য আগাগোড়া আমার দ্বারা রচিত। কিন্তু মাইকেল আমাকে অধিক টাকা দিতে পারিতেন না। টাকা দিতেন বঙ্কিম। কোনদিন পাঁচ, কোনদিন দশ। যেদিন 'দুর্গেশনন্দিনী' শেষ করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম, সেদিন তিনি আমাকে একেবারে একশত টাকা দিয়াছিলেন। অন্যান্য পুস্তকের জন্যও তিনি আমাকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। মাইকেল ও বঙ্কিম অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে,—'মহাশয়! আপনি যে আমাদের পুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে সে কথা প্রকাশ করিবেন না।' সেই জন্য এতদিন চুপ করিয়াছিলাম। আর দেখ, এখন যত বড় বড় গ্রন্থকার জীবিত আছেন, অন্ততঃ সাধারণে যাঁহাদিগকে গ্রন্থকার বলিয়া জানে, তাঁহাদের সমুদয় পুস্তকের প্রণেতা এই শর্ম্মা। হাসি পায়। নাম করিব না। নাম করিলে, তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম একেবারে যাইবে। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া নাম করিতে তাঁহারা আমাকে মানা করিয়াছেন। সেই জন্য চুপ করিয়া আছি। কিন্তু তাঁহার যে গ্রন্থকার বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন, তাই আমার হাসি পায়।

এই দেখ, আজকাল হোমরুল বলিয়া একটা হুজুগ পড়িয়াছে। এই লোকটি সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আমি শতগুণ বক্তৃতা করিতে পারি। আমার বক্তৃতা লোকে এইরূপ মুখভঙ্গী করিয়া অবাক হইয়া শ্রবণ করে।

আমার প্রতি মা সরস্বতীর সামান্য কৃপা নহে। সে বৎসর কার্ত্তিকের ময়ূরে

চড়িয়া আমি যখন আকাশ ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন মায়ের কৃপায় আমার মুখ দিয়া মহামন্ত্র বহির হইয়াছিল। এ তোমার হিড়িং বিড়িং মন্ত্র নহে। জিলেট মন্ত্র। আসল বীজমন্ত্র। এ মন্ত্রের যে কি অদ্ভুত শক্তি, এতদিন তাহা আমি জানিতাম না। এইবার জানিতে পারিয়াছি। এই মন্ত্রের প্রভাবে আমি শুক্লাম্বর ঢাককে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। প্রেতযোনি-প্রাপ্ত তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। সমুদ্রযাত্রা-জনিত পাপ হইতে তাঁহার জামাতাকে পরিত্রাণ করিয়াছি।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুক্লাম্বর ঢাক মহাশয়ের কি হইয়াছিল?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঢাকমহাশয়

ডমরুধর বলিলেন,—শুক্লাম্বর ঢাকমহাশয় গুরুগিরি করেন। তাঁর অনেক শিষ্য আছে। গুরুগিরি করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জন হয়। দোতালা কোঠা বাড়ীতে তিনি বাস করেন। মোকদ্দমা-মামলা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ ব্যুৎপত্তি, এরূপ ব্যুৎপত্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। নানা বিষয়ে ঢাক-মহাশয় আমার সহায়তা করেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। ঢাকমহাশয় অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ। পূজা-আহ্নিক জপ-তপে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সেজন্য তাঁহার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। আজকাল ব্রাহ্মণেরা ত্রিসন্ধ্যা করে না। টিকিনাড়ারা সে উপদেশ কাহাকেও প্রদান করে না। কিন্তু ঢাকমহাশয় সে প্রকৃতির লোক নহেন। কাহাকেও চা বা বরফ খাইতে দেখিলে তিনি আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তিনি চেষ্টা করেন।

গত বৈশাখ মাসে একদিন ঢাকমহাশয় আমাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সূর্য্য অগ্নিবৃষ্টি করিতেছেন। রৌদ্রে পৃথিবী পুড়িয়া যাইতেছে। আমি তাঁহার বাড়ী গমন করিলাম। ঘোর পিপাসায় কাতর হইয়া আমি কোঁৎ কোঁৎ করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া ফেলিলাম। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ঢাকমহাশয় আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার কন্যা কুন্তলার প্রখর জ্বর হইয়াছে। কুন্তলার বয়স নয় বৎসর। আট বৎসর বয়সে ঢাকমহাশয় তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের দুই মাস পরেই সে বিধবা হইয়াছিল। দোতালার উপর যে ঘরে কুন্তলা শুইয়াছিল, ঢাক-মহাশয়ের সহিত আমি সেই ঘরে গমন করিলাম।

জ্বরে কুন্তলার কাঠ ফাটিতেছে। আগুনের ন্যায় শরীরের উত্তাপ হইয়াছে। ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতেছে। মা একটু জল দাও, মা একটু জল দাও, ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে। মা! পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। একটু জল দাও মা! একটুখানি দাও। কেবল মুখটি ভিজাইয়া দাও। একটু জল না খাইয়া আর থাকিতে পারি না। জল, জল, জল।

বিরস বদনে মা নিকটে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে বাতাস করিতেছেন। মাঝে মাঝে চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

ঢাকমহাশয় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন,—"আজ একাদশী। বিধবা। সেইজন্য জল দিতে বারণ করিয়াছি। কিন্তু জল দিতে আমার গৃহিণীর ইচ্ছা। এখন করি কি? সেইজন্য তোমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম।"

নীচে গিয়া আমি বলিলাম,—"বাপ রে! জল কি দিতে পারা যায়? ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন জল খাইতে দিলে তাহার ধর্ম্মটি একে-বারে লোপ হইয়া যাইবে।"

ঢাকমহাশয় তাহাই করিলেন। কন্যাকে জল দিলেন না। রাত্রিতে কন্যা পাছে নিজে জল চুরি করিয়া খায়, অথবা তাহার কষ্ট দেখিয়া মাতা, ভগিনী কি অপর কেহ পাছে তাহাকে জল প্রদান করে, সেজন্য সন্ধ্যার সময় কুন্তলাকে তিনি নীচের তালার এক ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি পীড়িতা কন্যা একেলা সেই ঘরে রহিল। ধর্ম্ম রক্ষা সম্বন্ধে ঢাকমহাশয়ের এমনি দৃঢ়পণ।

প্রাতঃকালে যখন তিনি ঘরের চাবি খুলিলেন, তখন সকলে দেখিল যে, বালিকা পিপাসায় হতজ্ঞান হইয়া ঘরের ভিজা মেঝের একধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি বার বার চাটিয়াছে। অবশেষে অজ্ঞান হইয়া ঘরের এককোণে পড়িয়া আছে। মাতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার মাথাটি লুটিয়া পড়িল। সেদিন দ্বাদশী। মাতা তাহার মুখে জল দিলেন, কিন্তু সে গিলিতে পারিল না। দুই কশ দিয়া জল বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে আর কথা কহিল না। শেষকালে একবারমাত্র বলিল,—"জল—জল।" এই কথা বলিয়া সে প্রাণত্যাগ করিল।

এই ঘটনার কথা যখন চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন দেশশুদ্ধ লোক ঢাকমহাশয়কে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সকলে বলিল,—কি দৃঢ় মন! কি ধর্ম্মের প্রতি আস্থা! এরূপ পুণ্যবান লোক কলিকালে হয় না। তাঁহার প্রতি লোকের এত ভক্তি হইল যে, এক মাসের মধ্যে তাঁহার এক শতের অধিক নূতন শিষ্য হইল।

কন্যার মৃত্যুতে ঢাকমহাশয়ের আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, বিধবা হইয়া চিরজীবনদুঃখে যাপন করা অপেক্ষা মরাই ভাল। কিন্তু মৃত কন্যা তাঁহাকে অধিক দিন আনন্দভোগ করিতে দিল না। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় সহসা "জল, জল! হা জল! হা জল!" এইরূপ ভীষণ চীৎকার করিয়া সে বাড়ীর চারিদিকে ছটফট করিয়া বেড়াইল। সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে ঘোর ভয়ে ভীত হইল। ইহার চারিদিন পরে ঢাকমহাশয়ের পুত্রটি মরিয়া গেল। এইবার ঢাকমহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পনের দিন পরে আবার কুন্তলার ভূত সেইরূপ জল জল করিয়া চীৎকার করিল। এবার মাতঙ্গিনী নামক দাসীর মৃত্যু হইল।

ফলকথা, যখনই কুন্তলার ভূত চীৎকার করিত, তখনই বাড়ীর একটা না একটা লোক মরিতে লাগিল। দাসীর মৃত্যুর পর ঢাকমহাশয় গয়াতে পিণ্ড দিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। কারণ, কিছুদিন পরে পুনরায় যখন চীৎকার হইল, তখন ঢাকমহাশয়ের ছট্টু নামক চাকর মরিয়া গেল। বিধবা হইয়া একাদশীর দিন ভিজা মেঝে চাটা পাপটি সামান্য নহে। গয়াতে হাজার পিণ্ড দিলেও ইহা ক্ষয় হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মোল্লা জামাতা

কুন্তলাকে কি উপায়ে উদ্ধার করা যায়, সেই সম্বন্ধে ঢাকমহাশয় আমার সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলাম না।

ঢাকমহাশয়ের এক বালক দৌহিত্র আছে। তাহার নাম ভুলু। ভুলু ঢাকমহাশয়ের প্রাণস্বরূপ। এক মুহূর্ত্ত তাহাকে চক্ষুর আড় করিয়া ঢাকমহাশয় থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ পুত্রহীন হইয়া তাঁহার যত স্নেহ-মমতা ভুলুর

উপর পড়িয়াছিল। পাছে কুন্তলার চীৎকারে ভুলুর কোন অনিষ্ট হয়, সেজন্য ঢাকমহাশয় ঘোরতর ভীত হইলেন।

বিপদের উপর বিপদ। ঢাকমহাশয়ের জামাতা, ভুলুর পিতা, যাহার নাম কেশব, বোগদাদে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ঢাকমহাশয়ের সদ্ভাব ছিল না। ঢাকমহাশয় আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি লড়াইয়ে মারা পড়িবেন। ভুলু ও ভুলুর মাতা চিরকাল তাঁহার নিকট থাকিবে। ভুলুর মাতার নাম কালিকা। বাল্যকাল হইতে তাহাকে আমি কোলে-পিঠে করিয়াছি। কন্যার ন্যায় তাহাকে আমি স্নেহ করি। এত চুল কখন আমি কাহারও দেখি নাই। কিছুদিন পূর্বে দোতালার ঘরে জানালার ধারে সে চুল এলো করিয়া বসিয়াছিল। সে যে কি অপূর্ব শোভা হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে আর কি বলিব।

ঢাকমহাশয়ের জামাতা, কালিকা দেবীর স্বামী। ভুলুর পিতা কেশব লড়াইয়ে মারা যান নাই। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে আসিয়া তিনি কালিকা ও ভুলুকে লইতে পাঠাইলেন। ঢাকমহাশয়ের মাথায় ঠিক যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিলেন,—"কিছুতেই আমি আমার কন্যাকে ও দৌহিত্রকে তাহার বাড়ী পাঠাইব না। সে সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গমন করিয়াছে। তাহার জাতি গিয়াছে।"

কিন্তু ঢাকমহাশয়ের কয়েকজন শিষ্য যাহারা বি-এ, এম-এ পাশ করিয়াছে, তাহারা বলিল যে,—"মহাশয়! এমন কাজ করিবেন না। আপনার জামাতা রাজ-কার্য্যে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। মহাসংগ্রামে পৃথিবী টলমল করিতেছে। জর্ম্মণদিগকে যদি সম্পূর্ণ পরাজিত করা না যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। আমাদেরও সর্বনাশ হইবে। ইংরেজের প্রতাপে আমরা সুখে নিরাপদে বাস করিতেছি। আমাদের প্রাণপণে ইংরেজের সাহায্য করা উচিত। আপনি যাহা মনস্থ করিয়াছেন, তাহা করিলে রাজার বিরুদ্ধে কাজ করা হইবে। এমন কাজ কখন করিবেন না।"

এইরূপ কথা শুনিয়া ঢাকমহাশয় আমাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আমি গিয়া বলিলাম,—"ইংরেজ প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সাগর অতি ভয়ানক বস্তু। জগন্নাথে গিয়া আমি দেখিয়াছি তিনটা ঢেউ খাইয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। সে সাগর-পারে কেহ যাইলে হিন্দুধর্ম্মের গন্ধটী পর্য্যন্ত তাহার গায়ে থাকে না।"

আমি পুনরায় বলিলাম,—"আর দেখুন, ঢাক-মহাশয়! বিলাতে গেলে বরং নিষ্কৃতি আছে। বিলাত গেলে সাহেব হয়, সাহেবি পোষাক পরে, সাহেবি খানা খায়। তা এখন বিলাত না গিয়াও লোকে এই কাজ করিতেছে। কিন্তু বোগদাদে গমন করিলে লোকে মোল্লা হয়। মোল্লা হইয়া পীরের গান করে। বলে,—

'হুঁকো বন্দিলাম, কলুকে বন্দিলাম, আর বন্দিলাম টিকে।
আর তালগাছে বন্দিলাম প্রভু চামচিকে॥'

তাহার পর সে আরব্য উপন্যাসের দেশ। জিন, দৈত্য ও দানবীতে পরি-পূর্ণ। গুজব এই যে, আপনার জামাতা একটা দৈত্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। অতএব এরূপ লোকের সহিত কোন সংস্রব রাখিবেন না। তাহার বাড়ীতে আপনার কন্যাকে পাঠাইবেন না।" ঢাকমহাশয় তাহাই স্থির করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সন্দেশের হাঁড়ী

কিন্তু ঢাকমহাশয়ের কন্যা কালিকা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি শ্বশুরবাড়ী যাইবার নিমিত্ত মাতার নিকট কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর নিকট তাঁহাকে পাঠাইবার নিমিত্ত মাতা ঢাকমহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ঢাকমহাশয় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে,—সে পতিত পাপিষ্ঠ সমুদ্র-প্রত্যাগত নরাধমের নিকট পাঠাইয়া আমি কন্যার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতে পারি না। হতাশ হইয়া কালিকা স্বামীকে পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়া একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে কেশব আসিয়া ঢাকমহাশয়ের খিড়কির নিকট এক বন্য জামতলায় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জামতলায় অল্প বন ছিল। সেই বনের আড়ালে দাঁড়াইয়া দুইজনে কথাবার্তা করিতে লাগিলেন। বন্য জাম-গাছ। অসময়ে ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কসা জাম হইয়াছিল। এখন কেষ্টা ছোঁড়া জাম গাছে উঠিয়া জাম খাইতেছিল। কেশব ও কালিকা তাহাকে দেখেন নাই। পতি-পত্নীর সকল কথা কেষ্টা শুনিতে পায় নাই। তবে, 'বুধবার সন্ধ্যার সময়' ইত্যাদি গোটা কতক কথা কেবল শুনিয়াছিল। যখন স্ত্রী-পুরুষের পরামর্শ শেষ হইবার উপক্রম হইল, তখন গাছ হইতে কেষ্টা বলিয়া উঠিল,—"ঢাকমহাশয়কে বলিয়া দিব।"

দুইজনে চমকিত হইলেন। একটু স্তব্ধ থাকিয়া কালিকা তাহাকে বলিলেন,—"না, দাদা! তা কি বলিতে আছে? লক্ষ্মী দাদা! কাহাকেও কিছু বলিও না।"

কেশবকে লক্ষ্য করিয়া কেষ্টা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ইংরেজী জান?"

কেশব উত্তর করিলেন,—"হাঁ, একটু আধটু জানি। বি-এ পাশ করিয়াছি।"

কেষ্টা বলিল,—"শীঘ্রই আমাদের পূজার ছুটী হইবে। 'পূজার সময় তুমি কি করিয়াছ' এই মর্ম্মে মাষ্টার আমাদিগকে একটা প্রবন্ধ লিখিতে দিবেন। আমার এত কাজ যে, আমি লিখিতে অবসর পাইব না। তুমি যদি আমাকে লিখিয়া দাও, তাহা হইলে আমি বলিয়া দিব না।"

কেশব স্বীকার করিলেন। কেষ্টা তাহাকে তিন সত্য করিতে বলিল। কালিকাকেও সত্য করিতে হইল। তখন কেষ্টা গাছ হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। কেশবও আপনার গ্রামে চলিয়া গেলেন।

'বুধবার সন্ধ্যার সময়' এইরূপ দুই একটি কথা কেষ্টা সেদিন শুনিতে পাইয়াছিল। বুধবার সন্ধ্যাবেলা কেষ্টা ভাবিল,—যাই, গিয়া দেখি, আজ তাহারা কি করে। এইরূপ মনে করিয়া সে সেই জামগাছে উঠিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার পূর্বে সে দেখিল যে, কালিকা শরা-ঢাকা এক নূতন হাঁড়ী লইয়া ঘর হইতে চুপি চুপি বাহির হইলেন। জামতলার বনের ভিতর হাঁড়ীটি লুকাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। কালিকা চলিয়া গেলে, কেষ্টা গাছ হইতে নামিল ও দেখিল যে, হাঁড়ীর মুখে শরাখানি কালিকা ময়দা দিয়া আঁটিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ময়দা কাঁচা ছিল। শরা একটু উঠাইয়া কেষ্টা দেখিল যে, হাঁড়ীটি সন্দেশে পরিপূর্ণ। কেশববাবু আসিয়া কালিকা দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সেই কথা ঢাকমহাশয়কে বলিয়া দিব না, আমি এই অঙ্গীকার করিয়াছি। সন্দেশ খাইব না,—আমি এরূপ অঙ্গীকার করি নাই। অতএব আমি এই সন্দেশগুলি খাইব। এইরূপ মনে করিয়া কেষ্টা সন্দেশের হাঁড়ী লইয়া বন হইতে বাহির হইল। পথে দাঁড়াইয়া সে দেখিল যে, সম্মুখ দিকে দুইজন গ্রামের লোক আসিতেছে। পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল যে, প্রেম চাষিক ধানবোঝাই গরুর গাড়ী লইয়া আসিতেছে। কেষ্টা ভাবিল

যে, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে দিই, তা না করিলে আমি ধরা পড়িব। এইরূপ মনে করিয়া সে সন্দেশের হাঁড়ীটি গাড়ীওয়ালাকে দিয়া বলিল,—"প্রেমখুড়ো! কালিকা দিদি আমাকে সন্দেশ দিয়াছেন। আমি একেলা খাইব না। তোমাতে আমাতে দুইজনে খাইব। তুমি ঘোষেদের গঙ্গার ঘাটে গিয়া গাড়ী রাখ। একটু পরে আমি যাইতেছি।" [কলিকাতার দক্ষিণে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। এ স্থানে প্রাচীন গঙ্গার গর্ভ লোকে ভাগ করিয়া লইয়াছে। তাই ঘোষেদের গঙ্গা, বসুদের গঙ্গা ইত্যাদি] প্রেম চাকি সন্দেশের হাঁড়ী লইয়া গঙ্গার ঘাটে চলিল। কেষ্টাও অন্য পথ দিয়া সেই দিকে চলিল। প্রেম চাকি ঘাটে উপস্থিত হইয়া হাঁড়ীটি একটু খুলিয়া দেখিল যে, সন্দেশে পরিপূর্ণ। সে ভাবিল যে, আমার ছেলেদের জন্য সন্দেশ লইয়া যাইব! কেষ্টাকে ভাগ দিব না। কিন্তু এই সময় দেখিল যে, দূরে কেষ্টা আসিতেছে। তাড়াতাড়ি হাঁড়ীটির মুখ পুনরায় বন্ধ করিল। গাড়ী হইতে একটি ঝুড়ি লইয়া হাঁড়ীটি ঝুড়ি চাপা দিয়া তাহার উপরে সে বসিয়া রহিল। কেষ্টা আসিয়া সন্দেশের ভাগ চাহিল। প্রেমচাকি বলিল,—"আমার ক্ষুধা পাইয়াছিল, মুখে সন্দেশ ভাল লাগিল, আমি সব সন্দেশ খাইয়া ফেলিয়াছি।" দুইজনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। এমন সময় কেষ্টা দেখিল যে, দূরে গজরাজ আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া কেষ্টা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

এ দিকে কালিকার মন সুস্থির নাই। জামতলায় সন্দেশের হাঁড়ী ঠিক আছে কি না তাহা দেখিবার নিমিত্ত তিনি আর একবার বনের নিকট গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, বনের ভিতর সন্দেশের হাঁড়ী নাই। কালিকা কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার হাঁড়ী কে লইয়া গিয়াছে, এই বলিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিলেন।

সেদিন বৈকালবেলা আমি ঢাকমহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলাম। ঢাকমহাশয় বলিয়াছিলেন যে, আমি নানা বিপদে পড়িতেছি। মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিতেছেন না, অতএব আর আমি মা দুর্গার পূজা করিব না। কথা শুনিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে বুঝাইতে যাইলাম। আমি বলিলাম যে, মা দুর্গা পরম দয়াময়ী। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। ভক্তিভাবে ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করুন। তাহা হইলে আমাকেও যেরূপ তিনি নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন, আপনাকেও তিনি সেইরূপ নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

কিন্তু প্রথম তিনি আমার কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাহার পর যখন আমি বলিলাম যে, পূজা বন্ধ করিলে, শিষ্য-সেবক যে বার্ষিক প্রদান করে, তাহার কি হইবে? তখন তিনি পূজা করিতে সম্মত হইলেন।

আমাদের দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কালিকার কান্নার শব্দ আমাদের কানে প্রবেশ করিল। আমরা সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছে?"

কালিকা উত্তর করিলেন যে,—"আমার সন্দেশের হাঁড়ী কে লইয়া গিয়াছে?"

আমি বলিলাম,—"গোটা কত সন্দেশের জন্য এত কান্না কেন? ঢাকমহাশয় তোমাকে অনেক সন্দেশ কিনিয়া দিবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উড়ুখুড়ু হাঁড়ী

ক্রমে সকল কথা প্রকাশ পাইল। পিতার অগোচরে কালিকা ঘর হইতে পলায়ন করিবেন, স্বামীর সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। বুধবার সন্ধ্যা-

বেলা কেশব ঘোড়ার গাড়ীতে কাটি গঙ্গার ঘাটের নিকট লুক্কায়িত থাকিবেন একটু অন্ধকার হইলে কালিকা ভুলুকে লইয়া সেই স্থানে গমন করিবেন, তাহার পর ঘোড়ার গাড়ীতে রেল-স্টেশন যাইবেন। সে স্থান হইতে রেল গাড়ীতে কেশব স্ত্রী-পুত্র লইয়া আপনার গ্রামে গমন করিবেন। বাক্স লইয়া গেলে পাছে কেহ জানিতে পারে, সেজন্য কালিকা আপনার গহনাগুলি হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহার উপর সন্দেশ চাপা দিয়া বনে রাখিয়াছিলেন। যাইবার সময় লইয়া যাইবেন এইরূপ মানস করিয়াছিলেন।

যখন এইসব কথা প্রকাশ হইল, তখন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে সে হাঁড়ী লইয়া গেল, তাহার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। দুইজন গ্রামের লোক বলিল যে, সন্ধ্যার সময় তাহারা জামগাছের নিকট দিয়া যাইতেছিল। পেমা চাকি গরুর গাড়ী লইয়া সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। কেষ্টা তাহাকে একটা হাঁড়ী দিল। ইহা তাহারা দেখিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ একজন লোক প্রেম চাকির বাড়ীতে দৌড়িল। আর একজন লোক কেষ্টার বাড়ীতে গেল। আমার চাকর গজরাজকে আমি গঙ্গার ঘাটে পাঠাইলাম। আমি তাহাকে আদেশ করিলাম যে,—"সেস্থানে যদি তুমি পেমা চাকিকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে গাড়ীশুদ্ধ তাহাকে ধরিয়া আনিবে।"

গজরাজ তাহাই করিল। প্রেম চাকির গাড়ী আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম। হাঁড়ী পাইলাম না। কিন্তু যখন সে শুনিল যে, হাঁড়ীতে কেবল সন্দেশ ছিল না, তাহার ভিতর অনেক গহণা ছিল, তখন সে বলিল যে, যেস্থানে সে গাড়ী রাখিয়াছিল, তাহার নিম্নে ভূমিতে ঝুড়ি চাপা সেই হাঁড়ী আছে। তখন আমরা সকলেই গঙ্গার ঘাটের দিকে দৌড়িলাম।

এদিকে সন্ধ্যার সময় কেশব রেল-ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কাটিগঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু দূরে ঘোড়ার গাড়ী রাখিয়া তিনি ঘাটের নিকট গমন করিলেন। তখনও সে স্থানে কালিকা ও ভুলু আসে নাই। কিন্তু দেখিলেন যে, একটা ঝুড়ি উপুড় হইয়া রহিয়াছে। ঝুড়িটি তুলিয়া দেখিলেন যে, নিম্নে একটি হাঁড়ী রহিয়াছে। হাঁড়ীর ভিতর সন্দেশ। কেশব মনে করিলেন যে গাড়ীতে ভুলু খাইবে, সেই জন্য কালিকা এই সন্দেশগুলি কাহারও হাতে গোপনে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হাঁড়ীটা কোলে লইয়া তিনি কালিকা ও ভুলুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরে কেশব দেখিলেন যে, কিছুদূরে অনেক লোক ঘাটের দিকে আসিতেছে। ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত তিনি অন্য পথে দ্রুতবেগে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। গোয়ালের কোণে হাঁড়ীটি রাখিয়া তিনি গোয়ালের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিলেন।

সকলে গঙ্গার ঘাটে গিয়া ঝুড়ি দেখিতে পাইল। কিন্তু ঝুড়ি তুলিয়া দেখিল যে, তাহার নিম্নে হাঁড়ী নাই। হতাশ হইয়া সকলে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। ক্রমে বিলক্ষণ একটা জনতা হইয়াছিল। কালিকাও সকলের সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেশব লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিকার মুখে সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"কেন! হাঁড়ী আমি লইয়া আসিয়াছি। গোয়ালের কোণে তাহা আমি রাখিয়া দিয়াছি।"

আহ্লাদিত হইয়া কালিকা আলোক লইয়া মাতা-পিতার সঙ্গে গোয়ালে প্রবেশ

করিলেন। আঁতিপাতি করিয়া গোয়ালের সকল কোণ, গোয়ালের সকল স্থান অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু হাঁড়ী পাইলেন না।

কালিকা পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিন্দি নামক ঢাকমহাশয়ের ঝি বলিল যে,—"সে প্রতিদিন সকলের পাতের খাবার কুড়াইয়া তাহার বোনঝির নিমিত্ত গোয়ালের কোণে রাখিয়া দেয়। সন্ধ্যাবেলা তাহার বোনঝি লইয়া যায়। সে হয়তো হাঁড়ী লইয়া গিয়াছে।

বিন্দির বোনঝিকে খুঁজিতে লোক দৌড়িল। সে অধিক দূর যায় নাই। হাঁড়ী সহিত সকলে তাহাকে ধরিয়া আনিল। ব্যস্ত হইয়া কালিকা হাঁড়ী খুলিয়া দেখিলেন। হরি হরি! তিনি দেখিলেন যে, সন্দেশের নিম্নে তিনি যে ভাবে গহণাগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ আছে। হাঁড়ী লইয়া আনন্দে তিনি মাতা ও ভ্রাতার সহিত দোতালায় আপনার ঘরে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আরব্য উপন্যাসের জিন

কেশব আর লুক্কায়িত হন নাই। ভিড়ের অন্য লোকের সহিত দাঁড়াইয়া তিনি সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিলেন। ঢাকমহাশয়ের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তিনি তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"দূর হঃ, দূর হঃ! বোগদাদি মোল্লা আসিয়া আজ আমার হিন্দু ধর্ম নষ্ট করিল।" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার রাগ দাবানলের ন্যায় আরও জ্বলিয়া উঠিল। কেশবকে তিনি একপাটি জুতা ছুড়িয়া মারিলেন।

কেশব ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনি আমার পিতৃস্থানীয় গুরুজন। আমি প্রত্যুত্তর করিব না। চারিদিন পরে আপনার কন্যাকে ও আমার পুত্রকে আমি লইতে পাঠাইব, পাঠাইয়া দিবেন। না, পাঠাইলে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া কেশব চলিয়া গেলেন। কেশব তখনও বাড়ির বাহির হন নাই। এমন সময় ঢাকমহাশয়ের সম্মুখে মাথায় পাগড়ী, বুক পর্য্যন্ত দাড়ি, ইজের পরা, প্রকাণ্ড এক জিন আসিয়া দাঁড়াইল। জিন ঠিক দৈত্য নহে। আমাদের দেশে যেরূপ যক্ষ রক্ষ অপ্সর কিন্নর গন্ধর্ব আছে, বোগদাদ অঞ্চলে সেইরূপ জিন নামক এক প্রকার ভৌতিক বায়বীয় জীব আছে। জিনকে দেখিয়া সকলে ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কেবল আমি ডমরুধর ভয় পাইলাম না। অনেক ভূতপ্রেতের সহিত আমি কারবার করিয়াছি। ঢাকমহাশয়ের নিকট গট্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

জিনটির কথা আমি এইরূপ শুনিলাম। একদিন কেশব ছিপ ফেলিয়া তাইগ্রিস নদীতে মাছ ধরিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার বঁড়শীতে কি লাগিয়া গেল। সাবধানে উপরে তুলিয়া দেখিলেন যে, তাহা এক তাম্র-নির্মিত হাঁড়ী। তামার ঢাকন দ্বারা হাঁড়ীর মুখ বন্ধ। সেই ঢাকনের উপর হিজিবিজি লেখা আছে ও তাহার উপর সিলমোহর আছে। হাঁড়ীর ভাব দেখিয়া তাঁহার আরব্য উপন্যাস বর্ণিত ধীবরের কথা স্মরণ হইল। তিনি ভাবিলেন যে, ঢাকন খুলিলে হয় তো হাঁড়ীর ভিতর হইতে প্রথম ধূম বাহির হইবে, তাহার পর সেই ধূম জিনের আকার ধারণ করিবে, তাহার পর জিন আমাকে বধ করিতে চাহিবে। এই ভয়ে তিনি তিনদিন হাঁড়ীর ঢাকন খুলিলেন না। তিনদিন পরে হাঁড়ীর ঢাকন খুলিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে অতিশয় প্রবল হইল। ছুরি দিয়া অতিকষ্টে তিনি ঢাকন খুলিলেন। তাহার পর যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। হাঁড়ী হইতে প্রথম ধূম বাহির হইল;

ধূম গাঢ় হইয়া প্রকাণ্ড জিনে পরিণত হইল। কেশব ঘোরতর ভীত হইলেন। কিন্তু জিন তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আলাদিন কোথায়? প্রদীপের সে জিন কোথায়? আলাদিনের নিমিত্ত মণিমুক্তাখচিত অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে প্রদীপের জিন আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। মজুরি হিসাবে তাহার নিকট আমার এক সহস্র দিনার বা টাকা পাওনা আছে। সেই কথা লইয়া তাহার সহিত আমার বিবাদ হইয়াছিল। সেজন্য প্রদীপের জিন আমাকে তামার হাঁড়ীতে বন্ধ করিয়া সিলমোহর করিয়া তাইগ্রীস নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এখন তাহার নিকট হইতে আমি আমার টাকা আদায় করিব।"

কেশব বলিলেন,—"আমি বিদেশী লোক। আরব্য উপন্যাসের সে আলাদিন কোথায়, তাঁহার সে প্রদীপের জিন কোথায়, তাহা আমি জানি না।"

জিন বলিল,—"আমি আলাদিনকে ও প্রদীপের জিনকে খুঁজিয়া বাহির করিব। কিন্তু প্রথম আমি তোমার উপকার করিব। কারণ, তুমি আমাকে জল হইতে তুলিয়াছ; হাঁড়ী হইতে বাহির করিয়াছ। তোমার সহিত তোমার দেশে আমি যাইব। নানা বিপদ হইতে তোমাকে আমি রক্ষা করিব। তাহার পর তোমাকে লইয়া এ দেশে পুনরায় ফিরিয়া আসিব। সেই হাজার দিনার আদায় করিয়া তোমাকে আমি দিব।" কেশবের সহিত জিন সেই জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াছে।

জিন ঢাকমহাশয়ের দিকে ভয়ঙ্কর কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দুইটি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতে লাগিল। অবশেষে সে বলিল,—"নরাধম কাফের! তুই আমার বন্ধুকে অপমান করিয়াছিস। একচক্ষু কাণা দামড়া গরুর আকৃতি ধারণ কর।"

তৎক্ষণাৎ ঢাকমহাশয় একচক্ষুহীন দামড়া গরু হইয়া গেলেন। সেই মুহূর্তে জিন অদৃশ্য হইয়া গেল!

ঘোর বিপদ দেখিয়া আমি দৌড়িয়া গিয়া কেশবকে ধরিলাম। দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"শ্বশুরমহাশয়কে পুনরায় মানুষ করি, সে ক্ষমতা আমার নাই। জিন কেবল মাঝে মাঝে আমার নিকট আগমন করে। পুনরায় কবে আসিবে, তাহা জানি না। এইবার যেদিন আসিবে, তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া শ্বশুরমহাশয়কে ভাল করিতে চেষ্টা করিব।"

এই কথা বলিয়া কেশব আপনার গৃহে চলিয়া গেলেন। এ স্থানে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। কালিকা কাঁদিতে লাগিলেন, কালিকার মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, সকলেই কাঁদিতে লাগিল। ঢাকমহাশয় হাঁ করিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি এক হাঁড়ী ভাতের ফেন আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। ঢাকমহাশয় চোঁ চোঁ করিয়া তাহা খাইয়া ফেলিলেন। তাহা খাইয়া তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। আমরা তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তিনি পৈঠা উঠিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে গোয়ালে লইয়া যাইতে হইল। তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, তিনি আর সকলকে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম,—"কিছু ভয় নাই, শীঘ্রই পুনরায় আপনি মনুষ্যশরীর পাইবেন। আর যতদিন না পুনরায় আপনার মনুষ্যশরীর হয়, ততদিন আপনাকে আমি ছাড়িয়া যাইব না।"

রাত্রি নয়টার সময় আমি নিজহাতে খড় কাটিয়া তাঁহাকে জাব দিলাম। তাহার পর গোয়ালের দেলঁঠেস দিয়া বসিয়া আমি ক্রমাগত মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম যে—"মা! তুমি আমাকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমার

বন্ধুকে তুমি এ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর। ইনি পূজা করিবেন না বলিয়াছেন। কিন্তু মা! ভাবিও না; যাহাতে ইনি এ বৎসর ঘটা করিয়া তোমার পূজা করেন, আমি সে ব্যবস্থা করিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ: আবার এলোকেশী

মা দয়াময়ী। মা আমার কান্না শুনিলেন। রাত্রি তিনটার সময় গোয়ালে অন্ধকারে বসিয়া আমি একটু চক্ষু বুজিয়াছি, এমন সময় মা আমাকে দর্শন দিলেন।

মা বলিলেন,—"ডমরুধর! তুমি আমার বরপুত্র, কিছু ভয় নাই, সরস্বতীর কৃপায় তোমার মুখ হইতে জিলেট মন্ত্র বাহির হইয়াছিল, সেই মহামন্ত্রের প্রভাবে তুমি ঢাকের পশুত্ব মোচন কর। কুন্তলাকে উদ্ধার কর, কেশবকে সমুদ্রযাত্রাজনিত পাপ হইতে মুক্ত কর। সমুদ্রযাত্রা তো সামান্য কথা। জিলেট মন্ত্র-প্রভাবে মানুষের সকল পাপ দূর হয়। এই মহামন্ত্রের মহিমা অপার। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া মা অন্তর্ধান হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি প্রথমে স্নান করিলাম শুচি হইয়া গোয়ালে প্রবেশ করিয়া একচক্ষুহীন দামড়া গরুর অর্থাৎ ঢাকমহাশয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া আমি জিলেট মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ,—সাতবার এই মহামন্ত্র পাঠ করিতেই ঢাকমহাশয়ের দামড়া রূপ ঘুচিয়া পুনরায় মনুষ্যরূপ হইল।

তাহার পর জিলেট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমি ঢাকমহাশয়ের বাড়ী তিনবার প্রদক্ষিণ করিলাম। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পুষ্পক রথ নামিয়া আসিল। সেই রথে চড়িয়া কুন্তলা স্বর্গে গমন করিলেন। জিলেট মন্ত্রের এমনি প্রভাব। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

ঢাকমহাশয়ের পুনরায় মা দুর্গার প্রতি অসীম ভক্তি হইল। তিনি প্রতিমা গঠনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন ও মহাসমারোহে পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

জামাতা কেশবকে তিনি ডাকিতে পাঠাইলেন। জিলেট মন্ত্রে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া আমি তাঁহাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিলাম। শ্বশুর-জামাতায় অক্ষুণ্ণ অপরিসীম স্নেহ-মমতা ও সদ্ভাব হইল। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

দুই চারিদিন পরে জিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল,—এই যে ডমরুমহাশয়, মনুষ্য মধ্যে ইনি রত্নবিশেষ। ইনি জিলেট মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মহামন্ত্রবলে ইনি না পারেন, এমন কাজ নাই। আজ রাত্রিতে ইঁহাকে আমি শাহারজাদি দিনারজাদির নাচ দেখাইব। পুস্তকে লেখা আছে যে, শাহারজাদি গল্প বলিয়া বাদশাহকে বশ করিয়াছিলেন। সে মিথ্যা কথা। দুই ভগিনীর নাচ দেখিয়া বাদশাহ বশ হইয়াছিলেন।

সেই রাত্রি আমি পুনরায় ঢাকমহাশয়ের বাটী গমন করিলাম। রাত্রি নয়টার সময় দুইজন পরমা সুন্দরী রমণীর সহিত জিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দুইটি রমণী আমাদের সম্মুখে নানা ভাবভঙ্গী করিয়া নাচিতে লাগিল। কেবল ঢাকমহাশয়, কেশব ও আমি সে নাচ দেখিয়াছিলাম। রমণী দুইটির অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও অদ্ভুত নাচ দেখিয়া আমার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। দুর্লভী বাগদিনীকে আমি ভুলিয়া যাইলাম।

নাচ সমাপ্ত হইলে জিন বলিল,—"আজ রাত্রিতেই আমরা বোগদাদে গমন করিব। ডমরুমহাশয় ও কেশবকে সঙ্গে লইয়া যাইব। বায়ুরূপে উড়িয়া মুহূর্ত মধ্যে আমরা সে স্থানে পেঁাছিব। সে স্থানে গিয়া ডমরুমহাশয়ের সহিত শাহারজাদির নিকা দিব ও দিনারজাদির সহিত কেশবের বিবাহ দিব।"

সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। কিন্তু আমি বলিলাম যে, এলোকেশীর মত না লইয়া আমি যাইতে পারিব না। কারণ, তাঁহাকে যদি না বলিয়া যাই, তাহা হইলে পৃথিবী খুঁজিয়া তিনি আমাকে বাহির করিবেন। আর মাথার টাক হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত তিনি আমাকে ঝাঁটা-পেটা করিবেন।

জিন এলোকেশীকে ডাকিতে পাঠাইল। ঝাঁটা হাতে করিয়া নিবিড় তিমির দ্বারা গঠিত শরীরে জবাকুসুম লোহিত লোচনে এলোকেশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জিনের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তাহার পর শাহারজাদির সহিত আমার নিকার প্রস্তাব শুনিয়া যখন এলোকেশী জিনকে ঝাঁটা পেটা করিতে দৌড়িলেন, তখন জিন, শাহারজাদি ও দিনারজাদির শরীর গলিয়া ধূমে পরিণত হইল। ধূম বাতাসে মিশিয়া গেল। সেইদিন হইতে তাহারা কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহা কেহ জানে না। কেশবের নিকট জিন আর আসে না।

যাহা হউক, ঢাকমহাশয় এ বৎসরে ঘোর ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিলেন।

লম্বোদর বলিলেন,—"আচ্ছা আজগুবি গল্প তুমি বানাইতে পার!"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—সকলই মহামায়ার মায়া! জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

রূপসী হিরণ্ময়ী

১। যেন কেমন-কেমন।

বাঙ্গাল নিধিরাম মরিয়া গেলেন, তাহার পর কি হইল? হিরণ্ময়ীর কি হইল? অনেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন। কারণ, মাথার উপর ভগবান আছেন। হিরণ্ময়ীর মত কলঙ্কিনী যদি সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাপন করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম সব মিথ্যা, বিধাতার সৃষ্টি বৃথা। তবে ভাবিয়াছিলাম এই যে, সে হতভাগিনীর কথা লিখিয়া আমার লেখনী কেন আর কলঙ্কিত করি? তাই চুপ করিয়াছিলাম। কিন্তু সকলে বলেন যে, হিরণ্ময়ীর শেষ দশা কি হইল তাহা না বলিলে ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। তাই বলিতে হইল। কিন্তু লিখিতে আমার মন হইতেছে না, কলম সরিতেছে না।

হিরণ্ময়ী যখন বলিলেন,—"দেখ, দেখ! বাঙ্গাল কি করিতেছে দেখ! ঠাট করিয়া আবার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে!" তখন নবীন সেই ঘাটের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হাতে পৈতা, অর্দ্ধ জলমগ্ন, ভূতলশায়ী নিধিরামের দিকে নিমেষের নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। নৌকা মোড় ফিরিল, আর তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন না।

অধিক আর কিছু দেখিবার আবশ্যকও ছিল না। যাহা কিছু দেখিলেন, তাহাতেই যেন তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। হিরণ্ময়ীর সেই মৃদু মধুর কথাগুলি শেল সমান তাঁহার বুকে বাজিল।

নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী! ঘোর সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার মন বলিতেছে, নিধিরামের অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি আজ ঐ দেবতা-সমান ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বধ করিলাম। তোমার বিদ্রূপ বাক্য শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। এখন বুঝিতেছি, তুমি ঐ দেবপুরুষের সেবা-দাসী হইবার উপযুক্ত পাত্রী নও, তাই তুমি তাঁহাকে পাইলে না। এখন মন দিয়া শুন, তোমাদের জন্য নিধিরাম কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, কিরূপ ভয়াবহ বিপদ সমূহ হইতে রক্ষা পাইয়া তোমার পিতার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন!"

নিধিরামের সমুদয় বিপদ ও ক্লেশের কথা নবীন হিরণ্ময়ীকে বলিলেন।

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—"নিধিরাম আমাদের নিমিত্ত কষ্ট পাইয়াছেন সত্য, নানা বিপদে পড়িয়াছেন সত্য। কিন্তু আমরাও কি তাঁহার কিছু করি নাই? যখন তিনি বিসূচিকারোগগ্রস্ত হইয়া আমাদের বাটীতে আসিলেন, তখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম। যখন গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গীদিগের লাঠির প্রহারে তিনি আহত হন্, তখনও আমরা সেইরূপ সেবা করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। আমাদিগকে তিনি সাত শত টাকা দিয়াছিলেন, এই বৈ তো নয়! তা, আমরাও তাঁহার যাহা করিয়াছি, সাত শত টাকায় তাহা পরিশোধ হয় না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে তিনি আমাদের কিছুই করেন নাই, বরং আমরা তাঁহার অনেক করিয়াছি।"

নবীন চুপ। একবার কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মনে হইল,—"কালসাপিনী বুকে ধরিলাম!" কিন্তু হিরণ্ময়ীর রূপে তাঁহার মন এখন আচ্ছন্ন।

তিনি এখন অন্ধ, উন্মত্ত। এখন তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, হিরণ্ময়ী দেবীরূপা লক্ষ্মীস্বরূপা পবিত্রময় নারী। তিনি সত্যের আধার, সতীত্বের আদর্শ। তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য, তিনি যাহা করেন তাহাই ঠিক।

নবীন ও হিরণ্ময়ী ঘরে পেঁাছিলেন। নবীনের মাতাপিতা যথাবিধি সমাদরে পুত্রবধূকে ঘরে লইলেন। হিরণ্ময়ীর রূপে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। মেঘের কোলে সৌদামিনী অতি লাবণ্যময়ী। প্রতিবাসীগণ সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন যে, হিরণ্ময়ীর রূপ সেই মেঘের কোলে সৌদামিনীর মত। সে রূপের পানে স্থির হইয়া চাহিবার যো নাই, চক্ষু ঝলসিয়া যায়, মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

নবীনের মাতা কিন্তু সেই অতুলরূপরাশি দেখিয়া সুখী হইলেন না। তাঁহার মনে যেন কেমন একটা ঘৃণার ভাব উদয় হইল। স্বামীকে তিনি বলিলেন,—"দেখ! বৌ-মার সব ভাল বটে, কিন্তু তাঁর চাউনিটা যেন কেমন-কেমন।" যেন "কি দেখি কি দেখি, যেন কি করি কি করি", সর্বদা এই ভাব। বৌমা বোধ হয় একটু চঞ্চলা হইবেন।"

২। মনের বাসনা।

হিরণ্ময়ী শ্বশুরবাড়ীতে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। সেই চঞ্চলভাব ক্রমে বাড়িতে লাগিল, ঘুচিল না। সকলে দেখিলেন, যে, হিরণ্ময়ীর লজ্জা-সরমও কিছু কম। উচ্চরবে হাসিলে, কি কথা কহিলে, যদি শাশুড়ী বকিতেন, তাহা হইলে দুই একদিন হিরণ্ময়ীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইত না, যেন এমন ধীর শান্ত স্ত্রীলোক আর জগতে নাই। কিন্তু সে কেবল দুই একদিনের জন্য,—তাহার পর আবার যে সেই। জানালা দিয়ে উঁকি মারাটীও বিলক্ষণ ছিল। ধরণ চলন ভাবভঙ্গী সকলই—আর দুঃখের কথা কি বলিব?—ভদ্রলোক গৃহস্থ কুল-বধূর মত নয়।

নবীন মাঝে মাঝে হিরণ্ময়ীকে বুঝাইতেন। নবীন বলিতেন,—"দেখ হিরণ্ময়ী! সকলেই তোমার নিন্দা করিতেছে। কাহারও মুখে তোমার সুখ্যাতি শুনি না। তোমার নিন্দা শুনিলে আমার মনে দুঃখ হয়। ধীর শান্ত হইবে, সকলে বলিবে যে, বৌ-টীর যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। সেকথা শুনিতে ভাল, কি নিন্দা শুনিতে ভাল? তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি কিছু নির্বোধ নও। একবার স্থিরচিত্তে বুঝিয়া দেখ, কোন্‌টী ভাল?"

হিরণ্ময়ী মধুর হাসি হাসিয়া নবীনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শশুর, শাশুড়ী, প্রতিবাসিনীগণ, অর্থাৎ কিনা পৃথিবীর আর যাবতীয় লোক, সবাই মন্দ, সবাই মিথ্যাবাদী। সকলেই মিথ্যা মিথ্যা তাঁহার নিন্দা করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ভাল কেবল হিরণ্ময়ী এক নিজে, আর সবাই কুলোক।

হিরণ্ময়ীতে নবীন আচ্ছন্ন, নবীন অন্ধ, উন্মত্ত। নবীন তাহাই বুঝিলেন।

নবীনকে একদিন হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"দেখ। এই আরসীই হইতেছে যত অনিষ্টের মূল। যখন আরসী দিয়া নিজের মুখ দেখি, যখন নিজের অতুল সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারি, তখন জগতের লোকের জন্য মনে বড় দুঃখ হয়। আমি ঘরের ভিতর বন্ধ হইয়া রহিলাম, জগতের লোক এ অপূর্ব রূপরাশি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পাইল না। মনে মনে ভাবি যে, আমার এই অনুপম-রূপ দেখিলে জগতের লোক পাগল হইয়া আমার পদাশ্রিত হয়। মুনি হউন, ঋষি হউন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারি।"

নবীন উত্তর করিলেন,—"ছি হিরণ্ময়ী! এরূপ কথা মুখে আনিতে নাই, এরূপ সাধ মনে স্থান দিতে নাই। তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, তুমি ভদ্রলোকের বৌ। এরূপ পাপ কথা আর কখনও মুখে আনিও না।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"লেখাপড়া শিক্ষা করা আমার বড় সাধ। যদি লেখাপড়া পাই, তাহা হইলে আর কিছুই চাই না। তাই লইয়া ভুলিয়া থাকি, ওরূপ কথা আর মনে উদয় হয় না।"

নবীন সেইদিন হইতে হিরণ্ময়ীকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন পড়িতে লিখিতে শিখিলেন, নবীন তখন হিরণ্ময়ীকে মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তক আনিয়া দিলেন। কিন্তু তাহা পড়িতে হিরণ্ময়ীর মন হইল না। নাটক, নভেল, বটতলার চটি, গানের পুস্তক, এই সকলে হিরণ্ময়ীর মতি।

একদিন হিরণ্ময়ী একজন প্রতিবাসীর বাড়ী বিবাহ-বাসরে গিয়াছিলেন। সেখানে কিনুর মা গান করিতে আসিয়াছিলেন। কিনু ও কিনুর মা ব্যবসাদার লোক। কিনু ভিক্ষা করিয়া প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহার সংসার নির্বাহ হয়। কিনু সংবৎসর বাটীতে থাকেন না, পূজা করিবার নিমিত্ত দেশবিদেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। পূজার পূর্বে বাটী আসেন। বাটী আসিয়া একখানি প্রতিমা নির্মাণ করিয়া লন। পূজা আচ্ছা নাম মাত্র। তবে ঢাকি ডুলি থাকে, সমারোহে বাজনাটা হয়। একবার অষ্টমী পূজার দিনে কিনুর মা একটী পাত্র হাতে করিয়া একজন প্রতিবাসীর বাটীতে দা'ল চাহিতে গিয়াছিলেন। কিনুর মা বলিলেন,—"তোমরা রাছা আমাকে একটু দাল দিতে পার? বাজনদারদের দুটী ভাত দিতে হইবে। ব্যঞ্জন তরকারি কিছুই নাই। তাই মনে করিলাম, তোমাদের বাটী হইতে একটু দাল লইয়া বাজনদারদের একমুঠা ভাত দিই।" প্রতিবাসিনী বলিলেন,—"সে কি কথা গো? তোমার হইল পূজা বাড়ী! আমাদের পূজা বাড়ী নয়। আমাদের বাড়ী তুমি দা'ল চাহিতে আসিয়াছ—সে কিরূপ কথা? এমন পূজা তোমাদের কি না করিলে নয়, বাছা?" কিনুর মা উত্তর করিলেন,—"কিনু আমার পূজাটী যদি না করিবেন, তবে কিনু খাবেন কিটী কোরে?" কথা এই, পূজা করিবার নামে কিনু ভিক্ষা করিয়া যা অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার যৎ-সামান্য খরচ করিয়া বাকি পুঁজি করেন।

কিনুর মাও অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন। তিনি গান গাহিতে পারেন। যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি একটু-আধটু নাচিতেও তাঁহার বিশেষ কোন আপত্তি নাই। তিনি না উপস্থিত থাকিলে লোকের বাসর জমে না। বাসর জাগিয়া তিনি টাকাটা-সিকাটা উপার্জন করিয়া থাকেন।

কিনুর মা'র সহিত হিরণ্ময়ীর সদ্ভাব। তাঁহার নিকট তিনি দুই চারিটা গান শিখিয়াছিলেন, একটু একটু নাচিতেও শিখিয়াছিলেন। আজ বাসরে হিরণ্ময়ী গান করিলেন, একটু নাচিলেনও। তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাঁহার নৃত্যের ভাবভঙ্গি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল।

হিরণ্ময়ী বাটী আসিয়া নবীনকে বলিলেন, "দেখ, আজ আমার গান শুনিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিল। সকলেই বলিল,—'আহা, এমন গলা ত কখন শুনি নাই!' কিন্তু এসব গুণ আমার বৃথা হইয়াছে। ঘরে ঠিক কারাগারের মত বদ্ধ হইয়া আছি। মনে সাধ হয় যে, পাঁচ জনকে আমার গান শুনাই। সকলেই আমার গানে মুগ্ধ হইবে।"

নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি! তুমি পাগল নাকি? ছি ছি! ওরূপ কথা মুখে আনিও না। কুচরিত্রা স্ত্রীলোকদিগের মনে ঐরূপ বাসনা হয়। ছি ছি, ওরূপ কথা মুখে আনিও না।"

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—"তাহাতে দোষ কি? মেমেরা ত পাঁচজনের সমক্ষে গান গাইয়া ও নাচিয়া থাকেন, তা বলিয়া তাঁহারা কি অসতী? লোকের একটা গুণ থাকিলে পাঁচজনকে দেখাইতে ইচ্ছা হয়।"

নবীন হিরণ্ময়ীতে আচ্ছন্ন। নবীন অন্ধ, উন্মত্ত। নবীন চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর একটী পুত্রসন্তান হইল। সকলে ভাবিলেন, এইবার হিরণ্ময়ী ধীর ও শান্ত হইবেন। অপত্য স্নেহে তাঁহার চপলতা দূর হইবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। সন্তানের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহের উদয় হইল না। সন্তানের তিনি ঘোরতর অযত্ন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া, নবীনের মাতা নিজে ছেলেটীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ছেলেটীর নাম সকলে সুধীর রাখিলেন।

৩। গবেশচন্দ্র।

ধর্ম-কথা যে হিরণ্ময়ী জানিতেন না, তাহা নহে। প্রতিবাসীদিগের জামাতা আসিলে তাহাদিগের নিকট তিনি কত ধর্মকথা বলিতেন, কত সৎ উপদেশ দিতেন। সেই বিদেশীয় লোকেরা অনেকেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা বলিতেন,—"আহা! এই স্ত্রীলোকটী সাক্ষাৎ সরস্বতী। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি ধীর, তেমনি মিষ্টকথা, তেমনি ধর্মজ্ঞান! নবীন বাবুর কি সৌভাগ্য যে, এই অমূল্য—নারীরত্ন তিনি লাভ করিয়াছেন!"

কিন্তু সকল জামাতার নিকট হিরণ্ময়ী যশ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধর্ম-কাহিনী ভেদ করিয়া কেহ কেহ তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ চপলতার লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অর্ধ মুদিত ঘন পল্লব বেষ্টিত উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ের কোণ হইতে আড়-দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন,—"এই স্ত্রীলোকটাকে সহসা দেখিলে লক্ষ্মীরূপিনী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। একটু বুঝিয়া দেখিলে ইহাকে রাক্ষসীরূপিনী বলিয়া জ্ঞান হয়! রাক্ষসপুরীর বারবিলাসিনী নারীরূপে জন্ম লইয়াছে। তাই এত রূপ, তাই এত কপটতা। এ স্ত্রীলোকটা সৎকুলেই জন্ম লইয়া থাকুক, সদ্বংশেরই কুলবধূ হউক, আর রাজরাণীই হউক, পরিণাম ইহার অতি শোচনীয় হইবে।"

আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসীদিগেরও সেই মত। তাঁহাদিগের নিকট হিরণ্ময়ীর ধর্ম্মকথা অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। হিরণ্ময়ীর "ছোঁক ছোঁক" চঞ্চল ভাব দেখিয়া সকলে কখনও তাঁহাকে পাগল মনে করিতেন, কখনও তাঁহার দুরভিসন্ধির আশংকা করিতেন। কিনুর মা আড়ালে বলিতেন,—"বৌটার ভাব যেন সদাই 'কারে খাই—কারে খাই, কারে গিলি—কারে গিলি'।"

সুলোক কুলোক সকল স্থানেই আছে। কুলোক থাকুক তাহাতে ক্ষতি নাই। স্ত্রীলোক যদি আপনার মান মর্য্যাদা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, লজ্জা সরম বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া মনে ভক্তির উদয় হয়, তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সহসা কাহারও সাহস হয় না। স্ত্রীলোকের হাবভাবে চঞ্চলতা থাকিলেই বিপদ। তখন তাহার একখানি দোষ দশখানি হইয়া উঠে। হিরণ্ময়ীর তাহাই হইল। ক্রমে হিরণ্ময়ীর কুযশ চারিদিকে রটিল। মন্দলোকেরা

হিরণ্ময়ীর প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীর শ্বশুর বড় মানুষ। সহসা কেহ হিরণ্ময়ীকে প্রণয়-ডোরে বাঁধিতে সাহস করিল না।

গ্রামবাসী গবেশচন্দ্রের সে ভয় ছিল না। গবেশের মান অপমানের ভয়ও ছিল না। গবেশ চিরকাল হিরণ্ময়ীর শ্বশুরের বিরোধী। মামলা মকদ্দমা, দাঙ্গা হাঙ্গামা, দলাদলি সকল কার্য্যেই গবেশ হিরণ্ময়ীর শ্বশুরের বিপক্ষ। গ্রামের দুষ্টগণ সকলেই এই গবেশের দলে। সে নিমিত্ত গবেশকে সকলকে ভয় করিয়া চলিতে হইত।

গবেশ হিরণ্ময়ীর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। গবেশ ভাবিলেন,—"স্ত্রীলোকটার যেরূপ চালচলন দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাকে বশ করা কঠিন কথা নহে। আমি দেখিতে মন্দ নই। বয়স আমার অধিক হয় নাই। গোটাকত ভাসা ভাসা ধর্ম্মকথা, তাহার সহিত দুই চারিটা প্রেমের কথা ও প্রেমের গান মিশাইয়া দিলেই এই হিতাহিতজ্ঞান রহিত স্ত্রীলোকটা আমার পদানুবিতা হইয়া পড়িবে। এখন বেটীর সঙ্গে দেখা করি কি করিয়া? বেটী যেরূপ পাগলিনী, তাতে এক আধখানা চিঠি দিতে পারিলেই বেটী গড়াইয়া পড়িবে। তাই বা দিই কেমন করিয়া?" গবেশের এই ভাবনা হইল। হিরণ্ময়ীকে একখানি চিঠি দিবার নিমিত্ত তিনি সুযোগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। মাসের পর মাস গত হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীকে চিঠি লিখিতে গবেশ কোন সুযোগ পাইলেন না। চাকর-চাকরাণীকে বশ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তাহাতেও কৃতকার্য্য হন নাই। কিনুর মাকেও বলিয়া দেখিলেন। কিনুর মা সাহস করিলেন না।

একদিন প্রাতঃকালে নিকটস্থ একখানি গ্রাম দিয়া গবেশ যাইতেছিলেন। পৌষ মাস, দারুণ শীত। ছেলেরা এক প্রকাণ্ড আগুন করিয়াছে, তাহার চারিধারে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে। ছেলেদের সঙ্গে একজন লম্বা-চওড়া-মোটা বলবান পুরুষ বসিয়া আগুন পোহাইতেছিলেন।

সেই পুরুষের মুখখানি গুরুগম্ভীর, অভিমানে পূর্ণ, অহঙ্কারে মটঃ মটঃ। একটী ছেলে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"ভাই! এই পৌষমাসের সকালে আমরা সকলেই শীতে কাঁপিতেছি। কিন্তু কর্ত্তার শীত নাই। কর্ত্তা যদি মনে করেন, তাহা হইলে, এখনি পানাপুকুরে ডুব দিয়া আসিতে পারেন।" সেই পুরুষটীকে গ্রামের সকলে কর্ত্তা বলিয়া ডাকে। কারণ, তাঁহাকে একটু ফুলাইয়া দিলেই তিনি সকল কাজ করিতেই প্রস্তুত। ছেলেটীর সেই কথা শুনিয়া কর্ত্তা বাজখাঁই স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গামছা আছে?" ছেলেরা অমনি সব বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, আছে বৈ কি!" অমনি একটী ছেলে আপনার বাড়ী দৌড়িয়া গেল, আর নিমেষের মধ্যে একখানি গামছা লইয়া আসিল। কর্ত্তা সেই গামছাখানি পরিয়া নিকটস্থ একটী পানাপুকুরে গিয়া ডুব দিলেন। ছেলেরা সব হাততালি দিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কর্ত্তা উপরে উঠিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কত চেষ্টা করিলেন কিন্তু কাঁপুনিটী নিবারণ করিতে পারিলেন না। পাছে ছেলেদের কাছে বাহাদুরিটুকু যায়, তাই কাজেই তাঁহাকে বলিতে হইল,—"একটু কাঁপে, কিন্তু শীত করে না।" গবেশ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এই রহস্য আগা-গোড়া দেখিলেন।

আর একদিন বৈকাল বেলা গবেশ সেই গ্রাম দিয়া যাইতেছিলেন। ছেলেরা একটী মৌচাক ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছিল। পাঁকাটী জ্বালিয়া কত-কি করিয়া তাহারা মাছি তাড়াইতেছিল। কিন্তু মৌমাছি পলাইতেছিল না। এমন সময়

কর্ত্তা আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটী ছেলে বলিয়া উঠিল,—"ভাই! আমরা কত কাণ্ড করিতেছি, তবু চাক ভাঙ্গিতে পারিতেছি না। কর্ত্তা যদি মনে করেন, তাহা হইলে এখনি প্রাচীরে উঠিয়া হাত দিয়া চাকটী ভাঙ্গিয়া আনিতে পারেন।" বাজখাঁই আওয়াজে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মই আছে?" অমনি সকলে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, আছে বৈ কি।" অমনি দুই চারিজন দৌড়িয়া গিয়া একজনদের বাড়ী হইতে একখানি মই লইয়া আসিল। কর্ত্তা মই দিয়া প্রাচীরে উঠিলেন। প্রাচীরের গর্ত্তে হাত দিয়া চাকটী ভাঙ্গিলেন। চাকটী হাতে লইয়া আস্তে আস্তে নামিয়া আসিলেন। চাক ভাঙ্গিবার সময় মৌমাছিতে তাঁহাকে চারিদিকে ধরিয়াছিল, সর্বশরীরে হুল ফুটাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল। কর্ত্তার মুখে কিন্তু কথা নাই। একবার উঃ কি আঃ কিছুই করিলেন না। কিন্তু সর্বশরীর ফুলিয়া উঠিল, সেটী লুকাইতে পারিলেন না। পাছে তাহাতে বাহাদুরী কিছু কম হয়, সেইজন্য আপনার গা পানে চাহিয়া ছেলেদের বুঝাইয়া দিলেন,—"ফোলে, জ্বলে না।"

সেই স্থানে দাঁড়াইয়া গবেশ সমস্ত ব্যাপার দেখিলেন। গবেশ ভাবিলেন, এ রহস্য মন্দ নয়। বুঝিলেন যে, এই কর্ত্তা একটী মহাপুরুষ, ইহাঁর দ্বারা তাঁহার কার্য্য সাধন হইবে। কর্ত্তাকে নিকটে ডাকিয়া গবেশ বলিলেন,—"মহাশয় দেখিতেছি অতি বীর পুরুষ। ভয় ডর আপনার কিছুই নাই। পৌষমাসের প্রাতে পানাপুকুরে ডুব দিলে আপনার শরীর কাঁপে, কিন্তু শীত করে না। মৌমাছির হুলে আপনার সর্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইলে কেবল ফুলিয়া উঠে, কিছুমাত্র জ্বালা করে না। এতদেশ বেড়াইলাম, এত লোক দেখিলাম, কিন্তু আপনার মত মহাপুরুষ কখনও দেখি নাই। —অপরাধ লইবেন না, জিজ্ঞাসা করায় কোনও দোষ নাই,—বলি, মহাশয়ের গাঁজাটা-আসটা খাওয়া আছে কি?"

মৌমাছির হুলে তো ফুলিয়াছিলেন বটেই, কিন্তু গবেশের প্রশংসায় কর্ত্তা আরও ফুলিয়া উঠিলেন। অহঙ্কারে তাঁর আর মাটীতে পা পড়ে না। কর্ত্তা উত্তর করিলেন,—"গাঁজা! গাঁজা তো প্রতিদিন খাইই, না খাইলে চলে না। তার উপর যেদিন আর যা জোটে, তাও খাই। নেশার দ্রব্য ছাড়িতে নিষেধ।"

গবেশ বলিলেন,—"তা বটে, তা বটে, নেশার দ্রব্য ছাড়িতে নিষেধ। কৈলাসে সেই যে গায়ে ছাই মাখিয়া, হাড়ের মালা গলায় দিয়া, কানে ধুতুরা ফুল গুঁজিয়া, ষাঁড়ের উপর শিব বসিয়া আছেন, তাঁর অপমান করা হয়। নেশার দ্রব্য ছাড়িলে ঘোর পাপ হয়। আপনি আমার সহিত আসুন। নেশা করিয়া আপনাকে একটী কর্ম্ম করিতে হইবে। আপনি ভিন্ন সে কার্য্য আর কেহ করিতে পারিবে না!"

আনন্দিত মনে গবেশের সহিত কর্ত্তা চলিলেন। নিজ গ্রামে উপস্থিত হইয়া গবেশ কর্ত্তার নিমিত্ত নানারূপ নেশার দ্রব্য আয়োজন করিয়াছিলেন। কর্ত্তা মনের সুখে পেট ভরিয়া নেশা করিলেন।

অবশেষে কি কার্য্য করিতে হইবে, গবেশ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ীদের বাটী দেখাইলেন। হিরণ্ময়ীদের খিড়কী দেখাইলেন। খিড়কীতে বাগান। বাগানটী চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের মাথায় বোতল কুচি সন্নিবেশিত। প্রাচীরের বাহিরে দুইজনে একটী উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। সেখান হইতে হিরণ্ময়ীর ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ঘর কর্ত্তাকে দেখাইয়া দিলেন।

গবেশ বলিলেন,—"কি উৎকট কার্য্য সাধন করিতে হইবে, এখন আপনাকে বলি। এই প্রাচীরটী আপনাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে। তাহার পর ঐ যে ঘর

দেখিতেছেন, ঐ ঘরের নিকট যে আম গাছটী আছে, তাহার উপর আপনাকে উঠিতে হইবে। ঐ আমগাছের নিকট দোতলায় যে জানালা রহিয়াছে, তাহা দিয়া ঐ ঘরের ভিতর একখানি চিঠি ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐ ঘরে একটী স্ত্রীলোক বাস করে। সন্ধ্যাবেলা তাহার স্বামী ঘরে থাকে না। সন্ধ্যাবেলা চিঠি ফেলিতে হইবে।"

কর্ত্তা দেখিলেন, কার্য্যটী অসম সাহসী বটে। কিন্তু দুরূহ কার্য্যে কর্ত্তা কখনও পরাঙ্মুখ হন না। কর্ত্তা সম্মত হইলেন। তাহার পরদিন সমুদয় আয়োজন হইল। সন্ধ্যার পর মই দিয়া কর্ত্তা প্রাচীরের উপর উঠিলেন। একখানি কম্বল অনেকবার পাট করিয়া বোতল কুচিতে ঢাকা দিলেন। দড়ি ধরিয়া প্রাচীর হইতে হিরণ্ময়ীদের খিড়কীর বাগানে গিয়া নামিলেন। তাহার পর সেই আমগাছে গিয়া উঠিলেন। আমগাছ হইতে জানালা দিয়া হিরণ্ময়ীর ঘরে গবেশের চিঠিখানি ফেলিয়া দিলেন। চিঠি ফেলিয়া পুনরায় সেই প্রকারে ফিরিয়া আসিলেন।

গবেশের চিঠিখানি অতি সুদীর্ঘ। তাহাতে প্রথম ঈশ্বরের নানারূপ স্তুতিবাদ ছিল, তাহার পর হিরণ্ময়ীর অতুল সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ছিল, তাহার পর নিস্বার্থ পবিত্র-প্রেমের প্রসঙ্গ ছিল, তাহার পর দুই একটা প্রেমের গান ছিল, অবশেষে গবেশের মনের কথা ছিল। গবেশের মনের কথা এই যে, তিনি হিরণ্ময়ীর রূপেগুণে একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রেমময়ী হিরণ্ময়ীর সহিত একবার সাক্ষাৎ না হইলে তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন, না হয় জলে ডুবিয়া মরিবেন, না হয় গলায় ছুরি দিয়া মরিবেন, যাহা হউক একটা কারখানা করিবেন। এ কথাও গবেশ লিখিয়াছিলেন যে, যে লোক আজ এই চিঠি দিল, কাল সে পুনরায় আর একখানি চিঠি লইয়া যাইবে। পত্রের প্রত্যুত্তর সেই লইয়া আসিবে। হিরণ্ময়ী যদি পত্রে ঢিল বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে সেইলোক কুড়াইয়া লইয়া আসিবে। এই পত্রের প্রতীক্ষায় গবেশ কেবল প্রাণ রাখিলেন, তা না হইলে কোনকালে আত্মহত্যা করিয়া বসিতেন।

সন্ধ্যার পর খাটে শুইয়া হিরণ্ময়ী গুনগুন করিয়া গান করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘরের ভেতর একখানি কাগজ আসিয়া পড়িল। হিরণ্ময়ী প্রথম ভাবিলেন, বাতাসে বুঝি কাগজখানি ঘরের ভেতর উড়িয়া আসিল। কিন্তু তখন সেরূপ বাতাস ছিল না। তাই তিনি উঠিয়া কাগজখানি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন যে, একখানি চিঠি। আলোর নিকট যাইয়া চিঠিখানি পড়িলেন। পড়িয়া, প্রথম তাঁহার রাগ হইল, তাহার পর ভয় হইল। আর দুই একবার পড়িয়া ক্রমে তাঁহার মন ভিজিয়া আসিল। কারণ পত্রখানিতে অনেক ঈশ্বরের স্তুতিবাদ ছিল, অনেক ধর্ম্ম-কথা ছিল। হিরণ্ময়ী ভাবিলেন,—"লোকটী দেখিতেছি অতি পবিত্র চরিত্র, ধার্ম্মিক; কেবল ধার্ম্মিক নয়, আবার প্রেমিক,—বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেমের মর্ম্ম অবগত আছে।"

অনেক দিন ধরিয়া হিরণ্ময়ী এইরূপ পবিত্র প্রেমের জন্য লালায়িত ছিলেন। তাই তিনি ছোঁক ছোঁক করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। পবিত্র প্রেম এখানে অতি দুর্লভ। মনের মত পবিত্র প্রেমিক লোক তিনি এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পান নাই। তাই, তাঁহার প্রাণে সুখ ছিল না। তাঁহার খাইয়া সুখ ছিল না, বসিয়া সুখ ছিল না, কিছুতে সুখ ছিল না। নবীনকে লইয়া কি পরিতৃপ্তি হয়? নবীন কেবল খবরের কাগজ ও পুস্তক লইয়া থাকে। না জানে গান, না জানে বাজনা। না জানে প্রেমের কথা, না জানে রসের কথা। হিরণ্ময়ীর মন এতদিন তাই আঁধার হইয়াছিল, জীবন মরুভূমি হইয়াছিল। আজ

সেই আঁধার-মনে আলো দেখা দিল, উষর জীবনে রস সিঞ্চিত হইল। হিরণ্ময়ীর রূপ গুণ আজ সার্থক হইল। অন্ধ নবীন তাহার মর্ম্ম কি জানে? সেই রূপ গুণের প্রশংসা করিতে আজ তিনি একজন যথার্থ প্রেমিক-পুরুষ পাইলেন।

তাহার পরদিন ঈশ্বরের স্তুতি পরিপূর্ণ, সাধুভাব পরিপূর্ণ, নিস্বার্থ প্রেম-কথা পরিপূর্ণ, গবেশকে হিরণ্ময়ী একখানি পত্র লিখিলেন। সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা আসিয়া গবেশের আর একখানি পত্র হিরণ্ময়ীর ঘরে ছুড়িয়া ফেলিলেন, আর সেই সময় হিরণ্ময়ীও আপনার পত্রখানিতে ঢিল বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন। কর্ত্তা আমগাছ হইতে নামিয়া সেই পত্রখানি কুড়াইয়া লইলেন। এইরূপে প্রতিদিন চিঠি লেখা-লেখি হইতে লাগিল। পত্রে ক্রমে ঈশ্বরের মহিমা-গান কম হইয়া আসিল। পত্রগুলি কেবল প্রেমের কথায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বাটী হইতে বাহির হইয়া আসেন, অবশেষে গবেশ সেই প্রস্তাব করিলেন। হিরণ্ময়ী সম্মত হইলেন। কিছুদিন সেই পরামর্শ চলিতে লাগিল। ক্রমে সব ঠিক হইল। কোন দিন, কখন, কিরূপে বাটী হইতে বাহির হইবেন, সকল কথা স্থির করিয়া হিরণ্ময়ী গবেশকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির প্রথমেই এই কয়টি কথা ছিল,—

"সঁপিনু তোমার পায়ে প্রাণ।
যায় যাক জাতি কুল মান॥"

সেই দিন সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা আসিলে, হিরণ্ময়ী পূর্ব্বমত পত্রখানিতে ঢিল বাঁধিয়া উপর হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আজ সেই সময় হিরণ্ময়ীর একটু হাত কাঁপিল। কর্ত্তা আমগাছ হইতে নীচে নামিয়া পত্র খুঁজিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! আজ চিঠি কোথায় গেল? কর্ত্তা চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, চিঠি আর কিছুতেই পান না। এমন সময় খিড়কির বাগানে কে যেন আসিতেছে, এইরূপ সাড়া পাইলেন। আর অধিক খুঁজিবার অবসর হইল না। কর্ত্তা শীঘ্র বাগান হইতে পলাইয়া গেলেন।

৪। বোকেন্দ্র।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সে বৎসর ভাল আঁব হয় নাই। হিরণ্ময়ীর জানালার কাছে যে আঁব গাছটী ছিল, তাহাতে গুটিকত আঁব হইয়াছিল। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর সেই আঁবগুলি গণিয়া রাখিয়াছেন। পাকিলে প্রথম ঠাকুরদের দিবেন, এই মানসে মাঝে মাঝে আসিয়া সেই আঁবগুলির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন। যে রাত্রিতে কর্ত্তা পত্র খুঁজিয়া পাইলেন না, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে হিরণ্ময়ীর শ্বশুর সেই আঁবগাছতলায় দাঁড়াইয়া আঁব দেখিতেছিলেন। একটী বড় আঁবের বোঁটা হইতে একগাছি সুতা ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলেন। সুতা গাছটির একদিকে একটী ঢিল বাঁধা, অপরদিকে একখানি কাগজ। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর ভাবিলেন আঁব পাড়িবার নিমিত্ত কে ঢিল মারিয়াছিল। কিন্তু ঢিলটী ছোট ও সুতায় বাঁধা, আবার তার সঙ্গে কাগজ। কিছুই বুঝিতে পারেন না। একজন চাকরকে তিনি বলিলেন,—"দেখ তো রে। আঁবের বোঁটায় ও কি রহিয়াছে?" চাকর গাছে উঠিয়া ঢিল সহিত চিঠিখানি পাড়িয়া আনিল। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর দেখিলেন যে, চিঠিখানি গবেশের নামে। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠি দেখিয়া তাঁহার

মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। তাঁহার গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তিনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। চাকরকে বলিলেন,—"সহসা আমার শরীর বড় অসুস্থ হইল, তুই আমাকে বাতাস কর।"

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, হিরণ্ময়ীর শ্বশুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন ও নবীনকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নবীন আসিলে তাহার হাতে চিঠিখানি দিলেন। চিঠি পড়িতে পড়িতে নবীনের দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চিঠি পড়া হইলে পিতা বলিলেন,—"নবীন! কুলাঙ্গারী পাপিয়সীকে আর ঘরে রাখা হইবে না, স্ত্রী-হত্যা করিব না। পাপিনীর মুখে চুণ-কালি দিয়া এই মুহূর্ত্তে বাড়ী হইতে দূর কর।"

নবীন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, নীরবে কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন,—"বাবা! হিরণ্ময়ী সামান্য অবোধ স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারে নাই, না বুঝিয়া একটা কুকাজ করিয়া ফেলিয়াছে। এবার তাহাকে ক্ষমা করুন। এখনও সে অসতী হয় নাই। আমরা যদি এখন তাহাকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। সে দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। আমি কি করিয়া তাহাকে পথে দাঁড় করাই? তাই বলি, বাবা, এবার হতভাগিনীকে আপনি ক্ষমা করুন।"

নবীনের পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। হিরণ্ময়ীকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে দূর করিতে বার বার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। বাপের পায়ে ধরিয়া নবীন কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি হিরণ্ময়ীকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

অবশেষে নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ীকে যদি একান্তই আপনি বাড়ী হইতে দূর করিবেন, তবে আমিও সেইসঙ্গে আপনার বাড়ী হইতে দূর হইব। সংসারের এই অকূল-সমুদ্রে হিরণ্ময়ীকে আমি ভাসাইতে পারিব না।"

ক্রোধে তাঁহার পিতা উত্তর করিলেন,—"এই দণ্ডেই। এরূপ পাপিয়সী কুল-কলঙ্কিনীকে যে স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারে, সেরূপ পুত্রের মুখ দেখিতে আমি চাহি না। কেবল তুমি কেন? তোমার ঐ ছেলেটাকেও লইয়া আমার বাড়ী হইতে দূর হও। আজ হইতে জানিলাম যে, আমি নির্বংশ হইয়াছি।"

নবীনের মাতা কত কাঁদিলেন। নবীনকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার পিতার রাগ শীঘ্রই পড়িয়া যাইবে, তিনি সব ক্ষমা করিবেন। কিন্তু নবীন বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, সে রাগ আর পড়িবার নয়, হিরণ্ময়ীর এ দোষ ক্ষমা হইবার নয়। স্ত্রী ও পাঁচ বৎসরের শিশু সুধীরকে লইয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। হিরণ্ময়ীর গহনা প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু তিনি ছাড়িয়া আসিলেন। পৈত্রিক এক কণামাত্র বস্তুও তিনি সঙ্গে লইলেন না।

নবীনের পিতা অল্পদিন পরে সমুদয় বিষয়-বিভব বিক্রয় করিয়া সপরিবারে কাশী যাইলেন। লজ্জায় ঘৃণায় মনোদুঃখে তাঁহাদের শীঘ্রই মৃত্যু হইল। দেব-সেবার নিমিত্ত সমুদয় টাকা তাঁহারা নিয়োজিত করিয়া যাইলেন। পৈত্রিক সম্পত্তির নবীন একটী পয়সাও পাইলেন না।

বাটী হইতে বাহির হইয়া নবীন যে কোথায় যাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন না। তাঁহার শ্বশুরবাটীতে আর এখন কেহ নাই। নিধিরামের পরলোক হইলে অল্পদিন পরে এককড়ির মৃত্যু হইল। তাহার পর তাঁহার শিশু সন্তানটীও গেল। অবশেষে হিরণ্ময়ীর মাতারও পরলোক হইল। সে ভিটায় এখন আর কেহ নাই।

পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিবেন এই মানসে নবীন কলিকাতায় আসিলেন।

সামান্য একটী বাসা ভাড়া করিয়া সেই স্থানে বাস করেন, আর সমস্তদিন কর্ম্ম-কাজের নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়ান। যৎকিঞ্চিৎ নবীনের হাতে যে টাকা ছিল ও কলিকাতায় আসিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু তিনি উপার্জ্জন করিলেন, তাহা দ্বারাই অতিকষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল। সুধীর অতি আদরের ছেলে। পিতামহ পিতামহী তাহাকে অতিযত্নে লালন পালন করিতেছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের আর সে যত্ন নাই। একে খাইবার থাকিবার কষ্ট, তাহার উপর আবার হিরণ্ময়ীর মায়া-মমতার অভাব। সুধীরের প্রথম জ্বর হইল। সেই জ্বর প্লীহা যকৃতে পরিণত হইল। নবীন যথাসাধ্য ডাক্তার দেখাইলেন, বৈদ্য দেখাইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না।

দুঃখে পড়িয়া হিরণ্ময়ীর আচরণ কিছুমাত্র সংশোধিত হইল না। আমোদ-প্রমোদ রসরঙ্গের ইচ্ছা তাঁহার মনে বরং আরও বলবতী হইল। তাঁহাদের বাসার নিকট একটী স্ত্রীলোকের বাড়ী ছিল। এই বাটীতে একজন পুরুষ আসিয়া মাঝে মাঝে হারমোনিয়ম বাজাইতেন। জানালা দিয়া হিরণ্ময়ী দেখিতেন, আর প্রাণ ভরিয়া হারমোনিয়ামের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতেন।

হিরণ্ময়ী "বীরাঙ্গনা" কাব্য পড়িয়াছিলেন। তিনি একজন বীরাঙ্গনা হইবেন, তাঁহার মনে এই সাধ হইল। সেইভাবে সেই অজানিত পুরুষকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি বড়, তবে তাহার সার-মর্ম্ম এই,—"তোমার মধুর বাদ্যে আমার মন মোহিত হইয়াছে। আমি পাগলিনী, উদাসিনী, প্রেম-ভিখারিণী হিরণ্ময়ী। তোমার নিকট আমি প্রেমভিক্ষা করিতেছি। প্রেম দান করিয়া আমার প্রাণ তুমি পরিতোষ কর।" অবশ্য হিরণ্ময়ী পবিত্র প্রেমভিক্ষা করিয়াছিলেন ; তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

যেমন হিরণ্ময়ীর পবিত্র প্রাণ, সেই লোকটীরও সেইরূপ পবিত্র প্রাণ। বিশেষতঃ তাঁহার দয়ার শরীর। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ হিরণ্ময়ীকে পবিত্র প্রেমদান করিলেন। প্রতিদিন নবীন বাটী হইতে বাহির হইলে, হিরণ্ময়ী সেই স্ত্রীলোকের বাটীতে গমন করেন। সেস্থানে সেই লোকটীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সুবিধা পাইলে সে লোকটীও কখন কখন হিরণ্ময়ীর বাটীতে শুভাগমন করেন।

পবিত্র প্রেম কিনা ? বলিতে দোষ কি ? একদিন হিরণ্ময়ী অতি সোহাগে নবীনকে বলিয়া ফেলিলেন,—"দেখ, এই পাশের বাটীতে একটী স্ত্রীলোক থাকে। অতি সচ্চরিত্রা, অতি ধীর, অতি ভাল স্ত্রীলোক। আর তাঁহার বাটীতে একটী বাবু আসেন, তাঁর নাম বোকেন্দ্র। তিনি যে কি ভদ্র, আর কত ভাল, তা আর তোমাকে কি বলিব ? তাঁর মুখে সদাই ধর্ম্ম-কথা। আমাকে তিনি কত সদুপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁর গল্প শুনিতে আমি বড় ভালবাসি। তিনি আমাকে বাজনা শিখাইবেন বলিয়াছেন। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করেন।"

নবীন এই কথা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী, বল কি ? তুমি কি লজ্জা সরমের মাথা একেবারে খাইয়াছ ? হিতাহিত জ্ঞান কি তোমার একেবারেই নাই ? পিতৃ আজ্ঞা অমান্য করিয়াছি, আমার কপালে যে কি আছে, তা বলিতে পারি না। খবরদার, খবরদার ! আর ঐ স্ত্রীলোকের বাটীতে যাইও না। বোকেন্দ্রের সহিত আর সাক্ষাৎ করিও না, তাহা হইলে তোমার মান সম্ভ্রম, ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হইবে।"

হিরণ্ময়ী স্বামীর নিকট বার বার ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্ত্রীলোকটীর বাটীতে আর তিনি যাইবেন না। আর তিনি কখনও বোকেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

তাহার পরদিন নবীন বাটী আসিয়া দেখিলেন যে, ঘরে একখানি উত্তম বোম্বাই সাড়ি রহিয়াছে। নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সাড়ি কোথা হইতে আসিল?" হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"কিনিয়াছি।" নবীন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টাকা কোথায় পাইলে?" নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী! এ কাজ কিনিয়াছি, পরে টাকা দিলে চলিবে।" নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী! এ কাজ তুমি ভাল কর নাই। দেখিতেছ, এখন আমার কিরূপ দুঃসময়; এ সময় কি কোন মূল্যবান দ্রব্য কিনিতে আছে?"

দুই একদিনে নবীন জানিতে পারিলেন যে, হিরণ্ময়ী সে সাড়ি ক্রয় করে নাই। বোকেন্দ্র তাঁহাকে সেই সাড়ি দিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী! আর আমার সহ্য হয় না। পিতৃ-অভিশাপ এইবার ফলিল, তুমি এই মুহূর্ত্তে ও সাড়ি ফিরিয়া দাও।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"আমি একদিন একদিন গঙ্গাস্নান করিতে যাই। যখন আমি গাড়িতে চড়ি, তখন আমার রূপ দেখিয়া রাস্তায় কাতার দিয়া লোক দাঁড়ায়। সে সময় সামান্য একখানি বিলাতি কাপড় পরিয়া আসিতে আমার লজ্জা করে। তুমি আমাকে এইরূপ একখানি বোম্বাই সাড়ি কিনিয়া দাও, তাহা হইলে এখনি আমি বোকেন্দ্রর সাড়ি ফিরিয়া দিতেছি।"

নবীন আর কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার মনে বড় ধিক্কার জন্মিল। এইবার সংসারের প্রতি তাঁহার ঘৃণা হইল। এখন কেবল সুধীরের জন্য তিনি সংসারে রহিলেন। সুধীর একটু সুস্থ হইলে, তাহাকে লইয়া অতি দূরদেশে গিয়া একবারে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন, মনে মনে এই সংকল্প করিলেন। হিরণ্ময়ী গুপ্তভাবে বোকেন্দ্রের নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। দুই তিনদিন তাঁহার সহিত গাড়ি চড়িয়া সহরে বেড়াইতেও গিয়াছিলেন।

৫। সুধীর।

সুধীরের পীড়া উপশম হইল না। সুধীর ক্রমে নির্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল। নবীন দেখিলেন যে, সুধীরের আর রক্ষা নাই। সুধীরের শোকে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন।

একদিন প্রাতঃকালে সুধীর বলিল,—"বাবা, আজ আর তুমি বাহিরে যাইও না। আজ আমার শরীর ভাল নাই। বুকের ভিতর কিরূপ করিতেছে। প্রাণ ভরিয়া আমি নিশ্বাস লইতে পারিতেছি না।"

নবীন দেখিলেন যে, সুধীরের আসন্নকাল উপস্থিত। চক্ষের জল কোনও-রূপে সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"না বাবা! আজ আমি বাহিরে যাইব না। আজ আমি তোমার কাছে বসিয়া থাকিব। সুধীর, বাবা, তোমার কি কিছু খাইতে সাধ হয়? কুপথ্যই হউক আর সুপথ্যই হউক, আজ তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে খাইতে দিব।"

সুধীর উত্তর করিল,—"না বাবা, আর আমার কোনও জিনিস খাইতে সাধ নাই। যখন বৈদ্যের ঔষধ খাইতেছিলাম, তখন, বাবা, বড় ক্ষুধা ছিল। একদিন পেট ভরিয়া ভাত খাইতে তখন বড় সাধ হইত। এখন আর সে ক্ষুধা নাই, সে সাধ নাই। পোরে করিয়া তোমরা আমাকে দুটী ভাত রাঁধিয়া দিতে। তাহাতে বাবা, আমার পেট ভরিত না, কিছুই হইত না। সব ভাত কটী খাইয়া পাতের চারিদিক খুঁজিয়া দেখিতাম, যদি একটীও ভাত কোথাও পড়িয়া থাকে।

কোনও দিন একটী আধটী পাইতাম, কোনও দিন, বাবা, একবারেই পাইতাম না। পাথরটী আঙুল দিয়া কতবার চাটিতাম। খাওয়া হইয়া যাইলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত পাতের নিকট বসিয়া থাকিতাম, পাত ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করিত না।"

মায়ের পানে চাহিয়া পুনরায় সুধীর বলিলেন,—"মা, তুমি একটু ওঘরে যাও, বাবার সঙ্গে আমার চুপি চুপি কথা আছে। তুমি এখানে থাকিলে আমি বলিব না।"

হিরণ্ময়ী অন্য ঘরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবীন তাঁহাকে বলিলেন,—"যাও, এখনি ওঘরে যাও। এ সময় সুধীরের বাক্য শুনিবার তুমি উপযুক্ত পাত্রী নও।" হিরণ্ময়ী উঠিয়া অপর ঘরে যাইলেন। তখন সুধীর বলিল, "বাবা! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি কি এই মায়ের পেটে জন্মিয়াছি?"

নবীন উত্তর করিলেন,—"হাঁ, বাবা, উনিই তোমার গর্ভধারিণী।"

সুধীর বলিল,—"তবে, বাবা, আমার মা অমন কেন? আর আর ছেলেদের মা তো এরূপ নয়! মা মা বলিয়া আর সব ছেলেরা যখন বাড়ী যায়, তখন তাদের মায়েরা তাদের কত আদর করে। তাদের মায়েরা তাদের কোলে করিয়া কত মিষ্ট কথা বলে। আমার মা আমাকে কেবল দূর-ছাই করেন। আমি মনে করি, আমি বুঝি দুষ্ট ছেলে, ভাল ছেলে নই, তাই আমি মায়ের আদর পাই না। তা, বাবা, আমি তো কখনও কোন দোষ করি নাই। তোমরা যা বল, তাই তো আমি শুনি। ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা তো আমাকে খুব ভাল বাসিতেন। তুমি তো আমাকে খুব ভালবাসো। আর সকলে তো আমাকে খুব ভালবাসে। কেবল মা-ই কেন আমাকে ভালবাসেন না? সেই পোরের ভাত যখন ফুরাইয়া যাইত, পাত ছাড়িয়া যখন যাইতে মায়া হইত, পাতের নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতাম, তখন মা আসিয়া আমাকে মারিতেন। দেখ দেখি বাবা, আমার শরীরে এখন আর কি আছে? হাড় কয়খানি কেবল একটু চামড়া দিয়া ঢাকা আছে। ইহার উপর, মা আমাকে মারিতেন, আমার হাড়ে বড় লাগিত। এক এক দিন, মা আসিয়া জোর করিয়া আমাকে নড়া ধরিয়া তুলিতেন। তিন চারিদিন আমার হাতে ব্যথা থাকিত। সে সব কথা মনে করিলে, বাবা, কান্না পায়।"

সুধীর কাঁদিতে লাগিল। নবীনও কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া নবীন বলিলেন,—"সুধীর! চুপ কর, আর কাঁদিও না। যাহাতে তোমাকে আর কখনও কেহ না মারে, তাহা আমি করিব।"

সুধীর একটু হাসিয়া বলিল,—"পাঁচ বৎসর পার হইয়া আমি এই ছয় বৎসরে পড়িয়াছি বুঝি? কিন্তু বাবা আজ আর আমি ছেলে মানুষ নই। মা আর আমাকে মারিবেন না, তাহা আমি জানি। কেন, তাও জানি। আজ আমার কত-কি মনে আসিতেছে। চক্ষু বুজিলে আজ আমি কত-কি দেখিতেছি। রও, একবার চক্ষু বুজি। কি দেখি, তোমাকে বলি।"

সুধীর চক্ষু বুজিল ও মুদিত চক্ষে পিতাকে বলিতে লাগিল,—"সুন্দর লোক সব দেখিতে পাইতেছি। পুরুষ মানুষ, মেয়ে-মানুষ, ছেলে, মেয়ে, কত! আহা! ইঁহারা কি সুন্দর দেখিতে! ইঁহাদের মুখে কি মধুর হাসি! সূর্য্যের মত ইঁহাদের রূপ, তবে চাহিয়া দেখিতে পারা যায়। ইঁহাদের দেখিলে মনে সুখ হয়। ইঁহারা হাসিয়া হাসিয়া আমাকে আদর করিয়া ডাকিতেছেন। ইঁহাদের কাছে যাইতে আমার বড় সাধ হইতেছে। উনি কে? ঐ সুন্দর পুরুষ? আপনার নাম নিধিরাম? নিধিরাম কে, বাবা? নিধিরামের কথা তো কখনও শুনি নাই। নিধিরাম কে, জানি না। কিন্তু উনি আমাকে বড়

ভালবাসেন, কোলে লইবার নিমিত্ত হাত বাড়াইতেছেন। আবার ইনি কে? বাবা, ইনি আমার ঠাকুরদাদা, ওঁর নাম এককড়ি, তোমার নিকট যাঁহার গল্প শুনিয়াছিলাম। যিনি মরিয়া গিয়াছেন। আমার দিদিমাও এঁর সঙ্গে আসিয়াছেন। আর বাবা আমার সেই ছোট মামাটী দিদিমার কোলে রহিয়াছে। আমাদের বাড়ীর সেই ঠাকুরদাদা ঠাকুর-মাকেও দেখিতেছি। আমাকে কোলে লইয়া আদর করিবার নিমিত্ত সকলে এখানে আসিয়াছেন। এঁরা সব মরিয়া গিয়াছেন। দেখ দেখ, বাবা, তুমিও ঐ একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছ। আর সকলে হাসিতেছেন, আর সকলে মনের সুখে আছেন। তুমি কেন ঘাড় হেঁট করিয়া অত দূরে দাঁড়াইয়া আছ? আমার মা কৈ? আমার মাকে তো ইঁহাদের ভিতর দেখিতেছে না? নিধিরাম আমাকে ডাকিতেছেন। বলিতেছেন, আমার সঙ্গে একটু এস। নিধিরাম আমাকে কোলে লইলেন। আমাকে কোলে লইয়া উড়িয়া চলিলেন। এ আবার কোথায় আসিলাম? এখানে দেখিতেছি সব অন্ধকার, এখানে ভয়ানক দুর্গন্ধ, এখানে কে কাহাকে মারিতেছে? এখানে সব লোক কাঁদিতেছে। ও কে? ঐ পিশাচী, রাক্ষসী! যাহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া আমার প্রাণে বড় ভয় হইতেছে? বাবা গো! পিশাচী, রাক্ষসী, আমার মা!"

ভয়ানক চীৎকার করিয়া সুধীর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দাঁত-কপাটি ভাঙ্গিয়া, বাতাস করিয়া, মুখে জল দিয়া নবীন তাহার চেতন করিলেন। কিন্তু সুধীরের নিশ্বাস লইতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সুধীরের প্রাণ-বায়ু ক্রমেই ফুরাইয়া আসিল।

সুধীর বলিলেন,—"বাবা! আর কথা কহিতে পারি না। হাঁপ লাগিতেছে। আর একটি কথা তোমাকে বলি, তারপর ঘুমাইব। দেখ, বাবা, নদীর জল যেমন বহিয়া যায়, আমার প্রাণটী যেন সেইরূপ কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নদীর জল ফুরায় না, কিন্তু আমার প্রাণটী শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে। তাহাতে, বাবা, কোনও অসুখ নাই। সর্বশরীরে যেন বেশ সুখ পাইতেছি! আমি একটু ঘুমাই। ভাল করিয়া আমাকে শোয়াইয়া দাও।"

সুধীর ভাল করিয়া শুইল, আর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ক্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাস হীনবল হইয়া আসিল। অবশেষে শিশুর প্রাণবায়ু একেবারে ফুরাইয়া গেল। তখন নবীন সুধীরকে কোলে তুলিয়া লইলেন। নবীনের অশ্রুধারায় সুধীরের সর্বশরীর ভিজিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নবীন সুধীরকে আপনার বুকে তুলিয়া লইলেন। প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে নিজেই দাহ করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল একটী প্রতিবাসী ছিল।

৬। পরিণাম।

পুত্রশোকে হিরণ্ময়ী ঘরে খাটের উপর শুইয়া আছেন। কাপড় দিয়া চক্ষু মুছিতেছেন। চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই। কেবল কাপড় দিয়া মুছিয়া মুছিয়া চক্ষু দুইটী একটু রক্তবর্ণ করিয়াছিলেন। তাহা না করিলে লোকে কি বলিবে? এই সময়ে বোকেন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোকাকুলা হিরণ্ময়ীকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন, নানারূপ সদুপদেশ দিলেন।

বোকেন্দ্র বলিলেন,—"এই সংসার অনিত্য। মৃত্যু সকলের হইবে, মৃত্যুর হাত কেহই এড়াইতে পারিবে না। সেজন্য শোক করা বৃথা। এই সংসারে ধর্মই হইল

মনুষ্যের সহায়। ধর্ম বিনা মনুষ্যের আর অন্য গতি নাই। সে নিমিত্ত আমোদে প্রমোদে যতই ভুলিয়া থাকা যায়, ততই ভাল।"

ধর্ম-কথা হইয়া যাইলে তাহার পর বোকেন্দ্র কিঞ্চিৎ পবিত্র প্রেমের কথা পাড়িলেন। সঙ্গে ফুল আনিয়াছিলেন, সেইগুলি মনের সাধে হিরণ্ময়ীকে পরাইলেন। সেই ফুল পরিয়া হিরণ্ময়ীর রূপে দশ দিক আলোকিত হইল। বোকেন্দ্র হিরণ্ময়ীর রূপ গুণের বার বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর মুখে পুনরায় হাসির উদয় হইল। মনের সুখে হিরণ্ময়ী বোকেন্দ্রর নিকট ধর্ম-কথা ও পবিত্র প্রেম-কথা শুনিতে লাগিলেন।

বিদায় হইবার পূর্বে বোকেন্দ্র বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি! পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, সংসার অনিত্য। ঈশ্বরের লীলা বুঝা ভার। তোমার রূপে গুণে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাকে নিজস্বভাবে না পাইলে আমি কিছুতেই সুখী হইব না। এক্ষণে তুমি বিধবা হও, এই আমার প্রার্থনা। বিধবাবিবাহের আমি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হইলে সমাজ সংস্কার হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সমাজ একেবারে উৎসন্ন যাইতেছে। সেইজন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তুমি শীঘ্র বিধবা হও। তোমাকে বিবাহ করিয়া দেশে আমি সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। তুমি এক কর্ম করিবে। কাগজের ভিতর এই যে শুভ্রবর্ণ চূর্ণটী দেখিতেছ, ইহার একটু একটু প্রতিদিন নবীনবাবুকে খাওয়াইবে। তাহা হইলে তোমার ও আমার বিশেষ মঙ্গল হইবে। ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া, নাচিয়া, গাইয়া, চিরকাল, আমরা আমোদ-প্রমোদে কাটাইব।"

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন। শুভ্রবর্ণ সেই চূর্ণের কাগজটী হাতে লইলেন। বোকেন্দ্র চলিয়া যাইলে কিছুক্ষণ পরে সেই প্রতিবাসী অজ্ঞান অচেতন নবীনকে পাল্কি করিয়া বাটী আনিলেন। চিতায় আগুন দিয়া ঘাটে নবীন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। এখনও নবীনের জ্ঞান হয় নাই। সেই প্রতিবাসী ডাক্তার আনিয়া দিলেন। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী ঔষধের সহিত সেই শুভ্রবর্ণ চূর্ণের কিয়দংশ মিশ্রিত করিয়া নবীনকে সেবন করাইতে লাগিলেন। তিন দিন পরে নবীনের সংজ্ঞা হইল। জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু নবীন ডাক্তারের নিকট অন্যপ্রকার নানারূপ অসুখের পরিচয় দিতে লাগিলেন। দুই এক দিন নবীনের কথা শুনিয়া ও অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া ডাক্তারের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। নবীন যে ঔষধ খাইতেছিলেন, তাহার কিয়দংশ তিনি বাটী লইয়া যাইলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে শঙ্খবিষ মিশ্রিত রহিয়াছে। ডাক্তারখানায় ভ্রমক্রমে এই বিষ ঔষধের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে কিনা, সেই সন্ধান করিলেন। জানিতে পারিলেন যে, ডাক্তারখানায় ভুল হয় নাই।

এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি নবীনের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন যে, নবীনের মৃত্যু হইয়াছে। নবীনের মৃতদেহটী একঘরে পড়িয়া রহিয়াছে। অপর একটী ঘরে হিরণ্ময়ী ও বোকেন্দ্র ধর্মবিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। ডাক্তার সেই ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"পাপিয়সি! তুই তোর স্বামীকে বধ করিয়াছিস্। আর, তুই দুরাচার! তাহার সহায়তা করিয়াছিস্! রও, এখনি পুলিশ ডাকিতেছি। তোদের দুইজনকে যতদিন না ফাঁসিকাঠে ঝুলাইতে পারি, ততদিন আমার শান্তি নাই।"

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী ও বোকেন্দ্রর সুখস্বপ্ন ভাঙিগয়া গেল, তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। বোকেন্দ্রের শরীর শিহরিয়া উঠিল। ছাতে উঠিবার নিমিত্ত সেই ঘরের নিকট সিঁড়ি ছিল। তাড়াতাড়ি ছাতে উঠিয়া পলাইবার আশায় বোকেন্দ্র ছাত হইতে লাফ দিল। বোকেন্দ্রের দুইটী পা ভাঙিগয়া গেল। বোকেন্দ্র সেই স্থানে

পড়িয়া রহিল। ডাক্তার পুলিশ ডাকিয়া আনিলেন। পুলিশ আসিয়া বোকেন্দ্রকে হাসপাতালে লইয়া যাইল। চারি দিন পরে হাঁসপাতালে বোকেন্দ্রের মৃত্যু হইল।

হিরণ্ময়ীকে পুলিসে ধরিল। মোকদ্দমা হইল। স্বামী হত্যা অপরাধে হিরণ্ময়ী যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হইল। হিরণ্ময়ীর সুখের শরীর। কারাগারের কঠিন পরিশ্রম সে করিতে পারিবে না। দ্বীপ রক্ষার নিমিত্ত গোরাবারিক আছে। কর্মচারীরা কৃপা করিয়া হিরণ্ময়ীকে সেই গোরাদিগের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করিল। গোরাদিগের পরিচর্য্যায় সে জঘন্য পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং এখন তাহাকে অপরাপর কয়েদিন মত কঠিন পরিশ্রম করিতে হইল। পাঁচ বৎসর হিরণ্ময়ী কয়েদ খাটিল। কয়েদ খাটিয়াও অহরহ প্রহরীদিগের বেত খাইয়া হিরণ্ময়ীর সে রূপের আর চিহ্নমাত্রও রহিল না। পাঁচ বৎসর পরে কারাগারের অধ্যক্ষ সাহেব কতকগুলি কয়েদি ও কয়েদিনীদিগের বিবাহ দিবার মানস করিলেন। একদিকে সারি সারি পুরুষ কয়েদি দাঁড় করাইলেন, অপরদিকে স্ত্রী কয়েদি দাঁড় করাইলেন। সাহেব বলিলেন,—"যাহার যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার গিয়া হাত ধর।" একজন কাফ্রি আসিয়া হিরণ্ময়ীর হাত ধরিল। এখানকার বিবাহের এই রীতি, মন্ত্র তন্ত্র আর কিছুই পড়িতে হয় না। সেই দিন হইতে হিরণ্ময়ী কাফ্রির পত্নী হইল। দুইজনে একসঙ্গে কয়েদ খাটিতে লাগিল।

অল্পদিন পরে স্ত্রীর সতীত্ববিষয়ে কাফ্রির মনে সন্দেহ হইল। কাফ্রি হিরণ্ময়ীকে উঠিতে বসিতে প্রহার করিতে লাগিল। কাফ্রির প্রহারে হিরণ্ময়ীর শরীর জ্বর জ্বর হইল। দিবারাত্রি প্রহার করিয়াও কিন্তু কাফ্রির মনে শান্তি হইল না। স্ত্রী লইয়া সে একখানি ছোট নৌকাতে উঠিল। নৌকাখানি অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল। কাফ্রি মনে করিয়াছিল যে, নৌকাখানি ভাসিতে ভাসিতে হয় ব্রহ্মদেশে, না হয় ভারতবর্ষের কোনও স্থানে গিয়া লাগিবে। পর্বত সমান তরঙ্গের উপর নৌকাখানি নাচিতে নাচিতে চলিল। কোন্‌দিকে যাইতেছে কাফ্রি তাহার কিছুই জানে না। এইরূপে আট দিন কাটিয়া গেল। অনাহারে ও তৃষ্ণায় দুইজনেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। নবম দিনের রাত্রিতে নৌকাখানি তরঙ্গ তাড়নায় সবলে ভূমিতে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অতি ক্লেশে কাফ্রি ও হিরণ্ময়ীর প্রাণ বাঁচিল। দুইজনে গিয়া উপরে উঠিল। দেখিল যে, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, মনুষ্যের বসবাস নাই। ফলকথা, নৌকাখানি ব্রহ্মদেশ কি ভারতবর্ষে না গিয়া সেই আন্দামান দ্বীপের আর একধারে গিয়া পড়িয়াছিল। আন্দামান দ্বীপের যেধারে কারাগার আছে, সেই ধারে কেবল বসতি। দ্বীপের অবশিষ্ট অংশ ঘোর জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলে খর্বকায় কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ একপ্রকার অসভ্য জাতি বিচরণ করে। প্রাতঃকাল হইলে তাহাদের একদল কাফ্রি ও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কাফ্রির প্রাণ বধ করিয়া হিরণ্ময়ীকে ধরিল। বোতলকুচি দিয়া প্রথমে তাহারা হিরণ্ময়ীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল, তাহার পর গেরিমাটি গুলিয়া তাহার সর্বশরীরে লেপন করিল, অবশেষে কাপড় ফেলিয়া দিয়া তাহার কোমরের চারিদিকে কেয়াপত্র পরাইল। এইরূপ বেশভূষা হইলে, কে হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিবে, এই কথা লইয়া অসভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। পরস্পরের বিবাদ নিবারণের নিমিত্ত অবশেষে তাহারা সকলেই হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিল। হিরণ্ময়ী পঞ্চাশজন অসভ্যের ধর্মপত্নী হইল। গোরা বারিকে থাকিতে হিরণ্ময়ীর যে পীড়া হইয়াছিল, অসভ্যদিগের মধ্যে কখনও সে পীড়া ছিল না। হিরণ্ময়ী আগমনে তাহাদের মধ্যে এক্ষণে সেই পীড়ার আবির্ভাব হইল। অপর স্থানে এ পীড়া সাংঘাতিক নয়, কিন্তু অসভ্য শরীর এরূপ গঠিত যে, সেই পীড়াবশতঃ তাহারা পট পট মরিয়া যাইতে লাগিল।

একসময়ে আন্দামান দ্বীপের নিবিড় অরণ্য এই অসভ্যজাতিতে পরিপূর্ণ

আমার সেই অমূল্য মণি

প্রথম পরিচ্ছেদ : কি সুন্দর চুল

"তাই আনিয়াছ তো, আমার সেই অমূল্য মণি ?"

তুষার-আচ্ছাদিত মানসসরোবর মাঝে নীলপদ্মসম চক্ষু দুইটী ঈষৎ বাঁকাইয়া যখন হরিমতী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পারিজাতবনবিহারিণী-দেবকামিণীকুলনিন্দিত তাঁহার সেই অপূর্ব রূপ দেখিয়া মাধবের নয়ন সার্থক হইল। হরিমতীকে বালিকা বলিলেও চলে। বয়স কেবল চৌদ্দ বৎসর। তবে এক স্বামী ভিন্ন হরিমতীর পৃথিবীতে আর কেহ নাই। স্বামী নীলমাধবেরও পৃথিবীতে কেহ নাই। সুতরাং ভয়, লজ্জা, ঘোমটা, সে সব রাখিলে হরিমতীর চলে না। তাই তিনি সোহাগে স্বামীর স্কন্ধের উপর মাথাটী রাখিয়া চক্ষু দুইটী ঈষৎ বাঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার সেই অমূল্য মণি আনিয়াছ তো ?"

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গণ্ডদেশ হইতে লাল আভা যেন ফাটিয়া পড়িতেছে ঠোঁট দুইখানি যেন আলতা দিয়া কে সদ্য রঞ্জিত করিয়াছে, টানা-টানা ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটী যেন ঢল ঢল করিতেছে—ফল কথা হরিমতীর রূপমাধুরি-বর্ণনা করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। তাহার পর হরিমতীর চুল! এমন চাঁচর চিকুর নিবিড় নব মেঘের ন্যায় কেশ তো কখন দেখি নাই! তখনও হরিমতীর চুল বাঁধা হয় নাই। বাদল হইয়াছে, চুল তখনও শুষ্ক হয় নাই। মন্দ মন্দ মলয়া-মারুত সমুদ্রবক্ষে ক্রীড়া করিলে যেরূপ ঈষৎ তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেরূপই তরঙ্গের ন্যায় হরিমতীর চুলগুলি পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে এলোথেলো হইয়া দোলায়িত হইতেছিল।

এক কোষা কেশ হাতে লইয়া নীলমাধব বলিলেন,—"কি সুন্দর চুল! বিধাতা কি তোমাকে একেবারে নিখুঁত করিবার জন্য অবশেষে এই কেশরাশি দিলেন ?"

হরিমতী বলিলেন,—"যাও! মিছা বকিও না। যদি তুমি রাত্রিদিন আমার চুলের প্রশংসা কর, তাহা হইলে গরবে আমার আর মাটিতে পা পড়িবে না। আর এই চুলের কথা বলিতেছ, এ কাহার কৃপায় আমি পাইয়াছি ? তোমার কৃপায় নয় ? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আমার সে অমূল্য মণি আনিয়াছ ?"

নীলমাধব ও হরিমতী কলিকাতায় বাস করেন। নীলমাধব পূজার বাজার করিতে গিয়াছিলেন। একটী গাঁঠরি করিয়া নানাবিধ সামগ্রী আনিয়াছেন। ঘরে আসিয়া গাঁঠরিটী বিছানার উপর রাখিয়াছেন, সেই সময় স্ত্রী পরুষে এই-রূপ কথোপকথন।

নীলমাধব বলিলেন,—"তোমার সে অমূল্য মণি আনিয়াছি কিনা, গাঁঠরি খুলিয়া দেখনা কেন।"

হরিমতী তাড়াতাড়ি গাঁঠরি খুলিলেন। বহুমূল্য সাড়ি জামা প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া হরিমতী গাঁঠরির ভিতর হইতে একটী শিশি অতি যত্নে তুলিয়া লইলেন। কাগজের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। শিশির ভিতর হইতে লালবর্ণ তরল পদার্থের আভা বাহির হইতে লাগিল। বোধ হয় কোনওরূপ

তৈল। তাহাই কি হরিমতীর অমূল্য রত্ন? হাঁ তাহাই বটে। এ সম্বন্ধে কিছু রহস্য আছে। পাঠকের কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত আমাদের এস্থানে গল্পটী করিতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাঘবের পুত্রবধূ

হরিমতীর মাতুলের নাম রাঘব চক্রবর্ত্তী। ঠিক আপনার মামা নয়, কিছু দূর সম্পর্ক। রাঘব চক্রবর্ত্তীর বাস পল্লীগ্রামে ছিল। তিনি নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন না। মোকদ্দমা লইয়া সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। একবার একটী মোকদ্দমায় পড়িয়া তিনি সর্বস্বান্ত হন। তাঁহার ভিটাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। তখন রাঘবের বয়স প্রায় ষাটি বৎসর।

যাহা হউক, রাঘবের বিশেষ কোনরূপ সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ছিল না। বহুকাল তাঁহার গৃহ শূন্য হইয়াছিল। রাঘবের পরিবারের মধ্যে ছিলেন কেবল এক পুত্র। তাঁহার নাম গোপীকৃষ্ণ। গোপীকৃষ্ণ শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। শ্বশুর নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার দুই চারি বিঘা ভূমি ছিল। সেই ভূমি কর্ষণ করিয়া গোপীকৃষ্ণ জীবিকানির্বাহ করিতেন। সর্বস্বান্ত হইয়া, এক মুষ্টি অন্নের জন্য রাঘব বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের শ্বশুরালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপীকৃষ্ণ রাঘবেরই তো বেটা। পিতৃভক্তি অপেক্ষা স্ত্রীভক্তি তাঁহার মনে কিছু প্রবল ছিল। বাপকে দেখিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি যদি একগুণ জ্বলিলেন, তাঁহার গৃহিণীটী দশগুণ খরতর কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূর মনের ভাব রাঘব বিলক্ষণ বুঝিলেন। নিরুপায় হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধের কিন্তু আর লাঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না। পুত্র ও পুত্রবধূর ঘরে তাঁহাকে ঠিক চাকরের মত থাকিতে হইল। তাহার উপর গঞ্জনা, পুত্রটী বিশেষ কিছু বলেন না, কিন্তু পুত্রবধূর এক একটী কথা যেন এক একটী শক্তিশেল। সেই দারুণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক দিন বৃদ্ধকে ভাত ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া যাইতে হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারিকেল নাড়ু

পূজার সময় আসিল। জমি জোত ছাড়া গোপীকৃষ্ণ শ্বশুরের আর একটী বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন। পূজার সময় তিনি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের কোন কোন বড় লোকের নিকট হইতে কিছু কিছু বার্ষিক পাইতেন। গোপীকৃষ্ণ সেই বার্ষিকের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু গোপীকৃষ্ণের পূজার খরচ ছিল না। এক খানি প্রতিমা, দুই ঝুড়ি ফুল বিল্বপত্র, কতকগুলি নারিকেল নাড়ু আর দুইটী ঢোল, ইহাতেই যা খরচ।

এবার পিতা ঘরে। এই সমারোহ ব্যাপারে পিতাকে তিনি কর্ত্তা করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইল। কতকগুলি নারিকেল নাড়ু বাঁচিয়া রহিল। দশমীর দিন কর্ত্তাটী এক পেট নারিকেল নাড়ু খাইলেন। পুত্রবধূ তাহা জানিতে পারিয়া রাঘবকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, আর বলিলেন,—"এ আমার বাপের বাড়ী। এস্থানে তোমার কোন অধিকার নাই। শীঘ্রই তুমি অন্যত্র গমন কর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সিঙ্গনের খোঁচা

চক্ষু মুছিতে মুছিতে রাঘব গিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া আপনার দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে লাগিলেন। রাঘব ভাবিলেন যে,—"টাকাই হইল সকল সুখের মূল। যাহার টাকা আছে, তাহার সব আছে, যাহার টাকা নাই, তাহার কিছুই নাই। হে নারায়ণ! আমাকে কিছু টাকা দাও, যে এ দুষ্টপুত্র ও পুত্রবধূর তাড়না হইতে আমি নিষ্কৃতি পাই।" ভগবানের কি কৃপা! রাঘবের সেই কাতরোক্তি শুনিয়া নারায়ণ স্বয়ং গরুড়ে চড়িয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। চমকিত হইয়া রাঘব আস্তেব্যস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। নারায়ণ বলিলেন,—"রাঘব চক্রবর্ত্তী! যথা অভিষ্ট বর প্রার্থনা কর।" রাঘব উত্তর করিলেন,—"ঠাকুর! যদি আমার প্রতি কৃপা করিলেন, তবে আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করুন।" নারায়ণ বলিলেন,—"এই গরুড়ের পা ভাল করিয়া ধর। কলিকাতার টাকশালে গিয়া তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিব।" রাঘব গরুড়ের পা ভাল করিয়া ধরিলেন, গরুড় আকাশপথে উড়িল। নিমিষের মধ্যে কলিকাতার টাকশালে গিয়া উপস্থিত হইল। রাশি রাশি টাকা দেখিয়া রাঘব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—"রাঘব! যত পার টাকা লও, তাহার পর পুনরায় গরুড়ের পদদ্বয় ধারণ কর। শীঘ্র শীঘ্র স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইবে।" রাঘব গামছায় বাঁধিয়া ও কোঁচড়ে করিয়া অনেক টাকা লইলেন। টাকা লইয়া গরুড়ের পা ধরিলেন, আর বলিলেন,—"ঠাকুর চলুন! টাকা লইয়াছি।" গরুড় পাখা নাড়িয়া উড্ডীয়মান হইবার উপক্রম করিল। কিন্তু টাকার ভয়ে একেবারে অধিক উপরে উঠিতে পারিল না। প্রায় ছয় সাত হাত উপরে উঠিয়াছে, এমন সময় পাহারাওয়ালা শাস্ত্রি জানিতে পারিল যে, কে টাকা লইয়া পলাইতেছে। সিঙ্গনসংযুক্ত বন্দুক ঘাড়ে করিয়া শাস্ত্রি সে স্থানে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু চোর ধরিতে পারিল না। চোর তখন মাথার উপর ছয় সাত হাত উচ্চে গরুড়ের পা ধরিয়া ঝুলিতেছে। বন্দুক উত্তোলন করিয়া শাস্ত্রি রাঘবের গায়ে সিঙ্গনের খোঁচা মারিতে লাগিল। রাঘব তখন কাতর স্বরে নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর সিঙ্গনের খোঁচায় আমার প্রাণ যায়।" নারায়ণ বলিলেন, "সেপাহির মস্তকে তুমি বহির্দ্দেশ-গমন করিয়া দাও।" রাঘব বহির্দ্দেশ গমন করিতে লাগিলেন। এ কার্য্যে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ হইতে লাগিল।

নিকটস্থ একটী ঘরে রাঘবের পুত্র ও পুত্রবধূ শয়ন করিয়াছিলেন। সেই শব্দে পুত্রবধূর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, শ্বশুর বিছানায় এক ঝুড়ি বহির্দ্দেশ গমন করিয়াছেন। শ্বশুরকে তিনি যাহা বলিলেন তাহার উল্লেখের আবশ্যক নাই। "ভিক্ষা করিয়া খাই সেও ভাল, তবু আর এখানে থাকিব না।" এই বলিয়া রাঘব সেই রাত্রিতেই সে বাটী পরিত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, টাকশালের ঘটনাটী রাঘব স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : রাঘবের টাকা

পথে যাইতে যাইতে রাঘবের মনে পড়িল যে, দূর সম্পর্কীয় তাঁহার এক জন ভগিনী কলিকাতায় বাস করেন। কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগিনীও দীন দুঃখিনী, দুই বৎসরের একটি শিশুকন্যা লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছেন। তাঁহার শিশু-কন্যার নাম হরিমতী। আমাদের সেই অমূল্য

রঙ্গের হরিমতী। যাহা হউক, রাঘব চক্রবর্ত্তী ভগিনীর ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। এখন পুরোহিতের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক ও সরস্বতীর প্রতি যাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, তাঁহাদের যাজনক্রিয়া করিয়া বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জন হইল। রাঘব চক্রবর্ত্তীর হাতে দিন দিন পয়সা জমিতে লাগিল। পুরোহিতগিরি ছাড়া, তিনি ঘটকালির কাজও আরম্ভ করিলেন। একজন বংশজ ব্রাহ্মণের সহিত একটী কাওরা-কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া বিলক্ষণ দশ টাকা পাইলেন। তাহার পর বাটীর দালালি আরম্ভ করিলেন। আবার সোণা রূপা গহনার দোকানও করিলেন। ফল কথা, রাঘব চক্রবর্ত্তী এই বৃদ্ধ বয়সে একজন অর্থশালী লোক হইয়া উঠিলেন। নারায়ণ তাঁহার সহিত নিদ্রাবস্থায় যে খেলা খেলিয়াছিলেন, আজ জাগ্রত অবস্থায় সেই খেলা প্রকৃত প্রস্তাবে খেলিয়া দিলেন। সকল কালে সকল স্থানে অর্থবান লোকের আদর হইয়া থাকে। পুত্র ও পুত্রবধূ এখন রাঘবকে সোণার চ'ক্ষে দেখিতে লাগিলেন। দেশ হইতে কলাটা মূলাটা আখটা গুড়টা সর্বদাই আসিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেন। রাঘব উপহার-গুলি লইতেন, আর মনে মনে হাসিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ নেড়া মেয়ে

হরিমতীর যখন সাত বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। হরিমতীর সংসারে আর কেহ ছিল না। কাজেই তাঁহাকে রাঘবের নিকট থাকিতে হইল। সত্য কথা বলিতে কি, রাঘব হরিমতীকে একটু স্নেহ করিতেন। ধীর, শান্ত, কথার বশ, মেয়েটীকে যে দেখিত সেই ভালবাসিত। হরিমতী রাঘবের সকল কাজ করিতেন, রাঘব তাঁহাকে দুই বেলা দুইটী করিয়া খাইতে দিতেন, আর আপনার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়গুলি পরিতে দিতেন। সেই মলিন বেশেও হরিমতীর রূপে জগৎ আলো করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হরিমতীর মাথায় এক গাছিও চুল ছিল না। "কেশেই বেশ," অতুল সুন্দরী হইলে কি হইবে, এক চুল অভাবে হরিমতীর সব বৃথা হইয়াছিল। হরিমতীর ক্রমে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল, বিবাহের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তবুও রাঘব তাঁহার বিবাহের নাম করেন না। বিবাহ দিতে টাকা খরচ হইবে, সে এক কথা। তাহার পর হরিমতী যাইলে তাঁহার সেবা করে কে? সে গেল দ্বিতীয় কথা। পাড়া প্রতিবাসী হরিমতীর বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে, তিনি বলিতেন,—"ওর মাথায় চুল নাই, নেড়া মেয়েকে কে বিবাহ করিবে?"

তাঁহার একথা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। সেই নেড়া বালিকাকে বিবাহ করিবার জন্য অন্ততঃ একটী যুবক রাঘবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই যুবকের নাম নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। নীলমাধব সাহেব উকীলের বাড়ী কর্ম্ম করিতেন। সামান্য বেতন পাইতেন। রাঘব কলিকাতায় একখানি বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, একটী ঘরে আপনি ও হরিমতী থাকিতেন, আর সব ঘরগুলি ভাড়া দিয়াছিলেন। নীলমাধব তাহার একটী ঘরে থাকিতেন। সুতরাং সর্বদাই তিনি হরিমতীকে দেখিতেন। ময়লা কাপড়, মলিন মুখ, মেঘ ঢাকা শশির ন্যায় মেয়েটীকে দেখিয়া তাঁহার মন মোহিত হইয়াছিল। কিন্তু রাঘব চক্রবর্ত্তী বিবাহের কথায় সম্মত হইলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বাবা সন্দেশ খাও

এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল। একদিন হরিমতী আসিয়া নীলমাধবকে বলিলেন,—"মহাশয়! একবার মামাকে দেখিবেন চলুন। তাঁর আজ কয়দিন জ্বর হইয়াছে।"

নীলমাধব রাঘবকে গিয়া দেখিলেন। অতিশয় জ্বর, পেটের দোষও আছে। সেই দিন একবার পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। নীলমাধব বুঝিলেন যে, বৃদ্ধের এবার গতিক ভাল নয়। সে জন্য রাঘবের পুত্র গোপীকৃষ্ণকে তিনি সংবাদ দিলেন। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "বাবা তোমার জন্যে ভাল সন্দেশ আনিয়াছি, সন্দেশ খাও; বাবা, ভাল রসগোল্লা আনিয়াছি, খাও," এইরূপ নানা মিষ্ট বচনে রাঘব চক্রবর্ত্তীর তাঁহারা সমাদর করিতে লাগিলেন।

পীড়ার ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা নীলমাধব রাঘব চক্রবর্ত্তীর নিকট বসিয়া আছেন, তখন সে স্থানে আর কেহ ছিল না।

নীলমাধবকে লক্ষ্য করিয়া রাঘব মৃদু স্বরে বলিলেন,—"খাও বাবা রসগোল্লা খাও। আর বাবা যখন এক মুষ্টি অন্নের জন্য তোমাদের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন বাবাকে দূর দূর করিতে বাকি কর নাই। সেই দিন হইতে উহাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছি। একটী পয়সাও আমি উহাদের দিব না। সব হরিমতীকে দিব।" নীলমাধব বলিলেন,—"উনি আপনার পুত্র, আপনার ভাল মন্দ হইলেই উনি সব দখল করিয়া লইবেন। তখন হরিমতী কোথায় থাকিবে?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "চিরকাল আমি মোকদ্দমা মামলা করিয়াছি। কিসে কি হয় আমি সব জানি। যাহা করিয়াছি তাহা এঘরের ভিতরও রাখি নাই। খিড়কিতে, যে স্থানে পাতকো ছিল, করবী গাছের—না, না, আমি এখন সব বলিব না, আমার সময় হয় নাই, আমি শীঘ্রই ভাল হইব।" সঠিক সংবাদের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া নীলমাধব বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ আর মুখ খুলিলেন না। সেই রাত্রিতেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পুরাতন কূপ

রাঘব চক্রবর্ত্তীর যে দিন মৃত্যু হইল, তাহার পর দিন সন্ধ্যাবেলা নীলমাধব গোপীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, গোপীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্ত্রী ঘর আতিপাতি করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। কোনও স্থানে টাকা কড়ি দেখিতে না পাইয়া অবশেষে ঘরের মেজে খুঁড়িতেছেন। নীলমাধব বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি বৃথা ঘর খুঁড়িতেছেন। আপনার পিতা সমুদয় বিষয় হরিমতীকে দিয়া গিয়াছেন। ঘর খুঁড়িবেন না, যাহা কিছু বাহির হইবে, তাহা হরিমতী পাইবে।" কথায় কথায় দুই জনে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। মারামারি হইবার উপক্রম হইল। হরিমতী দুই জনের মাঝে পড়িয়া ছাড়াইয়া দিলেন। নীলমাধবকে গোপীকৃষ্ণ বাটী হইতে উঠিয়া যাইতে বলিলেন, আর হরিমতীকে সেই দণ্ডেই বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

রাস্তায় দাঁড়াইয়া হরিমতী কাঁদিতে লাগিলেন। একদিন গিয়া যে, কোথায় থাকেন, তাঁহার এমন স্থান ছিল না। দ্বাদশ বৎসরের বালিকা, যৌবনের প্রারম্ভ, রূপে পৃথিবী আলো করিয়া রহিয়াছে। তাহা ব্যতীত এখন আর হরিমতী নেড়া

নাই। কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন কাল চুল এলো থেলো হইয়া ঘাড়ে ও পিঠে পড়িয়াছে। এ সোণার প্রতিমা আজ কোথায় যায়! নীলমাধব আস্তে আস্তে তাঁহার নিকট যাইলেন। গিয়া বলিলেন,—"হরিমতি কাঁদিও না, এখন চল, আমার একটী বন্ধুর বাড়ী গিয়া থাকিবে। তাঁহার পরিবার অতি ভাল লোক। তিনি তোমাকে যত্ন করিয়া রাখিবেন। তাহার পর যাহা ভাল হয়, তাহা করা যাইবে।"

হরিমতীকে বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া নীলমাধব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলেন,—খিড়কিতে, যে স্থানে পাতকো ছিল, করবী গাছের—"রাঘব চক্রবর্তী এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ কি? রাঘব চক্রবর্তীর বাড়ীর আবার খিড়কি কোথায়? বাড়ীর পশ্চাৎদিকে কেবল দুই হাত প্রশস্ত একটী গলি। ইহাই কি খিড়কি? তাহা খিড়কি হইলেও পাতকো কোথায়?"

তাহার পরদিন ঘোর রাত্রিতে, সকলে নিদ্রিত হইলে, নীলমাধব সেই গলির ভিতর গিয়া করবী গাছের নিকট খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক স্থানে পুরাতন একটী পাতকোর চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। পাতকো এখন নাই মাটীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সেই পাতকোর পাট বাহির হইয়া পড়িল। প্রথম পাটের অল্প নিম্নে একখানি টালি দেখিতে পাইলেন। টালিখানি তুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার নীচে একটী টিনের ক্যাশ বাক্স রহিয়াছে। আস্তে আস্তে নীচের বাক্সটী আপনার ঘরের ভিতর আনিয়া লুকাইয়া রাখিলেন।

প্রাতঃকালে বন্ধুর বাটীতে গমন করিয়া নীলমাধব হরিমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হরিমতীকে বলিলেন,—"তোমার আর ভাবনা নাই। আমি গত রাত্রিতে একটী বাক্স পাইয়াছি। সে বাক্স এখনও খুলি নাই। তাহাতে বোধ হয় রাঘব চক্রবর্তীর সমুদয় টাকা কড়ি আছে। সে টাকা কড়ি সমুদয় তোমার। রাঘব চক্রবর্তী মরিবার পূর্বে আমার সমক্ষে তোমাকে সর্বস্ব দিয়া গিয়াছেন। তবে তুমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। কারণ, রাঘব চক্রবর্তী সে কথা কেবল আমার নিকট বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাজের কথা নয়। গোপীকৃষ্ণ জানিতে পারিলে বাক্স তো কাড়িয়া লইবেই; তাহা ছাড়া আমার নামে চুরির নালিশ করিতে পারে।"

হরিমতী বলিলেন,—"মহাশয়! যে কাজের গোপন করিতে হয়, সে কাজ আমি কখনই করিব না। যে টাকা লইলে চুরির নালিশ হয়, সে টাকা আমি লইতে ইচ্ছা করি না।"

নীলমাধব বলিলেন,—"হরিমতী! তুমি বালিকা বটে, তথাপি তোমার নিকট আজ আমি জ্ঞানশিক্ষা করিলাম।"

নবম পরিচ্ছেদ: তাক্ তুড়্ তুড়্ তাক্

যে বন্ধুর বাড়ীতে হরিমতী বাস করিতেছিলেন, নীলমাধব সেই বন্ধুকে ডাকিলেন। আর একজন উকিল বন্ধুকে ডাকিলেন। তাঁহাদিগকে ও পাড়ার আর দুই চারিজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া সেই টিনের বাক্সটী হাতে করিয়া গোপীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। কি করিয়া বাক্স পাইয়াছেন সে সমুদয় কথা তাঁহাকে বলিলেন। "এ বাক্স আমার পিতার" এই কথা বলিয়া গোপীকৃষ্ণ নীলমাধবের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে যাইলেন। নীলমাধব বলিলেন,—"তাহা হইবে না। উপস্থিত এই ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে বাক্স খুলিতে হইবে। ইহাতে

কোন কাগজ পত্র থাকিতে পারে।" গোপীকৃষ্ণ বিদেশী লোক। অগত্যা তাঁহাকে সে কথায় স্বীকার হইতে হইল। নীলমাধব উকিল বাবুর হাতে বাক্সটী দিলেন। সকলে মিলিয়া বাক্সটী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গোপীকৃষ্ণের স্ত্রী বাহির হইয়া বলিলেন,—"বাক্স ভাঙ্গিতে হইবে না। কর্ত্তার কোমরে আমি এই চাবিটী পাইয়াছি। বোধ হয় ইহার চাবি।" তাই বটে! বাক্সটী খোলা হইল। প্রথম কতকগুলি মোহর ও টাকা বাহির হইল। তাহার পর, এক তাড়া নোট বাহির হইল। উকিল বাবু একখানি ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন। তাহার পর কয়খানি কোম্পানীর কাগজ বাহির হইল। সর্বসমেত এক লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি। আর কোনওরূপ কাগজ পত্র বাহির হইল না।

নীলমাধবের দিকে চাহিয়া গোপীকৃষ্ণ বলিলেন,—"কেমন গো! এ সব সম্পত্তি এখন আমার তো? আর তো তোমার কোন কথা নাই?" নীলমাধব উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা না, আমার আর কোন কথা নাই, আপনার পিতার সম্পত্তি। এখন এ সমুদয় আপনার।" এই কথা শুনিয়া গোপীকৃষ্ণ মনের আনন্দে সেই খালি টিনের বাক্সটী বাজাইতে লাগিলেন। হাতে বাজাইতে লাগিলেন আর মুখে বলিতে লাগিলেন,—"তাক্ তুড়্ তুড়্ তাক্ তুড়্ তুড়্ তাক্! তাক্ তুড়্ তুড়্ তাক্ তুড়্ তুড়্ তাক্।" বাজাইতে বাজাইতে দৈবক্রমে বাক্সটী তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। ভূমিতে পড়িয়া বাক্সটী খুলিয়া গেল। বাক্সর একদিকে অতি ক্ষুদ্র একটী বিভাগ লুক্কায়িত ছিল। সেই বিভাগের টিন খণ্ডটুকু খসিয়া পড়িল। তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির হইয়া দূরে পতিত হইল। গোপীকৃষ্ণ সত্বর কাগজখানি তুলিয়া লইয়া উকিল বাবুর হাতে দিলেন,—"এই লউন আর একখানি নোট কি কোম্পানীর কাগজ।"

দশম পরিচ্ছেদ ঃ সুখে ঘর কন্যা

সে কাগজখানি নোটও নয়, কোম্পানীর কাগজও নয়। সে কাগজখানি রাঘব চক্রবর্ত্তীর উইল। হরিমতীকে সমুদয় বিষয় তিনি দিয়া গিয়াছেন, পুত্রকে এক পয়সাও নয়। গোপীকৃষ্ণের তাহার পর কিরূপ আনন্দ হইল, কিরূপ সমারোহের সহিত তিনি বাপের শ্রাদ্ধ করিলেন, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। "তোমরা সব কলিকাতার জুয়াচোর। তোমাদের নামে নালিশ করিব তোমাদের জেলে দিব।" এইরূপ সকলকে ভয় দেখাইয়া তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাঘব চক্রবর্ত্তীর সমুদয় টাকা হরিমতী পাইলেন। কিছুদিন পরে নীলমাধব বন্ধুর বাটীতে গমন করিয়া হরিমতীকে বলিলেন,—"হরিমতী! তুমি এখন আর সে হরিমতী নও। তুমি এখন লক্ষ টাকার অধীশ্বরী। আমি এখন আর তোমার উপযুক্ত পাত্র নই। উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া আমার বন্ধু তোমার বিবাহ দিবেন। আমি আর এ দেশে থাকিব না। চিরকালের নিমিত্ত তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

হরিমতী কোন উত্তর করিলেন না। ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। মুখ তাঁহার মলিন হইয়া গেল। চক্ষু দুইটী তাঁহার ছল ছল করিয়া আসিল। যাঁহার বাটীতে হরিমতী ছিলেন, সেই বাটীর গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া অপর স্বামীকে বলিলেন,—"তোমাদের ও সব রঙ্গ আমার ভাল লাগে না। একটী ভাল দিন দেখ, দুই জনের চারি হাত এক করিয়া দাও।"

বলা বাহুল্য যে, তাহাই হইল। নীলমাধব ও হরিমতী সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোপীকৃষ্ণকে একেবারে বঞ্চিত করিলেন না। স্বইচ্ছায় সমুদয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ তাঁহাকে দিলেন। সেই টাকা পাইয়া তিনি হরিমতী ও নীলমাধবের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে কিছু ফল হইল না ; কেবল যে টাকাগুলি হরিমতী তাঁহাকে দিয়াছিলেন, মোকদ্দমার ব্যয়ে তাহার আর একটী কপর্দ্দকও রহিল না।

হরিমতীর মাথায় এক গাছিও চুল ছিল না। কিন্তু তাহার পর এত নিবিড় কেশরাশি কোথা হইতে আসিল? এতক্ষণ সে কথা বলি নাই। কারণ, কথাটী বড় সামান্য নয়। ভাল ঔষধ পাইলে কেহ কাহাকে বলে না। যাহা হউক, এইবার বলিতে হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ : সে অমূল্য মণির নাম কি?

নীলমাধব সাহেব উকীলের বাড়ী কর্ম্ম করিতেন। হরিমতীর মত সাহেব উকীলের মাথায় চুল ছিল না। টাক পড়িয়া তাঁহার মাথাটী চোস্ত চক্-চকে হইয়া গিয়াছিল। সাহেব রবারের হউক কি চামড়ার হউক একটী স্থূল টুপি পরিতেন। সেই টুপির উপরে এরূপ সুন্দর ভাবে চুল সন্নিবেশিত ছিল যে, মাথায় পরিলে, কাহার সাধ্য বলে যে, সাহেবের মাথায় চুল নাই। ঠিক স্বাভাবিক এক মাথা চুল বলিয়া বোধ হইত। গ্রীষ্মের দিনে সাহেব মাঝে মাঝে টুপিটী খুলিয়া আফিসে কাজ করিতেন। সুযোগ পাইলে নীলমাধব সেই টুপিটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেন, আর মনে মনে বলিতেন যে, "যদি হরিমতীর সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমি এইরূপ টুপি পরাইব। চুল কিসের উপর বসানো আছে, রবার কি চামড়ার উপর, তাহা দেখিবার নিমিত্ত, নীলমাধব তাহার চাকু ছুরীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগটী সেই টুপীতে বসাইয়া দিলেন, ছুরির অগ্রভাগ টুপি ভেদ করিতে পারিল না। নীলমাধব আপনা-আপনি বলিলেন,—"এ রবার তাই ছুরি বসিল না।" আর একদিন সাহেব সেই টুপিটী মাথায় দিয়া চৌকিতে বসিয়া লিখিতেছেন, নীলমাধব পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। নীলমাধবের হাতে ছুরি ছিল। সাহেবের মাথায় টুপি, তবু তিনি সেই টুপিতে ছুরি বসাইয়া দিলেন। ছুরি প্রবিষ্ট হইল না, সাহেব জানিতেও পারিলেন না।

এক বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তাহার পর আর এক দিন সাহেব সেইরূপ চৌকিতে বসিয়া লিখিতেছেন, নীলমাধবও সেইরূপ ছুরি হাতে করিয়া সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। আজ সাহেবের মস্তকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া নীলমাধব অন্যরূপ কেশ দেখিতে পাইলেন। নীলমাধব ভাবিলেন যে, "সাহেব নূতন একটী চুলদার টুপি কিনিয়াছেন। এ নূতন টুপির উপর ছুরি বসাইয়া দেখি, ইহাতে কিরূপ হয়।" এইরূপ মনে করিয়া নীলমাধব সাহেবের মাথায় ছুরি বসাইয়া দিলেন। আশ্চর্য্য! আজ ছুরি বসাইতে না বসাইতে প্রবলবেগে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। "নরাধম! পাষণ্ড! আমাকে তুমি বধ করিবে?" এই বলিয়া সাহেব রুল লইয়া নীলমাধবকে মারিতে দৌড়িলেন। বিস্ময়ে, ভয়ে, নীলমাধব সাহেবের পায়ে গিয়া পড়িলেন। "মহাশয়! শুনুন, আমার একটা কথা শ্রবণ করুন, তারপর আমাকে রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিয়া ফেলিতে হয়, মারিয়া ফেলিবেন।" নীলমাধব কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

সাহেবকে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। তাহা ব্যতীত তিনি অতি দয়াবান পুরুষ ছিলেন। শীতল জল প্রয়োগে মাথার রক্ত বন্ধ হইলে, তিনি নীলমাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি বলিবার আছে? তাহা বল" নীলমাধব উত্তর করিলেন,—"মহাশয় আমি একটী বালিকার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছি, দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার মাথায় চুল নাই। তাহার সহিত আমার বিবাহ হইলে আপনার মত টুপি পরাইব, এই বাসনায় আপনার টুপি আমি বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইতিপূর্বে আরও দুই একবার ছুরি বসাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তখন আপনাকে লাগে নাই, রক্তও পড়ে নাই। এবার যে কেন এরূপ হইল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। নীলমাধবের অপরাধ ক্ষমা করিলেন, আর বলিলেন,—"এই দেখ, আমার মাথায় আর টুপি নাই। এখন আমার স্বাভাবিক চুল হইয়াছে। ইংরেজী ঔষধে আমি শত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছি, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে এই বঙ্গদেশের একটী সুগন্ধযুক্ত তৈলে আমার মাথার টাক গিয়াছে, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হইয়াছে, মাথায় আমার এই নিবিড় কেশরাশি হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া সাহেব নীলমাধবকে সেই তৈলের নামটী বলিয়া দিলেন। রাঘব চক্রবর্ত্তী জীবিত থাকিতে,—নীলমাধব সেই তৈল ক্রয় করিয়া হরিমতীকে মাখিতে দিলেন।

সেই তৈল মাখিয়া, মেঘের ন্যায় কোমল উজ্জ্বল, কাল রেশমের ন্যায় কোষা কোষা কেশ রাশিতে হরিমতীর মস্তকটী পরিপূর্ণ হইল। সেই জন্য হরিমতী আজিকার দিনে সেই শিশিটীর এত আদর করিলেন। মহামূল্য শাড়ি শেমিজ বডি জ্যাকেট ফেলিয়া সেই শিশিটীকে বুকে করিয়া লইলেন। ইহাই তাঁহার অমূল্য মণি। শিশিটী খোলা হয় নাই, তথাপি তাহার স্বর্গীয় সৌরভে সমুদয় বাড়ীটী আমোদিত হইল।

কিসের শিশি? এ মহামূল্য তৈলের নাম কি? প্রিয় পাঠক! এস, তোমাকে চুপি চুপি বলি। ইহার নাম ফুলেলা।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত

প্রবন্ধাবলী

ভারতে সুবর্ণ

শুনিতে পাই, ডাক্তার কিং সাহেব সোণার বিষয়ে শীঘ্রই একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিবেন। ডাক্তার কিং সাহেব ধাতু বিষয়ে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ভারত সাম্রাজ্যের ভূতত্ত্ব-বিভাগের ইনি কর্ত্তা। ভারতবর্ষে কোথায় সোণা পাওয়া যায়, পূর্ব্বকালে এই সোণা কিরূপে সংগৃহীত হইত এবং আজকালই বা এই কার্য্যের কিরূপ অবস্থা, এই পুস্তকে এ সমুদয় বিবরণ থাকিবে। যাঁহারা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সেই পুস্তক পড়িবেন। আপাতত মোটামুটী এ বিষয়ের যাহা আমরা জানি, তাহা এখানে বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

সোণা লইয়া কিছুদিন হইল কলকাতায় এক মহা হুজুগ পড়িয়াছিল। সোণা-সোণা করিয়া অনেকেই পাগল হইয়াছিলেন। ইহার গোড়া এই,—আজ কয়বৎসর হইল, দক্ষিণ অঞ্চলে সাহেবরা কলে পাথর ভাঙিগয়া সোণা বাহির করিতেছেন। কুলি-মজুরের খরচ, কল-কবজার দাম, মূলধনের সুদ, এসকল দিয়াও লাভ বিলক্ষণ থাকিতেছে। তাই, অনেক উদ্যমশীল সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, আমরা কি আর কোথাও হইতে সোণা বাহির করিতে পারিনা? রাণীগঞ্জের নিকট আসানসোল হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইয়া উঠিল। এই রেল ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের পাহাড়-পর্ব্বতের মাঝখান দিয়া গিয়াছে। রাস্তায় কত গ্রাম পড়িয়াছে, কত নদী পার হইয়াছে, কত পাহাড় অতিক্রম করিয়াছে। এতদিন এই পার্ব্বত্য-প্রদেশকে জঙ্গলমহল বলিয়া লোকে জানিত; কোল-সাঁওতাল-গণ্ড প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের বাস;—তারা বড় একটা কাপড়ের ধার ধারে না; কাঁড় বাঁশ লইয়া বনে বনে বেড়ায়; তাহাই লোকে জানিত। এখানকার বিশেষ খবর কলিকাতার লোকে বড় অধিক রাখিত না। অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর বালি ধুইয়া যে, ঝোরারা সোণা সংগ্রহ করিত, তাহা খুব কম লোকে জানিতেন। ক্রমে এই সকল কথা সাহেবদিগের কর্ণগোচর হইল। নদীর বালিতে কোথা হইতে এই সোণা আসে, তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন। সুবর্ণের কণা যে পাহাড় হইতে ধুইয়া আইসে, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেকদিনই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন পাহাড় হইতে ধুইয়া আসে তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে তো কোন কাজ হয় না। দৈবক্রমে নাগপুর রেল সোণাপেট নামক স্থানের কাছ দিয়া বাহির হইল। এই নামটী সাহেবদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। "সোণা-পেট!" সোণা যার পেটে আছে? তা নয় তো আর কি? তা যদি হইল, তবে এই সোণাপেট পাহাড়ের পেট ফুড়িয়া সোণা বাহির করিতে হইবে। কলিকাতার একঘর সাহেব-সওদাগর, এই কাজ করিবেন বলিয়া একটী কোম্পানী (যাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় যৌথ-কারবার বলে) খুলিলেন। এক টাকা করিয়া অংশ। কোম্পানীর উদ্দেশ্য,—প্রচুর পরিমাণ সোণা পাওয়া যায় কিনা, খুঁড়িয়া ও পরীক্ষা করিয়া দেখা। বাজারে অংশ বিক্রয় হইতে লাগিল। লোকে ভাবিল, পাহাড়ের যখন সোণাপেট নাম, তখন আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কি? সেতো সোণারই পাহাড়। কেবল কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া আনিলেই হয়। তাই দুই এক কোদাল সোণা পাইবার জন্য সকলেই অংশ কিনিতে লাগিলেন। সাহেব, মাড়োয়ারী সকলই অংশের জন্য লালায়িত। মায়, সওদাগরী আফিসের কেরাণীরা পর্য্যন্ত পুঁজি-পাটা বেচিয়া অংশ কিনিতে লাগিলেন। রাত্যারাতি বড় মানুষ হইবার উপায় এর চেয়ে আর

কি আছে? অংশের দাম আগুন হইয়া উঠিল। এক টাকা দামের অংশ, কুড়ি, ত্রিশ, এমন কি, পঞ্চাশ টাকা দামে পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে লাগিল। অন্য অন্য সওদাগরেরা ভাবিলেন,—"কথা মন্দ নয়।" তাঁহারাও এই অঞ্চলে এক আধ টুকরা জমি কিনিলেন ;—অধিক দাম দিয়া অবশ্য। কোম্পানী খুলিলেন, ইহাঁরাও অংশ বিক্রয় করিলেন, বিলক্ষণ দুপয়সা পাইলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, একথা শুনিতে পাই, কেহ বা এক ছটাকও জমি কিনিলেন না ; বাতাসের উপর ভর দিয়া কোম্পানী খুলিলেন। করিবার মধ্যে করিলেন,—কেবল একখানি ম্যাপ। সকলকে ম্যাপখানি দেখাইয়া বলিলেন,—আমার যে এই জমিটুকু, যার ম্যাপ দেখিতেছ, এতো জমি নয়, সোণা। একে তো জগতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য লোকের অভাব নাই। তাতে আবার অর্থলোভ তাঁহাদিগের "হেডে" প্রবেশ করিয়াছে। যখন দলে দলে তাঁহারা বায়ু-ভিত্তি-স্থিত সুবর্ণ শেয়ার কিনিতে ছুটিলেন, সে বিপদের কালেও যে, বিধাতার সৃষ্টি বজায় রহিয়া গেল, আমাদের পক্ষে তাই ঢের। শেয়ার বিক্রয় হইল। সেই শেয়ার আবার দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম দিয়া অন্য লোকে কিনিল। তাহাদিগের কাছ হইতে আবার দশ বারগুণ দাম দিয়া অন্য লোকে কিনিল। এইরূপে এ-হাত হইতে সে-হাত, সে-হাত হইতে এ-হাত, শেয়ার হস্তান্তর হইতে লাগিল। কম দামে শেয়ার কিনিয়া তাই আবার বেশী দামে বেচিয়া অনেকে বিলক্ষণ অর্থ লাভ করিলেন। কিন্তু সেই যে পাহাড় খুঁড়িয়া সোণা বাহির করিবার কথা গোড়ায় আমরা একবার একটুখানি শুনিয়াছিলাম, তাহার কি হইল? সকলেই শেয়ার কিনিতে ও শেয়ার বেচিতে ব্যস্ত ; সময় কোথায় যে, পাহাড়ে এক কোদাল কোপ বসাইবেন? পূজার ছুটী আসিতেছে, সেই সময় শেয়ার-হোল্ডারগণ সেইখানে যাইবেন, যত পারিবেন, সোণা লইয়া আসিবেন। এখন স্থির হইয়া থাক। পূজার ছুটী আসিল। অংশ-ক্রেতারা—দলে দলে রাক্ষস-ভয়-শূন্য হালি লঙ্কার দিকে ছুটিলেন। গাড়ীতে জন কতকের সঙ্গে আমাদের দেখা হইয়াছিল। তাঁহাদিগের কথার ভাবে বুঝিলাম, পৃথিবীর অন্যান্য পার্বতীয় স্থানে নোড়ানুড়ী মাটী পাথর পড়িয়া থাকে ; এখানে তেমন নয় ; এখানে কেবল সোণার ডেলা। সাহেব, খোট্টা, বাঙ্গালী, এই নব আবিষ্কৃত লঙ্কার দিকে দৌড়িলেন। রাস্তায় কত কি দেখিলেন। সাঁওতাল গ্রামের, সাঁওতাল কুটীরের, লাঠি হাতে সাঁওতালী বুড়ীও আজ এই স্বর্ণ-ক্ষুধাযুক্ত অপুষ্ট মানব-দল দেখিল। রাখালেরা লাঠির উপর ভর দিয়া তাঁহাদিগের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। গরুরা যে, কঙ্করময় মরুভূমি হইতে অতিকষ্টে খুঁজিয়া পাতিয়া, এক কল ঘাস মুখে করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মুখেই রহিল, চিবাইতে ভুলিয়া গেল। ঘাস চিবানো কাজতো চিরকাল আছে; সোণা-বেয়ে মানুষতো আর রোজ রোজ সে রাস্তা দিয়া যায় না? সোণা-বেয়ে লোকদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই! ওটী কি গাছ? ঐ যে, যাতে সবুজ-সবুজ, থেলো-থেলো ফল ঝুলিয়া রহিয়াছে?" তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্বের চেয়ে বিজ্ঞ, ও জ্ঞানী, ও বিদ্বান (কারণ তাঁর রেণোল্ডের দুএকখানা নভেল পড়া আছে) ও বহুদর্শী (কারণ তিনি একবার মুঙ্গেরে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন) তিনি বলিলেন, "ওটী পাহাড়ী আমড়ার গাছ।" আমাদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন, "উটী না হরিতকীর গাছ?" হরিতকী? ঘোর সবুজ পুরন্ত, রসে টলটল করিতেছে, ঐ রকম বুঝি হরিতকীর ফল হয়? হরিতকীর ফল না চোপসানো, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ? যেখানে পণ্ডিতে-পণ্ডিতে কথা, সেখানে আমাদিগের মত মূর্খ লোকের মাঝখান হইতে ফোড় তোলা বিড়ম্বনা মাত্র। মূর্খতার পরিচয় দিয়াছি বলিয়া আমরাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলাম। যাহা হউক সেই সুবর্ণ-বাত-ব্যাধিগ্রস্ত মহোদয়েরা

ক্রমে সুবর্ণখণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইলেন। যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিলেন, তখন কতই স্বর্গের বাজনা শুনিতে পাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ভাবিয়াছিলেন যে, এই আধুনিক সুমেরু চূড়ার নিকটবর্ত্তী হইলেই, তাহার জ্যোতি, দিগন্তর ব্যাপিয়া থাকিতে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দশক্রোশ রহিল, পঁচক্রোশ রহিল, তবুও কোথাও কিছু নাই। তাঁহারা কাছে গিয়া একবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভাল, এসকল পাহাড় পাকা সোণায় গড়া না হউক, গিনি সোণা দিয়াই না হয় হউক, তাহাও নয়। অন্যান্য পাহাড়ের ন্যায় মাটি পাথর দিয়া গড়া। তাঁহারা পাহাড় পর্বত দেখিলেন, বন উপবন দেখিলেন, উপত্যকা অধিত্যকা দেখিলেন ; নিম্নভূমিতে বাঁধ দিয়া কিরূপে বিস্তীর্ণ জলাশয় হয়, তাহাও দেখিলেন ; নদ নদী দেখিলেন, শাল ও মহুয়ার গাছ দেখিলেন, (কেহ কেহ এক গেলাস, আধ গেলাস মহুয়ার সরাবও চাকিলেন) আর সেই পাহাড়ী আমড়ার গাছও আরও অনেক দেখিলেন। কিন্তু সোণা কোথাও দেখিতে পাইলেন না। নিরানন্দ মনে তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। বাজারে শেয়ার ছিছি হইয়া পড়িল। যে এক টাকার শেয়ার পঞ্চাশ টাকায় কিনিয়াছিলেন, আজ তাহা আট আনায় বিক্রয় হওয়া ভার। এক্ষণে আদালতে নালিশ ফরিয়াদ পর্য্যন্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভাল, এই সকল অঞ্চলে কি সোণা নাই? সোণা অবশ্যই আছে। তবে শেয়ারের সেই কাগজখানি সোণা প্রসব করে না, পাহাড়ের গায়ে সেই কাগজখানি ঠেকাইলেই আপনা হইতে সোণা বাহির হইয়া আসে না। শেয়ারের টাকা দিয়া, কল ও লোকের সহায়তায়, মাটি ও পাথর হইতে সোণা বাহির করিতে হয় ; তবে সোণা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রায় এরূপ নদী নাই, যাহার বালিতে সোণার কণা দেখিতে না পাওয়া যায়। তবে সেই সোণা একত্রীভূত করিতে অনেক খরচ হয়, পরিশ্রম পোষায় না, তাই লোকে এ সমুদয় স্বর্ণকণা উদ্ধার করিতে যত্নবান হয় না। তবে যেখানে পরিশ্রম পোষায়, সেখানে লোকে বালি ধুইয়া-ধুইয়া সোণা বাহির করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সোণা উদ্ধৃত হইয়া আসিতেছে। বহুকাল ধরিয়া পঞ্জাব হইতে আসাম ও কুমাউন হইতে কুমারী পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের সকল অংশেই এইরূপ প্রতি বৎসর রাশি রাশি স্বর্ণ সংগৃহীত হইত। এইরূপে কালক্রমে ভারতবর্ষে বিস্তর স্বর্ণ সঞ্চিত হয়। এই অর্থলোভই মুসলমানেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত এবং উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া রাশি রাশি স্বর্ণ লইয়া যাইত। জেরুজিলমের রাজা সলমনের জন্য যে অফির নামক দেশ হইতে স্বর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন যাইত, এক্ষণে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই দেশ ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত একটী স্থান। ভারত যে স্বর্ণ প্রসবিনী, অতি প্রাচীনকালেও সকলে তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। রোম দেশীয় প্লানি বলিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্য ও বহুমূল্য রত্ন পাওয়া যায়। ক্রমে যে ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভারত এক্ষণে দীন দুঃখী, কিন্তু ভারতের পূর্ব ঐশ্বর্য্যের কথা এখনও বিজাতীয়দিগের মন হইতে তিরোহিত হয় নাই। তাই ভারতের প্রতি এখনও কাহারও কাহারও কটাক্ষপাত আছে।

স্বর্ণকণিকা-সমূহ কোথা হইতে আসিয়া বালুকার সহিত মিশ্রিত হয়? সচরাচর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণিকা-সকল মৃত্তিকা ও পাহাড়ের মধ্যে লাগিয়া থাকে। কালক্রমে এই সকল পাহাড়ের পাথর পচিতে থাকে এবং বর্ষার জলে সেই গলিত পদার্থ সকল ধৌত হইয়া নদীতে পড়ে। স্বর্ণকণিকা-সকল কর্দ্দম প্রভৃতি অন্যান্য

পদার্থ অপেক্ষা ভারী, সুতরাং স্রোতের সহিত চলিতে চলিতে নদীগর্ভে পতিত ও বালুকারাশিতে মিশ্রিত হইয়া থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভাবে স্বর্ণকণিকা-সকল কখন কখন একত্রে জমিয়া যায়। অনেক প্রকার পদার্থ আছে, যাহার সংযোগে স্বর্ণ গলিয়া যায়। স্বাভাবিক ভৌতিক ক্রিয়া প্রভাবে দ্রবীভূত স্বর্ণ-কণিকা-সকল ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত হইয়া দ্রবাবস্থাতেই একত্রীভূত হয়। ক্রমে আবার অন্য রাসায়নিক ক্রিয়াতে কঠিন হইয়া, কখন বা মটর কখন বা প্রস্তরখণ্ডের আকার ধারণ করে। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়া দেশে এইরূপ প্রস্তরের ন্যায় একখণ্ড স্বর্ণ পাওয়া যায়। সেই স্বর্ণখণ্ড ওজনে প্রায় ৬৭ সের ছিল এবং একলক্ষ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। আবার ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রায় দুইমণ ভারি আর এক খানি স্বর্ণখণ্ড পাওয়া যায় এবং একলক্ষ পনের হাজার টাকায় তাহা বিক্রয় হয়।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই লোকে নদীর বালি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিত। স্বর্ণ-কণিকাময় বালি সকল নদীর গর্ভ ও পাথরের গা হইতে চাঁচিয়া লইয়া, কেটকোর ন্যায় একটী পাত্রে রাখিয়া বড় বড় প্রস্তর, ঢেলা, কাঁকর প্রথমে বাছিয়া ফেলিয়া, স্রোতের জলে কর্দ্দম ধুইয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে সেই কাষ্ঠ-পাত্রখানি নাড়িতে হয়, তাহাতে ছোট ছোট কাঁকর ও অন্যান্য পদার্থ সকল পড়িয়া যায়। কাষ্ঠপাত্রে যে বালি রহিয়া যায়, তাহাকে পুনর্ব্বার ধুইতে হয়, আর কাঁকর কর্দ্দম পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে ধুইতে ধুইতে পরি-শেষে তলায় কৃষ্ণবর্ণ কতকটা বালির ন্যায় লৌহচূর্ণ পড়িয়া থাকে; তাহার মাঝে মাঝে স্বর্ণকণিকা সকল চিকচিক করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। হাতের কৌশলে সেই বালি হইতে স্বর্ণটুকু পৃথক করিয়া লইতে হয়। মানভূম সিংভূম প্রভৃতি বাঙ্গালার পর্বতময় প্রদেশে ঝোরা ও গণ্ড জাতিরা এইরূপে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সকল স্থানে লৌহও উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে বালি হইতে স্বর্ণ পৃথক করিবার সময় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণিকা, যাহা চক্ষে দেখা যায় না, তাহা রহিয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে নিয়মে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ সকল কণিকা নষ্ট হয় না। একটী রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা তাহাও তাহারা বাছিয়া লয়। পারদ,—স্বর্ণ ও রৌপ্যের সহিত মিশিতে ভালবাসে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারত-বাসীরা তাহা অবগত ছিলেন। স্বর্ণ-মিশ্রিত বালির সঙ্গে পারা মিশাইয়া দিলে, পারা বাছিয়া বাছিয়া সেই স্বর্ণ টানিয়া লয়। কিন্তু যেটুকু মাত্র আবশ্যক, তাহার অধিক পারা মিশাইলে স্বর্ণ কতকটা দ্রবভাব ধারণ করে। বালি ধুইতে ধুইতে পরিশেষে তলায় স্বর্ণ-কণিকাময় যে পদার্থটুকু পড়িয়া থাকে, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি স্থানে সেই অবশিষ্টাংশে একটু পারা মিশাইয়া দেয়। সেই পারা, লৌহ, কাঁকর, বালি, কর্দ্দম প্রভৃতি পদার্থকে পৃথক করিয়া স্বর্ণ-কণিকা-সকল বাছিয়া বাছিয়া লয়। তৎপরে সেই পারামিশ্রিত স্বর্ণে অগ্নির উত্তাপ দিলেই পারা উড়িয়া যায় এবং খাঁটী সোণাটুকু পড়িয়া থাকে। সোণাওয়ালারা আসামে যেরূপে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে, মণিরাম নামক আসাম-নিবাসী এক ব্যক্তি এ বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক-সোসাইটীর জর্ণালে তাহা প্রকাশ হইয়াছিল। নদী যেখানে অকস্মাৎ বক্রগামী হইয়াছে, এবং স্রোত অতি দ্রুত ও পাড় উচ্চ এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা, সচরাচর তাহার অপরপারে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। প্রথমে বাঁশে করিয়া নদীর গর্ভ হইতে কতকটা বালি তুলিয়া তাহাতে স্বর্ণ আছে কিনা দেখিতে হয়। সেই বালিতে ১০।১২টি স্বর্ণ-কণিকা আছে, দেখিতে পাইলেই বুঝিতে হইবে, সেই স্থানে

স্বর্ণ পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সোণাওয়ালা তথায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করে। তাহারা প্রথমে সেই স্থানে নদীর উপর একটী বাঁধ দেয় এবং যেস্থানটী মনোনীত করিয়াছে, তাহার উপর দিয়া স্রোত বহিয়া যাইতে দেয়। এইরূপে স্রোতে কর্দ্দম প্রভৃতি পদার্থ সকল ধুইয়া গেলে, তলায় স্বর্ণ-কণিকা মিশ্রিত বালুকারাশি পড়িয়া থাকে। তখন তাহারা বাঁধটী ভাঙ্গিয়া দেয় এবং নদীর স্রোত যথাস্থানে ফিরিয়া যায়। স্রোতে কর্দ্দম প্রভৃতি পদার্থ ধুইয়া গেলে, কেবল বালুকারাশি পড়িয়া থাকে। স্বর্ণ-কণিকাশূন্য উপরের বালি সকল তখন তাহার চাঁচিয়া ফেলিয়া দেয় এবং নীচের স্বর্ণ-কণিকামিশ্রিত বালি তুলিয়া বাঁশের চালুনীর উপরে জমা করে এবং লাউয়ের বসে করিয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে জল ঢালিতে ও সেই চালুনীকে নাড়িতে থাকে। এইরূপে স্বর্ণমিশ্রিত বালি ধৌত হইয়া নিম্নে স্থাপিত একটী পাত্রে পতিত হয়। কাঁকর, পাথর প্রভৃতি পদার্থ সকল যাহা উপরে পড়িয়া থাকে; মাঝে মাঝে বাছিয়া ফেলিয়া দেয়। এক একখেপে প্রায় ৪০।৫০ ঝুড়ি বালি ধৌত করে। এইরূপ এক, এক খেপকে তথায় সিয়া বলে এবং ইহা হইতে একরতি স্বর্ণ সংগৃহীত হইলেই পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইল। এক একদল সোণাওয়ালা প্রতিদিন প্রায় ২৫।৩০ সিয়া বালি ধৌত করিয়া তাহা হইতে সিকি তোলা স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রতি দলে পাঁচজন করিয়া লোক থাকে এবং সেই পাঁচজনে ওই স্বর্ণ ভাগ করিয়া লয়। সেই ধৌত ও পরিষ্কৃত স্বর্ণকণামিশ্রিত বালি তুলিয়া লইয়া তাহারা প্রথমে বাঁশের চোঙ্গায় রাখিয়া দেয় আবার নূতন বালি লইয়া এইরূপে ধৌত করিতে থাকে। এইরূপে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণবালি সংগৃহীত হইলে চোঙ্গা হইতে সেই বালি একটী পাত্রে রাখিয়া, তাহাতে পারা মিশাইয়া ধীরে ধীরে তাহার উপর অল্প অল্প জল ঢালিতে থাকে। বালি ধুইয়া যায় ও পারা-সংযোগে স্বর্ণ কণিকা সকল ডেলা বাঁধিয়া পড়িয়া থাকে। তখন তাহারা সেই পারা-সংযুক্ত স্বর্ণখণ্ড লইয়া একটী শামুকের ভিতর রাখে ও তাহাতে অগ্নির উত্তাপ দেয়; শামুকটী পুড়িয়া চূণ হইয়া যায়, পারা উড়িয়া যায় এবং স্বর্ণ আরও বিশুদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপে পারদের সহায়তায় ভারতবর্ষের নানা নদীর বালি হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত সর্বত্রই পারদ ব্যবহৃত হয়।

এটী আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই যে, অতি প্রাচীনকালে হিন্দুরা যে সকল দ্রব্যগুণ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন, বর্তমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এখনও তাহার অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। স্বর্ণ সংগ্রহে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পারার ব্যবহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই সময়ে (১৫৫৭) "বার্টলো-দে-মেদিনা" নামে এক ব্যক্তি মেক্সিকো দেশে স্বর্ণ সংগ্রহ উপলক্ষে পারা-ব্যবহার প্রণালী আবিষ্কার করেন। ইহার পূর্বে কি অষ্ট্রেলিয়া, কি কালিফর্ণিয়া সকল দেশেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল স্বর্ণ কণিকা বালির সঙ্গে থাকিত তাহা প্রায়ই নষ্ট হইত।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই স্বর্ণ আছে সত্য, কিন্তু অনেক স্থানে এরূপ সামান্য মাত্রায় পাওয়া যায় যে, তাহা সংগ্রহ করিলে, কিছুমাত্র লাভ হয় না। যেখানে এই মহারত্ন প্রচুর পরিমাণে পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে ইহা সংগ্রহের যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয় বিড়ম্বনা মাত্র। সেই স্থানে লাভ না হইয়া বরং লোকসান হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ছোটনাগপুরে এই কার্য্য যাহাদের উপজীবিকা, তাহারা দুই আনার অধিক দিনান্তে উপার্জন করিতে পারে কিনা সন্দেহ। ইহাতে তাহাদের কায়ক্লেশে কোনরূপে দিনপাত হয়, লাভের তো কথাই নাই। কাজেই অন্য সুযোগ পাইলে, এ কার্য্য তাহারা করে না। তিনশত বর্ষ পূর্বে অনেকস্থানে

স্বর্ণ ধৌতকারীদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখনও প্রায় তদ্রূপ। বরং খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হইয়াছে বলিয়া, তাহাদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ হইয়াছে। আবুল ফজল লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে অন্য অন্য দেশ হইতে স্বর্ণের আমদানি হইয়া থাকে সত্য বটে, কিন্তু এই দেশের উত্তর-প্রদেশস্থিত পার্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে এই বহুমূল্য রত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিব্বত দেশেও যথেষ্ট স্বর্ণ পাওয়া যায়। সিন্ধু ও গঙ্গানদীর বালিরাশিতেও স্বর্ণ মিশ্রিত আছে; কিন্তু সেই স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে যেরূপ পরিশ্রম ও অর্থব্যয়, তদ্রূপ লাভের সম্ভাবনা নাই।" সুতরাং ক্রীতদাস দ্বারা মালবার ও নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় এক লক্ষ দাস কেবল মালবার প্রদেশে সুবর্ণ সংগ্রহে নিযুক্ত ছিল। এই সকল দাস গরু-বাছুরের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় হইত। এক একটী দাসের মূল্য ৫ টাকা হইতে ২০ টাকা ছিল। অনেক স্থলেই তাহাদের পরিচ্ছদ কেবলমাত্র একখানি কলাপাত এবং চেহারা বনমানুষের মত। ছেলে-ধরারা গ্রাম ও নগর হইতে গরীব-দুঃখী-দিগের ছেলে চুরি করিয়া আনিয়া দাসদাসীদিগের নিকট বিক্রয় করিত। এই দাসদিগের দুরবস্থার পরিসীমা ছিল না। যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে, তাহাদিগকে সর্বদাই যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। স্বর্ণ ধৌতকারীদিগের দুরবস্থার আর একটী কারণ এই যে, একস্থানে চিরকাল সমভাবে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায় না। অনেক কালের ধোয়াটে নদীর বালিতে যে সোনা জমিয়া থাকে, ধুইতে-ধুইতে তাহা কমিয়া আসে, সেইসঙ্গে লাভও কমিতে থাকে। স্বর্ণ সংগ্রহ যাহাদের উপজীবিকা, এইজন্য তাহাদিগকে প্রায় মধ্যে মধ্যে স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। অনেকস্থলে আবার স্থান পরিবর্তন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। নদীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন লোকের অধিকার। একজন অপরের তালুকে যাইলে, ঘোরতর বাদ-বিসংবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কোন কোন স্থলে আবার স্বর্ণ-ধৌতকারীদিগের কপালে আরও একটী ঘোরতর বিপদ ঘটিয়া থাকে। যেমন জলাশয়ের নিকট শিকারীরা শিকার মারিবার জন্য ওৎ করিয়া বসিয়া থাকে, সেইরূপ কোন কোন সুবর্ণময় প্রদেশে ভূতগণ আপনাদিগের অধিকার স্থাপন করে। প্রচুর পরিমাণে পূজা না পাইলে, তাহারা স্বর্ণ সংগ্রহকারীদিগকে সেখানে স্বর্ণ ধৌত করিতে দেয় না। আসাম-প্রদেশে জুগীনামক নদীতে এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল। এই নদীর বালুকা স্বর্ণকণায় পরিপূর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে এত সোণা পাওয়া যাইত এবং সেই সোণা এরূপ নির্মল যে, বহুকালাবধি আসাম দেশের রাজারা এই স্বর্ণক্ষেত্রকে আপনাদিগের নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন গত হইল, এখানে ঘোরতর ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। চারিদিকে নাগা, মিরি, মিশমি, আবর, আকা প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা সে সকল ভূতদিগকে পূজা করিত, তাহারা এই নদীকূলে বর্ষে বর্ষে অসংখ্য লোকের সমাগম দেখিয়া ভাবিল যে, এখানে আসিয়া বসিলে অধিক পরিমাণে পূজা পাইব। প্রথমে দুই চারিটী ভূত আসিয়া উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে, স্বর্ণ ধৌতকারিগণ প্রচুর পরিমাণে পূজা দিয়া তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিল। ক্রমে চারিদিকে ভূত মহলে এই সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িল, আর পূজার লোভে দলে দলে খাপ্‌নায় খাপ্‌নায় ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল। পূজার খরচ ক্রমে এত বাড়িয়া গেল যে, স্বর্ণ ধৌতকারীদিগের আর কিছুমাত্র লাভ রহিল না; তাহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। অনেকদিন ধরিয়া জুগী নদীতে আর কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। যখন ডাল্টান সাহেব আসামে

যাইলেন, তখন তিনি এই দৈব-অত্যাচারের কথা শুনিয়া ভাবিলেন যে, অহিফেনভুক্ত দুর্বলকায় আসামীদিগের উপর উপদ্রব করিয়াছে বলিয়া, দুষ্ট ভূতেরা দুর্দান্ত অসীম-বিক্রমশালী ইংরেজ পুরুষের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে সাহস করিবে না। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিল। অনেকগুলি কুলি লইয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন, নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আপনার সাক্ষাতে বালি ধুইতে আদেশ করিলেন। ভূতদিগের মধ্যে কাহারও সাহস হইল না যে, ডাল্টন সাহেবের কথায় কথা কয়। অসভ্য জাতিদিগের কাছেও এ জাতীয় ভূতেরা কখনও কখনও বিলক্ষণ শিক্ষা পায়। ভূতেরা বাগে পাইলেই তাহাদিগের ছোট ছোট ছেলেদিগকে লুকাইয়া রাখে, পূজা পাইলে তবে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু এক-আধটা ভূত এরূপ লোভী থাকে যে, একবার দুবার পূজা পাইলেও ছেলে বাহির করিয়া দেয় না। আরও দাও এই অভিলাষ। তখন অসভ্য জাতিরা বিরক্ত হইয়া, বনের যত বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। একটী গাছ পড়িল, দুইটী গাছ পড়িল, ক্রমে অনেক গাছ পড়িতে লাগিল। অপরাপর ভূতেরা, যাহারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না, তাহারা আশ্চর্য্য হইল—আজ এত মানুষ জুটিয়া এরূপ ব্যাপার করিতেছে কেন? অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, অমুক ভূত অমুক মানুষের ছেলেকে লুকাইয়া রাখিয়াছে; দুইবার পূজা খাইয়াও বাহির করিয়া দিতেছে না। সকলে সেই লোভী ভূতের কাছে গিয়া তাহাকে যথেষ্ট বকিতে লাগিল। দেখ দেখি, তোমার জন্য আমাদিগের ঘরদ্বার সব নষ্ট হইল, বনের বড় বড় গাছগুলি মানুষেরা সব কাটিয়া ফেলিল, আমরাই বা এখন কোথায় থাকি, আর এর পর ভূতিনীদের দুইটা পাঁচটা ছেলে পিলে হলেই বা কোথা থাকে! তখন অগত্যা ভর্ৎসনার দায়ে লোভী ভূতটী মানুষের ছেলেটীকে বাহির করিয়া দেয়।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বর্ণকণিকাসকল পর্বত মধ্যস্থিত প্রস্তরমধ্যে নিহিত থাকে ও কালক্রমে পাথর পচিয়া বর্ষার জলে নদীতে যাইয়া পড়ে। কোয়ার্টজ নামক একজাতীয় প্রস্তরে স্বর্ণকণা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পাথরের খাঁজে খাঁজে যেখানে সোণা থাকে, তাহাকে স্বর্ণ-শিরা কহে। যে কোয়ার্টজ পাথরের শিরায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ থাকে, সেখানে কেবল কোদাল দিয়া খুঁড়িয়াই কত লোকে বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সচরাচর এরূপ পরিমাণ থাকে না। তাই কেবল কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া এখানে একটু, সেখানে একটু সোণা পাইলে লাভ হয় না। এরূপ স্থলে পাথর চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। সেই পাথর-চূর্ণ লোকে যেরূপ বালি ধুইয়া থাকে, সেইরূপ করিয়া ধুইলে সোণা বাহির হইয়া পড়ে। সচরাচর উপরের পাথরের সোণা ধুইয়া যায়, মাটির নীচের পাথরে পরিমাণে অধিক সোণা থাকে। তাই লোকে পাহাড়ের ভিতর দিয়া কূপ খনন করে, ভিতরের পাথর উপরে লইয়া আসে ও গুঁড়া করিয়া সোণা বাহির করে। আজকাল এই প্রথা সর্বত্রই প্রচলিত। অতি প্রাচীনকালে হিন্দুরাও এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সোণা বাহির করিতেন। তবে বাষ্পীয় কলে পাথর না ভাঙ্গিয়া তাঁহারা বড় বড় মুগুরের দ্বারা হাতে ভাঙ্গিয়া লইতেন। প্রাচীন হিন্দুগণ যে সকল কূপ খনন করিয়াছিলেন, অনেক স্থানে এখনও সে সমুদয় কূপ বর্তমান আছে। কোন কোনটী পঞ্চাশ হাতের চেয়েও গভীর, বজ্রের ন্যায় কঠিন কোয়ার্টজ পাথর ভেদ করিয়া আগাগোড়া খোদিত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগের কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকেন। কি যন্ত্রের সহায়তায় এরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রস্তর হইতে স্বর্ণ উদ্ধৃত হইত,

কাছে জামার জেবে, সুবর্ণ রেণু ও ফিরোজা পাথর রাখিয়া দেয় ও এই দুই বহুমূল্য দ্রব্যের বিনিময়ে টাকা, আদুলি, সিকি ও দু-আনি লইয়া হুনীয়ারা দেশে প্রত্যাগমন করে। তিব্বতে রৌপ্য নাই। সিকি দু-আনি-টাকার মালা গাঁথিয়া গলায় পরিলে কেমন দেখায়। পৃষ্ঠে লম্বমান বেণীর পাশ দিয়া মহারাণীর মুখ-গুলিন কেমন উঁকিঝুঁকি মারিবে! এই সাধে হুনীয়া কামিনীগণ পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। টাকা সিকি দুআনি আদুলি লইয়া যদি না যাও, তাহা হইলে কি তোমার আর রক্ষা থাকিবে? শুনিতে পাই, কালিফর্নিয়া হইতে সোহাগা আসিয়া, আর ভারত হইতে লবণ গিয়া, এই বণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত করিয়াছে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ প্রদেশ সমুহকে ডোট বলে। ডোটবাসীরা এই ব্যবসার মাঝখানে থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। একদিকে তাহারা তিব্বতীয় পণ্যজাত হুনীয়াদিগের নিকট হইতে লইয়া ভারতবাসীদিগকে যোগাইত, অপরদিকে ভারতীয় পণ্যজাত লইয়া তিব্বতীয়দিগকে দিত। এক্ষণে ডোটবাসীদিগের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য গবর্নমেণ্ট লবণের শুল্ক বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন বলিয়াছিলেন। কি হইল, বলিতে পারি না।

এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে বলিবার আর কিছু বড় বাকি নাই। ভারতের সর্বত্রই প্রায় সোণার আকর আছে। আর এই সোণা অতি প্রাচীনকাল হইতেই সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। আজকাল কিন্তু এই সুবর্ণ-সংগ্রহ-কার্য্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। সমুদয় পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা মূল্যের সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু ভারত হইতে অতি অল্পই উৎপন্ন হয়। ভারতে ভারতের আবশ্যক মত সোণাও উৎপন্ন হয় না। গম, চাউল, তূলা প্রভৃতি দ্রব্য বিনিময়ে প্রতি বৎসর আমরা প্রায় তিন কোটি টাকার সোণা কিনিয়া থাকি। এই সোণা লইয়া আমরা গহনা গড়াই, কিংবা মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখি। পূর্ব-প্রচলিত প্রণালী অবলম্বনে আর এখন অধিক পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। এক তো সেকালের মত লক্ষ লক্ষ দাসদাসী নিযুক্ত করিবার যো নাই, থাকিলেও বোধ হয়, এখনকার লোকের এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি না হইলেও না হইতে পারে। তারপর পূর্বকালে আহারীয় দ্রব্যসমূহ সকলই সুলভ ছিল। যতটুকু সোণা দিয়া আগে যতগুলি চাউল মিলিত, এখন ততটুকু সোণা দিয়া ততগুলি চাউল মিলে না। সেজন্য দিনান্তে আগে যতটুকু সোণা পাইলে লোকের ভরণপোষণ হইত, এক্ষণে সোণা ততটুকু পাওয়া যাইলেও সে সোণায় আর এখন লোকের ভরণপোষণ হয় না। তাই স্বর্ণধৌতকারিগণ এক্ষণে একাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে। আসল কথা, পূর্বপ্রথা অবলম্বন করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে যাইলে আর এক্ষণে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের এ ব্যবসা কেন, যেদিক পানে চাহিয়া দেখি, সেই দিক পানেই এই কথা। কালের গতিতে দেশ অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে। আজ যেখানে রেল নাই, কাল সেখানে রেল হইল, অমনি নৌকাওয়ালা, গাড়িওয়ালা প্রভৃতি কত লোকের অন্ন গেল। আমি হাজার লোককে ডাকি না কেন, কেহই আর আমার নৌকায় চড়িবে না। আমি হাজার কাঁদি না আর বলি না কেন—"হে দেশ-হিতৈষিগণ! আজ আমি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া শান্তিপুর হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে শান্তিপুর নৌকা বহিতেছিলাম, তোমরা সকলেই আমার নৌকায় আসিতেছিলে; আজ রেল খুলিয়াছে বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না। রেল বিজাতীয়েরা খুলিয়াছে। আমি তোমাদিগের স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়। অতএব হে ভারনাকিউলার ও আংগ্লো-ভারনাকিউলার দেশহিতৈষীগণ! তোমরা রেল ছাড়িয়া আমার নৌকায় চড়িয়া আমাকে প্রতিপালন কর।" বলা বাহুল্য, আমার

কথায় কেহই কর্ণপাত করিবে না। দেশকাল যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের ব্যবসায় প্রণালীও পরিবর্তন করিতে হইবে, তবেই পাশ্চাত্যদিগের সহিত এই ঘোরতর জীবিকা-যুদ্ধে আমরা জয়ী হইতে পারিব। তা না হয়, যদি কেবল কথার ঝাড়ি লইয়াই আস্ফালন করি, তাহা হইলে এই পুরাতন সনাতন হিন্দুজাতির দুর্গা দুর্গা বলিয়া আর যে কয়টা দিন যায় তাই ভাল। ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া ত আছিই, বাক্য বজ্রধারী ইন্দ্রচন্দ্রবায়ুবরুণসদৃশ বঙ্গীয় বীর পুরুষগণ আরও যে আমাদের, বিশেষত বাঙ্গালীজাতির কপালে কত কি ঘটাইবেন, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, ভারতে যদি পুনরায় অধিক পরিমাণে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্বে যেখানে পর্বতে স্বর্ণ আছে কিনা কেবল বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞানদ্বারা অনুমিত হইত, এক্ষণে সেইখানে নব-রচিত ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে। পূর্বে যেখানে কোদালির দ্বারা একটু একটু করিয়া প্রস্তর কর্ত্তিত হইত, এক্ষণে সেইখানে দুর্জ্জয় ডায়নামাইট নামক পদার্থদ্বারা পাহাড়ের মূল হইতে শিখর পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে। পূর্বে যেখানে হাতুড়ি দিয়া অল্প অল্প করিয়া প্রস্তর চূর্ণ করা হইত, আজ সেইখানে অসীম বলশালী বাষ্পীয় বলপ্রভাবে পর্বতসমূহ চূর্ণ করিতে হইবে। আমরা আশা করি যে, কলিকাতায় সুবর্ণ লইয়া সম্প্রতি যে উন্মত্ততা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ভাবী ফল শুভই হইবে। বঙ্গদেশের যে অঞ্চলে স্বর্ণের আকর আছে, সেইখানে হীরাও পাওয়া যাইতে পারে। অনেক বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। তাছাড়া লৌহ, তাম্র ও সীসের অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান রহিয়াছে। ভূমি হইতে কোনও না কোনও ধাতু উদ্ধার করিয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারিবে। এতদিন পরে এই প্রদেশের নীচজাতিদিগের সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইল বলিয়া বোধ হয়। অতি সামান্য সূত্র হইতে বৃহৎ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। ১৮৪৭ সালে মিল নামে একজন সাহেব কালিফর্নিয়া দেশে একটী করাতের কল ভাড়া লইয়াছিলেন। এই করাতের কলটী একটী সামান্য নদীর স্রোতবলে পরিচালিত হইত। হঠাৎ একদিন সাহেব দেখিলেন, নদীর বালিতে কি চিকচিক করিতেছে। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নদীর বালিতে কি চিকমিক করিতেছে। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহা সুবর্ণরেণু। এই কথা যেই প্রচার হইল, পৃথিবীর চারিদিক হইতে সেখানে সহস্র সহস্র লোক গিয়া পড়িল। সেই জনশূন্য গহন বন অল্পদিনের মধ্যেই লোকাকীর্ণ জনপদ হইয়া উঠিল। অনেক দিন ধরিয়া এই অঞ্চল হইতে বৎসর বৎসর প্রায় ১৩ তের কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদিত হইত। আজকাল কিছু কমিয়া আসিয়াছে। তবু এখনও প্রতি বৎসর প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। আবার অষ্ট্রেলিয়ায় দেখ—১৮৫১ সালে হ্যামণ্ড-হারগ্রেভস্ নামক একটী সামান্য লোক স্বর্ণ অনুসন্ধানে ক্রমাগত অতি কষ্টে মরুভূমিতে বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার শ্রম সফল হইল। অষ্ট্রেলিয়ায় আজ প্রতি বৎসর সাত কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। তাই বলি, অতি সামান্য সূত্র হইতে বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যে সকল ধন এতদিন আমাদের ভূগর্ভে বৃথা নিহিত ছিল, আজ সেই সকল ধন অনেক গরীব দুঃখীকে প্রতিপালন করিবে বলিয়া আশা হইতেছে। এই ধনের কিয়দংশ বিজাতীয় গবর্ণমেণ্ট বা বিজাতীয় বণিকদিগের হস্তে পতিত হইবে বলিয়া আমাদিগের ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। বনবিভাগের ভিতর যদি এরূপ কোন স্বর্ণের আকর আবিষ্কৃত হয়, যদ্দারা বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা, আর গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা

নিজস্ব করিয়া রাখেন, তাহা হইলে একদিন এদেশে পুনরায় স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত হইবার আশা করিতে পারা যায়। রৌপ্যের মূল্যের ন্যূনাধিক্যের জন্য তাহা হইলে আর আমাদিগকে প্রতি বৎসর তিন চারি কোটি টাকা ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে না। বিজাতীয় বণিকেরা কারখানা খুলিলেও আমাদের লাভ আছে। আর কিছু টাকা লাভ হউক না হউক, এই প্রদেশের জঙ্গলবাসীরা তখন উদর পূরিয়া ভাত খাইয়া বাঁচিবে। চিরকালই প্রায় তাহাদিগের অর্দ্ধাশনে দিন যায়। পুরুষ পুরুষানুক্রমে তাহারা অন্নবস্ত্রহীন। উদরের জ্বালায় তাহারা জ্বর-মৃত্যুভয়-সংকুল আসাম ও কাছাড়ের চার বাগানে আপনাদিগকে নির্বাসিত করে। সেই চিরক্ষুধিত দুর্ভাগারা আজ পেট ভরিয়া অন্ন খাইবে, লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় পরিবে, শীত নিবারণের জন্য জামা গায়ে দিবে। পরদুঃখে যিনি কাতর এ কথা ভাবিয়া তাঁর মনে অবশ্যই আহ্লাদের সঞ্চার হইবে। আর যদি আমরা মানুষ হই, এই ইউরোপীয় বণিকদিগের কারখানা দেখিয়া আমরাও কারখানা করিতে শিখিতে পারিব। ভূমি আমাদের হাতে রহিয়াছে ; অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে আমরা কার্য্যারম্ভ করিতে সমর্থ হইব। এরূপ যদি কাহারও অভিলাষ হয়, তিনি প্রস্তর লইয়া প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যতটুকু প্রস্তর লইবেন, সেইটুকু ওজন করিয়া দেখিবেন। তারপর প্রস্তরকে হাতে হাতুড়ী দ্বারা বা ঢেঁকিতে চূর্ণ করিয়া, পূর্বোল্লিখিত মতে ধুইয়া পারদের সংযোগে সুবর্ণ পৃথগ্‌ভূত করিবেন। কত পাথরে কতটুকু সোণা বাহির হইল তাহা দেখিয়া ২৭ মণ অর্থাৎ এক টনে কত সোণা উৎপন্ন হইতে পারিবে, তাহা হিসাব করিয়া লইবেন। যদি ভূমির দাম ও গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ রাজস্ব না দিতে হয়, তাহা হইলে, একশত প্রস্তরচূর্ণ-কারী লৌহ মুদ্গর সম্বলিত স্বর্ণের কারখানা খুলিতে পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধনের আবশ্যক, অর্থাৎ কলের দাম আড়াই লক্ষ টাকা ও কারখানা চালাইবার প্রথম খরচ আড়াই লক্ষ টাকা। এই কলে প্রতি বৎসর ছয় লক্ষ মণেরও অধিক প্রস্তর চূর্ণ হইতে পারিবে। বাৎসরিক খরচ প্রায় এক লক্ষ টাকা। যদি আকরের প্রস্তরে প্রতি টনে অর্থাৎ প্রতি ২৭ মণে আধতোলা করিয়া সোণা থাকে, তাহা হইলে প্রতি বৎসর ১১০০০ তোলা স্বর্ণ উৎপন্ন হইতে পারিবে। কুড়ি টাকা হিসাবে ইহার মূল্য ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। খরচ ১ লক্ষ টাকা, লাভ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। যদি প্রতি টনে আধতোলার চেয়ে আকরে সোণা অধিক পরিমাণে থাকে, অধিক লাভ হইবে ; কম পরিমাণে থাকে, কম পরিমাণে লাভ হইবে।

লৌহ

বামা ও তাহার স্বামী নন্দরামের নিবাস ছোটনাগপুর, লোহারডাগা জিলা, যাহাকে অনেকে রাঁচির জিলা বলিয়া জানেন। জাতিতে ইহারা অগরীয়া। অগরীয়ারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বলে—ছোটনাগপুর আমাদের আদিম নিবাসস্থান নহে; আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা আগ্রা অঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে বসতি করিয়াছিলেন। গলায় আমাদের যজ্ঞোপবীত ছিল; জীবিকার জন্য কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে হইল বলিয়া আমরা ইহা এখন পরিত্যাগ করিয়াছি। অগরীয়ারা ক্ষত্রিয় হইলেও, ইহাদিগের আচার ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য সজ্জাতি হিন্দুদিগের মত নয়। ইহাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। মৃত দেহ ভূগর্ভস্থ করিয়া ইহারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে কিছু-

দিন পরে বড় বড় হাড়গুলি তুলিয়া লইয়া গঙ্গার জলে প্রক্ষেপ করিয়া আসে। অগরীয়া ও আগুরি এই দুইটী নামে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক, বামা ও নন্দুরামের নাম ধাম কুল-মর্য্যাদা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ আলোচনার আবশ্যক নাই। ইহারা কি কাজ করিয়া দিনপাত করে, তাই লইয়াই আমাদের কথা। বামা ও নন্দুরাম ও তাহাদিগের দুইটী ছেলে প্রস্তর হইতে লোহ বাহির করে, ও সেই লোহ কর্মকারদিগকে বিক্রয় করে। তাহাতেই অতি কষ্টে ইহাদিগের ভরণপোষণ হয়। সেই কাজ করে বলিয়া সকলে ইহাদিগকে লোহা-অগরীয়া বলিয়া থাকেন। লোহা হয়, তজ্জন্য রাচি জিলার নাম লোহারডাগা হইয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। রাণিগঞ্জের দিকে যাঁহারা কখনও বেড়াইতে গিয়াছিলেন, মাঠে ছোট বড় কত পাথর পড়িয়া আছে, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন। এক একখানি পাথর দেখিতে ঠিক লোহার মত, হাতে তুলিয়া দেখিলে খুব ভারি বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে অনেক পরিমাণে লোহা আছে। অনেক জাতীয় প্রস্তর ও মৃত্তিকায় লৌহ থাকে, সে কথা পরে বলিব। বামার দুইটী ছেলে এইরূপ পাথর কুড়াইয়া আনে ও সকলে মিলিয়া তাহা চূর্ণ করে। বামাদের একটী ভাঁটী আছে। সেই ভাঁটিটী অনেকটা, চূণ পোড়াইবার ভাঁটির মত দেখিতে। ইহা মৃত্তিকা দিয়া গঠিত, গোলাকার, প্রায় তিন হস্ত উচ্চ। তলভাগে মেজে। মেজের আধ হাত উপরে ছাদ। ছাদ হইতে ভাঁটির চূড়া পর্য্যন্ত মাটি দিয়া বুজানো, কেবল মাঝখানে একটী সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের উপর-মুখে কিছু দিলেই মেজেতে গিয়ে পড়ে।

নন্দুরাম প্রথমে মেজেটীতে কাঠের কয়লা ঠাসিয়া দেয়। তারপর উপর হইতে মুঠা মুঠা কয়লা দিয়া সুড়ঙ্গটীও কয়লায় পরিপূর্ণ করে। সুতরাং সুড়ঙ্গের কয়লা ও মেজের কয়লা এক হইয়া পড়ে। তার পর নিচেতে একটু আগুণ দিয়া জাঁতার তাও দিলেই সমুদায় কয়লা ধরিয়া উঠে। জাঁতার তাও কিছু উপর হইতে দেওয়া যায় না, নীচে হইতেই লোকে দিয়া থাকে। ভাঁটির তলভাগে যে মেজে, সেই মেজের এক ধারে একটী ছিদ্র আছে। ছিদ্রটীতে একটী মাটির নল লাগানো থাকে। মাটীর নলের সহিত জাঁতার বাঁশের চোঙ্গের যোগ। যদি মাঝখানে একটু মাটির নল না রাখা যায়, তাহা হইলে বাঁশের চোঙ্গটী যে পুড়িয়া যাইবে, আর জাঁতাটি যে নষ্ট হইয়া যাইবে। ভাঁটিতে বাতাস দিবার জন্য একজোড়া জাঁতার আবশ্যক। জাঁতাগুলি দেখিতে ঠিক জগঝম্পের মত, কাঠের খোল, ছাগলের ছালে ঢিলে-ঢিলে ছাওয়া। জাঁতার এক দিকে বাঁশের চোঙ্গ, যাহা দিয়া ভাঁটির ভিতর বাতাস যায়, অপর দিকে একটি ছিদ্র, যাহা দিয়া বাহির হইতে বায়ু আসিয়া জাঁতাকে পরিপূর্ণ করে। ভাঁটির দুইদিকে দুইটি কাঠের খুঁটি ঢেঁকি-কল ভাবে ভূমিতে সংলগ্ন আছে। তাহাদিগের মাথায় দড়ি বাঁধিয়া নীচে হইতে টানিলে নুইয়া আইসে, আবার নোল দিলেই আপনি-আপনি উপরে উঠিয়া পড়ে। এই দড়ির অপর দিকটী জাঁতার চর্ম্মের সহিত টানো, টানো ভাবে বাঁধা। উপরে কাঠের টানে জাঁতার চর্ম তাই সর্বদা বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে। জাঁতার বাহির দিকে যে ছিদ্রটি আছে, তাহাকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বন্ধ করিয়া চর্ম্মের উপর চাপ দিলেই, খুঁটী নত হইয়া পড়ে, আর চর্ম্মের ভিতর যে বায়ুটুকু থাকে, তাহা ফোঁশ করিয়া বাঁশের চোঙ্গ দিয়া ভাঁটিতে প্রবেশ করে। বাহিরের ছিদ্রটী এই সময় খুলিয়া দাও, অমনি খুঁটির মাথাটী উপরে উঠিয়া পড়িবে, খুঁটিতে আর জাঁতাতে যে দড়ি বাঁধা আছে, তাহাতে টান ধরিবে, আর বাহির হইতে বায়ু আসিয়া চর্মকে পরিপূর্ণ করিবে। আবার ফের চর্মকে চাপিয়া ধর, ফের সেইরূপে বায়ু গিয়া ভাঁটিতে প্রবেশ করিবে।

এখানকার লোকেরা পায়ের ভর দিয়া জাঁতাকে চাপিয়া ধরে। জাঁতার উপর যেই একবার পা রাখে অমনি ফোঁশ করিয়া ভাঁটিতে বাতাস যায়, পা তুলিয়া লইলেই জাঁতা বাতাসে পরিপূর্ণ হয়। অপর পায়ের দ্বারা বাহিরের ছিদ্রকে একবার বন্ধ, একবার মুক্ত রাখিতে হয়। পাশা-পাশি দুইটী জাঁতা রাখিয়া লোকে কাজ করে। একবার এটীতে পা, একবার ওটীতে পা, এই করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইটী জাঁতা হইতে অবিরত ভাঁটিতে বাতাস যাইতে থাকে। একেলা দুইটী জাঁতা চালাইতে গেলে ভালরূপ ভর পড়ে না, আর শীঘ্রই নন্দুরাম শ্রান্ত হইয়া যাইবে, তাই সে আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়াছে। পশ্চাৎ হইতে বামা তাহার কোমর ধরিয়াছে, আর স্ত্রী-পুরুষে দুজনে মিলিয়া জাঁতা চালাইতেছে। অল্পকাল মধ্যেই কয়লা ধরিয়া উঠে ; ভাঁটির ভিতর কি মেজেতে কি সুড়ঙ্গে আগুণ গন্ গন্ করে। সুড়ঙ্গের কয়লা পুড়িয়া অধোগামী হইতে থাকে। অঙ্গার অধোগামী হইয়া সুড়ঙ্গের উপরিভাগ ক্রমে খালি হইয়া পড়ে। এখন সেই যে সকলে মিলিয়া তাহারা প্রস্তর চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢালিয়া দিতে হয় ও তাহার উপর ফের কয়লা সাজাইয়া দিতে হয়। এক থাক পাথরের গুঁড়া, এক থাক কয়লা দিয়া ক্রমাগত সুড়ঙ্গকে পরিপূর্ণ করিতে হয়। যেমন কয়লা পুড়িতে থাকে, পাথরের গুঁড়াও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই গলিতে থাকে, আর গলিয়া তলায় ভাঁটির মেজেতে গিয়া জমা হয়। এই দ্রবীভূত প্রস্তর চুর্ণের নিম্নভাগে গুরুভার লৌহ অবস্থিতি করে। লৌহ ভিন্ন প্রস্তরে আর যে কিছু পদার্থ থাকে, তাহা গলিয়া তরল ভাবে উপরে ভাসিতে থাকে। মাঝে মাঝে ভাঁটির গায়ে ছিদ্র করিয়া উপরিস্থিত এই ক্লেদ বাহির করিয়া দিতে হয়। এইরূপে দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রস্তরচূর্ণ ও কয়লা যোগাইলে, ভাঁটিতে অনেক খানি লৌহ জমিয়া যায়। তখন শেষকালে একবার জাঁতায় ঘন ঘন ভর দিয়া অগ্নিকে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়। তার পর ভাঁটির মুখে মাটির নলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই পথ দিয়া লৌহ বাহির করিয়া লইতে হয়। এই লৌহ সম্পূর্ণ তরলভাব ধারণ করে নাই, অর্ধ দ্রবীভূত পিণ্ডাকারে ইহা ভাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধও নয়। প্রস্তর-নিহিত অপরাপর দ্রব্য (সাধারণ কথায় যাহাকে লৌহমল বলিয়া থাকে) ও কয়লার গুঁড়া এখনও ইহার সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। তাই বাহির করিয়াই রক্তবর্ণ থাকিতে থাকিতে ইহাকে বলপূর্বক পিটিতে হয়। তাহাতে অসার দ্রব্যসমূহ দূরে গিয়া পড়ে ও লৌহ ক্রমে নির্মল হইয়া আসে। একবার পিটিলেই লৌহ সম্পূর্ণ-ভাবে বিশুদ্ধ হয় না। আরও দুই চারিবার হাপরে পোড়াইলে ও পিটিলে তবে ঠিক হয়। কোনও কোনও লৌহ-নিষ্কারকেরা লৌহকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিয়া তবে লোহার ও কর্মকারদিগকে বিক্রয় করে। আবার কেহ বা তাহা না করিয়া অশুদ্ধ অবস্থাতেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। কর্মকারেরা আরও পোড়াইয়া ও পিটিয়া আপনা-দিগের কর্মোপযোগী করিয়া লয়। ছয় ঘণ্টা ধরিয়া পরিশ্রম করিলে ভাঁটি হইতে যে এক খণ্ড লৌহ বাহির হয়, তাহাকে "গিরি" বলে।

লৌহের উৎপত্তি বিষয়ে জঙ্গল-মহলে একটী আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীনকালে লোহাসুর নামে একটী দুর্দান্ত দৈত্য ছিল। ঘোরতর তপোবলে সে এরূপ বলশালী হইয়াছিল যে, স্বর্গের দেবতাগণ তাহার ভয়ে কম্পিত থাকিতেন, এমন কি ইন্দ্রকেও তাহার নিকট পরাজিত হইয়া স্বর্গসুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। লোহাসুর স্বর্গ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শচীকে লইয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল। ইন্দ্রদেব পথের ভিখারী হইয়া কখনও মর্ত্ত্যে, কখনও পাতালে, কখনও মাঠে, কখনও ঘাটে অতি কষ্টে দিন

কাটাইতে লাগিলেন। রাজদেহ রাজভোগে গঠিত। এ সুকোমল দেহে এরূপ অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ আর কদিন সহ্য হইয়া থাকে? আর সহিত না পারিয়া তিনি রুক্ষকেশে, মলিনবেশে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক কান্না-কাটনার পর দয়াময় মহাদেব তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। কিন্তু সদয় হইলে কি হইবে, ওদিকে নিজেই লোহাসুরকে বর দিয়া বসিয়া আছেন যে, বিষ্ণুর চক্রই হউক, ইন্দ্রের বজ্রই হউক, আর বরুণের পাশই হউক, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, পিশাচ, মনুষ্য মধ্যে যে কোন অস্ত্র প্রচলিত থাকুক, তাহা দিয়া লোহাসুরকে মারিলে তাহার গায়ে আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগিবে না। সুতরাং বড়ই সংকটের কথা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহাদেব একটী মনুষ্যের সৃজন করিলেন। তাহাকে কামারের সজ্জায় সজ্জিত করা হইল কিন্তু কি স্বর্গে, কি মর্ত্তে, কি পাতালে, তখন কুত্রাপি একটীও কামার ছিল না, কামার কাহাকে বলে কেহই জানিত না। তা, কামারের সজ্জা কোথা হইতে আসিবে, তাই সেই কৈলাস-শিখরবাসী ভক্তাধীন ভবানীপতি নিজের আসবাবই ভাঙিয়া-চুরিয়া জাঁতা হাতুড়ী প্রভৃতি কর্মকারের আবশ্যকীয় যন্ত্র সমূহ গড়াইয়া দিলেন। ডমরুটী ভাঙিয়া হইল হাতুড়ী, মড়ার-মাথর খুলিখানি একটু পিটিয়া-পাটিয়া হইল নেঙাই (যাহার উপর স্বর্ণকার ও কর্মকারেরা কোন দ্রব্য রাখিয়া হাতুড়ীর ঘা মারিয়া থাকে), সাপটীকে বাঁকাইয়া হইল চিমটা। এইরূপ আয়োজন দেখিয়া শঙ্করবাহন ষাঁড়টীও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের প্রতি সকরুণ হইয়া তিনিও আপনার গায়ের একটু ছাল খুলিয়া দিলেন। তাহাতেই জাঁতা যোড়াটী প্রস্তুত হইল। মনুষ্যকে এইরূপে সুসজ্জিত করিয়া ভবানীপতি তাহাকে আদেশ করিলেন,—স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ইন্দ্র অতি ক্লেশ পাইতেছেন, ইন্দ্রের নিমিত্ত তুমি লোহাসুরের সহিত যাইয়া যুদ্ধ কর, সেই দুর্জয় দানবপতিকে শীঘ্রই বধ কর। এইরূপে সুসজ্জিত ও আদিষ্ট হইয়া 'যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি' ভৈরবরবে মনুষ্য যাইয়া লোহাসুরের নিকট উপস্থিত হইল। ভীষণ পর্বতাকার লোহাসুর এই কীটসদৃশ সামান্য মনুষ্যকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইল। মনে মনে ভাবিল, তাই তো, এ যে সেই বাঙ্গলার রসময় কবি কলিকালে যাহা বলিবেন, আজ তাহাই দেখিতেছি। দানবেরা যে কতকটা দেবযোনি, তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে না কি? তা না হইলে যুগ-যুগান্তের পরে রসময় বাবু কি বলিবেন, লোহাসুর কেমন করিয়া জানিল? রসময় কবি একবার একজন সমৃদ্ধশালী তন্তুবায় জমিদারের বাটীতে কিছু বিদায় পাইবার প্রত্যাশায় গিয়াছিলেন। এ অবস্থায় কবিলোক চুপ করিয়া চলিয়া আসিবেন, সে কথা তো কখনই হইতে পারে না। গৃহস্বামী পারস্য ভাষা পড়িতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটী কবিতা রচনা করিলেন, ও বাবুকে শুনাইয়া বলিলেন,—

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন শল্য সেনাপতি।
মোগল গেলেন পাঠন গেলেন ফার্শী খাঁ আজ তাঁতি।"

এই কথা বলিয়াই প্রস্থান। লোহাসুর ভাবিল, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সকলেই রণে পরাভব হইলেন, স-নন্দনকানন এই স্বর্গদেশে আমি বহুকাল একাধিপত্য স্থাপন করিলাম, আজ কি না মর্কটের মত একটা মানুষ আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চায়। এই রহস্য চিন্তা করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। হাসিয়া মনুষ্যকে বলিল—তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না, তোমার মত সামান্য কীটকে আমি যখন এক গালে খাইয়া ফেলিতে পারি, তা আবার তোমার সহিত যুদ্ধ কি করিব? লোকে আমাকে উপহাস করিবে, মা'র বাছা ঘরে ফিরিয়া যাও।

মনুষ্য নিরুপায় দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে দানবকে বলিল,—ভাল প্রকৃতই যদি তুমি এত বলশালী, সত্যই যদি তুমি অমর, তোমার অসাধ্য যদি কিছু না থাকে, তবে আমি একটী কথা বলি, তাহা করিতে পার? তা যদি করিতে পার, তবে আমার মনে বিশ্বাস হয় যে, যথার্থই তুমি অজয় অমর, আর তাহা হইলে তোমার সহিত যুদ্ধ আর কি করিব, কাজে কাজেই ঘরে ফিরিয়া যাইব। দানব উত্তর দিল,—বল, আমি আবার করিতে না পারি কি? মনুষ্য বলিল,—একটু রও, আমি এইখানে কাদা দিয়া একটী ভাঁটি গড়ি, সেই ভাঁটির গায়ে আমার এই জাঁতাটি বসাই, আর তাহার ভিতর কয়লা সাজাই, তুমি যদি সেই কয়লার উপর খানিক-ক্ষণের জন্য স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ দৈত্য বটে! দানব দৈত্য ভূত প্রেতেরা প্রায়ই বোকা হইয়া থাকে; তাহারা বড় ফের ফন্দি বুঝে না, গায়ের বলেই তাহারা জগৎকে শরাখানা দেখে। মন্ত্রবল বুদ্ধিবল যে গায়ের বলের চেয়ে বড়, তাহা তাহারা বুঝে না। তাহার সাক্ষী আবার উপন্যাসের দৈত্যটী, যে মৎসবধী ধীবরের এক কথাতেই তামার হাঁড়ির ভিতর পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিল। আর আমাদের দেশের রোজাদের ত কথাই নাই, বুদ্ধি-কৌশলে তাহারা আজ ও-ভূতটী ধরিয়া কুপার ভিতর পুরিতেছেন; কাল সে-ভূতটী ধরিয়া কুপার ভিতর জাগাইয়া রাখিতেছেন। তাঁদের কাজই হইল এই। দানব হাসিয়া বলিল—আমি মনে করিয়া-ছিলাম, তুমি কি না উৎকট কায করিতে বলিবে। যত বড় খুশী ভাঁটি গড়; বল তো আমি না হয় তোমার সহিত কাদার যোগাড় দিব, যত খুশী কয়লা চাপাও, কয়লায় আগুন দিয়া যত খুশী জাঁতা বহ। একেলা না পার, তোমার যদি কেহ বামা সুন্দরী থাকে, তারেও না হয় ডাকিয়া আন; তোমার কোমর ধরিয়া সেও জাঁতা বহিবে। তার পর যতক্ষণ বল, ততক্ষণ আমি ভাঁটীর ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। ভাঁটি গড়া হইল, কয়লা সাজান হইল, জাঁতা বসানো হইল। হাসিতে হাসিতে দানব গিয়া ভাঁটির ভিতর কয়লার উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিল। মনুষ্য কয়লায় আগুন দিয়া জাঁতায় তাও আরম্ভ করিয়া দিল। আগুন ধরিয়া উঠিল, কয়লা রক্তবর্ণ হইয়া টক্ টক্ করিতে লাগিল। অসুরের গা পুড়িল, দুঃসহ যাতনা হইল, তবুও (দানব কিনা? গাজুরিটুকু তো চাই!) যতই কেন কষ্ট হউক না, প্রকাশ করা কিন্তু হবেনা। তাই লোহাসুর অটল অচলভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে তাহার শরীর লাল হইয়া উঠিল। শরীর গলিতে লাগিল, অবশেষে সমুদয় শরীরটী গলিয়া ভাঁটির বাহিরে গড়াইয়া আসিল। এই যে সব লোহা দেখিতে পাও, খাঁটি লোহাই বল আর লৌহময় প্রস্তরই বল, এসব সেই লোহাসুরের শরীর। কেবল লোহা নয়, পিত্তল কাঁসাও তাই। আর সেই যে মানুষটী, যিনি কৌশল করিয়া লোহাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ও তাহার শরীর গলাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনিও বড় কেও-কেটা নন। তিনি কর্মকার প্রভৃতি কয়েকটী ধাতুসম্পর্কীয় শিল্পকারদিগের পূর্ব-পুরুষ। লোহাসুরের দ্রবীভূত শরীর শীতল হইয়া যেই একটু জমিয়া আসিল, অমনি তিনি তাহা পিটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। পিটিয়া পিটিয়া যে কয় প্রকার ধাতু বাহির হইল তাহা তিনি তাঁহার সন্তানবর্গকে বিভাগ করিয়া দিলেন, যথা—(১) লোহার কর্মকারকে তিনি লৌহ দিলেন; (২) পিত্তল কর্মকারকে পিত্তল দিলেন; (৩) কাঁসারীকে তিনি কাঁসা দিলেন; (৪) স্বর্ণ কামারকে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য দিলেন; (৫) ঘট্টা কর্মকারকে তিনি এরূপ লৌহ দিলেন যাহাতে অনায়াসে কাজলনাতা, লৌহফল ও পুত্তলিকা বিশেষতঃ লক্ষ্মীপূজার সময় যে পেচকের আবশ্যক হয়, তাহা গড়া যাইতে পারে; (৬) চাঁদ কামারকে তিনি এরূপ পিত্তল দিলেন, যাহাতে সুচারু দর্পণ নির্মিত হইতে পারে; (৭) ও (৮) ঠোক্রা ও তাম্রাকে তিনি তাম্র দিলেন। প্রবাদটী জঙ্গল মহলের, সুতরাং যে সকল ধাতুকারদিগের

কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী নাম কিছু জংগলী জংগলী। ইহাদের মধ্যে অনেকের আচার ব্যবহারও তদ্রূপ। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নহে। কেহ বা মুর্গী পোষে ও মুর্গী খায়, আবার কাহারও বা সেই উপাদেয় ভঁইসের মাংস পাইলেই পরম আনন্দ। আবার, ভাদ্র মাসে ঘোর-নিশীথে যখন এই কর্মকার-কুমারীরা হেলিয়া দুলিয়া শ্রীশ্রীভাদু দেবতার স্তুতিসূচক মধুর গান করিতে থাকেন, তখন কার না মন মোহিত হইয়া যায়? পৃথিবীতে যদি এমনও কেউ কঠিনপ্রাণ পাষণ্ড থাকে যে, সেই কোকিলকণ্ঠী কর্মকার-কুমারীদিগের অলকা-তিলকা বিভূষিত সুধাংশু-বিনিন্দিত মুখচন্দ্রমা দেখিয়াও একবারে জ্ঞানহারা না হইয়া পড়ে, গানের ভাব বুঝিলে তাহার আর কিছু বাকি থাকে না। বুকে সকলে সাহস বাঁধুন, আমি সেই গানের দুইটী কথা এখানে বলিয়া ফেলি :—

কদম গাছে উঠ্‌লে ভাদু কাঁচা কদম ভেংগো না।
পাক্‌লে কদম সবাই খাবে কেউ কিছু তখন ব'ল্‌বে না॥

অর্থাৎ কি না, হে ভাদু! তুমি দুড় দুড় করিয়া কদম গাছে উঠিলে দেখিতেছি; কিন্তু কদম ফল এখনও পাকে নাই। কাঁচা কদম ফলগুলি ছিঁড়িয়া বৃথা নষ্ট করিও না। যখন কদম পাকিবে, তখন আমরাও খাইব, তুমিও খাইও; যত ইচ্ছা পাড়িও, কেউ তখন তোমাকে মানা করিবে না। বলা বাহুল্য যে এখানকার লোকে পাকা কদম ফল খাইয়া থাকে।

এই গেল, জংগল-মহলে লৌহ-উৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ। প্রবাদটী সত্য কি মিথ্যা সে বিচার করিবার আমার ক্ষমতা নাই। যদি সে শাস্ত্রজ্ঞানই থাকিবে, তাহা হইলে এই সামান্য নীরস প্রস্তাব লিখিতেই বা প্রবৃত্ত হইব কেন? উপন্যাস রচনা করিতাম, না হয় তীব্র বাক্যে সাহেবদের গালি দিয়া প্রবন্ধ লিখিতাম। আবাল-বৃদ্ধ দেশ-হিতৈষীরা, মায় তাঁদের ছানা-পোনাটী পর্য্যন্ত, সাধু সাধু বলিয়া আমার জয়ধ্বনি করিতেন। হায়! সে যশ আমার কপালে নাই। আমার যে গতিবিধি, দীনহীন ভিখারী ভারতবাসীদিগের পর্ণকুটীরে। আমি যে তাহাদিগের হাঁড়ি উঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করি—"কেমন নন্দুরাম, কাল কতটুকু লোহা নামাইলে, কতকে বেচিলে; দুই দিন ছেলেপিলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে তো?" যাহার গতিবিধি পর্ণকুটীরে, অট্টালিকাবাসীরা তাহাকে ভাল বলিবেন কেন? কুটীরবাসীরা কি খায়, কি পরে, যাহার অনুসন্ধান; উচ্চ রাজতন্ত্রপরায়ণ জ্ঞানগম্ভীর মহোদয়েরা তাহাকে আদর করিবেন কেন? লোহা প্রভৃতি ভারতীয় পণ্যজাত লইয়া যাহার আলোচনা, আপনাদিগের সেই এম এ, বি এ, রূপ মণিময় মুকুটধারী পণ্ডিতেরা সে মূর্খের পানে ফিরিয়া চাহিবেন কেন? সেজন্য আগেই বলিয়া দোষে খালাস হইয়াছি, আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই যে, বিচার করি, এম এ বি এ নাই যে, অগ্নিস্ফুলিংগ বায়ুস্ফুলিংগ উদ্গীরণ করিতে করিতে উগ্রভাবাপন্ন প্রবন্ধ লিখি। তবে একথা বলিতে পারি, যে উৎপত্তি যেরূপেই হইয়া থাকুক, লৌহ একটী মূল বা রূঢ় পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নয়। যৌগিক পদার্থ, দুইটী বা ততোধিক মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইয়া থাকে। উত্তাপ দ্বারা হউক বা তাড়িতবল প্রয়োগে হউক বা অন্য কোন উপায়ে হউক, যৌগিক পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূল পদার্থে পরিণত করিতে পারা যায়, আবার সেই মূল পদার্থগুলিকে লইয়া, পুনরায় রাসায়নিক সংযোগ যেরূপ যৌগিক পদার্থ ছিল, তাহা করিতে পারা যায়। তুঁতে একটী যৌগিক পদার্থ। তামা ও গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশাইয়া তাপ দিলেই তুঁতে হয়। সুতরাং রাসায়নিক উপায় দ্বারা তুঁতেকে বিয়োগ করিয়া ইহা হইতে গন্ধকটুকু ও তামাটুকু পৃথক করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু গন্ধককে বা তামাকে বিচ্ছিন্ন

করিতে পারি না। তাপই দিই, তাড়িতবলই প্রয়োগ করি, যে কোন রাসায়নিক উপায় করি, গন্ধক গন্ধকই রহিয়া যায়, তামা তামাই থাকিয়া যায়। ইহাদিগের ভিতর হইতে আর কোন পদার্থ বাহির করিতে পারি না। তাই, গন্ধক ও তামা মূল পদার্থ, তুঁতে যৌগিক পদার্থ। সেইরূপ লৌহ মূল পদার্থ, হীরাকস যৌগিক পদার্থ। পূর্বকালের পণ্ডিতেরা মোটামুটি পাঁচটী মূল পদার্থ ধরিয়া গিয়াছিলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম, এই পঞ্চভূতে সমুদয় পৃথিবী গঠিত বলিয়া মোটামুটি স্থির করিয়াছিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য তাঁহারা ক্ষিতির ভিতরেই ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রকারেরা ক্ষিতিকে একটি স্বতন্ত্র ভূত বলিয়া গণনা করেন না, ইহাকে যৌগিক বা মিশ্রিত পদার্থ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, বালুকার আকার, চূণের আকর প্রভৃতি নানা মূল পদার্থের ক্ষিতি একটী সমষ্টি মাত্র। সেই সকল দ্রব্যের সহযোগে মৃত্তিকা হয়। তা ভিন্ন মৃত্তিকা আর কিছুই নয়, এই কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। কেবল কথায় বলেন না, এক মুঠা মাটি দিলে তোমার সম্মুখে সেই মাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়া দিবেন, কি কি দ্রব্য মিশিয়া-ঘুষিয়া সেই মাটিটুকু হইয়াছে। তাহাতে কতটুকু সোণা আছে, কতটুকু লোহা আছে, কতটুকু বালির আকর আছে, কতটুকু চূণের আকর আছে, সব কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিবেন। আবার সে হিসাব অব্যর্থ সন্ধান। যেমন দুই আর দুয়ে চারি হয়, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই, সেইরূপ ভাল করিয়া যদি হিসাব করিয়া দেন, তাহা হইলে ইঁহাদিগের হিসাবে আর কোন সংশয় থাকে না। ইউরোপের লোকে দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া এখন ইঁহাদের কথার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস করেন। অনেক টাকা দিয়া ইঁহাদের মত সংগ্রহ করিয়া সেই মতানুযায়ী কার্য্য করেন। শুনিলাম,—সে দিন একজন কলিকাতার সাহেব ছোটনাগপুরে একটী পাহাড় কিনিবার কল্পনা করিয়া সেই পাহাড়ের একমুঠা মাটি পরীক্ষার নিমিত্ত একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পাহাড়ে সোণা আছে কি না, আর কত মাটিতে কতটুকু সোণা পাওয়া যাইতে পারিবে, সেই কথা নিশ্চয়রূপে স্থির করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। পরীক্ষককে এই মাটি লইয়া দুই দিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এই দুই দিন পরিশ্রমের মজুরি স্বরূপ তিনি ১৪০ টাকা লইয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়া দিয়াছেন, ভূমি-ক্রেতা সাহেব অবশ্যই সেই মত কার্য্য করিবেন। তাহা হইলে ঠকিবার সম্ভাবনা কম। যাঁহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভূমি পরীক্ষা করিয়া লন। আমি ঐ জমিটুকু কিনিবার বাসনা করি, তাহাতে আলুর চাষ করিয়া দু-পয়সা পাইব কি না, মাটি পরীক্ষা করিয়া আমাকে বলিয়া দিন। আমি ঐ ভূমিটুকুতে গমের চাষ করিয়াছিলাম, ফসল ভাল হয় নাই, জমিতে কি দ্রব্যের অনটন আছে ; আর তাহাতে কি দ্রব্য দিলেই বা সেই দোষ দূরীভূত হয়, তাহা আমাকে বলিয়া দিন। নানা ব্যবসায়ীরা আপনাদিগের ব্যবসার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এইরূপ নিত্য নিত্যই বিজ্ঞানের সহায়তা লইয়া থাকেন। যাহা হউক পূর্বেই বলিয়াছি যে, এখনকার বিজ্ঞানবেত্তারা ক্ষিতিকে বহু মূল পদার্থে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। তেজ ও আকাশকে বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু জল ও বায়ু যে মূল পদার্থ নয়, তাহা স্থির করিয়াছেন। জগতে যে কোন বস্তু আমরা দেখিতে পাই, মায় মনসুরিটী সরিষাটী পর্য্যন্ত, বিয়োগ ও সংযোগে কাহাতে কি পদার্থ আছে, সকলই স্থির করিয়াছেন। ইহাঁদের কথা আর কি বলিব, কোটী কোটী যোজন দূরে সূর্য্যমণ্ডলে, আবার তার চেয়ে কোটী কোটী যোজন দূরে নক্ষত্রমণ্ডলে, কোনটীতে কি পদার্থ আছে, তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন। জগতের বস্তুসমূহের মধ্যে কেবল ৬৩টি দ্রব্যকে ইহাঁরা কোনও উপায়েই বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে অন্য পদার্থ

বাহির করিতে পারেন না। তাই, এই ৬৩টি পদার্থকে ইহাঁরা মূল পদার্থ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। মূল বা রূঢ় পদার্থদিগের মধ্যে কতকগুলি ধাতু, কতকগুলি ধাতু নহে। এইরূপ প্রস্তাবে নানারূপ মূল ও যৌগিক পদার্থ লইয়া আমাদিগের কাজ পড়িবে। সকল সময়ে গল্প করিয়া বুঝাইতে পারিব না। কাজেই গুটিকত পদার্থের নাম ও গুণের কথা কিছু কিছু বলিতে হইতেছে। অনেক গুলিনের আবার বাঙ্গালা নাম নাই। কতকগুলির বাঙ্গালা নাম থাকিলেও ইংরাজী নামই অধিক প্রসিদ্ধ। ইংরাজি নাম করিলে বরং কিয়ৎপরিমাণে লোকে বুঝিবেন, কিন্তু বাঙ্গালা নাম করিলে একেবারেই হয় তো কেহ দন্তস্ফুট করিতে পারিবেন না। ৬৩টি মূল পদার্থের মধ্যে ৪৮টি ধাতু আর ১৫টি ধাতু নহে। ৪৮টির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম এখানে করিতেছি, যথা,—(১) এলুমিনিয়ম, ইহাকে সোজাসুজি ফটকিরির পাথর বলা যাইলেও যাইতে পারে। কারণ ইহার সহিত অন্যান্য পদার্থ সংযুক্ত হইয়া বাজারে যে ফটকিরি দেখিতে পাই, সেই যৌগিক দ্রব্যটী উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২) এণ্টিমনি ইহাকে সুরমার পাথর বলিতে পারি, কারণ ইহা হইতেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা চক্ষে যে সুরমা লাগান, তাহা প্রস্তুত হয়। (৩) বিসমথ, ইহা হইতে শুভ্রবর্ণ এক প্রকার যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হয়। উদরে বেদনা হইলে ডাক্তারেরা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৪) ক্যালসিয়াম, ইহাকে চুণের আকর বলিতে পারা যায়, কারণ ইহা হইতে যৌগিক পদার্থ চুণ উৎপন্ন হয়, খড়িমাটি ও ইহার আর একটী যৌগিক পদার্থ। (৫) কোবাল্ট, জয়পুর অঞ্চলে এই ধাতু পাওয়া যায়, সেখানে ইহাকে সৈতা বলে। (৬) ম্যাগনেসিয়ম, ইহা হইতে ম্যাগনেসিয়া নামক যৌগিক পদার্থটী উৎপন্ন হয়; তাহা সচরাচর চিকিৎসা-প্রকরণে ব্যবহার হইয়া থাকে। (৭) ম্যাঙ্গানিস, এই ধাতুটী ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাওয়া যায়। কাচ প্রস্তুত করিতে বিলাতে সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। আধুনিক প্রণালীতে আকর হইতে লৌহ-নিষ্করণ কার্য্যেও ইহার বিশেষ আবশ্যক। (৮) নিকেল, ইহা একটী নূতন আবিষ্কৃত ধাতু। দস্তা তামা ও এই নিকেল একত্র গলাইয়া নকল রৌপ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাজারে ইহার নাম জর্ম্মান সিলভার। ঠিক রূপার মত বাজারে যে চামচা বিক্রয় হয়, তাহা এই নকল রৌপ্য হইতে প্রস্তুত। (৯) পটাসিয়াম, এক প্রকার ক্ষার। নানা প্রকারে নানা বিষয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে। (১০) সোডিয়ম, যাহা হইতে সোডা হয়। আপাতত এই দশটী ধাতুর নাম করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আর বেশী নাম করিতে গেলে সকলে আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন, মনেও করিয়া রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু যখন কেবল দশটীর নাম করিয়াই সকলকে নিষ্কৃতি দিলাম, তখন পাঠকবর্গকে আমার নিকট ঋণী হওয়া উচিত। অর্থ দিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না, তাঁহারা যদি এই দশটী ধাতব মূল পদার্থের নাম মনে করিয়া রাখেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব। পুনরায় এই দশটীর নাম করিতেছি; এলুমিনিয়ম বা ফটকিরির আকর; এণ্টিমনি বা সুরমার আকর; বিসমথ, ক্যালসিয়ম বা চুণ ও খড়ির আকর; কোবাল্ট, ম্যাগনেসিয়ম, ম্যাঙ্গানিস, নিকেল, পটাসিয়ম, সোডিয়াম। এই দশটী ছাড়া সোণা, রূপা, তামা, সিসা, লোহা, পারা, টিন, দস্তা এ আটটি ধাতুর নাম তো সকলে জানেনই। সর্বশুদ্ধ ৪৮টি ধাতুর মধ্যে দশটি আর আটটী ১৮টির নাম জানা হইল। আশা করি, সকলে এই ১৮টীর নাম মনে করিয়া রাখিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, যে ৬৩টী মূল বা রূঢ় পদার্থের মধ্যে ১৫টী ধাতু নহে। এই ১৫টীর মধ্যে দুইটী অধিক পাওয়া যায় না, কার্য্যেও বড় লাগে না। তাহাদের ছাড়িয়া বাকি ১৩টীর নাম করিতেছি। (১) আর্সেনিক, সংখীয়া বা

শেঁকো বিষ। ইহা কি তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। (২) বোরণ, ইহা হইতে সোহাগা হয়। (৩) ব্রোমীণ, সমুদ্রের জল জাল দিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রোমাইড অফ পটাসিয়ম নামক মহৌষধ ইহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মূল পদার্থ সমূহের মধ্যে কেবল দুইটী বস্তু তরলভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এক এই ব্রোমীণ, দ্বিতীয়টী পারা। এতদ্ভিন্ন অপরাপর পদার্থ হয় কঠিন না হয় বাষ্প। (৪) কার্ব্বণ বা অঙ্গার, ইহার কথা পরে বলিব। (৫) ক্লোরীণ ইহা এক প্রকার বাষ্প, এই বাষ্প সোডা সহযোগে লবণ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ বাষ্পকে দেখিতে পাওয়া যায় না। লবণকে রাসায়নিক উপায়ে বিযোগ করিলে ইহা পাওয়া যায়। (৬) ফ্লুরীণ, ইহাও একপ্রকার বাষ্প, চূণের আকর প্রভৃতি পদার্থে মিশ্রিত হইয়া থাকে, সহজে বাহির করা যায় না। (৭) হাইড্রোজেন বা জলজান, ইহার কথা পরে বলিব। (৮) আয়োডীন, সমুদ্রের উদ্ভিজ্জ শরীরে, সোডা প্রভৃতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ঔষধাদিতে উহা ব্যবহৃত হয়। (৯) নাইট্রোজেন যবক্ষারজান, ইহার কথা পরে বলিব। (১০) অক্ষিজেন, অক্সিজেন বা অম্লজান ইহার কথা পরে বলিব। (১১) ফস্ফরস, আমাদের শরীরের নানা অংশে এই দ্রব্য বর্ত্তমান আছে। শরীরের নানা অংশ বিশেষতঃ অস্থি গঠনের নিমিত্ত ইহা নিতান্ত আবশ্যক। অস্থি ভস্ম করিয়াই ইহা সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটু ঘসিলেই ইহা হইতে অগ্নি উৎপাদন হয়। ইহা দ্বারাই বিলাতী দিয়াশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১২) সিলিকন বা বালুকার আকর। (১৩) গন্ধক অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বণ এই চারিটী মূল পদার্থের কেবল নাম উল্লেখমাত্র করিয়াছি, অধিক আর কিছু বলি নাই। এই চারিটী পদার্থ যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। প্রাণী মাত্রের ইহারাই জীবন, প্রাণী মাত্রের ইহারাই দেহ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাংগালা ভাষায় রাসায়নিক শাস্ত্রে অক্সিজেন 'অম্লজান' নামে অভিহিত হইয়াছে। কেননা, দ্রব্যসমূহের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া অম্লগুণ বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। যত মূল পদার্থ আছে, তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অক্সিজেন পরিমাণে অধিক। খাঁটি অক্সিজেন একটি বাষ্প। চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। চারিদিকে যে বায়ুর ভিতরে আমরা বাস করি, তাহার তিন আনা অংশ অক্সিজেন। আর পৃথিবীতে যত মৃত্তিকা প্রস্তর ইত্যাদি কঠিন পদার্থ আছে, সে সমুদয়কে যদি একেবারে ওজন করি, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক অক্সিজেন। জলের প্রায় পনের আনা ভাগ অক্সিজেন। অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া অক্সিজেন যখন একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থ নির্ম্মাণ করে, তখন ইহা কঠিন আকার ধারণ করে। আবার সেই যৌগিক পদার্থকে বিযোগ করিলেই, ইহা স্বতন্ত্র হইয়া পূর্ব্বৎ স্বীয় বাষ্পীয় আকারে পরিণত হয়। মৎস্য যেরূপ জলের ভিতর থাকে, এই যে সেইরূপ বায়ুর ভিতর আমরা ডুবিয়া আছি, সেই বায়ুর তিন আনা ভাগ অক্সিজেন, বাকী নাইট্রোজেন। বায়ুতে যে নাইট্রোজেন, তাহা অক্সিজেনের সহিত এক সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু দুইটীতে রাসায়নিক সংযোগ হইয়া একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থ-ভাবে নাই। পৃথিবীতে আবার অনেকস্থানে হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ মিশ্রণ অন্য প্রকার, ইহা রাসায়নিক সংযোগ। এই সংযোগে একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই যৌগিক পদার্থের নাম জল, যাহা আমরা পান করিয়া জীবন ধারণ করি এবং যাহা দ্বারা আমাদিগের আহারীয় শস্যাদি বর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হয়। হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিলনে জল হয় বলিয়া হাইড্রোজেনের নাম জলজান। বায়ুতে থাকিয়া

অক্সিজেন নানা দ্রব্যের সহিত সর্বদাই মিশিতেছে আর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া নানারূপ বিভিন্ন বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করিতেছে। যেখানে অক্সিজেন কোন দ্রব্যের সহিত মিশিয়া একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিতে থাকে, তখন সেখানে উত্তাপ বাহির হয়। সেই উত্তাপ কখনও অধিক হয়, কখনও কম হয়। বাহিরে একখানি লোহা পড়িয়া থাকিলে তাহার সহিত যখন আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে অক্সিজেন মিশিয়া একটী যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, যাহাকে আমরা 'মরিচা' বলি, তখন এত অল্পমাত্র উত্তাপ বাহির হয় যে, আমরা একেবারেই অনুভব করিতে পারি না। আবার যখন কোন দ্রব্যের সহিত খুব শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণে অক্সিজেন মিশে, তখন উত্তাপ এত অধিক হয় যে, তাহাতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। কাঠ ও কয়লায় অধিক পরিমাণে কার্বণ থাকে ; বস্তুত বিশুদ্ধ কয়লাই কার্বণ, তজ্জন্য কার্বণের বাংগালা নাম অঙ্গার। এই কার্বণের সহিত যখন অক্সিজেন মিশিয়া একটী স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে থাকে, তখন সেই মিশ্রণকার্য্যের সময় কি হয় তাহা সকলেই জানেন। কাঠ ও কয়লাস্থিত কার্বণে যে উত্তাপটুকু সঞ্চিত থাকে তাহা বাহির হইয়া পড়ে, জ্বলন্ত শিখা হইয়া আগুণ জ্বলিতে থাকে। কাঠ বা কয়লাস্থিত কার্বণ ও বায়ুস্থিত অক্সিজেন এই দুইটী পদার্থ এইরূপে রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হইয়া, একটী যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। সে যৌগিক পদার্থটী বাষ্প, তাহা বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, চক্ষে দেখিতে পাই না। কাঠ ও কয়লায় যা কিছু ধাতব পদার্থ আছে তাহাই ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। কার্বণ ও অক্সিজেন সংযোগে যে যৌগিক পদার্থটী উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়, তাহাকে কার্বণিক অম্ল বা কার্বণিক য়্যাসিড গ্যাস বলে। এই বাষ্পটী ভয়ানক বিষ। যেখানে ইহা অধিক পরিমাণে আছে, সেখানে কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। নিশ্বাসের সহিত লইয়া মরিয়া যায়। কয়লায় অধিক পরিমাণে কার্বণ আছে, সুতরাং কয়লা জ্বালাইলে অধিক পরিমাণে কার্বণিক অম্ল উৎপন্ন হয়। ঘরের বাহিরে, কিংবা যে ঘরে দ্বার জানালা খোলা আছে, এরূপ ঘরে কয়লা জ্বালাইলে, কার্বণিক অম্ল উত্থিত হইয়া বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া যায়, তাহাতে মনুষ্য-জীবনের কোন অপকার হয় না। কিন্তু ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া কয়লা কি গুল জ্বালাইলে, ঘরের অক্সিজেন লইয়া কার্বণ কার্বণিক অম্ল উৎপাদন করে। সেই বাষ্প ঘরেই রহিয়া যায়, বাহিরে যাইতে পায় না। বাহির হইতে অক্সিজেন আসিয়াও ঘরের বায়ুকে সংশোধিত করিতে পারে না। এ অবস্থায় অতীব দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অনেকেই না জানিয়া এই বাষ্প হইতে প্রাণ হারাইয়া থাকেন। শুইবার ঘর কিংবা আঁতুড় ঘর উত্তপ্ত রাখিবার জন্য, দোষাদোষ না জানিয়া কেহ কেহ ঘরে কয়লা বা গুল জ্বালাইয়া, দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া শুইতে যান। শীঘ্রই তাঁহারা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। ইহকালে সে কালনিদ্রা আর ভঙ্গ হয় না। কখন মরিলাম তাহা টেরও পান না। এইরূপ দুর্ঘটনার কথা প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে। ফরাসী দেশে অনেকে এই উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। এই বিষে বিষাক্ত হইয়া একবার আমিও মরিতে মরিতে রহিয়া গিয়াছি। আমার জ্বর হইয়াছিল। শীতকাল, গায়ের শীত-শীত আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। তাই ভাবিলাম, ঘরে গুলের আগুণ করিয়া শুই। কার্বণিক অম্লের কথা জানিতাম। তাই বাহিরে গুল ধরাইলাম, যখন খুব ধরিয়া গুলগুলি লাল টক টক করিতে লাগিল, তখন ঘরের ভিতর লইয়া আসিলাম, মনে করিলাম ইহাতে আর কোন দোষ হইবে না। কিন্তু এরূপ করিয়াও ঘরের বায়ু বিলক্ষণ দূষিত হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে জ্বর হইয়াছিল, শরীরে অসুখ ছিল, তাহার জন্য একেবারে

নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি নাই। খানিক রাত্রিতে ভয়ানক শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল, মাথা আর তুলিতে পারি না। উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেই অমনি ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাই। অতিকষ্টে দ্বার খুলিয়া দিলাম, জানালা খুলিয়া দিলাম। বাহির হইতে অক্সিজেন আসিয়া ক্রমে ঘর হইতে কার্বণিক অম্লকে দূরীভূত করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে তবে আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইলাম। কয়েক বৎসর গত হইল সিমলার পাহাড়ে কার্বণিক অম্লের দ্বারা একেবারে চৌদ্দ-জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। তখন আমি সিমলায় ছিলাম। শীতকাল বরফ পড়িতেছে, গাছপালা পাহাড়-পর্বত সমুদায়ই বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। ভারত-সেনাপতি নেপিয়র সাহেব সেই সময় সিমলা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে অনেক কুলি ছিল ; রাত্রিকালে কুলিরা শিবিরের ভিতর নিদ্রা যাইত। একটী তাঁবুতে চৌদ্দজন কুলি শুইত। বড় শীত, পাহাড়ী লোক হইলে কি হয়, গরিব মানুষ, অধিক কাপড় চোপড় তো নাই! শীতে তাহাদিগের কাজে কাজেই কষ্ট হইতেছিল। একদিন, দিনমানে তাহারা কোন জমিদারের নিকট হইতে দুই ঝুড়ি কয়লা পাইয়াছিল। রাত্রিকালে তাঁবুর মাঝখানে একটী গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তে কিছু আগুণ দিয়া তাহার উপর দুই ঝুড়ি কয়লা একে-বারে ঢালিয়া দিয়াছিল। গর্ত্তের ভিতর কয়লা পুড়িতে লাগিল, চারিদিক ঘেরিয়া কুলিরা শুইল। তাঁবুর নিম্নভাগে যে এক আধটু ফাঁক ছিল, রাত্রিতে বরফ পড়িয়া সে ফাঁকটুকুও বুজিয়া গেল। সকাল হইলে সকলে দেখিল, তেরজন লোক একেবারে মরিয়া গিয়াছে, কেবল তাঁবুর দ্বারের নিকট যে লোকটী শুইয়া ছিল, তাহার ঈষৎমাত্র শ্বাস বহিতেছে। কয়লার খনি, জাহাজের খোল ও পুরাতন কূপেও কার্বণিক অম্লের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতেও অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এক বৎসরের অধিক হইল, বিলাত হইতে কলিকাতায় একখানি জাহাজ আসিতেছিল। তাহাতে এই বাষ্প দ্বারা সাত আটজন লোকের মৃত্যু হয়। প্রায় দুই বৎসর হইল চুঁচুড়ার ষাঁড়েশ্বরতলায় একটী পুরাতন কূপে এইরূপে চারি পাঁচ জন লোকের মৃত্যু হয়। সেই কূপে প্রথম যে লোকটী নামিল, সে তলভাগে পেঁাছিতে না পেঁাছিতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। উপরে যাহারা ছিল, তাহারা বুঝিতে পারিল না যে, কি হইয়াছে। নীচে যে লোকটী নামিয়াছে তার কোন সাড়া শব্দ নাই কেন? দেখিবার জন্য আর একজন লোক নামিল। নীচে না পেঁাছিতে পেঁাছিতে সেও মূর্চ্ছিত হইল। এইরূপে একে একে তার পর যে কয়জন নামিল, সকলেরই প্রাণ নষ্ট হইল। পুরাতন কূপ, যাহা অনেকদিন ধরিয়া ব্যবহার হয় নাই, কিংবা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নামিতে হইলে প্রথমে একটী প্রজ্বলিত দীপ বা উদ্দীপ্ত বাতিতে দড়ি বাঁধিয়া তাহার ভিতর ঝুলাইয়া দিতে হয়। যদি দীপ বা বাতিটী ভিতরে গিয়া জ্বলিতে থাকে তবে সে কূপে নামিতে কোন ভয় নাই। যদি বাতিটী ভিতরে গিয়াই টুপ করিয়া নিবিয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, প্রাণপ্রদীপও সেখানে টুপ করিয়া নিবিয়া যাইবে। বাতি তাহার ভিতর জ্বলিতে থাকিলে জানিবে যে, কার্বণিক অম্ল সেখানে হয় একবারেই নাই কিংবা যৎসামান্য ভাবে আছে। অক্সিজেন না থাকিলে দাহন-কার্য্য হয় না, অক্সিজেন কোনও একটী বস্তুর সহিত মিশিয়া অপর একটী যৌগিক পদার্থকে উৎপন্ন করার নামই পোড়া। উত্তাপ বাহির হওয়া সেই মিশ্রণ কার্য্যের লক্ষণ মাত্র। সুতরাং যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে কোন বস্তু দগ্ধ হইতে পারে না, সেখানে প্রদীপ জ্বলিতে পারে না, প্রাণাগ্নিও সেখানে নির্বাণ হইয়া যায়। তাই অক্সিজেন প্রাণী মাত্রের জীবনস্বরূপ। এই যে আমাদের দেহ রাবণের চিতার ন্যায়, ইহা দিবারাত্রি হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। আগুণ নিবিলেই

মৃত্যু। আমাদের খাদ্য সামগ্রী সমুদয় নাইট্রোজেন, কার্বণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশেষরূপে এই চারিটী মূল পদার্থের সহযোগেই নির্মিত। সুতরাং আহারের সংগে সর্বদাই শরীরে কার্বণ প্রবেশ করিতেছে। কাঠ ও কয়লা রূপে এই কার্বণ জীবনাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত রাখিতেছে। যেমন আহারের সংগে কার্বণের যোগান চাই, তবে অগ্নি জ্বলিতে থাকিবে, তেমনি অক্সিজেনের যোগান চাই, তবেই এই প্রাণহুতাশন জ্বলিবে। পান ভোজনের সহিত যেটুকু অক্সিজেন উদরস্থ হয়, তাহাতে এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মৎস্য যেরূপ জলে থাকে, আমরাও বায়ুর ভিতর সেইরূপ ডুবিয়া আছি। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন আছে। এই অক্সিজেন আমরা অহরহ নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি। অক্সিজেন শরীরের ভিতর গিয়া কি করে? শরীরের ভিতর যে কার্বণ আছে, তাহার সহিত রাসায়নিকভাবে মিশ্রিত হয়। অক্সিজেন যখন কার্বণের সহিত মিশিতে থাকে, তখন কি লক্ষণ উপস্থিত হয়? অগ্নি হয়, উত্তাপ হয়, তাহাই জীবনাগ্নি। এই মিশ্রণ কার্য্যের লক্ষণ অগ্নি বটে, কার্বণে যে উত্তাপ সঞ্চিত ছিল, তাহা অক্সিজেনের সহিত মিশিবার সময় বাহির হইয়া পড়ে বটে; কিন্তু কার্বণ ও অক্সিজেনে মিশিয়া ফল কি হইল, কি নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইল! পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই দুই বস্তুর সহযোগে উৎপন্ন হয়, সেই ভয়ানক বিষময় কার্বণিক য়্যাসিড গ্যাস। এই বিষময় বাষ্পটী শরীরে থাকিয়া পাছে রক্তকে দূষিত করে, তাই প্রশ্বাসের সহিত আমরা ইহাকে বাহির করিয়া দিই। সুতরাং একঘরে অনেক লোক শয়ন করিলে সকলে মিলিয়া অক্সিজেনটুকু টানিয়া লন, কার্বণিক অম্ল প্রশ্বাসের সহিত ছাড়িয়া ঘরটি তাহাতেই পরিপূর্ণ করেন। কাজেই ঘরে কয়লা জ্বালাইয়া শয়ন করাও যা, আর একঘরে অনেক লোক শোয়াও তা। ইহাতে পীড়া হইবার কেন সম্ভাবনা তাহা বুঝিলেন তো? আচ্ছা, এই যে অসংখ্য জীবজন্তু, অসংখ্য মনুষ্য কাল-কালান্তর হইতে অহোরাত্র অবিরত প্রশ্বাসের সহিত কার্বণিক অম্ল বাহির করিয়া দিতেছে, সে কার্বণিক অম্ল কোথায় যায়? পৃথিবী কেন তাহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যায় না? তা যদি যাইত, তাহা হইলে এই ধরাধামে আজ একটী প্রাণীও জীবিত থাকিত না। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল শুন। আমরা যেমন নিশ্বাসে অক্সিজেন লই, প্রশ্বাসে কার্বণিক-অম্ল ত্যাগ করি। গাছেরা তাহার ঠিক বিপরীত করে, তাহারা নিশ্বাসে কার্বণিক-অম্ল লয়, প্রশ্বাসে অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছেদের তো নাক নাই, তবে কি করিয়া তাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহাদিগের পাতার নিম্নদেশে অনেক ছিদ্র আছে, তাহা দ্বারাই এই কার্য্য সমাধা হয়। সুতরাং আমরা যে কার্বণিক অম্ল প্রশ্বাসের সহিত ত্যাগ করি, যাহা বায়ুতে মিশিয়া যায়, গাছেরা তাহা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে। মনে আছে ত,—কার্বণিক অম্ল একটী যৌগিক পদার্থ, মূল পদার্থ নয়, ইহা কার্বণ ও অক্সিজেনের সহযোগে হইয়াছে। গাছেরা এই বাষ্পকে নিশ্বাসের সহিত লইয়া সূর্য্যালোকের সহায়তায় কার্বণকে একদিকে আর অক্সিজেনকে একদিকে পৃথক করিয়া ফেলে। কার্বণটুকু লইয়া ছাল কাঠ করিয়া আমাদের দেহ পরিবর্দ্ধন করে, আর অক্সিজেনটুকু ছাড়িয়া দেয়। একদিকে জীবজন্তু অপরদিকে উদ্ভিজ্জ, এই দুই দলে ক্রমাগত এইরূপে কার্বণ ও অক্সিজেনের বিনিময় চলিতেছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উদ্ভিজ্জ-শরীর হইতে অন্ধকারে অক্সিজেন বাহির হয় না। অন্ধকারে কার্বণিক-অম্ল বাহির হয়। সুতরাং রাত্রিকালে শুইবার ঘরে অধিক ফলফুল পাতা রাখা ভাল নয়। বিলাতে দুই একজন কমলালেবু ব্যবসায়ীর এইরূপে মৃত্যু হইতে শুনিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে অগ্নি জ্বলিতে

পারে না। আবার যদি খাঁটি অক্সিজেনের ভিতর কোন দ্রব্য দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে অতি সত্বর হু হু করিয়া সেই দ্রব্যটি পুড়িয়া যায়। খাঁটি অক্সিজেনের ভিতর কোন দ্রব্য পোড়াইলে বড়ই উত্তাপ হয়। যে দ্রব্য বাহিরের বায়ুতে সহজে পোড়াইতে পারা যায় না, খাঁটি অক্সিজেনের ভিতর সে দ্রব্য অনায়াসেই পুড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ভিতর থাকিলে, খাঁটি অক্সিজেনের নিশ্বাস লইলে, পাছে আমাদের এই প্রাণাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া সত্বর আমরা পুড়িয়া মরি, তাই যে বায়ুর ভিতর আমরা ডুবিয়া আছি তাহা শুধু অক্সিজেন নয়। অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন নামক বাষ্প আমাদিগের এই বায়ুতে বিস্তার রহিয়াছে। এই নাইট্রোজেন একটী মূল পদার্থ, ইহা হইতে সোরা, নিষাদল প্রভৃতি বস্তু সমূহ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ইহার নাম যবক্ষারজান।

এতক্ষণ ধরিয়া বড়ই নীরস বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু কি করি, আজকালের যে কোনও ব্যবসার কথা বলিতে যাইব, তাহাতেই এই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বণ প্রভৃতি পদার্থের বিযোগ, সংযোগ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম ব্যবহার। একে তো জ্ঞান উপার্জন করাই কঠিন; তাতে আবার সেই জ্ঞান পার্থিব পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া কিরূপে অর্থ উপার্জিত হয়, তাহা বুঝাইতে হইবে। ইংরেজেরা ছাই-মুঠাটা ধরিয়া কিরূপে সোণা-মুঠাটা করেন, তাহা বলিতে হইবে। কাজেই এভাবের প্রস্তাব আগাগোড়া খাসগল্পের মত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষেই সাহেবেরা ছাই-মুঠাটা ধরিয়া সোণা-মুঠাটা করিয়া থাকেন। যেখানে বামা ও নস্তুরাম পাথর হইতে লোহা বাহির করে, সেখান হইতে কেবল মাটি কাটিয়া কলিকাতায় আনিতে যা খরচ পড়ে, বিলাত হইতে ইংরেজেরা লোহা আনিয়া আমাদিগকে সেই দামে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাতে আর বামার ঘরে অন্ন থাকিবে কি? বামার ছেলেপিলে কেন না পেটের জ্বালায় পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে? কিন্তু দোষ কার? বামার দোষ নয়, নস্তুরামেরও দোষ নয়, অন্ন বিহনে অস্থি-পঞ্জর-সার ছেলে দুইটীরও দোষ নয়। আহা! ইহারা কি জানে! দোষ আমার, ও আমার স্বজাতি ব্রাহ্মণবর্গের। সেই না আমরা, যাহারা নানা শাস্ত্র রচনা করিয়া জগৎকে একদিন শিক্ষা দিয়াছিলাম? বড় কথা দূরে থাকুক। ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি অতি সামান্য কয়টী অঙ্ক রচনা করিয়াছিলাম, তাহাতেই আজ জগৎ চলিতেছে, আজও জগতের লোক সেই অঙ্ক সন্নিবেশ প্রণালীর চাতুর্য্য দেখিয়া চমকিত হইতেছে। বীজগণিত প্রভৃতি উচ্চ শাস্ত্রের কথায় আর কাজ কি? কিন্তু আজ আমাদের পানে একবার চাহিয়া দেখ! জগতের শিক্ষাদাতা, জগতের পূজ্য না হইয়া, আমরা সেদিন হইলাম "কাফের" আবার আজ হইয়াছি "নিগার।" কেন বল দেখি? একটী বিশেষ কারণ এই—আমরা ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম বলিয়া বসিয়া রহিলাম। কালে "ক" অক্ষর এদেশে অখাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইল, পূর্বার্জিত ধন একে একে সকলই গালে দিলাম, হায়! আমাদের যাহা কিছু ছিল, ক্রমে সকলই লোপ হইল। কিন্তু অন্যান্য জাতিরা এই ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম ভাঙিগয়া চুরিয়া নানা অপূর্ব শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন, নানা অপূর্ব পদার্থের রচনা করিলেন, নানা অদ্ভুত বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, আর এই বিশ্বসংসারনিহিত ভীষণ আসুরিক বল সমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। তাই, আজ তুরস্ক আরব্য, পারস্য গান্ধার, ভারত শ্যাম, চীন মহাচীন, সমস্ত পৃথিবী, এই যশঃপ্রদায়িনী, ধন-প্রদায়িনী, বলপ্রদায়িনী, বিদ্যার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। এই মহাবিদ্যা তোমারও নন আমারও নন। "গোদা বাড়ি ছাঁদন দড়ী তুমি কার? না, যখন যার কাছে থাকি, তখন তার!" যাঁহার হৃদয়ে এক্ষণে এই মহাবিদ্যা বিরাজ করিতেছেন, আজ তিনিই বিপুল বলশালী, তাঁরই ঘর ধনধান্যে

উচ্ছলিত, ধরাধামের তিনিই অধীশ্বর, আর তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ বল, শূদ্র বল, সকলেই গল-বস্ত্র। মনের কালী যায়, চক্ষের জল মুছিয়া হাসি,—যদি এই মহাবিদ্যাকে আনিয়া সতীহারা শিবসদৃশ উদাসীন ছন্নছাড়া পিতৃভূমি জন্মভূমিকে ফিরিয়া দিতে পারি। সকলে এস, ভাই, সেই মহাবিদ্যার অন্বেষণ করি; যেখানে পাই তাঁকে সেইখান থেকে ধরিয়া আনি।

লোহের বিষয় এখনও কিছুই হয় নাই;- সূচনা হইয়া রহিল। বাকি পরে লিখিব।

অক্সিজেন, অর্থাৎ যে বাষ্পটী অদৃশ্যভাবে আমাদের বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে আছে, যাহাই আমাদের বায়ুর তৃতীয়াংশ, যে অক্সিজেনের অভাবে দহন কার্য্য হয় না, যাহা নানা বস্তুর সহিত মিশিয়া নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করিতেছে, যেটীকে আমরা নিশ্বাসের সহিত লইয়া জীবিত থাকি; হাইড্রোজেন, অর্থাৎ যে বাষ্পটীর সহিত অক্সিজেন মিশিলে "জল" যে যৌগিক পদার্থ, তাহার সৃষ্টি হয়; কার্বণ, যাহা কাঠ ও কয়লার ভিতর প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং যাহার সহিত অক্সিজেন মিশিবার সময় উত্তাপ বাহির হয়, যে উত্তাপের সহায়তায় আমরা রন্ধনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করি ; ফস্ফরস্, অর্থাৎ যে বস্তু চূণের সহিত মিশিয়া জীব-শরীরে অস্থিগুলির কঠিন অংশটী নির্মাণ করে, যাহা একটু ঘষিলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়, যাহা হাড় হইতে লোকে বাহির করিয়া লয় ও বিলাতী দীপ-শলাকা প্রস্তুত করে; সিলিকন, যাহা দ্বারা এই যে বালুকারাশি আমরা সচরাচর পদ-দলিত করি, আর এই যে নানাবিধ প্রস্তর আমরা দেখিতে পাই, তাহাদিগের অধিকাংশ ভাগই যাহা দ্বারা গঠিত; মাঙ্গেনিস, যে পদার্থটী বিলাতে কোনও কোনও প্রকার কাচ প্রস্তুত করিতে লাগে;—যদিও এই সমুদয় পদার্থের নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের শিল্পকারেরা অবগত নহেন, তথাপি তাঁহাদিগের কার্য্য-কৌশলকে কেহ যেন হেয় জ্ঞান না করেন। সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা, তাঁহাদিগের মনে এখনও কিছু কিছু বর্তমান রহিয়াছে, কার্য্যে প্রকাশও পাইতেছে। যুগ যুগান্তর হইতে পিতা, পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছেন, পুত্র আবার তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দিয়াছেন। এইরূপে এই জ্ঞান পুরুষানুক্রমে ক্রমাগতই চলিয়া আসিতেছে। যখন হিন্দুজাতি জীবিত ছিল, হিন্দু-দেহে যখন প্রাণ ছিল, তখন এই অভিজ্ঞতা ক্রমশই বর্ধিত হইতেছিল। কেবল নিজেই যে তাঁহারা নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতেন, তাহা নহে, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই জ্ঞান উদরস্থ করিয়া তাঁহারা স্বদেহ পুষ্ট ও বলশালী করিতেন। নানাদেশে তাঁহাদিগের জয়-পতাকা উড়িত, আজও নানা দ্বীপে নানা দেশে তাঁহাদিগের কীর্তিস্তম্ভ মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হে হিন্দু! আজ তুমি মৃত! সেই প্রবল-পরাক্রান্ত, জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত, দেবসদৃশ আর্য্যজাতি আজ মৃত। আর্য্য-বংশ-সম্ভূত লক্ষ লক্ষ নরনারীর দেহ আজ জীর্ণ ও শীর্ণ, মন নিস্তেজ ও নিশ্চল। যখন আমরা জীবিত ছিলাম, তখন কিরাত যবন প্রভৃতি বিদেশীয় বিজাতিসমূহ, আর্য্য-পরাক্রম সেই গগনভেদী আর্য্য-মনের উচ্চতা কিরূপ, তাহা জানিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখ, এই দেহ প্রাণ-শূন্য ও নির্জীব।

হে প্রাচীন আর্য্যগণ! স্বর্গ হইতে একবার আপনাদিগের এই দীন হীন সন্ততিদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন। এই খণ্ডের* প্রথম পৃষ্ঠায় আমরা যে চিত্রখানি দিতেছি, চক্ষু মেলিয়া একবার যেন তাহারা সেই চিত্রখানি দেখিতে পায়। ভারতের গৌরব-সূর্য্য একেবারেই অস্তমিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সূর্য্যরশ্মি আজও এই চিত্রখানিতে নিহিত রহিয়াছে, যেন সেই আলোকে ক্ষণেক মাত্রের

* জন্মভূমি, ফাল্গুন : ১২৯৭ সংখ্যায় প্রদত্ত দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চিত্র।

নিমিত্তও তাহাদিগের মন আলোকিত হয়। তাহা হইলে, আশা হইতে পারে যে, একবারে আমরা মরি নাই, কালে ঐ তিমিরময় উদয়াচলে পুনরায় সেই ভরত-গৌরব-রবিকে উদিত হইতে দেখিব।

চিত্রখানি পুরাতন দিল্লী হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ, যেখানে ময়দানব রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্রসভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যেখান হইতে ভীমার্জ্জুন-নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয়-বীরগণ নির্গত হইয়া জগৎকে কম্পিত করিয়াছিল। ছবিখানি একটী লৌহস্তম্ভের। কবে, কে, এই লৌহ-স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার কিছু ঠিক নাই। কেহ বলেন, ইহা পাণ্ডবদিগের সময় হইতে এখানে আছে। কেহ বা এ কথা বলিয়া থাকেন যে, পঞ্চদশ শতবর্ষ অতীত হইল দিল্লী প্রদেশে ধাব নামক এক নরপতি ছিলেন, তিনিই এই লৌহ-স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত করেন। দেবনাগর অক্ষরে ইহার উপর কিছু লেখাও আছে, কিন্তু সে অক্ষরগুলি এরূপ আঁচড় পিঁচড়ের মত যে, তাহা পড়িতে পারা যায় না। প্রিন্সেপ সাহেব বলেন যে, ইহাতে এই কয়টী কথা লেখা আছে—"রাজা ধাব এই স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করেন, ইহা তাঁহার কীর্ত্তিভুজ, ইহাতে যে সমুদয় চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, খড়্গ দ্বারা সেইরূপ চিহ্ন তিনি তাঁহার শত্রু-শরীরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন; বাহুবলে তিনি পৃথিবী একচ্ছত্র করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।" কিন্তু অনেকেই বলেন যে, প্রিন্সেপ্ সাহেব এই খোদিত অক্ষর-গুলি ঠিক পড়িতে পারেন নাই। আজ কয়েক বৎসর গত হইল, হিমালয়ের তলভাগ হইতে যমুনার ধারে ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপস্থিত হই। ইন্দ্রপ্রস্থ এখন একটী সামান্য গ্রাম; নাম এখন ইহার ইন্দরপৎ। পৃথ্বীরাজ-প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দিরে বাসা লই। পাশে কুতব-মিনার, যাহা হিন্দু-দেবমন্দির সমূহ ভাঙ্গিয়া গঠিত হইয়াছে। কুতবমিনারের পশ্চাতে এই লৌহ-স্তম্ভটী ভূমিতে নিহিত রহিয়াছে। আমি যে দেবী-মন্দিরে বাসা লইয়াছিলাম, পার্শ্বস্থিত গ্রাম-সমূহ হইতে সন্ধ্যাকালে অনেক ব্রাহ্মণেরা সেখানে আসিয়া আমার সহিত গল্প করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে বলেন যে, নিকটস্থ গ্রাম হইতে ফিরোজশাহ যে দুইটী প্রস্তরস্তম্ভ দিল্লীতে আনয়ন করেন, তাহাই প্রকৃত পাণ্ডবদিগের; লৌহ-স্তম্ভটী পাণ্ডবদিগের কিনা, তাহা তিনি ঠিক বলিতে পারেন না। তবে ইহা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে আছে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অনঙ্গপালের আদেশে এই লৌহ-স্তম্ভটী গঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, অনঙ্গপাল একবার একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞকালে স্তম্ভটী নির্ম্মিত হয়। শুভক্ষণে শুভলগ্নে ইহা ভূমিতে সন্নিবেশিত হইল। ব্রাহ্মণেরা একবাক্য হইয়া বলিলেন যে, স্তম্ভের মূলদেশ বাসুকির মস্তকে নিহিত হইল। যে পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, যে পর্য্যন্ত অহোরাত্র হইবে, সে কাল পর্য্যন্ত, মহারাজ! পৃথিবীতে আপনার এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বাসুকির মস্তকে লৌহস্তম্ভ সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনঙ্গপাল একথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, উপাড়িয়া দেখি, একথা সত্য কিনা। স্তম্ভটী উঠাইতেই ইহার মূলদেশ হইতে শোণিত স্রাবিত হইল। বাসুকির মস্তকের উপর ইহা যে নিহিত হইয়াছিল, তখন তিনি জানিতে পারিলেন। তাহার পর স্তম্ভটী পুনরায় ভূমিতে পুতিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সে শুভক্ষণ, সে শুভলগ্ন এখন আর কোথায়? তাই স্তম্ভটী আর বাসুকির মাথায় সংলগ্ন হইল না, আর পূর্ব্বমত ভূমিতে দৃঢ়রূপে বসিল না। অল্পকাল পরেই অনঙ্গপালের রাজ্য মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, এ প্রবাদটীও সত্য নয়। অনঙ্গপালের কাল

তো সে দিনকার কথা, লৌহস্তম্ভটী ইহার চেয়ে অনেক প্রাচীন। যাহা হউক, প্রবাদটী সত্য হউক, আর না হউক, লৌহ-স্তম্ভটী নিম্নে যে পাতাল পর্য্যন্ত যায় নাই, একথা সত্য। স্তম্ভটী ১৫ হাত দীর্ঘ, ইহার কেবল দেড়হস্ত ভূমিতে নিহিত রহিয়াছে। সাহেবেরা খুঁড়িয়া দেখিয়াছেন যে, মাটির নীচে ইহার গোড়া কিছু স্থূল, অনেকগুলি লৌহ শলাকার উপর সংলগ্ন আছে। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ প্রকাণ্ড লৌহখণ্ড পূর্ব্বকালের শিল্পকারেরা কিরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে পৃথিবীতে এমন কোন লোহার কারখানা ছিল না, যেখানে এরূপ লৌহখণ্ড নির্ম্মিত হইতে পারিত। আজকাল বোধহয়, বিলাতের দুইএকটী কারখানাতে এরূপ কার্য্য হইলেও হইতে পারে। লৌহ-বিষয়ে যাঁহাদিগের বিশেষ জ্ঞান আছে, প্রাচীন হিন্দুদিগের এই আশ্চর্য্য কারুকার্য্য দেখিয়া তাঁহারা আজও চমৎকৃত হন। কেবল যে এতবড় লৌহখণ্ড প্রস্তুত করা অতি কঠিন, এ কথা বলিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন, তাহা নহে। এই লৌহের অদ্ভুত গুণও দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া থাকেন। সাহেবেরা পারতপক্ষে আমাদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না। কেন না, সেদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কেবল ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পরমেশ্বর এই পৃথিবীর সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে যে জগৎ ছিল, একথা তো তাঁহাদের একেবারে স্বীকার করিবার যো-ই ছিল না। লোকের ধর্ম্মটী জানেন তো, কিরূপ ভঙ্গুর পদার্থ। এই আছে, এই নাই। এক কথাতেই লোপ হইয়া যায়। কাহারও বা আর একটী নাম না বলিয়া "বিল্বপত্র" বলিলে ধর্ম্ম একবারেই গিয়া থাকে, আবার কাহারও বা ঈষৎমাত্র শঙ্খধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে ধর্ম্ম লোপ পায়, ঘোর অধর্ম্ম হয়। হিন্দু-কীর্ত্তি-কলাপ আলোচনা করিতে সাহেবেরাও পদে পদে এইরূপ সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন। ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী ছিল, এ কথা স্বীকার করিলে, তাঁহাদিগের যে ধর্ম্মটী একেবারে লোপ হইয়া যাইবে! এ দুরূহ কাজটী তাঁহাদিগকে করিতে বলিবেন না; তা যদি বলেন, তার চেয়ে কেন একটী আইন করিয়া দিন না যে সাহেবেরা আর স্বধর্ম্ম মানিতে পারিবেন না? কি, তার চেয়ে কেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক হিন্দু করুন না, না হয় মুসলমান করিয়া ফেলুন না? আবার মুসা প্রভৃতি পয়গম্বরগুলি আছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে আর্য্য-জাতিকে স্থান প্রদান করিলে ধর্ম্মের অবমাননা হয়। সুতরাং প্রাচীন ইহুদিদিগের মানটুকু রাখা চাই। মিসর দেশটীও ইহুদি দেশের নিকট, বাইবেলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা। সুতরাং হিন্দুদিগের কার্য্যকলাপ যতই কেন প্রাচীন হউক না, মিসর দেশের সেই গুম্বজ-গুলির পরে হইয়াছে, পূর্ব্বে কোনমতেই নয়। আর গ্রিশদেশের তো কথাই নাই। সে যে ইউরোপ খণ্ডে! প্রাচীনত্বের গৌরবটুকু গ্রিশকে না দিয়া কি ভারতকে দিতে পারেন? তবে সেই যে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি চন্দ্রলোক, সূর্য্য-লোক, পিতৃলোক, দেবলোক ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে যাইয়া মিশিত; সে কবে? একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরেজেরা প্রথম অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে যাইয়া বসতি করিতে আরম্ভ করেন; হিন্দুদিগের চারিবেদ, ষড়্দর্শন, আঠারো পুরাণ তাহার পূর্ব্বে কি পরে? পরেই হইবে। কিন্তু নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একথা এখনও ভালরূপে প্রমাণ করিতে কেহ যত্ন করেন নাই। প্রমাণ করা কিছু বিচিত্র কথা নহে, তবে এখনও কোনও পণ্ডিত কেন যে এ ভারটী গ্রহণ করেন নাই, তাহাই বুঝিতে পারিতেছি না। হিন্দুদিগের কোনও কথা পড়িলে, সাহেবেরা, কি করেন! নিজের ধর্ম্মটী তো আর লোপ করিতে পারেন না? তাই নানারূপ বাদছাদ দিয়া তাহার কালনির্ণয় করিয়া থাকেন। এদিকে ওদিকে সেদিকে চারিদিকে কাটিয়া কুটিয়া

যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, আমাদের বেদ বল, পুরাণ বল, কেবল সেই কয়েকটী বৎসরের। সেইরূপ কাটিয়া কুটিয়া হইয়াছে কিনা তাহা জানি না, এই লৌহ-স্তম্ভটীর বয়স ১৫০০ বৎসর সাহেবেরা স্থির করিয়াছেন। ভাল, সেই কথাই যদি ঠিক হয়, তবুও ১৫০০ বৎসর ধরিয়া এই স্তম্ভটী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঘরের ভিতর নাই, আর শত শত বৎসরের সূর্য্য-তাপ, ঝড় ও জল ঝড়, ইহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তবুও ইহাতে একটু মরিচা ধরে নাই। অক্সিজেন, লোহা পাইলেই তাড়াতাড়ি তাহার সহিত মিশিতে যায়, মিশিয়া যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে, সচরাচর যাহাকে আমরা মরিচা বলিয়া জানি। বায়ুর অক্সিজেন, অন্যূন ১৫০০ বৎসর ধরিয়া এই লৌহ-স্তম্ভের লৌহের সহিত মিশিতে যত্ন করিতেছে। কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই, ইহাতে কণা-মাত্রও মরিচা ধরে নাই। প্রথম প্রথম তাই সাহেবদের মনে বিশ্বাস হয় নাই যে, স্তম্ভটী লৌহ-নির্ম্মিত। হয় তো ইহা মিশ্রিত ধাতু, এই কথা তাঁহারা মনে করিতেন। কোনও কথা "হয় তো" বলিয়া চুপ করিয়া থাকা ইহাঁদিগের স্বভাব নয়, উপায় থাকিলে অবশ্যই তাহার নিশ্চয়তা স্থির করিবেন, এই ইহাঁদের ধর্ম্ম। তাই কনিংহাম সাহেব স্তম্ভ হইতে কাটিয়া একখণ্ড লৌহ রুড়কীতে পাঠাইয়া-ছিলেন। রুড়কী কলেজের ডাক্তার মরে টমসন সাহেব ইহা রাসায়নিকভাবে পরীক্ষা করিলেন। ইহাকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না। যদি মিশ্রিত বা যৌগিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে, যে কয়েকটী বস্তুর মিশ্রণে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা এই পরীক্ষায় পৃথক হইয়া পড়িত। তাহা হইল না, কেবল লোহা লোহাই রহিল। তাই এক্ষণে নিশ্চয় স্থির হইল যে, স্তম্ভটী বিশুদ্ধ লৌহ-নির্ম্মিত। স্তম্ভের অপর একখণ্ড বিলাতেও এইরূপে পরীক্ষিত হইয়াছিল। ইহা লৌহ-নির্ম্মিত বলিয়া সেখানেও স্থির হইয়াছিল। মরিচা ধরে না এরূপ বৃহৎ লৌহখণ্ড দেখিয়া, তাই সকলেই চমৎকৃত হইয়া থাকেন। প্রাচীন হিন্দু-গণ কি উপায়ে এরূপ লৌহখণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই আশ্চর্য্যের কথা। আর আজকালের আমাদের দশা দেখ। যেদিক পানে চাই, সেইদিক পানেই ঘোর দুর্দ্দশা। কিছুই নাই, আছে কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম লইয়া বৃথা দর্প। "আমরা আর্য্যসন্তান" এই রবে পৃথিবী টলটলায়মান হইয়াছে। বাসুকি এখন মাথা হইতে পৃথিবীকে না ঝপ করিয়া ফেলিয়া দেন ; ফেলিয়া দিয়া না ঊর্দ্ধ-শ্বাসে কোথাও পলায়ন করেন, তবেই রক্ষা। কি জানি, পিতৃলোকে সেই আর্য্য-মহাপুরুষেরা এখন কি ভাবিতেছেন, আমাদের দশা দেখিয়া এখন কি মনে করিতেছেন। পৃথ্বীরাজ! তুমিই কেবল কলঙ্কের ভাগী হইয়াছ! ভারত-পতনের বীজ বহুদিন পূর্বেই বপন হইয়াছিল। বহুদিন পূর্বে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বৃক্ষটী ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল। তোমার সময়েই সেই বিষবৃক্ষে ফল ফলিল। কেবল এই তোমার অপরাধ!

নণ্ডরাম যেরূপে লৌহ প্রস্তুত করে, সেই উপায়ে এই লৌহ প্রস্তুত হইয়া-ছিল, আর তারপর কর্ম্মকারেরা অনেকগুলি লৌহখণ্ড একত্র পিটিয়া পিটিয়া জুড়িয়া এরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কি অন্য কোন প্রকার প্রণালীতে হইয়া-ছিল, তাহা বলিতে পারি না। তবে আজকাল ভারতে যেখানে যেখানে লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহা ঠিক নণ্ডরামের প্রণালীতেই হইয়া থাকে। ইদানীং ভারতের কোন কোন স্থানে লৌহ প্রস্তুত হইত, কি আজও হইয়া থাকে, তাহা বলিবার পূর্বে একথা জানা আবশ্যক যে, পৃথিবীর নানাস্থানে 'লৌহ' কিভাবে রহিয়াছে। লৌহ নাই এরূপ স্থানই দেখিতে পাই না। মৃত্তিকা প্রস্তরে আছে, উদ্ভিজ্জ শরীরে আছে, জীবজন্তু মনুষ্যদেহেও ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু যেখানে ইহা অধিক পরি-

মাণে নাই, সেখান হইতে বাহির করিতে যত্ন করা বৃথা। সামান্য একটী পুঁটি মাছের জন্য কে কবে সাগর সেচন করে? তাই যে যৌগিক দ্রব্যে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতেই লোকে ইহাকে বাহির করিয়া লয়। কেবল অধিক পরিমাণে থাকিলে হইবে না, এরূপভাবে থাকা চাই, যেন অল্প আয়াসে অল্প ব্যয়ে, অন্য দ্রব্য হইতে ইহা পৃথক হইয়া পড়ে। খাঁটি বিশুদ্ধ লোহ স্বাভাবিক অবস্থায় বড় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অক্সিজেনের সহিত ইহার যেরূপ প্রণয়, তাহাতে একেলা ইহা থাকিতে পায় না। একেলা পাইলেই ছুটাছুটি অক্সিজেন আসিয়া ইহার সহিত মিশ্রিত হয়। দুটীতে মিশিয়া একটী যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, আর দুটীতে মিশিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে পড়িয়া থাকে। বিশুদ্ধ লোহ যদি খুব বড় হয়, তবেই ইহার সহিত অক্সিজেন সহজে মিশিতে পারে না। তাই ইন্দ্রপ্রস্থের লৌহখণ্ডে মরিচা ধরে নাই। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ বিশুদ্ধ লৌহখণ্ড কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা অক্সিজেন ও অপরাপর পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়াই থাকে। বিশুদ্ধ লৌহের আবশ্যক হইলে, এই সকল বস্তু হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া লইতে হয়। যে যৌগিক পদার্থটী কেবল লোহ ও অক্সিজেন মিশিয়া হইয়াছে, তাহার একটুখানি একটী পাত্রে রাখিয়া, উপরে হাইড্রোজেন বাষ্পস্রোত পরিচালিত করিয়া তাপ দিলেই, হাইড্রোজেন যৌগিক পদার্থের অক্সিজেনটুকু গ্রহণ করে, কাজেই বিশুদ্ধ লৌহটুকু পড়িয়া থাকে। এ উপায়ে বিশুদ্ধ লোহ প্রস্তুত করিলে, লৌহটী চূর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাকে বাহিরে রাখিবার যো নাই। বাহিরে রাখিলেই বায়ুর অক্সিজেন এত তাড়াতাড়ি ইহার সহিত মিশিতে যাইবে যে, তাহাতে আপনা-আপনি অগ্নি-উৎপাদন হইয়া পড়িবে। সুতরাং যেখানে অক্সিজেন ইহাকে না দেখিতে পায়, না ছুঁইতে পায়, এমতস্থানে ইহাকে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। হাইড্রোজেন বাষ্পের ভিতরে রাখিলে, ইহা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। এই কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় বিশুদ্ধ লোহ দেখিতে পাওয়া যায় না। অক্সিজেন, কার্বণ, আলুমিনিয়ম বা ফটকিরির মূল, ম্যাগনেসিয়ম, ম্যাঙ্গেনিস, ফস্ফরস, গন্ধক, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি নানা দ্রব্যের সহিত ইহা মিশিয়া থাকে। লৌহ নিষ্কারকেরা এই সকল দ্রব্য হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া লয়। নন্দুরামের ভাঁটি এইরূপ অপরাপর বস্তু হইতে লৌহকে পৃথক করিবার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাকে পৃথক করিয়া লওয়াই নন্দুরামের ব্যবসা। বিশুদ্ধ লৌহ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না সত্য, তবে ধাতুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে কোনও পদার্থে ১০০ ভাগে ৮০ ভাগ বা ততোধিক লোহ দেখিতে পান, তাহাকেই মোটামুটি স্বাভাবিক খাঁটি লৌহ বলিয়া ধরিয়া লন। ইউরাল পর্বতে কোথাও কোথাও অল্প পরিমাণে তাঁহারা এরূপ লৌহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতে শতকরা ৯২ ভাগ লৌহ ছিল, ৬ ভাগ সীস ও ২ ভাগ তামা। আমেরিকা-ভূভাগের কোন কোন স্থানেও ইহাঁরা এইরূপ লৌহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে ৯২ ভাগ লৌহ ছিল, ৬ ভাগ কার্বণ আর বাকি দুইভাগ অপরাপর বস্তু। কিন্তু এরূপ মোটামুটি বিশুদ্ধ লৌহ আকাশ হইতে যে উল্কাপাত হয়, তাহাতেই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উল্কা-প্রস্তর দুই প্রকার, এক জাতিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকে, অপর জাতীয় পাথরে লৌহ থাকে না, কি অতি অল্পই থাকে। লৌহময় উল্কাপ্রস্তরে শতকরা ৮০ হইতে ৯৫ ভাগ পর্য্যন্ত লৌহ দেখা গিয়াছে। অবশিষ্ট অংশ নানা বস্তু দ্বারা গঠিত। যথা ;—নিকেল, কোবাল্ট, তামা, ম্যাঙ্গেনিস, ম্যাগ্নেসিয়ম, গন্ধক ইত্যাদি। আকাশ হইতে যে উল্কাপাত হয়, এগুলি যে নক্ষত্র খসিয়া পড়ে না, তাহা স্থির হইয়াছে। কারণ, নক্ষত্রগুলি আকাশের গায়ে

চুনকির মত আটা দিয়া যোড়াও নাই বা পিত্তলের পেরেকের মত পোতাও নাই যে, একটু ঢিলা হইলেই খসিয়া পড়িবে। উল্কাগুলি প্রস্তরখণ্ড, ঘোরতর বেগে আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। এই প্রস্তরগুলি পৃথিবীর দিকে এত বেগে আসিতে থাকে, ইহাদিগের গতি এত সত্বর যে, তাহাতেই আপনা-আপনি অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহাতেই আলো হয়। বৈজ্ঞানিকেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কখনও কখনও উল্কা-প্রস্তরগুলি পৃথিবীর দিকে এত দ্রুতবেগে ধাবিত হয় যে, "এক" এই কথাটী বলিতে না বলিতে, ইহারা কুড়ি ক্রোশ পথ চলিয়া যায়। যে প্রস্তর গুলি ছোট, সেগুলি পতনকালেই পথে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, ভস্ম হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় ও ক্রমে উড়িতে উড়িতে পৃথিবীতে পড়ে। কিন্তু যেগুলি বড়, সেগুলির সবটুকু আর পথেই পুড়িয়া যায় না, তাহাদিগের কতক-ভাগ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। নানাস্থানের উল্কাপ্রস্তর সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা রাসায়নিকভাবে বিযোগ করিয়া দেখিয়াছিলেন। সচরাচর ইহাতে কত লৌহ থাকে, সেই উপায়েই স্থির হইয়াছে। উল্কাপ্রস্তরগুলি ওজনে এক ছটাক, আধ ছটাকও হয়, আবার কখন কখন এক মণের চেয়ে অনেক অধিকও হইয়া থাকে। আমেরিকায় একবার এক খণ্ড উল্কাপ্রস্তর পড়ে, যাহা ওজনে ৪১ মণেরও অধিক। দক্ষিণ আমেরিকায় ১৭৮৩ সালে ডন রুচিন দে সেলিম নামক একব্যক্তি একটা উল্কাপ্রস্তর দেখিতে পান, যাহা ওজনে ৪২০ মণ হইয়াছিল। ১৮৭০ সালে সুইডেন দেশের লোক পৃথিবীর তুষারাবৃত উত্তরপ্রদেশে গ্রিণলণ্ড নামক দ্বীপে নানা বিষয়ের তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য কতকগুলি জাহাজ পাঠাইয়া দেন। এই জাহাজের লোকেরা সেখানে অনেক বড় বড় উল্কাপ্রস্তর দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কুড়ি-খানি প্রস্তর ইহাঁরা দেশে লইয়া আসেন। সর্বের চেয়ে বড়খানির ওজন ৫৮৮ মণ। ইহা এক্ষণে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলমে আছে। আমাদের কলিকাতায় যাদুঘরেও অনেক উল্কা-প্রস্তর আছে। সর্বের বড়টী ১৮৫৭ সালে মান্দ্রাজ প্রদেশে, মাদুরা জেলায় পরনালী নামক গ্রামে পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কাশী, আকবরপুর, নগরীয়া, বস্তি, গোরখপুর, মোরাদাবাদ, অম্বালা, ক্ষেতি, মৌ, লোধ্রান, ধর্ম্মশালা, ফতেপুর, গোয়ালপাড়া, সীতস্থলী, মানবাজার, বিষ্ণুপুর, গোপালপুর, মধুপুর, সহরঘাটী প্রভৃতি স্থানে আজ একশত বৎসর ধরিয়া যে সমুদয় উল্কাপ্রস্তর পড়িয়াছে, তাহারও অনেক নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। পারস্য ভাষায় একখানি পুস্তক আছে। এই পুস্তকখানির একটী নাম নয়, অনেক নাম, যিনি যা বলিয়া ডাকুন। যথা—তারিখ-ই-সলিমশাহি, তুজক-ই-জহাঙ্গিরি, কারনামা-জহাঙ্গিরি, ওয়াকিয়াৎ-ই-জহাঙ্গিরি, বয়াজ-ই-জহাঙ্গির, ইকবাল-নামা, জহাঙ্গির নামা ও মকালত-ই-জহাঙ্গিরি। আসল কথা, পুস্তকখানি দিল্লীর বাদশাহ জহাঙ্গিরের নিজের লেখা। সিংহাসনে বসিয়াই রোজনামচাভাবে তিনি এই পুস্তকখানি আরম্ভ করিয়া দেন, অর্থাৎ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১২ তারিখ হইতে। ভূমিকাতেই তিনি বলিয়াছেন ১০১৪ হিজরীসনে, ৮ তারিখ জমাদাউলসানিতে, বৃহস্পতিবারে, শুভলগ্নে, ঈশ্বরপ্রসাদে, ৩৮ বৎসর বয়সের সময়, আমি আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করিলাম। জহাঙ্গির এই পুস্তকে সকল কথা অতি সরলভাবে লিখিয়াছেন। পরের কুকথা সুকথা তো অম্লানবদনে বলিবেনই, কিন্তু নিজের কথাও কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া লেখেন নাই। কোথায় কবে মদ খাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তকে তিনি যে উল্কাপাতের কথাটী বলিয়াছেন, তাহা যে সত্য, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য

ঘটনা হইয়াছিল। এই বৎসরে (অর্থাৎ ১০৩০ হিজরী, ১৬২১ খৃষ্টাব্দে) ফরওয়ার্দিন মাসের ৩০ তারিখে, প্রাতঃকালে, জলন্দর পরগণার একটী গ্রামে ঘোরতর ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল, এমনকি সেই শব্দে সেখানকার লোকেরা ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া গেল। এই শব্দের সঙ্গে আকাশ আলোকময় হইল, আর এই আলোক পৃথিবীর দিকে বেগে নামিতে লাগিল। লোকে মনে করিল, পৃথিবীর উপর বুঝি অগ্নিবৃষ্টি হইবে। কিছুক্ষণ পরে শব্দ লুপ্ত হইল। তখন লোকের দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হয়। তাহারা শীঘ্র এক ব্যক্তিকে মুহম্মদ সৈদের নিকট পাঠাইয়া দিল। মুহম্মদ সৈদ এই পরগণার আমিল ছিলেন। লোকটী যাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিল। আমিল সাহেব তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার উপর চড়িয়া এই গ্রামে আসিলেন, আর নিজের চক্ষে সেই স্থানটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। সেখানে চারিদিকে প্রায় ২৫ হাত লইয়া ভূমিখণ্ড একেবারে পুড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে একটীও ঘাস ছিল না, এক গাছিও তৃণ ছিল না। তখনও ভূমি উত্তপ্ত ছিল। সেই স্থানটি তিনি খুঁড়িতে আদেশ করিলেন। খুঁড়িয়া লোকে যতই নীচে যাইতে লাগিল, ভূমি ততই উত্তপ্ত দেখিতে পাইল। অবশেষে একখণ্ড লৌহ বাহির হইয়া পড়িল। তখনও তাহা অতিশয় গরম ছিল, যেন এই হাপর হইতে বাহির করা হইয়াছে। অনেকক্ষণ পরে ইহা শীতল হইল। আমিল তাহা আপনার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন, তারপর একটী থলির ভিতর পুরিয়া, শিলমোহর করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াদিলেন। নিজের সম্মুখে আমি ইহাকে ওজন করাইলাম, ওজনে ১৬০ তোলা হইল। উস্তাদ দাউদকে বলিলাম, তুমি ইহাতে একখানি তলোয়ার, একখানি ছোরা ও একখানি ছুরি প্রস্তুত কর, গড়িয়া আমার নিকট লইয়া আইস। উস্তাদ দাউদ বলিল, এ লৌহে হাতুড়ির ঘা সহিবে না, টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি বলিলাম, তা যদি হয়, তবে ইহার সহিত অপর একটু লোহা মিশাইয়া দাও। তিন ভাগ আকাশের লোহার সহিত একভাগ পৃথিবীর লোহা মিশানো হইল, আর তাইতে দুইখানি তলোয়ার, একখানি ছোরা ও একখানি ছুরি গড়িয়া উস্তাদ দাউদ আমাকে নজর দিল। পৃথিবীর লোহার দ্বারাই ইহার ধাতু ঠিক রহিল ও ইহার উপর জলের ন্যায় আতা পাতার দাগ বসিল। দক্ষিণ দেশের অলমাসি তলোয়ারের ন্যায় ইহাও নুঙিয়া যাইত, আবার ছাড়িয়া দিলে ঠিক সোজা হইত। যে দুইখানি তলোয়ার প্রস্তুত হইল, আমার সম্মুখেই তাহার পরীক্ষার জন্য আদেশ করিলাম। খুব উৎকৃষ্ট তলোয়ারে যেরূপ কাটে, এই তলোয়ারেও সেইরূপই কাটিল।" সিঁধাল চোরেরা বজ্রের লৌহ হইতে সিঁধকাঠি প্রস্তুত করে, এই যে কথাটি এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার মূল কি এই উল্কা-প্রস্তর?

যাহা হউক, অধিক পরিমাণে লৌহ থাকিলে কি হইবে,বড় বড় উল্কা-প্রস্তর হইতে মনুষ্যের বিশেষ উপকার হয় না। মাঠে ঘাটে উল্কা-পাথর পড়িয়া নাই যে, নন্দরামের ছেলেরা কুড়াইয়া আনিবে, আর নন্দরাম তাহাদিগকে ভাঁটিতে গলাইবে। মাঠে ঘাটে উল্কা-পাথরের ছড়াছড়ি হইয়াও কাজ নাই। তাহা হইলে আর জীবজন্তু বাঁচিবে না, আমাদের ঘরদ্বার সব ভাঙ্গিয়া যাইবে। অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়া, উল্কা-প্রস্তর হইতে কেহ কখন লৌহ প্রস্তুত করে না। কিন্তু চুম্বক পাথর সেরূপ নয়। চুম্বক পাথর অনেক পাওয়া যায়, আর ইহাতে অধিক পরিমাণে লৌহও থাকে। চুম্বক পাথর আর কিছুই নয়, কেবল লৌহ ও অক্সিজেন সম্বলিত একটি যৌগিক পদার্থ। চুম্বক পাথরের একশত ভাগে ৭২ ভাগ লৌহ ও ২৮ ভাগ অক্সিজেন। দুইটী বস্তু এই পরিমাণে থাকিলে, তাহাকে বিশুদ্ধ চুম্বক প্রস্তর বলিতে পারি। কিন্তু তা প্রায় হয় না, ইহাতে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, যথা ;— হাইড্রোজেন, ম্যাঙ্গেনিস, আলুমিনিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগ্নেসিয়ম, গন্ধক, ফস্ফরস্

ইত্যাদি। যাহা হউক, তাহা হইলেও চুম্বক প্রস্তর হইতে অনেক লৌহ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তরাংশেই এই পাথর অধিক পাওয়া যায়। নরওয়ে, সুইডেন, রুশ, সাইবেরিয়া ও উত্তর আমেরিকায় ইহা রাশি রাশি পড়িয়া আছে। সেখানকার লোকে ইহা হইতে লোহা বাহির করে। সুইডেন দেশে ডানিমোরা নামক স্থানে লোকে একটী গর্ত্ত করিয়াছে, ১০০ হাত দীর্ঘে, ১০০ হাত প্রস্থে ও ৩৫০ হাত গভীর ; এই গর্ত্ত হইতে চুম্বক পাথর তুলিয়া তাহারা অতি উত্তম লৌহ প্রস্তুত করে। এই লৌহ প্রতি বৎসর বিলাতে অনেক আমদানি হয়, বিলাতের লোকেরা তাহা হইতে ইস্পাত প্রস্তুত করেন। ভারতবর্ষেও সুইডেনদেশীয় লৌহ আমদানি হইয়া থাকে, তাহাকে সুইডিশ আইরণ বলে, ইহা চুম্বক পাথর হইতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষের নানাস্থানেও চুম্বক প্রস্তর আছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে সালেম জিলায় ইহা অনেক, এমনকি সেখানকার ছোট ছোট পর্বতসমূহের চূড়াগুলি এই চুম্বক পাথরেই পরিপূর্ণ। কোটি কোটি মণ চুম্বক পাথর সেখানে রহিয়াছে, আর পূর্বকালে তাহা হইতে লৌহও উদ্ধৃত হইত। কিন্তু আজকাল সেখানে কাঠ ও কয়লার বড়ই অভাব। কিছু দিয়া তো এই পাথরকে পোড়াইতে হইবে, তবে তো লৌহ ভাগটুকু অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে। তা, সেখানে এমন কিছু নাই, যা দিয়া পোড়ায়। সেজন্য এরূপ ভাল লৌহময় প্রস্তর বৃথা পড়িয়া রহিয়াছে। স্পেকুলার লৌহ বলিয়া এক জাতীয় প্রস্তর আছে, তাহাতেও প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকে। ইহা দেখিতে বিশুদ্ধ ধাতুর ন্যায় উজ্জ্বল। ভূমধ্যসাগরে এল্বা নামক যে দ্বীপ আছে, সেখানে অতি প্রাচীন কাল হইতে, এই প্রস্তর হইতে লৌহ নিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে। এই লৌহ উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। বিশুদ্ধ স্পেকুলার প্রস্তরে ১০০ ভাগে ৭০ ভাগ লৌহ থাকে, ৩০ ভাগ অক্সিজেন ; কিন্তু লৌহময় যৌগিক প্রস্তরসমূহ একেবারেই বিশুদ্ধভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভূমণ্ডলে চারিদিকে অপরাপর নানারূপ মূল পদার্থ বিযুক্তভাবে রহিয়াছে। তাহারা কেহই একেলা থাকিতে ভালবাসে না। তাহাদের অণু পরমাণুর সর্বক্ষণই এই চিন্তা, কোথায় যাই, কার সঙ্গে গিয়া মিশি। আজ এটীর সহিত গিয়া মিশিতেছে, কাল সেটীর সহিত মিশিতেছে। আজ এটীকে ধরিতেছে, কাল সেটীকে ছাড়িতেছে। অহরহ ভূমণ্ডলে এই রহস্য চলিতেছে। মনুষ্য শরীরটী দেখ, কোটি কোটি অণু পরমাণু, কোটি কোটি জীব-শরীর দ্বারা ইহা গঠিত। মুহুর্মুহু কোটি কোটি অণু পরমাণু, কোটি কোটি জীব শরীর এই মনুষ্য-দেহে সংযুক্ত হইতেছে। কাল-প্রাপ্ত হইয়া আবার মুহুর্মুহু ইহা হইতে তাহারা বিযুক্ত হইতেছে। মূল ও যৌগিক পদার্থের সংযোগ-বিযোগ লইয়াই রাসায়নিক শাস্ত্র। পদার্থসমূহের গুণাগুণ লইয়াই আধুনিক শিল্প। কাহার কি স্বভাব, কে কি চায়, কে কি করিতে পারে, এই জ্ঞানই মনুষ্যের বল বুদ্ধি। জানিলে মনুষ্য ধরাধামের অধীশ্বর, না জানিলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় নিঃসহায়। এই অণু পরমাণুর বিযোগ-সংযোগের ভিতর আরও কত সূক্ষ্মতর কথা রহিয়াছে। কেহ কেহ সামান্য একটী বালুকারেণুতেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন, এই জগৎ সংসারের সমস্ত লীলা সেই সামান্য বালুকারেণুর খেলাতেই প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের চক্ষে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্যের বশবর্তী এই "সাধারণ" মনুষ্য-জীবনের সাধ-আহ্লাদ, সুখ-দুঃখ, ধর্মাধর্ম্ম সকলই বালকের ক্রীড়া বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীতে যে সমুদয় মূল পদার্থ বিযুক্তভাবে রহিয়াছে, সুবিধা পাইলেই তাহারা অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয়। তাই, স্পেকুলার প্রস্তরে কেবল লৌহ ও অক্সিজেন

না থাকিয়া, ইহার সহিত অন্যান্য পদার্থও সংযুক্ত থাকে। একজাতীয় স্পেকুলার প্রস্তরকে হিমাটাইট বলে। ইহা আবার দুই প্রকার, রক্তবর্ণ ও কটাবর্ণ। লাল হিমাটাইটের গায়ে আঁচড় মারিলে লাল দাগ পড়ে, আর ইহাকে গুঁড়া করিলে, রক্তবর্ণ চূর্ণে পরিণত হয়। সেই জন্য ইহার নাম রক্তবর্ণের হিমাটাইট। যে রক্তবর্ণ হিমাটাইটগুলি নরম ও মাটির মত দেখিতে, তাহাই আমাদের লালমাটি, গেরিমাটি ও হিরিমজি। বর্দ্ধমান, বীরভূম অঞ্চলের মাটি কিয়ৎ পরিমাণে রক্তবর্ণ। ইহার সহিত অক্সিজেন-সংযুক্ত লৌহ মিশ্রিত আছে বলিয়াই ইহার বর্ণ এরূপ। শীতকালের প্রাতঃকালে শীতে হু হু করিয়া যখন বালকেরা সূর্য্যের স্তব করে যে,—হে সূর্য্য! শীঘ্র আপনি উদয় হইয়া আমাদিগকে রৌদ্র প্রদান করুন,—এই স্তবে বর্দ্ধমানের লালমাটির কথাটি শুনিতে পাইতাম, তখন চক্ষে দেখি নাই। বিলাতী কাপড়ের প্রসাদে এখন এ স্তবটি আর বড় শুনিতে পাই না। কিন্তু পূর্ব্বে যখন এদেশের অনেক স্থানেই কেবল "জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ" ছিল, তখন বালক-বালিকা-মুখ-নিঃসৃত এই স্তুতিসূচক ছড়াটি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। "আয় রৌদ্র মেনে ছাগল দিব হেনে"—অবশেষে শেষ হইত গিয়া—"বর্ধমানের রাঙামাটি, বুড়িকে ছ্যাগলু গুড় কাটি।" ছেলেরা জানে না যে, বর্ধমানের রাঙামাটির জন্য বুড়ির কিছুমাত্র অপরাধ নাই। এজন্য যদি কাহারও অপরাধ থাকে, তো অপরাধ অক্সিজেন ও লোহার। অর্ভরী-লৌহ-প্রস্তরও একজাতীয় হিমাটাইট। ইহা দেখিতে অনেকটা অর্ভরের ন্যায়। কটা হিমাটাইট তিন প্রকার—টরগাইট, গোমাইট ও লাইমোনাইট। কটা হিমাটাইট মৃত্তিকার ন্যায় দেখিতে, সেই জন্য ইহাকে প্রস্তর বলিতে পারি না। অন্যান্য লৌহের আকর অপেক্ষা ইহাতে জলের ভাগ কিছু অধিক। নানারূপ লৌহ-প্রস্তর পচিয়া, তারপর তাহাদিগের অণুসকল মিশ্রিত হইয়া, কটা হিমাটাইটের উৎপত্তি হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যে প্রস্তর, লৌহ কার্বণ ও অক্সিজেন সংযোগে হইয়াছে এবং যে প্রস্তর, লৌহ ও গন্ধক সংযোগে হইয়াছে, ইহাদিগের অণু মিশ্রিত হইয়াই কটা হিমাটাইট সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ছোট ছোট প্রস্তরগুলি গন্ধক ও লৌহ সংযোগে উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদিগকে কাঁসমুখী বলে। আরব দেশ হইতে এই প্রস্তর এখানে আমদানি হয় এবং ইহা ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইংরেজিতে এই প্রস্তরকে আইরণ পাইরাইট বলে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। নানাস্থানে ইহাও অপরাপর ধাতুর সহিত একসঙ্গে অবস্থিতি করে। কয়লার খাতেও ইহা অনেক থাকে। গভীর অন্ধকারময় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কয়লা রাশির মধ্যে ইহার চাক্‌চিক্য দেখিয়া একজন ইংরেজি কবি লিখিয়াছেন,

> Here sable coal his massy coach extends,
> And stars of gold the sparkling pyrite blends.

যে কোয়ার্টজ প্রস্তর হইতে সোণা উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহাতে সচরাচর সোণার সহিত আইরণ পাইরাইটও দেখা যায়। লোহা হইতে গন্ধককে একেবারে পৃথক করা কিছু কঠিন, আর লোহার সহিত কি গন্ধক, কি ফস্‌ফরস, অতি অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলেও সে লোহা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়, সেই জন্য আইরণ পাইরাইট হইতে লোকে বড় লৌহ বাহির করিতে যত্ন করে না। অধিক পরিমাণে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাঁসমুখী পাথর হইতে গন্ধক বাহির করিলে লাভ হইতে পারে। গন্ধক না হউক, গন্ধকের দ্রাবকটী আমরা ইহা হইতে প্রস্তুত করিতে পারি। কৃষিকার্য্য ও শিল্পাদির উন্নতি-সাধনে গন্ধকের দ্রাবক একটী প্রয়োজনীয় পদার্থ। কিসে, কোথা হইতে ইহা অল্প ব্যয়ে লাভ হইতে পারিবে, এ চিন্তা

একদিন না একদিন, লোকের মনে আসিবে। একথা তাই এখানে বলিয়া রাখিলাম। জল বায়ুর প্রভাবে আইরণ পাইরাইট পচিয়া গেলে, আর কতক পরিমাণে গন্ধকটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, তবেই ইহা হইতে লৌহ ভাগটী লইতে পারা যায়। কটা হিমাটাইট আর একটী আশ্চর্য্য উপায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও জলা ও বিলের জলে অধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত থাকে। আমাদিগের বন্ধু গিরীশ-বাবু নিশ্চয়ই পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিবেন, যেরূপ মনুষ্য প্রভৃতি জীবজন্তু আহার করিয়া জীবিত থাকে, বৃক্ষাদিও সেইরূপ আহার করিয়া পরিবর্ধিত হয়। তবে আমাদের খাদ্য একরূপ, তাহাদের অন্যরূপ; আমরা এক উপায়ে আহার করি, তাহারা অন্য উপায়ে। একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ আছে, যাহারা লোহা খাইতে ভালবাসে। জলার জলে প্রচুর পরিমাণে লৌহ রহিয়াছে দেখিয়া, তাই আনন্দে তাহারা সেইখানে গিয়া বাস করে। জল-মিশ্রিত লৌহ-অণুগুলি তাহারা বাছিয়া বাছিয়া আহার করে ও তদ্দ্বারা তাহাদিগের দেহের অধিক ভাগই গঠিত হয়। জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় লৌহ-অণুগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে, ভারি নয় বলিয়া তলায় পড়িতে পারে না। কিন্তু এই উদ্ভিদদেহে সেই অণুগুলি তখন একত্রিত হয়, সুতরাং ভারি হইয়া পড়ে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন এই উদ্ভিদগুলি জলমধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া বিচরণ করে। যখন জীবন-লীলা অবসান হইয়া যায়, তখন এই আমার হস্তপদ-বিশিষ্ট মানবদেহেরও যে গতি, সেই সামান্য উদ্ভিদদেহেরও সেই গতি। পাঠকবর্গ! যখন সংজ্ঞাহীন জড়ের মত পড়িয়া থাকিব, তখন এই সামান্য লেখনীটীও উত্তোলন করিতে পারিব না। সেইরূপ মৃত্যু হইলে বায়ু-হিল্লোলে পরিচালিত হইয়া উদ্ভিদগুলিও আর সুখাদ্য লৌহ-কণার অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে না। তাহাদের লৌহ-ঘটিত মৃতদেহ জলার তলভাগে পতিত হয়। লোকে যেরূপ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করে, মাঝে মাঝে সেইরূপ জলার তলভাগ হইতে এই উদ্ভিদ-দেহ মনুষ্যেরা তুলিয়া লয় ও তাহা হইতে লোহা বাহির করে। এই উদ্ভিদগুলিকে পূর্ব্বে সকলে কীটাণু বলিয়া মনে করিতেন। বলিতে গেলে, ইহারা না উদ্ভিদ না কীট; উদ্ভিদ ও পশুজীবনের মাঝখানে। ইহাদের দেহের আবরণ বালুকা, চূর্ণলৌহ প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্মিত বলিয়াই কঠিন। নিদ্রাসক্ত কুম্ভকর্ণের চেয়ে ইহাদের শরীর বড় নয়, তাহার চেয়ে কিছু ছোট। এক অঙ্গুলি দীর্ঘে, এক অঙ্গুলি প্রস্থে, এক অঙ্গুলি উচ্চে; এই স্থানটুকুর ভিতর শত সহস্র কোটি এইরূপ উদ্ভিদ্ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। তাহাতেই বুঝিয়া লউন, ইহাদের শরীর কত বড়। আর এক প্রকার কটা হিমাটাইট আছে, তাহাতে আলুমিনিয়মের ভাগ অধিক। আয়র্লণ্ড ও ফরাশিশ দেশে ইহা হইতে অনেক লৌহ প্রস্তুত হয়। ইয়েলো মাটি, মূলতানি মাটি প্রভৃতি যে সকল হরিদ্রাবর্ণের মাটি দেখিতে পাই, তাহাকেও কটা হিমাটাইট বলিতে পারি। এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় লৌহ-প্রস্তর ও মৃত্তিকার কথা বলিলাম, তাহাতে লৌহের সহিত অক্সিজেন বিশেষরূপে থাকে। আবার অনেকপ্রকার লৌহের আকর আছে, যাহাতে কার্বণের ভাগ অধিক। ধাতু-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে স্পারি, স্প্যাথোস প্রভৃতি কয়েকটি জাতিতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। পাথুরিয়া কয়লার সহিত এই জাতীয় লৌহের আকর প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিলাতে ইহা হইতে অনেক লৌহ প্রস্তুত হয়। ইহাতে প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ লৌহ থাকে, বাকি কার্বণ সিলিকন ইত্যাদি। কার্বণ-সংযুক্ত লৌহের আকর দুই প্রকার দেখিতে। এক প্রকার কাদার মত, ইহাকে লৌহ-কর্দম বলে। অপর প্রকার কঠিন, প্রস্তরের ন্যায়। রাণীগঞ্জের কয়লার খাতে এই আকর প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। টাইটানিক নামে আর এক জাতীয় লৌহ-প্রস্তর আছে। তাহা হইতেও লোকে

লোহ বাহির করে। টাইটানিয়ম্ নামক ধাতু ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহার নাম টাইটানিক হইয়াছে। কালের গতিতে এই প্রস্তর পচিয়া স্থানে স্থানে বালুকার ন্যায় পড়িয়া থাকে। সেই বালুকা হইতেও লোকে লোহ প্রস্তুত করে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে লোহ প্রস্তুত হইত এবং এই লোহ হইতেই ভারতের সমুদয় কাজ চলিত। কেবল তাহা নহে, আমরা বিদেশে লোহ পাঠাইয়া বিদেশীদিগের নিকট হইতে অনেক টাকা পাইতাম, তাহাতে আমাদের জন্মভূমির ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইত। কিন্তু এক্ষণে সে কাল আর নাই। বিলাতের লোকেরা লোহ প্রস্তুত বিষয়ে এরূপ উন্নতি করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে আর আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারি না। অতি অল্প খরচে তাঁহারা মাটি, পাথর হইতে লোহ বাহির করিতে পারেন। সহস্র সহস্র ক্রোশ দূর হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া, সেই লোহ এখানে আনিয়া তাঁহারা অতি অল্প দামে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাঁদের বিলক্ষণ লাভ থাকে। ভারতের লোহকারেরা সে দামে কিছুতেই বেচিতে পারেন না; সে দামে বেচিতে যাইলে লাভ তো হইবেই না, উদরের অন্ন পর্য্যন্তও হয় না। আবার এদিকে দেশে লোহার খরচও দিন দিন বাড়িতেছে। নেপাল হইতে এখন আর শালকাঠ বড় আসে না, বর্মার সেগুন কাঠও কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং লোহার কড়ির আবশ্যক। নানা ছাঁদের লোহার রেলগুলিও দেখায় ভাল, সুতরাং তাহার জন্যও অনেক লোহা খরচ হয়। লোহার চালও ক্রমে এখানে-সেখানে দেখিতে পাইতেছি। তার পর আজ এখানে রেলের রাস্তা, কাল সেখানে পুল হইতেছে, তাহাতেও অনেক লোহার খরচ। তাই প্রতি বৎসর আমরা বিদেশ হইতে তিন ক্রোর টাকার লোহা কিনিয়া থাকি। এখন আমাদের আর কোনও তো অর্থ নাই, আমাদের অর্থ এখন কেবল চাউল গম প্রভৃতি কৃষিজাতদ্রব্য। সেই চাউল গমগুলি বিজাতীয়দিগকে বিক্রয় করি, বেচিয়া যা টাকা পাই, তাহাই আবার তাহাদিগকে দিয়া লোহা প্রভৃতি অপরাপর বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করি। তবেই হইল, আমরা প্রতি বৎসর তিন ক্রোর টাকার চাউল গম দিয়া বিদেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে বিনিময়ে লোহা লইয়া থাকি। একটু অনুধাবন করিয়া খেদের কথা দেখ! ভারতে যে লোহা নাই, তাহা নহে। যেমন গাভীর মধ্যে কপিলা, বৃক্ষ-মধ্যে কল্প-তরু, সেইরূপ ভূভাগ-মধ্যে আমাদের এই ভারতখণ্ড। আমাদের দেশে যেখানে সেখানে লোহা পড়িয়া রহিয়াছে, লোহার পর্বত, লোহার পাথর, লোহার মাটি, লোহার বালি, চারিদিকে এ দেশে লোহা। কিন্তু ভারতবাসীদিগের মনোবৃত্তি আজ একেবারেই প্রভাহীন। তাই ইউরোপবাসীরা ক্রমে যে আমাদিগকে বাঁদরের মধ্যে পরিগণিত করিতেছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে বড় দোষ দিতে পারি না। তাঁদের যে দোষ নাই, আমাদের দোষ, এ কথাটী বড়ই ভয়ে ভয়ে বলিলাম। দেশের লোক এখন আমার উপর খড়্গ-হস্ত না হইলে হয়। আমরা আর্য্য, আমরা সর্বগুণাধার, গুণের আর আমাদের কিছু বাকি নাই, এইরূপ কথা শুনিলে যেমন হৃদয়টী প্রসন্ন হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তবে এই কাঙালের কথা টাট্‌কা টাট্‌কা লোককে যেরূপ তিক্ত লাগিয়াছিল, এখন দেখিতেছি বাসি হইয়া ইহার আর ততটা বিস্বাদ নাই, ক্রমে অল্প অল্প মিষ্ট হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, আধুনিক প্রণালীতে যদি আমরা লোহ প্রস্তুত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রতি বৎসর তিন কোটি টাকার চাউল গম আর বিদেশে পাঠাইতে হইত না, তাহা দেশেই থাকিত। যাহাদের উদরে এখন অন্ন নাই, এরূপ লক্ষ লক্ষ গরীব দুঃখী তাহা খাইয়া সুখে কালযাপন করিত। আধুনিক প্রণালীতে লোহ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাণীগঞ্জের নিকটে একদল সাহেবেরা কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহাদের লোহা কলিকাতায় বিক্রয় হইতেছে। শুনিতেছি, বিলক্ষণ দু-পয়সা লাভও হইতেছে।

রাণীগঞ্জে লৌহ-প্রস্তুত-কার্য্য কিছু নূতন কথা নহে। এখানে হিন্দুলোহাকারেরা অতি পূর্ব্বকাল হইতেই লোহা বাহির করিত। তারপর আধুনিক উপায়ে লোহা বাহির করিতে সাহেবেরাও ইতিপূর্বে দুই একবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নানা গোলমালে তাঁহাদের খরচ পোষায় নাই। ষাট বৎসর গত হইল, বেঙ্গল কোল-কোম্পানি, যাঁহারা খনি হইতে পাথুরিয়া কয়লা বাহির করেন, তাঁহারা লোহার কারখানা করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে অনেকগুলি কলকব্জাও আনাইয়াছিলেন। কিন্তু কাজ আরম্ভ হয় নাই। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা কয়লা তুলি, তাহাতে আমাদের লাভ হইতেছে, নূতন একটী কারখানা খুলিতে গেলে, পাছে লোকসান হয়? তাই, তাঁহারা লোহা বাহির করিবার কল্পনা ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ১৮৭৪ সালে কেবল লোহা বাহির করিবার জন্য একটী সাহেবদিগের কোম্পানি হইয়াছিল। তাঁহারা দশ লক্ষ টাকা পুঁজি লইয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু জমি কিনিতে অনেক টাকা খরচ হইল, বাকি যাহা রহিল, তাহাতে কারখানা চলিল না, অল্পদিন চলিয়া বন্ধ হইয়া গেল। কথা এই, নূতন একটী বিষয় করিতে যাইলে, প্রথম প্রথম লাভ না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। বিশেষতঃ যখন বিদেশীয় দ্রব্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সেখানে বড়ই ভয়ের কথা, অতি সাবধানে সেস্থলে কাজ করিতে হয়। বিদেশীয়দিগের টাকা অনেক। তুমি একটী কারখানা খুলিলে, আর তাহারা লাভ না করিয়া, কি লোকসানও করিয়া, আপনাদিগের দ্রব্য বেচিতে লাগিল। যদি তোমার পুঁজি থাকে, তাহা হইলে তুমিও লাভ না লইয়া, কি লোক্‌সান করিয়া, কিছুদিনের জন্য বেচিতে পার। এ যুদ্ধে চাই তোমার পতন, কি তার পতন। আমরা যদি ভাল করিয়া কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে সহজে আমাদের পতন হয় না। কারণ, আমাদের জাহাজ ভাড়া লাগে না, আর আমাদের মজুরী কম। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই। সে অভিজ্ঞতাটী শিখাইবারও যো নাই, কাজ করিতে করিতে লোকে লাভ করে। এই অনভিজ্ঞতার জন্য স্থলবিশেষে এক পয়সার স্থানে দু-পয়সা খরচ হয়। সুতরাং যতদিন না তোমার এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি যে দ্রব্যটী করিতেছ, তাহার দামও বাড়িয়া যায়। আবার চল্‌তি জিনিসকে বাজার হইতে সহজে তাড়িত করা যায় না। সে জিনিসটী আপনার নামেই বিক্রীত হয়। রজারের ছুরিগুলি ভাল, লোকে অনেকদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। তাই খরিদদারেরা আসিয়া বলে "তোমার কাছে রজারের ছুরি আছে?" আমরা দোকানদার, রজারের ছুরি রাখি। কে বাপু, তুমি প্রেমচাঁদ কর্মকার? যে তোমার ছুরি আমরা কিনিব? যদি খরিদদারেরা আসিয়া বলে "আমাদের প্রেমচাঁদ কর্মকারের ছুরি দাও" তাহা হইলে আমরাও প্রেমচাঁদ কর্মকারের ছুরি রাখিব। কোনও একটী নূতন জিনিসের যতদিন না নাম বাহির হয়, ততদিন লোকসান হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং চল্‌তি কাজের বিরুদ্ধে নূতন কোন কাজ করিতে হইলে, প্রথম প্রথম অনেক ধাক্কা সহিতে হয়। আসল কাজে যত টাকা লাগিবে, তাহার চেয়ে অধিক মূলধনের আবশ্যক। তবেই এই সকল ধাক্কা হইতে কাটিয়া উঠিতে পারা যায়। যে কোম্পানিটীর কথা বলিলাম, তাঁহাদের সেরূপ মূলধন ছিল না। প্রথম তো জমি কিনিতেই অনেক টাকা খরচ হইল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, জমি কিনিতে কত টাকা লাগিবে, তাহা তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন নাই। তারপর তাঁহারা আজ একপ্রকার, কা'ল অন্যপ্রকার, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লৌহ-প্রস্তর আনিয়া ভাঁটিতে গলাইতে লাগিলেন। এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লৌহপ্রস্তরে অক্সিজেন প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ও অবস্থায় থাকে। সুতরাং একপ্রকার লৌহপ্রস্তর গলাইতে যতটুকু তাপ লাগে, যে উপায়ে তাহা হইতে সহজে লৌহ বাহির হইয়া আইসে, হয় তো অন্য

প্রকার প্রস্তর গলাইতে ততটুকু তাপ লাগে না, আর তাহা হইতে লৌহ বাহির করার প্রণালীও হয় তো অন্যরূপ। কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষদিগের সে জ্ঞানটুকু ছিল না। ক্রমে তাঁহারা এ অভিজ্ঞতাটী লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া গেল, মূলধনও কমিয়া আসিল। তারপর কোন কোন লৌহ-প্রস্তর হইতে লৌহ বাহির করিতে হইলে, ভাঁটিতে তাহার সহিত চূণ মিশাইয়া দিতে হয়। ইহাঁরা প্রথমে ঘুটিং দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিতে পাইলেন, একস্থানের ঘুটিং অন্য স্থানের ঘুটিং প্রস্তরের সমতুল্য নয়। একস্থানের ঘুটিঙে যে পদার্থগুলি যে পরিমাণে আছে, অন্যস্থানের ঘুটিঙে সে পদার্থগুলি সে পরিমাণে নাই। সেইজন্য ভাঁটিতে লৌহ-প্রস্তরের উপর তাহাদিগের কার্য্যও বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হইতে লাগিল। আজিকার ভাঁটিতে একরূপ লৌহ প্রস্তুত হইল, কা'ল অন্যরূপ। সুতরাং তাঁহারা ঘুটিং ছাড়িয়া দিলেন। দিয়া রোহতাস হইতে পাথুরে চূণ আনিতে লাগিলেন। চূণ ভাল; কিন্তু রোহতাস কোথায়? অনেক দূর, সেই শাহাবাদ জিলায়। সেখান হইতে চূণ আনিয়া কাজ করিতে অনেক ব্যয় হইতে লাগিল। এইরূপে চূণের জন্য যখন কোম্পানির ঢাকের দায় মনসা বিক্রয় হইতেছিল, তখন তাঁহাদের নাকের গোড়ায় যে প্রচুর পরিমাণে পাথুরে চূণ পড়িয়াছিল, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। কোম্পানি ভিন্ন আর সকলেই তাহা জানিত, আর সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছিল। পাঁচেটের নিকট হংসপাথর বলিয়া একটী স্থান আছে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে যে প্রস্তরে চূণ হয়, তাহা পড়িয়া রহিয়াছে। অবশেষে সেই চূণ আনিয়া ইহাঁরা কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ চূণ সে চূণ করিতে করিতে ইহাঁদের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া গেল। সেই যে পুঁজির কলসীটী ছিল, তাহা হইতে জল গড়াইতে গড়াইতে ক্রমে খালি হইয়া পড়িল। এমন টাকা আর নাই, যাহা দ্বারা কাজ চলিতে পারে। কি করেন, অনেক সুদ দিয়া কোম্পানি টাকা ধার করিলেন। কাজ চলিতে লাগিল, আয়ও হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু আয়টুকু সব সুদে খাইয়া গেল। কোম্পানি তাই কারখানা উঠাইয়া দিলেন। এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা, বাঙ্গালীরা, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে এক আধটী কোম্পানি খুলিয়া থাকি, সেই সকল কোম্পানির কাজ ঠিক এইভাবে হইয়া থাকে। এভাবে কাজ করিলে, পরিণামে যে ফল ফলা উচিত, সেই ফলই ফলিয়া থাকে। আমরা মনে করি, বিদ্যা শিখিয়াছি, কত কি পাশ করিয়াছি, মূর্খ অজ্ঞ নন্দুরামের চেয়ে অবশ্যই ভাল করিয়া লৌহ প্রস্তুত করিতে পারিব। কিন্তু গোড়াতেই আমাদের ভুল। মরিয়া ফুটিয়া যদি দুই পাত ইংরেজি উল্টাইতে পারি, তাহা হইলেই মনে করি, ভারি বিদ্বান্ হইয়া পড়িলাম। আর যদি অভিধান দেখিয়া মিল্টন, সেক্সপিয়র প্রভৃতি ইংরেজি কাব্যের মানে বুঝিতে পারি, তাহা হইলে তো আর বিদ্যার পরিসীমা নাই। বাপু! এ বিদ্যার বলে কেরাণিগিরি করিতে পার, ক্রমে ডাক্তার হইয়া না হয় লোকের প্রাণ বধ করিতে পার, উকিল হইয়া চাষা ভুষোর শোণিত শোষণ করিতেও পার, কিন্তু এ বিদ্যার বলে একগাছি তৃণও উৎপাদন করিতে পার না, এক ছটাক লৌহও বাহির করিতে পার না। সেক্সপিয়র, মিল্টন তুমি হাজার সুর করিয়া পড়, জননী ধরণী তাহা শুনিয়া ভুলিবেন না, মুহূর্তের নিমিত্ত মুখ নাড়িতে পার, এরূপ একমুঠা চাউলও তোমাকে স্বদেহ হইতে বাহির করিয়া দিবেন না। দেশে কিন্তু এই সেক্সপিয়র মিল্টনেরই আদর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনের সময় সেই যে পতঙ্গপালের ঠেলাঠেলি দেখিতে পাও, সেই পঙ্গপালগুলি এই বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া সেখানে আগমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চেলাগণ সকলেই নন্দুরামকে ঘৃণা করেন, কারণ নন্দুরাম মূর্খ, ইংরেজি জানে না, হ্যাম্‌লেটের গভীর

চিন্তাপূর্ণ খেদোক্তি তাহার কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই, কবি-চূড়ামণি মিল্টনের লেখনী-নিঃসৃত সুমধুর সুধাপানে সে কখনও কাব্য-রস-পিপাসা নিবৃত্তি করে নাই। কিন্তু আমরা ভাবি, নন্ডুরাম বিদ্যাহীন নয়। সে যে কাজ করে, সেই বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতাই বিদ্যা। আর এই বিদ্যাটী সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। সমুদয় এই জ্ঞানটী পুস্তকে নাই, ইহা কেবল কাজ করিতে করিতে উপার্জিত হয়। তাই, যেমন একদিকে লৌহ বাহির করার বিলাতি প্রণালীগুলি শিখিতে হয়, তেমনি অপরদিকে এদেশের পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতাটীও গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা কোন নূতন কর্মে হাত দিয়া, সতর্কভাবে, অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, কাজ না করিবেন, যাঁহারা গোড়া হইতে না ধরিয়া আগা হইতে ধরিবেন, তাঁহাদিগকে দুঃখ পাইতে হইবে। তাঁহারা নিজে দুঃখ পান, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের দুরদৃষ্ট দেখিয়া দেশের লোকে ভীত হইবে। আর কেহ কোন নূতন কাজে হাত দিতে সাহস করিবে না। সেইজন্যই এত কথা বলিলাম।

উপরি-উক্ত কোম্পানি আপনাদিগের কারখানায় যে লৌহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা কিছু মন্দ হয় নাই। কিন্তু সে লৌহ বিলাতি পেটা লৌহের মত ততটা উৎকৃষ্ট হয় নাই। সচরাচর যে ঢালা লৌহ বিলাত হইতে এদেশে আসে, তাহার মত হইয়াছিল। কারখানা খুলিয়া অবধি শেষ পর্য্যন্ত ইহাঁরা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ লৌহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম প্রতি মণ লৌহ প্রস্তুত করিতে তিন টাকা করিয়া খরচ হইতেছিল। ক্রমে যত অভিজ্ঞতা লাভ হইতে লাগিল, খরচও তত কমিয়া আসিল। শেষকালে প্রতিমণ লৌহ করিতে ১৷৷০ টাকা খরচ পড়িতেছিল। কাজ যদি চলিত, তাহা হইলে খরচ বোধহয়, আরও কম হইয়া আসিত। রাণীগঞ্জের নিকট লৌহ করিতে যে প্রস্তর পাওয়া যায়, সে সকলে সমানভাবে লৌহ থাকে না। যে কোম্পানির কথা এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছিলাম, তাঁহারা যে প্রস্তর হইতে লৌহ বাহির করিতেন তাহাতে শতকরা ৬৯ ভাগ লৌহ ও অক্সিজেন জড়িত হইয়াছিল, সিলিকন বা বালুকার মূল দশভাগ ছিল, আলুমিনিয়ম বা ফটকিরির মূল ৫ ভাগ ছিল, বাকি জল, ম্যাঙ্গেনিস, ম্যাগ্‌নেশিয়ম, ফস্ফরস, গন্ধক ইত্যাদি। এই রাণীগঞ্জের আর এক প্রকার প্রস্তর পেডলার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাহাতে লৌহের ভাগ কম। লৌহ ও অক্সিজেনে জড়িত হইয়া শতকরা ৪৪ ভাগ, সিলিকন ২৫ ভাগ, আলুমিনিয়ম ১২ ভাগ, ক্যাল্‌সিয়ম ৭ ভাগ, বাকি অন্যান্য পদার্থ।

রাণীগঞ্জের নিকট বীরভূম। এখানেও অনেক লৌহের আকর। অতি প্রাচীনকাল হইতে তাহা হইতে লৌহ নিষ্কৃত হইত। এত লৌহ বাহির হইত যে, বীরভূম জিলার পশ্চিমপ্রদেশ লৌহমহল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। লোকে মনে করে, ধাতুর আকর রহিয়াছে, তবে আর ভাবনা কি? যাই গিয়া বাহির করি, অনেক টাকা পাইব। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ শর্মা নামে একটী লোক তাই মনে করিয়াছিলেন। তখন এ দেশে ইংরেজের রাজত্ব সবে হইয়াছে। ইন্দ্রনারায়ণ অল্প অল্প ইংরেজি জানিতেন, সাহেবদিগের নিকট ইহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। বিলাতে কি প্রণালীতে লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহার দুই চারি কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমিও বীরভূমের পাথর হইতে সেই প্রণালীতে লোহা বাহির করিব, তাহা হইলে আমার বিলক্ষণ লাভ হইবে। তিনি গবর্ণমেণ্টকে বলিলেন—আপনারা আমাকে বীরভূম জিলায় লোহা বাহির করিবার অনুমতি প্রদান করুন, চারি বৎসর পরে আমি আপনাদিগকে পাঁচ সহস্র টাকা করিয়া বাৎসরিক কর দিব। কিন্তু আমাদের যা দশা, হুজুগ পাইলেই চক্ষু বুজিয়া ঝাঁপ দিই। ইন্দ্রনারায়ণও তাই

করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। হাঁ! বিলাতে এইরূপে লোহ করে? তো আমিও করি! কত খরচ পড়িবে তাহা হিসাব করিয়া দেখেন নাই। পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব প্রদান করা সম্ভব কথা, কি অসম্ভব কথা, সে চিন্তা তাঁহার মনে একবারও উদয় হয় নাই। ক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন আর লেখাপড়া করিয়া লইলেন না। তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে, মট্ ও ফারকুহার সাহেবদ্বয় বীরভূমের লোহ-আকাশে চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় উদয় হইলেন। ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টকে বলিলেন,—আমরা আপনাদিগকে অল্পমূল্যে গোলা-গুলি প্রস্তুত করিয়া দিব, আপনারা আমাদিগকে বীরভূম প্রভৃতি স্থানে লোহা বাহির করিবার অধিকার প্রদান করুন। আর, যেন আমরা সেই লোহ বিনাশুল্কে বাজারে বেচিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন, ভাল করিয়া ভাঁটি নির্মাণ করিবার জন্য ১৫,০০০, টাকাও দিলেন। কিন্তু যেই ইহাঁরা ভাঁটি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি চারিদিকে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। এ অঞ্চলের জায়গিরদার ও জমিদারেরা ভাবিলেন—এ আবার কি? চিরকাল হইতে এ সকল স্থান আমাদের জায়গির ও জমিদারী। না-বলা, না-কওয়া, ইহারা আসিয়া এখানে বড় বড় ভাঁটি নির্মাণ করে কেন? বার বৎসর ধরিয়া সাহেব-দলে ও জমিদার-দলে, বাদবিসম্বাদ অনুযোগ অভিযোগ চলিতে লাগিল। সাহেবেরা লোহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারিনা। যদিও করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ ঘোরতর বিবাদের উপর কিরূপে লাভ হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লউন। ফলকথা এই, ১৭৮৯ সালে, ফারকুহার সাহেবকে ভাঁটি ফেলিয়া পলাইতে হইয়াছিল। দয়া করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পল্‌তার বারুদের কারখানায় কর্ম দিয়াছিলেন। বীরভূমের লোহ-কার্য্য পুনরায় পূর্বাবস্থায় পরিণত হইল। যেমন প্রাচীনকাল হইতে এখানে লোহ বাহির হইয়া আসিতেছিল, এখন আবার সেইরূপ হইতে লাগিল। এই লোহ কলিকাতা পর্য্যন্তও আসিত। কলিকাতার বাজারে সে লোহ প্রতিমণ পাঁচ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইত। তখন বালেশ্বর অঞ্চল হইতেও কলিকাতায় লোহ আসিত। বীরভূমের লোহ অপেক্ষা সে লোহ ভাল। তাহার মূল্য ৬৷৷০ টাকা ছিল। বিলাত হইতেও তখন অল্প পরিমাণে লোহ এ দেশে আমদানি হইত। বিলাতি লোহের মূল্য আরও অধিক, প্রতি মণ দশ টাকা করিয়া বিক্রীত হইত। বীরভূমে অগরীয়ারা লোহ বাহির করিত না। মুণ্ডা বলিয়া যে বন্যজাতি আছে, তাহারাই এই কাজ করিত। তাহারা চিরদিন একস্থানে বাস করিত না; কিছুদিন একস্থানে থাকিয়া তাহার পর আবার অন্যস্থানে গিয়া ভাঁটি নির্মাণ করিত। তাহার কারণ এই যে, কয়লা না হইলে লোহা বাহির করা যায় না। গাছ কাটিয়া কয়লা করিতে করিতে যেই একস্থানের বন শেষ হইয়া আসিত, তখন কাজেই তাহাদিগকে অন্যস্থানে যাইতে হইত। লোহামহলের অনেকস্থানে মুসলমান লোহাকারেরাও এই কাজ করিত। তাহারা কাঁচা অর্থাৎ অপরিশুদ্ধ লোহ করিয়া হিন্দু কর্মকারদিগকে দিত। হিন্দু কর্মকারেরা তাহা পাকা অর্থাৎ পরিশুদ্ধ করিয়া ব্যবসাদারদিগকে বিক্রয় করিত। বীরভূমের ভাঁটিগুলি এত বড় করিয়া লোকে গড়িত, ও এক এক ভাঁটিতে এত অধিক পরিমাণে লোহা প্রস্তুত হইত যে, ভারতবর্ষের আর কোথাও এরূপ ছিল না। ১৮৫২ সালে ডাক্তার ওল্‌ডহাম সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তখন প্রতি বৎসর এই সকল ভাঁটি হইতে ৫০,০০০ মণ লোহ নিষ্কৃত হইত। বলীয়া, নারায়ণপুর, দেওচা, দুমরা ও গণপুর নামক স্থানেই অনেক দেশীয় ভাঁটি ছিল। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত বীরভূমে এইভাবে লোহার কাজ চলিয়াছিল। কিন্তু বন কাটিয়া কয়লা করিতে করিতে কয়লা ক্রমেই কমিয়া আসিল, সুতরাং লোহা প্রস্তুত করিবার খরচও ক্রমে অধিক হইয়াছিল। কিন্তু সেই পরিমাণে লোহার মূল্য অধিক হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, বিলাতের লোকে তখন অল্প

আয়াসে অল্প ব্যয়ে লৌহ বাহির করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহারা সে লৌহ এদেশে আমদানি করিতেছিলেন। কলিকাতায় তাহার দুই টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইতেছিল। বীরভূমের লৌহ কলিকাতায় দুই টাকা মণ বিক্রয় হইতে পারে না। তাই, এখানকার লৌহ-কার্য্যেরও ক্রমে অবনতি হইতেছিল। ১৮৫৫ সালে ম্যাকি বলিয়া একজন সাহেব মহম্মদ-বাজারে লোহার কারখানা খুলিলেন। তিনি ভাবিলেন, কাঠের কয়লা মহার্ঘ্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমি কতক পরিমাণে পাথুরে কয়লা ব্যবহার করিব, তাহা হইলে আমার খরচ কম পড়িবে, বিলাতি আমদানির মত আমিও অল্পমূল্যে আমার লৌহা বেচিতে পারিব। এমনকি, তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার লোহা কলিকাতায় এক টাকা ছয় আনা করিয়া মণ বেচিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। যে পাথুরে কয়লা তিনি ব্যবহার করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা এ কাজের উপযুক্ত নয়। পাথুরে কয়লা হইলেই হয় না। পাথুরে কয়লায় কার্বণের ভাগ অধিক থাকে সত্য, কারণ পাথুরে কয়লা আর কিছুই নয়, অতি প্রাচীন কালের বনের কাঠ। লক্ষ লক্ষ বৎসর মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত থাকায়, এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। গাছের কাঠ যে কয়টী মূল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার মধ্যে কার্বণ, হাইড্রোজেন, ও অক্সিজেনের ভাগই অধিক। অর্থাৎ অল্প পরিমাণে গুটিকত ধাতব পদার্থ ছাড়া গাছের কাঠে কার্বণ ও জল থাকে। অল্প তাপ দিলে জলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, কার্বণ ও ধাতব পদার্থ ভাগটুকু রহিয়া যায়। তাহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তাহাকেই কাঠের কয়লা বলে। কাঠকে ছোট ছোট খণ্ডে কাটিয়া তাহাতে আগুণ দিয়া, আল্গা আল্গা মাটি চাপা দিলে, তাহা অতি ধীরেধীরে পুড়িতে থাকে। সেই আল্গা মাটিকে ভেদ করিয়া অতি অল্প পরিমাণেই বায়ুর অক্সিজেন তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন না পাইয়া কাঠখণ্ডগুলি একেবারে জ্বলিয়া যায়না, অতি সামান্য গুমে গুমে পুড়িতে থাকে। সেই তাপে কাঠের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। বাকি থাকে, কার্বণ ও ধাতব পদার্থ। তাহাকেই কাঠের কয়লা বলে। ইহাতে প্রায় ৮০ হইতে ৯০ ভাগ কার্বণ থাকে। ইহাকে যদি আবার আরও অধিক উত্তপ্ত করা যায়, তবে কার্বণটুকুও কার্বণিক-অ্যাসিড-বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, আর অবশেষে বাকি থাকে, কেবল সেই ধাতব ভাগটুকু, যাহাকে আমরা ভস্ম বলি। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ নিবিড় বনময় ছিল, তখন হয় নদীর ধোয়াটে, না হয় অন্য কোনও কারণে স্থানে স্থানে এই বনসমূহ মাটির নীচে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ভূমিতলের উত্তাপে সেই বনবৃক্ষের কাষ্ঠরাশি হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উড়িয়া যায়, গিয়া কয়লায় পরিণত হয়। আবার কালক্রমে সেই কাঠের কয়লা প্রস্তররূপ ধারণ করে। তাহাই পাথুরে কয়লা। অনেক স্থানের মৃত্তিকাতে গন্ধক ও ফস্‌ফরস্‌ অধিক পরিমাণে থাকে। নদীর ধোয়াট পড়িয়া যেখানে সমুদ্রকূলে নূতন ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানকার মৃত্তিকাতে ক্যাল্‌সিয়ম্‌ অর্থাৎ চূণ ও খড়ি এবং ফস্‌ফরস্‌ অধিক থাকিবার সম্ভাবনা। কারণ সেখানকার মৃত্তিকাতে অনেক শম্বুকজাতীয় প্রাণীদিগের খোলা মিশ্রিত থাকে, আর ঐ সকল খোলা ক্যাল্‌সিয়ম্‌ ফস্‌ফরস্‌ প্রভৃতি পদার্থদ্বারা গঠিত। নদীর ধোয়াটে পড়িয়া সমুদ্রগর্ভ পরিপূরিত হয় ও তাহাতে নূতন নূতন ভূভাগের সৃষ্টি হয় একথা শুনিয়া যেন কেহ হাসিবেন না। এই কলিকাতা, যেখানে বসিয়া আজ আমি এই কথাগুলি লিখিতেছি, ইহাও একদিন সমুদ্রগর্ভে ছিল। বিস্তৃত হিমালয়-দেহ হইতে মৃত্তিকা বহন করিয়া

এদিকে ভাগীরথী অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র এইসব ভূভাগের সৃজন করিয়াছেন। আজও এই সৃষ্টি চলিতেছে। আজও বর্ষাকালের সেই কর্দ্দম-পরিপূরিত নদীনালার জল পড়িয়া সুন্দরবনের নিকট সমুদ্রকূলে নূতন ভূমির উৎপত্তি হইতেছে। ১২০০ বৎসর পূর্বে চীনদেশের একটী লোক ভারতবর্ষে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। গয়া প্রভৃতি প্রাচীন স্থানসমূহ বৌদ্ধদিগের তীর্থধাম বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালীন তিনি তমলুকে যাইয়া জাহাজ আরোহণ করেন। তমলুক তখন সমুদ্রের ধারে ছিল। এক্ষণে তমলুক সমুদ্র হইতে বিশ ক্রোশ দূরে। যদি এ কথায় কোন ভুল না থাকে, তাহা হইলে দেখ, এই বারশত বৎসরের মধ্যে বিশক্রোশ নূতনভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। যেখানে মৃত্তিকায় গন্ধক ও ফস্‌ফরস্‌ অধিক পরিমাণে থাকে, সেইখানে বন পুতিয়া গিয়া যদি পাথুরে কয়লা হয়, তাহা হইলে সেই কয়লায়ও অধিক পরিমাণে গন্ধক ও ফসফরস থাকে। মৃত্তিকা হইতে এই দুই দ্রব্য যাইয়া কয়লার ভিতর প্রবেশ করে, সেইজন্য এরূপ হয়। আবার, এরূপ কয়লা দিয়া লোহার আকর পোড়াইতে যাইলে, কয়লার গন্ধক ও ফস্‌ফরস্‌ যাইয়া লোহাতে প্রবেশ করে। এই দুই দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে থাকিলেও লোহা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। লোহা পোড়াইতে হইলে ভাল কয়লা চাই। তাহাতে কার্বণের ভাগ অধিক ও বিশুদ্ধ ভাবে থাকা আবশ্যক। বীরভূমের পাথুরে কয়লা এরূপ নয় বলিয়া ম্যাকি সাহেবের কারখানা চলিল না। বীরভূমে অপরিমিত লোহ-আকর পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল আকরে শতকরা ৪০ হইতে ৬০ ভাগ লোহ, বাকি অক্সিজেন প্রভৃতি অপরাপর পদার্থ। অক্সিজেন প্রভৃতি অপরাপর পদার্থ লোহের সহিত একত্রিত থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। আজ তোমার এক কথাতে কি তাহারা লোহকে ছাড়িয়া দিবে? তোমার খন্তা কুড়ুলের জন্য লোহের আবশ্যক হইয়াছে, তাহা তাহাদের কি? বিচার করিয়া যদি কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে অক্সিজেন প্রভৃতি পদার্থের দোষ নাই। তাহারা বলে, পৃথিবীতে নানা দ্রব্য আছে, যাহাদিগকে লোহ অপেক্ষা আমরা ভালবাসি। তোমরা সেই সকল দ্রব্য আমাদিগকে আনিয়া দাও, তাহা হইলে লোহকে ছাড়িয়া আমরা সেই সকল দ্রব্যের সহিত গিয়া মিলিব। লোহ তখন একেলা পড়িয়া থাকিবে, তাহাকে লইয়া তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিও। পোড়াইও, পিটিও, কাটিও—যাহা ইচ্ছা তাহা গড়িও, আমরা সেখানে থাকিব না, তোমাদিগের কার্য্যে কোনরূপ ব্যাঘাতও করিব না। লোহ-নিষ্করণ-কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য এই।

মানভূম জেলায়ও অনেকস্থানে লোহের আকর আছে। চুম্বক প্রস্তর-জাতীয় লোহ-আকর এখানকার নদীগর্ভে অনেকস্থানে বালুকারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সংগ্রহ করা ব্যয়সাধ্য বলিয়া এই লোহ-বালুকা লইয়া বড় কেহ লোহ বাহির করে না। করিলে, ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট লোহ প্রস্তুত হয়। প্রস্তর, কয়লা, চূণ প্রভৃতি নানা বস্তু একত্রীভূত করাও ব্যয়সাধ্য। অধিক পরিমাণে লোহ প্রস্তুত না করিতে পারার সেটীও বড় সামান্য কারণ নয়। অনেক দিন হইল, আমি একবার তিলুড়ীর নিকট বিহারিনাথ পর্বতের উপর আরোহণ করিতে যত্ন করি। অনেক দূর উঠিলে পর একপ্রকার মাছিতে আমাকে বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। তাই পর্বতের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উঠিতে পারি নাই। যতদূর গিয়াছিলাম, তাহাতেই অনেক চুম্বকজাতীয় লোহপ্রস্তর দেখিয়াছিলাম। রাণীগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মেঘের মত যে পর্বতটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই বিহারিনাথ পর্বত। মানভূমের অনেক স্থানে লাল ও কটা হিমাটাইট আকর দেখিতে পাওয়া যায়। সিংভূম জিলার নানাস্থানেও লোহার আকর আছে।

চাঁইবাসার পশ্চিমদিকে প্রচুর পরিমাণে ইহা পড়িয়া রহিয়াছে। এ অঞ্চলে এক্ষণে রেল হইয়াছে। এই সমুদয় আকর লইয়া সাহেবেরা শীঘ্রই বোধ হয় লৌহ প্রস্তুত করিবেন। আমরা? আর সে কথায় কাজ নাই! নীরব নিশ্চল হইয়াই থাকা ভাল। লোহারডাগা জিলার কথা বলিয়াছি, যেখানে নড়রাম লৌহ প্রস্তুত করিয়া থাকে, ইহা সেই স্থান। পালামো এই জিলার অন্তর্গত। পালামোতে প্রচুর পরিমাণে লৌহের আকর আছে; আর, এই আকর অতি উৎকৃষ্ট। লৌহ প্রস্তুত করিতে যে সমুদয় দ্রব্যের আবশ্যক, সে সমুদয়ই এখানে আছে। চুম্বক-জাতীয় লৌহ-প্রস্তর এবং লাল ও কটা হিমাটাইট রাশি রাশি অনেকস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই সকল আকরে শতকরা ৪০ হইতে ৯০ পর্য্যন্ত লৌহ, বাকি অপরাপর পদার্থ। বালুনগর নামক স্থানের চারিদিক প্রায় দুইক্রোশ ধরিয়া এইরূপ লৌহ আকরে পরিপূর্ণ। কাছেই আবার চূণের প্রস্তর। অতি উৎকৃষ্ট চূণের প্রস্তর, যাহাতে প্রায় ৯২ ভাগ কার্বণ ও চূণ। নিকটেই আবার ঔরাঙ্গা ও ডাল্টনগঞ্জের কয়লাখনি। সুতরাং লৌহ করিতে যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই এখানে বর্ত্তমান। তবে রেল নাই। শুনিতেছি রেলও শীঘ্র হইবে। তাহা হইলে এখানকার লৌহের আকর আর বৃথা পড়িয়া থাকিবে না। সাহেবেরা নিশ্চয় এখানে লৌহ প্রস্তুত করিবেন। আমরা বক্তৃতা-জীবী, অর্থে আমাদের প্রয়োজন নাই, আমাদের কেবল গলাবাজীর দিকে মন। যখন সাহেবেরা কারখানা খুলিবেন, তখন বসিয়া বসিয়া বক্তৃতাই করিতে থাকিব, আর সাহেবদিগের লৌহ বাহির করা দেখিব। ছোটনাগপুরে গুটিকত সামান্য রাজাদিগের অধিকার-ভূমি আছে। ইহার মধ্যে জশপুর ও গঙ্গপুরে কিছু কিছু লৌহ নিষ্কৃত হইয়া থাকে। জশপুরের লৌহ উৎকৃষ্ট বলিয়াই এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। পূর্বকালে মুঙ্গের জিলায় অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত, মুঙ্গেরের অস্ত্র-শস্ত্র সর্বত্রই প্রসিদ্ধ ছিল। খড়ক-পুরের নিকট পাহাড়ে অনেক লৌহের আকর আছে। এই পাহাড়ের উপরে দুই-মণ ওজনে একখণ্ড লৌহ বহুদিন হইতে পড়িয়াছিল। পাহাড়ীরা তাহাকে পূজা করিত। কোথা হইতে এত বড় একখানি লৌহ আসিয়াছিল, আর বৃথা এখানে পড়িয়াই বা ছিল কেন, তাহা কেহ জানে না। কেহ কেহ মনে করিতেন যে, ইহা আকাশ হইতে পড়িয়াছে। আবার কেহ মনে করেন, ইহা কোন লোহাকারের ভাঁটি হইতে নির্গত হইয়াছিল। সচরাচর ভাঁটি হইতে যেরূপ লৌহ বাহির হইয়া আইসে, ইহা সেরূপ ছিল না। ইহার বিকৃত আকার, তাহা দেখিয়া লোহাকারেরা ভাঁটি ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। পাহাড়ীরা কিন্তু চতুর, একটু সাহসও আছে। তাহারা ভাবিল, এত বড় লৌহখানি মিছামিছি পড়িয়া থাকে কেন, আমরা ইহাকে পূজা করি। তাহারা ভাল করিয়া সিন্দুর মাখাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল। অনেকদিন ধরিয়া অনেকে এই লৌহখানিকে পূজা করিয়া আসিতেছিল। এমন সময়, ইংরেজ-রাজ গিয়া সেই লৌহখানিকে উঠাইয়া আনিলেন, আনিয়া কলিকাতার জাদুঘরে রাখিলেন। এ পাহাড়ে লোহাকারদিগের আরও বিপদ অনেক। আর একবার একটী ভাঁটিতে হইল কি, লোহা বাহির না হইয়া কেবল দুগ্ধ ও রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোহাকারদিগের ঘরে দুই একজনের মৃত্যুও ঘটিল। কাজেই তাহাদিগকে ভাঁটি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে হইল। সাহেবেরা বলেন, সে দুগ্ধও নয়, রক্তও নয়। আকরের সহিত টিন ও সীসা ছিল, তাহাই গলিয়া বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক, আপদের শান্তি হইয়া গিয়াছে, লৌহ বাহির করার কাজ এখানে একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আসাম অঞ্চলে সেকালে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত। এখানকার লৌহের

আকর সচরাচর কয়লার খাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে যে লৌহ-কর্দমের কথা বলিয়াছি, তাহাই অধিক। সেই সমুদয় আকরে লৌহের পরিমাণ অধিক নয়, কেবল শতকরা ২২ হইতে ৪০, কোন কোন স্থানে আবার ইহা অপেক্ষাও অল্প। লৌহের পরিমাণ কম হইলেও এই আকর লইয়া সেকালে লোকে অনেক লৌহ প্রস্তুত করিত। এক তিরুগ্রাম ও হাথিগড়ের নিকট প্রায় তিন সহস্র লোক এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। এই লৌহ লইয়া বড় বড় তোপ নির্মিত হইত। দুই শত বৎসর পূর্বে আসামের বড় বড় তোপ সর্বত্রই প্রসিদ্ধ ছিল। করনেল হ্যানে সাহেব রংগপুর দুর্গে একটী বারহাত লম্বা তোপ দেখিয়াছিলেন, ইহার স্থূলতা প্রায় অর্দ্ধহস্ত ছিল। ব্রহ্মবাসীরা যখন আসাম আক্রমণ করে, তখন তাহাদিগের ঘোরতর অত্যাচারে আসামের লৌহ-নিষ্করণকার্য্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মবাসীরা চলিয়া যাইলে এ কার্য্যের যাহা কিছু বাকি ছিল, তাহা আসামের রাজা নিজেই ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তিনি লৌহ আকরের উপর এরূপ শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করিলেন, যে, তাহাতে এ ব্যবসা একেবারে চলিতেই পারে না। আসামে লৌহ প্রস্তুত করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইল। খাসিয়া পর্বত হইতে এখানে লৌহ আসিতে আরম্ভ হইল ; খাসিয়া পর্বতে পাণ্ডুয়া নামকস্থানে এক আশ্চর্য্য প্রণালীতে লোকে লৌহ প্রস্তুত করিত। লৌহের আকরকে প্রথমে পরিষ্কার করিয়া তাহারা জলে গলিত, আর সেই জলে কাটি-মাটি, পাতা নাতা ডুবাইয়া রাখিত। লৌহকণা এই পাতা-নাতা কাটি-মাটিতে লাগিয়া যাইলে, তাহা লইয়া আগুণে পোড়াইলে লৌহ বাহির হইত। চেরাপুঞ্জি হইতে প্রায় নয় ক্রোশ দূরে অনেক লৌহের আকর আছে। সেকালে ইহা হইতে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত। আমি যে টাইটানিয়ম ধাতুমিশ্রিত লৌহের আকরের কথা পূর্বে বলিয়াছি, এখানকার আকর তাহাই। ইহা দেখিতে সূক্ষ্ম বালুকারেণুর ন্যায়। পাহাড়ের পাথর পচিয়া ইহার উৎপত্তি। বড় বড় পাথরের কাছে যেখানে এই রেণু অধিক পরিমাণে জড় হইয়া থাকে, লোকে সেইখান দিয়া ঝরণার জলস্রোত পরিচালিত করে। জলে ধুইয়া বালুকারেণুগুলি কর্দম শূন্য ও পরিষ্কৃত হয়। তাহার পর যেরূপ স্বর্ণ-বালুকা ধৌত করে, সেইরূপ এই লৌহ-বালুকা লইয়া কাষ্ঠ পাত্রে লোকে ধুইয়া লয়। অবশেষে ইহাকে ভাঁটিতে পোড়াইয়া লৌহ বাহির করে। বিলাতি লৌহের আমদানিতে খাসিয়া পর্বতে লৌহ প্রস্তুত করা, প্রায় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি,— সেকালে বালেশ্বর হইতে কলিকাতায় লোহা আমদানি হইত। ১৭০৮ সালে কাপ্তেন হামিল্টন বলিয়াছেন যে, এই সময়ে বালেশ্বরে বড় বড় জাহাজের নোঙ্গর ঢালাই হইত। এখানে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাশিদিগের লোহার কারখানা ছিল। কিন্তু নিজ বালেশ্বরে কেবল ঢালাইয়েরই কাজ হইত, লোহা গড়-জাত হইতে আসিত। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, বালেশ্বর, কটক ও পুরী জিলার পশ্চিমে ১৮টি ছোট ছোট রাজ্য আছে। তাহাদিগকে ১৮ গড়জাত বলে। ইহাদিগের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ ও কেউঝর সর্বের চেয়ে বড়। গড়জাত মহল, পর্বত ও জংগলময়। অনেকদিন হইল, আমি একবার হাঁটিয়া জগন্নাথ গিয়াছিলাম। মেদিনীপুর জিলায় নারায়ণগড় পার হইয়াই এই সমুদয় পার্বত্য প্রদেশ দেখিতে পাই। যত যাই, পশ্চিমদিকে ততই পাহাড় দেখিতে পাই। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার গড়জাত হইতে এ অঞ্চলের সমুদয় নদনদীগুলি উত্থিত হইয়াছে, যথা— দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, শালিন্দী, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, মহানদী ইত্যাদি। এই গড়জাতে লৌহের আকর অনেক আছে। তালচড় বলিয়া স্থানে পাথুরে কয়লাও আছে। সেই কয়লার সংগে লৌহের আকর থাকে। অংগুলে

কঙ্কেরাই নামক স্থানে পূর্বকালে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত ও কটকের বাজারে ইহা টাকায় আটসের করিয়া বিক্রীত হইত। এখন এখানে লৌহ হয় কিনা, জানি না। গড়জাতের লৌহ-আকরে শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থানে ইহার সহিত ম্যাঙ্গেনিস মিশ্রিত থাকে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুজাপুরে আজও লৌহ প্রস্তুত হয়। কিন্তু লৌহ-কারদিগের অবস্থা বড়ই মন্দ ; এ কার্য্যে উদরের অন্ন পর্য্যন্ত হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। এখানে বিন্ধ্য-গিরিতে লৌহের আকর আছে। পার্বত্য জলস্রোতেও লৌহবালুকা দেখিতে পাওয়া যায়। বুন্দেল-খণ্ডের নানা স্থানেও লৌহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বিজাওয়ার নামক স্থানের আকর সর্বোৎকৃষ্ট। নিকটে বান্দা জিলায়ও নানাস্থানে লৌহ ভাঁটি আছে। গোরহাই, দেওরি ও ক্ষিরণী এই সকল স্থানের আকর লইয়া লোকে লৌহ প্রস্তুত করে। গোরহাইয়ের নিকটে একটী পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপর হইতে লোকে আকর সংগ্রহ করে। আলা-উদলের কীর্তিক্ষেত্র মহোবা হইতে একবার আমি গরুরগাড়ি করিয়া ঝাঁসি যাইতেছিলাম। চম্বল নদীর ধারে ছালা করিয়া লোকে অনেক কাঠের কয়লা লইয়া যাইতেছে দেখিলাম। কয়লার আকার অন্য কাঠের কয়লার মত নয়। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"ও কিসের কয়লা ?" তাহারা বলিল,—"বাঁশের কয়লা।" আমি বলিলাম,—"বাঁশের কয়লা কি হইবে ?" তাহারা বলিল,—"ইহা দিয়া পাথর পোড়াইব, পাথর হইতে লোহা বাহির করিব।" এখানে লোহা করিতে বাঁশের কয়লা ব্যবহার হয়। আমাদের কর্মকারেরাও বাঁশের কয়লায় কাজ করিতে ভালবাসে। ঝাঁসির দক্ষিণে ললিতপুর জিলায়ও লোহা হয়। সলদা নামক একটী স্থান আছে ; সেখানে একপ্রকার বিশুদ্ধ হিমাটাইট অনেক পাওয়া যায় ; তাহা হইতে লোহা করিয়া লোকে অন্যস্থানে প্রেরণ করে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিমালয়-প্রদেশেও বহুকাল হইতে লোহা বাহির হইয়া আসিতেছে। হিমালয়ের তলভাগে ও উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি নানা স্থানে ভাঁটি দেখিয়াছি। একবার কালাড়ুঙ্গি নামক স্থানে আমাকে দুইতিন দিন থাকিতে হইয়াছিল। সেখানে অনেক লৌহের আকর দেখিয়াছিলাম। রামগড়, খাসিয়া, কালাড়ুঙ্গি, গোয়ালকুড়ি ও দেওচৌরি নামক স্থানের লৌহ-আকর হইতে লৌহ বাহির করিবার জন্য দিনকত গবর্ণমেণ্ট অনেক আয়াস করিয়াছিলেন, অনেক টাকাও খরচ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশে দুইটী ইংরেজ-কোম্পানিও এখানে বসিয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে খরচ পোষায় নাই। তাহার মধ্যে একটী কারণ এখানে উল্লেখ করি। দেওচৌরি নামক স্থানের লৌহ-আকরে শতকরা ৩৮ ভাগ লৌহ, ১৬ ভাগ আলুমিনিয়ম, ১৮ ভাগ সিলিকন ;—বাকি অপরাপর পদার্থ। এত অধিক পরিমাণে আলুমিনিয়া আছে বলিয়া আকর উত্তম নয় ; কারণ আলুমিনিয়াকে বাহির করিয়া দেওয়া ব্যয়-সাধ্য। ইহার সহিত সিলিকা মিশাইয়া দিলে, আলুমিনিয়া গলিয়া সিলিকার সহিত মিলিত হয়। সিলিকা বালুকার মূল সত্য, কিন্তু লৌহ-আকরের সহিত কেবল বালুকা মিশাইয়া পোড়াইলে ভাল কাজ হয় না। তাই যাঁহারা দেওচৌরির আকর লইয়া কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহারা গোয়ালকুড়ি হইতে আকর আনিয়া দুই আকরে মিশাইয়া পোড়াইয়াছিলেন ; কারণ গোয়ালকুড়ির আকরে সিলিকা অধিক পরিমাণে থাকে। গোয়ালকুড়ির আকরে শতকরা ৪২ ভাগ লৌহ, ৩৩ ভাগ সিলিকা, ৪ ভাগ আলুমিনিয়া। দুই আকরে মিশাইবার উদ্দেশ্য এই যে, দেওচৌরি আকরের আলুমিনিয়া গলিয়া গোয়ালকুড়ি আকরের সিলিকার সহিত মিশিয়া দুইটী দ্রব্যই একেবারে লৌহকে ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু গোয়ালকুড়ি হইতে আকর আনিতে অনেক খরচ পড়িল, তাহাই কাজ বন্ধ হইবার

প্রধান কারণ। কুমাউন ও গড়ওয়াল—হিমালয়ের আর একটু পশ্চিমে শিরমুর। এখানকার রাজার রাজধানীর নাম নাহন। নাহনে রাজা একটী লোহার কারখানা খুলিয়াছেন। বিলাতি প্রণালীতে এখানে কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু দোষ হইয়াছে এই, আকর কারখানাতে দূর হইতে আনিতে হয়, কয়লাও নিকটে নাই। হিমালয়ের আরও পশ্চিম প্রদেশে মণ্ড, কাংগারা, কুলু প্রভৃতি স্থানে অনেক লৌহের আকর আছে ; কিছু কিছু লোহ বাহির হইয়াও থাকে। তাহাতে কড়া হাতা প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লোকে বিক্রয় করে। হিমালয়ের নীচে পঞ্জাব প্রদেশে ঝিলম জিলায় কোট-কিয়াণা নামক স্থানে হিমাটাইট্ আকর প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। সিন্ধুপারে বন্নু জিলায় কালাবাগ নামক স্থানেও লৌহের আকর অনেক। এখানে কিছু কিছু লোহ প্রস্তুত হয়। পেরেক, লৌহ-কলস, লৌহের হাঁড়ি প্রভৃতি দ্রব্যাদি করিতে এই লৌহ বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পেশোয়ার জিলায় বজৌর নামক স্থানে লৌহ-বালুকা হইতে লোকে লৌহ করে। বন্দুক করিবার নিমিত্ত কাবুলে এই লৌহের বড়ই আদর। কিন্তু পঞ্জাবে নানা স্থানে লৌহের আকর থাকিলে কি হইবে? এখানে কাঠ কি কয়লার বড়ই অভাব।

মধ্যপ্রদেশের লৌহ-আকর বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। এখন এই দিক্ দিয়া রেল হইয়াছে। সেই রেলের শাখা-প্রশাখা নানাদিকে যাইবার কথা আছে। সে নিমিত্ত এই অঞ্চলের লৌহ আকর এক্ষণে কাজে লাগিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্বকালে সম্বলপুর হইতে কটকে লোহ আসিত। সম্বলপুরের নিকট কদরবগা নামক একটী স্থান আছে, লোহার ও অগরীয়ারা এখানে অনেক লোহ করিত। রেড়াকোল, কোদালোই, রামপুর প্রভৃতি স্থানেও সেকালে অনিক লোহ হইত। এখনও যে হয় না, তাহা নহে, তবে অনেক কমিয়া আসিয়াছে। সম্বলপুরের লোহাকারেরা একস্থানে চিরদিন বাস করে না, কাঠের অপ্রতুল হইলেই অন্য স্থানে গিয়া ভাঁটি নির্মাণ করে। সম্বলপুরে হীরাও পাওয়া যায়, অন্যান্য ধাতুও আছে। এখানে প্রাচীনকাল হইতে অনেক লোকেই ধাতু সংগ্রহ করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত। সকল কাজেই সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য আছে, কাহারও বা লাভ হয়, কাহারও হয় না। ধাতুকার-দিগেরও তাহাই হইত। সুতরাং তাহারা ভাবিল, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের কোন অধীশ্বরী দেবতা থাকিবেন, যিনি প্রসন্ন হইলে লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে লাভ হয় না! ক্রমে তাহারা জানিল, এই দেবাটির নাম গোঁতেলী। আজ পর্য্যন্ত ধাতুকারেরা তাঁহাকে পূজা না করিয়া কোন কাজ করে না। সকলেই বোধহয় জানেন, সম্বলপুর বন্য প্রদেশ, এখানে গোণ্ড, কন্দ, শবর প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এ অঞ্চলে ক্রমে যখন হিন্দুদিগের প্রবেশ হইল, তখন তাঁহারা এই গোঁতেলী দেবতাটীকে লক্ষ্মী বলিয়া ধরিয়া লইলেন। ধাতুকারেরা তাঁহার কাছে ছাগ ও মহিষ বলি দিয়া থাকে। বাঁশ পুঁতিয়া বাঁশের ডগায় দেবতার উদ্দেশে মাংস বাঁধিয়া দেয়। চিল প্রভৃতি পক্ষি-পাখালিতে আসিয়া সেই মাংস লইয়া যায়। কবে কোথায় হয়ত একখণ্ড মাংস চিলের মুখ হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, আর দৈবক্রমে তাহাতে একখানি বড় হীরক বিঁধিয়া গিয়াছিল। কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি হীরক সহিত সেই মাংসখানি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই সৌভাগ্যের কথা লইয়া অবশ্যই চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া থাকিবে। গল্পটী প্রমাণ করিতে করিতে যতদূর যাইতে লাগিল, ততই যে নানা অলংকারে বিভূষিত হইয়াছিল, সে আর বিচিত্র কথা কি? আরব্য উপন্যাসে সিন্ধুবাদ কি করিয়া হীরা পাইয়াছিলেন, তাহা বোধহয় সকলের মনে আছে। সে গল্পের মূল হয়ত এই সম্বলপুরের লক্ষ্মী-পূজা। বিলাসপুর জিলায় অনেক লৌহের আকর আছে, কিন্তু এখানে অধিক পরিমাণে লৌহ হয় না। মান্দলা জিলায় অমরকণ্টক, উমেরওয়ানি, রামগড়,

মোয়াই প্রভৃতি স্থানে লৌহ নিষ্কৃত হইয়া থাকে; আর এই লৌহ অপরাপর জিলায়ও প্রেরিত হয়। ভাণ্ডারা জিলার লৌহ-আকর হইতে গোণ্ড, গোয়ারা, প্রধান ও ধীমর জাতিরা লৌহ করিয়া অন্যস্থানে প্রেরণ করে। জবলপুরে নানারূপ লৌহের আকর দেখিতে পাওয়া যায়। লমেটা, পানাগড় প্রভৃতি স্থানে ইহা হইতে অনেক লৌহ আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে হিমাটাইট জাতীয় আকরই অধিক। কুম্ভি পরগণায় এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ লৌহ-বালুকা আছে; তাহার নাম "ধাও"; ইহা হইতে লোকে কড়া হাতা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। জবলপুরের লৌহ-আকরে শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ লৌহ, বাকি অপরাপর পদার্থ। জৌলি নামক স্থানে এক প্রকার হিমাটাইট পাথর আছে। তাহাকে চূর্ণ করিয়া অলফার্ট নামক এক ব্যক্তি রং প্রস্তুত করেন। সেই রং বিক্রয় করিয়া তিনি বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন। পাহাড়ি নদীসমূহের জল দ্রুতবেগে বহিয়া যায়। সেই জল-স্রোতে ইঁনি কল বসাইয়াছেন। স্রোতের বলে সেই কলের চাকা ঘুরিতে থাকে; তাহার সহায়তায় তিনি পাথর পিশিয়া লন। হিমালয়ের অনেকস্থানে দেখিয়াছি, লোকে নদীর স্রোতে জাঁতা বসাইয়া সেই বলে ময়দা পিশিয়া লয়। জবলপুর জিলায় পলি বলিয়া একটী স্থান আছে। সেখানে প্রায় দুই শত হাত পরিমিত গর্ত করিয়া লোকে তাহা হইতে লৌহ-আকর বাহির করে। নরসিংহপুর জিলায় টেণ্ডুখেড়া ও অমরপানি নামক স্থানের লৌহ বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এখানে লোকে পাহাড়ের গায়ে গর্ত করিয়া ভাঁটি নির্মাণ করে। এই সকল ভাঁটিতে দুই প্রকার লৌহ প্রস্তুত হয়;—কাঁচা লৌহ ও অপরিশুদ্ধ ইস্পাত। এই ইস্পাতকে পুনর্বার পোড়াইয়া ও পিটিয়া লৌহ করিয়া লয়। সামান্য সামান্য কলের সহায়তায় এখানে একবার লৌহ প্রস্তুত করিবার কল্পনা হইয়াছিল। সেতু নির্মাণের নিমিত্ত কতকগুলি লৌহখণ্ড একবার প্রস্তুতও হইয়াছিল। সাগরে বিয়াস নদীর উপর যে পুল আছে, তাহা এই লৌহদ্বারাই নির্মিত। বলিতে পারি না, এরূপ লৌহ এখন আর এখানে হয় কিনা। মধ্যপ্রদেশে চান্দা জিলা লৌহের জন্য আরও অধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার আকর অতি উৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রায় ৭০ ভাগ লৌহ থাকে। দেবল গ্রামের নিকট খণ্ডেশ্বর পাহাড় লৌহ আকরে পরিপূর্ণ। এমন কি, সমুদয় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত লৌহের প্রয়োজন, তাহা এই পাহাড় হইতেই উদ্ধৃত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত গুঞ্জবাহি, লোহারা, পিপলগ্রাম, রত্নপুর প্রভৃতি নানা-স্থানে লৌহের আকর প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু অপরিসীম লৌহের আকর থাকিলে কি হইবে? এখানে পোড়াইবার দ্রব্যের বড়ই অভাব। কাঠের কয়লা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। নিকটে অরোরা নামক স্থানে পাথুরে কয়লা আছে সত্য, কিন্তু সে কয়লা ভাল নয়। তাহাতে কার্বণের ভাগ কম, ধাতব ভাগ অধিক। কার্বণ অল্প থাকায় ভালরূপ অগ্নি হয় না; কয়লার ধাতু ভাগটী ছাই হইয়া শীঘ্রই ভাঁটিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। বিলাতি মতে অধিক পরিমাণে লৌহ করিবার নিমিত্ত একবার এখানে পরীক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু এই কয়লার দোষে পরীক্ষার ফল ভালরূপ হয় নাই। পরীক্ষার নিমিত্ত ষোল হাত উচ্চ একটী বড় ভাঁটি নির্মিত হইয়াছিল। বিলাতি প্রণালীতে ভাঁটির তল-ভাগটী অগ্নি-ইষ্টক দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। ভাঁটি শুকাইলে তাহার প্রায় বার আনা ভাগ কাষ্ঠ দ্বারা প্রথম পরি-পূরিত করা হইল। নেস্ নামক একটী সাহেব এই পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেই কাঠে আগুণ লাগাইয়া দিলেন; দিয়া, তাহার উপর প্রচুর পরিমাণে কাঠের কয়লা চাপাইয়া দিলেন। যখন কয়লা উত্তমরূপ ধরিল, তখন তাহাতে একমণ পাথুরে কয়লা, অর্ধমণ লৌহ আকর ও দশ সের চুণের পাথর একসঙ্গে ঢালিয়া দিলেন। ভাঁটি যেমন জ্বলিতে লাগিল, তেমনি মাঝে মাঝে বার বার কয়লা, আকর

এবং চূণ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে ভাঁটি ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। ২৮ ঘণ্টার পর ভাঁটির গায়ের ছিদ্র দিয়া তরলভাবে লোহমল গড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। ভাঁটির নিম্নভাগে লোহ জমিতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন, লোহ কোমল হইয়াছে বটে, কিন্তু তরলভাব ধারণ করে নাই। বিলাতি মতে লোহ প্রস্তুত করিতে হইলে, লোহ তরল হওয়া চাই। তরল করিবার জন্য তিনি তাই আরও কয়লা ও আকর চাপাইয়া দিলেন, আর দ্রুতবেগে জাঁতা চালাইতে আদেশ করিলেন। এত উত্তাপ হইল যে, তাহাতে অগ্নি ইষ্টক পর্য্যন্ত গলিয়া যাইল, ভাঁটির তলভাগ গলিয়া যাইল, কিন্তু লোহ তবুও গলিল না। ক্রমাগত কয়লা ও আকর দিয়া এত লোহ জমিল যে, তাহা ভাঁটির গলায় গিয়া ঠেকিল। তখন নেস্ সাহেব করেন কি, আগুণ নিবাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। শীতল হইলে ভাঁটি খুঁড়িয়া সেই লোহখণ্ডকে বাহির করিয়া লইলেন, লোহখণ্ড প্রায় ৩৫ মণ ওজনে হইয়াছিল। কয়লার ছাই উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, লোহ একবারে গলিয়া জলের মত হয় নাই। যাহা হউক লোহ বড় মন্দ হয় নাই; কিন্তু বিলাতি প্রণালীতে ঠিক কাজ হইল না। পাথুরে কয়লা ভাল নয় বলিয়া হয় নাই। বিলাতে এই কথা লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল। তাহাতে এই স্থির হয় যে, অরোরার পাথুরে কয়লা মন্দ হউক, একটু কৌশল করিয়া ব্যবহার করিলে, সে কয়লায় কাজ চলিতে পারিবে। যতদূর জানি, চান্দাতে তাহার পর লোহ নিষ্করণ করিতে বিশেষ কোন যত্ন হয় নাই।

যেরূপ উত্তরে, দক্ষিণ অঞ্চলেও সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে লোহের আকর আছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে ত্রিচিণাপল্লি প্রভৃতি স্থানের নিকট আজিও রাশি রাশি লোহমল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই সকল স্থানে অনেক লোহ প্রস্তুত হইত। কয়লার অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সালেমের গিরিসমূহ চুম্বক আকরে পরিপূর্ণ। কয়লার অভাবে তাহা হইতে অতি অল্পই লোহ নিষ্কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু সালেমের চুম্বক প্রস্তর লইয়া সেকালে অনেক লোহ হইত। ষাট বৎসর পূর্বে এই প্রস্তর হইতে লোহ বাহির করিবার নিমিত্ত সাহেবদিগের একটী কোম্পানী ছিল। দক্ষিণ আর্কটে পোর্টো-নভো নামক স্থানে তাঁহাদিগের কারখানা ছিল। সালেমের আকর হইতে অতি উত্তম ইস্পাত করিয়া তাঁহারা বিলাতে পাঠাইতেন। পিগ-আইরণ, অর্থাৎ ঢালা লোহ প্রস্তুত করিয়াও তাঁহারা বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। বিলাতের লোকে সে লোহকে বড়ই আদর করিয়াছিলেন। এমন কি, কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, ইস্পাত করিতে ভারতবর্ষই ইংলণ্ডকে সমুদয় লোহ যোগাইতে পারিবে। তাঁহারা সুইডেনের নিকট আর চুম্বক পাথরের লোহ কিনিবেন না; এখন হইতে ভারতবর্ষ হইতেই কিনিবেন, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। বিদেশীয়দিগকে টাকা দিব কেন? আমাদের প্রজা ভারতবাসীদিগকে সেই টাকা দিব। হাতে পয়সা হইলে, তাহারা আমাদের কলের কাপড় আরও অধিক কিনিতে পারিবে। উভয়েরই লাভ হইবে। কিন্তু কয়লার অভাবে সালেমের চুম্বক-প্রস্তর হইতে লোহ নিষ্করণ কাজ অধিক দিন চলিল না। মান্দ্রাজ অঞ্চলে আরও যে কতস্থানে লোহের আকর আছে, তাহার কথা আর কত বলিব। মহিসূরে আমি কোন কোন স্থানে লোহ-নিষ্করণ কার্য্য দেখিয়াছি। নন্দিদুর্গ পর্বতের মাথার উপর একবার দিনকত বাস করি। ইহা এক্ষণে জনশূন্য, কেবল দুই তিনটি বাঙ্গলা ও তাহার তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত এক-আধটী খানসামা আছে। পূর্বে হাইদার আলি ও টিপু সুলতান আসিয়া এখানে কখন কখন বাস করিতেন। নন্দিদুর্গের নিকট চিকবালাপুরে, চিত্রাবতী নদীর উৎপত্তিস্থানে আমি অনেক লোহের আকর দেখিয়াছিলাম। সেই লোহ হইতে

আকমাড়া কল করিবার নিমিত্ত একটী দেশীয় বণিক কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহার কারখানা দেখিতে তিনি আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গপট্টনের নিকট কাবেরী নদীর ধারেও আমি অনেক লৌহের আকর দেখিয়াছি। মহিসূরে সেকালে অতি উত্তম ইস্পাত হইত। এই ইস্পাত বিলাতেও প্রেরিত হইত। কিন্তু দোষ এই, সকল ইস্পাত সমানভাবে প্রস্তুত হইত না। সেইজন্য ব্যবসা চলিল না। হাইদ্রাবাদের নানা স্থান বহুকাল হইতে ইস্পাতের জন্য প্রসিদ্ধ। নির্মল, দিবমূর্তি, কোন-সমুদ্রম, মুতপল্লি, কোণ্ডাপুর প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত হইত। তুরস্ক ও পারস্য হইতে ব্যবসাদারেরা আসিয়া সেই ইস্পাত কিনিয়া লইয়া যাইত। ইস্পাহান ও দামাস্কাস নগরের জগৎবিখ্যাত বহুমূল্য অস্ত্র-শস্ত্র এই ইস্পাত হইতেই লোকে প্রস্তুত করিত। বোম্বাই প্রদেশে রত্নগিরি, কোলহাপুর, রেবা-কান্থা, কাটিবার, কচ প্রভৃতি নানা স্থানে লৌহের আকর। কিন্তু আর কত বলিব!

ভারতবর্ষের সর্বস্থানেই লৌহের আকর পড়িয়া রহিয়াছে। সামান্য আকর নয়, অতি উৎকৃষ্ট আকর। এরূপ আকর পাইলে বিলাতের লোকে আপনাদিগকে অতি ভাগ্যবান মনে করেন। তাহা হইতে লৌহ উদ্ধৃত করিতে হইলে যে সমুদয় বস্তুর আবশ্যক, তাহা আমাদিগের অভাব আছে সত্য। কিন্তু এককালে বিলাতেও এইরূপ অভাব ছিল। বুদ্ধিবলে ইংরেজেরা সেই অভাব মোচন করিয়াছেন। এই জগতে বিঘ্ন, বাধা, বিপদ, অভাব আছে বলিয়াই মনুষ্যজাতি আজ এই দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত। সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, সেই অভাবকে মোচন করিবার নিমিত্ত, মনুষ্যের উদ্যম ও উৎসাহ। সেই বিপদ, সেই অভাব মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির মূল। যদি গণ্ডারের মত চর্ম হইত, যদি হস্তীর মত বল হইত, যদি ব্যাঘ্রের মত দন্ত থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যকে আর প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত ভাবিতে হইত না। ভাবনা অভাবে মনুষ্যকে তাহা হইলে আজ জড় পশুর ন্যায় থাকিতে হইত। ভাবনাই বুদ্ধিমার্জনের একমাত্র উপায়। নদীর পলিতে একবার দুইমুঠা বীজ ছড়াইয়া নিদ্রা যাইলেও যাহারা প্রচুর শস্য লাভ করিতে পারে, তাহাদের মনে ভাবনা কোথা হইতে আসিবে? সেই ভাবনাশূন্যতাই ভারত-পতনের প্রধান কারণ। তাই বলি, ভারতে যে ক্ষুধা আসিয়াছে, সেজন্য নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইও না। ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিপদ, বাধা বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ কর দেখি?

আকর হইতে লৌহ বাহির করা কি, সে কথার আভাস পূর্বেই দিয়াছি। লৌহের আকরে কেবল লৌহ থাকে, তাহা নহে। ইহার সহিত অক্সিজেন, গন্ধক, সিলিকা, আলুমিনিয়া, ফস্‌ফরস্, কার্বণ প্রভৃতি অপরাপর নানা বস্তু মিশ্রিত থাকে। সেই সকল দ্রব্য হইতে লৌহকে পৃথক্ করিয়া লওয়াই বড় কঠিন কথা। পৃথক্ করাই লোহাকারদিগের কাজ ও তাহাদিগের বিদ্যা। আকরে যদি কেবল লৌহ ও অক্সিজেন থাকে, তাহা হইলে লৌহকে পৃথক করিয়া লওয়া ততটা কঠিন কথা নহে। তাই, পূর্বকালের লোকেরা কেবল এইপ্রকার আকর লইয়াই কাজ করিত। ভারতবর্ষের লৌহ-নিষ্করণ-কার্য্যও প্রায়ই সর্বত্রে এইরূপ আকর লইয়া হইয়া থাকে। বিলাতে তাহা নহে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রভাবে বিলাতের লোকেরা অপরাপর বস্তু হইতেও সহজে লৌহকে পৃথক করিয়া লইতে পারেন। ভারতের লোহাকারেরা অতি উৎকৃষ্ট অক্সিজেন মিশ্রিত আকর না পাইলে কাজ করিতে পারে না; বিলাতের লোকেরা অতি নিকৃষ্ট নানাদ্রব্য মিশ্রিত আকর হইতেও লৌহ বাহির করিয়া লাভ করিতে পারেন। ভারতের লৌহ-কার্য্যের তাই অবনতি, বিলাতে তাই উন্নতি। অক্সিজেন, লৌহকে ধরিয়া রাখিয়াছে। দুইটীকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই আমরা লৌহটী পাই। তাই এক্ষণে দেখিতে হইবে, লৌহ অপেক্ষা কাহার সহিত অক্সিজেনের অধিক প্রণয়। সেইটী আনিয়া দিলেই অক্সিজেন তাহার কাছে যাইবে,

লোহ একেলা পড়িয়া থাকিবে। লোহ অপেক্ষা অক্সিজেন কার্বণকে অধিক ভালবাসে; তাই কাছে কার্বণ আনিয়া দিলে, আকরের অক্সিজেন কার্বণে প্রবেশ করে,—আকরের লোহ পৃথক হইয়া পড়ে। কাঠের কয়লায় অধিক পরিমাণে কার্বণ আছে। তাই মানুষে কাঠের কয়লা ও লোহ-প্রস্তর দুইটীকে একসঙ্গে রাখে। কিন্তু উত্তাপ না পাইলে কয়লা অক্সিজেন লইতে পারে না। এদিকে উত্তাপ না পাইলে আকর হইতে অক্সিজেন বাহির হইতে পারে না। তাই মানুষে কয়লায় আগুণ দিয়া দেয়। কয়লা প্রথমে বায়ুর অক্সিজেন লইতে থাকে। দুইটীতে মিলিয়া কার্বণিক অম্লের উৎপত্তি হয়। এইরূপ কার্য্যকে আমরা সাধারণ ভাষায় পোড়া বলি। পুড়িবার সময় কয়লা হইতে উত্তাপ বাহির হয়। সেই উত্তাপের বলে আকরের লোহ ও অক্সিজেন পৃথক হইয়া পড়ে। উত্তাপ অধিক না হইলে কিন্তু তাহারা পৃথক হয় না। তাই মানুষে সমুদয় উত্তাপটুকু ভিতরেই রাখিতে চেষ্টা করে। উত্তাপটুকু পাছে বাহির হইয়া যায়, সেজন্য কাদা দিয়া লোকে চারিদিক ঘিরিয়া দেয়। তাহাকেই ভাঁটি বলে। সামান্য কাদা দিয়া ঘিরিলে তবুও কিছু কিছু উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। সেজন্য বিলাতের লোকেরা একপ্রকার মৃত্তিকার আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই মৃত্তিকা দিয়া তাঁহারা ইট প্রস্তুত করেন। ইহাকে অগ্নি-ইষ্টক বলে। অতিশয় উত্তাপেও ইহা সহজে গলিয়া যায় না। আর ইহা দিয়া ভাঁটি গড়িলে উত্তাপ বড় অধিক বাহির হইয়া যায় না। এজন্য সেখানকার লোকে এই ইষ্টক দিয়া ভাঁটি গড়িয়া থাকেন। সহজে কয়লা গনগনে পুড়িলে যে উত্তাপটুকু বাহির হয়, তাহাতে আকর হইতে অক্সিজেন বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই সেই আগুনে প্রচুর পরিমাণে বায়ুস্রোত পরিচালিত করিয়া দিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই হাঁতা দিয়া লোকে বাতাস দিয়া থাকে। এইরূপে উত্তাপ অধিক হইলে, আকরের অক্সিজেন পৃথক হইয়া কার্বণে প্রবেশ করে। আকরের লোহ পৃথক হইয়া পড়ে।

তবেই হইল, অতি উৎকৃষ্ট লৌহ-আকর হইতে লোহ বাহির করিতে হইলে, প্রথমেই দুইটী বস্তুর আবশ্যক,—কয়লা ও বায়ু। ভারতের নানা স্থানে যে লৌহ-আকর বৃথা পড়িয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, কয়লা নাই। সেকালে ভারতভূমি বোধহয় এত জনাকীর্ণ ছিল না; বিদেশীয়দিগের সহিত এত অধিক ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না। বিদেশে পাঠাইবার নিমিত্ত এত অধিক কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের আবশ্যক ছিল না। সুতরাং এত অধিক ভূমি কর্ষিত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। তাই এখানে পতিত-ভূমি, সেখানে গোচর, ওখানে বন, এইরূপ চারিদিকে ছিল। পতিত-ভূমি আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গোচর অভাবে গরু সব অস্থিচর্মসার হইয়াছে। যেখানে নৈমিষ্যারণ্য ছিল, আজ সেইখানে জনপূর্ণ অযোধ্যা প্রদেশের হরডুই জিলা। বন কমিয়া গিয়াছে, তাই কয়লারও অভাব হইয়াছে। তাহাও বটে, আবার যাহা কিছু বন আছে, তাহার উপরও রাজা সম্পূর্ণ-রূপ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। বনবিভাগের কর্তৃপক্ষদিগের বিনা অনুমতিতে কোথাও একটী কাটি কাটিবার যো নাই, একগাছি তৃণে হাত দিবার যো নাই। বনের উপর গবর্ণমেণ্ট যে এরূপ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত মন্দ কথা নহে। এরূপ না করিলে ভারতে একবারেই বন থাকিবে না। বন না থাকিলে অনাবৃষ্টি হয়, ভূমিতে রস সঞ্চিত থাকিতে পারে না। ইহার ফলাফল অতি দূরদেশ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এমন কি, হিমালয়ে বন না থাকিলে, এতদূরস্থ বঙ্গদেশেরও অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। আমি দেখিয়াছি, দক্ষিণে নীলগিরি ও পশ্চিমঘাটের পর্বতসমূহের অনেক স্থান লোকে বন কাটিয়া কাটিয়া একেবারে প্রস্তরময় করিয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই সকল পর্বতে প্রথম ঘাস, তারপর ছোট ছোট গাছ, তারপর বড় বড় বৃক্ষ, এইরূপ হইয়া তাহাদিগের পাতা পড়িয়া, পাতা পচিয়া

ক্রমে মৃত্তিকা হইয়াছিল। পাথরের উপরে গাছের শিকড়ের দ্বারা সেই সকল মাটি আবদ্ধ ছিল। এখন লোকে বন কাটিয়া সেই মৃত্তিকাতে কফির চাষ করিতে গিয়াছে। কিন্তু গাছের শিকড়ের বাঁধন যেই অন্তর্হিত হয়, আর মাটিগুলি বর্ষার জলে ক্রমে ধুইয়া যায়। ধুইয়া-ধুইয়া নদীতে গিয়া পড়ে, নদী দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে,—পাহাড়ে পাথর বাহির হইয়া পড়ে। যখন মৃত্তিকা থাকে, তখন বর্ষার জল অনেক মাটিতে বসিয়া যায়। এখন পাথরে জল আর কি বসিবে? যেই বৃষ্টি হয়, আর জল দ্রুতবেগে একবারে যাইয়া নদীতে পড়ে। পাহাড়ে আর রস থাকে না। বর্ষাকাল গত হইয়া যাইলে পূর্বে ভূমিতে যা রস থাকিত, তাহা চুয়াইয়া চুয়াইয়া ঝরণা হইত; অনেকগুলি ঝরণার জল জুটিয়া নালা হইত; অনেকগুলি নালা পড়িয়া নদীগুলিকে জীবিত রাখিত। নদীগুলি যে সকল জনাকীর্ণ গ্রামসমূহ দিয়া বহিয়া যাইত, সেখানকার ভূমিকে স্নিগ্ধ রাখিত; মাঠ, ঘাট, খেত, খোলা সকলই স্নিগ্ধ থাকিত। বর্ষান্তে তাই এখন অনেকস্থান কেবল প্রস্তরময় ও শুষ্ক, ঝরণা শুষ্ক, নদী শুষ্ক, দূরদেশে জনপদ তৃষিত ও তৃণশূন্য। ভূমধ্যসাগরে মল্টা নামক একটী দ্বীপ আছে। কেবল একদিনের জন্য আমি সেই দ্বীপে বাস করিয়াছিলাম। দ্বীপের ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, বনশূন্য হইয়া এখানেও এই দশা ঘটিয়াছিল। প্রকৃত তাহাই। শেষকালে এখানকার লোককে জাহাজে করিয়া নিকটস্থ সিসিলি দ্বীপ হইতে মাটি আমদানি করিতে হইয়াছিল। এই মাটিকে পাহাড়ের গায়ে বসাইয়া তাহারা কৃষিকার্য্য করে। তাই বলি, বন রক্ষা করা রাজার কর্তব্য কর্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এদিকে কিন্তু বন রাখিতে গিয়া কয়লার অভাব হইয়াছে। এক স্থানের বন ফুরাইলে লোহাকারদিগের আর অন্য স্থানে যাইবার বড় সুবিধা নাই। সুতরাং বন ফুরাইল তো লোহার কাজ ফুরাইল। এক সময় বিলাতেও এই রহস্য ঘটিয়াছিল। চারিশত বৎসর পূর্বে জর্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশ হইতে ইংলণ্ডে অনেক লৌহ ও ইস্পাত আমদানি হইত। ইংলণ্ডের রাজা মনে করিলেন, এতো ভাল কথা নয় যে, অন্য দেশের লোক লৌহ দিয়া আমার প্রজাবর্গের নিকট হইতে স্বর্ণ লইয়া যাইবে? তাই তিনি বিদেশ হইতে বিলাতে লৌহ আমদানি করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু লৌহ না হইলে তো আর কাজ চলে না। কাজেই বিলাতের লোকে নানাস্থানে ভাঁটি খুলিতে লাগিল। তখন পাথুরে কয়লা দিয়া কি করিয়া লৌহ বাহির করিতে হয়, লোকে তাহা জানিত না; কাঠের কয়লা দিয়াই সর্বত্র লৌহ বাহির হইত। দেশের গাছ কাটিয়া লোকে ইংলণ্ডকে একেবারে বৃক্ষশূন্য করিয়া ফেলিল। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে রেলগাড়ির কলে পূর্বে কাঠ পুড়িত। তাহার দৌরাত্ম্যে সে অঞ্চলও এইরূপ বৃক্ষশূন্য হইতে বসিয়াছিল। যাহা হউক ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ দেশ বৃক্ষশূন্য হইতেছে দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি নূতন ভাঁটি করা ও গাছ কাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু লোহা চাই, লোহা না হইলে কাজ চলে না। আমরা যেরূপ একপথ বন্ধ হইয়া যাইলে একবারে চারিদিক শূন্য দেখি, জ্ঞানহারা হইয়া পড়ি, ইংলণ্ডের লোকে তাহা নহে। এক পথ বন্ধ হইলে, তাঁহারা অন্য পথের ভাবনা করেন। যখন গাছ কাটা বন্ধ হইল, তখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, অন্য কি উপায়ে লৌহ বাহির করিতে পারি। ইংলণ্ডে পাথুরে কয়লা আছে, সুতরাং তাহা দিয়া সকলেই লৌহ বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এই চেষ্টা হইতে লাগিল। কত লোকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ১৬১৮ খৃঃ ডড্‌লি সাহেব পাথুরে কয়লা দ্বারা উত্তম লৌহ বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু কুসংস্কার সর্বত্রই আছে। প্রচলিত বস্তু খুব ভাল, ইহার উপর আর কোন উন্নতি চলে না, এইরূপ সকলেরই ধারণা। প্রাচীনকালে

যে কত উৎকৃষ্ট ছিল তাহার তো কথাই নাই। সে কালের জন্য কে না চক্ষুর জল ফেলিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া দেন? কিন্তু ভাল হইলেও "কাল" কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। বালক-কাল ভাল, যৌবন-কাল ভাল, তা বলিয়া কি আমার চির-বাল্য, চির-যৌবন থাকিবে? পৃথিবীর অবস্থাও সেইরূপ। কাল অগ্রসর হইতেছে, পৃথিবী পরিবর্তন হইতেছে। সেই কালের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চলিতে হইবে। ইংলণ্ডের লোক সে সময়ে সে কথা বুঝিলেন না। পাথুরে কয়লা দিয়া লোহ বাহির করার প্রণালী ডড্‌লি সাহেবের কাছে তাঁহারা শিখিলেন না; সুতরাং বিদেশ হইতে লোহ আসিয়া বিলাতের লৌহকারদিগকে উৎসন্ন দিতে লাগিল। যেরূপ আজকাল ভারতবর্ষে হইয়াছে। বিলাতের লৌহ-নিষ্করণকার্য্যও প্রায় একবারে ধ্বংস হইয়া যাইল। ১৭১৩ খৃঃ এব্রাহাম ডারবি নামক একজন ইংরেজ পুনরায় পাথুরে কয়লা হইতে লোহ বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। তিনি আপনার কারখানায় এই প্রণালী প্রচলিত করিলেন। পাথুরে কয়লার দোষ এই যে, ইহাতে কার্বণ ছাড়া গন্ধক, ফস্‌ফরস্‌ প্রভৃতি অপরাপর অনিষ্টকর দ্রব্য থাকে; আকর পোড়াইবার সময় সেই দ্রব্য লোহে যাইয়া প্রবেশ করে; সেই সমুদয় দ্রব্য কিরূপে দূরীভূত করিতে হয়, তাহা লোকে জানিত না; সেইজন্য পাথুরে কয়লা ব্যবহার হয় নাই। পাথুরে কয়লাকে কোক কয়লা করিয়া লইলে, অনেকটা দোষের ভাগ দূরীভূত হয়; সম্পূর্ণরূপ হয় না। তবুও ১৭৫০ সাল হইতে কোকের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া লোহ-কার্য্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। পাথুরে কয়লা ও কোক দিয়া আকর হইতে প্রথমে অপরিশুদ্ধ লোহ বাহির করিয়া লইয়া, পরে তাহাকে পরিশুদ্ধ করিবার উপায় বিলাতের লোকে ক্রমে আবিষ্কার করিলেন। লোহ পরিশুদ্ধ করিবার প্রধান উপায়কে "পডলিং" বলে। পরিশুদ্ধ করিবার উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে কয়লা ও কোক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইতে লাগিল, আর বিলাতে লোহ-নিষ্করণকার্য্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

কয়লা যদি আপনা-আপনি ভাঁটির ভিতর জ্বলে তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ হয় না; সে উত্তাপে লোহ-প্রস্তর গলিয়া যায় না। আর না গলিলে, তাহা হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া পড়ে না। অক্সিজেন বাহির না হইলে, কার্বণ তাহাকে লইতে পারে না। তাই জাঁতা দিয়া ভাঁটিতে বাতাস দিতে হয়। অতি প্রাচীনকালে লোকে করিত কি? বড় বড় পাহাড়ের উপর ভাঁটি নির্মাণ করিত। ভাঁটির গায়ে ছিদ্র রাখিত। যখন খুব বাতাস হইত, তখন তাহারা ভাঁটি জ্বালাইত। ছিদ্র দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া জাঁতার কার্য্য সম্পন্ন করিত। তারপর ক্রমে অল্প অল্প জাঁতার ব্যবহার হইতে লাগিল। মঙ্গোপার্ক বলিয়া একজন ভ্রমণকারী আফ্রিকা দেশের অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে লোহ বাহির করা কার্য্য দেখিয়াছিলেন। সেই অসভ্যেরা ছাগচর্ম্মের ছোট ছোট জাঁতা ব্যবহার করিত। নড়রামের জাঁতার কথা তো বলিয়াছি। কিন্তু ভাঁটিতে বাতাস দিবার জন্য আজকাল যে সব প্রণালী আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার কাছে নড়রামের জাঁতা ছেলেখেলা বই আর কিছুই না। আট সহস্র হাত দীর্ঘে আট সহস্র হাত প্রস্থে ও আট সহস্র হাত উচ্চে,—এই স্থানের ভিতর যত বায়ু ধরে, প্রতি মিনিটে সেই বায়ুরাশি ধরিয়া এবং ছুঁড়িয়া ভাঁটির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিলে আর আজকালের লৌহ-কার্য্য ভালরূপ হয় না। সুতরাং বিলাতি লৌহের সহিত সংগ্রাম করা এখন আর নড়রামের কাজ নয়। বিলাতে যেদিন হইতে এই কলের জাঁতা আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতেই লৌহ-কাজের বিশেষ উন্নতি আরম্ভ হইল। অধিক দিনের কথা নয়, ১৭৬০ সালে স্মিটন নামক এক ব্যক্তি আপনার কারখানায় প্রথম কলের জাঁতা বসাইলেন। নড়রামের

মত ছোট ছোট জাঁতা বই আর বড় বড় জাঁতা মানুষ আপনার বলে বহিতে পারে না। তাই তিনি মানুষের বল না লইয়া নদীস্রোতের বলে বড় বড় জাঁতা চালাইতে লাগিলেন। নদীর জল যে হুহু করিয়া চলিয়া যাইতেছে, বায়ু যে হুহু করিয়া বহিতেছে, ইহাদিগের তো একটী শক্তি রহিয়াছে! জলের কত বল তাহা নদী-প্লাবনের সময় সকলে দেখিয়াছেন, বায়ুর কত বল তা ঝড়ের সময় সকলেই দেখিয়াছেন। জল ও বায়ুর আসুরিক বল অজ্ঞদিগের ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া দেয়, বিজ্ঞদিগের দাসানুদাস হইয়া, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া, তাহাদিগের নিমিত্ত অর্থোপার্জন করে। স্মিটন সাহেব বড় বড় জাঁতা করিয়া কৌশলে জলস্রোত তাহাতে জুতিয়া দিলেন। সেই জলস্রোত জাঁতা বহিতে লাগিল। ঘোরতর বেগে, একাধারে প্রচুর পরিমাণে ভাঁটিতে বায়ু প্রবেশ করিতে লাগিল। স্মিটন সাহেব অতি সত্বর এই কৌশলের ফল লাভ করিলেন। তাঁহার ভাঁটিতে পূর্বে প্রতি সপ্তাহে তিনশত মণের অধিক লৌহ হইত না। এই জাঁতা বসাইতেই প্রতি সপ্তাহে ছয়শত মণ করিয়া লৌহ হইতে লাগিল। তাঁহার এই আবিষ্কারের ফল সমগ্র ইংলণ্ডও লাভ করিল। পাথুরে কয়লা এবং জাঁতা ব্যবহার হইবার পূর্বে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ মণের অধিক লৌহ হইত না। এক্ষণে কুড়ি লক্ষ মণ করিয়া হইতে লাগিল। ১৭৮৮ খৃঃ ইংলণ্ডে লৌহ কার্য্য এইরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। জেমস ওয়াট সাহেব নামক এক ব্যক্তি অতি বলশালী বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃজন করিলেন। ইহা সেই কল,—যাহা এক্ষণে সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেশ-দেশান্তরে বড় বড় পর্বতাকার জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইতেছে; সেই বাষ্পীয় কল,—যাহার বলে বিস্তীর্ণ রেলগাড়ি শ্রেণী "এক" এই শব্দটী বলিতে না বলিতে ৬০ হাত রাস্তা চলিয়া যায়। মহাবলশালী এই বাষ্পীয় কল বিলাতের লোকে ভাঁটিতে জুতিয়া দিলেন। কত বলে কত পরিমাণে এক্ষণে ভাঁটিতে বাতাস যাইতে লাগিল, তাহা বুঝিয়া লউন। এই উপায়ে, ইংলণ্ডে লৌহ-নিষ্করণকার্য্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়িল। যেখানে পূর্বে ২০ লক্ষ মণ লৌহ হইত, এক্ষণে সেখানে ৩৫ লক্ষ মণ লৌহ হইতে লাগিল। ইহা ১৭৯৬ সালের কথা। আর দশ বৎসরে আবার তাহারও দ্বিগুণ হইল। ১৮০৬ সালে ইংলণ্ডে ৭২ লক্ষ মণ লৌহ প্রস্তুত হইয়াছিল। এইরূপে লৌহ উদ্ধারকার্য্য বিলাতে দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এত উন্নতি হইল যে, ১৮২৮ খৃঃ প্রায় তিন কোটি মণ লৌহ বিলাতে প্রস্তুত হইয়াছিল। স্মিটন সাহেব ধন্য! ওয়াট সাহেব ধন্য! এই দুইটী সামান্য ব্যক্তির বুদ্ধিকৌশলে, আজ মাটী লৌহে পরিণত হইতেছে, শতসহস্র নরনারী আজ এই কার্য্য করিয়া উদরের জ্বালা নিবারণ করিতেছে। আমাদের মধ্যেও যদি একজন স্মিটন কি ওয়াটের মত লোক জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু লোহাকারদিগের ছেলে-মেয়ে-গুলি আর আজ পেটের জ্বালায় পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইত না। এই সময়ে আবার আর একটী নূতন প্রণালীর উদ্ভাবনদ্বারা লৌহ-নিষ্করণ কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইল। গ্লাসগো নগরের নিলসন নামক এক ব্যক্তি দেখিলেন যে, জাঁতা দ্বারা বাহিরের শীতলবায়ু ভাঁটিতে প্রবেশ না করাইয়া, যদি সেই বায়ুকে প্রথম উত্তপ্ত করিয়া, তারপর ভাঁটির ভিতর পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। জাঁতার মুখে যে নলটি থাকে, তাহা দিয়া একেবারে ভাঁটিতে বায়ু প্রবেশ না করাইয়া তাহাকে দূর পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, ও ক্রমে তাহাকে অধিক হইতে অধিকতর উত্তপ্ত করিয়া তার-পর তিনি সেই নলটিকে ভাঁটির মুখে সন্নিবেশিত করিলেন। এই উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়া জাঁতা হইতে ভাঁটিতে বায়ু যাইতে-যাইতে বায়ু ঘোরতর উত্তপ্ত হইয়া

পড়ে। ফারেনহিটের তাপযন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বায়ু ৭০০ হইতে ৮০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া থাকে। এই উপায়ে প্রথমেই এই ফল হইল যে, যেখানে ২৮ মণ লোহ করিতে ২২৪ মণ কয়লা লাগিয়াছিল, সেখানে এখন ১৪০ মণ পড়িতে লাগিল। কয়লার খরচ কম হইল তো লোহা প্রস্তুত করিবার খরচও কম হইল। লোহের মূল্য কম হইল, তাহাতে বিলাতি লোহ বিদেশে পাঠাইবারও সুবিধা হইল। কারণ এতদিন বিলাতি লোহের মূল্য অধিক ছিল বলিয়া, যে দেশে ইহা যাইত, সেখানকার লোহের সহিত সংগ্রামে বড় জয়ী হইতে পারিত না। এখন সস্তা হইল, তাই সকল দেশের লোহ আর ইহার সহিত সংগ্রামে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। পৃথিবীর নানাদেশে এক্ষণে ইংলণ্ডের লোহ বিক্রয় হইতে লাগিল। ভাঁটিতে উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশের প্রণালী আবিষ্কার হওয়ার পরেই দশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে লোহ-প্রস্তুত-কার্য্য আবার দ্বিগুণ হইল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৩৯ সালে, এই দেশে চারি কোটি ২৩ লক্ষ মণ লোহ প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে বিলাতে প্রতি বৎসর প্রায় ২২ কোটি মণ লোহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমেরিকাতে এ কাজ সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকার লোক ইংরেজবংশ-সম্ভূত। ইহাঁদেরও বল-বুদ্ধি-উদ্যম-উৎসাহ সেইরূপ। গত বৎসর লোহ নিষ্করণ কার্য্যে ইংরেজকে ইহাঁরা পরাভূত করিয়াছেন। গত বৎসর আমেরিকাতে ২৫ কোটি মণ লোহ প্রস্তুত হইয়াছিল।

পোড়াইবার জন্য কয়লা, আর আগুণ জ্বালাইবার জন্য বাতাস, এই দুইটী বিষয়ে উত্তম প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বিলাতের লোকে কি অদ্ভুত ফলই না লাভ করিলেন! এক্ষণে ইহাঁরা রাশি রাশি লোহ-আকর, আর তাহার সঙ্গে একবারে রাশি রাশি কয়লা ভাঁটিতে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইলেন, আর সেই কয়লা ধরাইবার জন্য ভাঁটির ভিতর প্রবল ঝড়ের উৎপাদন করিতে পারিলেন। তবে আর নণ্ডরামের মত ছোট ছোট ভাঁটিতে আবশ্যক কি? তাই এক্ষণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাঁটি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন ভাঁটিগুলি ৭০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে; দীর্ঘে প্রস্থে পরিসরও সেইরূপ। দীর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা কালি করিলে ২০,০০০ হস্তের অধিক ইহাদিগের পরিসর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি আকরে কেবল লোহ ও অক্সিজেন থাকিত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। অক্সিজেন হইতে লোহকে পৃথক করিয়া লওয়া বড় কঠিন কথা নহে। আকরে অন্যান্য বস্তু মিশ্রিত থাকে; তাহাদিগের মধ্যে গন্ধক ও ফস্‌ফরস্‌ বড়ই অপকারী। বিলাতের আকরে প্রায়ই এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই স্থানে যেখানে প্রচুর পরিমাণে লোহ প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ ক্লিভলাণ্ড ও দক্ষিণ-ষ্টাফোর্ড-শায়ার, সেই-খানকার লোহের আকর সর্ব্বের চেয়ে নিকৃষ্ট। আকর নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সেখান-কার মনুষ্যের বুদ্ধি-কৌশল আবার সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। তাই স্বভাবের নিকৃষ্টতা, মানববুদ্ধির উৎকৃষ্টতার নিকট পরাভব মানিয়াছে। বুদ্ধিবলে তাহারা গন্ধক ও ফস্‌ফরসকে লোহ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। তারপর গন্ধক ও ফস্‌ফরস ছাড়া লোহ-আকরে মৃত্তিকা অনেক থাকে। এই মৃত্তিকায় সিলিকন ও আলুমিনিয়ামের ভাগই অধিক। যেমন লোকে কার্বণ দিয়া আকর হইতে অক্সিজেনকে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লয়, তেমনি আর একটি পদার্থ দিয়া সিলিকন ও আলুমিনিয়মকে ভুলাইয়া লইতে পারা যায়। সে পদার্থটা চুণ। লোহ-নিষ্করণ কার্য্যে এইজন্য চুণের ব্যবহার হয়। এ কথা রাণীগঞ্জের লৌহকারখানার বিষয় বলিবার সময় উল্লেখ করিয়াছি। আকর গলাইলে, অক্সিজেন নির্গত হইয়া যাইলে, যদি সিলিকা প্রভৃতি বালুকা ও মৃত্তিকা লোহের সহিত অধিক পরিমাণে থাকিয়া

যায়, তাহা হইলে সে লৌহ অতিশয় ভংগপ্রবণ ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়। তাই আকরে চূণ মিশাইয়া দিলে, সেই সিলিকা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ যাইয়া চূণের সহিত মিশ্রিত হইয়া, ঝামার মত এক প্রকার দ্রব্যের উৎপত্তি করে। তাহাকে শ্ল্যাগ বলে, আমরা ইহাকে লৌহ-মল বলি।

বিলাতি মতে লৌহ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই ;—প্রথমে ভাঁটির তলভাগে প্রায় কুড়িমণ শুষ্ক কাষ্ঠ সাজাইয়া দিতে হয়। তাহার উপর প্রায় ২৮০ মণ কোক কয়লা রাখিতে হয়। তাহার উপর আকর ও চূর্ণ একসংগে থাকে-থাকে রাখিতে হয়। কাঁচা পাথুরে কয়লা বা কোক কয়লা এবং তাহার উপর চূণ ও আকর,—এইরূপে পাঁজার মত থাকে-থাকে সাজাইয়া ভাঁটির উচ্চতার তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এক্ষণে কাষ্ঠে অগ্নি দিয়া বাতাস দিলেই ভাঁটি ধরিয়া উঠে। ভাঁটির ভিতর কয়লা ও আকর যত পুড়িতে থাকে, ক্রমাগত সেই পরিমাণে আরও কয়লা এবং আরও আকর ঢালিয়া দিতে হয়। এই প্রণালীতে সাজাইলে নীচে কাঠ ও কয়লা এবং তাহার উপর ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে আকর ও কয়লা থাকে। নীচের কাঠ ও কয়লা ধরিয়া উঠিলে তাহাতে উত্তাপ হয়। সেই উত্তাপ গিয়া আকরে লাগে। তাহাতে আকরের অক্সিজেন পৃথক হইয়া পড়ে। নীচে কাঠ ও কয়লা পুড়িয়া যে, কেবল উত্তাপ বাহির হয়, তাহা নহে। সেই কাঠ ও কয়লার কার্ব্বণ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয় ; মিশ্রিত হইলে কার্ব্বণিক অম্লবাষ্পের উৎপত্তি হয়। জাঁতার বায়ুর প্রবল বলে এই কার্ব্বণিক অম্লবাষ্প উপরে উঠিতে থাকে। কার্ব্বণিক অম্লকে উপরে তাড়িত করিবে বলিয়াই লোকে জাঁতা ভাঁটির তলভাগে বসাইয়া থাকে। সে উদ্দেশ্য যদি না থাকিত তাহা হইলে ভাঁটির গায়ে আর কোথাও জাঁতা বসাইলে চলিতে পারিত। কার্ব্বণিক অম্ল উপরে উঠিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে আকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অক্সিজেন অবস্থান করিতেছে। কার্ব্বণিক অম্ল,—কার্ব্বণ ও অক্সিজেন, এই দুই বস্তুর মিলনে হয় বটে, কিন্তু অক্সিজেনের ক্ষুধা এখনও ইহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় নাই। উত্তাপের সহিত অক্সিজেন পাইলে, কার্ব্বণিক অম্ল আরও ইহা গ্রহণ করিতে পারে। ভাঁটির উপরিভাগে আকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেখানে অক্সিজেন অবস্থান করিতেছে, সেইখানে আসিয়া ইহা অক্সিজেনকে দেখিতে পায়। তাহা গ্রহণ করিয়া লয়। এইরূপে অর্দ্ধ-দ্রবীভূত লৌহ অক্সিজেন-শূন্য হইয়া পড়ে। যদি আকরে কেবল অক্সিজেন ও লৌহ থাকে, তাহা হইলে এইখানেই কাজ বন্ধ করিয়া দিলে চলিতে পারে। কারণ, অক্সিজেন গিয়াছে, এক্ষণে কেবল লৌহ রহিয়াছে। আমাদের লৌহের আবশ্যক, আমরা অনায়াসে সেই লৌহ বাহির করিয়া লইতে পারি। কিন্তু যেখানে আকর ভাল নয়, সেখানে তাহাতে অক্সিজেন ছাড়া অপরাপর দ্রব্য থাকে ; সেই অপরাপর দ্রব্য এখনও বাহির হইয়া যায় নাই। এখন তাহাদিগকে বাহির করিতে হইবে। তাই আকরকে আরও নীচে আসিতে দিতে হইবে ; আরও তাপ দিয়া ইহাকে একবারে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। গলিয়া যাইলে, ইহা চূণের সহিত মিশিয়া যায়। সেই চূণ, সিলিকা প্রভৃতি পদার্থকে গ্রহণ করিয়া একপ্রকার তরল ঝামার ন্যায় পদার্থে পরিণত হয়। তাহাই লৌহমল। লৌহ অপেক্ষা ইহা লঘু, সুতরাং উপরে ভাসিতে থাকে। লৌহ গুরু, ইহা ভাঁটির তলভাগে গিয়া জমা হয়। যেখানে তরল লৌহ-মল ভাসিতেছে, সেইখানে ভাঁটির গায়ে ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র খুলিয়া দিলেই লৌহমল বাহির হইয়া যায়। ভাঁটির তলভাগে যেখানে তরল লৌহ জমিয়াছে, সেখানেও ছিদ্র আছে। যে সময়ে আকর ভাঁটির উপরিভাগে পুড়িয়া লৌহ প্রস্তুত হইতে থাকে, সে সময়ে এই ছিদ্র ছিপি দ্বারা বন্ধ থাকে।

ভাঁটির তলভাগে যখন প্রচুর পরিমাণে তরল লোহ জমিয়া যায়, তখন ছিপি খুলিয়া দিলে দ্রবীভূত ধাতু বাহিরে গড়াইয়া আসে। ছিদ্রের মুখের নিকট ছাঁচ আছে; সেই ছাঁচে দ্রবীভূত লোহ গড়াইয়া পড়ে। ছাঁচ আর কিছুই নহে, কেবল বালুকারাশির উপর একটী বড় লম্বা নালা ও তাহার উপর আড়া-আড়ি আর তিন-চারিটি নালা। বড় লম্বা নালাটীকে "সো" অর্থাৎ "শূকরী" বলে, আড়া-আড়ি ছোট নালাগুলিকে "পিগ" বা "শূকর-শাবক" বলে। ভাঁটির ভিতর হইতে ছিদ্র দিয়া দ্রবীভূত লোহ আসিয়া এই নালাগুলিকে পরিপূর্ণ করে; তাহার পর ক্রমে জমিয়া কঠিন হয়। নালার নাম "পিগ" বা "শূকর-শাবক" বলিয়া এই লোহকে পিগ-আইরণ বা ঢালা-লোহ বলে। যদিও এই ঢালা-লোহ হইতে সিলিকা প্রভৃতি নানা অসার দ্রব্য, চূণের সহিত মিলিয়া অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়, তথাপি এখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ লোহ নহে। ইহাতে এখনও অনেক অসার দ্রব্য রহিয়া যায়, সেইজন্য এই ঢালা লোহ ভঙ্গপ্রবণ। সচরাচর পিগ অর্থাৎ ঢালা লোহতে একশত ভাগে এই পরিমাণে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকে;—লোহের সহিত জড়িত হইয়া কয়লারূপে কার্বণ ০.৯১৬, কৃষ্ণসীসরূপে কার্বণ ১.৯১৮, সিলিকন ১.৮১০, ফস্ফরস ০.৩৩২, গন্ধক ০.২৫৩, ম্যাঙ্গেনিস ১.২৮০, টাইটানিয়ম ০.০৭৩, বাকি লোহ ৯৩.৪১৮। নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্যের নাম করিয়া পাঠকদিগের বিরক্তিভাজন হইতেছি, তাহা জানি। কিন্তু আমি সাধ করিয়া তাহা করিতেছি না; বরং যতদূর পারিয়াছি, ততদূর ইহাদিগের নাম উল্লেখ করি নাই। যে কয়টী বস্তুর নাম করিয়াছি, যেখানে করিয়াছি, উপায় নাই বলিয়াই করিয়াছি। এই প্রবন্ধটী "পড়া" বলিয়া পড়িলেই ভাল হয়। জগতে যে কত কি শিখিবার আছে, তাহার কথা আর বলিব কি! যে কিছুই জানে না, তাহার এ জ্ঞানও নাই যে, পৃথিবীতে কত কি শিখিবার আছে। তাহার পক্ষে সকলই অন্ধকার। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, এ জীবনে আমরা যা কিছু জ্ঞান-উপার্জন করি, মরিলে তাহা ভুলিব না। জ্ঞান ও ধর্ম্ম পরজীবনে আমাদিগের সঙ্গে যাইবে। সেইজন্য বৃদ্ধ হইয়াও কেহ যেন জ্ঞান-উপার্জনে পরাঙ্মুখ না হন। আমার বড় ইচ্ছা যে, এ দেশের প্রতিজন প্রতিদিন কিছু না কিছু নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে যত্ন করেন। আমরা যদি কখনও পুনরায় মানুষ বলিয়া পরিগণিত হই, তাহা হইলে জ্ঞান উপার্জন দ্বারাই হইব। জ্ঞান-উপার্জন পরিশ্রমসাধ্য; অক্সিজেন হাইড্রোজেনের নাম শ্রুতিকটু, তাহা বলিয়া আর কি করিতে পারি! আজকালের জ্ঞান আর মোটামুটি নাই, দিন দিন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে। রেল, তার প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাই, সে সকল এই সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয়। রূঢ়জ্ঞানের পরিচয় বাঁশের গরুরগাড়ি। লোহ-নিষ্করণ-কার্য্যে সেইরূপ। এই দেখ, পিগ-লোহতে উপরে যে অসার ভাগের পরিমাণ দিয়াছি, তাহা অতি যৎসামান্য, কিছুই নয় বলিলেও হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই যৎসামান্যতার কিঞ্চিন্মাত্র এদিক ওদিক হইলেই ঘোরতর বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। সমুদয় পরিশ্রম মাটী হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত ঐ কার্বণ, যাহা লোহতে থাকিয়া যায়। পিগ-লোহতে কার্বণের ভাগ দুই ভাবে থাকে, তাহা বলিয়াছি। প্রথম লোহের সহিত জড়িত হইয়া কয়লারূপ কার্বণ একশত ভাগে ০.৯১৬ ভাগ অর্থাৎ একশত সেরে একসেরেরও কম। তারপর কৃষ্ণসীসরূপে কার্বণ ১.৯১৮, একশত ভাগে দুই ভাগেরও কম। তবেই হইল,—পিগ লোহতে ২.৪৩৪ ভাগ কার্বণ থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি কার্বণ পদার্থটী আর কিছুই নয়, বিশুদ্ধ কাঠের কয়লাই কার্বণ। কিন্তু কার্বণ রূপান্তর হইয়া আরও দুই প্রকার আকার ধারণ করে। কয়লা ছাড়া কার্বণের একরূপ আকার বহুমূল্য হীরক, অপররূপ কৃষ্ণসীস। আমরা যে সীসা সচরাচর

দেখিতে পাই, কৃষ্ণসীস তাহা নহে। সীসা একটা স্বতন্ত্র ধাতু। কিন্তু কৃষ্ণসীস কার্বণ বই আর কিছুই নয়। কাঠের পেন্সিলের ভিতর সেই যে কাল পদার্থটী, যাহা দিয়া কাগজে লেখা যায়, ইহা তাহাই। সুতরাং রাসায়নিক কথায় বলিতে হইলে, কয়লাও যেই পদার্থ, কৃষ্ণসীসও সেই পদার্থ, আর হীরকও সেই পদার্থ,—তিনটী দ্রব্যই কার্বণ বই আর কিছুই নয়। কিন্তু এই কার্বণটীর কেবল রূপান্তর-প্রযুক্ত বিষম তারতম্য ঘটিয়া থাকে! একখণ্ড কয়লার আর কি মূল্য? কৃষ্ণসীসের মূল্যই বা কি? কিন্তু তত বড় একখানি হীরক সাত-রাজার ধন। তাই লৌহের সহিত কার্বণ একভাবে থাকিলে এক ফল হয়, অন্যভাবে থাকিলে, আবার অন্য ফল হয়। মনে কর, একখণ্ড লৌহতে কার্বণ শতকরা তিন ভাগ কয়লা-ভাবে আছে, আর একখণ্ড লৌহতে কার্বণ শতকরা তিনভাগ কৃষ্ণসীস-ভাবে আছে। দুই খণ্ড লৌহতেই কার্বণ সমান পরিমাণে আছে, কিন্তু তাহাদিগের রূপ বিভিন্ন। এই রূপবিভিন্নতার জন্য প্রথম লৌহখানি কৃষ্ণবর্ণ, দানাযুক্ত, ছিদ্রময়, কোমল হইবে। দ্বিতীয়খানি উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ ও কঠিন হইবে। প্রথম প্রকারের লৌহকে ব্যবসাদারেরা ধূসরবর্ণের পিগ বলেন, দ্বিতীয় প্রকারের লৌহকে শ্বেতবর্ণের পিগ বলেন। কার্বণের ন্যূনাধিকের কারণ শ্বেত ও ধূসর বর্ণের পিগ আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। ব্যবসাদারেরা সে সকলকে ১ নম্বর ২ নম্বর ৩ নম্বর প্রভৃতি নাম দিয়া শ্রেণীবদ্ধ করেন। এক তো কার্বণ পিগ লৌহতে অতি সামান্যভাবে থাকে; তাহাতে আবার সেই কার্বণের যদি একটু এদিক ওদিক হয়, তাহা হইলে লোহারও সেই সঙ্গে ঘোরতর রূপান্তর হইয়া পড়ে। সেইজন্য বলিয়াছি যে, এখনকার শিল্প কার্য্যসকল বড়ই সূক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছে; অণু পরমাণুর সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম হিসাব না রাখিতে পারিলে আর ভাল করিয়া কাজ করিতে পারা যায় না। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে পিগ লৌহ হইতে কার্বণ, সিলিকন ও ম্যাঙ্গেনিস অল্প আয়াসেই পৃথক করিয়া দিতে পারা যায়। আর, বার কয়েক লৌহকে উত্তপ্ত করিলেই এই সকল দ্রব্য পুড়িয়া যায়। কিন্তু সেই যে যৎসামান্য পরিমাণে গন্ধক ও ফস্ফরস পিগ লৌহতে থাকে, তাহাকে পৃথক করা বড়ই কঠিন কথা। পিগ লৌহের একশত ভাগে গন্ধক ও ফস্ফরস কিছু অধিক পরিমাণে থাকে না। পূর্বে বলিয়াছি পিগ লৌহের একশত ভাগে ০.২৫০ ভাগ গন্ধক থাকে অর্থাৎ এক সহস্র ভাগে কেবল আড়াই ভাগ, ফস্ফরস ০.৩৩২ অর্থাৎ এক সহস্র ভাগে তিন ভাগ। ঢালা লৌহ যে সমুদয় কাজে লাগে, বাড়ীর রেল ইত্যাদি, তাহাতে গন্ধক প্রভৃতি অনিষ্টকর বস্তু থাকিলে বিশেষ ক্ষতি নাই। কারণ রেল প্রভৃতির উপর বড় বল প্রয়োগ করিতে হয় না, সুতরাং সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় নাই। কিন্তু যে লৌহ কি ইস্পাতে হাতুড়ির ঘা মারিয়া কোন কাজ করিতে হইবে, তাহাতে গন্ধক কি ফস্ফরস থাকিলে বড়ই অনিষ্ট হইয়া থাকে। হাতুড়ির ঘা মারিলেই সে লৌহ ভাঙ্গিয়া যায়। পূর্বে লোহাকারেরা মনে করিতেন যে, গন্ধকই লোহার পরম শত্রু, কিন্তু এক্ষণে ফস্ফরসকে ইহাঁরা গন্ধকের চেয়ে ভয়ানক শত্রু বলিয়া গণনা করেন। অতি অল্প পরিমাণে এই দুই দ্রব্য থাকিলেই লৌহ ও ইস্পাত একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। যে ইস্পাতে দুই হাজার ভাগে এক ভাগ ফস্ফরস থাকে, তাহা দিয়া কোনরূপ ভাল যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারা যায় না। অতি সহজেই তাহার ধার ভাঙ্গিয়া যায়। যে ইস্পাতে এক হাজার ভাগে এক ভাগ ফস্ফরস থাকে, তাহাতে একেবারে কোন কাজই হয় না। লৌহ ও ইস্পাতে যদি ফস্ফরস থাকে, তাহা হইলে সে লৌহ ও ইস্পাত উত্তপ্ত অবস্থায় ভাঙ্গিয়া যায় না; শীতল অবস্থাতে ভাঙ্গিয়া যায়। গন্ধক থাকিলে ইহার ঠিক বিপরীত; সে লৌহ ও ইস্পাত শীতল অবস্থাতে ভাঙ্গে না, উত্তপ্ত করিলেই ভাঙ্গিয়া যায়।

ঢালা-লোহ হইতে অসার অংশ দূরীকরণ করিবার জন্য যত প্রকার উপায় উদ্ভাবন হইয়াছে, তাহার মধ্যে "পডলিং" অনেকস্থানেই প্রচলিত। ময়রারা যেরূপ সন্দেশের পাককে তাড়ু দিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া থাকে, দ্রবীভূত পিগ লোহকে সেইরূপ সঞ্চালন করার নামই পডলিং। এইরূপ নাড়িলে পিগ লোহতে যে সিলিকন প্রভৃতি দ্রব্য থাকে, তাহা গলিয়া যায়; লোহতে যে গন্ধক ও ফস্ফরস থাকে, তাহা দ্রবীভূত সিলিকনে ধরিয়া যায়; লোহ, দানা বাঁধিয়া পৃথক হইয়া পড়ে। পডলিং করিয়া যে লোহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই বিলাতী পেটা লোহ। এ দেশে নানা অনিষ্টকর বস্তু মিশ্রিত নিকৃষ্ট আকর লইয়া লোকে বড় লোহ প্রস্তুত করেনা, আর নানা অনিষ্টকর বস্তু মিশ্রিত পাথুরে কয়লা দিয়াও আকর পোড়ায় না। বিশুদ্ধ কার্বণ সম্বলিত কাঠের কয়লা দিয়াই এ কাজ করে। সুতরাং এদেশের লোহ, ভাঁটি হইতেই অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধভাবে বাহির হইয়া আসে। ইহাতে যাহা কিছু অসার ভাগ থাকে, তাহা উত্তপ্ত করিয়া পিটিলেই বাহির হইয়া যায়। কিন্তু বিলাতে বড় বড় কারখানা; বাছিয়া বাছিয়া অল্প স্বল্প আকর লইলে তাহার কাজ চলে না। কাঠের কয়লা দিয়া এরূপ কারখানা চালাইতে হইলে পৃথিবী বৃক্ষশূন্য হইয়া যাইবে। সেইজন্য সেখানে নিকৃষ্ট আকর ও নিকৃষ্ট পোড়াইবার দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। সেইজন্যই সেখানে ভাঁটি হইতে যে লোহ বাহির হইয়া আসে, তাহাতে বিশেষরূপ অনিষ্টকর দ্রব্যাদি মিশ্রিত থাকে। পরে পডলিং করিয়া তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। কাচ গলাইবার জন্য যেরূপ লোকে তন্দুর করে, পডলিং করিবার জন্য সেইরূপ একটী চতুষ্কোণ তন্দুর নির্মাণ করিতে হয়। এই তন্দুরের একধারে অগ্নি জ্বালাইবার স্থান, অপর ধারে পিগ লোহ থাকে। এই পিগলোহে কেবল অগ্নির উত্তাপ যাইয়া লাগে, অগ্নি ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ অগ্নি স্পর্শ করিলে ইহাতে পুনরায় কয়লা হইতে অনিষ্টকর পদার্থ যাইয়া মিশিবে। কেহ কেহ তন্দুরে পিগ-লোহের সহিত লবণ প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া দেন। অনুমান, যে তাহাতে গন্ধক ও ফস্ফরস শীঘ্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অগ্নির উত্তাপে যখন লোহ গলিতে আরম্ভ হয়, তখন তাহা হইতে ছোট ছোট বুদ্বুদ বাহির হইতে থাকে। এই বুদ্বুদ প্রথম প্রথম ভাসা-ভাসা উপর হইতে উঠে, আর উঠিয়াই ফাটিয়া যায়। ক্রমে ইহা অধিকতর ভিতর হইতে বাহির হয় এবং এই সময় দ্রবীভূত লোহ ফুটিতে থাকে। মাঝে মাঝে ইহা হইতে ঘোর নীলবর্ণের শিখা উত্থিত হয়। লোহতে যে কার্বণ থাকে, সেই কার্বণ পুড়িয়াই এই শিখার উৎপত্তি। বড় বড় লোহের তাড়ু দিয়া এই সময়ে গলিত লোহকে তন্দুরের ভিতর ঘন ঘন নাড়িতে হয়। এই ভয়ঙ্কর উত্তাপের নিকট দাঁড়াইয়া গলিত লোহকে ক্রমাগত সঞ্চালন করা বড়ই পরিশ্রমের কার্য্য; একজন মানুষ অল্পক্ষণ করিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই দুইজন লোকের আবশ্যক। একজন শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, আর একজন তাহার হাত হইতে তাড়ু লইয়া কাজ চালাইতে থাকে। তাড়ুর মুখ তন্দুরের উত্তাপে কোমল হইলে ইহা জলে ডুবাইয়া পুনরায় শীতল করিয়া লইতে হয়। এইরূপ নাড়িতে নাড়িতে তন্দুরের ভিতর দ্রবীভূত পদার্থরাশি ক্রমে গাঢ় হইয়া আসে। ইহার ভিতর এক্ষণে দুই প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, এক দানাদার, দ্বিতীয় তরল। দানাদার পদার্থগুলি বিশুদ্ধ লোহ, তরল পদার্থটী সিলিকন প্রভৃতি অসার দ্রব্যসমূহ। যতই কেন উত্তাপ হউক না, এরূপ বিশুদ্ধ লোহকে একবারে গলাইতে পারা যায় না। লোহের সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে তবে গলিয়া যায়। পিগলোহতে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত ছিল বলিয়া তাই গলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তন্দুরের অতিশয় উত্তাপে সেই সিলিকন প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ তরল হইয়া বিশুদ্ধ লোহভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; বিশুদ্ধ

লৌহদানার আকারে সেই তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। দানাগুলির গায়ে যে কিছু গন্ধক বা ফস্ফরস লাগিয়া থাকে, তাহা তাড়ুর সঞ্চালনে দ্রবীভূত সিলিকন দ্বারা ধৌত হইয়া যায়। নাড়িতে নাড়িতে ক্রমে লৌহ-দানাগুলি তরল পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া তাল বাঁধিতে থাকে। তখন পডলিংকারী তাড়ুকে তন্দুরের ভিতর একপাশে রাখিয়া লৌহদানাগুলির উপরে ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া তালটীকে বড় করে। তালটী বড় হইলে, আর অনেকগুলি তাল প্রস্তুত হইলে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনে। যেমন আর্দ্র বস্ত্রের ভিতর জল থাকে, তেমনি এই লৌহ তালের ভিতর দ্রবীভূত সিলিকন প্রভৃতি পদার্থ থাকে। সেইজন্য তালগুলিকে কলের হাতুড়ির নিম্নে রাখিয়া নিগড়াইয়া ফেলিতে হয়। তালগুলি কিন্তু এখনও ঘোর লোহিতবর্ণ, ঘোর উত্তাপযুক্ত। তাই লৌহ-নির্মিত গাড়ী করিয়া তালগুলিকে লোকে কলের হাতুড়ির নিকট লইয়া যায়। কলের হাতুড়ির নিম্নে রাখিয়া তদ্দ্বারা চাপ দেয়। যেরূপ কাজ, হাতুড়িগুলিও সেইরূপ। এক একটী হাতুড়ি শত শত হস্তীর বল ধারণ করে। জল অথবা বায়ুর বলে পরিচালিত হয়। ইহারা যদি আপনাদিগের সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করে, তাহা হইলে পর্বত চূর্ণ করিয়া দিতে পারে। আবার এদিকে এরূপ ধীর ও শান্ত স্বভাব যে অণ্ডের কেবল অগ্রভাগটী ভাঙিয়া দিতে বলিলে, তাহাই ভাঙিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে। এ সকলই মহাপরাক্রমশালী মনুষ্য-বুদ্ধির লীলা! লৌহ তালগুলি জমিয়া ক্রমে যতই কঠিন হইতে থাকে, ততই হাতুড়ির ঘন ঘন চাপে ইহা হইতে সিলিকন প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। যাহারা কাছে থাকে, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য লৌহনির্মিত বর্ম দ্বারা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হইয়া, তবে কাজ করে। এক্ষণে "পডলিং" কাজ সমাপ্ত হইল। ইহা দ্বারা ঢালা লৌহ পরিশুদ্ধ হইয়া পেটা-লৌহে পরিণত হইল। কলিকাতার বাজারে ব্যবসাদারেরা এই লৌহকে "রিফাইণ্ড" অর্থাৎ "পরিশুদ্ধ" নাম দিয়াছেন। সুইডেন দেশের চুম্বক-আকর হইতে কাঠের কয়লা দ্বারা প্রস্তুত উৎকৃষ্ট সুইডিস-লৌহ এখন আর অধিক পরিমাণে এদেশে আমদানি হয় না। রিফাইণ্ড লৌহ দ্বারাই সকল প্রকার ভাল কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার চেয়ে নিকৃষ্ট পেটা-লৌহকে কলিকাতার ব্যবসাদারেরা "ইংলিশ" নাম দিয়াছেন।

পডলিঙের পর পেটা-লৌহ যে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইল তাহা বলিতে পারা যায় না। এখনও ইহাতে কার্বণ প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্য অতি সামান্যভাবে মিশ্রিত থাকে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। এই লৌহে সকল প্রকার কাজই হইতে পারে। কেবল, যে সকল লৌহনির্মিত বস্তুকে দারুণ বল সহ্য করিতে হয়, সেই সকল বস্তু নির্মাণ করিতে হইলে এই লৌহকে আরও একটু পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বারবার উত্তপ্ত করিলে, ইহার সেই যৎসামান্য কার্বণ-ভাগটুকু পুড়িয়া যায়। আর পিটিলে উহাতে যাহা কিছু সিলিকন প্রভৃতি অসার দ্রব্য থাকে, তাহা বাহির হইয়া পড়ে। পেটা-লৌহ হাপরে একেবারে দ্রবীভূত হয় না, গঠন গড়িবার জন্য দ্রবীভূত হইবার আবশ্যকও নাই। কারণ, লৌহের এই আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, দুই খণ্ড উত্তপ্ত লৌহ একত্রে পিটিলেই দুইটীতে মিশিয়া একখণ্ড হইয়া যায়। এইরূপে বড় বড় লৌহনির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু যত বড় ইচ্ছা তত বড় লৌহনির্মিত দ্রব্য, যত ইচ্ছা তত স্থূল করিতে পারা যায় না। অতিশয় বড় ও অতিশয় স্থূল একখণ্ড লৌহ করিতে হইলে অনেকগুলি ছোট ছোট লৌহখণ্ড জুড়িয়া করিতে হইবে। অনেকগুলি লৌহ জুড়িতে হইলে, সেই লৌহগুলিকে বার বার পোড়াইতে ও পিটিতে হইবে। বারবার পোড়াইতে হইলে, এই বড় ভয় যে বায়ুর অক্সিজেন যাইয়া পাছে ইহার সহিত মিশ্রিত হয়। যে অক্সিজেনকে

ভাঁটি করিয়া কয়লা পোড়াইয়া আকর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে তাই ভয়, আবার পাছে সেই অক্সিজেন গিয়া লোহতে প্রবেশ করে। তাহা হইলে যে, আকর ছিল, পদার্থটী পুনরায় লোহ ও অক্সিজেন সম্বলিত সেই আকর হইয়া দাড়াইবে। পেটা-লোহকে প্রথম কয়েকবার পোড়াইলে সে ঘটনা হয় না; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে, পেটা লোহ অনেক পরিমাণে পরিশুদ্ধ হইলেও ইহাতে এখনও কার্বণ ও সিলিকন যৎসামান্যভাবে মিশ্রিত থাকে। অক্সিজেন এই সমস্ত বস্তুকে লোহ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। প্রথম বার-কত পোড়াইবার সময় বায়ুর অক্সিজেন তাহাদিগকে সম্মুখে পাইয়া, তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হয়, লোহকে স্পর্শ করে না। কিন্তু পোড়াইতে পোড়াইতে এই সকল দ্রব্য ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসে, তখন কাজেই আর কাহাকেও না পাইয়া অক্সিজেন যাইয়া লোহকে আক্রমণ করে; সেই জন্য যতবার মনে করি, ততবার পেটা-লোহকে পোড়াইতে পারি না। বার-বার পোড়াইতে না পারিলেও এদিকে অনেকগুলি লোহকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারি না; সেই জন্য যতবড় ইচ্ছা তত বড়, যত ইচ্ছা তত স্থূল একখণ্ড পেটা লোহ নির্মিত হইতে পারে না। এইজন্যই সাহেবেরা দিল্লীর লৌহস্তম্ভ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। অল্পদিন পূর্বে ইহাঁরা এতবড় লৌহখণ্ড নির্মাণ করিতে পারিতেন না. এখন বোধহয় করিতে পারেন। ইংরাজদিগের যুদ্ধের জাহাজ সকল স্থূল লৌহপত্র দ্বারা আবৃত, যে, শত্রুপক্ষীয়ের গোলাগুলি তাহাকে ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অল্পদিন গত হইল সকলেই মনে করিতেন যে, সিকি হাত স্থূল ইহার চেয়ে অধিক পুরু লৌহ পাত প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। কিন্তু বিলাতে শত সহস্র লোক আছেন, যাঁহারা সর্বদাই এই চিন্তা করেন যে, প্রচলিত দ্রব্যাদি বা প্রচলিত নিয়মাদি অপেক্ষা আরও কিসে ভাল হইতে পারে। পূর্বে বিলাতে নানারূপ কুসংস্কার ছিল, নূতন বস্তুর উপর বিলক্ষণ রাগ ছিল। অন্য কোন বিশেষ কুসংস্কার থাকুক বা না থাকুক এ সম্বন্ধে এখন আর একেবারেই নাই। নূতন বস্তুর আবিষ্কার জন্য যাহারা চিন্তা ও পরিশ্রম করেন তাঁহাদিগকে এখন আর কেহ পরিহাস করে না। এখন কোন একটী নূতন বস্তু আবিষ্কৃত হইলে আদরের সহিত তাহা সকলেই গ্রহণ করেন। গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের ধর্মলোপ হয় না। জন ব্রাউন নামক একটী লোক মনে করিলেন, সে কি কথা? সিকি হাতের চেয়ে স্থূল লৌহ-পত্র কেন হইবে না? আমি তাহা করিব। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন—রণতরি আচ্ছাদনের নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে অর্ধহস্ত স্থূল লৌহপত্র প্রস্তুত করিয়া দিব, আপনারা আমাকে সেই ভার দিন। এরূপ কার্য্য করা অসম্ভব বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না; ভাবিলেন, এ লোকটা বাতুল। জন ব্রাউন পুনরায় আবেদন করিলেন যে, আমি নিশ্চয় আপনাদিগের এইরূপ লৌহ-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিব, অগ্রে আমাকে দাম দিতে হইবে না। আমি এইরূপ লৌহ-পত্র প্রস্তুত করি, তাহার উপর আপনারা গোলা মারিয়া দেখুন, যদি তাহাকে ভেদ করিয়া গোলা যায়, তাহা হইলে আমাকে দাম দিবেন না; যদি না যায়, তাহা হইলে আমাকে দাম দিবেন। গবর্ণমেণ্ট এ কথায় স্বীকৃত হইলেন। সেইরূপ লৌহ-পত্র প্রস্তুত হইল, জন ব্রাউন তাহার মূল্য পাইলেন, তিনি ধনবান হইলেন, সাধারণের নিকট পূজ্য হইলেন, শ্রীশ্রীমহারাণী তাঁহাকে নানা উপাধি দ্বারা ভূষিত করিলেন। এক্ষণে দেড় হস্ত স্থূল, বড়-বড় লৌহ-পত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এরূপ কার্য্য প্রশস্ত ঘরের ভিতর সম্পন্ন হয়, সেই ঘরের চারিদিক একবারেই বন্ধ, তাহার ভিতর অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে না।

লোহের বিষয় সম্পূর্ণরূপে লিখিতে হইলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায়। দুই চারি কথায় সারিব মনে করিয়াও প্রবন্ধটী এত বড় হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক, এক কথা লইয়া পাঠকবর্গকে আর জ্বালাতন করিব না। লৌহের কথা এইখানে শেষ করিলাম। তবে এই কথাটী মনে করিয়া দিই যে, বিনা বিজ্ঞানের সহায়তায় বড় বড় লৌহের কারখানা একবারেই চলিতে পারে না। প্রথমে আকরকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহাতে কি কি পদার্থ আছে, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। কারখানা চলিবার মত সেই আকর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। সে আকরে অন্য আকর মিশাইতে হইবে কিনা, বিজ্ঞানের সহায়তায় তাহা স্থির করা আবশ্যক। মিশাইবার আকর আবার সুলভ কি না, তাহা জানিতে হইবে। আকরের সহিত কিরূপ চূণের আবশ্যক, সে চূণ কাছে আছে কি না, পোড়াইবার দ্রব্য কি আছে, সে কয়লা কিরূপ, এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও মীমাংসা করিয়া লইলে তবে কাজ চলিতে পারিবে। তাহার পর ভাঁটি নির্মাণ করিয়া কল-কবজা বসাইয়া কাজ আরম্ভ করিলেও পদে পদে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক। দশ লক্ষ টাকার কম মূলধন লইয়া কাহাকেও আমি লোহার কাজ করিতে পরামর্শ দিই না। বিলাতি মতে কারখানা খুলিলে যদি ধর্ম লোপ না হয় তো যাহাদিগের কোম্পানির কাগজ আছে, তাঁহারা যদি তাহা বেচিয়া এই কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে অনায়াসেই লাভ হইতে পারে। এ দেশের অনেক গরিব দুঃখী লোকও প্রতিপালিত হয়। টাকা না খরচ করিলে টাকা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইস্পাত

পেটা-লৌহ যতই কেন বিশুদ্ধ হউক না, তবুও তাহাতে একটুখানি কার্বণ রহিয়া যায়। সে কার্বণটুকু সহজে দূরীভূত হয় না। তাহাকে দূর করিবার আবশ্যকও নাই, বরং রাখাই ভাল। কারণ, কোনও বস্তু গড়িবার জন্য লৌহকে পোড়াইতে হইলে, বায়ুর অক্সিজেন যাইয়া সম্মুখে কার্বণকে দেখিতে পায়, তাহারই সহিত মিশ্রিত হয়, লৌহকে বড় আক্রমণ করে না। লৌহকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিলে লৌহ পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই, একশত সেরে সিকি সের পর্য্যন্ত কার্বণ থাকিলেও সে লৌহ পেটা-লৌহ, পেটা-লৌহের যে সকল গুণ আবশ্যক, সে সব গুণ তাহাতে থাকে। পেটা-লৌহ কোমল, হাপরে দ্রবীভূত হয় না, ঘা মারিলে ভাঙ্গিয়া যায় না, কিন্তু অতিশয় বল প্রয়োগ করিয়া টানিলে ছিঁড়িয়া যায়। সিকি সেরের চেয়ে যতই কার্বণের ভাগ অধিক হইল, ততই এই সকল গুণের পরিবর্তন হইবে, লৌহ ততই কঠিন হইবে, ততই হাপরে দ্রবীভূত হইবে, ততই ঘা মারিলে ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু টানিলে ছিঁড়িবে না। তখন আর আমরা এ লৌহকে পেটা-লৌহ বলিতে পারি না। তখন আমরা ইহাকে ইস্পাত বলি। একশত সের লৌহে কেবল আধ সের কার্বণ থাকিলে, সে ইস্পাত কোমল হয়, এক সের কার্বণ মিশাইয়া দিলে, তবে ছুরি কাঁচি নির্মাণের উপযোগী কঠিন ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার তাহার অধিক কার্বণ দিলে লৌহ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়ে। শতকরা দুই সেরের অধিক কার্বণ থাকিলে, লৌহ একেবারেই ইস্পাতের সীমা পার হইয়া অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ হয়, তাহাতে ঘা মারিয়া কোনও দ্রব্য গড়িতে পারা যায় না, ভাঙ্গিয়া যায়, আর হাপরের উত্তাপে সে লৌহ সহজে গলিয়া যায়; সুতরাং সে লৌহ পুনরায় আবার ঢালা-লৌহ হইয়া পড়ে। তবেই হইল, কার্বণ একেবারেই না থাকিলে কি শতকরা সিকি সের পর্য্যন্ত থাকিলে, সে লৌহকে পেটা-লৌহ

বলে। কিন্তু সে অতিশয় কোমল; তাহাতে ধার করিয়া কোন বস্তু কাটিতে যাইলে, কাটে না, ধার নুইয়া যায়। তাই যথা প্রয়োজন কার্বণ মিশাইয়া কঠিন করিয়া লইতে হয়। কার্বণ-মিশ্রণে লৌহ কঠিন হইয়া ছুরি কাঁচি গড়িবার উপযুক্ত হইলে তাহাকে ইস্পাত বলে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে প্রকার উৎকৃষ্ট ইস্পাত হইত, এরূপ আর কুত্রাপি হইত না। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে বেরার ও মহীশূর ইস্পাতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে মহাজনেরা আসিয়া এখান হইতে ইস্পাত ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। ইস্পাহান ও দামাস্কস নগরের জগৎবিখ্যাত অস্ত্র-শস্ত্র ঐ ইস্পাত হইতে প্রস্তুত হইত। এই ইস্পাত-প্রস্তুতের প্রকরণ এইরূপ। আধসের লৌহ ধরে, এরূপ অনেকগুলি কাদার মুচি কর্মকারেরা প্রথম গড়িয়া লয়। লৌহকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কাঠের কুচির সঙ্গে এই মুচির ভিতর রাখে ও অল্পপাতা দিয়া ঢাকিয়া দেয়। তার পর কাদা দিয়া মুচির মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, যেন বায়ু তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে। কাদা শুকাইলে ২০ কি ২৫টী মুচি লইয়া কুম্ভকারের পোয়ানের মত পোয়ানের ভিতর সাজাইয়া দিতে হয় ও সেই মুচিগুলিকে প্রচুর পরিমাণে কাঠের কয়লা দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হয়। এখন পোয়ানে আগুন দিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া জাঁতার বাতাস দিলেই মুচির ভিতর লৌহ গলিয়া ইস্পাতে পরিণত হয়। অর্থাৎ লৌহ-খণ্ডের সহিত মুচির ভিতর যে কাঠের কুচি থাকে, অগ্নির উত্তাপে সেই কাঠ হইতে কার্বণ যাইয়া লৌহে মিশ্রিত হইয়া লৌহকে ইস্পাতে পরিণত করে। এইরূপে ইস্পাত প্রস্তুত করা অতি সহজ কার্য্য বটে, কিন্তু ইহাতে একেবারে অধিক ইস্পাত প্রস্তুত হয় না। কুড়িটী মুচি পোয়ানে পোড়াইলে হয় ত কেবল চারিটী মুচিতে ভাল ইস্পাত হয়, বাকি ১৬ টার ইস্পাত ন্যূনাধিক নিকৃষ্ট। কোনটীতে হয়ত কার্বণ অধিক হইয়া ইস্পাতের চেয়ে কঠিন হইয়া পড়ে; কোনওটীতে হয়ত কার্বণ কম হইয়া সম্পূর্ণ ইস্পাত হয় না; কোনটীতে হয়ত লৌহের কেবল অর্ধেকভাগ উত্তপ্ত সেই ভাগটুকুই কার্বণ লইয়া ইস্পাত হয়, বাকি লৌহ রহিয়া যায়। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ইস্পাত লইয়া সেকালের খরচ চলিতে পারিত। এখন লোহা ও ইস্পাতের ব্যয় অধিক, পাঁচটী মুচির মধ্যে চারিটী মুচি ফেলিয়া দিতে হইলে এখন আর কাজ চলে না। একেবারে অধিক পরিমাণে ইস্পাত করিতে না পারিলে আর খরচ পোষায় না। তাই, এ দেশে লৌহ নিষ্করণকার্য্য যেরূপ একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, ইস্পাত-প্রস্তুত-কার্য্যও সেইরূপ। মহীশূর হইতে একবার বিলাতে এই ইস্পাতের আমদানি হইয়াছিল, কিন্তু সকল মুচির ইস্পাত সমান নয় বলিয়া ইহার শীঘ্রই দুর্নাম হইয়া পড়িল। সেখানকার লোকে এই ইস্পাতখণ্ডগুলিকে একত্র গলাইয়া সমান ভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। সেকালে মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে কিছু কিছু ইস্পাত বিলাতে যাইত। তেলুগু ভাষায় ইস্পাতকে উট্‌জ বলে। ভারতবর্ষের ইস্পাতকে তাই বিলাতের লোকেরা উট্‌জ বলিয়া জানিতেন।

বিলাতে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ। এখানকার লোকে কাচ গলাইবার তন্দুরের ন্যায় তন্দুর নির্মাণ করেন। তন্দুরের তলভাগে অগ্নি জ্বালাইবার জন্য স্থান থাকে, তাহাতেই তন্দুরের উপরিভাগ উত্তপ্ত হয়। এক একটী তন্দুর প্রায় দশ হাত দীর্ঘ, আর ইহাতে প্রায় তিনশত মণ লৌহ ধরে। প্রথম এক অঙ্গুলি স্থূল করিয়া কাঠের কয়লা চূর্ণ তন্দুরের মেজেতে বিছাইয়া দিতে হয়। এই কয়লার উপর লৌহশলাকাগুলি সাজাইয়া দিতে হয়। অল্পদিন পূর্বে ইস্পাত করিতে কেবল উৎকৃষ্ট সুইডিশ লৌহ ব্যবহার হইত। এক্ষণে কিন্তু ভাল বিলাতী

যাহা হউক, এক কথা লইয়া পাঠকবর্গকে আর জ্বালাতন করিব না। লৌহের কথা এইখানে শেষ করিলাম। তবে এই কথাটী মনে করিয়া দিই যে, বিনা বিজ্ঞানের সহায়তায় বড় বড় লৌহের কারখানা একবারেই চলিতে পারে না। প্রথমে আকরকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহাতে কি কি পদার্থ আছে, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। কারখানা চলিবার মত সেই আকর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। সে আকরে অন্য আকর মিশাইতে হইবে কিনা, বিজ্ঞানের সহায়তায় তাহা স্থির করা আবশ্যক। মিশাইবার আকর আবার সুলভ কি না, তাহা জানিতে হইবে। আকরের সহিত কিরূপ চূণের আবশ্যক, সে চূণ কাছে আছে কি না, পোড়াইবার দ্রব্য কি আছে, সে কয়লা কিরূপ, এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও মীমাংসা করিয়া লইলে তবে কাজ চলিতে পারিবে। তাহার পর ভাঁটি নির্মাণ করিয়া কল-কব্জা বসাইয়া কাজ আরম্ভ করিলেও পদে পদে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক। দশ লক্ষ টাকার কম মূলধন লইয়া কাহাকেও আমি লোহার কাজ করিতে পরামর্শ দিই না। বিলাতি মতে কারখানা খুলিলে যদি ধর্ম লোপ না হয় তো যাহাদিগের কোম্পানির কাগজ আছে, তাঁহারা যদি তাহা বেচিয়া এই কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে অনায়াসেই লাভ হইতে পারে। এ দেশের অনেক গরিব দুঃখী লোকও প্রতিপালিত হয়। টাকা না খরচ করিলে টাকা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইস্পাত

পেটা-লোহ যতই কেন বিশুদ্ধ হউক না, তবুও তাহাতে একটুখানি কার্বণ রহিয়া যায়। সে কার্বণটুকু সহজে দূরীভূত হয় না। তাহাকে দূর করিবার আবশ্যকও নাই, বরং রাখাই ভাল। কারণ, কোনও বস্তু গড়িবার জন্য লৌহকে পোড়াইতে হইলে, বায়ুর অক্সিজেন যাইয়া সম্মুখে কার্বণকে দেখিতে পায়, তাহারই সহিত মিশ্রিত হয়, লৌহকে বড় আক্রমণ করে না। লৌহকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিলে লোহ পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই, একশত সেরে সিকি সের পর্য্যন্ত কার্বণ থাকিলেও সে লোহ পেটা-লোহ, পেটা-লোহের যে সকল গুণ আবশ্যক, সে সব গুণ তাহাতে থাকে। পেটা-লোহ কোমল, হাপরে দ্রবীভূত হয় না, ঘা মারিলে ভাঙ্গিয়া যায় না, কিন্তু অতিশয় বল প্রয়োগ করিয়া টানিলে ছিঁড়িয়া যায়। সিকি সেরের চেয়ে যতই কার্বণের ভাগ অধিক হইল, ততই এই সকল গুণের পরিবর্তন হইবে, লোহ ততই কঠিন হইবে, ততই হাপরে দ্রবীভূত হইবে, ততই ঘা মারিলে ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু টানিলে ছিঁড়িবে না। তখন আর আমরা এ লোহকে পেটা-লোহ বলিতে পারি না। তখন আমরা ইহাকে ইস্পাত বলি। একশত সের লোহে কেবল আধ সের কার্বণ থাকিলে, সে ইস্পাত কোমল হয়, এক সের কার্বণ মিশাইয়া দিলে, তবে ছুরি কাঁচি নির্মাণের উপযোগী কঠিন ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার তাহার অধিক কার্বণ দিলে লোহ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়ে। শতকরা দুই সেরের অধিক কার্বণ থাকিলে, লোহ একেবারেই ইস্পাতের সীমা পার হইয়া অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ হয়, তাহাতে ঘা মারিয়া কোনও দ্রব্য গড়িতে পারা যায় না, ভাঙ্গিয়া যায়, আর হাপরের উত্তাপে সে লোহ সহজে গলিয়া যায়; সুতরাং সে লোহ পুনরায় আবার ঢালা-লোহ হইয়া পড়ে। তবেই হইল, কার্বণ একেবারেই না থাকিলে কি শতকরা সিকি সের পর্য্যন্ত থাকিলে, সে লোহকে পেটা-লোহ

বলে। কিন্তু সে অতিশয় কোমল; তাহাতে ধার করিয়া কোন বস্তু কাটিতে যাইলে, কাটে না, ধার নুইয়া যায়। তাই যথা প্রয়োজন কার্বণ মিশাইয়া কঠিন করিয়া লইতে হয়। কার্বণ-মিশ্রণে লোহ কঠিন হইয়া ছুরি কাঁচি গাড়িবার উপযুক্ত হইলে তাহাকে ইস্পাত বলে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে প্রকার উৎকৃষ্ট ইস্পাত হইত, এরূপ আর কুত্রাপি হইত না। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে বেরার ও মহীশূর ইস্পাতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে মহাজনেরা আসিয়া এখান হইতে ইস্পাত ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। ইস্পাহান ও দামাস্কস নগরের জগৎবিখ্যাত অস্ত্র-শস্ত্র ঐ ইস্পাত হইতে প্রস্তুত হইত। এই ইস্পাত-প্রস্তুতের প্রকরণ এইরূপ। আধসের লোহ ধরে, এরূপ অনেকগুলি কাদার মুচি কর্মকারেরা প্রথম গড়িয়া লয়। লোহকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কাঠের কুচির সংগে এই মুচির ভিতর রাখে ও অল্পদ্পাতা দিয়া ঢাকিয়া দেয়। তার পর কাদা দিয়া মুচির মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, যেন বায়ু তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে। কাদা শুকাইলে ২০ কি ২৫টী মুচি লইয়া কুম্ভকারের পোয়ানের মত পোয়ানের ভিতর সাজাইয়া দিতে হয় ও সেই মুচিগুলিকে প্রচুর পরিমাণে কাঠের কয়লা দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হয়। এখন পোয়ানে আগুন দিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া জাঁতার বাতাস দিলেই মুচির ভিতর লোহ গলিয়া ইস্পাতে পরিণত হয়। অর্থাৎ লোহ-খণ্ডের সহিত মুচির ভিতর যে কাঠের কুচি থাকে, অগ্নির উত্তাপে সেই কাঠ হইতে কার্বণ যাইয়া লোহে মিশ্রিত হইয়া লোহকে ইস্পাতে পরিণত করে। এইরূপে ইস্পাত প্রস্তুত করা অতি সহজ কার্য্য বটে, কিন্তু ইহাতে একেবারে অধিক ইস্পাত প্রস্তুত হয় না। কুড়িটী মুচি পোয়ানে পোড়াইলে হয় ত কেবল চারিটী মুচিতে ভাল ইস্পাত হয়, বাকি ১৬ টার ইস্পাত ন্যূনাধিক নিকৃষ্ট। কোনটীতে হয়ত কার্বণ অধিক হইয়া ইস্পাতের চেয়ে কঠিন হইয়া পড়ে; কোনওটীতে হয়ত কার্বণ কম হইয়া সম্পূর্ণ ইস্পাত হয় না; কোনটীতে হয়ত লোহের কেবল অর্ধেকভাগ উত্তপ্ত সেই ভাগটুকুই কার্বণ লইয়া ইস্পাত হয়, বাকি লোহ রহিয়া যায়। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ইস্পাত লইয়া সেকালের খরচ চলিতে পারিত। এখন লোহা ও ইস্পাতের ব্যয় অধিক, পাঁচটী মুচির মধ্যে চারিটী মুচি ফেলিয়া দিতে হইলে এখন আর কাজ চলে না। একেবারে অধিক পরিমাণে ইস্পাত করিতে না পারিলে আর খরচ পোষায় না। তাই, এ দেশে লোহ নিষ্করণকার্য্য যেরূপ একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, ইস্পাত-প্রস্তুত-কার্য্যও সেইরূপ। মহীশূর হইতে একবার বিলাতে এই ইস্পাতের আমদানি হইয়াছিল, কিন্তু সকল মুচির ইস্পাত সমান নয় বলিয়া ইহার শীঘ্রই দুর্নাম হইয়া পড়িল। সেখানকার লোকে এই ইস্পাতখণ্ডগুলিকে একত্র গলাইয়া সমান ভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। সেকালে মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে কিছু কিছু ইস্পাত বিলাতে যাইত। তেলুগু ভাষায় ইস্পাতকে উট্‌জ বলে। ভারতবর্ষের ইস্পাতকে তাই বিলাতের লোকেরা উট্‌জ বলিয়া জানিতেন।

বিলাতে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ। এখানকার লোকে কাচ গলাইবার তন্দুরের ন্যায় তন্দুর নির্মাণ করেন। তন্দুরের তলভাগে অগ্নি জ্বালাইবার জন্য স্থান থাকে, তাহাতেই তন্দুরের উপরিভাগ উত্তপ্ত হয়। এক একটী তন্দুর প্রায় দশ হাত দীর্ঘ, আর ইহাতে প্রায় তিনশত মণ লোহ ধরে। প্রথম এক অঙ্গুলি স্থূল করিয়া কাঠের কয়লা চূর্ণ তন্দুরের মেজেতে বিছাইয়া দিতে হয়। এই কয়লার উপর লৌহশলাকাগুলি সাজাইয়া দিতে হয়। অল্পদিন পূর্বে ইস্পাত করিতে কেবল উৎকৃষ্ট সুইডিশ লোহ ব্যবহার হইত। এক্ষণে কিন্তু ভাল বিলাতী

লৌহও ব্যবহার হইয়া থাকে। লৌহকে প্রথম শলাকা-আকারে পরিণত করিয়া তার-পর তন্দুরে রাখিতে হয়। শলাকাগুলি তিন চারি অঙ্গুলি চওড়া, প্রায় এক অঙ্গুলি পুরু। এক থাক লৌহশলাকা সাজান হইলে, তাহার উপর আবার কয়লা-চূর্ণ দিতে হয়। আবার তাহার উপর আর এক থাক লৌহ শলাকা সাজাইতে হয়। এইরূপে থাকে থাকে কয়লাচূর্ণ ও লৌহশলাকা সাজাইয়া তন্দুরটী পরিপূর্ণ হইলে পর, বালুকা বা মৃত্তিকার সহিত পুরাতন ইস্পাতের গুঁড়া মিশাইয়া লৌহস্তূপকে ভাল করিয়া লেপিয়া দিতে হয়। সাজাইবার সময় গুটিকতক লৌহশলাকার গোড়া তন্দুরের একটু বাহিরে রাখিতে হয়, কেন না ইস্পাত প্রস্তুত হইবার সময় দুই একখানিকে বাহির করিয়া দেখিতে হইবে ভিতরে কাজ কি প্রকার চলিতেছে। এক্ষণে তন্দুরের তলভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সাত হইতে দশদিন পর্য্যন্ত লৌহ-শলাকাগুলিকে ঘোর উত্তপ্ত রক্তবর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। যদি নরম ইস্পাত করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে, সাতদিন, আর কঠিন ইস্পাত করিতে হইলে, দশদিন পর্য্যন্ত এইভাবে রাখা আবশ্যক। কারণ যত অধিক দিন এইরূপ উত্তপ্ত রাখিবে, কয়লা-চূর্ণ হইতে কার্বণ যাইয়া ততই অধিক লৌহের সহিত মিশ্রিত হইবে। দিন গত হইয়া যাইলে, ভিতরে ইস্পাত হইয়া থাকিবে এইরূপ বুঝিতে পারিলে, এক আধখানি লৌহ-শলাকা বাহির করিয়া দেখিতে হয়, ইস্পাত হইয়াছে কিনা। ইহার ভিতরে হয় তো কার্বণ যায় নাই, ভিতরে হয়তো লৌহ রহিয়া গিয়াছে, তাই লৌহশলাকাকে ভাঙ্গিয়া ভিতর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, যেন মা'জ না থাকিয়া যায়। ইস্পাত হইয়াছে পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইলে, তখন অগ্নির উত্তাপ ক্রমে হ্রাস করিয়া সাত আট দিনের মধ্যে একেবারে নিবাইয়া দিতে হয়; অগ্নি নির্বাণ হইলে, তন্দুর শীতল হইলে, ইস্পাতের শলাকাগুলিকে বাহির করিয়া লইতে হয়। এক্ষণে এই শলাকার উপর ফোস্কার মত লৌহ-কণা উত্থিত হইয়াছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহতে কতটুকু কার্বণ প্রবেশ করিয়াছে, বিচক্ষণ লোকে এই ফোস্কার আকার দেখিয়া বুঝিতে পারেন। শলাকার উপরিভাগে যত কার্বণ থাকে, ভিতরে কিন্তু ততটা কার্বণ প্রবেশ করিতে পারে না। তাই বহির্দেশ কঠিন, মধ্যদেশ অপেক্ষাকৃত কোমল রহিয়া যায়। সেজন্য এই ইস্পাতকে পুনরায় এক ভাবাপন্ন করা আবশ্যক। শলাকা-গুলিকে ছোট ছোট খণ্ডে কাটিয়া মুচিতে গলাইলেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। গলাইতে অতিশয় উত্তাপের প্রয়োজন, অনেক কয়লা পুড়িয়া যায়, আর ঘোরতর উত্তাপে মুচিগুলিও অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। এত মুচি ধ্বংস হইয়া যায় যে, শিফিল্ড নগরের লোকে এই পুরাতন মুচি দিয়া উদ্যানাদির প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। শিফিল্ড নগর হইতেই রজারের ছুরি কাঁচি এদেশে আমদানি হইয়া থাকে। গলাইতে অধিক খরচ পড়ে সত্য, কিন্তু গলাইয়া একভাবাপন্ন করিলেই ভাল ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদি শস্তা করিবার মন হয়, তো লৌহ শলাকাকে ছোট ছোট খণ্ডে কাটিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া একত্র পিটিয়া লইলেও কাজ চলিতে পারে।

ভাল ইস্পাত করিবার নিয়ম গেল এই। ইংলণ্ডের লোকে কিন্তু এইভাবে কাজ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ইহার চেয়ে সহজ উপায়ে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক লোকে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া, দীন দুঃখী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—একবার ভাঁটিতে গলাইয়া আকরকে পিগ লৌহে পরিণত করিতে হয়, তারপর সেই লৌহকে পডলিং দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হয়, তার পর আবার সেই লৌহতে কার্বণ মিশাইয়া ইস্পাত করিতে হয়। অর্থাৎ একবার পিগলৌহ হইতে কার্বণ দূরীভূত করিয়া দিই, আবার কার্বণ মিশাইয়া ইস্পাত করি। এ দ্বিগুণ

পরিশ্রম কেন? পডলিঙের সময় সমুদয় কার্বণটুকু বাহির করিয়া না দিয়া, ইস্পাত করিতে যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেই ত হয়? এইরূপ ভাবিয়া পিগলোহ হইতে তাঁহারা একেবারেই ইস্পাত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই, পিগলোহতে কেবল যে কার্বণ থাকে তাহা ত নয়, ইহাতে সিলিকন, গন্ধক, ফস্ফরস প্রভৃতি অপরাপর পদার্থ থাকে। ইস্পাত করিতে হইলে লোহ হইতে যে সমুদয় দ্রব্যগুলিকে দূর করা আবশ্যক, তাই পডলিঙের প্রয়োজন। তবে যেখানকার আকর ভাল, যেখানে বিশুদ্ধ কাঠের কয়লা দ্বারা লোহ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেখানে লোহে বড় অসার দ্রব্য থাকে না। সেইজন্য ইস্পাত করিবার নিমিত্ত সেখানে পডলিং করিতে হয় না। কিন্তু বিলাতের আকর মন্দ, সেখানে পাথুরে কয়লা ব্যবহার হয়, তাই সেখানকার পিগলোহে নানা অসার দ্রব্য থাকে। এই নিমিত্ত যাঁহারা পডলিং না করিয়া একেবারেই পিগলোহ হইতে ইস্পাত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের পরিশ্রম যে একেবারে বিফল হইয়াছে, তাহা নহে। ইহাঁদের মধ্যে বেসেমার সাহেব পিগলোহ হইতে একেবারে ইস্পাত করিবার যে প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা অল্প মূল্যের ইস্পাত অনায়াসে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেখানে ভাল ইস্পাতের মূল্য এক টাকা, সেখানে এই ইস্পাতের মূল্য চারি আনা। এ ইস্পাতের দ্বারা ছুরি কাঁচি প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাজ হয় না সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা কলের গাড়ির রেল প্রভৃতি মোটা কাজ হইতে পারে। লোহার রেলের চেয়ে সে রেল দশগুণ দৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বেসেমার প্রণালীতে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে উৎকৃষ্ট পিগলোহের আবশ্যক। ইহাতে কার্বণ অধিক থাকা চাই। যে ধূসরবর্ণের পিগলোহতে শতকরা তিন কি চারিভাগ কৃষ্ণসীসরূপে কার্বণ থাকে, তাহা বিশেষ উপযোগী। শতকরা ১॥ হইতে ৩ ভাগ সিলিকন থাকা ভাল, যৎসামান্য ম্যাঙ্গেনিস থাকিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু গন্ধক ও ফস্ফরস্ যতই কম হয়, ততই ভাল। যে পিগলোহে একশত সেরে ১॥৹ ছটাক ফস্ফরস্ কি তিন ছটাক গন্ধকের অধিক থাকে, তাহাতে বেসেমার প্রণালীতে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। সচরাচর বেসেমার প্রণালীতে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে যে পিগলোহ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ এই পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

কয়লারূপে কার্বণ	- ০·৪৭
কৃষ্ণসীসরূপে কার্বণ	- ২·৭২
সিলিকন	- ২·৮৪
ফস্ফরস্	- ০·০৮
গন্ধক	- ০·১৪
ম্যাঙ্গেনিস	- ০·৯০
অবশিষ্ট লোহ	- ৯২·৮৫
	১০০·০০

এই কার্য্যের নিমিত্ত পূর্বে সুইডিস পিগ অনেক ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে নিজ বিলাতে হিমাটাইট আকর হইতে যে উৎকৃষ্ট পিগলোহ নিষ্কৃত হইয়া থাকে, তাহাই অধিক ব্যবহার হয়। এমন কি বেসেমার প্রণালীর জন্য উৎকৃষ্ট পিগ প্রস্তুত করা এক্ষণে একটী নূতন ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কার্য্যের

সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। একজন একটী ভাল কাজ করিলে কত দিকে তাহার ফল ফলে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই পিগলোহকে বৃহৎ একটী হাপরে একেবারে দ্রবীভূত করিতে হয়, তাহার পর এই দ্রবীভূত ধাতুকে বড় একটী পাত্রে ঢালিয়া দিতে হয়। এই সামান্য পাত্রটীই বেসেমার সাহেবের বুদ্ধি কৌশলের পরিচয়। ইংলণ্ডে ব্যারো-ইন্-ফরনেস নামক স্থানে আমি বেসেমার প্রণালীতে ইস্পাত প্রস্তুত করা দেখিয়াছিলাম। সেই প্রকাণ্ড বেসেমার পাত্র যখন গলিত লৌহ গ্রহণ করিয়া সদর্পে মস্তক উত্তোলন করে, যখন তলভাগের ছিদ্র দিয়া প্রবল বায়ুস্রোত শতধারে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে, তখন যে কি ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা পাঠকবর্গকে কি করিয়া বুঝাই? বুঝাইবার যো নাই, দেখিলে তবে প্রত্যয় হয়। তখন পাত্রের মুখ হইতে ঘোরতর শব্দে অত্যুজ্জ্বল অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকে। মুহুর্মুহু সহস্র সহস্র অগ্নিকণা চারি দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেই অগ্নিকণা-সমূহ নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তেজঃপুঞ্জ শত-সূর্য্যরশ্মি যেন সেইস্থানে এককালে প্রাদুর্ভূত হয়। বায়ুর জাঁতা এক ভাবেই গর্জন করিতে থাকে, কিন্তু পাত্রমুখ-নির্গত অগ্নিরাশি ক্রমেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়। দশ মিনিটের মধ্যে এরূপ উজ্জ্বল হয় যে, তখন আর তাহার পানে চাহিতে পারা যায় না। চাহিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু এই স্থির-বিদ্যুৎ-সদৃশ ভীষণ সৌন্দর্য্যরাশি হইতে কাহার সাধ্য যে চক্ষু অন্তরিত করে। মন তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, চক্ষু তাহার উপর পড়িয়া থাকে। অগ্নিশিখা ক্রমে কমিয়া আসে, আর এই সময় পাত্রটী কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া পুনরায় মুখব্যাদান করে। তখন পাশ হইতে আর একটী বৃহৎ হাঁড়ী ইহার কাছে ঘুরিয়া আসে, ও আর এক প্রকার গলিত লৌহ বেসেমার পাত্রে ঢালিয়া দেয়। এই দ্বিতীয় প্রকার লৌহের নাম স্পাইজেলিসেন। এই দ্বিতীয় প্রকার গলিত লৌহ লইয়া বেসেমার পাত্র পুনরায় উচ্চমুখ হয়; তখন পাত্রের ভিতর ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হয়, আর ইহা হইতে এক্ষণে রাশি রাশি নীলাভাযুক্ত অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে থাকে। অগ্নিশিখা কমিয়া আসে, আর অল্পক্ষণ পরেই ইস্পাত-প্রস্তুত-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তখন বৃহদাকার বেসেমার পাত্র সেই দ্রবীভূত ইস্পাতকে আর একটী পাত্রে ঢালিয়া দেয়।

দ্রবীভূত পিগলোহের সহিত যে লৌহ মিশ্রিত করিয়া বেসেমার প্রণালীতে ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাকে স্পাইজেলিসন বলে। জার্মানি হইতে ইহা বিলাতে আমদানি হয়। ইহা এক প্রকার ঢালা লৌহ, কাঠের কয়লা দ্বারা প্রস্তুত। ইহাতে শতকরা চারিভাগের অধিক কার্ব্বণ থাকে। বিলাতে আমদানি করিবার নিমিত্ত বনবিভাগের নিকটবর্তী স্থানে আমরা এই লৌহ প্রস্তুত করিতে পারি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশে এমন লোক নাই যে, লৌহকারদিগকে যথানিয়ম শিক্ষা প্রদান করিতে পারে। কি কোথায় হয় তাহা কেহই জানে না, কে কোথায় কি করে তাহাও কেহ জানে না। জানিতেও কেহ যত্ন করে না। তবে কি করিয়া কাজ হইবে? দেশে কোথায় কি হয়, কি উপায়ে কিসের উন্নতি হইতে পারে, এইরূপ জ্ঞান সংগ্রহ ও জ্ঞানবিতরণের নিমিত্ত আমরা একবার একটী সভা সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। দেখিলাম, গলায় কুঠার বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে না পারিলে কেহই কৃপাকটাক্ষ করিবেন না।

লৌহ ও ইস্পাতে গুণের কি বিভিন্নতা তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইস্পাতের যে আর একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহার কথা পূর্বে বলি নাই। ইস্পাতকে ইচ্ছামত কঠিন হইতে কঠিনতর করিতে পারা যায়, লৌহকে তাহা

করিতে পারা যায় না। একখণ্ড ইস্পাতকে অতিশয় উত্তপ্ত করিয়া হঠাৎ শীতল জলে নিমগ্ন করিলে, তাহা এরূপ কঠিন হয় যে, তদ্বারা অপর একখণ্ড ইস্পাতকে কাটিতে পারা যায়। যেরূপ দৃঢ়তার আবশ্যক ইস্পাতকে সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে হয়, ও তাহার পর ইহাকে হয় একেবারে না হয় ক্রমে শীতল করিতে হয়। কি কার্য্যের নিমিত্ত কিরূপ করা আবশ্যক কর্মকারেরা তাহা বিলক্ষণরূপ জানে। ইহাকে "পা'ন" দেওয়া বলে। পা'ন দিতে হইলে বিলাতের লোকে ইস্পাতকে পরিষ্কৃত করিয়া উত্তপ্ত করিয়া থাকেন। উত্তাপ অধিক হইতে থাকে, আর ইস্পাতের উপর মরিচার মত একপ্রকার রেণু উঠিতে থাকে। প্রথম এই রেণুর ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হয়, তাহার পর ঘোর হরিদ্রাবর্ণ, গাঢ় রক্তবর্ণ নীল,—অবশেষে ধূসরবর্ণ হইয়া যায়। যদি ইস্পাতে অন্য ধাতু কাটিবার নিমিত্ত যন্ত্র করিতে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ থাকিতে থাকিতে ইহাকে শীতল করিতে হয়। যদি কাঠ কাটিবার যন্ত্রের নিমিত্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ঘোর হরিদ্রাবর্ণ হইলে পা'ন দিতে হয়। ক্ষুর প্রভৃতি দ্রব্যের নিমিত্ত ইস্পাত আবশ্যক হইলে, ইহা রক্তবর্ণ হইলে নামাইতে হয়। আর অতি সূক্ষ্ম কাজ যথা ঘড়ির স্প্রিং,—করিতে হইলে সে ইস্পাতকে নীলবর্ণ করিয়া তবে শীতল করিতে হয়। তরবারি, সূচ, বঁড়শি প্রভৃতির নিমিত্তও এইরূপ পা'নের আবশ্যক।

আমাদের দেশে বনবিভাগের নিকট যেখানে উৎকৃষ্ট লৌহ-আকর আছে, সেখানে আমাদের সমুদয় কার্য্যোপযোগী ইস্পাত অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। সে ইস্পাত করিতে ব্যয়ও অধিক পড়ে না। তবে দরিদ্র মূর্খ লোহাকার-দিগকে উৎসাহিত করা ও শিক্ষা প্রদান করা নিতান্ত আবশ্যক।

বিড়াল

বিড়াল বাঘের মাসী। ঠিক মাসী না হউক, দুইজনে সম্বন্ধ নিকট। জাতি এক, কারণ দুইজনেই 'কার্ণিভোরা' অর্থাৎ মাংসজীবী। বংশ এক, কারণ দুইজনেই 'ফেলিডি' বা সিংহবংশীয়। সুতরাং দুইজনের অঙ্গসৌষ্ঠবে, রূপ-গুণে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে ছোট আর বড়, কম আর বেশি, এই যা বল। বিড়ালের অঙ্গ সৌষ্ঠবের বিষয় আমি কিছু বলিতাম না, কারণ সকলেই ইহা চক্ষে দেখিতেছেন। তবে, কোন বিষয় নিরীক্ষণ করিয়া দেখার রীতি এদেশ হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে, তাই এ সম্বন্ধে মোটামুটি দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। বিড়ালের শরীরটী আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিলাম ;—মুণ্ড, ধড়, পুচ্ছ ও পা। মুণ্ডটী আর কিছুই নয়, কেবল একটী গোলাকার হাড়ের বাক্স। এই বাক্সের ভিতর মস্তিষ্ক থাকে। বাক্সের পশ্চাৎদিকে হাড়ের গায়ে একটী ছিদ্র আছে। সে ছিদ্রটী মাংস ও চর্ম দ্বারা আবৃত, তাই আমরা দেখিতে পাইনা। তাহাও বটে, আবার এই ছিদ্রের মুখে একটী হাড়ের নল জোড়া আছে। এই নলটী পিঠের উপর দিয়া, বরাবর পুচ্ছ পর্য্যন্ত গিয়াছে। মস্তিষ্কও যে পদার্থ, এই নলের ভিতরও সেই পদার্থ থাকে। অনেকগুলি আংটীর মত হাড় গায়ে-গায়ে সংযুক্ত হইয়া এই নলটীকে প্রস্তুত করিয়াছে। এই আংটীর মত হাড়গুলিই পিঠের শিরদাঁড়া। সুতরাং পিঠের শিরদাঁড়া একখানি

হাড় নয়। পিঠ পার হইয়া যখন এই হাড়ের আংটীগুলি পুচ্ছ গড়িতে থাকে, তখন ইহারা ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হয়, আর নিরেট হইয়া আসে। পুচ্ছের শেষভাগে একেবারে হাড় থাকে না। মুণ্ডের সম্মুখে, হাড়ের বাক্সের তলভাগে, বাহিরের দিকে যে ছিদ্রটী আছে, তাহাই মুখ। মুখ হইতে একটী নলী বক্ষঃস্থল দিয়া, পেট দিয়া, একেবারে পুচ্ছের মূল পর্য্যন্ত গিয়াছে। নলীর যে ভাগটী গলার কাছে থাকে, তাহাকে 'ফেরিংস্' বলে, যে ভাগটী বক্ষঃস্থলে থাকে, তাহাকে 'ইসোফেগাস' বা অন্নবহা নলী বলে। পেটের উর্দ্ধভাগে নলীটী যখন প্রসারিত হয়, তখন তাহাকে 'ষ্টম্যাক' বা পাকস্থলী বলে। তাহার পর নলীটী সরু হইয়া ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুচ্ছের তলভাগে গিয়া শেষ হয়। এই ভাগকে অন্ত্র বা নাড়ী-ভুঁড়ী বলে। ইহার ইংরেজী নাম 'ইণ্টেষ্টাইন'। যে সব জন্তু উদ্ভিজ্জ খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের পাকস্থলী বৃহৎ; ইহার গঠনও অন্যরূপ, কারণ উদ্ভিদ পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়। মাংস সহজে পরিপাক হয় বলিয়া মাংসজীবী জন্তুদিগের পাকস্থলী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ও ইহাদের অন্ত্র তত দীর্ঘ নয়। বিড়াল যখন বনে থাকে, তখন কেবল মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে বলিয়া বন-বিড়ালের পাকস্থলী ও অন্ত্র অন্যান্য মাংসজীবী জন্তুর ন্যায়। কিন্তু পোষা-বিড়াল ভাত ও রুটী খায় বলিয়া ইহাদিগের পাকস্থলীর গঠনের কিছু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; অন্ত্রও কিঞ্চিৎ দীর্ঘে বড় হইয়াছে। মাংসজীবী জন্তুদিগের দন্তের গঠন উদ্ভিজ্জ-ভোজী জন্তুদিগের মত নয়। যে যাহা আহার করে, তাহার দন্তের গঠন সেই আহারের উপযোগী। শীকার করিতে পারে, দন্তের দ্বারা শীকারকে ধরিয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারে, মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে পারে, বিড়াল ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুদিগের দন্তের গঠন এই সব কার্য্যের উপযোগী। মনুষ্যের প্রতি মাড়ীতে ১৬টী করিয়া দন্ত থাকে, দুই মাড়ীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২টী। ঠিক সম্মুখে,—উপরে চারিটি নীচে চারিটি,—আটটী 'ইনসাইসার' দন্ত। এই আটটী দন্ত কোনও দ্রব্য কাটিবার জন্য উপযোগী। তাহার দুইপাশে একটী করিয়া 'কেনাইন' দন্ত। নীচে উপরে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী কেনাইন দন্ত। মনুষ্যের কেনাইন-দন্ত আহারীয় দ্রব্যকে ছিঁড়িবার নিমিত্তই বিশেষ উপযোগী। কেনাইন-দন্তের পাশে দুইটী করিয়া 'বাইকসপিড' বা 'প্রিমোলার' দন্ত; সর্বশুদ্ধ আটটী বাইকসপিড দন্ত। তাহার পাশে তিনটী করিয়া 'মোলার' দন্ত; সর্বশুদ্ধ বারটী মোলার দন্ত। বাইকসপিড ও মোলার অর্থাৎ কসের দন্ত দ্বারা আহারীয় দ্রব্যকে চিবাইতে ও পিশিয়া ফেলিতে পারা যায়। এইরূপ মনুষ্যের ৩২টী দন্ত আছে। বিড়াল জাতীয় জন্তুদিগের দন্তের গঠন এরূপ নয়। সম্মুখে, প্রতি মাড়ীতে, ইহাদের ছয়টি করিয়া ছোট ছোট 'ইনসাইসার' দন্ত থাকে। তাহার ধারে প্রতি পাশে একটী করিয়া খুব বড় কেনাইন দন্ত আছে। এই চারিটী কেনাইন দন্ত দ্বারা ইহারা শীকার ধরিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়। তাহার পর প্রতি পাশে দুইটী করিয়া বাইকসপিড বা প্রিমোলার দন্ত আছে। বাইকসপিড দন্তগুলিতে খুব ধার, ইহা দ্বারা মাংস কাটিয়া তাহারা খণ্ড খণ্ড করিতে পারে। অবশেষে একটী করিয়া মোলার বা কসের দাঁত আছে। আমাদের কসের দাঁত দিয়া যেমন আমরা খাদ্যকে পিষিয়া ফেলি, ইহাদের কসের দাঁত সেরূপ পিষিবার উপযোগী নয়। বাইকসপিড-দন্তের ন্যায় কসের দাঁত দিয়া ইহারা কেবল খাদ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে পারে। তাহার পর না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে। তবেই হইল, বিড়ালজাতীয় জন্তুদিগের সচরাচর ২৮টী করিয়া দন্ত থাকে—অর্থাৎ ১২টী ইনসাইসার, ৪টী কেনাইন, ৮টী বাইকসপিড ও ৪টী মোলার। কোন কোন জাতিতে ৩০টী করিয়া দন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। হাড়ের গায়ে মাংস ও রক্ত

লাগিয়া থাকিলে চাটিয়া খাইতে পারিবে বলিয়া বিড়ালের জিহ্বা অতিশয় কর্কশ। বিড়ালের দেহ বা ধড় অপরাপর চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। কেবল বিড়ালের কেন, মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট সকল জন্তুর দেহই একটী লম্বা পেটারার মত। উপরে রহিল মেরুদণ্ডের হাড়, যাহা অনেকগুলি ছোট আংটির মত হাড়ের সমষ্টি মাত্র। এইসব ছোটি হাড়গুলিকে 'কশেরুকা' বলে। এই হাড় হইতে কতকগুলি লম্বা হাড় 'বাতার' মত বক্ষঃস্থলে আসিয়াছে; তাহারাই পঞ্জর। কশেরুকা, পঞ্জর ও বক্ষঃস্থলের হাড় বা ষ্টার্ণম্ দিয়া পেটারার 'কাটামো'টী নির্মিত হইয়াছে। তাহার পর কাটামোটী মাংস ও চর্ম দ্বারা আবৃত। পেটারার ভিতর আছে কি? ফুস্‌ফুস্ অর্থাৎ যে যন্ত্র দ্বারা নিঃশ্বাস লইতে হয়, হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ যাহা দ্বারা রক্তসঞ্চালন হয়, পাক-যন্ত্র, যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদি। এই সকল যন্ত্রকে 'ভিসেরা' বলে। পেটারাটী যে চারিটী পায়ার উপর বসান আছে, তাহাই বিড়ালের পা। বিড়ালের থাবাটী শিকার ধরিবার বিশেষ উপযোগী। নখগুলি অতিশয় কঠিন, তীক্ষ্ণ ও বক্র। নিঃশব্দে চলিতে পারিবে বলিয়া থাবাগুলি মখমলের মত নরম। চলিবার সময় নখগুলি ওই মখমলের ভিতরই থাকে। শীকার ধরিবার সময় বাহির করে। বিড়ালকে উপর হইতে ফেলিয়া দিলে এই নখ বাহির করিয়া মাটিতে গিয়া পড়ে। সেইজন্য ইহাদের শরীরে বড় আঘাত লাগিতে পায় না। এই নখগুলি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, বিড়ালের থাবা দেখিয়া বড় বড় জন্তুকেও ভয় করিতে হয়। কুকুরের সহিত বিবাদেই আমরা সচরাচর এই রহস্য দেখিতে পাই। তাই শেখ সাদি এই আরবি বয়েৎটী বলিয়া গিয়াছেন;—

"ইজা য়াএসা ইনসানো তালা লেমান হু।
কসিন—নৌরিণ মগলুবিন য়েসলুহু আললু কলবো॥"

যবকে নউমেদ হোতা হায় আদমি, দরাজ হোতি হায় জবান উস্‌কি। যাই সিকি আজিজ হোতি হায় বিল্লি, হমলা করতি হায় উপর কুত্তেকে।

বিড়ালের শরীরের বিষয়ে এখানে আর অধিক কথা বলিব না। বাকি যাহা রহিল, একটী বিড়াল ধরিয়া দেখিয়া লইবেন।

পালিত বিড়ালের মধ্যে সচরাচর যাহা দেখিতে পাই, তাহা ছাড়া আরও চারিজাতি আছে। (১) কচ্ছপরঙ্গের বিড়াল (২) আঙ্গোরা বা পারস্য বিড়াল (৩) চীন দেশের বিড়াল (৪) শারতুজ বিড়াল। প্রথম প্রকার বিড়ালের কচ্ছপের খোলার মত রং, তাই ইহার এরূপ নাম হইয়াছে। আঙ্গোরা বিড়াল দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদিগের বড় বড় লোম, ঠিক রেশমের ন্যায় কোমল। চীন বিড়ালের লোম খুব উজ্জ্বল, আর ইহাদের কাণ ঝুলিয়া থাকে। শারতুজ বিড়ালের রং ঈষৎ নীলবর্ণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বিড়াল মানুষের পালিত জন্তুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। প্রথম কোন্ বনবিড়াল ধরিয়া মানুষে পুষিয়াছিল, তাহার কিছু ঠিক নাই। এক্ষণে যত প্রকার বন-বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের শরীরের গঠন ঠিক ঘরের বিড়ালের মত নয়। তাই 'কোন্ বন-বিড়াল ঘরের বিড়ালের পূর্ব পুরুষ' পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে সচরাচর চারি জাতি বন-বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই কয়জাতি বন-বিড়ালের কেহই ঘরের বিড়ালের মত নয়। ঘরের বিড়াল বনে গিয়া বন-বিড়াল হয় সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুদিন বনে বাস করিলেও ইহার পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রকৃত বন-বিড়ালের মত হইয়া যায় না।

আমাদের দেশে পালিত বিড়ালের কখনই অভাব ছিল না। ষষ্ঠী দেবীর ইহা আদরের সামগ্রী, তাঁহার বাহন। তাই কৃত্যতত্ত্বে সূতীকাষষ্ঠী পূজা প্রকরণে ষষ্ঠীর ধ্যানে বিড়ালের উল্লেখ আছে,—

অভয় বরদহস্তাং কৃষ্ণমার্জারসংস্থাং
কনকরুচিরগাত্রীং সর্ব পুত্রৈকধাত্রীম্।
সুরমুনিগণবন্দ্যাং দিব্যমাল্যাম্বরাঢ্যাং
বটবিটপিবিলাসাং নৌমি ষষ্ঠীং সহাসাম্।

পূর্বকালে বিলাতে কিন্তু বিড়ালের বড়ই অভাব ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্বদেশ হইতে বিলাতে প্রথম বিড়াল গিয়াছিল। তামিল ভাষায় বিড়ালের নাম 'পুষে'। পণ্টু ভাষায় ইহাকে 'পুষা' বলে, পারস্যে 'পুষী'। সকলে মনে করেন ব্রিটেন দ্বীপে যে সমুদয় প্রাচীন ভাষা প্রচলিত ছিল তাহাতে বিড়ালের কোনও নাম ছিল না। এই তামিল-নামই তাহাতে গৃহীত হইয়াছিল। সে জন্য আইরিস ভাষায় ইহাকে 'পুস' আর্স ভাষায় 'পুষগ' ও গেলিক ভাষায় 'পুইস' বলে। বিড়াল রাগিলে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে বলিয়াও তাহার এরূপ নাম হইতে পারে। কারণ যে জন্তু যেরূপ ডাকে তাহার সেইরূপ নাম দেওয়ার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। কাক, কোকিল, কুক্কুট, বউ-কথা-ক প্রভৃতি পক্ষীর নাম এই নিয়ম অনুসারেই হইয়াছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সেই সকল নামের এত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক কুক্কুটের নাম দেখ—ইংরাজিতে 'কক্', ওরুবা ভাষায় 'কোকলো', ইবো ভাষায় 'ওকোকো', জুলু ভাষায় 'কুকু', ফিনিশ ভাষায় 'কক্কো' ইত্যাদি। প্রাচীন পারস্যবাসীরা কুক্কুটের বিশেষ সম্মান করিতেন। কারণ সকাল-বেলা ডাকিয়া ইহারা লোককে জাগাইয়া দেয় ; মানুষে দিবসের ধর্ম-কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুতরাং এরূপ পক্ষীকে ডাকের মত নাম দিলে তাহার অপমান হয়। তাই প্রসিদ্ধ জেন্ড আবেস্তা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"The bird who bears the name of Paradaos O holy Zarthustra ; upon whom evil-speaking men impose the name Kaharkatak." (কুক্কুট)

ইংরেজ বালক বালিকারা বিড়ালকে "পুস" বলিয়া ডাকে বলিয়া, সে কথাটী যে তামিল ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। ইহার ফোঁস ফোঁস শব্দ হইতেও এ নাম হইতে পারে। যাহা হউক আটশত বৎসর পূর্বে বিলাতে বিড়ালের বড়ই অপ্রতুল ছিল। বিড়াল-রক্ষা বিড়াল-বিক্রয় বিষয়ে সেখানকার রাজারা নানারূপ আইন করিতেন। ওয়েলস্ দেশের হাউয়েল নামক একজন রাজা বিড়াল-রক্ষার্থ একবার একটী আইন পাশ করেন। এই আইনে বিড়ালের মূল্যও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যে বিড়াল-ছানার চক্ষু ফুটে নাই, তাহার মূল্য এক পেনি ; ইন্দুর ধরিতে শিখিলে তাহার মূল্য দুই পেনি। যে সকল বিড়াল রাজার গোলাবাড়ীতে ইন্দুর মারিত তাহাদিগকে চুরি করিলে চোরকে একটী মেষ মায় ছানা শুদ্ধ জরিমানা দিতে হইত। ভেড়া না দিয়া তাহার বদলে গম দিলেও রাজা সন্তুষ্ট হইতেন। কত গম দিতে হইবে, তাহার পরিমাণ এইরূপে স্থির হইত ;—লেজে দড়ি বাঁধিয়া বিড়ালটীকে এরূপভাবে ঝুলাইতে হইত, যেন তাহার মস্তক যাইয়া মাটীতে লাগে। তাহার পর সেই দেহের উপর গম ঢালিয়া দিতে হইত। যতগুলি গম দিলে পুচ্ছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে, ততগুলি গম বিড়াল-চোরের জরিমানা হইত। বিলাতে এখন এত বিড়াল হইয়াছে যে, ছানা হইলে মারিয়া ফেলিতে হয়। ফণি-মনসার গাছ লইয়াও এদেশে এইরূপ রহস্য ঘটিয়াছিল। ফণি-মনসা এদেশের

গাছ নয়, আফ্রিকা অঞ্চল হইতে ইহা এদেশে আসিয়াছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, কোনও এক সাহেব প্রথম এইগাছ দক্ষিণ অঞ্চলে লইয়া আসেন। অন্য গাছের মত ডাল নয়, পাতা নয়—কিছুই নয়। তাই এই অপূর্ব গাছকে তিনি অতি যত্নে, অতি সাবধানে বাগানে পুতিয়াছিলেন। গাছটী বাগানে বাড়িতে লাগিল, আর প্রতিবাসীরা ইহার অপূর্ব রূপ দেখিয়া হিংসায় ফাটিয়া মরিতে লাগিল। কেহ কেহ ইহার দুই একটী ডাল রাত্রিতে চুরি করিয়াও লইয়া যাইল। এইরূপে চারিদিকে ফণিমনসার গাছ হইতে লাগিল। সেই আদরের গাছ এক্ষণে লক্ষ লক্ষ বিঘা ভূমি জুড়িয়া বসিয়াছে। আর এখন যত্ন করিয়া চাষ করিতে হয় না, আপনা আপনিই চাষাদিগের ক্ষেতসকল অধিকার করিয়া লইতেছে। তাহার জ্বালায় কৃষকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জলে ডুবাইলে মরে না, আগুনে পোড়াইলে মরে না, মাটীতে পুতিলে মরে না। তাই এই বৃক্ষকুলের প্রহ্লাদকে লইয়া কি করিবে কৃষকেরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না। আমি পশ্চিম-ঘাট পর্বতে দেখিয়াছি, অনেক উর্বরা ভূমি এই ফণি মনসা দ্বারা অধিকৃত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একপ্রকার খরগোষকে এইরূপ আদর করিয়া লোকে অষ্ট্রেলিয়া দেশে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে এখন ঐ খরগোষ পংগপালের ন্যায় এত বাড়িয়াছে যে, কৃষকদিগের শস্য রক্ষা করা ভার হইয়া পড়িয়াছে। বিড়াল লইয়া প্রাচীনকালে মিসর দেশেও এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল। সেখানকার লোকে বিড়ালকে দেবতা বলিয়া মানিত। বিড়ালের জন্য মন্দির নির্মাণ করিত, পূজা করিত, আর মরিয়া গেলে ইহার পেটের ভিতর নানারূপ মসলা দিয়া "মমি" করিয়া, মহা সমারোহের সহিত গোর দিত। বিড়াল মারিলে মহাপাতক হয়, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। 'ডাইয়োডোরস সাইকুলস' বলিয়া এক ব্যক্তি বলেন যে, একবার আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে রোমদেশীয় একজন সেনানী দৈবক্রমে একটী বিড়াল মারিয়া ফেলিয়াছিল। এই সর্বনাশের কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র লোকে ক্রোধ-উদ্দীপ্তনয়নে তাহার বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্ভাগা রোমীয়ের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত রাজা সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল, বিড়াল-হত্যাকারীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া লোকে রাস্তায় ফেলিয়া দিল। এখন আর মিসর দেশের সে অবস্থা নাই। এই আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরের পথে পথে কতই না আমি ভ্রমণ করিয়াছি। এখন সে মিসরও নাই, বিড়াল-উপাসক সে প্রাচীন মিসরবাসীও নাই। যাহা হউক মিসর দেশে বিড়ালকে এইরূপ যত্নের সহিত রক্ষা করিতে করিতে, অবশেষে ইহাদিগের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িল। এমন কি, ক্রমে লোকের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল যে, মিসর দেশ বুঝি বিড়াল সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। তাই মিসরবাসীরা সেখানকার পণ্ডিতদিগের নিকট বিধান প্রার্থনা করিলেন,—"মহোদয়গণ! এক্ষণে উপায় কি? দেশ যে বিড়ালে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল! মিসর যে রসাতলে যাইতে বসিল! আমরা সামান্য মনুষ্য এক্ষণে কোথায় যাই?" সেখানকার পণ্ডিতগণ পুঁথি খুলিয়া ব্যবস্থা দিলেন যে, বিড়াল বড় হইলেই পূজ্য, তখন তাহাকে মারিতে নাই। বিড়াল-ছানাকে মারিলে কোন দোষ নাই। তখন সেখানকার লোকে বিড়ালের ছানা হইলে যে দুই-একটী দেবতা করিবার নিমিত্ত আবশ্যক হইত, তাহাই রাখিয়া বাকিগুলিকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিতে লাগিল। পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি কৌশলে মিসর দেশ দেবতাদিগের উপদ্রব হইতে এইরূপে উদ্ধার হইল। কথিত আছে যে, পরশু-বিড়ালের দ্বারাও অনেক দেব-শাবক ধ্বংস হইত। সকল দেশেই পরশু-বিড়াল, ছানা মারিয়া ফেলে। লোকে বলে মারিয়া খায়; খাইতে কিন্তু কখনও দেখি নাই। যাহা হউক, এই ভয়ে বিড়ালী আজ এখানে কাল সেখানে ছানাগুলিকে লুকাইয়া রাখে। তাই 'বিড়ালছানা নাড়ানাড়ি' কথাটী হইয়াছে। গ্রীক-ইতিহাসবেত্তা মহা পণ্ডিত হেরোডোটাস

মিসরদেশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ;—"পিতা-বিড়াল নিজেই যদি না আপনার ছানাগুলিকে হত্যা করিতেন, তাহা হইলে মিসর দেশে বিড়ালের সংখ্যা বড়ই অধিক হইয়া পড়িত। প্রসব করিয়া বিড়ালী শাবকগুলিকে অতি সাবধানে লুকাইয়া রাখে, পাছে বিড়াল টের পায়। কিন্তু বিড়ালও ধূর্ত, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাদিগকে বাহির করে, বাহির করিয়া তাহাদের প্রাণ নষ্ট করে। সেখানকার লোকে কিন্তু বিড়ালের প্রাণ রক্ষা করিতে সততই চেষ্টা করিয়া থাকে। যদি কাহারও ঘরে আগুণ লাগে, তখন আর সব ফেলিয়া কিসে বিড়ালের প্রাণ রক্ষা হইবে, লোকে সেই চিন্তাতেই ঘোরতর ব্যগ্র হইয়া পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, বিড়ালেরা ঐ সময় লোকের পা গলিয়া, কি মাথা ডিঙ্গাইয়া আগুণে ঝাঁপ দেয়। তখন চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। দুঃখে,, শোকে, লোকে ভুরু কামাইয়া ফেলে। কুকুর মরিলে আরও বিপত্তি, সকলকে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্বশরীর কামাইয়া ফেলিতে হয়। বিড়াল মরিলে মিসরবাসীরা মৃতদেহ মন্দিরে লইয়া যায়। মৃতদেহকে লবণ দ্বারা যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া বুবস্তিনগরে তাহার সমাধি-ক্রিয়া সম্পন্ন করে।" মিসর দেশে মনুষ্য দেহও মশলা দ্বারা রক্ষিত হইত। সেখানকার বায়ু অতিশয় নীরস, সুতরাং ঐ সকল দেহ পচিয়া যায় নাই, শুষ্ক হইয়া মাটীর নীচে এখনও অনেক দেহ রহিয়াছে। মাটী খুঁড়িয়া রাজা-প্রজার অনেক দেহ পাওয়া গিয়াছে; আর ইউরোপের লোকেরা তাহা লইয়া যাদুঘরে রাখিয়াছেন। এই সকল শুষ্ক মনুষ্যদেহকে "মমি" বলে। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ঐ মমিরা জীবিত মনুষ্য ছিল। তখন তাহারা কত কথা কহিত, কত চিন্তা করিত। বিড়াল, কুকুর, ও কুম্ভীর প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া কতই না ধর্ম সঞ্চয় করিত। মিসর দেশে এইরূপ অনেক বিড়ালেরও মমি অর্থাৎ শুষ্কদেহ পাওয়া গিয়াছে। সে বিড়াল দেখিতে ঠিক আমাদের বিড়ালের মত নয়।

মিসর দেশের লোকে বিড়াল পূজা করিত বলিয়া কেহ যেন তাহাদিগকে উপহাস না করেন। প্রাচীন মিসরবাসীরা বিদ্যা বুদ্ধিতে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। যখন সমগ্র জগৎ তিমিরময় ছিল, তখন এদিকে ভারতবর্ষ, ওদিকে মিসর, কেবল এই দুইটী দেশ জ্ঞান ও ধর্মে বিভূষিত ছিল। তবে মিসরবাসীরা বিড়াল, কুম্ভীর প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারকে পূজা করিত বটে। ঐ সকল জন্তু জানোয়ার যে ইহকালে সুখ ও পরকালে সদ্গতি প্রদান করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগের একান্ত বিশ্বাস ছিল। জন্তুরা সকল কথা বুঝিতে পারে, মনুষ্যের চেয়ে তাহাদিগের বুদ্ধি অধিক, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তাহারা সকলই জানে, অনেকের এইরূপ বিশ্বাস। তাই, যেমন মানুষে মানুষের সহিত কথা কয়, জন্তুদিগের সহিত অনেকে সেইভাবে কথা কহিয়া থাকে। যখন এইভাবে কথা কয়, তখন তাহারা মনে করে—প্রতি কথাই জন্তুদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। একবার রাজপুতনায় চিতাবাঘ লইয়া হরিণ শীকার করিতে গিয়াছিলাম। চিতাবাঘের চক্ষে ঠুলি ছিল। দূরে হরিণপাল দেখিয়া চিতা-রক্ষক সেই ঠুলি খুলিয়া বাঘকে ছাড়িয়া দিল। বাঘ যাইয়া হরিণের পালের উপর পড়িল, কিন্তু না পড়িতে পড়িতে হরিণ সব ছুটিয়া পলাইল। চিতা একটীকেও ধরিতে পারিল না। তখন বাঘের আর রাগের পরিসীমা নাই। ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল, পুচ্ছ সজোরে মাটীতে আঘাত করিতে লাগিল; ইচ্ছা, সম্মুখে যাহাকে পাই তাহাকেই ধরি। তখন রক্ষকেরও সেই ক্রোধান্ধ বাঘের কাছে যাইতে ভয় হইল। আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল, আর দূর হইতে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল,—"এত রাগ করিতেছিস কেন বাচ্ছা ? তুই চিতা, তোর বাপ চিতা, তোর দাদা চিতা, তোর সাত

পুরুষ চিতা। সাহস ও বিক্রমে তোদের চেয়ে আর কে আছে পৃথিবীতে। এবার না হয় হরিণ পলাইয়াছে, এর পর কত হরিণ ধরিবি। আয় বাবা, ঘরে যাই।" রক্ষক এইরূপে চিতার সহিত কথা কহিয়া কহিয়া তাহাকে শীতল করিল। আমেরিকার পুরাতন অধিবাসীরাও ঘোড়ার সহিত এইরূপে কথা কহিয়া থাকে। কি বলিয়া মানুষে খাবার দেয়, আর কিরূপ শব্দ করিয়া তারপর মারে, এ দুটী শব্দ প্রায় সকল পালিত জন্তুই বুঝিতে পারে। তাহার পর কুকুর প্রভৃতি বুদ্ধিমান জন্তু আরও নানা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে। আমরা বিড়ালকে "আয় আয়" কি "পুশ পুশ" বলিয়া ডাকিলে কাছে আসে, 'যা' বলিলে দূরে যায়। স্পেন দেশের লোকে বিড়ালকে "মিজ মিজ" বলিয়া ডাকে। "জপে জপে" বলিয়া তাড়াইয়া দেয়। স্পেন দেশের একটী মঠে অনেকগুলি অতি সুন্দর বিড়াল ছিল। পাছে চোরে চুরি করিয়া লইয়া যায়, মঠ-বাসীরা সেই ভয়ে এই বিড়ালদিগকে ঠিক বিপরীত ভাষা শিক্ষা দিয়াছিল। তাহারা "মিজ মিজ" বলিয়া বিড়ালকে তাড়াইয়া দিত, "জপে জপে" বলিয়া ডাকিত। বিড়ালেরাও তাহাই শিখিয়াছিল। চোরেরা কিন্তু এ মর্ম জানিত না; সুতরাং চুরি করিতে আসিয়া তাহারা বিড়ালকে যেই "মিজ মিজ" বলিয়া ডাকিত আর বিড়াল পলাইয়া যাইত। এই সকল দেখিয়া কাজেই প্রাচীনকালের অনেক মনুষ্যদিগকে মনে মনে স্থির করিতে হইল যে, পশুরা না পড়িয়া পণ্ডিত। বাঙ্গালা ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষায় ইহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ইহারা সর্বদাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। তারপর আবার ইহাদের গাম্ভীর্য্য ও মৌনভাব দর্শনে লোকে আরও বিস্ময়াপন্ন হইল। ইহাদের মুখে একটী কথা নাই। কথা না কহিয়া ঠারে ঠোরে মত প্রকাশ করার যে কত ফল, তাহা আর কি বলিব! তা যদি করিতে পারি তো আমি তুমিও পূজা পাই। মূর্খ কালিদাস পরমাসুন্দরী রাজকন্যা লাভ করিয়াছিল। এই উপায়ে সেকালে পশুরা সকল দেশেই পূজা পাইয়াছিল। সর্প তো সকল দেশেই পূজা পাইয়া থাকে। আমেরিকার অধিবাসীরা মনে করে যে, সাপ মারিলে ভূত হইয়া হত্যাকারীর বিশেষ অপকার করে। তবে না মারিলে নয়, কাজেই নানারূপ তুক্ তাক্ করিয়া মারিতে হয়। সাপ দেখিলে প্রথমে তাহাকে সেলাম করা চাই, তারপর আরও বিশেষরূপে প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার সম্মুখে একটুখানি তামাক ফেলিয়া দিতে হয়। এই সব করিয়া তার পর তাহার লেজটী ধরিয়া মারিলে আর কোন দোষ নাই। সাপ মরিয়া ভূত হয় নব্য সম্প্রদায়দিগের মনে এ কথাটী বিশ্বাস না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তিথি নক্ষত্রের যোগে, স্থান বিশেষে, কোন্ বস্তুটী যে ভূত না হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। শুনিয়াছি, একবার একটী কলিকা (ছিলিম) নাকি ভূত হইয়াছিল। দুর্ভাগা কলিকাটী তামাকের কাট পড়িয়া বুজিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে ভাল করিয়া ধূম বাহির হইতেছিল না। তাই, যাহার কলিকা সে রাগ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। "গরম অবস্থায় আমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল; আছাড় মারিয়া আমাকে ভাঙ্গিয়া মারিয়া ফেলিল; আমি সিকি পয়সার ছিলিম বলিয়া আমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল?" এই কথা মনে করিয়া কলিকার বড়ই অভিমান হইল। অপঘাত মৃত্যুবশতঃ তাহার সদ্গতি না হইয়া ছিলিমটী ভূত হইল। ভূত হইয়া সেই লোকটীর গায়ে সে ক্রমাগত ছেঁকা দিতে লাগিল। শুইয়া আছে, গরম কলিকার ছেঁকা, বসিয়া আছে, কলিকার ছেঁকা, উঠিতে বসিতে কেবল কলিকার ছেঁকা, অথচ দেখিতে কিছুই পাওয়া যায় না। ভূত আর বল কে কবে দেখিতে পায়! এইরূপ দিবারাত্রি ছেঁকা খাইয়া খাইয়া লোকটী অস্থিচর্ম সার হইয়া পড়িল। অবশেষে একজন রোজা নিয়া আসিল। মন্ত্র তন্ত্র পড়িয়া, গুনিয়া গাথিয়া রোজা বলিলেন,—"তুমি যে গরম কলিকাটীকে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলে,

সেইটী এখন ভূত হইয়াছে। ভূত হইয়া তোমার উপর এইরূপ উপদ্রব করিতেছে। তাহার পর রোজার বিধিমত চেষ্টাতে কলিকাভূত শান্ত হইল। তবে লোকটীর প্রাণ বাঁচিল। পাঠকগণ! রাগ করিয়া ছিলিম কখনও ভাঙিবেন না। মিছা-মিছি কেন সমূহ বিপদে পড়িবেন?

ভল্লুক মারিয়াও ভল্লুক ভূতের প্রীতি-সাধনের জন্য আমেরিকাবাসীরা বিধিমত চেষ্টা করিয়া থাকে। ভল্লুকের মৃতদেহকে মাঝখানে রাখিয়া সকলে মিলিয়া তামাক খায়, তাহার মুখেও দুই একবার নলটি দেয়। তামাক খাইয়া ভল্লুকভূত পরম প্রীতি লাভ করে, হত্যাকারীদিগের উপর আর কোন উপদ্রব করে না। আফ্রিকা দেশের কাফ্রীরা হস্তি-মাংস ভক্ষণ করে। হস্তীকে বধ করা চাই, আবার বধ করিলে পাছে হস্তি-ভূত তাহাদিগের উপর উপদ্রব করে সেও ভয়। তাই মারিয়া মৃত দেহের প্রতি নানারূপ স্তুতি বিনতি করিতে হয়। মৃতদেহকে বুঝাইয়া বলিতে হয় যে, "দেখ, আমরা তোমাকে জানিয়া শুনিয়া মারি নাই, দৈবাৎ এ কার্য্যটী হইয়া গিয়াছে, সেজন্য আমাদিগের অপরাধ লইও না।" কথাগুলি যদিও ঠিক সত্য নয়, তথাপি করা যায় কি? প্রাণের দায়ে দুই একটী মিথ্যা কথা না কহিলে চলে না। হস্তি-ভূতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কেহ বা হত্যাকারীর সহিত কপট সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তাহার গায়ে দুই ঘা আস্তে আস্তে মারিলে হস্তি-ভূত বুঝিতে পারে যে, অপরাধীর যথাবিধি দণ্ড হইয়াছে। তখন আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া হস্তি-ভূত প্রেত-দেশে প্রস্থান করে। সাইবিরীয়া দেশে সামোয়েড বলিয়া জাতি আছে। তাহারা ভল্লুক মারিয়া মৃতদেহকে মিছা-মিছি করিয়া বলে—"আমরা তোমাকে মারি নাই, রুশের লোকে মারিয়াছে, আমাদের অপরাধ লইও না। আমেরিকার অধিবাসীরা ভল্লুক মারিয়া তাহার মাংস খায়, কিন্তু মুণ্ডটীকে রং মাখাইয়া পূজা করে। সাইবিরীয়া দেশে য়াকুত জাতিও ভল্লুকের পূজা করিয়া থাকে। যে বনে ভল্লুক থাকে, সেই বনের কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহারা ভক্তিভাবে করযোড়ে নমস্কার করে, আর বলে"ভল্লুক-খুড়া মহাশয়! আপনি বীর-পুরুষ। আমাদের প্রতি কৃপা রাখিবেন।" তাই বলিতেছি, বিড়াল-পূজা বিষয়ে হাসিবার কথা কিছুই নাই। পৃথিবীতে এরূপ কোন জন্তু নাই যাহা এককালে না এককালে, একদেশে না একদেশে মনুষ্যের উপাস্য হয় নাই। শৃগাল, কুকুর, হাঙ্গর, কুম্ভীর ময় পক্ষী পাখালি পর্য্যন্ত হয় এ-জাতির নয় সে-জাতির, ভিন্ন ভিন্ন দেশে মধ্যে প্রায় সকল জন্তুই মনুষ্যের আরাধ্য হইয়াছে। তবে বিড়ালের দোষ কি?

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে পশুটীর এক দেশে আদর, তাঁর আবার অন্য দেশে অনাদর। যিনি একদেশে আরাধ্য, তিনি অন্যদেশে বধ্য। শয়তান কে জানেন তো? ইনি অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত স্বর্গে বাস করিতেন। ঈশ্বরের সহিত ইঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি সদলে ঢাল-তলোয়ার লইয়া ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধও করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন কেন? তাই স্বর্গ হইতে ঈশ্বর ইঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আবার কেহ বলেন যে, ঈশ্বর ও শয়তানে কখনও যুদ্ধ হয় নাই। ঈশ্বর আদম ও ইবাকে সৃষ্টি করিয়া সকল দেবতাকে আদেশ করেন যে, "তোমরা এই দুইটী ইনসানকে তশিলমাৎ কর।" সকলেই স্বীকার করিলেন, কেবল শয়তান ও তাঁহার দল স্বীকার করিলেন না। তাই তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে ঈশ্বর তাড়াইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, শয়তান অহোরাত্র মনুষ্যের কাছে ঘুরিতেছে। সুযোগ পাইলেই মনুষ্যের আত্মা ধরিয়া নরকে লইয়া যাইতেছে।" মনুষ্যকে নরক ভোগ করিতে দেখিলে শয়তানের দল বিশেষ প্রীতি লাভ করে। অল্পদিন গত হইল বিলাতের লোকের মনে এই ধারণা ছিল যে, বিড়াল শয়তানের চেলা। শাদা বিড়াল তো বটেই, আর কালো বিড়ালের তো কথাই

নাই। যদি শয়তানের চেলা না হইবে, তাহা হইলে ইহার এত প্রাণ কঠিন কেন? বিলাতের লোকে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিড়ালের একটী প্রাণ নয়, নয়টী প্রাণ। অন্যান্য জন্তুর কেবলমাত্র একটী প্রাণ থাকে, সুতরাং এক ঘা মারিলেই সব ফুরাইয়া যায়। বিড়ালের একটী প্রাণ লইলে, তবু আরও আটটী থাকে। একে একে নয়টী প্রাণ বধ করিতে না পারিলে আর বিড়ালের মৃত্যু হয় না। ঠিক নয়টী প্রাণ আছে কি সাড়ে আটটী আছে, এদেশের লোকে তাহা কখনও হিসাব করিয়া দেখেন নাই। তবে বিড়ালের যে কঠিন প্রাণ তাহা সকলেই জানেন। একবার কাণপুরে আমি একটী দুরন্ত বিড়ালকে ঘরে বন্ধ করিয়াছিলাম। তাহাকে প্রথম বড় বড় ছিটা-গুলি দিয়া মারি। তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সে আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল। বন্দুকে পুনরায় কাঁকর পুরিয়া ফের আর একবার গুলি করি। তাহাতেও তাহার মৃত্যু হইল না। আমাকে পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিল। অবশেষে আমি নিজেই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলাম। বিড়ালকে ঘরে বন্ধ করিয়া মারিতে যাওয়া বড়ই বিপদের কথা। সে যে বাঘের মাসী এই অবস্থায় তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। শুনিয়াছি একবার একজন লোক একটী দুরন্ত বিড়ালকে ঘরে বন্ধ করিয়া বলিতেছিল—"তুমি রোজ রোজ হাঁড়ি খাও। এইবার তোমাকে বাগে পাইয়াছি। এখন কোথায় যাইবে? এইবার তোমার প্রাণ বধ করিব।" এইরূপ সুমধুর বক্তৃতা শুনিয়া বিড়াল কি করিল? বক্তৃতা-সুধারস-লোলুপ দুগ্ধ পোষ্য শিশুদল টাউন হলে যাইয়া যাহা করে, বিড়াল তাহা করে নাই। বিড়াল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে নাই, করতালি দেয় নাই, কিংবা "হিয়ার, হিয়ারও" বলে নাই। বিড়াল টপ করিয়া লোকটীর টুঁটি ধরিল, গলার জুগুলার শিরা ছিঁড়িয়া দিল, ক্যারোটিড ধমনী ও নিমোগ্যাষ্ট্রীক বা ভেগস স্নায়ুতে নখ বসাইয়া দিল। তাহাতেই লোকটীর মৃত্যু হইল। এরূপ অবস্থায় বিড়াল কখন কখন চক্ষুতে গিয়া থাবা মারে, তাহাতে চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া যায়। তাই বলি, বিড়ালকে ঘরে বন্ধ করিয়া কেহ যেন মারিতে না যান। কুকুর ও শৃগাল কামড়াইলে যেরূপ ভয়ের কথা থাকে, বিড়ালের কামড়ে সেরূপ বড় ভয় নাই। ক্ষিপ্ত বিড়াল ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, আর বিড়ালের কামড়ে ক্ষিপ্ত হইয়া মানুষ মরিতে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে যে বিড়ালের কামড়ে জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া রোগ একেবারেই হয় না তাহা নহে। বিড়াল অপর একটী বিড়ালের সহিত বড় অধিক বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করে না। কেবল ভয়ানক শব্দ করিয়া ডাকে, অধিক কামড়া-কামড়ি করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিবাদের সময় গায়ে একটু জল দিলে ক্রোধ কিছু বৃদ্ধি পায়, তাহা দ্বারা উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধের দিকে কিয়ৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করে। লোকে বলে যে, গায়ে জল দিলে বিড়াল ভাবে যে, ন্যায় যুদ্ধের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বিপক্ষ তাহাকে অপবিত্র করিয়া দিল। বলুন, এ অপমান কার প্রাণে সহ্য হয়? তাই প্রাণ যায় আর থাকে, সাহস ও উদ্যমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। শরীর অপবিত্র হইয়াছে এ চিন্তা বিড়ালের মনে উদয় হউক আর নাই হউক, জলের উপর ইহার বিলক্ষণ দ্বেষ। তাহার কারণ এই যে, অপরাপর জন্তুদিগের লোমে যেরূপ যৎসামান্য তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, বিড়ালের লোমে সেরূপ থাকে না। বিড়ালের গা শুষ্ক বলিয়া ইহা ঘষিলে বিদ্যুত বলের উৎপত্তি হয়। শীতকালের রাত্রিতে ইহার কাণের অগ্রভাগ হইতে বিদ্যুত-অগ্নি-কণাও বাহির করিতে পারা যায়। তৈলাক্ত পদার্থ থাকিলে লোমে জল বসিতে পায় না, জল লাগিলে লোম নষ্ট হইয়া যায় না। বিড়ালের লোমে তৈলাক্ত পদার্থ নাই বলিয়া জল লাগিলে ইহার বিশেষ অপকার হয়, দেখিতেও ঠিক "ভিজে-বিড়ালের" মত হয়। তাই বিড়াল জলকে ভয় করে, গায়ে জল দিলে

ইহার রাগ হয়। লোমে তৈলাক্ত পদার্থ নাই বলিয়া ধুলো কাদা ইহাতে লাগিয়া থাকিতে পায় না, ঝাড়িয়া ফেলিলেই পড়িয়া যায়। পারতপক্ষে জলের নিকট যায় না বলিয়া বিড়াল কখনও মুখ ধুইলে বিলাতের লোকে বৃষ্টি-বাদলার আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত বিড়ালকে তেলও মাখিতে হয় না, স্নানও করিতে হয় না। ইহার রূপের ছটা আপনা-আপনিই বাহির হইতে থাকে। বিড়ালের রূপের নিন্দা করিলে তাহার প্রাণে কি দুঃখ হয়, মনে কি রাগ হয়? তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে তোতোলের নামে বিড়াল কেন এই সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল? তোতোল একটী ঘুঘুর নাম। একজনদের বাড়ীতে বিচালির গাদায় তোতোল বাসা করিয়াছিল, তিন চারিটী ছানা হইয়াছিল। বিড়াল তাহা জানিতে পারিয়াছিল। ছানাগুলির সুকোমল মাংসের আস্বাদনে রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে বিড়ালের মনে বড়ই সাধ হইল। কিন্তু দয়ার সাগর বিড়াল বিনাদোষে ঘুঘুর ছানাগুলিকে কি করিয়া খায়? তাই, একদিন পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া বিড়াল যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল, আর দূর হইতেই আরক্তনয়নে কর্কশবচনে বলিতে লাগিল;—"তোতোল ঘরে, তোতোল ঘরে?" ঘুঘুটী ভয়ে ভীত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর দিল—"কেন গ মাসি!" তুই নাকি বলেছিস যে, "আমার খটাশপানা চক্ষু দুটো, খত্তালের মত কাণ দুখানা, হাত দুচ্চার লেজটা?" ঘুঘু বলিল;—'না মাসি! তা কেন বলিব?' আমি বলিয়াছি যে, "তোমার পদ্মর মত চক্ষু দুটী, খঞ্জনির মত কাণ দুখানি, পাঁজের মত লেজটী।" এরূপ মিষ্ট কথা শুনিয়া কার না প্রাণ শীতল হয়, রাগ পড়িয়া যায়? তাই বিড়াল আর কিছু বলিতে পারিল না। কেবল "তাইতো বটে, তাইতো বটে" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ঘুঘুর ছানার লোভ তো আর পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না! তাই আবার তার পরদিন সেইরূপ রাগত-ভাবে আসিয়া তোতোলকে ঠিক সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তোতোলও ঠিক পূর্বদিনের মত উত্তর দিল। এইরূপ বিড়াল প্রত্যহ আসে আর তোতোল মিষ্ট কথা বলিয়া কাকুতিমিনতি করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। তোতোলের প্রাণে কিন্তু বড়ই ভয় হইল। বিপদ সমূহ। বিড়ালের লোভ ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, মিষ্ট কথায় আর সে ভুলে না। তাই তোতোল ছানাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাছাসকল! তোমরা কি এখন উড়িতে শিখিয়াছ?" ছানাগুলি বলিল "হাঁ, মা! আমরা এখন একটু একটু উড়িতে শিখিয়াছি।" তোতোল বলিল, "কৈ, একটু উড়িয়া আমাকে দেখাও দেখি?" ছানাগুলি উড়িয়া মাকে দেখাইল। তখন তোতোল নিশ্চিন্ত হইয়া বাসায় বসিয়া রহিল। সেদিন বেলা বিড়াল আসিয়া পূর্ববৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"তোতোল ঘরে, তোতোল ঘরে?" "কেন? ঘরে থাকিব না তো যাব কোথায়?" "তুই নাকি বলিয়াছিস"— "বলেছি তো বলেছি তো।" এই কটু উত্তর শুনিয়া বিড়াল যেই ছানাগুলিকে ধরিতে যাইল, আর তাহারা উড়িয়া গেল। বিড়াল দুঃখে বাসাটী চাটিয়া চুটিয়া ফিরিয়া গেল? তোতোল বলুক, কিন্তু তাহার মাসীর ঠিক পদ্মের মত চক্ষু নয়। তার মাসী হয় কি না? স্নেহবশতঃ সে এই কথা বলিয়া থাকিবে। আমরা কিন্তু যাহা সত্য তাহাই বলিব। তোতোলের মাসির চক্ষু এরূপ গঠিত যে ইচ্ছা করিলেই কনীনিকা কুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়। অন্ধকারে ইহা বিলক্ষণ প্রসারিত হয়, তখন যেন চক্ষু-দুটী জ্বলিতে থাকে। বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি শীকার পাইলে খানিকক্ষণ তাহাকে লইয়া খেলা করে, তারপর মারিয়া ফেলে শুনিয়াছি, বাঘেও এইরূপ করিয়া থাকে। বিড়াল কিন্তু পাখী পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলে, পাখীকে বিশ্বাস নাই, সে দৈবাৎ উড়িয়া যাইতে পারে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, বিড়াল যখন অপর বিড়ালের সহিত ঝগড়া করে, তখন তুমুল সংগ্রামে কৈ বড় প্রবৃত্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে নিতান্ত মর্ম্মান্তিক রাগ হইলে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। এরূপ শুনা গিয়াছে যে একবার দুইটী বিড়ালে ঝগড়া করিয়া উভয়ে উভয়কে কামড়াইয়া একেবারে খাইয়া ফেলিয়াছিল। আয়র্লণ্ড দেশে কিলকেনি নামক স্থানে এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। সেখানে দুইটী বিড়ালে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে সংগ্রাম এরূপ তুমুল হইয়া উঠে যে, এ ওর দেহ হইতে একখণ্ড মাংস ভক্ষণ করে। এইরূপে পরস্পরে কামড়া-কামড়ি খাওয়া-খাওয়ি চলিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সেখানকার লোকসব উঠিয়া দেখিল যে, এ ও-বিড়ালটীকে একেবারে খাইয়া ফেলিয়াছে, ও এ-বিড়ালটীকে একেবারে খাইয়া ফেলিয়াছে। দুইটী বিড়ালের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কেবলমাত্র লেজের একটু একটু ডগা সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। এই বিড়াল-যুদ্ধে তবুও লেজের আগাটুকু পড়িয়াছিল, কিন্তু আমাদের দেশে সাপে সাপে যুদ্ধ হইলে তাহাও থাকে না। সাপ দুইটী যদি সমান-পরাক্রমশালী হয়, আর সমান-দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করিতে করিতে এ ওর লেজের আগা ধরে ও এর লেজের আগা ধরিয়া গিলিতে আরম্ভ করে। আস্তে আস্তে গিলিতে গিলিতে এ ওরে গিলিয়া ফেলে ও এরে গিলিয়া ফেলে। বাকী আর কিছুই থাকে না, ধরাধামে কোনও সাপটীরই চিহ্নমাত্র থাকে না। মনুষ্যের মধ্যেও এ রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয় লইয়া আদালতে মোকদ্দমা করিতে যাইলে, দুই পক্ষেরই ভাগ্যে এই ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক সেকালের খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে বিড়াল শয়তানের চেলা। ধর্ম্মে যাঁহাদিগের আস্থা, ভক্তি কিছু গাঢ়; তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, শয়তান নিজেই বিড়ালের রূপ ধরিয়া দুর্ভাগ্য মনুষ্যদিগকে নরকাগ্নিতে ডুবাইবার নিমিত্ত নানারূপ পাক-চক্র করে। লোকের মন্দ করিবার নিমিত্ত, লোকের শরীরে পীড়া উপস্থিত করিবার নিমিত্ত, লোকের গরু-বাছুর মারিবার নিমিত্ত বিড়াল—ডাইনদিগেরও বিশেষ সহায়তা করিত। তাই পূর্বকালে বিলাতের লোকে বিড়ালের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। মিসরবাসীদিগের যিনি দেবতা, মিসরবাসীরা যাঁহার সেবার জন্য সর্ব-স্বান্ত হইত, বিলাতের লোকেরা সেই বিড়ালকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিতেন। জাহাজের উপরে বিড়াল আমোদ-প্রমোদ করিয়া লাফালাফি করিলে মাঝিকেরা, নিশ্চয় বুঝিত যে অবিলম্বে তুমুল ঝড় উঠিয়া তাহাদিগের জাহাজ ডুবাইয়া দিবে। তাহা না হইলে দুষ্ট বিড়ালের এত আনন্দ কেন? ছাদের উপর বিড়াল ডাকিলে বাটীতে কেহ না কেহ মরিবে ইহাও লোকের বিশ্বাস ছিল। কাক ডাকিলে কিংবা কুকুর কাঁদিলে আমাদেরও বিপদের আশঙ্কা হয়। কেন না ঐসকল জীবজন্তু ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানে। কেবল চুপ করিয়া থাকে এই যা তো নয়? আমরা যাহা দেখিতে না পাই, ইহারা তাহা দেখিতে পায়। বাটীর নিকট ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্য আসিলে আমরা দেখিতে পাই না, ইহারা দেখিতে পায়। কাহারও বাটীতে আগে থাকিতে যমদূতের আনা-গোনা দেখিয়া গৃহ-পালিত পশুদের মধ্যে কেহ বা আহ্লাদে ডাকে, কেহ বা দুঃখে কাঁদে। এরূপ ঘটনা হইলে রোমক খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন করিলে আর কোন ভয় থাকে না। করিতে হয় কি, চারিটী বাতি জ্বালিতে হয়, আর এই মন্ত্রটী পড়িতে হয়;—

Ut quibus cumque locis accensae, sive positoe fuerint, fiscedant principes tenebrarum, et contremiscant, at fugiant Davidi cum omnibus ministris suis at habitationibus illis, etc.

এইরূপ বাতি জ্বালিয়া মন্ত্র পড়িলে ভূত, প্রেত, যমদূত প্রভৃতি পলায়ন করে, আর কোনও অমঙ্গল ঘটে না। একজন ইংরেজি কবি ইহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

".....a wondrous force and might
Doth in these candles lie, which if at
anytime they light,
They sure believe that neither storm nor
tempest dare abide,
Nor thunder in the skies be heard, nor
any devil's spide,
Nor fearful sprights that walk by
night, nor hurts of frost or hail".

দেব দানব, ডাকিনী যোগিনী শয়তান ডেবিলের সহিত বিড়ালের এইরূপ সদ্ভাব বলিয়া ইন্দ্রজাল কার্য্যে এই জন্তুর বিশেষ প্রয়োজন। কালো বিড়ালের চক্ষু, দন্ত ও নখের যে কত গুণ, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু বলিতে সাহস করি না। কেহ যদি আমার উপর যাদু করেন? আমারই কাছে শিখিয়া শেষকালে আমার উপরেই মারণ উচ্চাটন বশীকরণ করিবেন। তাই বলিব না। বিলাতে এরূপ দারুণ থাকিলেও বলা বাহুল্য যে, বিড়াল মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। তবে কুকুরের মত প্রভুভক্ত নয়। বিড়াল কিছু স্বার্থপর। তাই এদেশে লোকে বলে বিড়ালের কামনা এই যে, গৃহস্থ পুত্র-কন্যা-শূন্য হউক, তাহাকেই লইয়া আদর করুক। কুকুরের প্রার্থনা, গৃহস্থের বংশ-বৃদ্ধি হউক যে, পাঁচজনের কাছে পাঁচমুঠা পাইয়া তাহার উদর পূর্ণ হইবে। গৃহস্বামী অন্ধ হউক বিড়াল এ প্রার্থনাও করিয়া থাকে, সে স্বচ্ছন্দে মাছ দুধ চুরি করিয়া খাইতে পারিবে। কুকুরের মত বিড়ালের, মানুষের প্রতি ততটা মমতাও হয় না, বিড়াল যে স্থানে প্রতিপালিত হয়, কেবল সেই স্থানের উপরেই ইহার মায়া বসে, ইহাকে স্থানান্তরিত করিলে স্থানের মমতাতেই ফিরিয়া আসে। তাই লোকে ইহাকে থলীর ভিতর বন্ধ করিয়া দূরে লইয়া যায়, যেন পথ চিনিতে না পারে। বিড়াল কখনও কখনও অন্য পশুর ছানাকে প্রতিপালন করে। বোধহয় তাহাদিগকে আপনার শাবক বলিয়া মনে করে। গিলবার্ট হোরাই সাহেব বলেন যে একবার একটী বালক তিনটী কাটবিড়ালীর ছানা ধরিয়াছিল। বালকের একটী বিড়াল ছিল, সেই সময়ে তাহার ছানা মরিয়া গিয়াছিল। বালক কাটবিড়ালী শিশুগুলিকে সেই বিড়ালের কাছে দিল। বিড়াল আনন্দের সহিত তাহাদিগকে স্তন পান করাইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া অনেক লোকে সেই বিড়ালকে দেখিতে আসিল। অনেক লোকের সমাগম দেখিয়া বিড়ালের ভয় হইল, পাছে তাহার প্রতিপালিত সন্তানদিগকে কেহ লইয়া যায়। তাই সে ছাদের উপর লইয়া তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিল। সেখানে একটী ছানা মরিয়া গেল। আর একবার আর এক বিড়াল একটী খরগোষের ছানাকে প্রতিপালন করিয়াছিল। যাহা হউক স্বার্থপর হইলেও বিড়াল একটী খেলাইবার জিনিস, আদরের সামগ্রী। ইহার নানারূপ ফন্দি, নানারূপ ক্রীড়া, নানারূপ ভাবভঙ্গী দেখিয়া ছেলেদের ও পুত্র-কন্যা-হীন স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ প্রীতি জন্মে। তা ছাড়া ইঁদুর মারিয়া, বিড়াল মনুষ্যের বিশেষ উপকার করে। ইঁদুর মারা লইয়া, বিড়ালের স্বভাব লইয়া সকল দেশেই নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। হুইটিংটন ও তাঁহার

বিড়ালের কথা বিলাতে ছেলেমেয়েদের উপমাস্থল। দরিদ্র হুইটিংটন কেবলমাত্র একটী বিড়ালকে সহায় করিয়া জনাকীর্ণ লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লোকের বাটীতে ইঁদুর মারিয়া এই বিড়াল তাঁহার জন্য অর্থ উপার্জন করিত। প্রথম প্রথম তাহাতেই তাঁহার ভরণপোষণ হইত। তাহার পর ঘোরতর অধ্যবসায় ও অসীম পরিশ্রমের দ্বারা তিনি বিপুল ধনশালী হইয়া পড়িলেন ও অবশেষে লণ্ডন নগরের লর্ড মেয়রের পদে নিয়োজিত হইলেন। সেখানে দরিদ্র বালকেরা এই গল্পটী পড়িয়া মনে সাধ করে, আমরাও "পরিশ্রম করিয়া বড়লোক হইব।" আমি যখন ইতালি দেশে রোম নগরে ছিলাম, তখন সেখানেও এইরূপ একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। ফ্লরেন্স নগরের কণ্টি লোরেনজো ম্যাগেলোটি নামক একটী লোক জাহাজ করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ঝড় উঠিয়া জাহাজ ডুবিয়া গেল। ধর্ম্মে ধর্ম্মে তাঁহার প্রাণ বাঁচিল। দুইটী বিড়াল লইয়া তিনি একটী দ্বীপে গিয়া উঠিলেন। (bell gatti un maschio, una fammina) সেই দ্বীপ তখন ইঁদুরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এত ইঁদুর হইয়াছিল যে, লোকের চাষবাস একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ হইয়া অনাহারে সহস্র সহস্র লোক মরিতেছিল। সেখানকার রাজা কতই উপায় করিতেছিলেন, কিন্তু এ বিপদ হইতে দেশকে কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিতেছিলেন না। ইঁদুরের সংখ্যা কমিতেছিল না, কেবল বাড়িতেই ছিল। ফ্লরেন্স নগরের এই লোকটী গিয়া রাজার সহায় হইলেন। তিনি আপনার বিড়াল দুইটী দ্বারা ইঁদুর বধ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেশ ইঁদুর শূন্য হইল। রাজা ইহাঁকে প্রচুর অর্থ দিয়া ধনশালী করিলেন। (un richissimi doni) ইঁদুরের উপদ্রবে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। কয়েক বৎসর গত হইল, বোম্বাই প্রদেশে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, সহসা কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর আসিয়া ঘরের ও মাঠের শস্যাদি খাইয়া ফেলিতে লাগিল। লোকে অনাহারে মরিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট ইঁদুরের সংখ্যা কমাইবার জন্য কতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে ইঁদুরদল সহসা আবার আপনা-আপনিই অন্তর্হিত হইল। কোথা হইতে এরূপ ইঁদুরেরা পালে পালে আসিয়াছিল, আবার কোথায় তাহারা গেল, এ কথার ভালরূপ মীমাংসা হয় নাই। এ দেশের, অপোগণ্ডদের বুঝাইয়া যেরূপ দুই চারিজন চতুর লোক আপনাদিগের কাজ সাধিয়া লন, গল্পে আছে, একবার একটী বাঁদরও বিড়াল দ্বারা সেইরূপ আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিল। পৌষ মাসে মেঘ করিয়াছে, বায়ু চলিতেছে, খুব শীত। বিড়ালটী পরমসুখে উনুনের কাঁদায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। মনের আনন্দে এক একবার "ঘড় ঘড়" করিয়া শব্দ করিতেছে। গৃহস্থ উনুনে কাঁঠাল-বিচির ন্যায় চেষ্টনট নামক একপ্রকার ফল পোড়াইতে দিয়াছেন—পুড়িলে ছেলেরা খাবে। কাছে শৃঙ্খলদ্বারা একটী বাঁদর বাঁধা আছে। বাঁদরটীর সেই ফল খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু আগুন হইতে কি করিয়া বাহির করে? হাত পুড়িয়া যাবে যে? তাই সে খপ করিয়া বিড়ালের একটী পা ধরিল, ধরিয়া সেই পাটী উনুনের ভিতর দিল। পায়ে আগুন লাগিতেই বিড়াল চীৎকার করিয়া থাবা গুটাইল, সেই থাবার ভিতর দুই একটী আধ-পোড়া ফল আসিল, তখন বাঁদর সেই পা'টী বাহির করিয়া থাবার ভিতর হইতে ফল লইয়া খাইল। "পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা" আর কি?

বিড়াল হাঁড়ি খায় সত্য, বিশেষতঃ যদি হাঁড়িতে মাছ থাকে। সিকের পানে, দুধের বাটীর দিকে চাহিয়া থাকেও সত্য। মানিলাম যে, চুরির দিকে বিড়ালের

একটু স্পৃহা আছে। তা বলিয়া বিড়াল যে একেবারেই ধর্ম্মপরায়ণ হয় না তাহা নহে। কিন্তু হইলে হবে কি, বিড়ালের অখ্যাতির কপাল। যেমন তেমন গণৎকারও বিড়ালের হাত দেখিবামাত্র বলিয়া দিতে পারেন—"তোমার বাছা যশো-ভাগ্য নাই।" ধর্ম্মকর্ম্মই করুক আর ব্রত নিয়মই করুক, বক ও বিড়ালের যশ নাই, বরং অযশ। ভগবান মনু বৈড়ালব্রতিক ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। বিড়াল তপস্বীর কথা কে না শুনিয়াছেন? তারপর সেই যে সতী-সাধ্বী বিড়ালীটী, যিনি ঘোর দুর্য্যোগ বাদলার দিন উনুনের ধারে পরম সুখে বসিয়া আগুন পোহাইতেছিলেন, তাঁহাকেও যেন সকলে প্রাতঃস্মরণীয়া বলিয়া মানেন। একভাবে না একভাবে তাঁহার গল্প বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রেই শুনিতে পাওয়া যায়। বিড়ালী পরম সুখে ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন, কুকুরের কিন্তু সে আদর নাই, কুকুর ঘরের ভিতর যাইতে পায় না, সেই দুর্য্যোগের দিন অনাথা ক্ষুধার্ত্ত কুকুরটী সতৃষ্ণ নয়নে খাবারের জন্য ঘরের দিকে চাহিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছিল। তাই বিড়ালী ঘরের ভিতর হইতে তাহাকে বলিলেন,—

"টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ে, ভিজে যাচ্ছে গা।
আমি যেন ব'সে আছি মহারাজের মা॥"

কুকুর তখন চুপ করিয়া রহিল। দৈবক্রমে আমাদের পরম পূজনীয়া বিড়ালীটী সেই রাত্রিতে গৃহস্থের হাঁড়ি খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কারণ রক্ত-মাংসের শরীরে ভ্রম সকলকারই হইয়া থাকে। মোহ-মুগ্ধ গৃহস্থের তত্ত্বজ্ঞান নাই। সে পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে ধরিয়া বিচালির দড়ী দিয়া বাঁধিয়া বিদায় করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। কুকুরটী ছাইগাদার উপর বসিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় রহস্য দেখিতেছিল। অবশেষে সে বিড়ালীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কা'ল যে বড় শুনেছিলাম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।
বিচালির দড়ী গলায় দিয়া যাওয়া হচ্চে কোথা॥"

বিড়ালী উত্তর করিলেন—

"এখন ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
তুলসীর মালা গলায় দিয়া যাচ্চি বৃন্দাবন॥"

সাধু, সাধু! সংসারের উপর কি বৈরাগ্য!

পশম

মেষের লোমে পশম হয়। মেষের লোমেই যে কেবল হয় তাহা নহে, অন্যান্য কতিপয় জন্তুর লোমেও পশম হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে উটের লোমে নানা প্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, গরীব-দুঃখীরা তাহা পরিয়া সেখানকার দুরন্ত শীত হইতে রক্ষা পায়। ছাগলের লম্বা লম্বা কেশেও লোকে রজ্জু প্রভৃতি নানা-বিধ বস্তু প্রস্তুত করে। কিন্তু তাহাকে পশম বলে না। কোঁকড়া কোঁকড়া সরু সরু নরম নরম লোমকেই পশম বলে। ছাগলের কেশ তাহা নহে, তাই তাহাকে

পশম বলে না। তবে তিব্বত প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে, ছাগলের কেশের নীচে ঠিক গায়ের উপর, কোঁকড়া-কোঁকড়া অতি কোমল পশম জন্মে। এখানে বড় শীত, সামান্য পাতলা-পাতলা কেশের আবরণে শীত ভাঙ্গে না, তাই জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়ম;—এখানকার ছাগলের গায়ে তিনি পশমের আয়োজন করিয়া দিয়াছেন। এই পশম—বহুমূল্য; ইহাতে কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হয়,—ইহাকে লোকে পশমীনা বলে। মেষের লোমকে মাজিয়া ঘসিয়া নরম করিয়া লইলে, তাহাকেও লোকে পশমীনা বলে। দুঃখের বিষয় এই, ভারতে পশমীনা ছাগল জীবিত থাকে না। কাশ্মীর প্রভৃতি শীত প্রধান প্রদেশে কতবার এই ছাগল প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহারা সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পশমীনা ভারতের দ্রব্য নয়, তাই ইহার বিষয় এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ছাগলের ন্যায় তিব্বতে কুকুরের গায়েও পশমীনা হইয়া থাকে, তাহা হইতেও লোকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। আবার এখানে আর একটী জন্তু আছে, তাহার গা হইতেও লোকে পশম কাটিয়া লয়। ইহাকে 'য়াক' বলে, আমরা বলি, চামর-গরু; (চমরীমৃগ?) কারণ ইহার পুচ্ছ হইতেই চামর হয়। তিব্বত ও হিমালয়ের উত্তর-প্রদেশে এই গাভী মানুষের পরম বন্ধু। বালুকাময় আরবে যেরূপ উট, তুষার-ময় ল্যাপ্‌স্থানে যেরূপ রেণ-হরিণ, হিমালয়ের ভোট-প্রদেশে সেইরূপ চামর-গরু। এই প্রস্তরময়, বরফময়, মরুভূমির ভিতর জীব-জন্তুর আহারের বড়ই অনটন। আহার সংগ্রহ বিষয়ে চামরগরু কিন্তু বড়ই দক্ষ। বরফের ভিতর কোথায় ঘাস কোথায় পাতা লুক্কায়িত থাকে, শুঁকিয়া ইহারা জানিতে পারে। সেই স্থান খুর দিয়া আঁচড়ায়, বরফ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘাসগুলি খুঁটিয়া খায়।

এখানে শীত কিরূপ? একবার এই কথা আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইনি গাঁজা-ধূমপানে বড়ই প্রীতি লাভ করিতেন, ইঁহার ঘরে গাঁজার সদাব্রত ছিল, যে যাইত, অবাধে সেই গাঁজা খাইতে পাইত। অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে ইনি বড়ই ভালবাসিতেন। ইহাঁর কাছে কোনও কথা পাড়িলে, অতি অদ্ভুত যদি হইত, তবেই কান দিয়া শুনিতেন, না হইলে উড়াইয়া দিতেন। একবার হিমালয় প্রদেশ হইতে বাটী আসিয়াছি, ইনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেখানে গিয়াছিলে, ভাল, সেখান হইতে কৈলাস পর্বত কতদূর?" পাঠকগণ! ক্ষমা করিবেন। আমি কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া বলিয়াছিলাম। দেশ পর্য্যটকদিগের রীতিই এই। তাহাতে আমার দোষ নাই। আমি বলিলাম, "মহাশয়! সেখান হইতে কৈলাস পর্বত অতি নিকটে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যখন শিবের আরতি হইত, তখন শাখ-ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইতাম। ভক্তিরসে প্লাবিত হৃদয়ে শিব-সহচর ভূতদল তখন নৃত্য করিত। যেখানে আমি গিয়াছিলাম, সেখান পর্য্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত, ঘরের বালি খসিয়া পড়িত।" অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি বলিলেন "বটে হ্যা! আচ্ছা, বল দেখি, সেখানে শীত কি প্রকার?" আমি বলিলাম, "মহাশয়! সামান্য শীতে জল জমিয়া বরফ হয়। সেখানে এরূপ ঘোরতর শীত যে, বায়ু পর্য্যন্ত জমিয়া যায়।" আর সকলে যাঁহারা বসিয়াছিলেন, এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি হাসিলেন না, সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা এসকল তত্ত্ব কিছুই জান না, তাই হাসিতেছ; আমার অনেকটা জানা আছে, আমি পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছি, ইনি যাহা বলিতেছেন সে সকলই সত্য।"

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, শীতে যদি বায়ু জমিয়া যায়, তো লোকে রাস্তা চলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "সেখানকার স্ত্রীপুরুষের হাতে

কুঠার ও মাথায় আগুনের হাঁড়ি থাকে। কুঠার দিয়া বায়ু কাটিয়া কাটিয়া পথ চলিতে হয়; যে স্থানে বায়ু বড়ই কঠিন, সেখানে এই আগুনের তাত দিলেই কিঞ্চিত কোমল হয়, তখন কুঠার দিয়া অনায়াসেই কাটিতে পারা যায়। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বায়ু যদি এতই কঠিন হয়, তাহা হইলে লোকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লয় কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "হামান-দিস্তাতে বায়ু চূর্ণ করিয়া কৌটার ভিতর রাখিতে হয়, লোকে যেরূপ নস্য লইয়া থাকে, সেইরূপ মাঝে মাঝে কৌটা হইতে বায়ু চূর্ণ লইয়া নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইতে হয়।" গাঁজাপ্রিয় বন্ধু এরূপ অদ্ভুত কথা জনমে কখনও শুনেন নাই, এখন শুনিয়া আমার প্রতি তাঁহার বড়ই ভক্তি হইল। ভরসা করি, পাঠকদিগের মনেও আমার প্রতি সেইরূপ ভক্তির উদয় হইবে। বায়ু না জমিয়া যাউক, এখানে কিন্তু দারুণ শীত। শীতকালে চামর-গরুর চক্ষুর উপর বড় বড় লোম হয়, চক্ষুর উপর তাহা ঝুলিয়া থাকে, তাহাতে চক্ষু রক্ষা পায়। শীতে এই সময়ে নাক দিয়া ইহাদের জল পড়িতে থাকে, এই জল মাটীতে না পড়িতে পড়িতে জমিয়া যায়। অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ বেলোয়ারি কাচের নোলোকের মত নাকের আগায় ঝুলিয়া থাকে।

পালিত মেষের মত বন্য মেষ নিরীহ নহে। বন্য অবস্থায় ইহাদের বড় বড় শৃঙ্গ থাকে, সেই শৃঙ্গের গর্বে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুরন্ত বলশালী পশু-দিগকেও ইহারা গ্রাহ্য করে না। পরস্পর যুদ্ধের সময়ও মেষে ঘোরতর বীরত্ব প্রকাশ করে, ঢুঁ মারিয়া একেবারে মাথা ফাটাইয়া দেয়। কিন্তু খেলিবার সময় ছাগলের মত ইহাদের বড় ভাবভঙ্গী নাই। ছাগলে কেমন সম্মুখের পা দুটী তুলিয়া ঘাড় ও মাথাটী একটু বক্র করিয়া, চক্ষুতে কিঞ্চিৎ আধ আধ ভঙ্গী করিয়া এরূপ ভাব দেখায়, যেন একটী ঢুঁসেই ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া দুইখানা হইবে। কিন্তু সে কেবল আড়ম্বর সার, আঘাতের সময় শৃঙ্গেশৃঙ্গে কেবল একটু ঠেকাঠেকি হয়, তাই উদ্ভট কবি বলিয়াছেন,—

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

বন্য অবস্থায় মেষের গায়ে কেশ অধিক পরিমাণে থাকে, পশম অল্প থাকে। সে পশমও ভাল নয়। পালিত মেষের পশমের ন্যায় কোমল ও চিক্কণ নয়। ভাল ঘাস, ভাল জল খাইতে পাইলে এ সকল দোষ ক্রমে দূরীভূত হয়। পশুদিগের মধ্যে যাহাদের শাবক স্তন পান করে, মেষ সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত। ইংরেজিতে এই সম্প্রদায়কে 'ম্যামেলিয়া' বলে। ম্যামেলিয়ার ভিতর আবার যে পশুরা রোমন্থ চর্বণ করে অর্থাৎ জাবর কাটে, মেষ সেই জাতির অন্তর্ভূত। এইরূপ পশুর চারিটী পাকস্থলী থাকে। ইংরেজীতে ইহাদিগকে 'রিউমিনেটা' বলে। আবার রৌমন্থিক পশুদিগের মধ্যে মেষ ক্যাপ্রিডি দলভুক্ত। এই পশুদলের শৃঙ্গ খসিয়া যায় না, আর তাহাদিগের শৃঙ্গ একটী সামান্য অস্থি-প্রবর্দ্ধন হইতে নির্গত হয়। ক্যাপ্রিডির মধ্যে মেষ আবার অভিস শ্রেণীভুক্ত। অভিস শ্রেণী পশুদিগের শৃঙ্গ থাকিতেও পারে, আবার না থাকিতেও পারে। ইহাদিগের শৃঙ্গ—সম্মুখের দিকে যায় না, পার্শ্বে পশ্চাৎদিকে বৃদ্ধি পায়। পালিত মেষ-দিগের আদি পুরুষ কিরূপ পশু ছিল, তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। হিমালয়ের অপর পারে ও তাতার প্রভৃতি দেশে "আরগালি" নামক এক প্রকার বন্য মেষ আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজেরা এই মেষকে শীকার করিতে বড়ই ভালবাসেন, ইহাকে শীকার করিবার জন্য সেই নিদারুণ দেশে ঘোরতর ক্লেশও

ভোগ করিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন যে, এই আরগালি মেষই পালিত মেষদিগের পূর্বপুরুষ। কিন্তু পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সকলে একথা স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বলেন যে, 'আরগালি' মেষ পূর্বে গৃহপালিত ছিল, গৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া বন্য হইয়াছে, বনে বাস করিয়া ইহাদের স্বভাব-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, দীর্ঘ শৃঙ্গ ও বলশালী হইয়াছে, শরীরে পশমের স্থানে কেশের উৎপত্তি হইয়াছে। গৃহপালিত পশু বন্য হইয়া যাইলে ইহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যে বিলক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা আমরা চক্ষের উপরই দেখিতেছি। কলিকাতার সন্নিকট গ্রামসমূহে আজকাল যে বন্য-শূকরের উপদ্রব দেখিতে পাই, সেই বন্য-শূকর পূর্বে গ্রাম্য-শূকর ছিল। আশ্বিনে ঝড়ের বৎসর তাহারা রক্ষকদিগের হাত হইতে বনে পলায়ন করিয়া ক্রমে বন্য হইয়া পড়িয়াছে। যখন মানুষের ঘরে থাকিত, তখন তাহাদিগের এরূপ দীর্ঘ দন্ত, অপরিমিত বল, ও অসীম সাহস, ইহার কিছুই ছিল না। সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় এক্ষণে ইহাদিগের বল বিক্রম হইয়াছে।

সমুদয় ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রায় তিন কোটী মেষ আছে। পূর্বাপেক্ষা মেষের সংখ্যা এক্ষণে অনেক কমিয়া গিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনেক পতিত জমি এক্ষণে কর্ষিত হইয়াছে। সেকালে যেখানে গরু, ছাগল ও মেষ চরিত, এক্ষণে সে সমুদয় ভূমিতে শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে। পূর্বে যে সমুদয় বনে পালিত পশু চরিতে পাইত, বন-বিভাগের কঠিন নিয়মে এক্ষণে আর সেখানে চরিতে পায় না। এইরূপে গোচরভূমি যতই সংকীর্ণ হইতেছে, গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ততই কমিতেছে। যে সকল জাতিরা মেষ ছাগল প্রভৃতি পশু পালন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত, তাহাদের অনেকে হয় অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, আর না হয় ঘরদ্বার ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে। দক্ষিণের অনেক পশুপালকেরা এক্ষণে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, অযোধ্যার পশুপালকেরা নেপালে পলায়ন করিয়াছে। অল্পদিন পূর্বে ঐ জাতিদিগের বড়ই কষ্ট হইয়াছিল, এমন কি, অনাহারে অনেককেই দিনপাত করিতে হইত। এক্ষণে ইহাদিগের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের পশম পূর্বে বড় বিদেশে যাইত না। সুতরাং পশমমূল্য সুলভ ছিল। পশুপালকেরা দেশের লোকদিগকে পশম ও কম্বল প্রভৃতি বেচিয়া যাহা কিছু টাকা পাইত, তাহাতে তাহাদের উদরান্ন পর্য্যন্ত হইত না। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের পশম বিদেশে যাইতেছে, পশম মহার্ঘ্য হইয়াছে। তাই পশুপালকদিগের ঘরে এক্ষণে অন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশে বড় মেষের চাষ নাই। আর্দ্রভূমি মেষের পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। শুষ্ক-বায়ু-ভূমি সম্বলিত দেশই মেষদিগের পক্ষে হিতকর। বেহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবেই তাই অনেক মেষ প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলে যে জাতি, মেষ পালন করে তাহাদিগকে 'গাড়রীয়া' বলে। হিন্দি ভাষায় 'গাড়র' মেষের একটী নাম। ভেড়াও ইহার অপর নাম। তাই গাড়রীয়া জাতিকে ভেঁড়িহারও বলে। ইহারা যে, কেবল মেষ পালন করে, তাহা নহে ; মেষের দেহ হইতে পশম কাটিয়া তাহা দিয়া কম্বলও প্রস্তুত করে। গাড়রীয়ারা বোধহয়, গোপ-জাতির শাখাবিশেষ, তবে মেষ পালন ও কম্বল বুনন নীচ কার্য্য বলিয়া জাত্যংশে ইহারা কিঞ্চিৎ লাঘবপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক একজন গাড়রীয়ার নিকট কুড়ি হইতে পাঁচশত পর্য্যন্ত ভেড়া থাকে। যে পালটীতে কুড়িটী ভেড়া থাকে সে পালের নাম "লেন হর", যে পালটীতে একশত ভেড়া থাকে তাহার নাম "বসা"। যাহাতে চারিশত কি পাঁচশত ভেড়া থাকে তাহার নাম "গেহর"। গাড়রীয়ারা নিঃশব্দে মেষদিগকে চরায়। এ ভূমি হইতে সেভূমি

গাড়রীয়া লাঠি হাতে আস্তে আস্তে যায়। ভেড়াগুলি, আপনা-আপনি তাহার পাছে পাছে যায়, তাড়াইতে হয় না। তবে ছোট খাটো নদী পার হইবার সময় কিছু গোল। নদী পার হওয়া ভেড়াদের মনোমত কার্য্য নয়। জলের ধারে গিয়া তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে, এ বলে ও আগে যাউক, ও বলে সে আগে যাউক। তখন একটীকে ধরিয়া গাড়রীয়া জলে ফেলিয়া দেয়, একটী যাইলেই আর সকলে কোনও কথা না কহিয়া আপনা আপনি ঝুপঝাপ করিয়া গিয়া জলে পড়ে। মাঝে মাঝে নেকড়ে বাঘ, পালের উপর বড়ই উপদ্রব করে। গত কার্ত্তিকমাসে আমি জরাসন্ধ-মহাশয়ের রঙ্গভূমিতে রাজগৃহে গিয়াছিলাম। ব্রহ্মকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, মকদুমকুণ্ড প্রভৃতি নানা তীর্থে স্নানাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে একটী ধাঙলায় গিয়া বাসা লই। আমাদের সহিত অনেক লোক ছিল। লোকের কোলাহল দেখিয়া রাত্রিতে বাঘে উপদ্রব করিতে পারিবে না বলিয়া একজন মেষপালক পালের সহিত সেইখানে আশ্রয় লইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, মেষপালক কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। রাত্রিকালে একটী মেষকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। সমুদয় ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ গাড়রীয়ার বাস। ইহার মধ্যে বেহারে ও উত্তর-পশ্চিমেই অধিক। বেহারে ইহাদিগের সংখ্যা ৮৭ হাজার। উত্তর-পশ্চিমে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার। পঞ্জাব, রাজপুতানা ও মধ্য-প্রদেশে ইহাদিগের সংখ্যা অধিক নয়। মধ্য-প্রদেশের দক্ষিণে গাড়রীয়া জাতি একালে নাই বলিলেও হয়।

দক্ষিণপ্রদেশে অন্য জাতিতে মেষ-পালন করে। বোম্বাই অঞ্চলে এ জাতির নাম 'ধাঙগড়', মান্দ্রাজে ইহাদিগকে 'কুরুবার' বলে। পূর্ব্বকালে মধ্যপ্রদেশে আহীরেরা মেষ পালন করিত। এক সময়ে আহীরেরা ধনধান্য সম্পন্ন বিপুল প্রতাপশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহারা অনেক গো-মহিষ-মেষ প্রতিপালন করিত। অনেকগুলি দুর্গম দুর্গও ইহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। খান্দেশে আসা আহীরের নাম আজ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইহাঁর বিশ সহস্র মেষ ছিল। বদান্যতার জন্য লোকে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া গণনা করেন। আহীরেরা এক্ষণে কেবল গো-পালন করে, মেষ পালন করে না। মেষ পালন নীচ কার্য্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই অবধি কুলে-শীলে ইহাঁদিগের মর্য্যাদা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোম্বাই অঞ্চলে ধাঙগড় নামক জাতি মেষ পালন করে। সাহেবেরা এই ধাঙগড়দিগকে আমাদিগের ছোটনাগপুরের ধাঙগড়দিগের সহিত একজাতি বলিয়া পরিগণিত করেন। তাহা ভুল। ছোটনাগপুরের ধাঙগড়েরা অহিন্দু অসভ্য বন্য জাতি। বোম্বাইয়ের ধাঙগড়েরা জল—আচরণীয় সজ্জাতি হিন্দু। গোপজাতির নিম্নস্থ একপ্রকার শাখা মাত্র। "ধেম্বাট" হইতে বোধহয় ধাঙগড় নাম হইয়াছে। কায়স্থেরা যেরূপ ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, হাড়িরা যেমন ব্রহ্মার হাড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ধাঙগড়েরা সেরূপ ব্রহ্মার কোন অংশ হইতে বাহির হয় নাই। ধাঙগড়েরা বলে, শিবের পদরেণু হইতে তাহাদিগের আবির্ভাব হইয়াছে। ধাঙগড়েরা সুদীর্ঘ, বলশালী ও সাহসী। মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী যে সেনাদিগের বাহুবলে মুসলমান সাম্রাজ্য ছিন্ন বিছিন্ন করেন, এই ধাঙগড়েরাই সেই ভারতবিজয়ী সেনা। মেষ পালন করিয়াই ইহারা এক্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, মেষের পাল সঙ্গে লইয়া ইহারা দূর দূরান্তর গমন করে। যেখানে যতদিন ঘাস জল আদি মেষের খাদ্য থাকে, সেখানে ততদিন অবস্থিতি করে। ফুরাইয়া যাইলে পুনরায় আগে চলিতে থাকে। রাত্রিতে চাষাদিগের ক্ষেত্রে মেষদিগকে শয়ন করায়। মেষদিগের মলমূত্র ত্যাগে ভূমি সারবান হইবে বলিয়া কৃষকেরা

উহাদিগকে শস্যাদি প্রদান করে। প্রতি মেষের পালে ধাঙ্গড়েরা একটী কি দুইটী ছাগল রাখে। ছাগল সুবুদ্ধি। যেখানে খাবার মিলিবে, পথ দেখাইয়া আগে আগে সেইখানে যায়। মেষেরা গুটি গুটি তাহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। মেষের পালের সহিত কুকুরও থাকে। বিলাতে একপ্রকার "কলি"জাতীয় কুকুর আছে। সে কুকুর অতি চতুর। তাহারা পালের ভিতর মেষদিগকে একত্রে রাখিয়া দেয়, এ-খানে সেখানে যাইতে দেয় না। প্রভুর আদেশে মেষদিগের তত্ত্বাবধারণ করে। ধাঙ্গড়দিগের কুকুর কিন্তু সেরূপ নয়। ইহারা মেষদিগকে কোথায় যাওয়া উচিত, কোথায় না যাওয়া উচিত এ কথা বলিয়া দিতে পারে না। বন্য পশু হইতে মেষদিগকে রক্ষা করাই ইহাদের কার্য্য। সে কার্য্যে সময়ে সময়ে ইহারা প্রভূত পরাক্রম প্রদর্শন করে। ব্যাঘ্র, পালে আসিয়া পড়িলেও নির্ভয়ে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। কুকুরীর ছানা হইলে ধাঙ্গড়েরা তাহাদিগকে মা'র কাছ হইতে কাড়িয়া লয়। স্তন পান করাইবার জন্য মেষস্ত্রীদিগের হস্তে কুকুরছানাগুলিকে প্রদান করে। প্রথম প্রথম দুগ্ধবতী মেষিনী কুকুর ছানাকে স্তন পান করাইতে বড়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু দুই চারিদিন পরে তাহাদিগের প্রতি তাহার মমতা জন্মে। তখন স্নেহের সহিত স্তন পান করায়। কুকুরছানাগুলি যখন বড় হয়, তখন মেষ—মেষস্ত্রীদিগকে পিতৃকুল ও মাতৃকুল বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের রক্ষার জন্য অকুতোভয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করে। মেষস্ত্রী কর্তৃক কুকুরছানা প্রতিপালন একবার আমি অমরাবতীতে দেখিয়াছিলাম। চক্ষে দেখি নাই, কানপুরে একটী বানরী কর্তৃক কুকুর ছানা প্রতিপালনের কথা শুনিয়াছিলাম। বানরীর নবপ্রসূত শিশুটী মরিয়া গিয়াছিল। তবুও কয়দিন ধরিয়া মরা ছেলেটীকে কোলে করিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন এক-স্থানে অনেকগুলি কুকুরের বাচ্ছা হইয়াছে সে দেখিতে পাইল। তখন নিজের মৃত শিশুকে ফেলিয়া, একটী কুকুরের ছানা বুকে লইয়া গাছে গিয়া উঠিল। কুকুরছানা অতশত কি জানে? বানরীর স্তন পান করে, আর বড় হয়। বানরী কিন্তু ক্রমে বড়ই আশ্চর্য্য হইল। ছানা কোল ছাড়ে না কেন? ছানা গাছের উপর লাফালাফি করিতে শিখে না কেন? যাহা হউক, যতদিন বহিতে পারিল, ততদিন তাহাকে কোলে লইয়া গাছে গাছে বেড়াইল। কিন্তু যখন খুব বড় হইল, যখন খুব ভারি হইয়া উঠিল, তখন আর তাহাকে কোলে রাখিতে পারিল না, তখন ভূমিতে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কুকুর বানরীকে ছাড়িল না। বানরী গাছে, কুকুর মাটীতে। যেখানে বানরী যায়, সেইখানেই কুকুর যায়, আর গাছ পানে চাহিয়া, ঊর্দ্ধমুখে ডাকাডাকি করে। এই অদ্ভুত রহস্য দেখিয়া লোকের দয়া হইল। সকল লোকেই কুকুরকে খাবার দিতে আরম্ভ করিল। গাছতলায় খাবার দিয়া লোকে সরিয়া যাইত। তখন বানরী গাছ হইতে নামিয়া আসিত। কুকুরে ও বানরে সেই খাদ্য একসঙ্গে আহার করিত। যতক্ষণ বানরী না আসিত, ততক্ষণ কুকুর খাদ্যদ্রব্য স্পর্শও করিত না।

মেষ-মেষস্ত্রীদিগের সহিত ধাঙ্গড়েরা তাই কুকুরের এইরূপে প্রণয়-সঞ্চার করিয়া দেয়। খণার মত ধাঙ্গড়েরা মেঘ-ঝড়ের বিষয় আগে থাকিতেই বলিয়া দিতে পারে। চিরকাল ঘরের বাহিরে মাঠের মাঝখানে বাস করিয়া এ বিষয়ে তাহাদিগের বিলক্ষণ বুদ্ধুৎপত্তি জন্মায়। অপরাপর সাংসারিক বিষয়ে লোকে কিন্তু তাহাদিগকে বড়ই মূর্খ বলিয়া জ্ঞান করে। মেষের সহিত চিরকাল বাস করিয়া অনেকটা ইহারা মেষ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে এই কথা বলে। কোন বিষয়ে কেহ মূর্খতা প্রকাশ করিলে লোকে তাহাকে ধাঙ্গড়ের সহিত তুলনা করে। মারহাটী ভাষায় বলে—"ধাঙ্গড় বেদত্যাচে দোক্যাস্ত শিলে আহে।" অর্থাৎ কিনা—"ধাঙ্গড়ের পাগলামি ইহার মাথায় প্রবেশ করিয়াছে।" কিম্বা বলে "ত্যালা ধাঙ্গড় বেদ ল্যাগলে আহে।" ইহার অর্থ এই "ধাঙ্গড়ের পাগলামী তাহাকে পাইয়াছে।" পশুর সহিত দিবারাত্রি

বাস করিলে যে, কতকটা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, সেকথা নিতান্ত মিথ্যা নহে। কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জেলার গোঁড় গোয়ালারা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যে গয়লা যুবকগণ গরু লইয়া চিরকাল বাতানে থাকে, বিদ্যাবুদ্ধিতে তাহারা যে বেদব্যাসের মত পণ্ডিত নয় তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। পৃথিবীর বিষয় তাহারা কিছুই জানে না, একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। বিয়ে পাশ টেড়া মেজাজ বাবুদিগের মত কুলগুরু নবদ্বীপের গোস্বামীকে তাহারা যথাবিধি মান্য করে না। একবার শীতকালে একটী গরু গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধেরা অবশ্যই তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সম্মান করিয়াছিল। সন্ধ্যা হইল, গরুর ভিতরে চাদর দিয়া উপরে লাল বনাত গায়ে দিলেন, মাথায় চূড়া সংযুক্ত নাইট ক্যাপটীও পরিলেন। সাজগোজ করিয়া গোয়ালের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গোয়ালের কোণে ঘুটের আগুণের কাছে বসিয়া মনের সুখে আগুণ পোহাইতে লাগিলেন। এমন সময় গোপ-যুবক মাঠ হইতে গরুর পাল লইয়া ঘরে আসিল। গরু সকল গোয়ালের ভিতর প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে দেখে সেই অপরূপ রূপ। দেখিয়া যেদিকে দু-চক্ষু যাইল সেই দিকে সব গরু লেজ তুলিয়া ছুটিয়া পলাইল। গোপ যুবক মনে করিল গোয়ালে বুঝি বাঘ প্রবেশ করিয়াছে! গোয়ালের ভিতর গিয়া দেখে, সেই মূর্তি স্থির ভাবে বসিয়া আছেন, মনের সুখে আগুণ পোহাইতেছেন। তখন গোয়ালার আর রাগের সীমা নাই। গর্ভিনী গাভীদিগের অনিষ্ট হইবে, এই চিন্তায় রাগে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। লাঠি লইয়া সে গরুকে এই মারে তো এই মারে। বৃদ্ধগণ আসিয়া তাহাকে থামাইল। তাহাকে বলিল,—"ইনি গুরু, ইহাঁর অপমান করিতে নাই।" গোয়ালা-যুবক চুপ করিল। গুরু এতক্ষণ ভয়ে জড়সড় হইয়াছিলেন। এইবার তাঁহার রাগ চাগিল। ক্রোধে সর্বশরীর তাঁহার কম্পিত হইল, হাতে ধরিয়া পায়ে ধরিয়া কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। তিনি বলিলেন—"দুষ্টু ছোঁড়াকে আমি এই মুহূর্তে দণ্ড দিতেছি। ইহাকে এক্ষণে আমি রামগণ্ডির ভিতর দাঁড় করাইব।" গোয়ালা যুবককে তিনি একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। যুবক অবাক; প্রাণে তাহার ভড়ই ভয় হইল, মনে করিল,—কি ঘোরতর দণ্ডই না তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। গুরু ঢিল লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মাটিতে তাহাকে বেড়িয়া গোলাকার দাগ দিলেন, আর বলিলেন—"ইহার ভিতর তুই দাঁড়াইয়া থাক্।" গুরুর বাসনা এই যে, কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইবার পর গৃহস্থের নিকট কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবেন। যতক্ষণ মন্ত্র পড়া হইতেছিল, রামগণ্ডি দেওয়া হইতেছিল, গোয়ালা ততক্ষণ সভয়ে দাঁড়াইয়াছিল। মনে করিতেছিল, তাহার বুঝি প্রাণ বধের সমস্ত আয়োজন হইতেছে! কিন্তু আঁক-কাটা বই যখন আর কোনও গুরুতর ব্যাপার দেখিতে পাইল না, তখন তাহার মনে সাহস হইল। সে ভাবিল;—"গুরু মনে করিয়াছেন, আমি এই দাগ ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারি না।" এই ভাবিয়া সে বলিল—"ঈশ! আমি কত খানা, কত পগার ডিঙ্গাইয়াছি, আর তোমার এই দাগ ডিঙ্গাইতে পারি না বুঝি?" এই বলিয়া এক লাফে রামগণ্ডি পার হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যাইল। তবেই দেখ!! যাহারা রামগণ্ডিকে অমান্য করে, তাহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা কি করিয়া করি? গোবুদ্ধি ভিন্ন ইহাকে প্রখর নরবুদ্ধি বলিতে পারি না। মেষের পালের সহিত থাকিয়া যেরূপ ধাঙ্গড়দিগের মেষবুদ্ধি হয়, বাতানে গরুর পালের সহিত থাকিয়া অনেক গোয়ালাও সেইরূপ গোবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বোম্বাই প্রদেশে করড়া, পাঁচমহল প্রভৃতি স্থানে রবাড়ী, ভরওয়াড ও কমলীয়া জাতিরাও অনেক মেষ পালন করে। কাঠিওয়ারে রবাড়ী জাতি মেষ পালন করে না। গো পালন করিয়া ইহারা এক্ষণে উচ্চপদস্থ হইয়াছে। কাঠিওয়ারে ভরওয়াডেরা মেষ

পালন করে। কর্ষিত ভূমিকে পুনরায় গোচরভূমি করিবার নিমিত্ত ইহাদিগের মধ্যে এক আশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহের সময় ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করে। তাহাতে তাহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে ; কেন বলিতে পারি না। উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগের কিছু কাটিবার বাসনা হয়, কিছু না কাটিয়া থাকিতে পারে না। তাই তাহাদের পুরুষেরা পূর্ব্ব হইতেই একটী শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র কিনিয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা দুগ্ধ পানে উন্মত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া তবে সুস্থির হয়। সেই ক্ষেত্রে পুনরায় হাল কর্ষণ করিবার রীতি নাই। তাহা গোচর বা মেষচর হয়। ভরওয়াড়েরা গোকুলের নন্দ ঘোষের বংশ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। ইহাঁকে তাহারা নন্দ "ঘোষ" বলে না। নন্দ "মেড়" বলে। বলে নন্দমেড়ের ম্যাড়ার পালই অনেক ছিল, গরু তত ছিল না। এই অঞ্চলে মেড় বলিয়া আর একটী জাতি আছে। ভরওয়াড়েরা বলে যে, এই মেড়েরা তাহাদিগের জ্ঞাতি। মেড়েরা তাহা কিন্তু স্বীকার করে না। মেড়েরা আপনাদিগকে হনুমানের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা যে প্রকৃত হনুমানের বংশ তাহার সাক্ষ্য প্রমাণও অনেক দিয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটী প্রমাণ এই যে, বরাবর হইতে তাহাদের রাজবংশীয় সকলেরই লাঙ্গুল ছিল, লাঙ্গুল সহিত তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিতেন। আজ অল্পদিন হইল রাজবংশীয় সন্তানগণ আর সলাঙ্গুল জন্মগ্রহণ করেন না। তাহারা বলে যে, কলিকালের পাপের নিমিত্ত রাজবংশে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

দক্ষিণের পুনা, আমদনগর প্রভৃতি জেলায় 'কুনরী' বলিয়া এক প্রকার জাতি আছে। এই কুনরীরা অনেক মেষ পালন করিয়া থাকে। শাক-সবজী উৎপাদন করাই কুনরীদিগের প্রকৃত জাতীয় ব্যবসা। শাক-সবজী উৎপাদনে সারের প্রয়োজন ; মেষের মলমূত্র অতি তেজঃশালী সার ; সেই জন্যই তাহারা মেষ পালন করে। মেষ হইতে যে পশম প্রাপ্ত হয়, তাহা অধিকন্তু লাভ। দক্ষিণের পূর্ব্বদিকে যাইলেই আমরা ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজ প্রদেশে উপস্থিত হই। এখানে যে জাতি, মেষপালন করে, তাহাদিগের নাম 'কুরুবার'। অনেক স্থানে কুরুবারেরা সভ্য-ভব্য হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। আবার, কোনও কোনও স্থানে তাহারা বনে বাস করে, অসভ্য বন্য জাতিদিগের মত তাহাদিগের ব্যবহার। মহীসুর ও নীলগিরি পর্ব্বতে অনেক বন্য কুরুবার দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটস্থ অপরাপর বন্য জাতিদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, কুরুবারেরা মন্ত্র-তন্ত্র মারণ-উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি যাদুবিদ্যায় অতি পারদর্শী। তাই সকলেই তাহাদিগকে ভয় করে ও শস্যাদি নানাবিধ উপঢৌকন দ্বারা তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করে। বন্য কুরুবারদিগের নিকট 'বড়াগা' নামক আর একটী জাতি বাস করে। বর্ষারম্ভে প্রথম ক্ষেত্র কর্ষণের সময় কুরুবারদিগের দ্বারা একবার চাষ দিয়া লয়। সংস্কার এই যে, এরূপ করিলে ক্ষেত্রে উত্তম শস্যের উৎপত্তি হয়। মেষ পালন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া যেখানে কুরুবারেরা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, সেখানে আজ পর্য্যন্ত ইহারা গণ্য-মান্য হইতে পারে নাই। নীচ জাতি বলিয়াই তাহারা পরিগণিত হয়। অনেক স্থানে কিন্তু তাহারা সৎজাতি হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার যথাবিধি প্রতিপালন করে। বিজাপুর জিলায় তাহারা ক্রমে সম্ভ্রান্ত জাতি হইয়া উঠিতেছে। এখানে কুরুবারেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বিবাহের সময় এক সম্প্রদায় তুলার সূতা হাতে করিয়া বিবাহ করিতে যায়, তাই তাহাদিগকে 'হাতিকঙ্কণ' বলে। অপর সম্প্রদায় পশমের সূতা হাতে পরিয়া থাকে, তাই তাহাদিগকে 'উণিকঙ্কণ' বলে। যদিও একজাতি, তথাপি এই সূতাপরা লইয়া মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকস্থলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আহারাদি ক্রিয়া একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। বিজাপুর জিলায় কুরুবারেরা অনেক মেষ পালন

করে। একটী একটী পালে পাঁচ ছয়শত করিয়া মেষ থাকে। ধাঙ্গড়দিগের মত, কুরুবারদিগের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য বিষয়ে দক্ষিণ দেশে নানারূপ পরিহাস উক্তি প্রচলিত আছে। সেখানেও লোকের বিশ্বাস এই যে, মেষদিগের সহিত দিবারাত্রি সহবাস করিয়া কুরুবারেরা কতকটা মেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

হিমালয়ের উপর 'গড্ডি' নামক একপ্রকার জাতি আছে। তাহারাই সে অঞ্চলের মেষ-পালক। হিমালয়ের অতি উচ্চ প্রদেশে, তিব্বতের কোলে, বরফান পাহাড়ে, 'চম্বা' নামক যে একটী সামান্য দেশীয় রাজ্য আছে, গড্ডিদিগের বাস সেইখানে। গড্ডিদিগের মেষ ও ছাগলের বড় বড় পাল আছে। এক একটী পালে তিনশত হইতে বার শত করিয়া পশু থাকে। গ্রীষ্মকালে বাটীর সন্নিকট পর্বত সমূহে প্রচুর পরিমাণে তৃণাদি প্রাপ্ত হয়, সেইখানেই তখন তাহারা স্ব স্ব পাল চরায়। কিন্তু শীতকালের প্রারম্ভে এই অঞ্চলে, আকাশ হইতে বরফ পড়িতে থাকে। অল্পকাল মধ্যেই সমুদয় পর্বতশ্রেণী একেবারে অনেক হাত গভীর তুষারে আবৃত হইয়া যায়। তখন মেষ ছাগলের খাদ্য আর সেখানে পাওয়া যায় না। তাই গড্ডিরা তখন পাল লইয়া নিম্নস্থ পর্বতসমূহে নামিতে থাকে। যেমন শীত গভীর হইতে থাকে, ইহারাও সেই অনুসারে নিম্ন হইতে নিম্নতর পাহাড়ে নামিতে থাকে। নামিতে নামিতে ক্রমে পঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের একেবারে দক্ষিণ-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাল চরাইতে চরাইতে এতদূর আসিতে প্রায় চারি পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়া যায়। ইত্যবসরে শীতকালও কাটিয়া যায়। বসন্তকাল আসিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত হিমালয়ের পর্বত সমূহ ক্রমে নবপল্লবে নব-তৃণে সজ্জিত হইতে থাকে। সেই নবপল্লবের, সেই নব-তৃণের সঙ্গে সঙ্গে গড্ডিরাও পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। যাইতে যাইতে গ্রীষ্মকালে গিয়া ঘরে উপস্থিত হয়। সেখানে আবার কয়েকমাসের জন্য প্রচুর পরিমাণে তৃণাদি প্রাপ্ত হয় ও পরিবারাদির মধ্যে আসিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের পাল চরায়।

গড্ডিরা মেষদিগকে অতি যত্নে প্রতিপালন করে। পালে যতই কেন মেষ থাকুক না, প্রতি মেষই তাহাদিগের পরিচিত। একটী হারাইয়া যাইলে তখনই তাহারা জানিতে পারে ; আর তৎক্ষণাৎ তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। পালের সহিত গড্ডিরা কুকুর পুষিয়া থাকে। কিন্তু বিলাতী কুকুরের মত এ-কুকুর মেষদিগকে পথ প্রদর্শন করে না। হিংস্রক পশুদিগের উপদ্রব হইতে কেবল তাহাদিগকে রক্ষা করে। চিতাবাঘ এখানে মেষপালের পরম শত্রু। অনেকদিন ধরিয়া চুপি চুপি তাহারা মেষপালের অনুসরণ করে। এক আধটী মেষ কোনও প্রকারে পাল ছাড়া হইলেই চকিতের ন্যায় তাহার উপর গিয়া পড়ে, আর তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। ভল্লুকেরা উদ্ভিজ্জজীবী। কিন্তু কখনও কখনও এরূপ ঘটনা হয় যে, পর্বত-প্রদেশ বরফে আবৃত হইয়া উদ্ভিজ্জ আহারের একবারেই অনটন হয়। তখন জঠরানলে ভল্লুকেরা নিতান্তই কাতর হইয়া পড়ে। তাহাদিগের আর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। জীবজন্তু ধরিয়া খায়। ক্ষুধার জ্বালায় একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া দিনের বেলাই পালের মাঝে গিয়া পড়ে। কুকুর মানে না, মনুষ্য মানে না, কিছুই মানে না। মেষদিগকে বন্য পশু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গড্ডিরা কাছে বন্দুক রাখে না। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, বন্দুকের শব্দ শুনিলে বন-দেবতারা রাগ করিবেন। বনদেবতারা রাগ করিলে প্রাচীন প্রথানুসারে পালে মহামারী উপস্থিত করিয়া দেন। কিন্তু ভারতের সকলেই আজকাল ক্রমশঃ প্রাচীন প্রথাসমূহ ছাড়িয়া দিতেছেন। বনদেবতারাও কতকটা ছাড়িয়াছেন। গড্ডিদিগের উপর অপরিতুষ্ট হইলে মেষপালে কেবল মহামারী উপস্থিত করিয়াই এখন আর তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন না। যখন মেষপাল পাহাড়ের গায়ে অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে থাকে, সেই সময়ে

ছাগলের পালের উপর লক্ষ্য করিয়া উপর হইতে এক আধটী বড় বড় প্রস্তর গড়াইয়া দেন, তাহাতে শত শত মেষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার হিমালয় প্রদেশে এক প্রকার বরফের নদী আছে। ইহাকে 'গ্লেসীয়ার' বলে। অতি দীর্ঘ অতি গভীর অতি প্রকাণ্ড স্রোতাকার নদীর মত বরফরাশিকে গ্লেসীয়ার বলে। সিন্ধু, গঙ্গা প্রভৃতি নদ নদী এইরূপ গ্লেসীয়ার হইতেই উৎপন্ন। গড়িয়া যখন পাল লইয়া হিমালয়ে ভ্রমণ করে, তখন স্থানে স্থানে এইরূপ অনেক গ্লেসীয়ার পার হইতে হয়। গ্লেসীয়ারের মাঝে মাঝে ফাটা থাকে। এই ফাটাকে ক্রেভিস বলে। এই ফাটা অতলস্পর্শ। গঙ্গোত্তরীর নিকট একবার এইরূপ একটী ভয়াবহ ক্রেভিস অতি কষ্টে পার হইয়াছিলাম। মনে করিলে আজও শরীর শিহরিয়া উঠে। ক্রেভিসের ভিতর পড়িলে আর রক্ষা নাই। বনদেবতার রাগ করিয়া যখনও কখনও আগের মেষটীকে এইরূপ একটী ফাটার ভিতর পড়িতে প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। আগের মেষটী পড়িলেই পালের সমস্ত মেষ সকলেই গিয়া তাহার ভিতর পড়ে। পালটী একেবারে সমূলে ধ্বংস। শুনিয়াছি যে, একবার সাতশত মেষ এইরূপ একটী ফাটায় পড়িয়া মরিয়া যায়। সেই ভয়ে গড়িয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া বনদেবতাদিগের ক্রোধভাজন হইতে বড়ই ভয় করে।

ভারতবর্ষে প্রায় তিন কোটী মেষ আছে। কিন্তু কোন্ প্রদেশে কত আছে, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশে মেষের সংখ্যা অল্প; যেহেতু এখানকার জলবায়ু মেষ-পালনের উপযোগী নয়। যেহার অঞ্চলে অনেক মেষ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখানকার বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং এখানে চরিবার স্থান দুর্লভ নহে। শীত ও গ্রীষ্মকালে গঙ্গা, শোণ, গণ্ডক প্রভৃতি নদ-নদীর গর্ভে যে চড়া বাহির হয়, মেষেরা সেই চড়ায় চরিয়া বেড়ায়। বর্ষাকালে যে সকল ক্ষেত্রে নীল-বপন হইয়াছে, মেষেরা সেই নীলক্ষেত্রে চরিতে পায়। প্রথমাবস্থায় নীলক্ষেত্রে মেষ চরিলে, ফসলের কোনও অপকার হয় না। সত্তর বৎসর পূর্বে মারটিন্ সাহেব অনুমান করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, পাটনা ও শাহাবাদ জিলায় প্রায় ৪৫,০০০ মেষ আছে। মারটিন্ সাহেব বোধহয় ভুল করিয়াছিলেন,—এই দুই জিলায় মেষের সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক অধিক। জয়ন্তীপুরের আবট সাহেব সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, একা তাঁহার জমিদারীতেই এক লক্ষ মেষ আছে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মেষ ও ছাগলের সংখ্যা ৪৫ লক্ষেরও অধিক, আর অযোধ্যা-প্রদেশে ইহার সংখ্যা প্রায় আঠার লক্ষ। গো-চর ভূমির অভাবে এক্ষণে মেষের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। যমুনার দুই কূলে, ভগ্ন-ভূমিতে, যাহাকে 'খাদিড়' বলে, যেখানে অন্য ফসল উৎপন্ন হয় না, এখন সেইখানেই কেবল মেষ ও ছাগল অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কুমাউন গঢ়ওয়ালেও অনেক পতিত ভূমি আছে। বর্ষাকালে এই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস হয়। সে ঘাস খাইয়া অনেক মেষ প্রতিপালিত হইতে পারে। কিন্তু শীতকালে বড় কষ্ট। সমুদয় পার্বত্যভূমি তুষারে আবৃত হইয়া যায়। সেই সময় উদ্ভিজ্জভোজী পশুদিগের আহারীয় সামগ্রীর অতিশয় অনটন হয়। বাণ বৃক্ষের বাকল ও তুঁতগাছের পাতা লোকে শুকাইয়া রাখে, তাহাই তখন মেষদিগকে খাইতে দেয়। কিন্তু তাহা সুখাদ্য নহে, তাহা খাইয়া ধড়ে কেবল প্রাণটী মাত্র থাকে, শরীর অস্থিচর্ম-সার হইয়া যায়। আবার বসন্তের আগমনে পাহাড়ে যখন পুনরায় ঘাস হয়, তখন তাহা খাইয়া মেষেরা অল্পদিনের মধ্যেই বলশালী ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া উঠে।

পঞ্জাবে ষাট লক্ষের অধিক মেষ আছে। হিমালয়ে ও কাবুলের নিকটবর্তী জিলাসমূহে ইহার সংখ্যা অধিক। কুলু, লাহুল, স্পিটি, রামপুর প্রভৃতি পার্বত্য-প্রদেশে লোকে মেষ লইয়া এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে যায়। গ্রামে মেষ আসিয়াছে

শুনিয়া গ্রামবাসীরা মেষপালকদিগের নিকট হইতে পশম কিনিতে যায়। যাহার যেরূপ প্রয়োজন, মেষপালকেরা তদনুসারে গ্রামবাসীদিগকে মেষের গাত্র হইতে পশম কাটিয়া দেয়। পশমের বিনিময়ে গ্রামবাসীরা জনার, গোধূম প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী তাহাদিগকে প্রদান করে। সেই খাদ্যসামগ্রী মেষের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া মেষ-পালকেরা তাতারে গমন করে। সেইখানে এই খাদ্যসামগ্রী অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। এই প্রকারে রামপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পশম একত্রীভূত হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের পশ্চিমাংশে শাপুর ও ডেরাইসমাইল খাঁ জিলায় বাড় ও থল নামক ভূমি আছে। এই ভূমি বহু বিস্তৃত, এখানে ফসল হয় না। মৃত্তিকা ফলশালী, কিন্তু জল নাই। পাঞ্চাশ ষাট হাত গভীর কুপ খনন করিলে জল মিলিতে পারে; কিন্তু সে জল অতিশয় বোদা। এজন্য বাড় ভূমিতে শস্য উৎপন্ন করিতে পারা যায় না। ইহাতে ছোট ছোট বন্যবৃক্ষ আপনা-আপনি হয়, আর বর্ষার প্রারম্ভে ঘাসও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সেজন্য বাড় ভূমির উপর বহুসংখ্যক মেষ প্রতিপালিত হয়। থল ভূমি লবণ পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাতেও কোনও প্রকার কৃষিকার্য্য হয় না। এই বিস্তৃত প্রান্তর দেখিতে ঠিক সমুদ্রের ন্যায়, কেবল জলের তরঙ্গ না হইয়া, ইহার উপর বালুকার তরঙ্গ ক্রীড়া করে। বালুকা-তরঙ্গের মধ্যে মধ্যে কঠিন ভূমি আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মে। পাঁচ লক্ষ মেষ এই ঘাস খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। মেষ-পালনই এখানকার লোকের একমাত্র উপজীবিকা। মেষপালকেরা পূর্বে হিন্দু ছিল, এক্ষণে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের প্রতি তাহাদিগের ঘোরতর বিদ্বেষ। তাহারা বলে, "হিন্দু শব্দের অর্থ 'দাস' আর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, লোকে আপনাদিগকে ক্রীতদাস বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না।" ডেরা ইসমাইল খাঁ বনু প্রভৃতি জিলার লোকেরা সেদিন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগকে পাগড়ি মাথায় দিতে দিত না। "হিন্দু" শব্দ "সিন্ধু" হইতে উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব; কিন্তু আরব্য, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের লোকেরা এই নামটী ভারতবাসীদিগকে দিয়াছিলেন। সেই দেশের লোকেরা বলেন যে, 'হিন্দু' শব্দের অর্থ "ক্রীতদাস"। এই নিমিত্ত দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্যগণ ও ভারত-ধর্ম-মণ্ডলের সভ্যগণ হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রাজপুতানার নানা স্থানে অনেক মেষ পালিত হইয়া থাকে। রাজপুতানার মেষে অতি সুন্দর পশম হয়। বিকানির রাজ্যে প্রায় নয় লক্ষ মেষ আছে, যোধপুরে আড়াই লক্ষ, জয়পুরে আড়াই লক্ষ, যসলমীড়ে দুই লক্ষ, সিরোহিতে এক লক্ষ ইত্যাদি। বোম্বাই প্রদেশে তিন লক্ষ মেষ আছে, বেরারে চার লক্ষ, মহীশুরে দুই লক্ষ ও মাদ্রাজে দশ লক্ষ। ভারতবর্ষে মেষের দুই জাতিই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণের মেষ,—যাহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, আর দুম্বা মেষ,—যাহা কাবুলের নিকটবর্তী স্থানে প্রতিপালিত হয়। মেরিণো প্রভৃতি বিলাতি মেষ আনিয়া এদেশে পশমের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত অনেকবার যত্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু সে যত্ন সফল হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে আমরা অষ্ট্রেলিয়া হইতে কাণপুরে একটী মেড়া আনিয়াছিলাম। মেড়াটী আমরা দেড় সহস্র টাকায় কিনিয়াছিলাম।

বৎসরের মধ্যে মেষের গা হইতে পশম দুইবার কাটিতে হয়, বসন্তে ও শরতে। প্রতিবার গড়ে আধ সের করিয়া পশম বাহির হয়, সুতরাং বৎসরে প্রতি মেষ হইতে এক সের করিয়া পশম হয়। এই হিসাবে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর সাড়ে সাত লক্ষ মণ পশম উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া বিদেশ হইতেও ভারতবর্ষে অনেক পশম আনীত হয়। বিদেশীয় পশম আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতেই অধিক আমদানি হয়। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার পশম আনীত হয়। ভারতবর্ষে যে পশম উৎপন্ন হয় ও বিদেশ হইতে যাহা এখানে

আনীত হয়, তাহার কতক অংশ এ দেশে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকার পশম বিদেশে রপ্তানি হয়। ইতিপূর্বে এ দেশ হইতে পশম বিদেশে প্রেরিত হইত না। এখানকার পশম নিকৃষ্ট বলিয়া বিদেশে ইহার কেহ ক্রেতা ছিল না। রপ্তানি ব্যবসা আরম্ভ হইয়া মেষপালকদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ঝঙ্গ প্রভৃতি জিলায় মেষ-পালকেরা পূর্বে খাইতে পাইত না। আজকাল মেষ-পালিকাদিগের হাতে সোণার বালা হইয়াছে। পঞ্জাব অঞ্চলের মেষ-পালকেরা পূর্বে একমণ পশম বেচিলে আট টাকার অধিক পাইত না, এক্ষণে তাহারা একমণ পশম বেচিয়া সাড়ে আঠার টাকা পায়। ভারতবর্ষ হইতে যে পশম বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহার অধিকাংশ বিলাতবাসীরা ক্রয় করেন। ইহা হইতে তাঁহারা গালিচা, আসন ও কম্বল প্রস্তুত করেন। প্রতি বৎসর বিলাতে প্রায় দেড় কোটী মণ পশমের খরচ। এই পর্বত-সদৃশ পশম-রাশির অধিকাংশ অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিলাতে গিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ায় ইংরেজদিগের কীর্তির কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ১০৪ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। যেরূপ আণ্ডামানদ্বীপে ভারতবর্ষের যাবজ্জীবন-কারাবাসিগণ প্রেরিত হয়, সেইরূপ ইংলণ্ড হইতে দ্বীপান্তরিত দুষ্টগণ তখন অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হইত। অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশই তখন জনশূন্য ছিল। অতি অল্পসংখ্যক অসভ্য অধিবাসীরা কেবল তখন এখানে বাস করিত। সেই অধিবাসীদিগের মাথার উপর ঘর ছিল না, দেহে বস্ত্র ছিল না, উদরে অন্ন ছিল না। উদরের জ্বালায় অনেক সময়ে তাহাদিগকে পোকা মাকড় খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইত। অষ্ট্রেলিয়ার তখন এইরূপ অবস্থা ছিল; কিন্তু যাই সেখানে জনকতক ইংরেজ গমন করিলেন, আর দেশের অবস্থা অমনি পরিবর্তিত হইল। প্রথম প্রথম যে সকল ইংরেজ সেখানে গমন করে, তাহারা অতি নীচজাতীয়, আর অতি কঠোর অপরাধে অপরাধী; কেহ বা হত্যাকারী, কেহ বা চোর, এইরূপ; কিন্তু সেই জনকত নীচজাতীয় ইংরেজের বিক্রমে অতি অল্পকালের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইল। চারিদিকে বড় বড় নগর হইল, রেল হইল, তার হইল, জাহাজ হইল, নানা দেশ হইতে কোটী কোটী টাকা অষ্ট্রেলিয়ায় আমদানি হইতে লাগিল। অধিক দূর যাইতে হইবে না আমাদের এই দেশেই ইহাঁরা যেরূপ উদ্যম, উৎসাহ ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। একদল সওদাগরের জন পাঁচ-ছয় গোমস্তা, বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন!

ভারতবর্ষে যে পশম থাকিয়া যায়, তাহা হইতে কম্বল, লুই, শাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিলাতে যেরূপ ভাল কম্বল হয়, এ দেশে সেরূপ ভাল কম্বল হয় না। সেইজন্য ভাল কম্বল এ দেশে বিলাত হইতে আমদানি হয়। এ দেশের পশম হইতে যে ভাল কম্বল হইতে পারে না, তাহা নহে। পরিশ্রম করিলে এ দেশের পশম হইতে বিলাতি কম্বল প্রস্তুত হইতে পারে। মিরট জিলায় মিরপুর বলিয়া একটী স্থান আছে। পূর্বকালে এখানে এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট কোমল কম্বল প্রস্তুত হইত। সে কম্বলের নাম ছিল 'সাঁসলা'। মেষ-শাবক তিন-চারি দিনের হইলে তাহার গাত্র হইতে পশম কাটিয়া এই কম্বল প্রস্তুত হইত। এক্ষণে আর এরূপ কম্বল হয় না, আর সেখানকার লোকে এখন ইহার নাম পর্য্যন্তও ভুলিয়া গিয়াছে। পঞ্জাবে নুরপুর বলিয়া একটী স্থান আছে, সেখানে এখন উত্তম কম্বল হয়। স্থূল কথা, ভারতবর্ষে যে কম্বল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি নিকৃষ্ট। দুঃখীলোকেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। হিন্দু সাধুদিগের যেরূপ গেরুয়া বসনটী না হইলে চলে না, পশ্চিমাঞ্চলে সেইরূপ মুসলমান ফকিরদিগের কম্বল না হইলে শোভা পায় না। রাজাদের রাজ্য পিপাসা কিছুতেই

নিবৃত্ত হয় না, এই কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত সেখ সাদি বলিয়াছেন ;—"দহ দরবেশ দর গলীমে বখুস্পদ। ও দো বাদশাহ দরইকলিমে ন গুঞ্জন্দ।"

দশজন ফকির একখানি কম্বলে শুইতে পারে, কিন্তু দুইজন রাজার এক দেশে সংকুলান হয় না।

ভাল পশমের এই কয়টী গুণ থাকা আবশ্যক—(১) কোমলতা, (২) স্থিতি-স্থাপকতা, (৩) সূক্ষ্মতা। এতদ্ব্যতীত পশম সব সমান দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। এ দেশের পশমে কিন্তু এ সকল গুণ ভালরূপে নাই। 'পশম ভাল করিব' এদেশের মেষ-পালকের মনে এ চিন্তা কখনও উদয় হয় নাই। অনেক স্থানে জলবায়ুর দোষে পশম ভাল হইবার সম্ভাবনাও নাই। অল্পদিন হইল, সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, কোনও কোনও লোক মধ্যপ্রদেশে মেষ পালন করিবার কল্পনা করিতেছেন। পশম যাহাতে ভাল হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্নবান হওয়া আবশ্যক। যে জলে চূণের ভাগ অধিক আছে, সে জল পশমের পক্ষে বিশেষ অহিতকর। আর মেষের খাইবার নিমিত্ত ভাল ঘাসের চাষ করা আবশ্যক। ভূমিতে গন্ধক সংযুক্ত সার দিয়া ঘাসের চাষ করিলে, বিশেষ উপকার লাভ হইবার সম্ভাবনা। পশম পদার্থটীর প্রায় কুড়ি ভাগের এক ভাগ গন্ধক দিয়া নির্মিত। সুতরাং মেষের আহারীয় দ্রব্যে গন্ধকের পরিমাণ কিছু অধিক থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষের পশমের আর একটী দোষ এই যে, ইহাতে অনেক কেশ মিশ্রিত থাকে। বন্য মেষের শরীরে পশম না হইয়া কেশের ভাগই অধিক হইয়া থাকে। বন্য অবস্থায় মেষের কেশের মূলে অতি সামান্যভাবে পশমের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের যত্নে কেশগুলি ক্রমে খসিয়া যায়, তলভাগের পশমগুলি তখন বাড়িতে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়াছে যে, পুরুষ-মেষের গাত্রে কেশের পরিবর্ত্তে পশমের উৎপত্তি অতি শীঘ্র হয়, মেষী-গাত্রে তত শীঘ্র হয় না। এক-পুরুষে বন্য মেষের গাত্র হইতে সমুদয় কেশ অন্তর্হিত হইয়া পশমের আবির্ভাব হয় না। ক্রমে ক্রমে অনেক পুরুষে তবে এই ভাবান্তরটী সম্পূর্ণভাবে ঘটিয়া থাকে। যত্ন করিয়া এইরূপে কঠিন পশমের স্থানে কোমল পশম করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের মেষ-পালকেরা কিন্তু নিতান্ত মূর্খ। সময়ের পরিবর্ত্তনের কথা তাহারা কিছুই জানে না। ভারতবর্ষে যে পশম উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে যে ৩০ লক্ষ টাকার পশম বিদেশে প্রেরিত হয়, একথা তাহারা কি করিয়া জানিবে? আর অল্প পরিশ্রম করিলে এখন যে কয়মণ পশম ৩০ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়, তাহাই ৪৫ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইতে পারে, তাহাও তাহারা জানে না। এই সকল বিষয়ে আমি যে প্রবন্ধ লিখিতেছি, তাহা যে, অরণ্যে রোদন হইতেছে, তাহা আমি বিলক্ষণরূপ জানি। তবে এই মনে করি যে, বীজ বপন করিয়া যাই, একদিন না একদিন ফল ফলিবে।

অল্পদিন হইল, তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে পশম আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিব্বতের সহিত গোলমালে এখন কিছু কমিয়া গিয়াছে। তিব্বতের পশম, রজ্জুর আকারে এখানে আসিয়া থাকে। কলিকাতার দুই-চারিজন লোক তাহা খরিদিয়া, তাহার পর সেই পশম ধুইয়া বিলাতে প্রেরণ করেন। শুনিতে পাই, এ কার্য্যে তাঁহাদিগের দু-পয়সা লাভ হইতেছে। এরূপ শুনিয়াছি যে, চুংগ থুংগ উপত্যকায় অসংখ্য মেষ প্রতিপালিত হয়। খরিদ্দার নাই বলিয়া তাহার পশম লোকে ফেলিয়া দেয়। মেষ মারিয়া, তাহার মাংস শুকাইয়া মেষ-পালকেরা বিক্রয় করে। এক একটী শুটকী মেষের মূল্য আট আনা। শুটকী মেষের যদি কাহারও প্রয়োজন থাকে, তাঁহারা সিকিমের উত্তর কম্বলায় গিয়া কিনিয়া আনিবেন।

কম্বল, লুই প্রভৃতি বস্ত্র ব্যতীত, পশম হইতে এদেশে নমদা বলিয়া এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। নমদা করিতে হইলে পশমের সূতা কাটিয়া বুনিতে হয় না। পশম জমাইয়া নমদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, এক এক গাছি পশমের গায়ে শাখা-প্রশাখার ন্যায় অনেক-গুলি দাড় আছে। অনেকগুলি পশম একত্র করিয়া, চাপ দিলে এই দাড়ে দাড়ে লাগিয়া জমিয়া যায়। জমিয়া গিয়া যে কম্বলের মত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকে নমদা বলে। এই প্রকারে প্রস্তুত, কিন্তু একপ্রকার বাসায়নিক পোদায় বলে। রাজ-পুতানা অঞ্চলে চকমা, ঘামি প্রভৃতি নানাপ্রকার কাপড় পশম হইতে প্রস্তুত হয়।

এই প্রবন্ধ যখন আরম্ভ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, বিলাতে পশম হইতে কি প্রকারে কাপড় হয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিব। কিন্তু এ কার্য্যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিষ্কার করিয়া সেই কলের কথা লিখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সাধারণে যাহা বুঝিতে পারিবেন না, এরূপ কথা লেখায় কোনও ফল নাই। কলকব্জার কথা ক্রমে ক্রমে হইবে। সেইজন্য এক্ষণে ক্ষান্ত রহিলাম।

এরণ্ড বা রেড়ি

সূচনা ॥ অনেকদিন ধরিয়া এদেশে রেড়ির কার্য্য ভালরূপে চলিতেছিল। রেড়ির চাষ, রেড়ির ব্যবসা, রেড়ির তেল প্রস্তুত, এইরূপ নানা কার্য্যে সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছিল। এই সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিদেশ হইতে এ দেশে অনেক অর্থের সমাগম হইতেছিল। এক্ষণে এই ব্যবসার অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা দেশের মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন, জাতীয় ধনোৎপত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এ কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই দুঃখিত হইবেন। কিন্তু কেবল দুঃখ করিলে চলিবে না। যথাশক্তি প্রতিবিধান করা আবশ্যক। যে রূপ রোগোৎপত্তির কাল হইতেই সুচিকিৎসক, তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইয়া থাকেন, সেইরূপ জাতীয় ধনের উপর কোনওরূপ আক্রমণ হইলেই তাহার নিবারণের উপায় করা আবশ্যক। রোগ-নির্ণয় ও প্রতিকার করিতে যেরূপ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষরূপ জ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন ; সেইরূপ জাতীয় ধন সম্পর্কে কোনও রূপ প্রতিবিধান করিতে হইলে, কৃষি-নীতি, অর্থ-নীতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। সেজন্য আমি এই রেড়ির বিষয় কিছু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিব। কার্য্যে কিছু হউক না হউক, পাঠকদিগকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারিলেও আমি আমার পরিশ্রম সফল বলিয়া মানিব।

নাম ॥ অতি প্রাচীন কাল হইতে রেড়ির ব্যবহার এ দেশে প্রচলিত ছিল। সেইজন্য সংস্কৃত ভাষায় ইহার অনেক নাম। ইহার আকার, ইহার গুণ, ইহার শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্দ্ধন, এই সকল ধরিয়া ইহার নানারূপ নাম হইয়াছে। রাজনির্ঘণ্ট পুস্তকে ইহার এইরূপ পর্য্যায় প্রদত্ত হইয়াছে—ব্যাঘ্র-পুচ্ছ, গন্ধর্ব্ব-হস্ত, উরুবূক, রুবূক, চিত্রক, চঞ্চু, পঞ্চাঙ্গুল, মণ্ড, বর্দ্ধমান, ব্যাড়ম্বক, রুবূক, রুবক, বুক, অমণ্ড, আমণ্ড, ব্যাড়ম্বন, কান্ত, তরুণ, শুক্ল, বাতারি ও দীর্ঘপত্রক। ভারতীয় আধুনিক ভাষা-সমূহেও রেড়ি নানা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদিগের

কিন্তু অধিকাংশই এরণ্ড নামের রূপান্তর মাত্র। যথা—হিন্দী ভাষায় ইহাকে অরণ্ড, রাণ্ড বলে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে ভেরেণ্ডা বলে। সাঁওতালি, এরডম। আসামি, এড়ি। নেপালি, অরেটা, লেপচা, রকলোপ। মগধী রেড, লেড়, অণ্ড। উড়িয়া, গাব, গোণ্ড, মেরিণ্ডা। মারহাটী, এরেণ্ড। তেলেগু, এরামনডপু। তামিল, অমনক্কম, কোটিমনটু। কর্ণাটি, হরালু। ব্রহ্ম, কেশু। সিংহলি, এণ্ডারু। চীন, পীমা। পুস্ত, অরহণ্ড। পারস্য, বসাঞ্জির, বেদাঞ্জির। আরব্য, খিরওয়া ইত্যাদি। প্রাচীনকালে অন্য দেশেও রেড়ির ব্যবহার লোকে জানিত। প্রাচীন মিসর ভাষায়, যাহা এক্ষণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাকে 'কি কি' বলিত। সেকালে মিসর দেশে মনুষ্যের মৃতদেহ অতি যত্নে রক্ষিত হইত। মৃতদেহের উদরে মসলা ও গন্ধদ্রব্য দিয়া, পাথরের সিন্দুকের ভিতর উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া লোকে গোর দিত। মিসরের বায়ু অতি শুষ্ক বলিয়া সে দেহ পচিয়া যায় নাই। যে সকল মনুষ্য তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্বে জীবিত ছিল, তাহাদিগের দেহ এখনও শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। লোকে তাহা কুড়াইয়া লইয়া যাদুঘরে রাখিয়াছে। এই শুষ্ক দেহকে 'মমী' বলে। যে বাক্সে মমী থাকে, তাহাকে সারকোভেগস (Sarcophagus) বলে। মমীর সঙ্গে এই বাক্সের ভিতর নানারূপ দ্রব্য থাকে। কাপড় থাকে, ভূর্জপত্রের ন্যায় লেখা কাগজ (Papyri) থাকে, আবার গমও থাকে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিন হাজার বৎসরের এই গম লইয়া লোকে চাষও করিয়াছে, সে গম হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, ফলও হইয়াছে। এই সিন্দুকের ভিতর লোকে রেড়ির বীজও প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, অতি প্রাচীনকালে মিসর দেশের লোকে রেড়ির ব্যবহার জানিত। মিসর দেশে ইহার যথাবিধি চাষ হইত, এ কথা হেরোডোটাস, প্লিনি, ডিওডোরাস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন মিসর ভাষায় রেড়ির নাম 'কি কি' ছিল বলিয়া, লাটিন ভাষায়ও এই নাম পরিগৃহীত হইয়াছিল। লাটিন ভাষায় কিন্তু ঐ নাম শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর ইহার নাম হয় রিসিনস্ (Ricinus)। রিসিনস্ একজাতীয় পোকার নাম। রেড়ির ফলের সহিত এই পোকার সাদৃশ্য থাকায়, ইহার এইরূপ নাম হইল। উদ্ভিদ বিদ্যায় অড়র গাছের নাম রিসিনস-কমিউনিস (Ricinus communis)। সেকালে বিলাতে রেড়ির একেবারে ব্যবহার ছিল না। শোভার জন্য বাগানে লোকে এ-খানে ও-খানে দুটী একটী গাছ পুতিত। তিনশত বৎসর পূর্বে টরনার সাহেব নামক একব্যক্তি ইহার তেল বাহির করিয়া তেলের নাম ওলিয়ম কিকিনম ভেল রিসিনিয়ম (oleum cicinum vel ricininum) দিয়াছিলেন। জিরারড সাহেব নামক আর একজন পণ্ডিত ইহার নাম ওলিয়ম কিকিনম বা ওলিয়ম দে চেরুয়া (oleum cicinum or oleum de cherue) দিয়াছিলেন। সেকালে ইহার পামাকৃষ্ট জিরাসোল প্রভৃতি আরও অনেক নাম ছিল। যাহা হউক, ইংরেজি ভাষায় রেড়ির ক্যাষ্টর (castor) নামই এক্ষণে প্রসিদ্ধ। একশত বৎসর পূর্বে জ্যামেকা দ্বীপে রেড়ির অনেক চাষ হইত। সেখানে পোর্ত্তুগিজ ও স্পেন দেশীয় অধিবাসীরা ইহাকে ক্যাষ্টো (casto) বলিয়া ডাকিত। ভাইটেক্স অ্যাগনস ক্যাসটস (vitexa gnus castus) বলিয়া একটী ওষধীর গাছ আছে। তাহারা মনে করিত, ঐ গাছও যা, আর রেড়ির গাছও তা। তাই তাহারা রেড়িকে ক্যাষ্টো বলিত। যখন রেড়ি বিলাতে আমদানি হইতে আরম্ভ হইল, তখন সেখানকার বণিকেরা ক্যাষ্টো নামকে ক্যাষ্টর করিয়া তুলিলেন।

নিবাস ॥ কোন দেশে রেড়ির আদিম বাসভূমি তাহা লইয়া উদ্ভিদ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে বড়ই গোল। কেহ বলেন, ভারতবর্ষই ইহার আদি বাসস্থান।

কেহ বলেন আফ্রিকা। যেমন বন্য পশু ধরিয়া লোকে গো, মহিষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতিকে পোষা পশু করিয়াছে, সেইরূপ বন্য বৃক্ষ তৃণাদির চাষ করিয়া মনুষ্যে উৎকৃষ্ট ফল ফুল আবির্ভূত করিয়াছে। সকল পশুই এককালে অরণ্যবাসী ছিল, সকল গাছই এককালে বন্য ছিল। একদল পণ্ডিতেরা বলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় রেড়ির নানা নাম, সুতরাং রেড়ির আদিবাস ভারতভূমি। সেখান হইতে জাতি-কুল বিসর্জ্জন দিয়া, হিন্দুধর্ম্ম না মানিয়া, রেড়ি নানা দেশে গমন করিয়াছে। স্থলপথে একদিকে আটক পার হইয়া রেড়ি বেলুচিস্থান, পারস্য, তুরস্ক, আরব্য, আফ্রিকা, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছে। অপরদিকে নানা বন, নানা নদ-নদী, নানা গিরি অতিক্রম করিয়া রেড়ি,—ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম এবং চীন গিয়াছে। আবার সমুদ্র যাত্রা করিয়া মহাসাগর-মধ্যস্থিত নানা-নাম-ধারী দ্বীপ-পুঞ্জে, এমনকি আমেরিকাতেও আজ রেড়ি বিরাজ করিতেছে। এই হইল এক সম্প্রদায় মুনির মত। আর অপর সম্প্রদায় মুনিরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যদি রেড়ির আদিবাস ভারত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় কোনও না কোনও বনে ইহাকে বন্য অবস্থায় দেখিতে পাইতাম। সত্য বটে, হিমালয় প্রদেশের কোনও কোনও স্থানে ইহাকে বেল, কতবেল, কমলা, সোঁদাল প্রভৃতি বৃক্ষের সহিত একত্রে বনবাসী হইয়া থাকিতে দেখিতে পাই, কিন্তু সে রেড়ি প্রকৃত বন্য নহে। গৃহপালিত বিড়াল প্রভৃতি পশু যেরূপ মনুষ্য-সহবাস পরি-ত্যাগ করিয়া বন্য হইয়া যায়, এ রেড়িও সেইরূপ উদাসীন ভাবাপন্ন কৃষিজাত রেড়ি মাত্র। বলা বাহুল্য যে, অনেক বৃক্ষ, যুগ যুগান্তর ধরিয়া মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, সুবিধা পাইলে পুনরায় বন্য হইয়া যায়। কলিকাতার নিকট 'নোনা' নামক যে ফলটী আমরা দেখিতে পাই, তাহা বিদেশ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। আদি বাসস্থানে ইহা অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখানে আসিয়াও বহুদিনাবধি মানুষ ইহাকে আদর করিয়াছিল। এখন আর ইহার সে আদর নাই। মনের দুঃখে ইহা ক্রমে বন্য হইয়া পড়িতেছে। এখন ফল যাহা হয়, তাহা আর পূর্ব্বের ন্যায় সুমিষ্ট ও সুস্বাদু নহে। এখন ফল বীজে পরিপূর্ণ, শাঁসে কর-কোরে দানা, খাইতে গা শিহরিয়া উঠে। এখন নোনা গাছ বনে দেখিতে পাই বলিয়া, ভারত যে নোনার আদি বাসস্থান এ কথা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সেইরূপ হিমালয়ের দুই একস্থানে রেড়িকে বন্য অবস্থায় দেখিতে পাই বলিয়া ভারত যে রেড়ির আদি বাসস্থান, একথা স্বীকার করিতে পারি না। এই গেল অপর সম্প্রদায় মুনিদিগের মত। যাহা হউক মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। মুনিদিগের মতিভ্রম হয়, তা বলিয়া আমার মতিভ্রম হইতে পারে না? আমি যদি এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাই, তাহা হইলে জানিবে যে, আমারও মতিভ্রম হইয়াছে। তাই এ তর্কের কোনও রূপ একটা উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। এ বিষয় বিশেষ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিবার যাঁহাদের অবসর আছে, তাঁহারা ডিকাণ্ডোল সাহেবের ফরাসি গ্রন্থ পাঠ করিবেন। পুস্তকখানির ইংরেজি নাম Origin of Cultivated Plants.

জাতি ॥ আমাদের একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য উদ্ভিদ আছে। অতএব নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বা চিহ্ন এবং সৌসাদৃশ্য ধরিয়া তৎসমুদয় শ্রেণি, জাতি, বর্ণ, গণ, প্রকার ইত্যাকারে বিভক্ত না হইলে উদ্ভিদ সকলের বিশেষ বিশেষ স্বভাব কখনই জ্ঞাত হইতে পারা যাইত না, এবং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিবরণ হইতে অপরের গোচর করিতে পারা যাইত না।" ষোল বৎসরের অধিক হইল ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে উদ্ভিদ-বিদ্যা তখনও যে ভাবে

ছিল, আজও সেইভাবে রহিয়াছে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। আমরা দুঃখী মানুষ, পেটের চিন্তায় সর্বদা পাগল। কিন্তু ধনবান লোকের ছেলেরা কেন এই সকল বিষয় আলোচনা করেন না? উদ্ভিদ-শাস্ত্র, রাসায়ন-শাস্ত্র, তাড়িত-শাস্ত্র এইরূপ নানা শাস্ত্রের চর্চ্চা ও পরীক্ষা লইয়া থাকিলে যে কত আনন্দলাভ হয়; তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন। মন উন্নত হয়, চিন্তাশক্তি গভীর হয়, পদে পদে ঈশ্বরের অসীম মহিমা উপলব্ধি করিয়া নীচ প্রকৃতিগত সাংসারিক সামান্য সুখের উপর অভক্তি জন্মে। বালককাল হইতে এইরূপ শাস্ত্র-চর্চ্চায় ক্রমে মন নিয়োজিত করার রীতি এদেশে প্রচলিত নাই বলিয়া আমরা ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিশেষ কোনও ফল লাভ করি না। রাগ করিবেন না। আমি ধনবান ব্যক্তিদিগকে বলি যে, তাঁহারা মহাভারত রামায়ণ প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, সে উত্তম কার্য্য। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, তিনি যে দেশের কত উপকার করিবেন, তাহা বলিতে পারি না।

যাহা হউক, উদ্ভিদ-শাস্ত্রের আলোচনা নাই বলিয়া রেড়ি কোন শ্রেণী কোন জাতিভুক্ত, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিব না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যে ইউফরবিয়েসি (Euphorbiaceae) বলিয়া এক প্রকার জাতি আছে, রেড়ি সেই জাতিভুক্ত। এই ইউফরবিয়েসি জাতির ভিতর বড় বড় গাছ হইতে অল্পকায় সামান্য ওষধী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতিতে প্রায় তিন সহস্র উদ্ভিদ আছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে কেবল ৩২৩টির পরিচয় পাইয়াছি। সচরাচর এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে দুগ্ধবৎ রস নিঃসরণ হয়, তাহা হইতে রবার প্রস্তুত করিতে পারা যায়। মনসা গাছ তাহার দৃষ্টান্ত। ইহাদের এক ফলের ভিতরেই পরাগ প্রকৃতি থাকে না, ভিন্ন ফলে এইরূপ লক্ষণভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় কোনও কোনও বৃক্ষের দুগ্ধবৎ আটা ভয়ানক বিষময়। অনেকগুলির আটা ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। বিরেচক, বমনকারক, মাদকারক প্রভৃতি তাহা নানা প্রকার। জয়পাল, আমলকী, মনসা, কমীলা প্রভৃতি বৃক্ষ ইউফরবিয়েসি জাতির অন্তর্গত।

রেড়ি, ইউফরবিয়েসি জাতির রিসিনস পরিবারভুক্ত। উদ্ভিদশাস্ত্রে ইহার নাম রিসিনস কমিউনিস (Ricinus Communis)। রেড়ি গাছ, নানাস্থানে নানারূপ আকার ধারণ করে। কোনও স্থানে ইহা বিশ ত্রিশ হাত উচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অনেকদিন জীবিত থাকে, আবার কোথাও বা ইহা সামান্য ওষধীরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়। সচরাচর ইহা সাত আট হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। কাণ্ড ফাঁপা, চিক্কণ, গোলাকার, লোমশূন্য। উপরিভাগে ঈষৎ রক্ত বর্ণ, পত্র বিপর্য্যস্ত (Olternate), অর্থাৎ ওবার্টর পর আর একটী পত্রের বৃন্ত দীর্ঘ, বক্র, গোলাকার, ঈষৎ রক্তবর্ণ। পত্র ঈষৎ নিম্নমুখ, উপত্রণ সংযুক্ত, ছয় হইতে আট ইঞ্চ দীর্ঘ, বহু ভিন্ন পুষ্পগুচ্ছক, পুংকেশর ও গর্ভকেশর ভিন্ন ফুল থাকে। ফল ত্রিকোষ, কাঁটাযুক্ত। পক্কাবস্থায় ষড়্ভাগে বিভক্ত হইয়া বীজ নির্গত হয়। বীজ গোলাকার, চেপ্টা সিকি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চ দীর্ঘ, সিকি হইতে ২ এর ৫ ইঞ্চ প্রস্থ, ১ এর ৮ ইঞ্চ স্থূল, চিক্কণ, রেখা বিশিষ্ট, নানাবর্ণে রঞ্জিত।

সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা এরণ্ডকে দুই বর্ণে বিভেদ করিয়াছেন, শ্বেত ও রক্ত। হেকিমি মতে রক্তবর্ণের রেড়িই অধিক ফলদায়ক বলিয়া পরিগণিত। উদ্ভিদ শাস্ত্রমতে রেড়ি বড় ও ছোট এই দুইবর্ণে বিভক্ত। বড় দানাকে ফ্রক্টস মেজর ও ছোটদানাকে ফ্রক্টস মাইনর বলে (Fructus major and minor)। অনেকের

মত এই যে ছোট দানা হইতে ভাল তেল প্রস্তুত হয়; কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চয়তা নাই।

মোকাম ॥ যে হাটে কি গঞ্জে, কি রেলওয়ে ষ্টেশনে, কি সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগরে, রেড়ি জমা হইয়া কলিকাতায় বা অন্যস্থানে প্রেরিত হয়, তাহাকে মোকাম বলে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রেড়ি ভিন্ন গুণসম্পন্ন। কোনওস্থানের রেড়ি বড় কোনও স্থানের রেড়ি ছোট। কোনও স্থানের রেড়ির খোসা পাতলা, কোনও স্থানের রেড়ির খোসা পুরু। কোনও স্থানের রেড়ি হইতে ঘন তেল বাহির হয়, কোনও স্থানের রেড়ি হইতে পাতলা তেল বাহির হয়। কোনও স্থানের রেড়ির তেল পরিষ্কার ও শুভ্র বর্ণ। কোনও স্থানের রেড়ির তেল অপরিষ্কার, গাঢ় ও ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ। কোন স্থানের রেড়িতে অধিক তেল বাহির হয় কোনও স্থানের রেড়ি হইতে কম তেল বাহির হয়। এই সকল গুণ ধরিয়া রেড়ির মূল্য ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্থানবিশেষে রেড়ির এত অধিক ইতর বিশেষ হইয়া পড়ে। এমনকি অতি নিকটস্থ দুই স্থানের রেড়ি সমান হয় না। অনেকস্থলে নদীর এক পারে একরূপ রেড়ি হয় অপর পারে অন্যরূপ। যে মোকাম হইতে রেড়ির আমদানি হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবাপন্ন রেড়ি, সেই মোকামের নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে একশত প্রকারেরও অধিক রেড়ি আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল রেড়িকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—(১) যে সকল রেড়ি উপরদেশ অর্থাৎ ভাগলপুর, বেহার ও উত্তরপশ্চিম হইতে আমদানি হয়। (২) যাহা সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান হইতে আইসে। উপর দেশের রেড়ির মধ্যে কয়েকটীকে প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। পীরপৈঁতি, কহলগাঁ, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর মকয়া, রামনগামা, মথুরাপুর, বিসনি, রেভেলগঞ্জ, সিতারা, রসলপুর, বখতীয়ারপুর, জুমাই, দারভাঙ্গা, রোশড়া, বীরপুর, ইটেয়া, হাজ্রাস ইত্যাদি। সমুদ্রকূলবর্ত্তী রেড়ির মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান—পোর্টনভো, মান্দ্রাজ, মসলিপাটাম, কোকোনাডা, ব্রজবাহা, কটক, বালেশ্বর ও মেদিনীপুর। উপর দেশের রেড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে, পীরপৈঁতিরই রেড়ি ভাল বলিয়া পরিগণিত, তাহার নীচে কহলগাঁ, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর ও মকয়া। সমুদ্রতীরবর্ত্তী রেড়ির মধ্যে পোর্টনভো সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পোর্টনভোর উত্তর কোকোনাডি রেড়ি কলিকাতা বন্দরে আমদানি হয় না। পোর্টনভোর নীচে মান্দ্রাজ। মসলিপাটাম ও এই পাহাড়গুলি স্থানে যে রেড়ি হয় তাহা ঐ তিনের রেড়ির অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

চাষ ॥ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই রেড়ির চাষ হইতে পারে, কিন্তু পাটনা অঞ্চলেই ইহার অধিক চাষ হয়। কৃষকেরা এখানে তিন প্রকার রেড়ির চাষ করিয়া থাকে, যথা ভাদোই, বাসন্তী বা সালাক এবং চনাকি। প্রথমটী অন্যান্য শরিফ বা বর্ষাকালের ফসলের সহিত উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাই ইহার ভাদোই নাম হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম জল পড়িলে কৃষকেরা ইহার ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বুনিয়া দেয়। মাঘমাসে ইহার ফল পরিপক্ক হয়। ভাদোই রেড়ির দানা বড়, কিন্তু খোসা স্থূল। ভাদ্র অশ্বিন মাসে বাসন্তী রেড়ির বপন হইয়া থাকে ও চৈত্র মাসে ইহার ফল পরিপক্ক হয়। চনাকি রেড়ির বড় অধিক চাষ হয় না। ইহার ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়, আর বীজ দূরে গিয়া ছিটকাইয়া পড়ে, তাই ইহার এরূপ নাম হইয়াছে। চনাকি রেড়ির দানা ভাল, কিন্তু বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক নষ্ট হয়, লোকে তাই ইহার বড় অধিক চাষ করে না। ভাগলপুর প্রভৃতিস্থানে চনাকি রেড়ির গাছ তিনবৎসর পর্য্যন্ত কৃষকেরা রাখিয়া দেয়। কিন্তু প্রথম বৎসরে যেরূপ ফল হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে সেরূপ হয় না। তারপর

গাছ মরিয়া যায়। নদীর ধারে দোঁয়াস জমিতেই রেড়ি ভালরূপ জন্মে। রেড়ির চাষে কোনরূপ বিশেষ পরিশ্রম নাই। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া, দেড় হাত কি দুই হাত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। কোনও কোনও স্থানে লোকে দুই হাত অন্তর কেবল একটী ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতেই বীজ বপন করিয়া দেয়। বুনিবার সময় বীজের মুখের দিক নীচে রাখিতে হয়। এক বিঘা বুনিতে পাঁচ সের বীজ যথেষ্ট। আট নয় দিনে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন মাঝে মাঝে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিলে রেড়ির বিশেষ উপকার হয়। তাহা যদি না হয়, তবে নিড়াইয়া দিলেও চলিতে পারে। অর্থাৎ কি না গোড়াগুলি একটু আলগা থাকে। আর ঘাসে কি অপর কোনও গাছে ইহাকে চাপিয়া না ধরে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মাঝে মাঝে লাঙ্গল দেওয়া ও গোড়া আলগা করিয়া দেওয়ার আরও উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা আশেপাশের ছোট ছোট শিকড় কাটিয়া যায়, তাহাতে গাছ লম্বা হইয়া উর্দ্ধমুখে বাড়িতে পারে না, তখন ইহার প্রতি গাঁ'ট হইতে শাখা প্রশাখা বাহির হইতে থাকে। উর্দ্ধমুখে দীর্ঘ হইয়া বাড়িয়া উঠিলে, মাথায় কেবল একগুচ্ছ ফল হইবে, অধিক হইবে না। আর চারিদিকে শাখা প্রশাখা হইলে, প্রতি শাখায় দুইতিন থোলো করিয়া ফল হইবে। এক এক গুচ্ছে ২৫ হইতে ৩০টী করিয়া ফল থাকে, প্রতিফলে তিনটী করিয়া বীজ থাকে। যদি অপর কোনও ফসলের সহিত ইহার চাষ করা হয়, তাহা হইলে সেই ফসলের পাটের সঙ্গে সঙ্গে রেড়িরও পা'ট হইয়া যায়। এক্ষণে বঙ্গদেশের যে যে বিভাগে রেড়ির চাষ করিবার প্রথা প্রচলিত নাই, সেই সেই স্থানে কৃষকেরা যদি ক্ষেত্রের চারিধারে সা'র করিয়া রেড়ি বুনিয়া দেয়, তাহা হইলে ক্ষেত্র-মধ্যস্থিত অন্য ফসলকে এই গাছ বড় হইয়া রক্ষা করিতে পারে, আর বিনা ব্যয়ে বিনা পরিশ্রমে রেড়ি হইতে কৃষকদিগের কিছু কিছু লাভ হইতে পারে। পোস্তর ঢেড়ি চিরিয়া, রতি রতি আটা জমা করিয়া, দেখ কত সহস্র মণ আফিম জন্মিতেছে। দেশ আমাদের এত বড়, যে কোনও বস্তু অল্প অল্প করিয়া জমা করিলেও বৃহৎ কাণ্ড হইয়া পড়ে। সেইরূপ, যেখানে লোকে যা বুনুক না কেন? উচ্চ ভূমিতে, আশে পাশে অব্যবহার্য্য স্থানে—গুটিকতক রেড়ির গাছ পুঁতিয়া দিলে, জাতীয় ধনের উন্নতি হইতে পারে। এইরূপ উচ্চতর ভূমিতে, এখানে ওখানে যদি প্রতি বিঘায় এক আনা মূল্যেরও রেড়ির বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গদেশে যেখানে আজ এক পয়সা হইতেছে না, সেখানে পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা লাভ হইতে পারে। রেড়ির ফল 'পাকো পাকো' হইয়া আসিলে কৃষকদিগের ছেলেরা দেখিতে থাকে, কোন থেলোটীর বীজ এক আধটী ফাটিয়া বাহির হয়। থেলোর এক আধটী ফল ফাটিলেই সমস্ত থেলোটী কাটিয়া লইতে হয়। তারপর থোলোগুলি ঘরের ভিতর ছায়াতে রাখিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ফল সংগ্রহ হইলে, যখন গাছগুলি ফল-শূন্য হইয়া পড়ে, তখন সংগৃহীত ফল সকল একত্র করিয়া একটী গর্ত্তের ভিতর রাখিতে হয়। অল্প জলে কিঞ্চিৎ গোবর গুলিয়া সেই জল ইহার উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। তারপর হয় একখণ্ড মাদুর না হয় গুন দিয়া তাহা চাপা দিতে হয়। তিনদিন পরে ফল-গুলিকে বাহির করিয়া রৌদ্রে দিয়া অল্প পিটিলেই সমুদয় খোসা বীজ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। কিন্তু বুনিবার নিমিত্ত যে বীজ রাখিতে হইবে, তাহা এরূপ করিলে চলিবে না। তাহাতে জল-আছড়া দিয়া শুকাইলে রসে ও উত্তাপে বীজ-নিহিত অঙ্কুরের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। বীজের জন্য যে রেড়ি রাখিতে হইবে, তাহার ফল দুইতিনদিন রৌদ্রে শুকাইয়া একখণ্ড তক্তার উপর রাখিয়া পিটিয়া খোসা পৃথক করিয়া লইতে হইবে। এক বিঘায় একেলা রেড়ির চাষ করিলে

চারি হইতে বার মণ রেড়ি উৎপন্ন হইতে পারে। উৎপত্তিস্থানে রেড়ি সচরাচর দুই কি তিন টাকা মণ এই মূল্যে বিক্রীত হয়। কলিকাতার বাজারে রেড়ি তিন হইতে চারি টাকা মণ হিসাবে বিক্রয় হয়। ক্ষেত্রে রস থাকিলে রেড়ির বারমাসই চাষ হইতে পারে।

ভাগলপুর, মুঙ্গের, মালহদা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে পাঁচ প্রকার রেড়ির চাষ হইয়া থাকে, যথা—মুঠীয়া, ঝোকিয়া, চনাকি, গোহুমা ও ভাদোইয়া। প্রথম চারি প্রকার রেড়ির অগ্রহায়ণ মাসে বুনন হইয়া থাকে, চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহাদের ফল সংগৃহীত হয়। ভাদোইয়া রেড়ির জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনন হয়; অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ইহার ফল সংগৃহীত হয়। রেশমের জন্য যেখানে তুঁতের চাষ হয়, সেইখানে অনেকস্থানে ক্ষেত্রের আলের উপর, লোকে রেড়ি বুনিয়া দেয়। যশোহর জিলায় দুইপ্রকার রেড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, খুদে ও বাঘা। খুদে অবশ্য ছোট, আর বাঘা বড়। খুদে বনে-বাদাড়ে আপনা-আপনি হয়, কেহ ইহার চাষ করে না, ইহার ফলও কেহ কুড়ায় না। বাঘা, লোকে খেতের ধারে বুনিয়া দেয়। গাছ বড় হইলে ইহা একপ্রকার বেড়ার মত হইয়া ভিতরের ফসলকে গরু বাছুর হইতে রক্ষা করে। পূর্বদেশে রেড়ির বড় চাষ হয় না। কখনও কখনও হরিদ্রার সঙ্গে লোকে ইহা বুনিয়া থাকে। কিশোরগঞ্জ, জমালপুর, নেত্রকোণা প্রভৃতি স্থানে ক্ষেত্রের ধারে ধারে রেড়ি গাছের সা'র দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি সুসঙের বনে না—কি অনেক রেড়ির গাছ আপনা-আপনি জন্মে। লোকে কিন্তু ইহার ফল আহরণ করে না। বীজ গাছ-তলায় পড়িয়া পচিয়া যায়। গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতার বাজারে কখনও কখনও এক প্রকার ক্ষুদ্র রেড়ির আমদানি হয়। তাহার কিন্তু বড় আদর নাই।

মেদিনীপুর জিলায় সুবর্ণরেখা ও দোলঙ্গ নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে রেড়ি জন্মে। বালেশ্বর ও কটকেও রেড়ি হইয়া থাকে। উৎকল ভাষায় রেড়িকে গাব বা জড় বলে। প্রধানতঃ রেড়ি এখানে দুই জাতিতে বিভক্ত, বড় ও ছোট। বড়কে উড়িয়া ভাষায় বড়-গাব আর ছোটকে চুনি-গাব বলে। বড় গাবের আবার দুইটী ভেদ আছে, যথা পাতা-জড় আর কলা-জড়। ছোট জাতিরও দুইটী ভেদ, চুনি ও হহুরি। বড় গাবের গাছ প্রায় আট হাত উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পত্র ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ। ছোট-গাব তিন চারি হস্তের অধিক উচ্চ হয় না, ইহার পত্র হরিদ্রা-বর্ণ। বপন করিবার পূর্বে উৎকলবাসীরা, বীজ তিন চারি দিন জলে ভিজাইয়া রাখে। পূর্ব দেশেরও কোনও কোনও স্থানে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকল স্থানেই রেড়ির চাষ হয়। লোকে ইহাকে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে বুনিয়া থাকে। ক্ষেত্রের পার্শ্বে ইহার পংক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। খরিফ ফসলের ক্ষেত্রেও মাঝে-মাঝেও রেড়ি গাছ থাকে। কৃষকেরা তাহার কাছে লোবিয়া অর্থাৎ বরবটি ও সিম গাছ পুতিয়া দেয়। এই দুই লতা রেড়ি-গাছের উপর গিয়া উঠে, সুতরাং কৃষকেরা এককালে দুইটী দ্রব্য লাভ করে। বাহিরে আদর করুক, অন্তরে কিন্তু এখানকার কৃষকেরা রেড়ি-গাছকে ঘৃণা করে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, রেড়ি-গাছ জাতি কুল বিসর্জন দিয়া, জাহাজে চড়িয়া, বিলাতে গিয়াছে। এ কথাটী বুঝিয়া সুঝিয়াই বলিয়াছি। সকলের এ কথাটী স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যেমন মনুষ্যদিগের জাতিভেদ আছে; গাছদিগেরও সেইরূপ জাতি আছে। গাছদিগের মধ্যে নারিকেল অশ্বত্থ হইতেছেন ব্রাহ্মণ, রেড়ি জাতিতে চামার। সুতরাং রেড়ির ঘরে যখন কোনও কাজ কর্ম হয়, তখন নারিকেল অশ্বত্থ নিমন্ত্রণে আসেন না। তবে গোপনে পুরোহিতগিরি করেন কিনা, আর চা'লটে কলাটার পুঁটলি বাধেন কিনা তাহা বলিতে সাহস

করি না। যেহেতু আজকাল সকলেই অর্থডক্স-হিন্দু। আমিও অর্থডক্স, মহাশয়ও অর্থডক্স, আর হানিফ সেখও অর্থডক্স। সাহেবেরা বলিয়াছেন যে, "সেই যে মারা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলে, ঝুঁকে-ঝুঁকে সেলাম করে, পেট বাজায় আর কাঁদিয়া বলে, 'সাহেব খেতে পাই না,' আমরা সেই অর্থডক্স কেলাশকে বড়ই ভালবাসি।" তাই মহাশয়! আমরা আজ সকলেই অর্থডক্স। সে যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় শুনুন। মানুষ-চামারে আর বৃক্ষ-চামারে কিছুমাত্র সম্ভব নাই; তাতি শত্রু কিনা! মানুষ-চামার বৃক্ষ-চামারের ডাটাকে বড়ই ভয় করেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস এই যে, রেড়ির ডাটাটীর বাড়ি যদি কেহ তাঁহাকে ধস্ করিয়া এক ঘা মারে, তাহা হইলে তাঁহার জীবন সংশয় হইবে। পাঠকগণ! যখন আপনারা চামারের দোকানে জুতা কিনিতে যাইবেন, তখন একগাছি রেড়ির ডাঁটা হাতে করিয়া যাইবেন। তাহার ফল দুই প্রকার হইতে পারে। হয়, মা'র খাইয়া আসিবেন, না হয় জুতা সস্তা পাইবেন। পঞ্জাবে বড় অধিক রেড়ির চাষ হয় না। এখানকার দারুণ শীতে রেড়ি-গাছ মরিয়া যায়। "পালা" রেড়ির পরম শত্রু। শীতকালে রাত্রিতে শিশির জমিয়া যে সাদা-সাদা নুনের মত হয়, তাহাকে 'পালা' বলে। ইংরেজিতে ইহাকে ফ্রষ্ট (Frost) বলে, বাঙ্গালায় কি বলে তা জানি না।

বোম্বাই অঞ্চলে, সুরাট, আহ্মদনগর প্রভৃতি স্থানে রেড়ির চাষ হয়। রেড়ির গাছ দুই প্রকার, বড় ও ছোট। ইক্ষু, পান প্রভৃতি ক্ষেত্রের চারিদিকে লোকে বড় জাতির গাছ পুতিয়া দেয়। প্রচুর পরিমাণে জল ও সার পাইয়া এই জাতীয় রেড়ি উচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, আর অনেকদিন জীবিত থাকে। কিন্তু ইহার তেল ভাল নয়। অপরিষ্কার ও ঘন। জ্বালাইবার কাজ ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যে লাগে না। ছোট জাতীয় রেড়ি, লোকে অন্যান্য খরিফ ফসলের সহিত বুনিয়া থাকে। ইহার গাছ বাৎসরিক, অর্থাৎ এক বৎসরেই ফল ফলিয়া মরিয়া যায়। ইহার তেল উৎকৃষ্ট, ঔষধেও ব্যবহার হইতে পারে।

বোম্বাইয়ের মত মান্দ্রাজেও রেড়ি বড় ও ছোট জাতিতে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে আরও কিছু সামান্য জাতিভেদ আছে। কৃষ্ণা নদীর কূলে পিয়ারা নামক এক জাতীয় রেড়ির গাছ দৃষ্ট হয়। এ গাছের শাখা-প্রশাখা বাহির হয় না। আবার কোইম্বাটুর জিলায় মুলিকোট্টাই নামক এক প্রকার রেড়ি আছে, ইহার ফল ক্ষুদ্র ও তাহার উপর কাঁটা থাকে না। বড় জাতীয় রেড়ির,—গাছও বড়, বীজও বড়। ইহাকে লোকে একেলা পুতিয়া থাকে। ইহার তেল কিন্তু ভাল নহে। প্রদীপে জ্বালাইবার জন্যই কেবল ব্যবহৃত হয়। ছোট জাতীয় অন্যান্য ফসলের সহিত জন্মে। ইহার তেল উৎকৃষ্ট। কলিকাতার বাজারে এই রেড়ি অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। গোদাবরী, কৃষ্ণা, সালেম, বেল্লারি প্রভৃতি জিলায় অনেক পরিমাণে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে। কোকোনাডা, মসলিপাটাম, কোথাপটনম, মান্দ্রাজ এই সমুদয় বন্দর হইতে—রেড়ি, বিদেশে প্রেরিত হয়। কলিকাতা হইতে তেলের রপ্তানি অধিক, মান্দ্রাজ হইতে বীজের রপ্তানি অধিক। মান্দ্রাজ হইতে যে বীজ বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহার অধিকাংশ ফরাশি দেশে—মারসেলি নগরে ও ইতালি দেশে ভেনিসে গিয়া থাকে। পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন ও রুষ দেশে সিবাষ্টপল ও ওডেসাতেও কতক কতক বীজ প্রেরিত হয়।

চাষের কথা শেষ করিবার পূর্বে আমার বক্তব্য এই যে, একদিকে পিরপেঁতি অপরদিকে কোথাপটনম, এই দুই স্থানের বীজ সর্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত। এই দুই বীজ কলিকাতার বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। অতএব যে সকল

জমিদারদিগের এলাকাতে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে, তাঁহারা যদি পিরপৈণ্ডি ও [illegible] কৃষকদিগকে প্রদান করেন, তাহা হইলে যে কত উপকার হইতে পারে। এই দুই বীজ হইতে রেড়ি উৎপন্ন করিলে, ভাল দানা হইবার সম্ভাবনা। ভাল রেড়ি হইলে মূল্যও তাহার অধিক হয়। অধিক মূল্য পাইলে কৃষকেরা আপনারাই আগ্রহের সহিত ভাল বীজ কিনিয়া লইবে। ইহার পর কৃষকদিগকে আর লাভালাভ বুঝাইয়া দিতে হইবেনা। ধনবান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা যে কাজটুকু হইতে পারে, সেই কাজটুকুর প্রথম প্রয়োজন। প্রথম তাঁহারা ভাল বীজ আনয়ন করুন, সেই বীজ হয় আপনারা না হয় কৃষকদিগের দ্বারা রোপণ করিয়া, পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করুন যে, তাঁহাদিগের এলাকাতে ভাল বীজ বপন করিলে ভাল ফল হইতে পারে, আর তাহাতে প্রকৃতপক্ষে অধিক লাভও হয়। লাভের কথা প্রমাণ হইলে আর বড় অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। গরুড়ের আয়োজন করিয়া কাহাকেও পিপীলিকার নিকট গলায় কাপড় দিয়া নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে হয়না। [illegible] ভাল রেড়ির বীজ ও কেরাপটনম দানা আনীত হয়, তাহা বুনিবার পক্ষে কতদূর উপযোগী বলিতে পারি না। গোবর-জল-আছড়ায়, রসে ও উত্তাপে সে বীজের প্রাণ নাশ না হইলেও তাহার কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। সেজন্য ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, নেল্লোর, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি জিলায় বুনিবার নিমিত্ত কৃষকেরা যে বীজ রাখিয়া দেয়, তাহাই লইয়া আসা কর্তব্য। আমার আর একটী কথা। আপাততঃ ভাল বীজ হইতে ভাল রেড়ি উৎপন্ন হইলেও যদি এ দেশজাত বীজ বারবার রোপিত হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রমে অবনতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাই দেশ-জাত বীজ বপন না করিয়া বিদেশ-জাত বীজ বপন করাই ভাল। ভাল বীজ হইতে যে ভাল ফল হয়, তাহা বিলাতের লোকে বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। বীজ প্রস্তুত করা, বীজ বিক্রয় করা, সেখানে একটী স্বতন্ত্র ব্যবসা। বীজ ব্যবসায়ীরা কেবল বীজের জন্য যাহা কিছু সামান্য চাষ করেন, ফসলের জন্য চাষ করেন না। যেমন কৃষকের চেষ্টা কিসে অধিক ফসল হইবে; তেমনই বীজ-ব্যবসায়ীদিগের কেবল এই চেষ্টা, এই ভাবনা যে, কিসে আমার বীজটী সর্বোত্তম হইবে, আর কৃষকেরা আসিয়া অধিক মূল্য দিয়া কিনিবে। বীজ-ওয়ালা সটনের নাম কেনা শুনিয়াছেন? বীজের ব্যবসা এদেশে নাই বলিলেও হয়। তবে এই মাত্র দেখিতে পাই যে, কলিকাতার নিকট মূলার চাষ করিতে হইলে, তমলুক হইতে যে বীজ আসে, তাহাই কিনিয়া বপন করিতে হয়। দেশী বীজ বপন করিলে ভাল মূলা হয় না, শীকড়ি হইয়া যায়। আবার মুজফ্ফরপুর প্রভৃতি স্থানে সাহেবেরা যে নীলের চাষ করিয়া থাকেন; তাহার জন্য মুজফ্ফর-পুরের বীজ বপন করেন না। তাঁহারা কাণপুর হইতে বীজ আনয়ন করেন। কাণপুরে নীলের বীজ-ব্যবসাটী বড় মন্দ নয়। গভীর চিন্তাশীল, কৃষিবিদ্যা-মহাসাগরেরা এখন ঘোরতর অন্নধাবনা করিয়া একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন যে, ভারতে কৃষি কার্য্যের একবারেই অণুমাত্র উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে না। সত্য বটে, বিলাতি মতে একবার হল চালনা করিলে, বিলাতি মতে একবার শস্য বপন করিলে, রাতি পোহাইলেই দেখিতে পাই না যে, ক্ষেত্রটী সব সোণার গাছে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সোণার গাছও হয় না, হীরার ডালও হয় না, মণির পাতাও হয় না, মাণিকের ফুলও হয় না, মুক্তার ফলও হয় না। কাজেই মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, কৃষিশাস্ত্র ও রাসায়নশাস্ত্রের প্রতি একবারেই বৈরাগ্য জন্মে। রেড়ি-বীজ লইয়া যে পরীক্ষার কথা বলিলাম, ইহা তাঁহাদিগের জন্য নয়। তাঁহারা ঊর্দ্ধমুখে আকাশপানে চাহিয়া থাকুন, আকাশ হইতে কখন মণি মাণিক্যের বৃষ্টি হয়। যাঁহারা সামান্য উন্নতিকেও অবহেলা করেন না, যাঁহাদিগের ঐকান্তিক

অধ্যবসায় আছে, যাঁহারা পরিশ্রমকে ভয় করেন না, রেড়ি-বীজ-পরীক্ষার বিষয় আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম।

তেল ॥ অনেক স্থানে প্রদীপে জ্বালাইবার নিমিত্ত লোকে ঘরে রেড়ির তেল বাহির করে। ঘরে, তেল বাহির করিতে হইলে, রেড়িকে প্রথম অল্প খোলায় ভাজিতে হয়। তাহার পর ঐ ভাজা-রেড়িকে ঢেঁকি কি উখলি কি হামান দিস্তায় কুটিয়া লইতে হয়। কুটা-রেড়িকে জলের সহিত মিশাইয়া সিদ্ধ করিলে তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। সেই তেল উঠাইয়া লইয়া আর একবার সিদ্ধ করিলে জল শুকাইয়া যায়, কেবল তেল রহিয়া যায়। কুটা রেড়ি একবার সিদ্ধ করিলে যদি সমস্ত তেল বাহির না হয়, তাহা হইলে আর দুএকবারও সিদ্ধ করিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থানে কুটিবার পূর্বে আস্ত রেড়িকে লোকে প্রথমে সিদ্ধ করে, তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া কুটিয়া লয়। এরূপ করিলে তেল উত্তমরূপ বাহির হইয়া আইসে। ঘরে কৃষকেরা যে তেল বাহির করে, তাহা অপরিষ্কার। প্রদীপ ভিন্ন আর তাহা অন্য কাজে লাগে না। কলুদিগের ঘানি-দ্বারাও রেড়ির তেল বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তেল বাহির হয় না, অনেক রহিয়া যায় ও নষ্ট হয়।

অধিক পরিমাণে রেড়ির তেল বাহির করিতে হইলে কলের আবশ্যক হয়। ঐ কল লৌহ নির্ম্মিত, ইহাকে প্রেস বলে। কলিকাতায় আজকাল এই কল প্রস্তুত হইতেছে। এই কলটী ইস্‌ক্রুপের দ্বারা প্রসারিত বা সংকুচিত করিতে পারা যায়। সেই সংকুচনেই রেড়িতে চাপ পড়ে, তাহাতেই তেল বাহির হয়। কলে সম্মুখে অগ্নি জ্বালাইবার স্থান আছে। তেল বাহির করিবার সময় এই স্থানে আগুন জ্বালিতে হয়। আগুনের উত্তাপ গিয়া রেড়িতে লাগে, তাহাতে তৈল বিগলিত হইয়া নিঃসরণের সহায়তা করে। প্রধানত রেড়ি তৈল চারি প্রকার। যথা,—কোল্ডড্রন (cold drawn) প্রথম নম্বর (No.1), দ্বিতীয় নম্বর (No.2), তৃতীয় নম্বর (No.3), দ্বিতীয় নম্বরের আবার নানারূপ ভেদ আছে, যথা গুড সেকণ্ড (Good second) অরডিনারি নম্বর টু (ordinary No.2) লণ্ডন কোয়ালিটি (London quality) লিভারপুল কোয়ালিটি (Liverpool quality) গ্লাসগো কোয়ালিটি (Glasgaw quality) ইত্যাদি। রেড়ির তেল কিছুদিন ঘরে থাকিলে পরিষ্কার হইয়া আইসে। সুতরাং আজ যে তেলটী এক প্রকার, কাল সেটী অন্য প্রকার হইয়া যায়। এজন্য উপরিউক্ত কয়প্রকার তেলের বিশেষ একটী নির্দ্ধারিত লক্ষণ নাই। পরিষ্কার, শুভ্রবর্ণ, তরল তৈল উৎকৃষ্ট; তদ্বিপরীত নিকৃষ্ট।

কলের দ্বারা রেড়ি হইতে ঐ প্রণালীতে তেল বাহির হইয়া থাকে। ভাল তেল করিতে হইলে প্রথম রেড়িকে কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া লইতে হয়। ইহাতে ছোট দানা, ধূলা প্রভৃতি দ্রব্য পৃথক হইয়া যায়। তাহার পর তক্তার উপর একবারে যতগুলি ধরে ততগুলি রেড়ি রাখিয়া কাঠের হাতল দিয়া এক ঘা মারিতে হয়। ইহাতে বীজের উপরে যে খোসা থাকে, তাহা পৃথক হইয়া যায়। ইহাকে পুনরায় কুলা দ্বারা ঝাড়িলে খোসা সমুদয় উড়িয়া যায়। আর হাতলের আঘাতে যে সকল বীজ একেবারেই চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাও পৃথক হইয়া পড়ে। গোটা গোটা শাঁসগুলি তখন কুলার উপর ছড়াইয়া হাতে একটী একটী করিয়া বাছিতে হয়। যেসকল শাঁস ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ হরিদ্রাবর্ণের একটী শাঁস যদি পাঁচসের শুভ্রবর্ণের শাঁসের সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে সমুদয় তেলটুকুকে বিবর্ণ করিয়া ফেলে। যখন বীজগুলি খোসা-

দ্বারা আবৃত থাকে, তখন কোনটীর ভিতর শুভ্রবর্ণের আর কোনটীতে হরিদ্রা-বর্ণের শস্য আছে, তাহা বলিবার যো নাই। বীজ না ভাঙ্গিলে ইহা টের পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, বীজ অধিক পাকিয়া যাইলে ভিতরে এইরূপ হরিদ্রা-বর্ণের শস্য হয়। এইরূপ মন্দ শাঁস বাছিয়া ফেলিয়া ভাল শাঁসগুলিকে রৌদ্রে দিতে হয়। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে শাঁসকে এক প্রকার চক্রের ভিতর দিয়া অল্প ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। কোল্ডড্রন তেল প্রস্তুত করিতে হইলে শাঁস ভাঙ্গিতে হয় না। তাহার পর, প্রায় এক ফুট লম্বা চট কাপড়ের ভিতর যতগুলি শাঁস ধরে, তাহা রাখিয়া চট মুড়িয়া দিতে হয়। শাঁসসম্বলিত এক এক খণ্ড চটকে পুডিং বলে। এই পুডিংগুলি লইয়া তখন কলের ভিতর সাজাইয়া দিতে হয়। একটী করিয়া পুডিং আর একখানি করিয়া ছোট লৌহপাত্র রাখিয়া পুডিং-দিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া সাজাইয়া দিতে হয়। পুডিং দ্বারা কলটী আগা-গোড়া পুরিয়া যাইলে, তখন কলের স্ক্রুপে পাক দিতে হয়। তাহাতে পুডিংএর উপর চাপ পড়ে, নিষ্পীড়িত হইয়া তাহা হইতে তেল বাহির হইতে থাকে, আর সেই তেল ফোঁটায় ফোঁটায় নীচে পড়িতে থাকে। এই সময় পুডিংদিগের সম্মুখে অগ্নি জ্বালিবার স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে হয়। পুডিং-মধ্যস্থিত রেড়ির শাঁসে সেই অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া তেল বিগলিত হইয়া ভালরূপে বাহির হইতে থাকে। কোল্ডড্রন তেল করিতে হইলে, অগ্নি ব্যবহার করিতে নাই, কিন্তু কেহ কেহ অল্প উত্তাপ দিয়াও থাকেন। কি কোল্ডড্রন কি ১ নম্বর তেলের জন্য ভাল কাঠের কয়লা বা কোক্ কয়লার আবশ্যক। কয়লা মন্দ হইলে আগুন হইতে ধূম নির্গত হইয়া তেল বিবর্ণ হইয়া পড়ে। কোল্ডড্রন তেল প্রস্তুত করিতে হইলে শাঁস হইতে সমস্ত তেল বাহির করিয়া লইতে নাই। তাহাতে তেল পরিষ্কার ও তরল হয় না। বার আনা রূপ তৈল বাহির হইলেই ছাড়িয়া দিতে হয়। যে খোল রহিয়া যায়, তাহা ৩ নম্বর তেলের রেড়ির সহিত মিশাইয়া পুনরায় অবশিষ্ট তেল বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। ১ নম্বর তেল করিতেও লোকে সম্পূর্ণরূপ তেল বাহির করে না; শাঁসে কিছু তেল বাকি থাকিতে নিষ্পীড়নকার্য্য স্থগিত করিয়া দেয়। ২ কি ৩ নম্বর তেল করিতে শাঁস হইতে সমুদয় তেলটুকু লোকে বাহির করিয়া লয়। তেল বাহির হইয়া পুডিং সব যেমন আল্গা হইতে থাকে, তেমনি আরও স্ক্রুপ আঁটিয়া দিতে হয়। এই সময় স্ক্রুপ আঁটিতে অতিশয় বলপ্রয়োগের আবশ্যক। তাই তৈল-নিষ্পীড়ক একবার নীচে নামে আবার পুনরায় কলের উপর চড়িয়া বসিয়া স্ক্রুপে তাহার সমুদয় দেহের ভার ও বলপ্রয়োগ করিতে থাকে। এই সময় সে শীঘ্রই অতিশয় শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া পড়ে। কলে চাপ দিবার নিমিত্ত কোনও কোনও স্থানে জলীয় বলের (Hydraulic power) সহায়তা গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু কলিকাতার প্রায় সকল কলই মানুষের বল দ্বারা পরিচালিত হয়। বাষ্পীয় বলে ইহার কার্য্য ভালরূপ হয় না, কারণ স্ক্রুপের চাপ অতি সাবধানে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয়। তিন মণ রেড়ি ভাঙ্গিলে দুইমণ শাঁস হয়, ঐ দুইমণ শাঁসে কলটী পরিপূর্ণ হয়, আর একবারের নিষ্পীড়নকার্য্য ইহাতেই হইয়া থাকে। সকল রেড়িতে সমান তেল বাহির হয় না। কোথাপটনম ও পিরপেঁতির ১০০ মণ বীজে ৪১ মণ তৈল বাহির হয়। পহলগাঁ, কোকোনাডা, ভাগলপুরের ১০০ মণে ৪০ মণ বাহির হইয়া থাকে। অপরাপর নিকৃষ্ট রেড়ি হইতে শতকরা ৩০ হইতে ৩৮ মণ তেল বাহির হয়। সকল রেড়িতে কোল্ডড্রন কি ১ নম্বর তেল প্রস্তুত হয় না। ইহার জন্য কোথাপটনম, কোকো-নাডা ও পিরপেঁতিই সর্বোত্তম। আজকাল কলিকাতায় কেহ বড় কোল্ডড্রন তেল

প্রস্তুত করেন না। ইতিপূর্বে ক্ষেত্রমোহন বসাকেরা এই কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা ফেল হইয়া গিয়াছেন। যতদূর আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে যাঁহারা রেড়ির তেল প্রস্তুত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাবু অম্বিকাচরণ কুমরি, বাবু অবিনাশচন্দ্র কুমার, বাবু বিধুভূষণ কুমার, বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু ও বাবু গোরাচাঁদ দাস প্রসিদ্ধ।

কল হইতে তেল বাহির করা হইল। এই তেল এক্ষণে অতিশয় অপরিষ্কার ও গাঢ়। ইহাকে পরিষ্কার ও তরল করিতে হইবে। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাকে এক্ষণে অনেকক্ষণ ধরিয়া কলাইকরা তাঁবার-ডেকচিতে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ করিবার সময় বড়ই সাবধানতার আবশ্যক। যেরূপ বৈদ্যদিগের পাক তেল নামাইতে বিশেষরূপ বিচক্ষণতার আবশ্যক করে, ইহাও তদ্রূপ। যদি খরপাক হইয়া যায়, তাহা হইলে রেড়ির তেল বিবর্ণ হইয়া পড়ে। উত্তমবর্ণ থাকে না ; অপরিষ্কৃত হইয়া যায়, এবং তাহাতে রক্তিমা আভার উদয় হয়। রক্তিমা আভাযুক্ত তেলের আদর কম, মূল্যও কম। আবার তেল কাঁচা থাকিলে তাহাতে জল রহিয়া যায় সুতরাং অল্পদিন পরে সে তেল পচিয়া যায়। সিদ্ধ হইলে তেল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহার জন্য কাঠের ফ্রেম আছে। সেই ফ্রেমের উপরিভাগে একখানির নীচে আর একখানি, এইরূপ অনেক খণ্ড কাপড় সংলগ্ন থাকে, তলভাগে দুই তিন খণ্ড ফেলানেল থাকে। প্রথম কাপড়ের উপর তেল ঢালিয়া দিলে, ফোঁটায় ফোঁটায় দ্বিতীয় কাপড়খণ্ডে তেল পড়িতে থাকে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়। এইরূপে সমস্ত কাপড় ও ফেলানেল পার হইয়া তেল নীচে গিয়া একটী গামলায় পতিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়-খণ্ড কাঠের কয়লার গুঁড়া রাখিতে হয়। তাহাতে তেল উত্তমরূপে পরিষ্কার হয়। কোল্ড ড্রনের পক্ষে, শুনিয়াছি, পশু-হাড়ের কয়লা (animal charcoal) বিশেষ পরিষ্কারক। কেহ কেহ আবার কোল্ডড্রন তেল এ প্রণালীতে না ছাঁকিয়া ব্লটিং কাগজে ছাঁকিয়া লন। ইহার জন্য ছিদ্রময় টিনের অনেকগুলি ফনেলের আবশ্যক করে। ফনেলের ভিতর কয়লার গুঁড়া ও ব্লটিং পেপার রাখিয়া উপরেরটীতে তেল ঢালিয়া দিলে, টোসায় টোসায় সব ফনেল পার হইয়া তেল বিশুদ্ধ হইয়া যায়। ছাঁকিবার পর কোল্ডড্রন তেলের আর কিছুই করিতে হয় না। কোল্ডড্রন ও ১ নম্বর তেলই ছাঁকিতে বিশেষরূপে যত্ন করিতে হয়। অপর সব নিকৃষ্ট নম্বরের তেল কেবল দুই তিনখানি কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই চলিতে পারে। ছাঁকা হইয়া যাইলে ১ নম্বর প্রভৃতি তৈল এক্ষণে হৌজ বা ট্যাঙ্কে লইয়া ফেলিতে হয়। এখানে চারি পাঁচদিন রৌদ্র খাইলে তেল আরও পরিষ্কার হইয়া আসে। তাহার পর টিনের ক্যানেস্তারায় বন্ধ করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। রেড়ি কিনিতে আর রেড়ির বীজ বিক্রয় করিতে, নবাবগঞ্জের শ্রীযুক্ত শ্রীধর মণ্ডল মহাশয়ের জামাই শ্রীবিনোদবেহারি শাহা বিশেষ পারদর্শী। বীজ উৎপন্ন করিয়া, কোথায় কি করিয়া বিক্রয় করি, পল্লীগ্রামস্থ লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ সমস্যা হইয়া উঠিতে পারে। তারজন্য ইহাঁর নাম করিলাম। তেলের বিষয়ে শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার দত্ত অতি বিচক্ষণ। কোল্ডড্রন ও ১ নম্বর তেলের জন্য বীজ বাছিতে ও পরিষ্কার করিতে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, অপর সকল নম্বরের তেলের জন্য লোকে সেরূপ যত্ন করে না। ৩ নম্বর তেলের জন্য লোকে যৎসামান্যই যত্ন করিয়া থাকে।

কোল্ডড্রন তেল ঔষধে ব্যবহার হয়। কিন্তু কলিকাতায় আজকাল আর কেহ এ তেল বড় প্রস্তুত করে না। সাহেবদের দোকান, ও শ্রীযুক্ত বাবু শিরীষচন্দ্র দত্তের দোকান ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ১ নম্বর তেলও

আজকাল ঔষধে ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু ইহা অন্যায়; কারণ এ তেলে অনেকটা রেড়ির রুক্ষস্বভাব (acridity) বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত করিতে পারে। শস্তা ঔষধ ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কল-কব্জার নানাস্থানে পরস্পরে ঘর্ষণ নিবারণের জন্য ২ নম্বর তেল বিশেষ প্রয়োজন হয়। ৩ নম্বর তেল প্রদীপে জ্বালাইবার নিমিত্তই লোকে ক্রয় করে। ইহা অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রেরিত হয়। শুনিয়াছি সেখানকার লোকে ইহা মেষের গায়ে মাখাইয়া দেয়। তাহা করিলে পশম বর্দ্ধিত হয়।

ব্যবসা ॥ গত বৎসর (১৮৯০—৯১) সালে, ৫১,৪৭,৮৫৫ টাকার রেড়ি বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে বিলাতে যায়, ১১,২৭,৪৩০ টাকার, আর ফরাসিদেশে যায়, ২৭,২৩,০১৭ টাকার। সেই বৎসর ৩৭,৩৩,৬৫১ টাকার তেল ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে, ১১,৯৮,৪০৫ টাকার তেল বিলাতবাসীরা ও ১৪,৯৫,৭১৮ টাকার তেল অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা ক্রয় করে। রেড়ির বীজ বঙ্গদেশ হইতে বড় বিদেশে যায় না। বোম্বাই হইতে অধিক রপ্তানি হয়। গত বৎসর যে ৫১ লক্ষ টাকার বীজ বিদেশে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে বোম্বাই হইতে ৪১ লক্ষ টাকার রেড়ি রপ্তানি হয়, বঙ্গদেশ হইতে কেবল ৯ লক্ষ টাকার রেড়ি বিদেশে গিয়াছিল। ৩৭ লক্ষ টাকার তেলের মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে যায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার।

খো'ল ও রেশম ॥ রেড়ির খো'ল অতি উত্তম সার। ইক্ষু ও আলু প্রভৃতি ফসলে, (যাহার ফল লইয়া আমাদের প্রয়োজন, তাহার জন্য) ইহা বিশেষ উপকারী। অন্যান্য দ্রব্যের খো'ল ক্ষেতে কিছু বিলম্বে ফলদায়ক হয়। কিন্তু রেড়ির খো'ল সত্বর ফসলকে বলশালী করিয়া তুলে। আসাম ও বঙ্গদেশের উত্তরবিভাগে এড়ি নামক এক প্রকার রেশমের কীট আছে। ইহারা রেড়ির পাতা খাইয়া জীবিত থাকে। এই রেশম হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার তুল্য দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় আর পৃথিবীতে নাই। ছিঁড়িতে জানে না। এক কাপড় পরম্পর-পরম্পরানুক্রমে ব্যবহার করিতে পারা যায়, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। আজকাল এই কাপড় ইংরেজ ও ভদ্র দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এড়ি-রেশমের কথা স্বতন্ত্র। সে কাহিনী এখানে আরম্ভ করিলে পুঁথি বড়ই বাড়িয়া যাইবে।

শেষ ॥ রেড়ির সার পদার্থ হইল তেল। এই তেল প্রস্তুত ও তেলের ব্যবসা করিয়াই এতদিন অনেকে দুই পয়সা উপার্জন করিতেছিলেন। ইহাতে কোনওরূপ ব্যাঘাত হইলে দেশের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। ব্যাঘাত হইবার কথাও কিন্তু শুনিতেছি। শুনিতেছি কি, যে আমেরিকায় মৃত্তিকা-উদ্ভূত কি একপ্রকার সুলভ তেল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলে ও মেষের গায়ে লাগাইবার জন্য তাহা বিশেষ উপযোগী। একতো কেরাসিন তেল বাহির হওয়ায়, পোড়াইবার জন্য রেড়ির তেলের আর এক্ষণে তত আদর নাই। আবার যদি অন্য কোনও তেল বাহির হওয়ায় রেড়ির তেলের আদর আরও কমিয়া যায়, তাহা হইলে অনেকের পক্ষে ইহা সর্ব্বনাশের কথা। আমাদের কিন্তু স্থির বিশ্বাস যে, নূতন আবিষ্কৃত তৈল রেড়ির তেলের মত কার্য্যোপযোগী হইবে না। সেজন্য কলওয়ালাদিগকে আমি এ বিষয়ে অনেকটা আশ্বস্ত করিতে পারি। যাহা হউক, তথাপি সাবধান হওয়া উচিত। রেড়ির ব্যবসাতে যে কোনও দোষ আছে, তাহা দূরীকরণ করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। রেড়ির বীজে আজকাল দেখিতে পাই, অনেক মিশ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বড় দানার সহিত ছোট দানা, ভালদানার সহিত মন্দ দানা, এইরূপ সচরাচর দেখিতে পাই, এই প্রকার মিশ্রিত দানা হইতে তেল বাহির করিতে ব্যয় অধিক। তেলও নিকৃষ্ট হয়। যদি কল-

ওয়ালারা ধর্মঘট করিয়া, কৃতসংকল্প হন যে, এরূপ মিশ্রণকার্য্য করিতে দিব না, তাহা হইলে বীজ ব্যবসায়ীরা কখনও এ কার্য্য করিতে পারে না। তারপর তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা পাইলেও পাইতে পারেন। যদি গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, এইরূপ মিশ্রণকার্য্য দ্বারা ব্যবসাটী মাটী হইতেছে ; আর ইহা আইনদ্বারা নিবারণ করিবার উপায় আছে, যুক্তিসঙ্গত হইলে তাঁহাদিগের কথা গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় শুনিবেন।

তারপর দেখ, ফরাসি, ইতালি প্রভৃতি দেশে এখান হইতে অনেক রেড়ির বীজ প্রেরিত হইয়া থাকে। বীজ না লইয়া যাহাতে তাহারা তেল লয়, এ বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। তেল বাহির করিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহার মূল্য আমরা পাই না। তাহার লাভও পাই না। আবার এ দেশে 'খোল' রহিয়া যাইলে ভূমির সার হইতে পারে। তাহাতে ভূমি তেজঃশালী হইয়া যে অধিক পরিমাণে ফসল হয় তাহাও আমরা এক্ষণে পাই না। সুতরাং বিদেশে বীজ না গিয়া যাহাতে তেল যায়, সে বিষয়ে আমাদিগের যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে, যে ফরাসিরা এখান হইতে প্রতি বৎসর ২৭ লক্ষ টাকার বীজ লইয়া কিরূপে তেল বাহির করে? তাহারা যেরূপ তেল বাহির করে, আমরাও যে সেইরূপ তেল বাহির করিতে পারিব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা যে তাহাদিগের চেয়ে সুলভ মূল্যেও করিতে পারিব, তাহাও বোধ হয় নিশ্চিত কথা। দুঃখের কথা বলিব কি, বিদেশীয়েরা আমাদিগের নিকট হইতে বীজ লইয়া, তাহা হইতে তেল বাহির করিয়া, পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরণ করিতেছে, এমনকি, এই ভারতেই পুনরায় পাঠাইতেছে। আবার এ কথা শুনিয়াছি যে, আমাদের ২ নম্বরের তেলে সাহেবেরা ১ নম্বরের টিকিট লাগাইয়া দিলেই, তৎক্ষণাৎ সে তেল ১ নম্বর হইয়া যায়। সাহেব নামের গৌরব এমনই। তাহা না হইলে বিশুদ্ধ ঔষধের প্রয়োজন হইলে সাহেবদিগের দোকানে ছুটি কেন? মনে করিলে, বোধ হয়, এই বিদেশীয় ব্যবসার অধিকাংশ আমরা হস্তগত করিতে পারি। তবে সকল বিষয়ে তত্ত্বসংগ্রহ, জ্ঞান-সংগ্রহ, এই হইতেছে প্রথম কথা। কোথায়, কোন্ দেশে, কি হইতেছে, কে কি করিতেছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত প্রয়োজন। যাহাতে আমাদের লাভ হয়, সেইরূপ বিদেশীয় জ্ঞান, চাহিয়া পাই, চুরি করিয়া পাই, ছলে পাই, কৌশলে পাই, আমাদিগকে লইতে হইবে। আমাদিগের যাহা কিছু ছিল, বিদেশীয়েরা সে সমুদয় লইয়াছে। তাই তাহারা আজ বড়। আমাদিগের প্রাচীন বিদ্যার উপর এক্ষণে তাহারা যে অসীম উন্নতি সম্পাদন করিয়াছে, সেই উন্নতিটুকু এক্ষণে আমাদিগকে লইতে হইবে। ফল কথা, নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে এখন সকল বিষয়ে কার্য্য করিতে হইবে। বাঙ্গালীদিগের মত প্রখর বুদ্ধি বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও জাতির নাই। তবে ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে এ বুদ্ধি অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় হইবে। বাঙ্গালী জাতি সমৃদ্ধশালী গৌরবান্বিত [illegible] বাঙ্গালী এ কামনা করিয়া থাকেন, তিনি প্রার্থনা করুন যেন বাঙ্গালীকৃত নানা দ্রব্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

পৃথিবীর সকল স্থানেই যেন বণিক্ বাঙ্গালীর উপনিবেশ হয়। পৃথিবীর সাগর মহাসাগরে যেন বণিক্ বাঙ্গালীর জাহাজ গমনাগমন করে। হাসিবার কথা ইহাতে কিছুই নাই। কেন, আমরা কি মানুষ নই? বুদ্ধিবলে আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কে পরাজয় করিয়াছে? বরং যেটুকু সুবিধা পাইয়াছি, সেইটুকুতে আমরাই সকলকে পরাজয় করিয়াছি। এইরূপ মহাউদ্দেশ্য আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া, আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে, আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ আমরা যতটুকু পারি ততটুকু আগে যাই। আমাদিগের সন্তান সন্ততিদিগের

নিমিত্ত যতটুকু পারি, পথ পরিষ্কার করিয়া রাখি। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, গৌরব হারাইয়া আমাদের পুত্র পৌত্রগণ যেন কোল সাঁওতালদিগের মত হইয়া না যায়।

গজদন্ত

বিড়ালের গল্পে জীবদিগের দন্তের কথা বলিয়াছি। সকল জীবের দন্ত সমান নয়, সংখ্যায়ও একরূপ নয়। তবে গঠন দেখিলেই বলিতে পারা যায়, এটী ইন্‌-সাইসার বা কাটিবার দন্ত, এটী কেনাইন বা ছিঁড়িবার দন্ত, এটী মোলার বা খাদ্য পিশিবার দন্ত। হস্তীদিগের উপর মাড়ীতে দুইপাশে যে দুইটী ইনসাইসার দন্ত থাকে, তাহাই বৃদ্ধি হইয়া গজদন্ত হয়। নীচের মাড়ীর দন্তবৃদ্ধি হয় না। হস্তীর মত হস্তিনীর তত বড় গজদন্ত হয় না। বন্য শূকরের যে বড় বড় দন্ত দেখিতে পাই, তাহা কেনাইন দন্ত, ইনসাইসার নহে। শূকরের উপর ও নীচের দুই মাড়ীর দন্তই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গাছের ছাল ছাড়াইতে, কি গাছ কাটিয়া ফেলিতে, বন্য হস্তীদিগের দন্ত মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যায়, সেজন্য অতিশয় বৃহৎ হইতে পায় না। একবার ভাঙ্গিয়া যাইলে পুনরায় গজাইয়া থাকে। গজদন্ত দীর্ঘে ছয়হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এরূপ একজোড়া দন্ত ওজনে প্রায় চারি মণ হয়। সচরাচর কিন্তু এত বড় গজদন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। সচরাচর ত্রিশ সের, একমণ, এইরূপ ওজনে হইয়া থাকে। গজদন্ত আড়া-আড়ি ভাঙ্গিলে ইহার ভিতরে গোলাকার রেখা-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

হস্তীর ন্যায় অনন্য কতিপয় জন্তুরও বৃহৎ দন্ত হইয়া থাকে। গজদন্তের ন্যায় সে দন্ত কিন্তু তত কারুকার্য্যের উপযোগী নয়। সমুদ্র-হস্তী ও সমুদ্র-ঘোটকের এইরূপ দন্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইউরোপের অধিবাসীগণ ইহা হইতে নানারূপ বস্তু নির্ম্মাণ করিতেন। হস্তী কিরূপ, হস্তীর আবার এত বড় দন্ত হয়, এ কথা বোধহয় তখন তাঁহারা কর্ণেও শুনেন নাই। তারপর যখন গজদন্ত ইউরোপে আমদানি হয়, তখন অনেক দিন ধরিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল যে, ইহা হস্তীর শৃঙ্গ। এত বড় দন্ত কোনও পশুর হইতে পারে, এ অভাবনীয় কথা কি করিয়া লোকের মনে উদয় হইবে? লণ্ডনে বণিক্‌দিগের ঘরে আমি পর্বত-প্রমাণ নানা প্রকার দন্ত দেখিয়াছি। এক একটী রাশি, সাত রাজার ধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দন্ত রাশির ভিতর আর এক প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিয়াছিলাম। ইহা ম্যামথ বলিয়া এক প্রকার বৃহদাকার পশুর দন্ত। এই পশু ঠিক হস্তীর ন্যায়। পশুতত্ত্বে ইহাকে এলিফাস প্রাইমিজিনিয়স্‌ বলে (Eliphas primigenius). অতি প্রাচীনকালে যখন ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা ঘোর গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল, তখন এই হস্তী অসংখ্য দলে দলে সেই নিবিড় বনে বিচরণ করিত। এখন এ পশু সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, পৃথিবীতে আর একটীও নাই। সাইবেরিয়া প্রভৃতি তুষারময় দেশে বরফ খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া লোকে এক্ষণে ইহার কঙ্কাল বাহির করে। সেই কঙ্কালের সঙ্গে গজদন্ত থাকে, সেই দন্ত অনেক টাকায় বিক্রীত হয়। লণ্ডনে গজদন্ত-স্তূপে এরূপ দন্ত আমি অনেক দেখিয়াছিলাম। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর গত হইল, সাইবেরিয়া দেশে, অস্থি-মাংস-চর্ম্ম সম্বলিত একটী ম্যামথের দেহ বরফ খুঁড়িতে খুঁড়িতে লোকে পাইয়াছিল। অনেক সহস্র বৎসর গত হইল, ম্যামথ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; তাই

করেন। হা জগদীশ্বর! তোমাকে উপলক্ষ করিয়া কত ধর্ম্মে, কত দেশে, কত জাতিতে কত যে কি নিষ্ঠুর আচরণ আচরিত হইয়া থাকে, তাহা মনে করিতে যাইলে আর জ্ঞান থাকে না, পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে তিল মাত্র আর ইচ্ছা হয় না!! সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া গজদন্তগুলি বণিকেরা জাহাজে বোঝাই দেন, আর অবশিষ্ট এই হতভাগা নর-নারীদিগকে বেচিয়া ফেলেন। দাস-ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে আরব্য, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে লইয়া বিক্রয় করে। এক্ষণে ইংরেজেরা এই দাস-ব্যবসার ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। আরব-বণিকেরা যে, আফ্রিকার পুরুষ-মানুষটী, মেয়ে-মানুষটী,ছেলেটী পিলেটী বেচিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিবেন, ইংরেজেরা তাহার আর যো রাখিলেন না। জাঞ্জিবারে অনেক হিন্দু অধিবাসী আছেন, দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত বলিয়া সম্প্রতি তাঁহাদিগের নামে একটী কলঙ্ক রটিয়াছে। একথা কিন্তু তাঁহারা একেবারেই অস্বীকার করেন—"আমরা এ নৃশংস মহাপাতককে কায়মনঃবাক্যে ঘৃণা করি" এই কথা বলিয়া তাঁহারা বিলাতে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন। যাহা হউক, দাস-ব্যবসার উপর ইংরেজেরা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া, আফ্রিকার মধ্যস্থান হইতে গজদন্ত আনিবার আর এক্ষণে সুবিধা নাই। তার জন্য ব্যবসা কমিয়া আসিতেছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গজদন্তের কারুকার্য্য প্রচলিত আছে। বৃহৎ-সংহিতার মতে খাট, পালঙ্ক প্রস্তুত করিবার উপযোগী ইহার তুল্য আর অপর বস্তু নাই। এই পুস্তকের মতে খাটের পায়াগুলি গজদন্তে নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক। অপরাপর অংশ কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর হস্তিদন্ত বসাইয়া দিলে চলিতে পারে। ভারতবর্ষে যেমন অন্যান্য কারু কার্য্যের অবনতি হইয়াছে, সেইরূপ এ কার্য্যেরও অবনতি হইয়াছে, আর দিনদিন অধিকতর অবনতি হইতেছে। চুড়ি করিবার নিমিত্তই এক্ষণে হস্তিদন্ত এদেশে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের এদিকে পূর্ব্বে যেরূপ শাঁখা না হইলে চলিত না, ভারতবর্ষের নানাস্থানে এখনও সেইরূপ গজদন্তের চুড়ি না হইলে চলে না। এ অঞ্চলে যেরূপ বিবাহের সময় কন্যাকে হীরা-মণি-মাণিক্যের সহস্র গহনা দিলেও সঙ্গে দুইগাছা কড় দিতেই হইবে; রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সেইরূপ অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত কন্যাকে গজদন্তের চুড়ি দিতেই হইবে। শঙ্খ-নির্ম্মাণ-ব্যবসাটী যেরূপ এ অঞ্চলে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, পশ্চিমাঞ্চলে হস্তিদন্তে চুড়ি করিবার কার্য্যটী সেইজন্য এখনও লোপ হয় নাই। হিন্দু মুসলমান সকল জাতিরই নারীগণ গজদন্তের চুড়ি পরিয়া থাকেন। বিবাহের সময় কন্যাকে গজ-দন্তের চুড়ি পিতামাতা কিনিয়া দেন না। এই অলঙ্কারটী দিবার অধিকার মাতুলের; কন্যার মাতুল ইহা দিয়া থাকেন। শাঁখার ন্যায় গজদন্তের চুড়িও নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে; পীত, হরিৎ, লোহিত, ইত্যাদি। শাঁখার ন্যায় ইহার উপর অভ্র, রাঙতা প্রভৃতি চাকচিক্যময় বস্তুও আরোপিত হইয়া থাকে। রং ও রাঙতার ভিতরে যে হস্তিদন্ত আছে, তাহা একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। হস্তের আগা-গোড়া এই চুড়ি পরিতে হয়। বড় ঘরের মেয়েরা বিবাহের পর একবৎসর পর্য্যন্ত চুড়ি পরিয়া থাকেন, কেবল নিয়মরক্ষামাত্র। তারপর খুলিয়া ফেলিয়া সোণা-রূপার গহনা পরেন। গরিব-দুঃখীরা গজদন্তের চুড়ি চিরকাল হাতে রাখে। রাজপুতানার রেলে, যেখানে যোধপুর যাইবার শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নিকট পালী বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। এইখানে প্রচুর-পরিমাণে হস্তিদন্তের চুড়ি প্রস্তুত হয়। গজদন্তের চুড়ি নানা প্রকার। সচরাচর যাহা হয়, তাহা অনেকটা শাঁখার ন্যায় দেখিতে।

পালী প্রভৃতি স্থানে যে গজদন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহা বোম্বাই হইতে আনীত

হয়। সেই যে ফাঁপা "চড়িবার" অংশের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা হইতেই চড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ে হস্তিদন্ত নানাভাগে কর্ত্তিত হইয়া, তাহার পর দেশ বিদেশে বিতরিত হয়। সূত্রধরেরাই হস্তিদন্ত করাত দিয়া কাটিয়া থাকেন। তাঁহারা মজুরি পান না। কাটিতে কাটিতে দন্তের যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহাই তাঁহাদিগের প্রাপ্য। এই দন্তচূর্ণ তাঁহারা গোপদিগকে বিক্রয় করেন। গোপদিগের এরূপ বিশ্বাস যে, গো-মহিষকে ইহা খাইতে দিলে দুধ অধিক হয়। মনুষ্যের পক্ষেও গজদন্ত-চূর্ণ বলকারক ঔষধের মধ্যে পরিগণিত। ইহার পর হস্তিদন্ত তিনটী আড়ঙে আসিয়া উপস্থিত হয়; তার পর সেখান হইতে অন্যান্য-স্থানে প্রেরিত হয়। এই তিনটী আড়ঙের নাম—পালি, সুরত ও অমৃতসর। নহরীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়ওয়ারিরাই গজদন্তের প্রধান ব্যবসায়ী। ইহাঁরা জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং গজদন্ত ছুঁইলে ইহাদের মহাপাতক হয়। তাই ইঁহারা নিজে স্পর্শ করেন না। গজদন্ত ছুঁইলে মুসলমানদিগের পাপ হয় না। তাই স্পর্শ করা, রাখা ঢাকা, ওজন করা প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা ইহাঁদিগের দ্বারাই করাইয়া লন। এতদ্দ্বারা জৈনদিগের পারলৌকিক ধর্ম্মটী রক্ষা পায় বটে, কিন্তু ঐহিক কার্য্য তত সুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ হয় না। মাঝে মাঝে মুসলমান কর্ম্মচারীদের সহিত বিবাদ ঘটে। মহাজন বলেন, 'আমার দ্রব্য অধিক ওজন করিয়া দিল' খরিদ্দার বলেন, 'আমাকে কম দিল; দাঁড়ি-পাল্লার ভাল করিয়া পাষাণ ভাঙ্গে নাই।' এইরূপ বিবাদ, কেহই সন্তুষ্ট নন।

চড়ির পর এদেশে গজদন্ত চিরণি করিবার নিমিত্তই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিরণির প্রধান আড্ডা দিল্লী ও অমৃতসর। চিরণি করিয়া যাহা কিছু সামান্য গজদন্ত বাদ পড়ে, তাহা আবার অন্য লোকে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। সেই গজদন্তের পাত তাহারা বাক্স প্রভৃতি কাঠের দ্রব্যে বসাইয়া দেয়। মুলতান, ডেরা ইসমাইল খাঁ, হুশিয়ারপুর, সিয়ালকোট, সুরত, ব্যাঙ্গেলোর, বিজাগাপাটাম প্রভৃতি স্থানে এইরূপ হস্তিদন্ত-সম্বলিত অতি সুন্দর কাষ্ঠের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে বিজাগাপাটামের তুল্য এরূপ কার্য্য আর কুত্রাপি হয় না।

কেবল গজদন্ত হইতে যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা মুরশিদাবাদেই অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এরূপ সুন্দর শিল্প-কৌশল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মুরশিদাবাদের কারিগরেরা দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা, হস্তী-শকট, ময়ূর-পঙ্খি নৌকা প্রভৃতি নানাদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মুরশিদাবাদে এ ব্যবসায়ের কিন্তু ক্রমেই অবনতি হইয়া আসিতেছে। শুনিয়াছি কুড়ি বৎসর পূর্বে যতগুলি লোকের ইহা উপজীবিকা ছিল, এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশও এ কর্ম্মে নিযুক্ত নাই। দ্রব্য বিক্রয় হয় না। কলিকাতা প্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান হইতেও হস্তিদন্তের দ্রব্যাদি আসিয়াছিল। গয়া, দুমরাওন, দারভাঙ্গা, কটক, উড়িষ্যা, গড়জাত, রঙ্গপুর, বর্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে গজদন্তের দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাদের সকল স্থানেই যে গজদন্তের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহা নহে। লোকের ঘরে পূর্ব হইতে যা দুই একটী দ্রব্য সঞ্চিত ছিল, তাহাই তাঁহারা সাধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গজদন্তকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিরিয়া চামর হয়, আবার তাহাকে বুনিয়া মাদুর, শীতল পাটী করিতে পারা যায়। পূর্বকালে শ্রীহট্টে এইরূপ পাটী অনেক হইত। এক্ষণে ব্যবসা লোপ পাইয়াছে। কলিকাতা প্রদর্শনীতে দারভাঙ্গার মহারাজা এইরূপ একটী পাটী পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মূল্য ১৩২৫ টাকা। সেকালের রাজারা বাছিয়া বাছিয়া নানারূপ কারিগর চাকর রাখিতেন। তাহারা বসিয়া বসিয়া ধীরে-সুস্থে সূক্ষ্মাণসূক্ষ্ম করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত। সরকারি বেতন আছে, অন্নের চিন্তা নাই। তাড়াতাড়ি কর্ম্ম

শেষ করিয়া বেচিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং পূর্বে যেরূপ সূক্ষ্ম কাজ হইত, এক্ষণে আর সেরূপ সূক্ষ্ম কাজ হয় না। আবার কর্ম্মটী সমাধা হইলে যথাবিধি পুরস্কারও মিলিত। দারভাঙ্গা মহারাজের পাটীটি বোধহয় এইরূপ বেতনভোগী শিল্পকার দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কাশীর মহারাজের নিকটও এইরূপ গজদন্তের শিল্পকার নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে আছে কিনা বলিতে পারি না। এই শিল্পকার বারাণসীর একটী খাট ও একখানি কোচ প্রস্তুত করিয়াছিল। মহারাজের ঘরে এরূপ নানা দ্রব্য সজ্জিত আছে। কোচখানি কিন্তু গৃহপালিত হস্তিদন্ত হইতে নির্মিত। গৃহপালিত হস্তিদন্ত, বন্য গজদন্তের তুল্য উত্তম নহে। গৃহপালিত দন্ত কিছু ভঙ্গপ্রবণ হয়। দক্ষিণদেশে ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজা হস্তিদন্তের দ্রব্য বড়ই ভালবাসিতেন। এ অঞ্চলে বন্যহস্তীও অনেক আছে এবং তাহা হইতে গজদন্তও লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু অধিক নয়। ত্রিবাঙ্কুড়ে এখনও হস্তিদন্তের নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গজদন্তে দ্রব্য নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্রহ্মবাসীরাও বিশেষ পারদর্শী। তাঁহারা একটী দ্রব্য সচরাচর প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সে দ্রব্য ভারতবর্ষে হয় না। হস্তিদন্তের নিরেট অংশ কতকটা তাঁহারা পরাপরি কাটিয়া লন। প্রথম তাহার উপরিভাগে লতা পাতা কাটিয়া অলঙ্কৃত করেন। তাহার পর সেই লতাপাতার মধ্য দিয়া ভিতরের গজদন্ত কুরিয়া কুরিয়া বাহির করেন। বাহিরের লতাপাতার অলঙ্কার ক্রমে জালবৎ ছিদ্রময় হইয়া পড়ে। সেই ছিদ্র সমূহ দিয়া ভিতরে অস্ত্র চালিত হয়। কুরিয়া কুরিয়া অস্ত্র যখন দন্তের মধ্যস্থলে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই মধ্যবর্ত্তীস্থানের দন্ত কাটিয়া ইহাঁরা একটী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বাহির করেন। বাহির হইতেই সমুদয় মূর্ত্তিটি প্রস্তুত হয়। গজদন্তকে পত্র আকারে চিরিয়া তাহার উপর নানারূপ চিত্র আঁকিতে পারা যায়। দিল্লীই হইল এ কার্য্যের প্রধান স্থান। মুসলমান বাদশাহগণের প্রতিমূর্ত্তি, নুরজাহান প্রভৃতি বেগমগণের প্রতিমূর্ত্তি গজদন্তে চিত্রিত হইয়া বিক্রীত হয়। কতিপয় মুসলমান চিত্রকরেরা এই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন কলিকাতায় আসিয়া দোকান খুলিয়াছেন। ভারতবর্ষে এইরূপে নানা স্থানে নানা-রূপ গজদন্তের কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু সকল স্থানেই এ কার্য্যের অবনতি দৃষ্ট হইতেছে।

ইউরোপে যখন হস্তিদন্ত যাইতে আরম্ভ হইল, তখন সেখানকার অধি-বাসীরাও ইহা হইতে নানারূপ কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। নানা বিপ্লববশত ভারতবর্ষের প্রাচীন দ্রব্যাদি যেরূপ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, সেখানে সেরূপ নহে। শতশত বৎসরের দ্রব্যাদি সেখানে তাঁহারা অতি আদরের সহিত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীশদেশে গজদন্ত হইতে মনুষ্য-মূর্ত্তি নির্মিত হইত ; সে মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। গজদন্তকে পাত করিয়া পুস্তকও হইত, তাহাও এখন বর্ত্তমান আছে। ফরাশি দেশে পারিস নগরের পুস্তকাগারে একখানি এইরূপ পুস্তক আছে। ১৩০০ বৎসর পূর্বে এই পুস্তক-খানি প্রস্তুত ও লিখিত হইয়াছিল। ইহার পত্রগুলি ১৫ ইঞ্চি দীর্ঘে, ৬ ইঞ্চি প্রস্থে। হস্তিদন্ত চিরিয়া কিরূপে এ প্রকার বড় পত্র প্রস্তুত হইল, তাহার কিছু মীমাংসা হয় নাই। সকলে অনুমান করেন যে, গোলাকার হস্তিদন্তকে সমতল ও প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত, বাড়াইবার কমাইবার নিমিত্ত, সেকালের লোকে কোনও-রূপ উপায় জানিতেন, এখনকার লোকে আর সে উপায় জানেন না। থিওফিলাস নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, হস্তিদন্তকে যদি ক্ষার, লবণ, গন্ধক-দ্রাবক ও শিরকায় ভিজাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহা মোমের ন্যায় কোমল হয়, তখন ইহাকে ইচ্ছামত বাড়াইতে কমাইতে পারা যায়। তাহার পর ইহাকে

শুভ্র শিরকায় পুনরায় ভিজাইলে কঠিন হয়। এ কথা কিন্তু কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। বিশ্বাস হয় না। চতুরঙ্গের বল, নরমূর্ত্তি প্রভৃতি নানা কার্য্য সেখানে হস্তিদন্ত হইতে ইউরোপবাসীরা প্রস্তুত করিতেন।

হস্তিদন্তের বিষয়ে অধিক আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কি কি বস্তু ইহা দ্বারা হয়, উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা হইতে এক প্রকার বুঝা যাইবে। স্থূল কথা এই, এ কার্য্যের উন্নতি নাই, উন্নতি হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল এ কার্য্য কেন? আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন কোনও সূক্ষ্ম কার্য্যেরই আর বিশেষরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত আজকাল নানা স্থানে সভা সংস্থাপিত হইতেছে। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে। তাহাদের সহায়তায় আপাতত শিল্পকার-দিগের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতে পারিবে। কিন্তু পূর্ব্বের মত সূক্ষ্ম-কার্য্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া অধিক অর্থ লাভের আর প্রত্যাশা নাই। লোকে এখন সকল দ্রব্যই সুলভমূল্যে কিনিতে বাসনা করেন। ভাল দ্রব্য কিন্তু সুলভ হইতে পারে না। ভাল দ্রব্যের তাই ক্রেতা নাই। আহারীয় দ্রব্যাদি যেরূপ মহার্ঘ হইয়াছে, তাহাতে কারিগরেরা পূর্ব্বের দরেও এখন ভাল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। সেইরূপ দ্রব্য এখন কিন্তু লোকে অর্দ্ধেক দামে কিনিতে চান, এইরূপ অবস্থায় যে ফল ফলা সম্ভব, তাহাই ফলিতেছে। অন্নাভাবে কারিগরগণ স্ব স্ব ব্যবসা পরিত্যাগ করিতেছে। মোটামুটি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অতি সুলভদ্রব্য প্রস্তুত না করিতে পারিলে এখন আর লোকের ঘরে অন্ন হইবে না। একদিকে ৪০ টাকা গজের ঢাকাই মলমল, আর একদিকে তিন আনা গজের বিলাতী মলমল ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। —বিলাতী তন্তুবায়গণ ক্রোরপতি, আর ঢাকাই তন্তুবায়গণ নিরন্ন।

পাথুরে কয়লা

যুগ-যুগান্তরের সূর্য্য-কিরণ॥ যে সাহেব প্রথম রেলগাড়ীর কল করেন, তাঁহার নাম ষ্টিফেনসন। কলে গাড়ী চলিবে শুনিয়া বিলাতের লোক আশ্চর্য্য হইলেন। অনেকে উপহাস করিলেন; অনেকে বলিলেন,—"ষ্টিফেনসন পাগল, তাহাকে পাগলা-গারদে রাখা উচিত।"

একদিন তাঁহার একটী বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ষ্টিফেনসন! তোমার গাড়ী টানিতে যদি ঘোড়া চাই না, গরু চাই না, তবে তোমার গাড়ী কি করিয়া চলিবে?"

ষ্টিফেনসন উত্তর করিলেন,—"সূর্য্য-কিরণ আমার গাড়ী টানিবে। যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে যে রৌদ্র হইয়াছিল, সেই রৌদ্র পৃথিবীর ভিতর কারাবদ্ধ হইয়া আছে। আমি সেই রৌদ্রকে মুক্ত করিয়া আমার গাড়ীতে যুতিয়া দিব। তাহার বলে আমার গাড়ী চলিবে।"

ষ্টিফেনসনের কথা শুনিলে হাসি পায়। কিন্তু তিনি পরিহাস করেন নাই, সত্য কথাই বলিয়াছিলেন।

পাথুরে কয়লার ভিতর সূর্য্য-কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে, পোড়াইলেই বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতেই আলো ও উত্তাপ হয়।

রেলগাড়ীর কলে লৌহনির্মিত একটী লম্বা পিপার ভিতর প্রচুর জল থাকে। এই পিপাটীকে "বয়লার" বা গরম-জলের হাঁড়ি বলে। ইহার উপরদিকে একটু আল্‌গা-ভাবে ছিপির ন্যায় একটী লৌহদণ্ড থাকে।

কয়লা পুড়িয়া, তাহার উত্তাপে কলের ভিতর যে জল থাকে, তাহা ফুটিয়া বাষ্পরূপ ধারণ করে। বাষ্প হইয়া বারিকণা-সমুদয় আকাশে পলাইবার নিমিত্ত পথ অন্বেষণ করে। বয়লারের ছিদ্রের নিকট যাইয়া দেখিতে পায় যে, একটী লৌহদণ্ড পথ যোড়া করিয়া আছে। বাহিরে পলাইবার নিমিত্ত বারিকণাগণ সেই লৌহদণ্ডকে তুলিয়া ধরে। একটু উঠিয়া লৌহদণ্ডটী পুনরায় স্বস্থানে নামিয়া পড়ে। আবার বারি-কণারা তাহাকে তুলিয়া ধরে, আবার সে নামিয়া পড়ে। এইরূপ পুনঃপুন লৌহদণ্ডটী উঠিতে ও নামিতে থাকে।

ভাত উথলিয়াও ঠিক এইরূপ হয়। যতক্ষণ না ভাত ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণ হাঁড়ির মুখের সরাটী স্থির হইয়া থাকে। অগ্নির উত্তাপে হাঁড়ির ভিতরের জল যখন বাষ্পরূপ ধারণ করে, তখন আকাশে পলাইবার নিমিত্ত বারি-কণারা হাঁড়ির মুখ হইতে সরাখানিকে ফেলিয়া দিতে যত্ন করে। এখানে সরাখানি যা, বয়লারে লৌহদণ্ডটী তা।

বয়লারে লৌহদণ্ডটী এইরূপে একবার উঠিতে একবার নামিতে থাকে। এই লৌহদণ্ডটীর সহিত গাড়ীর চাকার যোগ থাকে। লৌহদণ্ডের উঠা-নামার বলে গাড়ির চাকা ঘুরিতে থাকে। তাহাতেই রেলগাড়ি চলে।

সুতরাং কথা হইল এই—পাথুরে-কয়লার ভিতর সূর্য্য-কিরণ নিহিত আছে। এই সূর্য্যকিরণের বলে জল বাষ্পরূপে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প সূর্য্যকিরণের শক্তি পাইয়া লৌহদণ্ডকে একবার উঠায়, একবার নামায়। সেই শক্তিতেই রেলগাড়ী চলে।

পাথুরে কয়লা ॥ পাথুরে-কয়লার ভিতর সূর্য্যকিরণ কি করিয়া আসিল? এখন সেই বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

লৌহের গল্পে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কারবণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। তখন, এই নামগুলি মনে করিয়া রাখিতে সকলকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যাঁহাদের মনে নাই, তাঁহারা পুনরায় লৌহের গল্পটী পড়িয়া লইবেন।

নিশ্বাসের সহিত আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। অক্সিজেন না পাইলে জীব জীবিত থাকিতে পারে না। যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে যাইলে জীব মরিয়া যায়।

কিন্তু নিশ্বাসের সহিত যদি আমরা কেবল খাঁটী অক্সিজেন লই, তাহা হইলে আমাদের শরীরের সমুদয় কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। অন্তরে অন্তরে গুমে গুমে পুড়িয়া আমরা শীঘ্রই মরিয়া যাই। তাই অক্সিজেনের সহিত প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। আমরা যে বায়ুর ভিতর ডুবিয়া আছি, তাহা আর কিছুই নহে; কেবল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুইটী বাষ্পীয় পদার্থ।

আহারের সহিত প্রচুর পরিমাণে আমরা কারবণ গ্রহণ করি। নিশ্বাসের সহিত অক্সিজেন যাইয়া শরীরের ভিতর সেই কারবণের সহিত মিশ্রিত হয়। এই দুই বস্তুর মিশ্রণে নূতন একটী যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। তাহার নাম কারবণিক অম্ল। ইহা বাষ্প, কঠিন বস্তু নয়। চক্ষে আমরা ইহাকে দেখিতে পাই না। কারবণিক অম্ল বিষ, অধিক পরিমাণে নিশ্বাসের সহিত লইলে জীব মরিয়া যায়।

প্রাণি-শরীরে যেমনি মুহুর্মুহু কারবণিক অম্লবাষ্প প্রস্তুত হয়, তেমনি তাহা প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। কোটি কোটি প্রাণি-শরীর হইতে এইরূপে অহরহ কারবণিক অম্ল বাহির হইতেছে। এ কারবণিক অম্ল যায় কোথা? কারণ, এই সাংঘাতিক বিষ যদি বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে একটী প্রাণীও জীবিত থাকিতে পারে না।

বৃক্ষেরা এই কারবণিক অম্ল গ্রহণ করে পূর্বেই বলিয়াছি, এই বাষ্প একটী যৌগিক পদার্থ, অর্থাৎ কিনা,—ইহা কেবল অক্সিজেন ও কারবণ। পত্রের দ্বারা বৃক্ষেরা কারবণিক অম্লকে টানিয়া লয়। সেইখানে ইহা পরিপাক হয়। বৃক্ষেরা কারবণ হইতে অক্সিজেন পৃথক্ করিয়া ফেলে। কারবণ লইয়া বৃক্ষেরা আপনাদিগের শরীর, অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে। অক্সিজেনে তাহাদের অধিক আবশ্যক নাই। অক্সিজেনকে তাহারা ছাড়িয়া দেয়। বিশুদ্ধ অক্সিজেন পুনরায় বায়ুতে প্রত্যাগমন করে।

কিন্তু কারবণিক অম্লকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অক্সিজেন ও কারবণকে পৃথক্ পৃথক্ করা সহজ কথা নহে। রাসায়নিক বলপ্রয়োগ না করিলে একার্য্য সিদ্ধ হয় না। বৃক্ষেরা সেই বল, সেই শক্তি সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষ-পত্রের উপর যখন সূর্য্য-কিরণ পতিত হইতে থাকে, তখন বৃক্ষেরা সেই সূর্য্য-কিরণ গ্রহণ করিয়া, তাহার বলে কারবণ হইতে অক্সিজেনকে পৃথক্ করিয়া ফেলে। অক্সিজেন ত বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু কারবণ কাষ্ঠরূপে বৃক্ষ-শরীরে রহিয়া যায়। সুতরাং গৃহীত সূর্য্য-বল এই বৃক্ষ-কাষ্ঠে নিহিত থাকে। কাষ্ঠ পোড়াইলে পুনরায় তাহা বাহির হইয়া আলো ও উত্তাপ প্রদান করে।

পুনরায় বলিতেছি, স্থূলকথা এই,—বৃক্ষশরীর গুটিকতক ধাতু, কারবণ ও গুটিকতক বাষ্প দিয়া নির্ম্মিত। বৃক্ষ-শরীর পোড়াইলে, অদৃশ্যভাবে যাহা উড়িয়া যায় ও বায়ুতে গিয়া মিশ্রিত হয়, তাহাই বাষ্প; আর অবশিষ্ট যাহা ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাই ধাতু।

বৃক্ষেরা ধাতু কোথায় পায়? কোথা হইতে ধাতু লইয়া তাহারা আপনাদিগের শরীর নির্ম্মাণ করে?—ভূমিতে ধাতু আছে, মূলদ্বারা বৃক্ষেরা সেই ধাতু ভোজন করে।

বৃক্ষেরা বাষ্প কোথায় পায়? কোথা হইতে বাষ্প লইয়া আপনাদিগের শরীর নির্ম্মাণ করে? ভূমিতে জল আছে। জল আর কিছুই নয়, কেবল দুটী বাষ্প—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে রাসায়নিকভাবে যোগ করিলেই জল হয়। মূল দ্বারা বৃক্ষেরা জল পান করে।

বৃক্ষেরা কারবণ কোথায় পায়? কোথা হইতে কারবণ লইয়া আপনাদিগের শরীর নির্ম্মাণ করে? —মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ প্রশ্বাসের সহিত কারবণিক অম্ল পরিত্যাগ করে। সেই কারবণিক অম্ল বায়ুতে থাকে। মনুষ্যের যেরূপ নাক, বৃক্ষদিগের সেইরূপ পত্র। পত্রদ্বারা তাহারা কারবণিক অম্ল নিশ্বাস লয়। নিশ্বাসের সহিত এই কারবণিক অম্ল বৃক্ষ-শরীরে প্রবেশ করে। কারবণিক অম্ল আর কিছুই নয়, কেবল কারবণ ও অক্সিজেন।

এইরূপে ভূমি ও বায়ু হইতে বৃক্ষেরা ধাতু, কারবণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পান-ভোজন করে। এতদ্ভিন্ন তাহারা নাইট্রোজেনও অধিক পরিমাণে লইয়া থাকে।

বৃক্ষদিগের পান-ভোজন হইল,—ভূমি ও বায়ু হইতে তাহারা ধাতু, কারবণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পান-ভোজন করিল। কিন্তু কেবল খাইলে

হইবে না, এই সমস্ত বস্তু পরিপাক করিতে হইবে, তবে বৃক্ষ-শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইবে ; তবে ছাল হইবে, কাঠ হইবে, পাতা হইবে, ফুল হইবে, ফল হইবে।

পরিপাকের নিমিত্ত আর একটী দ্রব্যের প্রয়োজন। সে দ্রব্যটী সূর্য্য-কিরণ, —প্রবল প্রতাপশালী সূর্য্যরশ্মি, যাহা আলোক ও উত্তাপরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়। যখন সূর্য্যরশ্মি বৃক্ষ শরীরে পতিত হইতে থাকে, তখন অতি আগ্রহের সহিত বৃক্ষেরা ইহা পান করে, ক্রমাগত গিলিতে থাকে। সূর্য্য-কিরণ বৃক্ষ-শরীরে রূপান্তর হয়, আলো ও উত্তাপরূপ পরিত্যাগ করিয়া "শক্তি" রূপ ধারণ করে। এই শক্তির সহায়তায় বৃক্ষদিগের পান-ভোজন পরিপাক হইয়া কাষ্ঠ, পত্র, ফুল, ফলে পরিণত হয়।

লর্ড লিটন আপনার কবিতায় লিখিয়াছেন,—"The Wind and the Beam loved the Rose" "বায়ু ও সূর্য্যকিরণ গোলাপকে ভালবাসে।" কেবল তাহা নহে। ঐ যে সুন্দর সুগন্ধময় মনোহর গোলাপটী, তাহা বায়ু ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা গঠিত, এ কথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না।

বৃক্ষেরা সূর্য্যকিরণ গ্রহণ করিয়া এইরূপে আপনাদিগের শরীরে পরিপাক করিয়া রাখে। "শক্তি" রূপে বৃক্ষ-শরীরে ইহা অদৃশ্যভাবে নিহিত থাকে।

তাহার পর কি হয়? তাহার পর কালের বশে বৃক্ষ মরিয়া যায়। কিন্তু বৃক্ষেরা জীবিত থাকিতে যে সূর্য্য-কিরণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আর যায় না। তাহা তাহাদের মৃতদেহে রহিয়া যায়।

তবে হয় এই যে, বৃক্ষদিগের মৃতদেহ হইতে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বাহির হইয়া যাইতে থাকে। বৃক্ষ-শরীর বিশুদ্ধ কারবণে পরিণত হইতে থাকে। কতক পরিমাণে এই সমুদয় দ্রব্য বাহির হইয়া যাইলে, লোকে বলে,—"এ কাষ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে।"

কাষ্ঠ কারবণ দিয়াই বিশেষরূপে গঠিত। এই কারবণের ভিতর সেই সূর্য্য-শক্তি সুষুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে। অগ্নি সংযোগ করিলেই সেই সূর্য্যশক্তি পুনরায় জাগরিত হয়, পুনরায় তাহা আলোক ও উত্তাপরূপ ধারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাহাকেই লোকে বলে যে, "অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে।"

বৃক্ষ-শরীর শুষ্ক হইলেও কারবণ ব্যতীত তাহাতে ধাতু, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন রহিয়া যায়। কিন্তু এই বৃক্ষ-শরীর যদি কোনরূপে মাটী চাপা পড়ে, তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে ইহা হইতে আরও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইতে থাকে। কাঠে আগুন দিয়া, তাহার উপর আলগা আলগা মাটী চাপা দিয়া, লোকে যাহা করে তাহাই হয়। ক্রমে কয়লারূপে পরিণত হয়।

অল্প পরিমাণে অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইলে, উদ্ভিদ-শরীর ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকারূপ ধারণ করে। তাহাকে তখন পিট্ (Peat) বলে। জলা প্রভৃতি স্থানে যে কাল মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অক্সিজেন-হীন উদ্ভিদ শরীর। কিন্তু তাহাতে বালুকা প্রভৃতি অনেক ধাতব বস্তু মিশ্রিত থাকে,সেজন্য তাহা জ্বালাইতে পারা যায় না। পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে অনেক স্থলে এরূপ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা বাহির হয়, তাহাতে উদ্ভিদের ভাগ অধিক, বালুকা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ কম ; সেরূপ পিট্‌কে জ্বালাইতে পারা যায়। আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকেরা জলা হইতে এইরূপ পিট্ কাটিয়া অগ্নি করে, সেই অগ্নিতে রন্ধনাদি কার্য্য নির্বাহ করে। জলার ঘাস প্রভৃতি কোমল উদ্ভিদ শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া সচরাচর "পিট্" হয়।

মাটি-চাপা পড়িয়া, অক্সিজেন বাহির হইয়া, কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, ঘাস প্রভৃতি কোমল উদ্ভিদ শরীর "পিট্" রূপে পরিণত হয়। ঠিক সেইরূপ অবস্থায় পড়িলে

কঠিন কাষ্ঠ "পিট্" না হইয়া "লিগনাইট" হয় (Lignite)। লিগনাইটকে ঠিক কাঠের কয়লার মত দেখিতে। লিগনাইটের ভিতর হইতে সর্বদা কার্বণ ও অক্সিজেন বাহির হয়। কার্বণ ও অক্সিজেন পৃথক্ পৃথক্ হইয়া বাহির হয় না। পূর্বে যে কারবণিক অম্লের কথা বলিয়াছিলাম, সেই কারবণিক বাষ্প হইয়া বাহির হয়। এই বাষ্প বিষ। কয়লার খনিতে এই বিষ নিশ্বাসের সহিত লইয়া মাঝে মাঝে অনেক মনুষ্য মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া, লিগনাইট হইতে যদি অক্সিজেন বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে লিগনাইটের আকার ক্রমে পরিবর্তিত হয়। লিগনাইট আর তখন কাঠের কয়লার মত দেখায় না, তখন ইহা প্রস্তরের মত দেখিতে হয়। সেইজন্য লোকে তখন ইহাকে আর লিগনাইট বলে না ; লোকে তখন ইহাকে "পাথুরে কয়লা" বলে।

পৃথিবীর নানাস্থানে মাটীর ভিতর অনেক লিগনাইট আছে। এই লিগনাইট হইতে এখন ক্রমে ক্রমে অক্সিজেন বাহির হইতেছে। তিন চারি সহস্র বৎসর পরে, যখন ইহার ভিতর হইতে অনেক অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইবে, তখন ইহা পাথুরে কয়লা হইয়া মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী হইবে। কিন্তু তিন চারি সহস্র বৎসর সময়টা নিতান্ত অল্প নহে। পোলণ্ড দেশের একটী লোক বলেন যে, "ততদিন আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর যেখানে যত লিগনাইট আছে, তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। মাটি চাপা পড়িয়া কাঠ কি করিয়া ক্রমে ক্রমে লিগনাইট হয়, লিগনাইট আবার কি করিয়া ধীরে ধীরে পাথুরে-কয়লা হয়, সে বিষয় তিনি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে তদন্ত করিয়া দেখিলেন। তাহার পর লিগনাইটকে একেবারে পাথুরে কয়লা করিবার নিমিত্ত তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। শুনিতেছি, তাঁহার চিন্তা নাকি সফল হইয়াছে। লিগনাইটকে একেবারে পাথুরে কয়লা করিবার উপায় নাকি তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে পাথুরে কয়লা আরও সুলভ হইবে।

লিগনাইট হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইলে যে পাথুরে কয়লা হয়, তাহা অতি উত্তম কয়লা নহে। সে কয়লার ভিতর অধিক পরিমাণে হাইড্রোজেন রহিয়া যায়। সেই হাইড্রোজেন কারবণের সহিত মিশিয়া নানা প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে ; যথা,—আলকাতরা, পিচ, পেট্রোলিয়াম বা অপরিষ্কার কেরোসিন তৈল, বিটুমেন ইত্যাদি। সেইজন্য এইরূপ কয়লাকে বিটুমিনস্ কয়লা বলে। জ্বলিবার সময় এই কয়লা হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়।

যদি এই পাথুরে কয়লা হইতে হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হয়। খনির ভিতর থাকিয়া ইহা হইতে আপনা-আপনি হাইড্রোজেন বাহির হইতে থাকে। হাইড্রোজেন একেলা বাহির হয় না, ইহার সহিত কারবণ মিশ্রিত থাকে। সেইজন্য এই হাইড্রোজেন ও কারবণ-মিশ্রণে উৎপন্ন বাষ্পকে "কারবণেটেড হাইড্রোজেন" বলে। কলিকাতার রাস্তায় যে গ্যাস জ্বলে, ইহা এই কারবণেটেড হাইড্রোজেন। কোনও কোনও কয়লার খনিতে এই গ্যাস সময়ে সময়ে প্রচুর পরিমাণে একত্রীভূত হয়। কর্মচারীরা যেই সেখানে মশাল লইয়া কাজ করিতে যায়, আর সেই গ্যাস 'দপ' করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহাতে অনেক লোক মরিয়া যায়।

ঘরে গ্যাসের নল থাকিলে, কখন কখন সেই নলে ছিদ্র হইয়া ঘর গ্যাসে পরিপূর্ণ হয়। সে গ্যাস দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা গ্যাস জ্বালাইবার নিমিত্ত দেশলাই জ্বালাইলেই সেই গ্যাসে আগুন লাগিয়া যায়। আমাদের দেশের

ঘরের দ্বার জানালা সর্বদা মুক্ত থাকে বলিয়া সচরাচর বড় এজন্য বিপদ ঘটিতে শুনা যায় না; কারণ সেই দ্বার-জানালা দিয়া গ্যাস বাহির হইয়া যায়। কিন্তু বিলাতে দ্বার-জানালা সর্বদা বন্ধ থাকে, সুতরাং সেখানে ঘরের ভিতর গ্যাস জমিয়া থাকে, আর সেই গ্যাসে আগুন লাগিয়া মাঝে মাঝে লোক মারা পড়ে। যাহা হউক, গ্যাসের গন্ধ পাইলেই, যেখান হইতে গ্যাস বহির হইতেছে সেস্থান বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। বিটুমিনস্ কয়লা হইতে হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যাইলে, তাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ পাথুরে কয়লা হয়। সে কয়লাকে অ্যান্থ্রাসাইট্ কয়লা বলে। অ্যান্থ্রাসাইট্ কয়লা অনেকটা কোক কয়লার মত। হাতে করিলে হাতে কালি লাগে না, আর জ্বালাইলে ইহাতে শিখা না হইয়া গন্‌গন্ করিয়া জ্বলে।

মাটি চাপা পড়িয়া এইরূপে কাঠ হইতে ক্রমে ক্রমে পাথুরে কয়লার উৎপত্তি হয়। কাঠ হইতে লিগনাইট হয়, লিগনাইট হইতে বিটুমিনস্ কয়লা হয়, বিটুমিনস্ কয়লা হইতে ভাল অ্যান্থ্রাসাইট্ কয়লা হয়। কাঠ যতই কয়লা হইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ইহা হইতে অন্যান্য পদার্থ দূরীভূত হইয়া ইহাতে কারবণের ভাগ অধিক হয়। কারবণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—এই তিন বস্তুই কাঠের প্রধান উপকরণ। এই তিন বস্তু শতকরা কিসে কত থাকে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত তালিকা দেখিলেই জানিতে পারা যায়।

	কাঠে	পিটে	লিগনাইটে	কয়লায়
কারবণ	৫০.০	৬০·০	৬৫·৭.	৮২·৬
হাইড্রোজেন	৬.২	৬·৫	৫·৩	৫·৬
অক্সিজেন	৪৩.৮	৩৩·৫	২৯·০	১১·৮
	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

উপরি-উক্ত তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঠে ১০০ ভাগে কেবল ৫০ ভাগ কারবণ থাকে ও পাথুরে কয়লায় ১০০ ভাগে ৮২ ভাগ কারবণ থাকে। ভাল অ্যান্থ্রাসাইট্ পথুরে কয়লায় কখন কখন ১০০ ভাগে ৯৪ ভাগ কারবণ থাকে। আসল কথা,—কয়লা যত বিশুদ্ধ কারবণ হইবে, ততই ভাল হইবে। বিশুদ্ধ কারবণ না হইয়া কয়লায় যত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি অপর পদার্থ মিশ্রিত থাকিবে, সে কয়লা ততই নিকৃষ্ট হইবে।

বৃক্ষ-শরীর পৃথিবীর ভিতর অবস্থান করিয়া কয়লা হওয়াই কি ইহার রূপান্তরের চরম সীমা? তাহা বোধ হয় না। যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত ইহা আরও পরিশোধিত হইতে থাকে। ইহার রূপ আরও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তখন বোধ হয়, ইহা গ্র্যাফাইট বা কৃষ্ণ সীসে পরিণত হয়, যাহা দিয়া উডপেন্সিল প্রস্তুত হয়।

বৃক্ষ-কাষ্ঠ কৃষ্ণসীস হইয়াই কি চুপ করিয়া থাকে? তাহা বোধ হয় না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ইহা আরও পরিশোধিত হইয়া বিশুদ্ধ কারবণে পরিণত হইতে থাকে। ইহার রূপ আরও পরিবর্ত্তিত হয়। বোধ হয়, তখন ইহা মহামূল্য, উজ্জ্বল হীরক হয়।

কোথা হইতে আসিল? ভূমির নিম্নে এত কাঠ কোথা হইতে আসিল, যে, কালক্রমে তাহা হইতে অক্সিজেন প্রভৃতি অপরাপর পদার্থ বহির্গত হইয়া পাথুরে-কয়লায় পরিণত হইল?—বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে,

পৃথিবী এককালে কেবল বাষ্পময় ছিল। পৃথিবীতে তখন জল ছিল না, মৃত্তিকা ছিল না, কোনও রূপ তরল বা কঠিন পদার্থ কিছুই ছিল না। অতি বিস্তৃত গোলাকার বাষ্পরাশি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া তখন কেবল ঘূর্ণিত হইতেছিল। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই বাষ্পরাশি ক্রমে শীতল হইতেছিল। শৈত্যের গুণ—ঘনীভূত-করণ ; উষ্ণতার গুণ—প্রসারণ। শীতে নারিকেল তৈল জমিয়া দৃঢ় হয়, জল জমিয়া বরফ হয়। উষ্ণতায় পুনরায় তাহা গলিয়া প্রসারিত হয় ; উষ্ণতায় বরফ গলিয়া জল হয়, উষ্ণতায় জল আরও প্রসারিত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করে। তাই সেই বাষ্পময় পৃথিবী যতই শীতল হইতে লাগিল, ততই তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। নানারূপ মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি তরল ও কঠিন বস্তু-সমুদয় উৎপন্ন হইতে লাগিল। এককালে পৃথিবী কেবল জলেই আবৃত ছিল। তখন মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীব ভিন্ন পৃথিবীতে অপর কোনও জীব ছিল না। পৃথিবী ক্রমে আরও ঘনীভূত হইয়া জল ও স্থলে পরিণত হইল। কিন্তু কোমলতা হেতু তখনও পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হয় নাই। এই সময়ে পৃথিবীর স্থলভাগ,নিবিড় উদ্ভিজ্জে আবৃত হইল। এই উদ্ভিজ্জ মাটী চাপা পড়িয়া কালক্রমে পাথুরে কয়লা হইয়াছে।

কোটি কোটি বৎসর পূর্বে এই ঘটনা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে পাথুরে-কয়লার উৎপত্তি যে একেবারে বন্ধ হইয়াছে, তাহা নহে। কোটি কোটি বৎসর পরে যাহা পাথুরে কয়লা হইবে, তাহার আয়োজন বোধ হয়, এখনও পৃথিবীতে চলিতেছে। আমাদের সুন্দরবনে পাথুরে-কয়লা উৎপত্তির উপকরণ সমুদয় বর্তমান আছে। নিবিড় বন আছে, প্রতি বৎসর এই বন, রাশি রাশি পচিতেছে। নদীর ধোয়াটে উদ্ভিজ্জ শরীর মাটী-চাপা পড়িতেছে। কালক্রমে এই উদ্ভিজ্জ শরীর হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইবে, কালক্রমে ইহা প্রস্তরের আকার ধারণ করিবে ও তখন ইহা পাথুরে-কয়লা হইবে। এক্ষণে নদীর ধোয়াটে ইহার পর যে বালুকা ও কর্দ্দম পড়িতেছে, কালক্রমে তাহাও প্রস্তর হইয়া যাইবে। বালুকা হইতে যে প্রস্তর হয়, তাহাকে 'বালুকা-প্রস্তর' বলে। ইঁটের ন্যায় তদ্দ্বারা গৃহাদি নির্মিত হইতে পারিবে। কর্দ্দম হইতে শ্লেট-প্রস্তর উৎপন্ন হয়। সামুদ্রিক শম্বুকাদির খোলা ধ্বংস হইয়া যে প্রস্তর হয়, তাহাকে 'চূর্ণ প্রস্তর' বলে।

যেখানে পাথুরে-কয়লা আছে, সেইখানেই তাহার উপর 'বালুকা-চূর্ণ-শ্লেট' প্রভৃতি প্রস্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে এই বালুকা ও কর্দ্দম, নদীর ধোয়াটে আসিয়া বনকে চাপা দিয়াছিল। এক্ষণে যেখানে পাথুরে-কয়লা আছে, এক সময়ে সেস্থানে ঘন বনাবৃত সুন্দরবনের ন্যায় নদীর মোহানা ছিল। নদী-মুখ-স্থিত উর্বর কর্দ্দম—ভূমিতে এই বন বহুকাল পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভূমিকম্প দ্বারা হউক, অথবা অন্য কোনও কারণে হউক, বনাবৃত এই ভূমি বসিয়া যায়। তখন সেই ভূমি নিম্ন হইয়া জলমগ্ন হয়। বন মরিয়া যায়। নদী-স্রোতে বনের উপর বালুকা ও কর্দ্দম আসিয়া পড়ে। বালুকা-কর্দ্দম দ্বারা বন আবৃত হইয়া পড়ে। ধোয়াটে ধোয়াটে পুনরায় ভূমি উচ্চ হয়। তাহার উপর পুনরায় উদ্ভিজ্জ জন্মে, পুনরায় সেস্থান ঘোর নিবিড় বনে আবৃত হইয়া পড়ে। বহুকাল পরে পুনরায় সেস্থান বসিয়া যায়। আবার তাহা জলমগ্ন হয়, বন মরিয়া যায়, বালুকার ধোয়াটে আবৃত হয়। অনেক স্থানে কয়লার খনিতে এইরূপ স্তরে স্তরে পাথুরে-কয়লা ও স্তরে স্তরে প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় রকি মাউণ্টেন নামক একটী পর্বতশ্রেণী আছে ; সেই পর্বতস্থিত কয়লার খনিতে এইরূপ ত্রিশটী পাথুরে-কয়লার স্তর আছে। সুতরাং ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুগ-যুগান্তর পূর্বে ত্রিশবার এই ভূমি বসিয়া জলমগ্ন

হইয়াছিল, ত্রিশবার ইহার উপর নিবিড় বন জন্মিয়াছিল ; ত্রিশবার নদীর ধোয়াটে এই বন মাটী-চাপা পড়িয়াছিল। কলিকাতায় যখন শিয়ালদহ ষ্টেশন হয়, তখন মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে বন বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। বনের বৃক্ষাদি অবশ্য মরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মাটী-চাপা থাকিয়াও বৃক্ষগণ স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। কালক্রমে এই বৃক্ষকাষ্ঠ পাথুরে-কয়লায় পরিণত হইত। অনেক পাথুরে-কয়লার খনিতে কয়লারূপ প্রাপ্ত এইরূপ দণ্ডায়মান বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে আবার ফাঁপা বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বনে থাকিতে এইরূপ ফাঁপা বৃক্ষগুলির ভিতরের কাঠ পচিয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল। বাহিরে কেবল কাঁচা ছাল ছিল, তাহাতেই বৃক্ষ জীবিত ছিল। এমন সময় ভূমি বসিয়া যাইল, বৃক্ষটী জলমগ্ন হইয়া মরিয়া গেল। সেস্থানে নদীর ধোয়াটে আসিয়া পড়িতে লাগিল। নদীর বালি বৃক্ষ-কোটরে প্রবেশ করিল, বাহিরে ছালের দ্বারা আবৃত রহিল। কালক্রমে ছাল-ভাগটী পাথুরে-কয়লায় পরিণত হইল, অভ্যন্তরস্থ বালুকা প্রস্তর হইল। কয়লার খনির ভিতর লোকে এই প্রস্তর-রূপ বৃক্ষকে থাম করিয়া রাখে। কখনও কখনও বাহিরের সামান্য কয়লার আবরণ, ভিতরের বালুকা-প্রস্তরের ভার সহ্য করিতে পারেনা, থামটী ঝুপ করিয়া পড়িয়া যায় ; তখন কাছে যাহারা থাকে, তাহারা আঘাতে হত বা আহত হয়। পূর্ব্বকালে যেরূপ ভূমি বসিয়া বন জলমগ্ন হইয়া ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রোথিত হইয়া পাথুরে-কয়লা হইয়াছিল, এক্ষণেও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে ভূমি বসিয়া যাওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু-নদের মুখে ভূমিকম্প হইয়া অনেক ভূমি এইরূপ বসিয়া গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূরে ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ ৮ ক্রোশ প্রস্থ সাত হাত উচ্চ হইয়া একখণ্ড ভূমি উত্থিতও হইয়াছিল। এখানকার লোকে আজ পর্য্যন্ত এই উত্থিত ভূমিখণ্ডকে "আল্লা-বাঁধ" বলে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় 'মিসিসিপি' নদীর নিবিড় বনাবৃত একটী প্রদেশ এইরূপ বসিয়া গিয়াছিল। পাঁচ বৎসর গত হইল, যবদ্বীপে ভূমিকম্প হইয়া অনেক ভূমি এইরূপে সমুদ্র-গর্ভে নিহিত হইয়া গিয়াছিল। আজ প্রায় একমাস হইল, ফিলিপাইন দ্বীপেও এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছে। এই সকল ভূমির উপর যে বন-বৃক্ষ আছে, ক্রমে তাহা মৃত্তিকা দ্বারা প্রোথিত হইয়া যাইবে। বনের কাষ্ঠ কালক্রমে প্রথমে লিগনাইট, পরে পাথুরে-কয়লা হইবে। পৃথিবীস্থ সমুদয় পাথুরে-কয়লা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে।

কয়লা কারে বলে॥ অনেক স্থানে প্রোথিত উদ্ভিজ্জ-শরীর কয়লারূপ ধারণ করিয়াও এত অধিক মৃত্তিকা ও কর্দ্দম মিশ্রিত হইয়া থাকে যে, তাহাকে প্রকৃত পাথুরে-কয়লা বলিতে পারা যায় না। উদ্ভিজ্জের ভাগ অধিক ও কর্দ্দমাদির ভাগ অল্প থাকিলে তাহাকে জ্বালাইতে পারা যায়, তাহাতে চুয়াইয়া মৃত্তিকা-তৈলও বাহির করিতে পারা যায়। এইরূপ পদার্থকে বিটুমিনস শেল বলে। উৎকৃষ্ট বিটুমিনস শেল ও নিকৃষ্ট পাথুরে কয়লায় বিভিন্নতা অতি সামান্য! এত সামান্য, যে, এরূপ পদার্থকে নিকৃষ্ট কয়লা বলা উচিত কি উৎকৃষ্ট শেল বলা উচিত, এই কথা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পাথুরে-কয়লা কারে বলে, বা 'শেল' কারে বলে? এই কথা লইয়া বিলাত ও ক্যানাডায় কয়েকবার ঘোরতর মোকদ্দমা হইয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্কটলাণ্ড-দেশীয় একজন জমিদার আপনার জমিদারিতে কয়লা তুলিবার নিমিত্ত একজনকে ২৫ বৎসরের নিমিত্ত পাট্টা দিয়াছিলেন। পাট্টাদার সেই ভূমি হইতে একপ্রকার পদার্থ তুলিয়া গ্যাস-কয়লা বলিয়া বেচিতে লাগিলেন। জমিদার বলিলেন,— "আমি তোমাকে কেবল কয়লা তুলিবার নিমিত্ত পাট্টা দিয়াছি, অন্য পদার্থ তুমি

তুলিতে পারিবে না। যে পদার্থ তুমি তুলিতেছ, তাহা কয়লা নহে ; তাহা বিটুমিনস শেল।" পাট্টাদার বলিলেন যে, "সে পদার্থ বিটুমিনস শেল নহে, তাহা পাথুরে কয়লা।" জমিদার আদালতে নালিশ করিলেন ও এই বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত উভয়পক্ষ সহস্র সহস্র টাকা মোকদ্দমায় ব্যয় করিতে লাগিলেন। ১৮৫৩ সালে এডিনবর্গ নগরে এই কথার আদালতে বিচার হয়। বিলাতের ছয় সাত জন মহা মহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। "নানা মুনির নানা মত।" সুতরাং পণ্ডিতেরা সেই পদার্থকে কেহ বলিলেন,—'শেল', কেহ বলিলেন, 'কয়লা'। বিচারে জজ সাহেব পদার্থটীকে কয়লা বলিয়া পাট্টাদারকে ডিক্রী দিলেন। রায়ে তিনি এই কথা লিখিলেন,—"কারে কয়লা বলিতে পারা যায়, কারে শেল বলিতে পারা যায়, এ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। সে নিমিত্ত এদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মত আমি জিজ্ঞাসা করি। পণ্ডিতগণ আমার আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। একমত হইয়া তাঁহারা এ কথার মীমাংসা করিতে পারিলেন না।" এডিনবর্গ নগরে আরও দুই একবার এই প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ক্যানাডা দেশেও একবার এইরূপ কথা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। একস্থানে অতি বিস্তৃত-ভাবে স্থিত দ্বাদশ হাত গভীর এক প্রকার খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। সে পদার্থটী কয়লা বলিয়া ভূস্বামী তাহার উপর আপনার অধিকার স্থাপনের বাঞ্ছা করেন। প্রজা বলেন যে, সে বস্তু কয়লা নহে, ভূস্বামীর তাহার উপর কোন অধিকার নাই। অবশেষে এই কথা লইয়া আদালতে ঘোরতর মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মোকদ্দমায় উভয়ের প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়। প্রথমবারে জুরিগণ স্থির করেন যে, সে পদার্থ অ্যাস্ফাল্টম। মোকদ্দমা পুনর্বিচার হয়। সেবারকার জুরিগণ বলেন যে, "না, পদার্থটী কয়লা বটে!" যেমন এডিনবর্গের মোকদ্দমায় বিলাতের যাবতীয় ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিতে আসিয়াছিলেন, তেমনি ক্যানাডার মোকদ্দমাতেও দেশ-দেশান্তর হইতে রাসায়নিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিধান দিতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলেও সেই পুরাতন কথা ফলিল,—"নানা মুনির নানা মত!" পাঠকগণ! "পদার্থটী পাথুরে-কয়লা কি পাথুরে-কয়লা নয়।" এই সামান্য প্রত্যক্ষ বিষয় লইয়াও দেখুন, পণ্ডিতে পণ্ডিতে কত বিবাদ, কত তর্ক বিতর্ক। সকল কথা লইয়াই পৃথিবীর সকল স্থানেই জানিবেন—এইভাব।

কি ভাবে থাকে॥ পাথুরে কয়লা কি ভাবে মাটীর ভিতর থাকে এখন তাহা দেখা যাক। কোনও স্থলে পাথুরে কয়লা পৃথিবীর উপরেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোনও স্থানে ইহা পৃথিবীর এত গভীর দেশে অবস্থিতি করে যে, মনুষ্য সেখানে যাইতে পারে না। কালক্রমে এই ভূগর্ভ-নিহিত কয়লা আরও উপরে উঠিতে পারে। তখন মনুষ্য ইহা তুলিতে পারিবে। পৃথিবীর নীচে কয়লা স্তরে স্তরে থাকে। নিম্নে মৃত্তিকা, তাহার উপর একস্তর কয়লা, তাহার উপর বালুকা-প্রস্তর চূর্ণ-প্রস্তর বা লৌহ-প্রস্তর, পুনরায় মৃত্তিকা পুনরায় কয়লা পুনরায় প্রস্তর ইত্যাদি। এক একটী কয়লার স্তর এক ইঞ্চি হইতে ২৫ হাত বা তাহারও পুরু হইতে পারে। সচরাচর কিন্তু এক একটী স্তর চারি পাঁচ হাতের অধিক স্থূল হয় না। একবারের বন পাঁচিয়া এইরূপ স্থূল হইবারই সম্ভাবনা। যেখানে কুড়ি পঁচিশ হাত স্থূলতা দৃষ্ট হয়, সেখানে বোধ হয়, দুই তিনটী স্তর কোনও কারণে একত্রীভূত হইয়া গিয়া থাকিবে। কয়লার স্তর এক হাতের অধিক পুরু না পাইলে তুলিয়া লাভ হয় না।

কয়লার জাতি॥ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পাথুরে কয়লা সচরাচর দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে, অ্যানথ্রাসাইট ও বিটুমিনস্। ভাল মন্দ গুণে

ইহাদিগের আবার নানা বিভেদ আছে। বিটুমিনস্ অপেক্ষা অ্যান্থ্রাসাইট অধিক প্রস্তরবৎ অধিক ধাতুবৎ অধিক ভারি। ইহা হাতে করিলে হাতে কালি লাগে না, দেখিতে ইহা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। এ কয়লায় শীঘ্র অগ্নি ধরাইতে পারা যায় না, কিন্তু একবার ধরিয়া উঠিলে ইহা হইতে প্রখর উত্তাপ বাহির হইতে থাকে। অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা হইতে ধূম নির্গত হয় না; ধাতব প্রস্তর গলাইয়া লৌহ প্রভৃতি ধাতু বাহির করিতে ও বাষ্পীয় কল চালাইবার নিমিত্ত জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে সচরাচর ইহা ব্যবহৃত হইয়াথাকে। এই কয়লায়১০০ ভাগে ৮০ হইতে ৯৫ ভাগ কারবণ থাকে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই কয়লা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা শিখা যুক্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয় না, তৈল, আলকাতরা প্রভৃতি পদার্থ ইহাতে একেবারেই থাকে না।

বিটুমিনস্ কয়লার নানা জাতি আছে। ইহার সহিত বিটুমেন, মৃত্তিকা তৈল, আলকাতরা প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া, ইহাকে বিটুমিনস্ কয়লা বলে। ইহার সহিত তৈল প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া এই কয়লা শিখাযুক্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়। ক্যানেল কোল বলিয়া এক প্রকার বিটুমিনস্ কয়লা আছে, পুড়িবার সময় তাহা হইতে চট্‌পট্ করিয়া শব্দ হয়। ক্যানেল কয়লায় বিটুমেন প্রভৃতি পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে। এ কয়লার আবার নানা জাতি আছে। এক প্রকার ক্যানেল কয়লা আছে, তাহা দেখিতে ঠিক কৃষ্ণবর্ণ মারবেল প্রস্তরের ন্যায়। ইহা কাটিয়া লোকে মালা, গহনা, বাক্স, দোয়াত প্রভৃতি বস্তু প্রস্তুত করে। মারবেল প্রস্তরের মেজের ন্যায় ইহা হইতে বড় বড় টেবেলও প্রস্তুত হইতে পারে। ক্যানেল কয়লার এ গুণ পূর্বে লোকে জানিত না। একবার বিলাতের একজন বড় মানুষ ইহা হইতে থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি বাসন প্রস্তুত করিয়া বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এই বাসনে পানভোজন করিলেন। আহারান্তে বড় মানুষ, সমুদয় বাসনগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। চট্‌পট্ শব্দ করিয়া বাসনগুলি পুড়িতে লাগিল। বন্ধুবর্গ তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। আলোকের নিমিত্ত ক্যানেল কয়লা হইতে উৎকৃষ্ট গ্যাস প্রস্তুত হয়। ইহাকে চুয়াইয়া লোকে মৃত্তিকা-তৈল ও (Paraffin) প্রস্তুত করে। স্কটলাণ্ড উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ক্যানেল কয়লা প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হইয়া থাকে।

রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে যে কয়লা আনীত হয়, ইহাকে "সাধারণ কয়লা" বলে। ইহা দিয়া আমরা পাজা পোড়াই ও ইহা হইতে যে কোক কয়লা প্রস্তুত হয়, তাহা দিয়া আমরা রন্ধনাদি-কার্য্য নির্বাহ করি। ইহা এক প্রকার বিটুমিনস্ কয়লা।

যে বৃক্ষকাষ্ঠ এখনও সম্পূর্ণভাবে কয়লারূপে পরিণত হয় নাই, তাহাকে লিগনাইট বলে। জ্বালাইবার নিমিত্ত অনেক দেশে লিগনাইটও লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে কিন্তু কার্বণের ভাগ অল্প; একশত ভাগে ৫০ হইতে ৭০ ভাগ। অবশিষ্ট অক্সিজেন, হাড্রোজেন ও নাইট্রোজেন। কারবণের ভাগ ইহাতে অল্প বলিয়া,প্রকৃত কয়লার ন্যায় ইহা ততদূর কার্য্যোপযোগী নহে। কিন্তু যে দেশে ভাল কয়লা নাই, আর যেখানে কাঠের অভাব, সেখানে কাজেই লোককে লিগনাইটের আদর করিতে হয়। জর্ম্মানী দেশে লোকে লিগনাইট হইতে মৃত্তিকা-তৈল, আলকাতরা প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

নানা দেশের কয়লা ॥ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাথুরে কয়লা আছে। কিন্তু সকল স্থানের চেয়ে বিলাতে ও আমেরিকায় ইহা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। বিলাতের কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। এখানকার কয়লায়

কারবণের ভাগ অধিক, ধাতু ও বাষ্পের ভাগ অল্প। সুতরাং ইহা হইতে ছাই অধিক বাহির হয় না। কারবণ অধিক থাকা প্রযুক্ত এই কয়লা হইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপ বাহির হয়। সুতরাং বাষ্পীয় যন্ত্র চালাইবার নিমিত্ত ইহা বিশেষ-রূপে কার্য্যোপযোগী। আর লৌহকণা-মিশ্রিত প্রস্তর বা মৃত্তিকা গলাইয়া তাহা হইতে এই কয়লা দ্বারা লৌহ সুচারুরূপে বাহির করিতে পারা যায়। বিলাত-বাসীদিগের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের দেশে, যেখানে পাথুরে কয়লা, সেইখানেই আবার প্রচুর পরিমাণে লৌহ-প্রস্তর আছে। এই দুই বস্তুর সহায়তায় এবং আপনাদিগের বিক্রম ও বুদ্ধিবলে বিলাতবাসীরা এইরূপ প্রতাপান্বিত হইয়াছেন। কালক্রমে এই দুই বস্তু, বিশেষতঃ পাথুরে কয়লা, পাছে সব খরচ হইয়া যায়, সেজন্য এখন হইতে বিলাতের লোকে চিন্তিত হইয়াছেন। পাথুরে কয়লা সব খরচ হইয়া যাইবার ভয় আপাততঃ কিন্তু কিছু নাই। তাঁহাদের দেশের মাটীর ভিতর এখনও যা পাথুরে কয়লা প্রোথিত আছে, তাহাতে অভাবপক্ষে তিন চারি শত বৎসর চলিতে পারিবে। কিন্তু তবুও এখন হইতে তাহাদিগের ভাবনা হইয়াছে যে, তিন চারি শত বৎসর পরে পাথুরে কয়লার অভাবে আমাদের দেশের হয়তো দুরবস্থা হইবে। সে নিমিত্ত কত লোকে কত চিন্তা করিতেছেন। অনেকে এখন হইতে কেরোসিন তেল জ্বালাইয়া কল চালাইবার পরামর্শ করিতেছেন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের অনুমান করেন যে বিলাতে মাটীর নীচে এখনও ৪,১০,১৪৪ কোটী মণ কয়লা নিহিত আছে। পৃথিবীর উপর হইতে তিন সহস্র হাত নিম্ন পর্য্যন্ত যে কয়লা আছে, তাহারই হিসাব হইয়াছে। তাহার নীচে যে কয়লা আছে, তাহা আর তুলিতে পারা যায় না।

ফরাসি দেশে অধিক কয়লা নাই। চারি পাঁচ স্থানে কেবল কয়লার খনি আছে। তাহা হইতে এ দেশের লোক প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ কোটী মণ কয়লা তুলিয়া থাকে। ফরাসি দেশে প্রতি বৎসর যে কয়লা খরচ হয়, তাহা দেশীয় কয়লা হইতে চলে না। বেলজিয়ম, প্রুশীয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আরও কুড়ি কোটী মণ আমদানি করিতে হয়। বেলজীয়াম একটী অতি ক্ষুদ্র সামান্য দেশ। কিন্তু বেলজিয়ম দিয়া যাইবার সময় আমি অনেক কয়লার খনি দেখিয়াছিলাম। বেলজীয়মের যে প্রদেশে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা কিছু অধিক বড় নয়, ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ ২॥ ক্রোশ প্রস্থ ইহার অধিক হইবে না। কিন্তু এখানকার খনিতে কয়লার স্তরগুলি খুব স্থূল, সুতরাং তাহা হইতে অনেক কয়লা উঠিয়া থাকে। প্রতি বৎসর বেলজীয়ম দেশে প্রায় ৬০ কোটী মণ কয়লা উৎপন্ন হয়। জর্ম্মানি দেশে নানা স্থানে কয়লা আছে। ওয়েষ্টফ্যালিয়া প্রদেশে কয়লা-ভূমির পরিমাণ প্রায় পাঁচ শত ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রস্থ। জর্ম্মানি দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ১৩৫ কোটী মণ কয়লা উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রীয়া দেশে অধিক কয়লা নাই। তবে এখানে এক্ষণে কাঠের বড় অপ্রতুল হইয়াছে। সেজন্য লোকে লিগনাইট, শেল ও নানারূপ নিকৃষ্ট কয়লা মাটীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া ব্যবহার করিতেছে। অষ্ট্রীয়া দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ২৪ কোটি মণ কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে। স্পেন দেশে অতি উৎকৃষ্ট কয়লা আছে। কিন্তু এদেশে শাসন প্রণালীর দোষে এখনও ইহা মনুষ্যের উপকারে আসে নাই। ইটালির কোনও কোনও স্থানে উত্তম অ্যানথ্রাসাইট কয়লা আছে। কিন্তু এখানকার লোকে এখনও ইহা ভালরূপে তুলিতে পারে নাই। ইটালি দেশে, ভূমধ্যসাগরের কূলবর্ত্তী স্থানসমূহে লিগনাইট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। নরওয়ে ও সুইডেন দেশে কয়লা-ভূমি আছে। কিন্তু এখনও এ দুইদেশে কাঠের অপ্রতুল হয় নাই। সুতরাং কয়লা তুলিতে লোকে বড় যত্ন করে না। রুষদেশে নানাস্থানে অতি বিস্তৃত কয়লা-ভূমি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু

পোলাণ্ড হইতেই অধিক পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হয়। রুষদেশের অপরাপর অংশের কয়লা-ভূমি এখনও পতিত রহিয়াছে। যেরূপ বিলাতে, আমেরিকাতেও সেইরূপ অতি বিস্তৃত কয়লা-ভূমি আছে। এখানকার কয়লাও অতি উৎকৃষ্ট। এই কয়লার সহায়তায় আমেরিকার লোকেও প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ডাক্তার লিভিংষ্টন আফ্রিকার নানাস্থানে কয়লা দেখিয়াছিলেন। জ্যামবেসী নামক স্থানের কয়লাভূমি হইতে তিনি স্বর্ণরেণু আহরণ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া-দেশে নানাস্থানে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। কিন্তু স্বর্ণ আহরণ করিয়া এখানকার লোকে বিপুল ধনশালী হইয়াছেন; সুতরাং কয়লা তুলিতে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন নাই। কিন্তু যেখানে যতই কয়লা থাকুক না কেন, চীনদেশের কয়লাভূমির বিস্তৃতি শুনিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। যে দুই একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত এখানকার কয়লাভূমি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ইহার পরিমাণ দুই লক্ষ বর্গ ক্রোশ। আর চীনদেশে মাটীর নীচে যে কয়লা আছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট কয়লা। কয়লার স্তর প্রায় ২০ হাত স্থূল। কিন্তু এরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট কয়লা থাকিলে কি হইবে? এখানকার মানুষেরা তাহা তুলিতে বা ব্যবহার করিতে জানে না। এই কয়লা-ভূমির উপর কাষ্ঠের ঘোরতর অপ্রতুল। গাছ কাটিয়া কাটিয়া গাছ নির্ম্মূল হইয়াছে। বৃক্ষাভাবে দেশ মরুভূমি-তুল্য হইয়াছে। রন্ধনাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকে অতি পরিশ্রমের সহিত ঘাসের গোড়াগুলি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া আহরণ করে। অথচ মাটীর নীচে এত কয়লা বৃথা পড়িয়া রহিয়াছে যে, সে কয়লা দ্বারা সমস্ত চীন দেশকে শত শত বৎসর পর্য্যন্ত রাবণের চিতার ন্যায় জ্বালাইতে পারা যায়। লক্ষ্মী সর্বত্রই বিরাজমানা, তবে কেহ বা ভক্তিভাবে তাঁহাকে মস্তকে রাখে আর কেহ বা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলে। চীনের তাই অবনতি, আর ইউরোপবাসীরাও আজ তাই লক্ষ্মীর বরপুত্র।

ভারতে কয়লা॥ ভারতবর্ষের নানাস্থানে পাথুরে কয়লা আছে। সে কয়লা কিন্তু বিলাতের মত ততদূর উৎকৃষ্ট নয়। আমাদের দেশে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা একেবারে নাই বলিলেও হয়। ভারতবর্ষের কয়লা,—সমুদয় বিটুমিনস্ কয়লা। ইহাতে কার্বণের ভাগ অল্প, বাজে পদার্থের ভাগ অধিক। রাণীগঞ্জের কয়লাভূমিতে যে প্রতি বৎসর রাশি রাশি কয়লা উত্তোলিত হয়, তাহাতে শতকরা গড়ে ৫৫ ভাগের অধিক কারবণ থাকে না। রাণীগঞ্জের নিকট, করহর-বাড়ীর কয়লা, ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট। ইহাতে শতকরা ৬৫ ভাগ কারবণ আছে। রাণীগঞ্জের কয়লার ১০০ ভাগে, ১০ হইতে ১৫ ভাগ বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ। কয়লা বা কাঠ পোড়াইলে যেটুকু ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে, সেই-টুকু জানিবে যে ধাতব পদার্থ, অর্থাৎ মৃত্তিকা, বালুকা ইত্যাদি। মৃত্তিকা বালুকা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ পুড়িয়া উত্তাপ বাহির হয় না, মিছা-মিছি কেবল ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। তাই, কয়লার মধ্যে এরূপ পদার্থ যত অল্প থাকে, ততই ভাল। আবার, ধাতব পদার্থ না থাকিয়া কয়লায় যতই কারবণের ভাগ অধিক থাকে, ততই ভাল। বিলাতের কয়লায় কারবণ অধিক, ছাই কম। তাই, যে কল চালাইতে অধিক উত্তাপের আবশ্যক, অধিক বলের প্রয়োজন, এদেশে সে কল চালাইতে বিলাতী কয়লা ব্যবহার হইয়া থাকে। সেজন্য ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর দেড় কোটি টাকার বিলাতী কয়লা আমদানি হয়।

আমাদের দেশে ভাল কয়লা নাই, তাই ভাল কাজের নিমিত্ত বিলাত হইতে কয়লা আমদানি হয়। যেমন তেমন কাজ এ দেশের কয়লাতেই চলে। চাউল গম প্রভৃতি কৃষিজ বস্তুসমূহের বিনিময়ে আমরা এই বিলাতী কয়লা ক্রয় করি

আমাদের দেশে যদি ভাল কয়লা থাকিত, তাহা হইলে এই চাউল গম আর বিদেশে যাইত না। দেশের লোক, অন্নের জন্য 'হা হা' করিতেছে, তাহারা খাইয়া বাঁচিত। আমি আমদানি-রপ্তানির বিরোধী নই। কারণ, আমদানি-রপ্তানি "বিনিময়" বৈ আর কিছুই নয়। আমাদের যাহা আবশ্যক, সেই দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আনয়ন করার নামই আমদানি। কিন্তু সে দ্রব্য অন্য দেশের লোক বিনামূল্যে আমাদিগকে দিবে কেন? তাই, বিদেশের লোকের যাহা আবশ্যক, তাহা দিয়া আমরা তাহাদিগের দ্রব্য ক্রয় করি। বিদেশের লোকের প্রয়োজন,—চাউল, গম প্রভৃতি কৃষিজ-সামগ্রী। সেজন্য, এদেশের লোক অন্নের জন্য লালায়িত হইলেও, চাউল গম দিয়া, কাপড়, লোহ প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করে। কৃষক, আপনার কৃষি-জাত দ্রব্য যেখানে অধিক মূল্য পাইবে,—সেইখানেই বেচিবে। পৃথিবীর নিয়ম এই। তাহার পর, তাহার কাপড়ের প্রয়োজন। যেখানে অল্পমূল্যে সে কাপড় পাইবে, সেই স্থান হইতেই সে কিনিবে। এও পৃথিবীর নিয়ম। আমি যদি কৃষককে বলি যে,—"দেখ, আমি তোমার স্বদেশী। বিদেশীয়দিগকে তুমি চারিটাকা মণ হিসাবে চাউল বেচিতেছ, তুমি আমাকে একটাকা দরে বিক্রয় কর। আর আমি এই কাপড়খানি বুনিয়াছি। ঠিক এইরূপ কাপড় বিদেশীয়েরা চারি আনা গজ হিসাবে বিক্রয় করে সত্য কিন্তু আমি একটাকা গজের কম বিক্রয় করিতে পারি না। আমি তোমার দেশের লোক, সেইজন্য তুমি আমাকে একটাকা মণ হিসাবে চাউল বিক্রয় কর, আর আমার নিকট একটাকা গজ হিসাবে কাপড় ক্রয় কর।" ইহার উত্তরে কৃষক আমাকে বলিবে,—"তোমার মত তো আর আমি পাগল হই নাই।"

সুতরাং আমরা এক্ষণে বিদেশ হইতে যে সমুদয় দ্রব্য আনয়ন করি, সেই দ্রব্য এদেশে অল্পমূল্যে হইতে পারে কিনা, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। বিদেশীয় কাপড় যদি চারি আনা গজ হিসাবে বিক্রয় হয়, আমাদিগকেও অন্যূন সেই দামে বিক্রয় করিতে হইবে। তবেই দেশের লোকে লইবে। গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া প্রতিদিন কেহ স্বদেশ-অনুরাগ দেখাইবে না। "হিন্দু সাবান," "আর্য্য বিস্কুট," "সনাতন-পেড়ে সাড়ি," "মহাদেব-চূর্ণ" এসব জুয়াচুরি কেবল দুইদিন চলিয়া থাকে, অধিক দিন চলে না।

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আজকাল অনেকের মনে "চিন্তার" উদয় হইয়াছে। কতকাল আমরা চিন্তাশূন্য জড় পদার্থের মত ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পুরাতন পুস্তক পাঠে, ভারতের প্রাচীন গভীর চিন্তাশীলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যখন প্রাচীন পুস্তকাদি পাঠ করি, তখন সত্য সত্যই মনে হয়, আমরা কি সেই সাগরসম গভীরচিন্তাশীল ঋষিবংশ জাত? মনে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তখনি আবার ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সজ্জাতিদিগের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হয়। আমি পৃথিবীর নানা দেশের লোক দেখিয়াছি, পৃথিবীর নানাদেশের লোক আমার অধীনে কাজ-কর্ম্ম করিয়াছে। আমি বার বার বলিয়াছি, আর বারবার একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, বাঙ্গালী, কাশ্মীরী ও মারহাট্টা ব্রাহ্মণদিগের মত বুদ্ধিশালী মনুষ্য এ পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। কায়স্থ, বণিক ও প্রভু প্রভৃতি জাতির বুদ্ধি প্রখরতাও সামান্য নহে। এ দেশে এরূপ প্রগাঢ় তেজঃশালী বুদ্ধিবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিতেও আমাদের এ গতি কেন? ভাবিয়া কিছু ঠিক পাই না। আমাদের ভাল ইতিহাস নাই। তবে মুসলমান পুরাবৃত্ত —পণ্ডিতগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে শোকে দুঃখে কাতর হইয়া পড়িতে হয়। কি করিয়া মুসলমান বীরগণ হিন্দুদিগকে পরাভব করেন, তৎকালের হিন্দুগণ কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় বিষয় পাঠ করিতে করিতে চক্ষুতে জল আসে। দুঃখে কাতর হইয়া, পাঠে অক্ষম হইয়া,

কতবার পুস্তক ফেলিয়া দিয়াছি। মনে হয়, সেই যে দ্বাপরের শেষে দানবগণ আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশ-সম্ভূত মনুষ্যরূপী জীবগণ ভারতবাসীদিগকে সতত কুপথগামী করিতেছে, ভারতের চক্ষে তাহারাই আবরণ দিয়া রাখিয়াছে। মহাভারতের যুদ্ধে ভারতে দানব-কুলের বীজ মরে নাই। তাই শত শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারত তিমিরাবৃত থাকিয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহা না হইলে এই সুবর্ণভূমি এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে কেন?

যাহা হউক, এক্ষণে সকলে বুঝিতেছেন যে, নব আবিষ্কৃত নানারূপ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। মুদ্রাযন্ত্র ও বাষ্পীয় কলের সহায়তা ভিন্ন এই "জন্মভূমি" কিছুতেই এরূপ সুলভ হইত না। বাষ্পীয় কলের সহায়তা ভিন্ন সুলভমূল্যে কাপড়, কাগজ প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিছুতেই হইতে পারে না। রাসায়নিক শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন সুলভমূল্যে কাচ, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে না। তাই, এদেশের অনেকেই এক্ষণে নব-আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সহায়তায় নানাদ্রব্য প্রস্তুত করিবার কল্পনা করিতেছেন। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা কৃতকার্য্য হউন। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্ত এক্ষণে এদেশের লোক নানাস্থানে গমনাগমনও করিতেছেন। ফরাশি দেশে অবস্থান করিয়া, কাশিম সাহেব রেশমের বিষয় শিক্ষা করিয়া, এই কলিকাতা নগরে শত শত দরিদ্র লোকদিগকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ইতালি প্রভৃতি দেশে অবস্থান করিয়া রেশমকীটের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া, এক্ষণে বঙ্গদেশোৎপন্ন রেশমের নিমিত্ত চীন ও জাপানের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোম্বাই নগরের কাপড় যদি এই সকল দেশে বিক্রীত না হইত, তাহা হইলে সে স্থানে এত-গুলি কাপড়ের কল কিছুতেই চলিত না। এই সকল কাপড়ের কলে সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার কতকগুলি চিকন-ব্যবসায়ী-দিগকে আমি আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে তাহাদিগের কার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে। কেহ পাঁচ হাজার, কেহ ছয় হাজার টাকা করে প্রেরণ করিয়াছে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া অষ্ট্রেলিয়া দেশেও ভারতবাসিগণ গমনাগমন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি জনকত লোক সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। তাহারা অতি সামান্য লোক। কেন্তু সেখানে তাহাদিগের কার্য্য এরূপ ভালরূপ চলিতেছিল, যে বন্ধু-বান্ধবদিগকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত, তাহারা সোণার ঘড়ি প্রভৃতি নানারূপ বহুমূল্য দ্রব্য আনিয়াছে। কালের স্রোতের এইরূপ গতি দেখিয়া ভরসা হয় যে, কমলা পুনরায় দীন-হীন ভারতবাসীদিগের মুখপানে তুলিয়া চাহিবেন। পূর্ব্বে যেরূপ সাগর-মহাসাগরে, দেশ-বিদেশে ভারতের কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান ছিল, পুনরায় আমাদিগের সেই সৌজন্য-সূর্য্যের উদয় হইবে।

আমাদের দেশে ভাল পাথুরে-কয়লা নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সহায়তায় এই মন্দ কয়লাকেই ভাল করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানের সহায়তায় এই মন্দ কয়লা হইতে সারভাগটুকু বাহির করিয়া "পেটেন্ট ফিউয়েল" নামক পদার্থে পরিণত করিতে পারা যায়। মন্দ কয়লা হইতে এইরূপ পদার্থ বিলাতে অনেকেই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এ পদার্থ এ দেশেও আমদানি হয়। গত বৎসর এই পদার্থ দুই লক্ষ টাকার আমদানি হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ উদ্যম, এরূপ বুদ্ধি-কৌশল ভারতবাসীদিগের এখনও চিন্তা পথে উদয় হয় নাই। তাহার অনেক বিলম্ব আছে। তবে কথা এই,—কার্য্যোপযোগী সুলভ "পেটেন্ট ফিউল" প্রস্তুত করিতে পারিলে, ভারত হইতে প্রতি বৎসর দেড় কোটী টাকার গম চাউল প্রভৃতি দ্রব্য আর

বিদেশে প্রেরিত হয় না। সে গম চাউল এ দেশে থাকিলে শত সহস্র দরিদ্র লোকেরা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায়। এ দেশের ধনবান্ ব্যক্তিরা দরিদ্র ভোজন করাইবার নিমিত্ত অনেক অর্থ ব্যয় করেন। বৎসরের মধ্যে দুই চারিদিন মিষ্টান্ন না খাইয়া, যাহাতে তাহারা বারমাস উদর পূর্ণ করিয়া সামান্য মোটা ভাত খাইতে পায়, এরূপ উদ্দেশে যদি কেহ অর্থ ব্যয় করেন, তাহা হইলে সে অর্থ ব্যয় বোধ হয় অধিক সুফলপ্রদ হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে পাথুরে কয়লা আছে। সকলে বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই কলিকাতা শহরের নিম্নভাগেও পাথুরে কয়লা আছে। ৫৫ বৎসর গত হইল, অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, একজন সাহেব কেল্লার নিম্ন-ভূমি "বোরিং" যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কলিকাতা-ভূমির ২৬০ হাত নিম্নে তিনি পাথুরে-কয়লা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ কয়লা কিন্তু উৎকৃষ্ট নহে। প্রিন্সেপ সাহেব পরীক্ষা করিয়া ইহার একশত ভাগে কেবল ৩৫ ভাগ কার্বণ পাইয়াছিলেন। অবশিষ্ট ৬০ ভাগ বাষ্পীয় ও ৫ ভাগ ধাতব পদার্থ। এরূপ কয়লা তুলিয়া কোনও লাভ নাই। বিশেষতঃ এরূপ গভীর প্রদেশ হইতে কয়লা উত্তোলন করা অতি ব্যয়সাধ্য। আবার, কয়লার স্তর অধিক স্থূলও নয়।

আজ ২৩ বৎসরের কথা হইল, মেদিনীপুর জেলখানায় এক সাহেব-চোর এক অপূর্ব রহস্যের সংঘটন করিয়াছিলেন। এই জেলখানায় একটী কূপ খনন করা হইতেছিল। এদেশে যেরূপ সচরাচর কূপ দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ কূপ নহে। ইহাকে "আরটেশিয়ন" কূপ বলে। পৃথিবীর অতি নিম্নদেশে যে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, সেই স্রোতকে বিদীর্ণ করিয়া জল উত্তোলন করাই এই কূপের উদ্দেশ্য। একবার এইরূপ একটী জলস্রোত বিদীর্ণ করিতে পারিলে, ফোয়ারা মত অতি প্রবল বেগে জল ভূমির উপর আপনা-আপনি উঠিতে থাকে, জল আর তুলিতে হয় না। সকলস্থানে কিন্তু এরূপ কূপ খনন করিতে পারা যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভূমির অবস্থা দেখিয়া বলিতে পারেন যে, এখানে "আরটেশিয়েন" কূপ হইবার সম্ভাবনা আছে,—এখানে সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অনেক সময় আবার তাঁহাদিগের ভ্রমও হইতে পারে। এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে সম্প্রতি অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিচেরি নগরে ফরাশিরাও "আরটেশিয়েন" কূপ খনন করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। কোয়েটা অঞ্চলেও ইংরেজেরা এইরূপ কূপ খনন করিতেছিলেন। বোধ হয়, দুই চারি স্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাহা হউক, মেদিনীপুর জেলখানায় এইরূপ একটী কূপ খননের চেষ্টা হইতেছিল। সেই সময় একজন ইংরেজ-কয়েদী এই জেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। কিছুদিন পরে তাঁহার কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন জেলখানার কর্তৃপক্ষেরা বেতন দিয়া সাহেবকে এই কর্মে নিযুক্ত করিলেন। সাহেব চতুর, মেয়াদ-খালাসী, সামান্য লোক নহেন। ভূমির ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেস্থলে "আরটেশিয়ন" কূপ হইতে পারে না। তাই তিনি অন্য প্রকারে অর্থ সংগ্রহের উপায় স্থির করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই কূপ হইতে জল বাহির না হউক, ৮০ হাত খনন করিলে, ইহার ভিতর হইতে অতি উৎকৃষ্ট পাথুরে কয়লা বাহির হইবে।" সত্য সত্যই তাহা হইল। ৮০ হাত নিম্নে যাইতে না যাইতে, কূপ হইতে অতি উত্তম কয়লা বাহির হইতে লাগিল। কূপটী যতই নিম্নে যাইতে লাগিল, ততই পাথুরে কয়লা বাহির হইতে লাগিল। অতি উত্তম কয়লা, অতি উৎকৃষ্ট কয়লা। চারিদিকে এই কয়লার নমুনা প্রেরিত

হইল। কয়লার রূপ, কয়লার গুণ দেখিয়া চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই সে কয়লার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই কয়লা তুলিবার নিমিত্ত অনেক টাকা খরচ করিয়া বিলাত হইতে ভাল ভাল দল আসিল। যে সাহেব-চোর এই কয়লার হুজুগ তুলিয়াছিলেন, অনেক টাকা তাঁহার হস্তগত হইল। তাহার পর? তাহার পর সাহেবটী নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহার কোনও সন্ধান হইল না। তাঁহার ঘর হইতে অনেক কয়লা বাহির হইল। এই কয়লা চুপি চুপি তিনি কূপের ভিতর রাখিয়া দিতেন। কূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহাই বাহির হইত। সম্প্রতি সোণার হুজুগেও এইরূপ কাণ্ড হইয়াছিল। ছোটনাগপুর অঞ্চলে পাথর গুঁড়া করিয়া তাহা হইতে সোণা বাহির করা হইবে, সে নিমিত্ত দুই বৎসর পূর্বে কত কোম্পানি খোলা হইয়াছিল, কত শত লোক সেই কোম্পানিতে টাকা দিয়া ফকির হইয়া গেল। কোম্পানির শেয়ার অধিকমূল্যে বিক্রয় হইবে বলিয়া একজন সাহেব সুবর্ণের রেণু প্রস্তর-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতেন।

বঙ্গদেশে রাণীগঞ্জের পাথুরে কয়লাই প্রসিদ্ধ। কলিকাতার উত্তর-পশ্চিম ৬০ ক্রোশ দূরে রাণীগঞ্জের কয়লা-ক্ষেত্র। এই কয়লা-ক্ষেত্র, পূর্ব হইতে পশ্চিম, প্রায় কুড়ি ক্রোশ দীর্ঘ, প্রস্থে অধিক নয়; কেবল নয় ক্রোশ। রাণীগঞ্জের চারিদিকে এই কয়লা-ক্ষেত্র অবস্থিত বলিয়া, ইহা "রাণীগঞ্জ-ক্ষেত্র" নামে পরিচিত। একদিকে দামোদর, অপরদিকে অজয়, এই দুই নদের মধ্যেই ইহার অধিকাংশ ভাগ অবস্থিত। ইহার ভিতর অনেকগুলি কয়লার খনি আছে, যথা;—এগেরা, হরিষপুর. বাবুসোল, নিমচা, পরিহজারি, শিয়ারসোল, তপসী, ধোমাল, চৌকিডাঙ্গা জুজানকী, বনবাহাল, শিবপুর, বনালী, মঙ্গলপুর, বাঁশড়া, রঘুনাথচক, জেড়া, নিজা, শঙ্করপুর ইত্যাদি। শিয়ারসোলের খনি ভিন্ন আর সকল বড় বড় খনি-গুলিই সাহেবদের। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরও অনেকগুলি ছোট ছোট খনি আছে।

পূর্বকালে এদেশের লোকে কয়লার ব্যবহার জানিতেন কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পাথুরে কয়লার, ব্যবহার তখন আবশ্যক ছিল না। যে সকল স্থানে এখন জনাকীর্ণ গ্রাম ও নগর হইয়াছে, প্রাচীনকালে সে সকল স্থান নিবিড় বনে আবৃত ছিল। কানপুরের নিকট বিঠুরে, যেখানে নানা সাহেব বাস করিতেন, সেইখানে সীতার বনবাস হইয়াছিল। এই স্থানে লব-কুশের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের সময়, যে সমুদায় বড় বড় অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ প্রভৃতি নানা নামধারী বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফলা আজ পর্য্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। এই পাপ-চক্ষে আমি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তবে ইংরাজী পড়িয়া মনটা আমার কিছু সন্দিগ্ধ হইয়াছে; টপ করিয়া কোনকথা বিশ্বাস করি না। তাই আমি পুরোহিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"তোমরা এ সমুদয় বাণের ফলা কোথায় পাইলে?" তাহারা উত্তর করিল,—"গঙ্গার ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে।" তবে. আমার বিশ্বাস হইল। এক্ষণে যেস্থানে হরডুমি জেলা, পূর্বে সেইস্থানে বন ছিল। পঞ্চপাণ্ডব এই বন কাটিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের স্থাপনা করেন। এলাহাবাদও বনে আবৃত ছিল। ব্যাঘ্র ভালুক ব্যতীত এই বনে গন্ধর্ব রাক্ষস প্রভৃতি অপরাপর নানা যোনি বাস করিত। এলাহাবাদের বেনীঘাটে অর্জ্জুনের সহিত সেই গন্ধর্বদের কত বিবাদ না হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। কনৌজ হইতে আসিয়া নানা স্থানে আমাদিগকে বন কাটিয়া তবে বসবাস করিতে হইয়াছে। যেস্থানে এত বন, সেস্থানে কাঠের অভাব কি? সুতরাং কয়লারও কোন

প্রয়োজন ছিল না। সেইজন্য বোধ হয় প্রাচীন ভারতবাসিগণ কয়লা তুলিতে কখন যত্ন করেন নাই।

বোধ হয়, ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পর কয়লার ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জে কয়লা উত্তোলিত হইত। সেই সময় হইতে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবসা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তখন রেল ছিল না; দামোদর দিয়া নৌকা করিয়া কলিকাতায় কয়লা আনীত হইত। একতো দামোদরে বার মাস জল থাকে না, নৌকা চলে না, তাতে আবার আনিতে অনেক খরচ হইত। এখন যেরূপ আড়াই পয়সা তিন পয়সা মণ মাটির দরে কয়লা বিক্রয় হইতেছে তখন আর তাহা কি করিয়া হইবে। কয়লা তখন মহার্ঘ্য ছিল। লোকে তখন সুন্দরী কাঠ দিয়া ভাত রাঁধিত, আর আম ও বাবলা কাঠ দিয়া পাঁজা পোড়াইত। পাঁজাও তখন কম হইত। খুব বড় মানুষ ছাড়া, অপর সকলের তখন মেটে বাড়ী ও খোড়ো ঘর ছিল। অল্প-স্বল্প ক্ষমতা হইলেও তখন কেহ কোঠা বাড়ী করিতে সাহস করিত না। কোঠা-বাড়ী করিলে ডাকাত আসিয়া গায়ে মশালের ছ্যাঁকা দিত, না হয়, তলোয়ারে কোপ মারিত। লোকের বাড়ী ডাকাত পড়িলে পাড়া-প্রতিবাসীরা আপনার আপনার ঘরে ডবল করিয়া হুড়কো ও খিল দিত। কেহ বাহির হইলে ডাকাতেরা তাহার সহিত আড়ি করিত, আর তার পরদিন আসিয়া তাহাকে কাটিয়া যাইত। রেল অভাবে সহর অঞ্চলে কয়লা আনিবার সুবিধা ছিল না; নৌকা করিয়া আনিতে অনেক খরচ পড়িত, সুতরাং কয়লার মূল্য অধিক ছিল। এই কারণে কয়লার-খরচও অল্প ছিল। আজকাল যত কয়লা একদিনে উত্তোলিত হয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তত কয়লা এক বৎসরেও উত্তোলিত হইত কিনা, তাও সন্দেহ।

যেস্থানে পাথুরে কয়লা, ভূমির সামান্য নিম্নে অবস্থিত করে, সেস্থানে পুষ্করিণীর মত গর্ত্ত খনন করিয়া কয়লা তুলিতে পারা যায়। এরূপ গর্ত্তকে "পুকুরে খাদ" বলে। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে সেকালে এরূপ অনেক পুকুরে খাদ ছিল। রাণীগঞ্জ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে "উকড়ো" বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। সেকালে এই গ্রামে আমি স্কুল-মাষ্টারী করিতাম। অবসর পাইলেই কয়লার খাদ দেখিতে যাইতাম। কালি-ঝুঁলি মাখিয়া যখন পুনরায় মাটির উপর উঠিতাম, তখন বাউরী-কন্যাদিগের নিকট হইতে কতই না টিট্‌কারী খাইতাম। এই সময় "পুকুরে-খাদ" ও অন্যান্য নানারূপ খাদ দেখিয়াছিলাম। কয়লা-খনি হইতে উকড়োর একটী ভদ্রলোক এই সময় কেমন বিপুল ধন-লাভ করিয়াছিলেন! তিনি, একটী বিস্তৃত পতিত ভূমি, যাহাকে "ড্যাঙা" বলে, তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। এই পতিত ভূমি আবাদ করিবেন, এইরূপ তাঁহার মানস ছিল। প্রথম সেই ভূমির উপর এরণ্ডের বীজ ছড়াইয়া দিলেন। রেড়ীরগাছ বড় হইলে রেড়ী বেচিয়া অনেক টাকা পাইবেন, এইরূপ আশা করিলেন। কিন্তু সে কঙ্করময় ভূমিতে রেড়ীর গাছ ভাল হইল না, ফলও হইল না। তাহার পর তিনি আরও কত কি চাষ করিলেন। লাভ কিছুতেই হইল না, কেবল লোকসান হইতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া সে ভূমির উপর তিনি আর কিছু করিলেন না। ভূমি বৃথা পড়িয়া রহিল। এমন সময় সাহেবেরা "বোরিং" করিয়া, অর্থাৎ ভূমিতে ছিদ্র করিয়া দেখিলেন যে, সে ভূমির নীচে পাথুরে কয়লা আছে। আমার ঠিক মনে নাই, বোধ হয়, ৬০,০০০ টাকা সেলামী দিয়া সাহেবেরা সেই ভূমি তাঁহার নিকট হইতে পাট্টা করিলেন।

গ্যাস

পাথুরে কয়লার গল্প বলিতে, দুই একবার আমি গ্যাসের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম,—যে গ্যাসের দ্বারা কলিকাতা সহর রাত্রিকালে আলোকিত হয়। একশত বৎসর পূর্বে কয়লা-গ্যাসের চলন কোথাও ছিল না, বিলাতেও ছিল না। গাসে আবার আলো হয়, এ কথা কেহ জানিতও না। বিলাতে মরডক, ফরাসি দেশে লেবন, এই দুইজন লোক, প্রায় একই সময়ে কয়লা-গ্যাসের গুণ জানিতে পারিয়াছিলেন। মরডক কয়লা খনিতে কাজ করিতেন। কয়লা খনি হইতে কয়লা লইয়া, সেই কয়লা লৌহ পাত্রের ভিতর বন্ধ করিয়া, বাহির হইতে তাহাতে উত্তাপ দিয়া, তিনি গ্যাস প্রস্তুত করেন। তাহার পর নলের দ্বারা সেই গ্যাস আপনার বাটীতে লইয়া যান। এই গ্যাসের আলোকে তাঁহার বাটী আলোকময় হইয়াছিল।

এখন যেমন এদেশে, তখন সেইরূপ বিলাতে লোকে সহজে নূতন বিষয় ব্যবহার করিতে চাহিত না। অধিক দিনের কথা নয়, একশত বৎসরের কথা বলিতেছি। সুতরাং বলবুদ্ধিতে বিলাতের লোক তখন যেরূপ ছিলেন, আমরাও প্রায় সেইরূপ ছিলাম। কিন্তু আজ? আজ তাঁহারা দিন দিন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন, উন্নতির পর উন্নতি করিতেছেন। এ সমস্ত উন্নতির প্রভাবে বলবুদ্ধিতে তাঁহারা অনেক আগে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা যেখানে ছিলাম, সেইখানেই পড়িয়া আছি। তাই আজ আমাদের কাছে কোল, সাঁওতাল যেরূপ বর্বর, বিলাতের লোকের কাছে আমরাও সেইরূপ। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিলাতের লোকের সহিত আমাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই এক্ষণে তাঁহারা আমাদিগকে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে পরিগণিত করেন। মিষ্টভাষী ধীর ধর্মপরায়ণ,—এখানে সে "সভ্যতার" কথা হইতেছে না। যে সভ্যতার প্রভাবে, মানব জাতি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, ব্যোমের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে, সেই সভ্যতার কথা বলিতেছি। পাঠক যে উপায়ে, ইউরোপের লোকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন, কিসে সেই উপায়ের দিকে তোমাদিগের মন নিয়োজিত করিব, তাই চিন্তা!

পরীক্ষা দ্বারা মরডক সাহেব যখন দেখিলেন যে, কয়লা-গ্যাসের দ্বারা ঘর আলোকিত হইতে পারে, তখন সেই কথা বন্ধু-বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিলেন। নিজে তিনি অর্থহীন ছিলেন। পেটেণ্ট লইয়া নিজে এই নূতন বিষয় প্রচলিত করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, সেজন্য তিনি অপরের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া যতদূর সাধ্য, তিনি নিজেই গ্যাসের আলো প্রচলনে যত্নবান হইলেন। আজ ইহার ঘর, কাল তাহার কারখানা, তিনি গ্যাস দ্বারা আলোকিত করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে মিথ্যা যেরূপ চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে না, অল্পদিন ধূমধাম করিয়া পরিশেষে যেরূপ সত্যের নিকট পরাজিত হয়, সেইরূপ কুসংস্কারও চিরকাল লোকের মনমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের যেটী প্রকৃত উপকারী ও লাভজনক, প্রথম প্রথম অবহেলা করিলেও কালে তাহার আদর হয়। গ্যাস-আলোকের ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল।

মনে করিও না যে, যাঁহারা লেখাপড়া জানেন, বিদ্যাবুদ্ধিতে যাঁহারা উন্নত, নূতন বিষয়ের গুণ তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। তাহা নয়। আজকাল যাহা হউক, সেকালে নূতন বিষয়ের প্রথমেই তাঁহারা বিরোধী হইতেন। প্রথম যখন কলের গাড়ীর প্রস্তাব হয়, তখন সেই কথা শুনিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মুখে

আর হাসি ধরে না। রেলগাড়ির স্রষ্টা ষ্টিফেনসন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, "আমার কলের গাড়ী ঘণ্টায় ছয়ক্রোশ চলিতে পারিবে।" বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পাগল মনে করিলেন। ঘোড়ায় টানিবে না, উটে টানিবে না, আর গাড়ী আপনা-আপনি ঘণ্টায় ছয় ক্রোশ পথ দৌড়িয়া যাইবে। এও কি কখনও হয়? বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে কার্য্যকারণ বাহির করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, এ কথা কখনই হইতে পারে না। বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা অনেক বিষয় প্রমাণিত হইতে পারে। সম্প্রতি রাসায়নিক-শাস্ত্র দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন। না হয়, নিদানপক্ষে ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। দশ অবতার ত ফুরাইয়া গেল। অবতারগিরি আর খালি নাই। এখন কল্কিদেব যে কি করিবেন, সেই ভাবনা। তাইতো!

গ্যাসের দ্বারা যখন অনেক বাড়ী ও কল-কারখানা আলোকিত হইল, তখন ইহা দ্বারা গ্রাম নগরের পথ-ঘাটও আলোকিত করিবার প্রস্তাব উঠিল। সেই সময় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা আপনাদিগের বিদ্যা প্রকাশ করিলেন। প্রথম উপহাস করিলেন, তাহার পর গ্যাসের দ্বারা মনুষ্যজীবনের যে কি ঘোরতর অনিষ্ট হইবে, তাহা প্রমাণিত করিলেন। কিন্তু উইল্‌ডসর নামক এক ব্যক্তি গ্যাসের গুণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। পণ্ডিতদিগের মূর্খতা ও সাধারণের কুসংস্কারের সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আট বৎসর ধরিয়া গ্যাসের কার্য্যকারিতা, তিনি ক্রমাগত লোককে বুঝাইতে লাগিলেন। যখন লোকে বুঝিল যে, তৈলের আলোক অপেক্ষা গ্যাসের আলোক অধিক প্রভাবশালী, তখন গ্যাসের দ্বারা লণ্ডন নগর আলোকিত করিবার নিমিত্ত তিনি একটী কোম্পানি খুলিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানি স্থাপিত হয়। আজও ইহার কার্য্য চলিতেছে। ইহা হইতে অংশীদারেরা অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার কার্য্য সুচারুরূপে চলে নাই। প্রথম প্রথম রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের হস্তে ইহার ভার অর্পিত হইয়াছিল। কেবল পুথিগত বিদ্যাদ্বারা সাংসারিক কার্য্য ভালরূপ নির্ব্বাহিত হয় না। তাঁহাদের হস্তে কোম্পানি মুমূর্ষু অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, এই সময়, কোম্পানি গ্যাস আবিষ্কারক মরডকের একজন শিষ্যকে পাইলেন। তাঁহার কেবল পুথিগত বিদ্যা ছিল না। মরডকের অধীনে থাকিয়া গ্যাসের কার্য্য তিনি নিজে হাতে করিয়াছিলেন। কোম্পানির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া গ্যাস-প্রস্তুত বিষয়ে তিনি নানারূপ উন্নতিসাধন করিলেন। কারখানায় গ্যাস প্রস্তুত করিয়া নলের দ্বারা নগরের রাস্তায় ও লোকের বাড়ী বাড়ী গ্যাস লইয়া যাইলেন। প্রতি রাত্রিতে যে বাড়ীতে যতটুকু গ্যাস ব্যবহার হয়, তাহা মাপিবার যন্ত্র আছে। গ্যাস বায়ুর মত অতি লঘু পদার্থ, সুতরাং ইহা ওজন-দরে বিক্রীত হয় না। পো পালির মাপে যেরূপ ধান বিক্রীত হয়, গ্যাসও সেইভাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। গ্যাস বিক্রয় করিয়া কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। লণ্ডনে এক্ষণে কুড়িটির অধিক গ্যাস কোম্পানি আছে। কিন্তু এই আদি কোম্পানিটীই সকলের অপেক্ষা বড়। অনেক সময়ে—বিশেষতঃ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে লণ্ডন নগর কুজ্ঝটিকায় আবৃত হয়। দিনেরবেলায় কোলের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সময় দিনেরবেলায় গ্যাস জ্বালিয়া কাজ করিতে হয়। আবার আমাদের দেশের চেয়ে শীতকালে সেখানে দিন আরও ছোট। এদিকে সাতটার কম সূর্য্য উদয় হয় না, ওদিকে চারিটার পরই সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। সুতরাং এদেশ অপেক্ষা সেখানে গ্যাসের খরচ অধিক। ইহা ছাড়া অনেকে সেখানে গ্যাসের দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া থাকেন।

প্রথম গ্যাস কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হইতেছে দেখিয়া, বিলাতের অপরাপর

সহরে অনেক কোম্পানি স্থাপিত হইল। কেহ বা কয়লা-গ্যাসে রাস্তাঘাট ও লোকের বাড়ী আলোকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ বা তৈল হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেহ বা গ্যাসকে বাক্স বন্ধ করিয়া, গাড়ি বোঝাই দিয়া আমদানি.রপ্তানি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষোক্ত দুই কাজ ভালরূপে চলিল না। তৈল হইতে যে গ্যাস প্রস্তুত হয় না, তাহা নহে। তবে কয়লা সস্তা, তৈল মহার্ঘ্য। তৈল হইতে গ্যাস করিলে খরচ পোষায় না। যেখানে পাথুরে কয়লা নাই, সেখানে গ্যাসের আবশ্যক হইলে, কাজেই তৈল হইতে প্রস্তুত করিতে হয়। মহারাজ রামসিংহ তৈল হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিয়া জয়পুর সহরের রাস্তায় আলো দিয়াছিলেন। বাক্সে বন্ধ করিয়া যাঁহারা গ্যাস আমদানি রপ্তানি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের লাভ হয় নাই। এইরূপে গ্যাস লইয়া আজকাল ইণ্ট-ইণ্ডিয়েন রেলগাড়ি আলোকিত করা হইতেছে। যাঁহারা কয়লা হইতে গ্যাস করিয়া নলের দ্বারা রাস্তা ও লোকের বাড়ীতে লইয়া বেচিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। এক্ষণে বিলাতে প্রায় প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে গ্যাসের কারখানা আছে। অনেক বড়মানুষ, যাঁহাদের বাটী গ্রাম বা সহর হইতে দূরে অবস্থিত, তাঁহারা নিজের গ্যাসের কারখানা করিয়া আপনাদের গৃহাদি আলোকিত করেন। গ্যাস করিবার নিমিত্ত বিলাতে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ কোটী মণ পাথুরে কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লণ্ডন সহরে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ কোটী টাকার গ্যাস বিক্রীত হয়।

পাথুরে কয়লায় তাপ দিলে যে সমুদয় পদার্থ উবিয়া বা উড়িয়া যায়, তাহাই ধরিয়া কয়লা গ্যাস প্রস্তুত হয়। হাইড্রোজেন ও কার্বণ বাষ্প ভিন্ন ইহা আর কিছুই নয়। সর্বোত্তম কয়লা, যাহা পাথরের মত দেখিতে, যাহাতে কারবণের ভাগ অনেক অধিক, তাহা হইতে ভাল গ্যাস হয় না। যে কয়লায় তৈলের ভাগ অধিক; অর্থাৎ কিনা বাইটুমিনস্ কয়লা, তাহা হইতেই ভাল গ্যাস হয়। গ্যাস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কয়লা বাহিরে রাখা ভাল নয়, কারণ বৃষ্টির জল পাইলে, সে জল বাষ্প হইয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। সেই জলকে পুনরায় গ্যাস হইতে পৃথক করিতে হয়। পাথুরে কয়লায় আগুণ ধরাইলে উপর দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হয়। ইহাই জ্বালাইবার গ্যাস। তবে ইহার সহিত অনেক কয়লার গুঁড়া মিশ্রিত থাকে। সেই কয়লা চূর্ণ হইতে ঘরে ঝুল পড়ে ও তাহার অনেক অংশ ধূমের সহিত বাহিরে গিয়া ভূতলে পতিত হয়। সাহেবেরা যে কাদার পাইপে তামাক খান, পাথুরে কয়লা গুঁড়া করিয়া যদি তাহার ভিতর রাখা যায় ও কাদা দিয়া যদি তাহার মুখটী বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় এবং তাহার পর যদি পাইপের সেই কয়লাপূর্ণ ভাগটী আগুণে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, পাইপের নল দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে। তাহাই গ্যাস। সেই ধূমে আগুণ দিলে জ্বলিতে থাকে। যেরূপ পাইপের মুখে কয়লাচূর্ণ রাখিয়া উত্তাপ দিলে গ্যাস বাহির হয়, সেইরূপ বড় বড় লৌহ বা মৃত্তিকা পাত্রে পাথুরে কয়লা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে উত্তাপ দিলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস বাহির হইতে থাকে। ঐরূপ লৌহ বা মৃত্তিকা পাত্রকে রিটর্ট (Retort) বলে। পূর্বে লৌহ পাত্রে কাঁচা কয়লা বন্ধ করিয়া গ্যাস প্রস্তুত হইত। এক্ষণে অনেক স্থানে মৃত্তিকা পাত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ দিবা-রাত্রি অগ্নি উত্তাপে মৃত্তিকা পাত্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় না। এক্ষণে লোকে প্রচণ্ড উত্তাপ সংযোগে শীঘ্র শীঘ্র প্রচুর পরিমাণে গ্যাস প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তাপ সংযোগে লোকে যদি আস্তে আস্তে গ্যাস প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে গ্যাসের আলো অতি উত্তম হয়। কিন্তু পৃথিবীতে আজকাল সব তাড়াতাড়ি ও হুড়াহুড়ি। ভালই

হউক আর মন্দই হউক, তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া কাজ না করিলে এক্ষণে আর লাভ হয় না।

গ্যাস প্রস্তুত করিবার পাত্রগুলি সচরাচর প্রায় ১০।১২ হাত লম্বা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহার উপর ও তলভাগ দুই দিকই খোলা রাখিয়া থাকেন, তবে সহজে বন্ধ করিবার নিমিত্ত ঢাকন আছে। কাঁচা কয়লা হইতে গ্যাস উড়িয়া যাইলে সেই কয়লা আমাদের রাঁধিবার কোক্ কয়লা হয়। পাত্রের দুই মুখ খোলা রাখিবার অভিপ্রায় এই যে, ইহা হইতে সহজেই কোক্ কয়লা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও পাত্রের ভিতর ময়লা পড়িলে দুই দিক দিয়া পরিষ্কার করিতে পারা যায়। পাত্রগুলি কখনও ঠিক গোল, কখনও বা লম্বাভাবে গোল। গ্যাস-কারখানায়, পাত্রগুলিকে ভূমি হইতে উচ্চ করিয়া সারি সারি সাজাইতে হয়। একটী একটী সারিতে বারটি পাত্র রাখিতে পারা যায়। গ্যাস প্রস্তুতের সময় প্রথম, পাত্রের তলদেশ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর কয়লাপূর্ণ করিয়া উপরটীও বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কেবল উপরের দুই ধারে দুইটী ছিদ্র থাকে। গ্যাস উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত সেই ছিদ্রে নল সংযোজিত থাকে। এইরূপে পাত্রগুলি কয়লাপূর্ণ ও বন্ধ হইলে তাহার পর ইহার বাহিরে অগ্নি জ্বালিতে হয়। নীচে হইতেও জ্বাল দিতে পারা যায় ও পাত্রের দুই পাশেও আগুণ জ্বালিতে পারা যায়। এক পঙ্‌ক্তির সব পাত্রগুলিতে সমানভাবে যাহাতে উত্তাপ লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অসমানভাবে উত্তাপ লাগিলে কোনটির ভিতরের কয়লা কাঁচা রহিয়া যায়, আর কোনটির কয়লা অধিক পুড়িয়া যায়। এইরূপ হইলে নানা দোষ। তাহার মধ্যে প্রধান এইটী যে, পাথুরে কয়লার সঙ্গে অল্প পরিমাণে গন্ধক থাকে, এই গন্ধক বাষ্পে পরিণত হইয়া, গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতে গ্যাস অতি হানিজনক হইয়া পড়ে।

গ্যাস উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত সচরাচর প্রতি পাত্রের উপর দুইটী করিয়া নল সংযোজিত থাকে। পাত্রের ভিতর গ্যাস প্রস্তুত হইলে শীঘ্র শীঘ্র এই নল দিয়া উঠিয়া যাওয়া আবশ্যক। বিলম্ব হইলে পাত্রের গায়ে গ্যাসের খাঁকরি পড়ে, তাহাতে পাত্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, আর গ্যাসের আলোকপ্রদানশক্তি কমিয়া যায়। পাত্রের ভিতর সমস্ত কয়লা যখন উত্তমরূপে ভাজা হইয়া যায় ও তাহা হইতে যখন সমুদয় গ্যাস নির্গত হইয়া যায়, তখন সেই কয়লাকে কোক্ কয়লা বলে। কোক্ কয়লা হইতে বাষ্পীয় ভাগ নির্গত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, ইহা দেখিতে ভাজা কয়লা বলিয়া বোধ হয়। কাঁচা কয়লা অপেক্ষা ইহা লঘু ও ইহাতে কারবণের ভাগ অধিক। ইহা জ্বালাইবার সময় অধিক ধূম বা গন্ধ নির্গত হয় না, সে নিমিত্ত ইহা রন্ধনাদি কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। সমুদয় গ্যাস বাহির হইয়া যাইলে, তখন পাত্রের দুই মুখ খুলিয়া দিয়া, এই ভাজা বা কোক্ কয়লা বাহির করিয়া লইতে হয়। এই সময় যে নল দিয়া গ্যাস উপরে উঠিয়া যায়, সেই নলের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহা না করিলে, হয় এই নলের মুখ দিয়া গ্যাস বাহির হইয়া পড়ে, আর না হয় বাহিরের বায়ু গিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করে। বাহিরের বায়ু গিয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইলে গ্যাসের আলোক প্রদান শক্তি কমিয়া যায়। সে নিমিত্ত কলিকাতায় যেরূপ ড্রেন সংযোগে S অক্ষরের মত নলের একস্থান বাঁকা করা হয়, গ্যাসের নলেও অনেকে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। নলটী উপরে উঠিয়া পুনরায় নামিলে এইরূপ বাঁকাভাবে গঠিত হয়। এইস্থানের তলভাগটী নল অপেক্ষা বিলক্ষণ মোটা একটী গর্ত বলিলেও চলে। ইহাকে হাইড্রলিক মেন (Hydraulic main) বলে। এই গর্তের ভিতরে সর্বদা জল বা আলকাতরা থাকে। কয়লা ভাজিবার পাত্রে গ্যাস প্রস্তুত হইয়া প্রথম নলের মুখ দিয়া উপরে

উঠে, তাহার পর এই গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে আসিয়া সম্মুখে জল বা আলকাতরা দেখিতে পায়। পাত্রে যদি গ্যাস ক্রমাগত ঘন ঘন প্রস্তুত না হইত, আর নীচে হইতে যদি ইহার সবলে ঠেল না ধরিত, তাহা হইলে গ্যাস এই আলকাতরা পার হইয়া আগে যাইতে পারিত না। কিন্তু পাত্রের ভিতর ক্রমাগত কয়লা ভাজা হইতেছে, ক্রমাগত তাহা হইতে গ্যাস উদ্ভূত হইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আগের দিকে ক্রমাগত ঠেল ধরিতেছে। সে নিমিত্ত পশ্চাতের গ্যাস আগের গ্যাসকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া এই আলকাতরার ভিতর প্রবেশ করাইতেছে। আলকাতরার ভিতর প্রবেশ করিয়া গ্যাসকে সেখানে বসিয়া থাকিবার যো নাই। একে তো আলকাতরা অপেক্ষা গ্যাস লঘু, সুতরাং আপনা-আপনি ভাসিয়া পড়িতেই হইবে, তাহার পর আবার সেই পশ্চাত হইতে ঠেল। গ্যাস আলকাতরার ভিতর প্রবেশ করিয়াই বুদবুদ আকারে উপরে ভাসিয়া পড়ে। উপরে উঠিলে আর ভাবনা নাই। এখন বরাবর নলের সোজা পথ। এখন সেই পথ দিয়া গ্যাস নিরুদ্বেগে ভ্রমণ করিতে থাকে। কোক্ বাহির করিবার নিমিত্ত পাত্রের মুখ খুলিবার সময় নল হইতে গ্যাস পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। কারণ ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ হইতে এরূপ ঠেল বা বল নাই। ফিরিয়া আসিতে গিয়া সম্মুখে সেই আলকাতরা দেখিতে পায়, আলকাতরা পার হইবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং পুনরায় অগ্রমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়। সেই কারণে বাহ্য বায়ুও আলকাতরা পার হইয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

কয়লা ভাজা হইয়া প্রথম যে গ্যাস প্রস্তুত হয়, তাহা কিন্তু বিশুদ্ধ নহে। কয়লায় যে তৈল প্রভৃতি পদার্থ থাকে, ঘোরতর অগ্নির উত্তাপে প্রথম তাহা বাষ্পাকার ধারণ করে ও গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। তাহার পর শীতল হইলেই জমিয়া যায়। জমিয়া যে পদার্থ হয়, তাহাকে "তার" বা আলকাতরা বলে। আলকাতরা জমিয়া গিয়া গ্যাস হইতে পৃথক হইয়া যাইলেও গ্যাস বিশুদ্ধ হয় না। তখনও গ্যাসের সহিত আমোনিয়া, গন্ধক, কার্বণিক অম্ল প্রভৃতি পদার্থ বাষ্পাকারে মিশ্রিত থাকে। ঐ সকল পদার্থ কোথা হইতে আসে? ইহারা কাঁচা পাথুরে কয়লায় থাকে। কয়লা যখন ভাজা হয়, তখন ইহারা বাষ্পাকার ধারণ করিয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়। শীতল হইলেই যেরূপ আলকাতরা জমিয়া গ্যাস হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে, ইহারা সেরূপ হয় না। ইহারা বাষ্পাভাবে থাকিয়া বরাবর গ্যাসের সহিত অবস্থিতি করে। সুতরাং গ্যাস হইতে ইহাদিগকে পৃথক্ করা বড়ই কঠিন, এমন কি একেবারে পৃথক করা অসাধ্য বলিলেও হয়। তবে যতদূর সাধ্য, পৃথক্ না করিলে চলে না। কারণ গ্যাসের সহিত ঐ সকল দ্রব্য, লোকের ঘরে পড়িলে নানারূপ অনিষ্ট সাধন করে। সুতরাং গ্যাস নলের ভিতর যাইলেই ইহাকে যতদূর সাধ্য, বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইতে হয়। প্রথম গ্যাস হইতে আলকাতরা পৃথক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়। কারণ আলকাতরা মিশ্রিত গ্যাস অধিকদূরে যাইতে দিলে, সেখানে আলকাতরা জমিয়া সব নল বুজিয়া যাইবে। গ্যাস হইতে আলকাতরা পৃথক হইয়া যাইলে, তাহার পর বাষ্পভাবাপন্ন আমোনিয়া, গন্ধক প্রভৃতি পদার্থকে দূর করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে হয়। ক্রমে ক্রমে গ্যাসকে বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইহাকে অনেক নল ও নানারূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করাইতে হয়। এখন, জলস্রোতের মুখে যেরূপ বাঁধ দিলে হয়, সেইরূপ এই সকল যন্ত্র সত্বর গ্যাসের অগ্রসর হইবার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করে। যেরূপ বাঁধের নিকট প্রথম অনেক জল না জমিলে আর বাঁধ ছাপাইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ একটী একটী যন্ত্রের নিকট প্রথম অনেক গ্যাস না জমিলে আর সে যন্ত্র পার হইয়া যায় না। সম্মুখে এইরূপ বিলম্ব হইলে,

পশ্চাৎ দিকে গ্যাসের স্রোত হীনবল হইয়া পড়ে। হাইড্রলিক মেনের সেই আলকাতরা পার হইতে কষ্ট হয়। কয়লা-ভাজা পাত্রে গ্যাস জমা হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে নানাদিকে বিপত্তি। সুতরাং পশ্চাৎ দিক হইতে গ্যাসকে আরও জলে ঠেলিয়া না দিলে আর উপায় নাই। সচরাচর বাহির হইতে বাষ্পীয় বলে এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। হাইড্রলিক মেনের সেই আলকাতরার নিকট গ্যাস যাইবার পূর্বে একস্থানে ঐ যন্ত্রটী সংস্থাপিত থাকে। বাষ্পীয় বলে ঐ যন্ত্র ক্রমাগত গ্যাসকে আগের দিকে ঠেলিয়া দিতে থাকে। তাহাতে গ্যাস অনায়াসে আলকাতরা পার হইয়া যায়, সম্মুখের অপরাপর বাধাবিঘ্নও দ্রুতবেগে পার হইয়া যায়।

গ্যাস তো এখন নলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিলেন ও হাইড্রলিক মেনের সেই আলকাতরা পার হইয়া আগে চলিতে লাগিলেন। এখন স্বয়ং গ্যাসে যে প্রচুর পরিমাণে আলকাতরা মিশ্রিত থাকে, ইহাকে সেই আলকাতরা হইতে পরিষ্কার করিতে হইবে। গ্যাস যখন উত্তপ্ত থাকে, তখন আলকাতরা ইহার সহিত বাষ্পভাবে মিশ্রিত থাকে। তাহার পর ক্রমে যখন গ্যাস শীতল হয়, তখন আলকাতরা জমিয়া গিয়া গ্যাস হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। নলের ভিতর গ্যাস আসিবার পর অনেক আলকাতরা ইহা হইতে আপনা-আপনি পৃথক হইয়া পড়ে ও হৌজে গিয়া জমা হয়। তাহার পর গ্যাস আরও শীতল হইলে অবশিষ্ট আলকাতরা বাহির হইয়া যায়। উত্তপ্ত গ্যাসকে সহসা শীতল করিতে নাই। তাহা করিলে নলের গায়ে লবণের মত আর একটী পদার্থ জমিয়া যায়। সেই লবণের মত পদার্থ জমিয়া নলের ছিদ্র বুজিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই পদার্থের নাম ন্যাফথালিন (Naphthaline) ন্যাফথালিনের যে মূল্য নাই তাহা নহে। নেকড়ার পুঁটলি করিয়া ইহা বাক্সের ভিতর রাখিলে পোকা-মাকড়ে কাপড়-চোপড় কাটিতে পারে না। কিন্তু গ্যাস প্রস্তুতের সময় নলের ভিতর ন্যাফথালিন জমিতে দিলে নলের বড় অনিষ্ট হয়। তাহা ছাড়া আবার, গ্যাসের কিয়ৎ পরিমাণে আলোকপ্রদায়িনী শক্তি জমিয়া এই ন্যাফথালিনের সৃষ্টি হয়। সেজন্য যে গ্যাস হইতে ন্যাফথালিন বাহির হইয়াছে, সে গ্যাস উত্তম নয়। এই কারণে উত্তপ্ত গ্যাসকে সহসা শীতল করিতে নাই, ক্রমে ক্রমে শীতল করিতে হয়। কয়লা ভাজিবার পাত্র হইতে বাহির হইয়া নলের ভিতর গ্যাস উঠিলে, তাহাকে একেবারে শীতল না করিয়া আরও অনেকগুলি নলের ভিতর দিয়া তাহাকে চালাইতে হয়। নলে নলে গ্যাসকে একবার উঠাইতে একবার নামাইতে ক্রমে শীতল হইতে থাকে। অবশেষে স্নিগ্ধ নল ও স্নিগ্ধ পাত্রের ভিতর দিয়া গ্যাসকে ভ্রমণ করাইলেই ইহা হইতে সমুদয় আলকাতরা পৃথক হইয়া পড়ে। অনেকগুলি খাড়া নল যাহার গায়ে বাহ্য বায়ু লাগিয়া ভিতরের গ্যাসকে শীতল করে, তাহাকে স্নিগ্ধ নল বলে। কোনও কোনও কারখানায় এই নলের ভিতর কোক কয়লা অথবা ইটের খোয়া থাকে। তাহার সহযোগে গ্যাস হইতে আলকাতরা শীঘ্র পৃথক্ হইয়া পড়ে। আবার কোথায় বা স্নিগ্ধ নল সমুদয় শায়িতভাবে জলের ভিতর ডুবানো থাকে। তাহাতে গ্যাস হইতে আরও শীঘ্র আলকাতরা পৃথগ্ভূত হয়। এইরূপে নানাস্থানে আলকাতরা জমিয়া হৌজে আসিয়া জমা হয়। তাহার পর সেখান হইতে তুলিয়া ইহা বিক্রীত হয়। বিলাতে পূর্বে আলকাতরার মূল্য অতি যৎসামান্য ছিল। এক্ষণে ইহা হইতে ম্যাজেণ্ডা প্রভৃতি নীল, পীত, লোহিত নানারূপ রঙ্ প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্য! এই আলকাতরা হইতে স্যাকেরিণ নামক একপ্রকার চিনি প্রস্তুত হয়। ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে ঘোর মিষ্ট পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই।

আলকাতরার হাত হইতে মুক্ত হইবার পর গ্যাসকে আমোনিয়া হইতে পৃথক

করিতে হয়। গ্যাসের সহিত নিষেদল বাষ্পভাবে মিশ্রিত থাকে। যদি লোকের বাড়ী গিয়া গ্যাস ও নিষেদল বাষ্প একসঙ্গে জ্বলে, তাহা হইলে পিত্তল কাঁসা নির্মিত দ্রব্যাদিতে কলঙ্ক পড়িয়া বিশেষ ক্ষতি হয়। আমোনিয়া গ্যাস একটী যৌগিক পদার্থ, মূল পদার্থ নহে। ইহা একভাগ নাইট্রোজেন ও তিনভাগ হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। আমোনিয়া গ্যাস যখন পুড়িতে থাকে, অর্থাৎ যখন ইহা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে, তখন দুইদিকে নূতন দুইটী যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। নাইট্রোজেনের সহিত প্রথম অল্প অক্সিজেন মিশিয়া নাইট্রস এসিড, তাহার পর আরও অক্সিজেন মিশিয়া, নাইট্রিক এসিড বা সোরার দ্রাবক প্রস্তুত হয়। অপরদিকে হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া জল হয়। জল হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু ঘরের ভিতর নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন হইলে বিশেষ ক্ষতি আছে। ঘরের বায়ু দূষিত হয়, তাহা ছাড়া পিত্তলাদি ধাতু নির্মিত দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সে নিমিত্ত গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক্ করা আবশ্যক। আরও কথা এই, আমোনিয়া হইতে নিষেদল প্রস্তুত হয়। নিষেদল কিছু আর অকর্মণ্য দ্রব্য নয়, ইহার মূল্য আছে। বিলাতে পূর্বে অধিক নিষেদলের ব্যবহার ছিল না। পূর্বকালে মিশর দেশে উষ্ট্রের বিষ্ঠা হইতে নিষেদল প্রস্তুত হইত। তাহাই বিলাতে অল্প পরিমাণে আমদানি হইত। গ্যাস প্রস্তুত করিতে করিতে সুচতুর বিলাতবাসিগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের এই গ্যাসের ভিতরই প্রচুর পরিমাণে আমোনিয়া রহিয়াছে। বাহির করিতে পারিলেই টাকা হয়। তাই এই আমোনিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। বিলাতবাসীরা দেখিলেন যে, জলের সহিত আর আমোনিয়া গ্যাসের সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। দেখা হইলেই দুইজন কোলাকোলি মেশামেশি করিতে ভালবাসে। জল আমোনিয়া গ্যাসের সহিত এত মিশিতে ভালবাসে যে, একভাগ জল ৭৭০ গুণ আমোনিয়া বাষ্পের সহিত না মিশিলে আর পরিতৃপ্তি লাভ করে না। বটে! তুমি আমোনিয়া বাষ্প কয়লা গ্যাসকে ভালবাস সত্য, তাই কয়লা গ্যাসের সহিত মিশিয়া আছ। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে তুমি জলকে অধিক ভালবাসো। জল পাইলে তুমি গ্যাস ছাড়িয়া জলে গিয়া মিশিবে। তোমার নিকট আমরা জল আনিয়া দিব, জলের সহিত তোমাকে আমরা মিলাইব। প্রথম প্রথম লোকে বড় বড় জলের হৌজ করিয়া তাহার একদিকে গ্যাস ডুবাইয়া দিতে লাগিল, অপরদিকে এক একটী তালের মত বড় বড় বুদ্বুদ হইয়া গ্যাস ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপ গ্যাসের আমোনিয়া জলে ধৌত হইয়া যাইল, অর্থাৎ কিনা আমোনিয়া জলের সহিত গিয়া মিশিল। কিন্তু এরূপ ধৌত করা বিলম্বের কাজ। হৌজের নিকট উপস্থিত হইয়া ধৌত হইবার নিমিত্ত গ্যাসকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। পশ্চাৎ দিকে গ্যাসের দ্রুতগতি মন্দ হইয়া পড়ে। এরূপে গ্যাস ধৌত করার আরও একটী দোষ এই যে, গ্যাসের চারিপিট জলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় না। তালের মত বড় যে বিম্বগুলি হয়, তাহার বাহির-পিট কেবল জলে ধৌত হয়, ভিতরের দিকে জল লাগে না। ভিতরের দিকে যে আমোনিয়া থাকে, তাহা আর জলের সহিত মিশিতে পায় না, সুতরাং গ্যাসে আমোনিয়া রহিয়া যায়। সেজন্য আর একজন লোক বৃষ্টির সৃষ্টি করিলেন। কলের বলে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িবে। বৃষ্টি ভেদ করিয়া গ্যাস উপরে উঠিতে থাকিবে। তাহাতে গ্যাসের চারিপিট ধুইয়া যাইবে। আমোনিয়া বাষ্প গিয়া জলের সহিত মিশিবে। এ উপায়টী অনেক পরিমাণে সফল হইল বটে, কিন্তু ইহাতেও একটী দোষ প্রতীয়মান হইল। প্রকৃত-পক্ষে কয়লা-গ্যাস হইল এক প্রকার হাইড্রো কারবণ, অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও কারবণ মিশ্রিত একটী যৌগিক পদার্থ। এই হাইড্রো কারবণ পুড়িয়াই উত্তাপ ও আলোক

হয়। মুষলধারে বৃষ্টি ভেদ করিয়া যাইবার সময় কেবল যে গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক হইয়া পড়ে তাহা নহে, ইহার হাইড্রোকারবণও অনেক নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং গ্যাসের আলোক ও উত্তাপ প্রদায়িনীশক্তি কমিয়া যায়। সে নিমিত্ত আর একজন আর একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। অনেকগুলি বড় বড় খাড়া নলের ভিতর কোক কয়লা রাখিয়া, তাহা দিয়া গ্যাস চালাইয়া দিলেন। গ্যাস চলিবার সময় তাহার উপর আস্তে আস্তে ঝুর ঝুর করিয়া জল বর্ষণ করাইলেন। সেই জলের সহিত আমোনিয়া মিশ্রিত হইল, কিন্তু হাইড্রোকারবণ নষ্ট হইল না। কিন্তু গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক করিবার নিমিত্ত আর একজন একটী চমৎকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন। কলটী আর কিছুই নয়, নলের ভিতর কতকগুলি চক্র। এই চক্রের গায়ে লোম থাকে। চক্রটী ঘুরিবার সময় লোমগুলি জলে ভিজিয়া যায়। ইহার ভিতর দিয়া গ্যাস যাইবার সময় সেই জলে আমোনিয়া লাগিয়া যায়। কিন্তু এই কলটীর দাম অনেক। প্রায় ৪৫,০০০ টাকা। কিন্তু মূল্য অধিক হইলে কি হয়, ইহা ব্যবহার করিলে লাভ আছে। গ্যাস ধৌত এই আমোনিয়া মিশ্রিত জল বাজারে বিক্রয় হয়। ইহা হইতে লোকে নিষেদল প্রস্তুত করে। যে গ্যাস কারখানায় আমোনিয়া পাইবার জন্য ৪৫,০০০ টাকার একটী কল ব্যবহার হইতে পারে, সেখানে এত নিষেদল উৎপন্ন হয় যে, তাহা বেচিয়া এক বৎসরের মধ্যেই কলের দাম উঠিয়া যায়। গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক হইলে ইহা হইতে গন্ধক ও কারবণিক এসিড পৃথক করিতে হয়। কারবণিক এসিড অল্প পরিমাণে থাকে ও ইহা বিশেষ অপকারী নহে। কিন্তু গন্ধক অতিশয় অপকারী। গন্ধক থাকিলে গ্যাস হইতে যেসকল দুর্গন্ধ বাহির হয় ও ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সম্পূর্ণভাবে গ্যাস হইতে গন্ধক দূর করা অতি দুঃসাধ্য কাজ। চূণের ভিতর দিয়া গ্যাস পরিচালিত করিলে গন্ধক গ্যাস ছাড়িয়া চূণের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। কারবণিক এসিডও ইহার সহিত মিশিয়া যায়। এই উপায়ে অনেকে গ্যাস পরিষ্কার করিয়া থাকেন। লৌহ চূর্ণের ভিতর দিয়া গ্যাস পরিচালিত করিলে, গ্যাস হইতে গন্ধক পৃথক হইয়া পড়ে।

এইরূপে গ্যাস পরিষ্কৃত হইলে, তাহার পর ইহাকে জমা করিয়া রাখিতে হয়। গ্যাস রাখিবার পাত্র আর কিছুই নয়, কেবল বড় একটী লৌহ নির্মিত গোলাকার বাক্স। ইহার তলদিক খোলা, বন্ধ নয়। মনে করিলে এই পাত্রটী উঠাইতে নামাইতে পারা যায়। ইহার নিম্নভাগে বড় একটী জলের হৌজ থাকে, সেই হৌজের ভিতর দিয়া গ্যাসের নল আসিয়া তাহার মুখ জলের উপর একটু জাগিয়া থাকে। কারখানায় গ্যাস প্রস্তুত হইয়া যখন এই নলের মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, তখন লৌহ পাত্রটী নামাইয়া দিতে হয়। ইহার চারিধার হৌজের জলে ডুবিয়া যায়। নলের মুখ দিয়া গ্যাস আসিয়া ক্রমে পাত্রটী পূর্ণ হয়। ইহার চারিধার জলে ডুবিয়া থাকে বলিয়া গ্যাস বাহির হইয়া যায় না। আবশ্যকমতে এই পাত্র হইতে রাস্তায় ও লোকের বাড়ীতে নলের দ্বারা গ্যাস প্রেরিত হয়।

গুটিকত ধাতু

ভারতবর্ষের কোথায় পশ্চাৎ লিখিত ধাতুগুলি পাওয়া যায়, সংক্ষেপে সেই কথা বলিতেছি। আবশ্যক হইলে পরে সেগুলির কথা বিস্তৃতভাবে লিখিব।

রৌপ্য ॥ রৌপ্য সচরাচর গন্ধক, সীস প্রভৃতি অপরাপর পদার্থের সহিত

মিশ্রিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে রৌপ্যের আকর ভালরূপ নাই, সেজন্য এই ধাতু অন্য দেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, পূর্বকালে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে মালাবার প্রদেশ হইতে চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইত। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। এক্ষণে ভারতবর্ষের কোনও স্থানে আকর হইতে লোকে রৌপ্য বাহির করে না। এদেশে সীসের আকরের সহিত অল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত হইয়া থাকে। সীসের আকরকে গ্যালিনা (Galina) বলে। এই আকরে সীস ও গন্ধক অধিক পরিমাণে থাকে। সামান্য ভাবে রৌপ্য থাকে। মাদ্রাজ প্রদেশে কডাপা ও করণুল জিলায়; মধ্যপ্রদেশে শম্বলপুর, হোশঙ্গাবাদ জিলায়; বঙ্গদেশে সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, বীরভূম, মানভূম, হাজারিবাগ জিলায়; হিমালয়ের নানাস্থানে ও ব্রহ্মদেশের পার্বত্য অঞ্চলে গ্যালিনা বর্তমান আছে। কোথাকার গ্যালিনায় কি পরিমাণে রৌপ্য আছে, তাহা অতি সাবধানে নিরীক্ষত হইয়াছে। যতগুলি সীসের আকর রাসায়নিকভাবে পরীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে করণুল জিলার কোইল কোণ্টলা নামক স্থানের আকর সর্বোত্তম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। এখানকার ২৭ মণ আকর হইতে ১২ সের রৌপ্য বাহির হইয়াছিল। অপরাপর স্থানের আকর হইতে ২৭ মণে কোথাও এক ছটাক, কোথায় এক সের এইরূপে রৌপ্য বাহির হইয়াছিল। বঙ্গদেশে মানভূম জিলায় ঢাডকার আকর হইতে ২৭ মণে প্রায় ৪ সের রৌপ্য বাহির হইয়াছিল। এরূপ আকর হইতে কেবল রৌপ্য বাহির করিতে যাইলে লাভ হইবার কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনা নাই। সীস বাহির করিতে পারিলে লাভ হইতে পারে। সেই কার্য্যের সহিত যেটুকু রৌপ্য বাহির হইয়া পড়ে, তাহা উপরি লাভ।

তাম্র ॥ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে খনি হইতে তাম্র উদ্ধৃত হইত। নানাস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পরিত্যক্ত খনি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে অতি সামান্যভাবে আকর হইতে তাম্র সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ তাম্র ও গন্ধক মিশ্রিত সোণামুখী নামক প্রস্তরই তাম্রের আকর। ইহাকে গলাইয়া লোকে তাম্র বাহির করিয়া লয়। সোণামুখী পাথর মাটি খুঁড়িয়া খনির ভিতর হইতে বাহির করিতে হয়। তাম্রের খনিতে শীঘ্র জল বাহির হইয়া পড়ে। এদেশের খনিকেরা দমকল ব্যবহার করিতে জানে না, সুতরাং তাহারা ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে না। যথোচিত পরিশ্রম করিয়াও তাম্র-খনি কার্য্যে তাহাদের কষ্টে দিনপাত হয়। সে নিমিত্ত ভারতবর্ষে আকর হইতে তাম্র বাহির করা ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে ও বিদেশ হইতে তাম্র আমদানি হইতেছে। মাদ্রাজ প্রদেশে, ত্রিচিনাপল্লী, বেল্লারি, কডাপা, করণুল, বঙ্গলোর প্রভৃতি জিলায় প্রচুর পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। প্রাচীনকালে এই সকল স্থানে বহুল পরিমাণে তাম্র উদ্ধৃত হইত। নানাস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পরিত্যক্ত খনি পড়িয়া রহিয়াছে। আধুনিক মতে ইংরাজেরা তামা বাহির করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে লাভ না হইয়া বরং ক্ষতি হইয়াছিল। সুতরাং খনি-কার্য্য এক্ষণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মধ্যপ্রদেশে রাইপুর, জব্বলপুর, নরসিংহপুর, চান্দা প্রভৃতি জিলার নানাস্থানে অনেক তামার আকর আছে। কয়েক বৎসর হইল, নর্মদা নদীর একটী চড়া হইতে আকর লইয়া তাহা হইতে তামা বাহির করিয়া একজন সাহেব বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। খরচ উঠিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ লাভ হয় নাই। সে নিমিত্ত এ কাজ তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। মধ্যপ্রদেশে যে সর্বোত্তম তাম্রের আকর আছে, তাহাতে একশত ভাগে ৪৮ ভাগ তাম্র থাকে, অবশিষ্ট ৫২ ভাগ মৃত্তিকা, লৌহ প্রভৃতি অপরাপর পদার্থ। মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের ভিতরও প্রচুর পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। রিবা, বুন্দেলখণ্ড, অলবার, ভরতপুর, জয়পুর, আজমীর, উদয়পুর, বুন্দি,

বিকানীর প্রভৃতি স্থানের পার্বত্যভাগে তাম্রের আকর আছে। জয়পুর এলাকায় আরাবলি পর্বতে, শিংখানা নামক স্থানে এখনও লোকে আকর হইতে তাম্র প্রস্তুত করে। ক্ষেত্রি নামক স্থানেও প্রচুর পরিমাণে তাম্র উদ্ধৃত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ধারবাড় জিলায় অল্প পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। বঙ্গদেশে, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মানভূম, সিংভূম, হাজারিবাগ ও লোহারদাগা জিলায় প্রচুর পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। ৪৫ বৎসর পূর্বে এই আকর প্রথম আবিষ্কৃত হয়। দুই একজন সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই আকরের সহিত রৌপ্যও মিশ্রিত আছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে (১৮৮৯ খৃঃ) যেরূপ স্বর্ণ লইয়া হুলস্থূল পড়িয়াছিল, সেইরূপ সেই সময়ে বৈদ্যনাথের তাম্রের আকর লইয়াও হুলস্থূল পড়িয়াছিল। কিন্তু এ আকর হইতে বিশেষ কোনও লাভ হয় নাই। এই আকরে একশত ভাগে পশ্চাৎ লিখিত পদার্থ সমূহ মিশ্রিত আছে ঃ—তাম্র ৩৮ ভাগ, লৌহ ১৭, সীস ১, রৌপ্য ১/৬, গন্ধক ১৭, অবশিষ্ট বালুকা, মৃত্তিকা ইত্যাদি। মানভূম জিলায়, মানবাজারের নিকট একটি পরিত্যক্ত পুরাতন তাম্রের খনি আছে। কে কবে এই খনি আবিষ্কার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার কিছু ঠিক নাই। সিংভূমে নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে এই স্থানের আকর হইতে তাম্র বাহির করিত। ইংরাজেরাও বারবার এই কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভালরূপ লাভ হয় নাই। ধলভূম ও সেরাইকেলা রাজার এলাকায় অনেক তাম্র খনি আছে। এস্থানে তাম্র খনির কার্য্য করিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা। সিংভূম ও ধলভূম এলাকায় বরগণ্ডা নামক স্থানে একটী ইংরাজ-কোম্পানি তাম্রখনির কার্য্য করিতেছেন। ১৮৯১ কালে তাঁহারা ১,৩২,৫০০ টাকা মূল্যের তাম্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হাজারিবাগ জিলায়ও অনেক প্রাচীন তাম্রখনি আছে। এ স্থানের আকরে একশত ভাগে ৩৪ ভাগ তাম্র, ৩৪ ভাগ লৌহ ও ৩০ ভাগ গন্ধক থাকে। হিমালয় পর্বতে, বিশেষতঃ কুমাউন ও গড়ওয়াল জিলায়, উত্তম আকর আছে ও অনেকস্থানে পরিত্যক্ত খনিও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও স্থানে এখনও সামান্যভাবে তাম্র সংগৃহীত হইয়া থাকে। নেপালের খনিসমূহ হইতেও অল্প পরিমাণে তাম্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু ক্রমে সর্বত্রই এই কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইতেছে। দার্জিলিং জিলায় অনেকগুলি তাম্রখনি আছে। ভুটান, আসাম, ব্রহ্মদেশ—সকল স্থানেই তাম্রের আকর অল্পাধিক বর্তমান আছে।

সীস ॥ সীস বিশুদ্ধভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। সচরাচর ইহা গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এরূপ আকরকে গ্যালিনা (Galina) বলে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে প্রচুর পরিমাণে সীস উৎপন্ন হইত। এক্ষণে এ কার্য্য প্রায় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে, কডাপা জিলায়, জংগমরাজপল্লি নামক গ্রামে বৃহৎ সীসের খনি আছে। এখানকার আকরে ১০০ ভাগে ৬৭ ভাগ সীস থাকে। তাহার সহিত যৎসামান্য রৌপ্যও মিশ্রিত থাকে। ২৭ মণ আকর হইতে ৩০ তোলা রৌপ্য বাহির হয়। করণুল বেল্লারি প্রভৃতি জিলায়ও সীসের আকর আছে। নাগপুর, রিবা, বুন্দেলখণ্ড, আজমীড়, অলবাড়, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে সীসের আকর আছে। আজমীড় জিলায় তারাগড় নামক পর্বতে আজ পর্য্যন্ত লোকে আকর হইতে সীস বাহির করে। বোম্বাই প্রদেশে পাঁচমহল নামক স্থানে পূর্বকালে সীসের খনি ছিল। এক্ষণে এ কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হিমালয় পর্বতে অনেক স্থানে আজ পর্য্যন্ত সীসের খনির কার্য্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সাঁওতালপরগণা, মানভূম, হাজারিবাগ, লোহারদাগা প্রভৃতি জিলায় নানাস্থানে সীসের আকর আছে। সাঁওতালপরগণায় শঙ্করাপাহাড়, তুরি পাহাড়,

বাইগুকি, পাঁচপাহাড় প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে সীসের আকর বর্তমান আছে। এখানকার আকরের একশতভাগে ৪২ ভাগ সীস, ১৫ ভাগ গন্ধক, ও যৎসামান্য রৌপ্য থাকে। ভাগলপুর জিলায় গোরিপুর, খড়িঘর প্রভৃতি স্থানে সীসের খনি আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে এই জিলায় বাঁকা নামক স্থানে এক সাহেব সীসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু লাভ হইল না। সুতরাং তাঁহাকে অল্পদিনেই কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইল। মুঙ্গের জিলায় চকাই ও খড়কপুর পাহাড়ে, মানভূম জিলায় ঢাডকা প্রভৃতি স্থানে, হাজারিবাগ জিলায় মহাগাগ, বরাগুণ্ডা, মেহানদাদি, মুকুন্দগঞ্জ, পরসেয়া, হিসাটুতে; লোহারদাগা জেলায় বরিখাপ, সিলি ইত্যাদি নানাস্থানে সীসের আকর বর্তমান আছে। মধ্যপ্রদেশে, আসামে, ব্রহ্মদেশে সর্বত্রই অল্পাধিক সীসের আকর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে এখনও সামান্যভাবে সীস বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

দস্তা (Zinc)॥ দস্তা বা জস্তা সচরাচর গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই ধাতু অতি বিরল। হাজারিবাগ জিলায়, রাজপুতানায় ও হিমালয়ের কোন কোন স্থানে ইহা সীসের আকরের সহিত সামান্যভাবে বর্তমান থাকে। রাজপুতানায়, উদয়পুর এলাকায় জওয়ার নামক স্থানে সেকালে লোকে আকর হইতে দস্তা বাহির করিত। কিন্তু একথা ঠিক কিনা, তাহা ভালরূপে মীমাংসা হয় নাই।

টিন॥ ভারতবর্ষে এ ধাতুও বিরল, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতেই আনীত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে, হাজারিবাগ জিলায় নরঙ্গা নামকস্থানে টিনের আকর আছে। এই অঞ্চলে যাহারা প্রস্তর গলাইয়া লৌহ বাহির করে, তাহারা একবার লৌহের আকর গলাইতে গলাইতে এক প্রকার শুভ্র ধাতু দেখিতে পাইয়াছিল। রৌপ্য মনে করিয়া সেই ধাতু তাহারা রাণীগঞ্জে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত লইয়া আইসে। রাণীগঞ্জের একজন সাহেব এই কথা শুনিয়া সেই স্থানে গমন করেন। সেই ধাতু যে টিন ও টিনের আকর যে সেস্থানে বর্তমান আছে, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া পালগঞ্জের রাজার নিকট হইতে তাহার স্বত্ব কিনিয়া খনিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, সাহেব কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্পদিনেই তাঁহাকে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে, টেনেসেরিম, মারগুই প্রভৃতি অনেকস্থানে টিনের খনি আছে।

নূতন বৃক্ষ

কপি, গোল-আলু, তামাক প্রভৃতি নানারূপ নূতন বস্তু অল্পদিন হইল, এদেশে আনীত হইয়াছে। অন্যান্য নূতন বস্তুও ভারতে আনিবার নিমিত্ত আজ পর্য্যন্ত চেষ্টা হইতেছে। এরূপ চেষ্টা সাহেবেরাই অধিক করিতেছেন, এ দেশবাসীরা নয়।

আজ কয় বৎসর হইল। এ দেশে একটী নূতন গাছ আসিয়াছে। ইহার নাম ইউকালিপটস্ (Eucalyptus), এ গাছের আদি বাস অষ্ট্রেলিয়া দেশে। তক্তা করিবার নিমিত্ত বৃক্ষটী বিশেষ উপযোগী, ইহার গা হইতে একপ্রকার আটা বা গঁদ নির্গত হয়, তাহাও মনুষ্যের নানা কার্য্যে লাগে, আর ইহার পত্র হইতে যে তৈল বাহির হয়, অনেক পীড়ায় তাহা একটী মহৌষধ।

ইউকলিপটস্-পত্রের বর্ণ নীল, সেইজন্য আমি ইহাকে এই প্রবন্ধে "নীলবৃক্ষ" বলিয়া ডাকিব। বৃক্ষাদিগের যে বংশে বেলের জন্ম, নীলবৃক্ষও সেই বংশসম্ভূত। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে এই বংশকে মারটাসি (Myrtaccae) বলে। নীল বৃক্ষ প্রায় ১৫০ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আছে। এই বৃক্ষের পাতা কখন ঝরিয়া যায় না, বারমাস নবীন নীলবর্ণে বৃক্ষটী আচ্ছাদিত থাকে। বৃক্ষটী খুব বড়, ২০০ শত হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। শিশুবৃক্ষের পাতা বড়। বৃক্ষের যত বয়স হইয়া আসে, পাতাও তত ছোট হয়। নীলবৃক্ষের ফল অনেকটা গোলাপজামের ফলের মত দেখিতে।

নীলবৃক্ষের প্রধান গুণ এই যে, ইহা নিজদেশে অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে গাছটী বিলক্ষণ বড় হয়। ষোল বৎসরে এই গাছ ৬০ হাত উচ্চ হয়। এই সময়ে গাছ এত মোটা হয় যে, মানুষে আঁকড়াইয়া পায় না। পঞ্চাশ বৎসরে এই গাছ প্রায় ১৫০ হাত উচ্চ হয়। এই সময় গুঁড়ির বেড় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ষাট-সত্তর হাত পর্য্যন্ত গাছটী অতি সরলভাবে উঠে, ইহার ভিতর একটীও ডাল হয় না। এরূপ সরল গাছ হইতে কি প্রকার ভাল তক্তা হইতে পারে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার কাঁড় তক্তা প্রভৃতি অতি দীর্ঘকালস্থায়ী। ইহার আর একটী গুণ এই যে, কাঠের মত ইহাতে পোকা কি ঘুণ ধরে না। এই বৃক্ষের কাঠ পোড়াইলে যে ছাই হয়, তাহাতে অনেক পটাশ (Potash) বা ক্ষার থাকে। ১০০ সের ছাইয়ে প্রায় ২১ সের ক্ষার থাকে। যে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে, সে স্থানে নীলবৃক্ষ পুতিলে শুনিয়াছি যে, দূষিত বায়ু সংশোধন করে।

নীলবৃক্ষের পত্র চোয়াইলে যে তৈল বাহির হয়, নানা পীড়ায় সেই তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষরূপ যে উপকার হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই তৈল এক প্রকার কর্পূরের ন্যায়। আরক বা টিংচাররূপেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অজীর্ণ, পক্বাশয়ের ও অন্ত্রের পুরাতন সর্দ্দি, মূত্রবৎ কৃমিবাত প্রভৃতি নানা রোগে এই ঔষধ ব্যবহার হয়। ইহার পবন-নিবারণশক্তিও বিলক্ষণ আছে। ম্যালেরিয়া জ্বরেরও ইহা একটী ভাল ঔষধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে, সেস্থানে নীলবৃক্ষ রোপণ করিলে বায়ু পরিশোধিত হয়। সে নিমিত্ত কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন "জ্বরনাশক বৃক্ষ"। প্রকৃতই যে ইহার ম্যালেরিয়ার বিষনাশ করিবার শক্তি আছে, তাহা ডাক্তার বেণ্টলি অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্থির করিয়াছেন। সে নিমিত্ত ইটালি ও আলজিরিয়া দেশে যেখানে অনেক স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, সেস্থানে লোকে আজকাল অনেক নীলবৃক্ষ রোপণ করিতেছে; তাহাতে ফলও ভাল হইয়াছে। যে স্থানে বারমাস লোকে কম্পজ্বরে কাঁপিত, যেস্থানে লোকের প্লীহা যকৃৎ বাড়িয়া পেট মৃদঙ্গের আকার ধারণ করিত, যেস্থানে শিশুদিগের প্রাণরক্ষা হওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল, আজ এই নীলবৃক্ষের গুণে সেসব স্থানে সুস্থকায় সবল বীরপুরুষেরা সদর্পে পৃথিবীকে পদদলিত করিতেছে।

নীলবৃক্ষের এমন কি গুণ আছে, যাহাতে মানবজাতির এরূপ উপকার হইতে পারে? তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হইতে এক প্রকার বাষ্প নিঃসৃত হয়, তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়ার বিষ ধ্বংসভূত হয়। অনেক বৃক্ষ হইতে বাষ্প নির্গত হয়, তাহাতে মনুষ্য-শরীরের উপকার কি অপকার হইয়া থাকে। বোধ হয়, নিম ও তেঁতুল বৃক্ষের গুণাগুণের কথা সকলেই অবগত আছেন। লোকে কথায় বলে,—

"তাল তেঁতুল কুল, ভিটা করে নির্ম্মূল।" নিমের হাওয়া ভাল, তেঁতুলের

হাওয়া ভাল নয়, এই কথাটী বহুকাল হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে। এই কথাটী বিশেষরূপে প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এ দেশে একটী গল্পও প্রচলিত আছে। একজন প্রবীণ বিচক্ষণ বৈদ্যের পুত্র বিদেশে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। পুত্র বিদেশে অবস্থিতি করিয়া কিরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পিতা তাঁহার নিকট একটী লোক পাঠাইয়া দিলেন। "পথে প্রতিদিন তেঁতুল কাঠের জ্বালে রাঁধিবে, তেঁতুল দিয়া ভাত খাইবে, তেঁতুলতলায় রাত্রিতে শুইবে, সকল বিষয়ে তেঁতুল ব্যবহার করিবে;" লোকটীকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। বৈদ্যের উপদেশ অনুসারে শয়ন ভোজন করিতে করিতে লোকটী পথ চলিতে লাগিল। বহুদিন পরে বৈদ্যের পুত্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বৈদ্যের পুত্র পিতা-প্রেরিত লোকটীকে অনেক সমাদর করিলেন। লোকটী বৈদ্যের পুত্রকে আপনার শরীর দেখাইয়া বলিলেন যে—"দেখুন মহাশয়, সম্প্রতি আমার গায়ে এ সব কি বাহির হইয়াছে। বোধহয় আমার শোণিত দূষিত হইয়াছে।" পথের সমুদয় বিবরণ পাইয়া বৈদ্যপুত্র জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পিতা লোকটীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। তেতুল ভোজন, তেতুলের বায়ুসেবনে লোকটীর শোণিত প্রকৃতই দূষিত হইয়াছে। প্রত্যাগমনকালে বৈদ্য-পুত্র লোকটীকে পথে নিম্বভক্ষণ, নিম্ববায়ুসেবন করিতে উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ পালন করিয়াই লোকটী পথ চলিতে লাগিল। অল্পদিনে সে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। বৃদ্ধ বৈদ্যের নিকট আসিয়াই সমুদয় পরিচয় দিল। বৈদ্য বুঝিলেন যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার পুত্রের জ্ঞান হইয়াছে বটে।

যেরূপ নিমবৃক্ষের গুণ আছে, নীলবৃক্ষেরও সেইরূপ কোনও গুণ থাকিতে পারে। যাহা হউক, ইটালি, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে এই বৃক্ষ রোপণ হওয়ায় লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

বায়ু

মাছ যেরূপ জলের ভিতর থাকে, আমরাও সেইরূপ বায়ুর ভিতর ডুবিয়া আছি। মাছ যেরূপ জল না পাইলে বাঁচে না, আমরাও সেইরূপ বায়ু না পাইলে বাঁচি না। নিশ্বাসের সহিত এই বায়ু লইয়া আমরা জীবিত থাকি। বায়ু স্বচ্ছ পদার্থ, তাই আমরা ইহাকে চক্ষে দেখিতে পাই না। কাচ স্বচ্ছ পদার্থ, সে নিমিত্ত উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইলে দূর হইতে কাচও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই মক্ষিকা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ কাচের সারসি দিয়া বাহিরে পলাইতে চেষ্টা করে। ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া তাড়া দিলে পলাইবার চেষ্টায় চড়ুই পক্ষীও জানলার সারসির উপর গিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, স্বচ্ছ পদার্থ চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। নির্বোধ চড়ুই পাখী মনে করে, এখানে বুঝি কিছুই নাই, এস্থান বুঝি খোলা, তাই সারসি দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। স্বচ্ছ বলিয়া বায়ুও আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু বায়ু আমরা স্পর্শ করিতে পারি। গ্রীষ্মকালের দিনে মৃদুমন্দ দক্ষিণ-বায়ু আসিয়া আমাদের শরীর সুশীতল করে। পাখা দিয়া আশে-পাশের বায়ু একত্র করিয়া আমাদের গায়ে লাগাইয়া সুখানুভব করি। তাহার পর, বায়ুর যে কত বল, তাহ সকলেই জানেন। যখন খরতর স্রোতে

বায়ু বহিতে থাকে, তখন পৃথিবী কম্পিত হয়, গাছ-পালা ঘর-বাড়ী সব পড়িয়া যায়।

আকাশের উপর যেস্থানে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র আছে, আমাদের এ বায়ু সে স্থান পর্য্যন্ত নাই। পৃথিবী হইতে বোধহয় পঁচিশ ক্রোশ উপরে এ বায়ু একেবারেই নাই। সামান্য একটী আবরণের ন্যায় এই বায়ু পৃথিবীকে চারিদিকে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর এই বায়ু-আবরণটী পঁচিশ ক্রোশ পুরু। পৃথিবী খুব বড়, তাই আবরণটীও পুরু। পৃথিবী যদি একটী জালার মত ছোট হইত, তাহা হইলে, সেই পরিমাণে, এই আবরণটী এক অঙ্গুলির অধিক পুরু হইত না। বায়ুর যখন বল আছে, তখন বায়ুর ভারও আছে। জল যেরূপ ওজন করিতে পারা যায়, বায়ুও সেইরূপ ওজন করিতে পারা যায়। এক বর্গ ইঞ্চি ভূমির উপর প্রায় সাড়ে সাত সের বায়ু আছে। তবেই ভাবিয়া দেখ, আমাদের মাথার উপর কত মণ বায়ু আছে! কিন্তু চারিদিক হইতে বায়ু আমাদিগকে চাপিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমরা অনায়াসে সে ভার বহন করিতে সমর্থ হই, কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি না, জানিতেও পারি না যে, মাথার উপরে এত বড় বোঝা রহিয়াছে। মাথায় করিয়া এক ঘড়া জল লইয়া আসিতে কত ক্লেশ হয়; কিন্তু জলের ভিতর যখন ডুব দিই, তখন কত শত ঘড়া জল মাথার উপর থাকে! কিন্তু তাহাতে মাথা ভাঙ্গিয়া যায় না, কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। জল শরীরের চারিদিকে চাপিয়া থাকে বলিয়া, সেই নিমিত্ত ক্লেশ বোধ হয় না। বায়ুও সেইরূপ শরীরের চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে বলিয়া বায়ুর ভার আমরা অনুভব করিতে পারি না। এক অঙ্গুলি অর্থাৎ এক ইঞ্চি ভূমির উপর সাড়ে সাত সের বায়ু থাকে এ কথা মনে করিয়া রাখিতে হইবে। এ কথাটী বিশেষ আবশ্যক। এই কথা লইয়া ইহার পর অনেক বাদানুবাদ হইবে। অগ্নির উত্তাপে জল কেন ফুটিয়া উঠে, জল ফুটিয়া বাষ্প কিরূপে হয়, বাষ্প হইয়া কল কিরূপে চলে, যখন এই সকল কথা বিচার করিব, তখন এই বায়ুর ভারটী আমার আবশ্যক হইবে। প্রতি ইঞ্চি ভূমির উপর বায়ুর চাপ /৭॥—সের এই কথাটী মনে করিয়া রাখিবে।

মাটির উপর যেখানে আমরা বাস করি, সেই স্থানে বায়ু বিলক্ষণ গাঢ়। সেই স্থানেই বায়ুর চাপ সাড়ে সাত সের। যতই উপরে যাইবে, ততই দেখিতে পাইবে যে, বায়ুর গাঢ়তা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, বায়ু ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতেছে, বায়ু লঘু হইতেছে, বায়ুর ভার কমিয়া আসিতেছে। এইরূপে ক্রমে কম হইয়া হইয়া অবশেষে পঁচিশ ক্রোশ উপরে আর আদৌ বায়ু থাকে না। বড় পাহাড়ের মাথায় বায়ু এই জন্য অতিশয় পাতলা। সে স্থানে বায়ু এত পাতলা যে, নিশ্বাস লইয়া কুলায় না। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। বায়ু অভাবে নাক কাণ দিয়া রক্ত ফুটিয়া বাহির হয়। বেলুনে চড়িয়া আকাশের উপর উঠিলেও সে স্থানে বায়ুর অভাবে লোকের এইরূপ কষ্ট হয়। পৃথিবীতে তিন ক্রোশের অধিক উচ্চ পর্বত নাই, কিন্তু দুই ক্রোশ উঠিলেই অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক উপরে মনুষ্য আর উঠিতে পারে না।

সেকালের পণ্ডিতরা বায়ুকে একটী মূল পদার্থ বলিয়া পরিগণিত করিতেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুকে একটী ভূত বলিয়া তাঁহারা গণনা করিতেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বায়ু একটী পদার্থ নয়। সচরাচর চারিটী পদার্থ ইহার ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কারবণিক অম্ল ও জল বায়ুর সহিত যৎসামান্যভাবে মিশ্রিত থাকে। আজ পাঠকদিগকে আমি "অক্সিজেন" ও

"নাইট্রোজেন" এই দুইটী নাম মনে করিয়া রাখিতে অনুরোধ করি। ইহাদিগকে লইয়া পরে যে আমাকে কত কি কথা বলিতে হইবে, তাহার সীমা নাই।

সুগন্ধ

নানারূপ ফুল হইতে ফরাসীদেশে অনেক সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফরাসী দেশে থাকিতে আমি এই বিষয়ে যৎসামান্য তদন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তবে সে সময়ে শীতকাল ছিল, দেশ বরফে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ফুল ছিল না, তাই ভাল করিয়া আমি তদন্ত করিতে পারি নাই। এখান হইতে জর্মান দেশে কলোন নামক নগরে যাই। এই স্থানে জগদ্-বিখ্যাত ইর-ডি-কলোন প্রস্তুত হয়। তাহাও মোটামুটি দেখিয়াছিলাম। এই সব দেখিয়াছি শুনিয়াছি বলিয়া তাই আজ সুগন্ধ বিষয়ে দুই চারি কথা বলিতে সাহস করিতেছি। আর এক কারণ এই যে, আজকাল দেশীয় আতর বা ফুলেল তৈলের প্রতি লোকের রুচি নাই;—মাখা বল, শুঁকা বল, তত্ত্ব বল, তাবাস বল, এখন আর ভাল ভাল সখের শিশিপূর্ণ ফরাসী দেশের এসেন্স না হইলে লোকের মন উঠে না।

সুগন্ধ দ্রব্যের অধিকাংশ—গাছের ফুল বা মূল বা পাতা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। মৃগনাভি, খটাস প্রভৃতি দুই চারিটী বস্তু কেবল জন্তুদিগের শরীর হইতে পাই। কোনরূপ ধাতব সুগন্ধ দ্রব্য আছে কিনা বলিতে পারি না; বোধ হয় নাই। ফলকথা, প্রায় সমুদয় সুগন্ধ উদ্ভিদ্ হইতেই পাই।

উদ্ভিজ্জ সুগন্ধকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি;—(১) তৈল; (২) বীর্য্য বা ইষ্টার। এই দুইটী পদার্থ বৃক্ষ-শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই মানুষে বাহির করিয়া লয়। দুইটীই বায়ুতে উবিয়া যায়। বায়ুতে সত্বর মিশিয়া যায় বলিয়া, তাই সুগন্ধ দ্রব্যের শিশির ছিপি খুলিলেই ঘর গন্ধে আমোদিত হয়, কিংবা বাগানে ফুল ফুটিলে চারিদিকে সুন্দর সুগন্ধ বাহির হয়। যে সকল বস্তু বায়ুতে উবিয়া যায়, ইংরেজী কথায় তাহাদিগকে 'ভোলেটাইল' পদার্থ বলে। গাছের ভোলেটাইল তৈল চোয়াইয়া বাহির করিতে হয়। গাছের ফুলে জল দিয়া, একটী পাত্রে রাখিয়া, পাত্রটীর মুখ বন্ধ করিয়া তাপ দিলে জল বাষ্পরূপ ধারণ করে। পাত্রটীর মুখ যাহা দিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে একটী ছিদ্র থাকে; সেই ছিদ্রে একটী নল বসাইয়া দিতে হয়। অগ্নি হইতে দূরে অপর একটী পাত্র থাকে; তাহারও মুখ বন্ধ; তাহারও ঢাকনে ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রে নলের অপর মুখ লাগাইয়া দিতে হয়। অগ্নির উপর ফুল ও জল সহিত যে পাত্র থাকে, তাহার ভিতরের জল উত্তাপে বাষ্পরূপ ধারণ করে; সেই বাষ্প নলে নলে অপর পাত্রে গিয়া প্রবেশ করে। দ্বিতীয় পাত্রের ভিতর বাষ্প প্রবেশ করিলে, তাহার গায়ে শীতল জল সেচন করিতে হয়। শৈত্য পাইয়া বাষ্প পুনরায় জমিয়া যায়; বাষ্প জমিয়া পুনরায় জলে পরিণত হয়। যে ফুল সিদ্ধ করিবে, সেই ফুলের তৈল উঠিয়া বাষ্পের সহিত গিয়া অপর পাত্রে পড়ে। যেমন বাষ্প জমিয়া জল হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের তৈলও জমিয়া যায়। তৈল জমিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে; সেই তৈল লোকে উপর উপর উঠাইয়া লয়। গোলাপ, ল্যাভেণ্ডার, কমলা-নেবুর ফুল, দারুচিনি, পিপারমেণ্ট প্রভৃতির তৈল লোকে এইরূপে প্রস্তুত করে। জল হইতে তৈল সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লইতে পারা যায় না, অল্প পরিমাণে জলের সহিত রহিয়া

যায়। যৎসামান্য পরিমাণে তৈল রহিয়া যায় বলিয়া জলও সুগন্ধযুক্ত থাকে। গোলাপ-জল, ল্যাভেণ্ডার-জল, পিপারমেণ্ট-জল এইরূপে হয়।

কোনও কোনও বস্তুতে তৈল অতি সামান্য পরিমাণে থাকে। এত সামান্য পরিমাণে থাকে যে, তাহাকে জল হইতে পৃথক্ করা কঠিন কথা। সে নিমিত্ত সে সব তৈলের মূল্য অধিক। গোলাপ-ফুলে তৈল এইরূপ অতি সামান্যভাবে থাকে। এই তৈলের নাম আতর। এ দেশে গাজিপুর হইল আতর ও গোলাপ-জলের একটী প্রধান আড্ডা। গাজিপুরে থাকিতে আমরা গোলাপের বাগানে কখন কখন বেড়াইতে যাইতাম। একবার বেড়াইয়া আসিলেই শরীর সুগন্ধযুক্ত হইয়া পড়িত। প্রাতঃকালে গোলাপের বাগানগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়,—ফুটন্ত ফুলে যেন আলো করিয়া থাকে! দশটার মধ্যে লোকে সব ফুল তুলিয়া লয়। যতগুলি ফুল, তাহার দ্বিগুণ জল দিয়া চোয়াইতে হয়। প্রথম বার চোয়াইলে যে গোলাপ-জল বাহির হয়, তাহার সহিত পুনরায় নূতন নূতন ফুল দিয়া যতবার চোয়াইবে, গোলাপ-জল ততই উৎকৃষ্ট হইতে থাকিবে। আতর বাহির করিয়া লইতে হইলে, এই জলে কাপড় ঢাকা দিয়া রাত্রিকালে বাহিরে রাখিতে হয়। নিশার শীতলতা পাইয়া, গোলাপের তৈল, অর্থাৎ কি-না আতর, অতি সূক্ষ্ম সরের মত উপরে ভাসিতে থাকে। প্রাতঃকালে ধীরে ধীরে তাহাকে পালক দিয়া উঠাইয়া শিশির ভিতর রাখিতে হয়। দিন দিন এইরূপে সমুদয় তৈলটুকু উঠাইয়া লইতে হয়। বিশ সহস্র গোলাপ ফুলে এক তোলা আতর বাহির হয় কিনা সন্দেহ। একতোলা এরূপ বিশুদ্ধ আতরের মূল্য একশত টাকারও অধিক; কিন্তু এরূপ আতর অতি দুর্লভ পদার্থ। একবার খলিফা হারুণ-উল-রশিদের কীর্তিভূমি বোগদাদ নগর হইতে আমার নিকট এইরূপ আতর আসিয়াছিল। ইহার গুণ এই যে, তূণাগ্রে অণু-পরিমাণে ব্যবহার করিলে কাপড়-চোপড়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত কাঁচা গোলাপের সুগন্ধ থাকে। বাজারে যে আতর বিক্রীত হয়, তাহাতে চন্দন-তৈল মিশ্রিত থাকে। বিলাতের "অটো-ডি-রোজ" অধিকাংশ তুরস্ক-দেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলগেরিয়া প্রদেশে গোলাপের অনেক চাষ ছিল। ১৮৭৭ সালের যুদ্ধে—তুরস্ক যুদ্ধের পর এই প্রদেশ স্বাধীন হইয়াছে। এক্ষণে কি পরিমাণে আতর প্রস্তুত হয়, তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে প্রতি বৎসর ৪৫ মণ অর্থাৎ ১৮০০ সের আতর প্রস্তুত হইত। এক সের আতর করিতে ৭৪ মণ গোলাপ-ফুলের আবশ্যক। তবেই বুঝিয়া দেখ, বলগেরিয়া প্রদেশে গোলাপ ফুলের কিরূপ চাষ ছিল!

ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেরিড সন্নিবেশিত থাকে। পুদিনার গন্ধ পাতায় ও ডাঁটায়, দালচিনির ছালে, তেজপাতের পাতায়, চন্দনের কাষ্ঠে, লবঙ্গের পুষ্পকলিতে, এলাচির বীজে, নেবুর ফলে, আদা ও মুথার মূলে, বেণার ঘাসে ও মূলে, গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতির পাপড়িতে। আবার এক গাছেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সেরিড বাহির হইয়া থাকে। কমলা-নেবুর পাতা হইতে একরূপ সুগন্ধ বাহির হয়, তাহাকে ফরাসী ভাষায় "পেটিটগ্রেন" বলে; ফুল হইতে যাহা হয়, তাহাকে "নিরোলি" বলে। ইহা ব্যতীত ফলের খোসা হইতেও একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত তৈল বাহির হয়। যে সকল ফুলে তৈল অতি সামান্য-ভাবে থাকে, তাহা হইতে ফরাসীরা আর এক উপায়ে সুগন্ধ বাহির করিয়া লয়। তিলের তৈলে ভিজাইয়া তূলা অথবা চর্বির উপর স্তরে স্তরে ফুল সাজাইয়া দিলে, ফুলের গন্ধ সেই তূলায় অথবা চর্বিতে গিয়া প্রবেশ করে। তাহার পর সেই সুগন্ধযুক্ত তূলা বা চর্বি সুরায় ভিজাইয়া রাখিলে, সুরা সেরিড-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। ফরাসীরা সেই সুরা লইয়া নানারূপ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ্-শরীরের কোনও অংশে অধিক পরিমাণে তৈল থাকিলে তাহাকে পীড়ন করিয়া বাহির

করিতে পারা যায়। কমলা-নেবুর খোসা হইতে লোকে এই উপায়ে তৈল বাহির করিয়া লয়।

নানা স্থানে আমি পাঠকদিগকে বার বার আধুনিক রাসায়নিক-শাস্ত্র-অনুমোদিত মূল পদার্থগুলির নাম মনে করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে এগুলি ক খ স্বরূপ। যে সমুদয় নূতন জ্ঞানের প্রভাবে ইউরোপীয় জাতিরা আজ সসাগরা ধরার অধিপতি, এই নামগুলি মনে করিয়া না রাখিলে সে জ্ঞানলাভ করিবার উপায় নাই। এমন কি, এইরূপ প্রবন্ধ বুঝিতে পারাও কঠিন। পূর্ব প্রবন্ধে আমি চারিটী মূল পদার্থের নাম বার বার করিয়াছিলাম,—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বণ। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন—এ তিনটি বাষ্প। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়া বায়ু গঠিত। অক্সিজেন নিশ্বাসের সহিত লইয়া জীব জীবিত থাকে। খাঁটি অক্সিজেন নিশ্বাস লইলে শরীরের কার্য্য অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র হইয়া জীব মরিয়া যায়, সেজন্য অক্সিজেনের সহিত বায়ুতে নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। অক্সিজেন ও হাইড্রেজেন মিশিয়া জল হয়। অপরাপর পদার্থের সহিত মিশিয়া অক্সিজেন কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। অপরাপর পদার্থের সহিত মিশিয়া নাইট্রোজেনও কঠিনরূপ ধারণ করে। এই আমাদের সোরা নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও পটাস নামক ক্ষার দিয়া প্রস্তুত। কয়লাকে কার্বণ বলে। বৃক্ষাদিগের কাষ্ঠ কার্বণ দিয়া গঠিত। চিনিতে অনেক কার্বণ থাকে। হীরা বিশুদ্ধ কার্বণ দিয়া গঠিত।

যে সমুদয় সুগন্ধযুক্ত তৈলের কথা বলিতেছিলাম, তাহারা কার্বণ ও হাইড্রোজেন দিয়া গঠিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ঐ দুই পদার্থ সমান পরিমাণে থাকিলেও বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন বিভিন্ন স্বাদ-গন্ধের উৎপাদন করে। বিশুদ্ধ টারপিন-তৈল ৮৮ ভাগ কার্বণ ও ১২ ভাগ হাইড্রোজেন দিয়া গঠিত; অর্থাৎ কিনা, ১০০ সের টারপিন-তৈলে ৮৮ সের কার্বণ ও ১২ সের হাইড্রোজেন থাকে। নেবুর তৈল, কমলানেবুর তৈল, কাবাবচিনির তৈলও ৮৮ ভাগ কার্বণ ও ১২ ভাগ হাইড্রোজেন দিয়া গঠিত। তবে টারপিন-তৈলের একপ্রকার স্বাদ-গন্ধ, নেবুর তৈলের অন্যপ্রকার স্বাদ-গন্ধ হয় কেন? জগতের এ রহস্য বুঝা ভার! রাসায়নিক শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তুতে মোটের উপর কার্বণ ও হাইড্রোজেনের ভাগ সমান থাকিলেও তাহাদের প্রতি অণুতে কার্বণের ও হাইড্রোজেনের ভাগ সমান থাকে না। যথা,—মৌরির তৈল ও লবঙ্গের তৈল মোটের উপর সমানভাবে কার্বণ ও হাইড্রোজেন দিয়া গঠিত, কিন্তু ঐ দুই পদার্থের এক একটী অণু সমানভাবে গঠিত নয়। মৌরির তৈলের এক একটী অণু দশটী কার্বণের পরমাণু ও ষোলটী হাইড্রোজেনের পরমাণু দিয়া গঠিত; লবঙ্গ-তৈলের এক একটী অণু ১৫টী কার্বণের পরমাণু ও ২৪টী হাইড্রোজেনের পরমাণু দিয়া গঠিত। এ নিমিত্ত মৌরির তৈল একটী পদার্থ ও লবঙ্গ-তৈল আর একটী পদার্থ। এই নিমিত্ত মৌরির তৈলের একপ্রকার রূপ, রস ও গন্ধ; লবঙ্গ-তৈলের অন্যপ্রকার রূপ, রস ও গন্ধ। পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ইউরোপীয় জাতিরা সকল বিষয়ের কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও অনুধাবনা করিয়া দেখিয়াছেন। এই অনুসন্ধানের বলেই তাঁহারা আলকাতরা হইতে নানারূপ মনোহর রং প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অনুসন্ধানের বলেই নানারূপ বস্তু প্রস্তুত হইয়া ভারতে আসিয়া ভারতের ধন লুণ্ঠিত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। হাবা-গোবার মত আমরা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছি! ছি!!

হাইড্রোজেন ও কার্বণ ব্যতীত কতকগুলি সুগন্ধযুক্ত তৈলে অক্সিজেন

বর্তমান থাকে। তিক্ত-বাদাম ও দালচিনির তৈল এই জাতীয়। বাদাম পিশিয়া যে তৈল বাহির হয়, সে এ তৈল নহে। পেশা বাদাম হইতে "স্থির" তৈল হয়; অর্থাৎ কিনা, সরিষা, নারিকেল প্রভৃতি তৈলের মত তাহা উবিয়া যায় না। তিক্ত-বাদামের তৈল—ভোলেটাইল, অর্থাৎ কিনা, তাহা উবিয়া যায়, আর তাহাতে এক প্রকার সুগন্ধ থাকে। উদ্ভিদ্-শাস্ত্রে বাদামগাছের নাম প্রুণস আমিগ্ডেলস (Prunus Amygdalus) এই গাছের একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে, তাহাকে অমর (amara) বলে। এই সম্প্রদায় গাছের ফলে তিক্ত-বাদামের উৎপত্তি হয়। তিক্ত বাদামকে ইংরেজীতে বিটার আমণ্ড (Bitter Almond) বলে।

দালচিনির তৈলের শতভাগে ৮২ ভাগ কার্বণ, ৬ ভাগ হাইড্রোজেন ও ১২ ভাগ অক্সিজেন থাকে। তিক্ত-বাদামের তৈলে কার্বণ ৭১ ভাগ, হাইড্রোজেন ১৪ ও অক্সিজেন ১৫ ভাগ থাকে। তিক্ত-বাদামের তৈলে একপ্রকার ভয়ানক বিষ থাকে; তাহাকে "প্রসিক" বা "হাইড্রোসিয়ানিক আসিড" বলে। অল্পদিন হইল ভলক্রমে এই বিষ খাইয়া এই কলিকাতা নগরে একটী কৃতিবিদ্য অল্পবয়স্ক ডাক্তার মারা পড়িয়াছেন। সে নিমিত্ত তিক্ত-বাদামের তৈল হইতে এই বিষ দূর করিয়া তবে লোকে বাজারে বিক্রয় করে।

সুগন্ধ তৈল, তাহা হইলে, কার্বণ ও হাইড্রোজেন দিয়া নির্মিত। কতকগুলিতে একটু আধটু অক্সিজেনও থাকে। জগতে এ তিনটী দ্রব্যের অপ্রতুল নাই। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন রহিয়াছে; জলে হাইড্রোজেন ও গাছে কার্বণ যত চাও, তত আছে। তবে এই সব দ্রব্য হইতে একটু কার্বণ, একটু হাইড্রোজেন ও একটু অক্সিজেন লইয়া নানাবিধ সুগন্ধ প্রস্তুত করিলেই ত হয়? চাষ করিয়া লক্ষ লক্ষ ফুল লইয়া, চোয়াইয়া, সূক্ষ্ম পালকের আগায় অতি সন্তর্পণে অণু পরিমাণে গোলাপের আতর আহরণ করিবার আর আবশ্যক কি? বড় কঠিন কথা। তবে "মানুষের অসাধ্য কাজ নাই" এই ভাবিয়া মানুষ নিতান্ত হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। চেষ্টার ত্রুটি নাই। আমাদের ঘি—যাহাতে ঠাকুরদের লুচি ভাজা হয়—তাহাও কার্বণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়া গঠিত। আবার চর্বিও সেই সব পদার্থ দিয়া নির্মিত। সুতরাং চর্বি হইতে ঘৃত প্রস্তুত করার চেষ্টাটী নিতান্ত বিফল হয় নাই। সেইরূপ কোনও কোনও প্রকার সুগন্ধযুক্ত দ্রব্যের অনুকরণ করা কার্য্যটীও বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে। এই আলকাতরা হইতে যে "মেজেণ্টা" প্রভৃতি নানা রং হইতেছে, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহা হইতে আমাদের চিনির চেয়ে ২৫০ গুণ মিষ্ট চিনি হইতেছে। আবার ইহা হইতে গন্ধ-দ্রব্যও প্রস্তুত হইতেছে। এই আলকাতরা লইয়া সাহেবেরা যে আরও কত কি করিবেন, তাহাই চিন্তার বিষয়। চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র না গড়িয়া বসেন! আজকাল আলকাতরা হইতে তিক্ত-বাদামের তৈল বাহির হইতেছে। গ্যাসের প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় গ্যাস-ঘরে আলকাতরা জমা হইয়া যায়। এই আলকাতরা চোয়াইলে "ন্যাফথা" বলিয়া একটী তরল-দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। ন্যাফথা অনেকগুলি অপর বস্তুর সমষ্টি, তাহার মধ্যে একটীর নাম বেনজল। বেনজলের সহিত সোরার দ্রাবক বা নাইট্রিক আসিড মিশাইলে দুইটীতে মিলিয়া যে বস্তু হয়, তাহার গন্ধ ও আকার তিক্ত-বাদামের মত। কৃত্রিম তিক্ত-বাদামের তৈল বলিয়া ইহা বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। সাবান সুগন্ধযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইহার ব্যবহার অধিক। কৃত্রিম তিক্ত-বাদামের তৈল অন্য উপায়েও হইতে পারে। ঘোড়ার ও গরুর মূত্রে একপ্রকার অম্ল পদার্থ আছে, যাহাকে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা "হিপুরিক আসিড" বলেন। এই হিপুরিক আসিড গোমূত্র হইতে অনায়াসেই পৃথক করিতে পারা যায়। ইহার সহিত বালি ও দস্তার

কেলারাইড মিশাইয়া গরম করিলে প্রথম কার্বণিক অম্ল বাহির হইয়া যায়। তাহার পর ইহা হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ বাহির হইতে থাকে। এই তরল পদার্থের নাম হইয়াছে "বেনজনাইট্রিল"। ইহার গন্ধ তিক্ত-বাদামের তৈলের মত।

অনেক প্রকার সুগন্ধ তৈল আছে, যাহা তরল নহে,—কঠিন। এ সমুদয়ে অক্সিজেন বর্তমান থাকে। কর্পূর ইহার একটী দৃষ্টান্ত। অক্সিজেন অধিক পরিমাণে থাকিলে আরও কঠিন হয়। শালগাছের আঠা বা ধুনা তাহার দৃষ্টান্ত। কর্পূর-বৃক্ষের সকল ভাগই সুগন্ধময়। ইহার ডাল কুচি কুচি করিয়া লোকে জলে সিদ্ধ করে, কর্পূর উপরে ভাসিয়া উঠে, তাহার পর জল শীতল হইলে জমিয়া যায়। কর্পূরগাছে গর্ত করিয়া দিলেও তাহাতে তরল তৈল জমা হয়, তাহার পর সেই তৈল জমিয়া শুষ্ক কর্পূর হয়। যাহা হইতে সুগন্ধ তৈল বাহির হইয়া থাকে, ঈদৃশ অনেক প্রকার ঘাস আমাদের দেশে আছে, যথা; খস্‌খস্, রুষা ইত্যাদি।

পূর্বে বলিয়াছি যে, উদ্ভিদ্-শরীরের দুই প্রকার পদার্থ হইতে সুগন্ধের উৎপত্তি হইয়া থাকে;—প্রথম ভোলেটাইল তৈল, দ্বিতীয় বীর্য্য বা ইষ্টার। এতক্ষণ তৈলের কথা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে ইষ্টারের কথা বলিব। ইষ্টার নানারূপ আছে ও নানা কাজে লাগে। বিশুদ্ধ সুরা বা স্পিরিট লইয়া তাহার সহিত গন্ধকের দ্রাবক মিশাইয়া চোয়াইলে, সুরার ইষ্টার প্রস্তুত হয়। স্পিরিট, গন্ধকের দ্রাবক ও সোরা এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া চোয়াইলে ডাক্তারখানার নাইট্রিক ইষ্টার প্রস্তুত হয়। লৌহপাত্রে শুষ্ক কাষ্ঠ চোয়াইলে, জল, আলকাতরা, সিরিকা বা ভিনিগার ও একপ্রকার অপেয় সুরা বাহির হয়। কাঠের স্পিরিট ভাল স্পিরিটের সহিত মিশাইলে "মেথিলেটেড স্পিরিট" হয়। খাবার নিমিত্ত নয়,—নানা কাজের নিমিত্ত, শস্তাদরে ইহা বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাঠের স্পিরিটের সহিত গন্ধকের দ্রাবক দিয়া চোয়াইলে কাঠের ইষ্টারের উৎপত্তি হয়। আলু হইতে ব্যাণ্ডি প্রস্তুত করিবার সময়, আলুর ইষ্টার বাহির হইয়া পড়ে। নানারূপ সুগন্ধ-যুক্ত ফুল-ফল চোয়াইয়া আমেরিকা ও ফরাসীদেশের লোকেরা অনেক প্রকার ইষ্টার প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া পরিত্যক্ত জঞ্জাল প্রভৃতি হইতেও রাসায়নিক-বিদ্যা-প্রভাবে নানারূপ ইষ্টার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফুল হইতেই হউক আর জঞ্জাল হইতেই হউক, খাঁটি ইষ্টার এক-এক শুঁকিতে ভাল নয়। তিন-চারিটী ইষ্টার মিশাইয়া একটী সুগন্ধের সৃষ্টি করিতে হয়। আজকাল কলিকাতার বাজারে মনোহর সৌরভপূর্ণ "কাশ্মীর-বোকে" বিক্রীত হইতেছে। ইহা একটী দ্রব্য নয়, তিন-চারিটী দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কনসার্টে যেরূপ সকল বাজনাগুলির শব্দ একত্রে মিশ্রিত হইয়া সুশ্রাব্য স্বরের উৎপাদন করে, গন্ধদ্রব্যগুলিও সেইরূপ একত্রে মিশ্রিত হইয়া সুমিষ্ট সুঘ্রাণে পরিণত হয়। তাম্বরা-ওয়ালা যে এ কাণটায় মোচড় দিয়া সে কাণটায় মোচড় দিয়া, একঘণ্টা ধরিয়া ঘ্যাং ঘ্যাং করিয়া, লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে, তাহার কারণ এই যে, কোথাও একটু উচ্চ-নীচতা হইলেই সব মাটী হইয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত গন্ধী "ইউজেনি রিমেল" আমার একজন ভক্ত ছিলেন। গন্ধ-মিশ্রণ কি করিয়া করিতে হয়, তাঁহাকে আমি শিখাইতে বলিলাম। আমি বলিলাম,—"আমাদের দেশে নানারূপ ফুল আছে; কি করিয়া সুমিষ্ট সুস্নিগ্ধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, আমাকে শিখাইয়া দাও।" তিনি বলিলেন "এ বিষয় কাহাকেও শিখাইবার যো নাই। তাল-বোধের নিমিত্ত যেরূপ কাণ চাই, গন্ধ-বোধের নিমিত্ত সেইরূপ নাক চাই।" রন্ধনও সেইরূপ। মন্দ-রাঁধুনীকে ভাল-রাঁধুনি করা বড়ই কঠিন কথা। রন্ধনের মশলাতেও তাল আছে; লবণের একটু উচ্চ-নীচতা হইলে স্বাদের বড়ই তারতম্য হইয়া থাকে। কথা এই, সমুদয়

জগৎ সামঞ্জস্যভাবে তালে তালে চলিতেছে। কোথাও একটু বে-সুর হইলেই চারিদিকে বিভ্রাট উপস্থিত হয়। কি একখানি ফারসি পুস্তকে একবার পড়িয়াছিলাম যে, "জগতের একটী প্রাণীর অনিষ্ট করিলে, সমুদয় প্রাণীর অনিষ্ট হয়; যেমন শরীরের এক অঙ্গকে ব্যথিত করিলে সমুদয় অঙ্গ ব্যথিত হয়।"

জান্তব সুগন্ধ অতি চিরস্থায়ী। ইহার মধ্যে মৃগনাভিই সর্বোৎকৃষ্ট।

কস্তুরী-মৃগ হিমালয়, চীন, তিব্বত প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশে বাস করে। তুষারাবৃত হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু জীবন্ত কস্তুরী-হরিণ দর্শন কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। একবার কেবল এই জাতীয় হরিণের একটী ছানা দেখিয়াছিলাম। একজন সাহেব তাহা পুষিয়াছিলেন। বেশ পোষ মানিয়াছিল। প্রতিদিন সকাল-বেলা জঙ্গলে চরিতে যাইত, সন্ধ্যাবেলা বাটী ফিরিয়া আসিত। একদিন ছানাটী মরিয়া গেল। চাকরেরা অনুমান করিল যে, জঙ্গলে কি বিষগাছ খাইয়াছিল। মৃগনাভি পুরুষ-হরিণের হয়, হরিণীর হয় না। হিমালয়ের উপরি-প্রদেশে এ হরিণ শীকার করা বড় বিপদের কথা। প্রাণটী হাতে করিয়া ইহার অনুসরণ করিতে হয়; কারণ একটু পা খসিলেই একেবারে সহস্র সহস্র হাত নীচে গিয়া পড়িতে হয়। টাটকা অবস্থায় মৃগনাভির গন্ধ অতিশয় তীব্র। মৃগটী মারিয়া শীকারীরা মুখ ফিরাইয়া ইহাকে কাটিয়া লয়; তাহা না করিলে ইহার গন্ধে অজ্ঞান হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। পুরাতন হইলেও অনেকে ইহার গন্ধ একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। ইতালি-দেশের লোক মৃগনাভির গন্ধ কিছুমাত্র ভালবাসে না। মৃগনাভির গন্ধ অতি চিরস্থায়ী। রতিমাত্র বাক্সের কোণে পড়িয়া থাকিলে বহু কালাবধি সুগন্ধ বর্তমান থাকে। আটশত বৎসর পূর্বে মধ্য-এশিয়ায় একজন ধনবান্ মুসলমান একটী মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। চূণ-সুরকির সহিত তিনি মৃগনাভি মিশাইয়া দিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত সেই মস্‌জিদে প্রবেশ করিলেই লোকে মৃগনাভির গন্ধ পায়। কুম্ভীরের মাংসে সামান্যভাবে মৃগনাভির গন্ধ আছে। অনেক গাছেও মৃগনাভির গন্ধ বর্তমান থাকে। আমাদের দেশে কস্তুরীদানা বলিয়া একটী ছোট গাছ আছে, তাহার বীজে মৃগনাভির গন্ধ। সে নিমিত্ত এই বীজ মাথাঘষার মসলায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমেরিকার উপকূলের দ্বীপসমূহ হইতে এই বীজ বিলাতে আমদানি হইয়া থাকে। বিলাতে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ হাজার তোলা মৃগনাভি আমদানি হইয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ মৃগনাভি মিলা কঠিন।

খট্টাশ-বিড়ালের শরীরেও একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এই বিড়াল এসিয়া ও আফ্রিকায় বাস করে। ইহার দুই জাতি আছে। প্রাণি-তত্ত্বে ইহাদিগকে ভিভেরা বলে। (Viverra Zibetha ও V. Civetta) লোহিত সমুদ্রের ধারে এই বিড়াল লোকে পুষিয়া রাখে। এখানকার কৃষ্ণকায়, কাফ্রি-অঙ্গনাগণের গাত্র হইতে ঘামের সহিত একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়; খট্টাশের সুগন্ধ মাখিলে তাহা ঢাকিয়া যায়।

"আমবার গ্রীস" বলিয়া একপ্রকার জান্তব সুগন্ধযুক্ত পদার্থ আছে। ইহার বাঙ্গালা নাম আছে কিনা বলিতে পারি না। একপ্রকার পীড়া হইয়া তিমি-মৎস্যের উদরে ইহার উৎপত্তি হয়। এই পদার্থ সমুদ্রের জলে কখনও কখনও ভাসিতে থাকে; নাবিকেরা দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া লয়। ইহার গন্ধ অনেকাংশে মৃগনাভির মত।

এড়ী রেশম

১। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, আসাম প্রভৃতি স্থানে এড়ী রেশমের চাষ হয়। ইহার পোকা রেড়ী বা এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া জীবনধারণ করে। সেজন্য এ রেশমের নাম 'এড়ী' বা 'এণ্ডি' হইয়াছে।

২। এড়ী পোকার তিন-চারিটি জাতি আছে; সকলেই একপ্রকার নিকৃষ্ট রেশমের গুটি বা কোয়া প্রস্তুত করে। তুঁত পোকা ও তসরের গুটি হইতে যেরূপ সুতা বাহির হয়, ইহা হইতে সেরূপ সুতা বাহির করিতে পারা যায় না। তুলার মত ইহাকে পিঁজিয়া সুতা কাটিতে হয়। এই তুলা হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহা অনেক কাল যায়; শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায় না। সে নিমিত্ত এড়ী রেশমের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে। এক্ষণে কিন্তু এ কাপড় অধিক পাওয়া যায় না।

৩। সুতরাং এ রেশমের আরও অধিক চাষ হইলে দেশের উপকার হইবে। ইহার চাষ বোধহয় চারিদিকে অনায়াসেই হইতে পারে। কারণ,—(প্রথম) বীজের নিমিত্ত রেড়ীর চাষ এখন অনেক স্থানেই হয়; (দ্বিতীয়) গোরু বাছুরে রেড়ীর পাতা খায় না, সুতরাং যেখানে সেখানে এ গাছ জন্মিতে পারে; আর বেড়া দিয়া ইহাকে ঘিরিয়া রাখিতে হয় না; (তৃতীয়) অল্পদিন পাতা খাইয়াই এ পোকা গুটি প্রস্তুত করে; (চতুর্থ) এ পোকা প্রতিপালন করা কঠিন নহে।

৪। রেড়ীর গাছ হইতে লোকে এখন বীজ ভিন্ন আর কিছু পায় না। ইহার পাতা খাওয়াইয়া রেশম উৎপন্ন করিলে, লোকে তখন এক গাছ হইতে দুইটী ফসল পাইবে। রেড়ীর পাতা এখন কোনও কাজেই লাগে না। প্রতি গাছের গুটিকত পাতা ভাঙিগয়া লইলে গাছটীও মরিয়া যাইবে না, অথচ নূতন একটী উপার্জনের পথ হইবে। সুতরাং যেখানে এখন রেড়ীর চাষ হয়, সেইখানেই আবার ঘর ঘর এড়ী রেশমের চাষ হউক, এই আমার ইচ্ছা।

৫। আবার দেখ, ইতিপূর্বে গরিব লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা কাটনা কাটিয়া দিনান্তে এক পয়সা দু-পয়সা উপার্জন করিত। বিলাতি সুতা, বিলাতি কাপড়ের আমদানিতে সে উপার্জনের পথটী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই কৃষক-রমণীদিগকে এড়ী পোকা প্রতিপালন করিতে শিখাইলে, তাহাদের দু-পয়সা উপার্জন হইবে। অবসরক্রমে ইহারা আবার সুতা কাটিয়াও অনেকে প্রতিপালিত হইবে। এইরূপে আমাদের দেশের লোক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে। এড়ী রেশম বিদেশে প্রেরিত হইয়া বিদেশের টাকা এ দেশে আসিবে। দেশে এ কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়া বিলাতি কাপড়ের ব্যবহার কম হইয়া যাইবে, যে টাকা দিয়া এখন আমরা বিলাতি কাপড় ক্রয় করি, সে টাকা বিদেশে না গিয়া দেশেই রহিয়া যাইবে। এড়ী রেশমের ব্যবসাবাণিজ্যে অনেক ভদ্র সন্তানও প্রতি-পালিত হইবেন।

৬। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এড়ী রেশমের চাষ বৃদ্ধি করিতে "ভারতীয় শিল্প সমিতি" উৎসুক হইয়াছেন। এক্ষণে পরীক্ষার নিমিত্ত ভারতীয় শিল্প সমিতি বিনামূল্যে এড়ী রেশমের বীজ বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু এত লোকে বীজ চাহিতেছেন যে, চিরকাল বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করা সমিতির সাধ্য নাই। সে নিমিত্ত এখন হইতে যাঁহাদিগের বীজের আবশ্যক হইবে, তাঁহাদিগকে যৎসামান্য মূল্য দিতে হইবে। আট আনার বীজ আর আট আনার ডাকমাশুল প্রভৃতির খরচ, মোট এক টাকা, দিলেই যথেষ্ট হইবে।

৭। কি করিয়া এড়ী রেশমের চাষ করিতে হয়, এইবার সেই কথা বলিব।

কিন্তু এড়ী ও অপরাপর রেশমের কথা যাঁহারা ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রেশম-বিজ্ঞান" নামক পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

৮। রেশমের কীট মাকড়সার মত আপনার শরীরের ভিতর হইতে সূতা বাহির করে। ক্রমাগত পাক দিয়া সেই সূতা আপনার সর্বশরীরে জড়ায়। এইরূপে দিব্য একটী সূতার ঘর প্রস্তুত হয়। তাহাকেই কোয়া বা গুটি বলে। কীটটী এই কোয়ার ভিতর কিছুদিন নিদ্রা যায়। তাহার পর কোয়ার একদিক কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়। এই প্রজাপতি অণ্ড প্রসব করে। সেই ডিম ফুটিয়া পুনরায় পোকা জন্মে। সেই পোকা কিছুদিনের জন্য রেড়ীর পাতা খায়। তাহার পর পূর্বরূপ আপনার গায়ে সূতা জড়াইয়া কোয়া প্রস্তুত করে। মোটামুটি এই হইল রেশমের চাষ।

৯। চাষ করিতে হইলে প্রথম জীয়ন্ত কোয়ার আবশ্যক। অর্থাৎ কিনা যে কোয়ার ভিতর পোকা মরিয়া যায় নাই বা যাহার ভিতর হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া যায় নাই। এইরূপ কোয়া লইয়া একখানি ডালায় পাতলা পাতলা সাজাইয়া রাখিতে হয়। ডালায় না রাখিয়া একটী পাখীর খাঁচাতে সাজাইয়া রাখিলেও চলে। ঐ ডালা বা খাঁচাকে, রৌদ্র বা জল না লাগে এরূপ একটী পরিষ্কার স্থানে রাখিতে হইবে। ডালা বা খাঁচাতে কোয়া না রাখিয়া আর এক কাজ করিলেও চলে। একগাছি সূতা লইয়া কোয়াগুলিকে আস্তে আস্তে বাঁধিয়া ফুলের মালার মত গাঁথিয়া কোনও পরিষ্কার স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলেও চলে।

১০। ১৫ হইতে ৩০ দিনের ভিতর কোয়ার ভিতর হইতে প্রজাপতি বাহির হয়। প্রজাপত্নীরা, ডালা বা খাঁচা বা মালা, যেখানে বাহির হইবে সেইখানেই বসিয়া থাকিবে, উড়িয়া যাইবে না। প্রজাপতিরা কেহ কেহ উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহারা আবার ফিরিয়া আসিবে। প্রজাপতিরা কিছু খায় না, সুতরাং ইহাদিগকে কিছু খাইতে দিতে হয় না। একদিন কি দুইদিন পরে প্রজাপত্নীরা ডিম পাড়িবে। ডিম পাড়িবার নিমিত্ত ডাল বা খাঁচার উপর কাগজ কি কাপড় বিছাইয়া দিলে ভাল হয়। কোয়ার যদি মালা গাঁথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডিম এই মালার উপর পাড়ুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। ডিমগুলি দেখিতে পোস্তদানার মত। অনেকগুলি ডিম একসঙ্গে জোড়া থাকে। ইহাতে এক প্রকার আটা থাকে। সেই আটায় ডিমগুলি কাগজে বা কাপড়ে বা মালায় বা খাঁচা কি ডালার গায়ে জুড়িয়া যায়। ডিম পাড়া হইয়া যাইলে প্রজাপতিদিগের জীবনের কার্য্য সমাধা হইল। তাহারা দুই-চারি দিনে মরিয়া যায়। সেজন্য ডিম পাড়া হইয়া যাইলে প্রজাপতিদিগকে ফেলিয়া দিবে।

১১। ডিমগুলি কাগজে কি কাপড়ে কি মালায় কি ডালা বা খাঁচার গায়ে জুড়িয়া থাকে। নখ দিয়া খুঁটিয়া লইতে হয়। তাহার পর ডিমগুলিকে একখানি ডালায় পাতলা করিয়া বিছাইয়া রাখিতে হয়। এমন স্থানে এই ডালাখানি রাখিবে, যেন পিপীলিকা, কি মাকড়সা কি ইঁদুরে না খাইতে পারে। ১০।১৫ দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয়। একদিনেই সব ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয় না। সমুদয় ডিম ফুটিতে তিন চারিদিন লাগে।

১২। ডিম ফুটিবার পূর্বে কতকগুলি ডালা ঠিক করিয়া রাখিবে। সারি সারি স্তরে স্তরে তিন-চারি থাক ডালা সাজাইয়া রাখিবার জন্য একটী বাঁশের মাচান প্রস্তুত করিবে। ডিম ফুটিবার সময় মাচানের বাঁশের খুঁটিতে কোনওরূপ আটা লাগাইয়া দিবে, যেন খুঁটির গা দিয়া পিপীলিকা উঠিয়া পোকাদিগের অনিষ্ট না করিতে পারে। একটু সরিষার তৈলের সহিত ধুনা গলাইয়া লইলে অনায়াসেই

এইরূপ আটা প্রস্তুত হয়। দুই চারি ফোঁটা আকদের আটা ইহার সহিত মিশাইয়া দিলে আরও ভাল হয়। খুঁটির গায়ে একটু টাটকা আলকাতরা অথবা রেড়ীর তেল লাগাইয়া দিলেও চলে।

১৩। যেদিন ডিম ফুটিতে আরম্ভ হইবে, সেইদিন বেলা একটার সময় কতকগুলি কচি কচি আস্ত রেড়ীর পাতা ইহার উপর রাখিয়া দিবে। এই পাতার উপর উঠিয়া পোকা সব পাতা খাইতে আরম্ভ করিবে। বেলা পাঁচটার সময় ডাঁটা ধরিয়া এক একটী পাতা আস্তে আস্তে তুলিবে। পাতার তলায় যদি অফুটন্ত ডিম লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ডিমগুলি পুনরায় ডিমের ডালায় ঝাড়িয়া ফেলিবে। তাহার পর পোকাসহ পাতাগুলি অপর ডালায় রাখিবে। এই পোকার ডালা মাচানের সর্বের নীচের শ্রেণীতে রাখিবে। ইহারা হইল প্রথম দিনের পোকা। ডালায় রাখিয়া পোকাগুলিকে এখন (অর্থাৎ বেলা পাঁচটার সময়) রেড়ীর পাতা কুচি কুচি করিয়া খাইতে দিবে। পোকাদিগকে চারি-পাঁচদিন কাটা পাতা খাইতে দিতে হয়। তাহার পর বড় হইয়া ইহারা আস্ত পাতা খাইতে পারে। প্রথমদিন পোকাদিগকে আবার রাত্রি নয়টার সময় খাইতে দিবে। এক ডালায় যেন অনেক পোকা না হইয়া যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে।

১৪। দ্বিতীয় দিন দিবা একটার সময় পুনরায় কতকগুলি আস্ত রেড়ীর পাতা ডিমের ডালায় রাখিয়া দিবে। আজিকার পোকাও সেইরূপ পাতার উপর উঠিবে ও পাঁচটার সময় তাহাদিগকে অন্য ডালায় লইয়া মাচানের দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখিয়া দিবে। এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে যে সমুদয় ডিম ফুটিয়া পোকা হইবে তাহাদিগকে মাচানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বাঁশের উপর রাখিবে। চারি দিন পরে আর বোধহয় ডিম ফুটিবে না, সুতরাং অবশিষ্ট ডিমগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে।

১৫। প্রথম দিনের পোকা চতুর্থ দিনের পোকা অপেক্ষা চারিদিনের বড়, সে নিমিত্ত অল্পাধিক আহার দিয়া চারি দিনের পোকাকে সমানভাবে আনিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত আকারে ইহা সমান হইয়া না উঠে, সে পর্য্যন্ত আগের পোকাদিগকে অল্প খাইতে দিতে হইবে ও শেষের পোকাদিগকে অধিক খাইতে দিতে হইবে। দুই-চারিদিন প্রথম দিনের পোকাদিগকে দিবসে তিনবার, দ্বিতীয় দিনের পোকা-দিগকে চারিবার ও তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসের পোকাদিগকে পাঁচবার খাইতে দিবে। দুই-চারিদিনের জন্য আহারের এইরূপ ন্যূনাধিক করিলে শেষের পোকারা বাড়িয়া প্রথম পোকাদিগের মত হইয়া যাইবে।

১৬। কয়দিনের পোকা এক প্রকার হইলে তখন সকলকেই একসঙ্গে দিনে পাঁচবার করিয়া খাইতে দিবে, যথা প্রাতঃকালে ৫টার সময়, ৯টার সময়, মধ্যাহ্ন একটার সময়, অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ও রাত্রি ৯টার সময়। পোকা যখন ছোট থাকিবে, তখন পাতা কুচি কুচি করিয়া খাইতে দিবে। পোকা বড় হইলে, আস্ত পাতা খাইতে দিবে।

১৭। এড়ি পোকা চারিবার খোলশ ছাড়িয়া থাকে। চারি পাঁচদিন অন্তর দেখিতে পাইবে যে, পোকা সব চুপ করিয়া রহিয়াছে। তখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের খোলশ ছাড়িবার সময় হইয়াছে। এ সময়ে পোকারা পাতা খায় না। সুতরাং এখন তাহাদের উপর পাতা দিবে না, তাহা হইলে পোকাদিগের অনিষ্ট হইবে। সুতরাং খোলশ ছাড়িবার নিমিত্ত এড়ী পোকাদিগকে চারিদিন উপবাস করিতে হয়।

১৮। ডালা হইতে পুরাতন পাতা ও মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। ডালায় আস্ত পাতা দিলে পোকারা যখন সেই পাতার উপর উঠিবে, তখন পাতার

ডাঁটা ধরিয়া পোকাদিগকে অন্য ডালায় রাখিয়া পুরাতন ডালা অনায়াসেই পরিষ্কার করিতে পারা যায়। পোকারা যে কয়দিন কাটা-পাতা খায়, তখন একদিন অন্তর একবার আস্ত পাতা দিয়া পোকাদিগকে অন্য ডালায় রাখিবে। ডালা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত আর একটী উপায় আছে। একটুখানি পুঁটিমাছ ধরা জাল পোকাদিগের উপর রাখিয়া সেই জালের উপর পাতা দিতে হয়। জালের ছিদ্র দিয়া পোকারা পাতার নিকট গিয়া উঠিবে। তখন সেই জালসহ পোকা অন্য ডালায় নাড়িয়া পুরাতন ডালা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

১৯। এইরূপে পোকাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে রেশম-পোকার সমুদয় কাজ শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যায়; শীতকালে বিলম্ব হয়। গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন পাতা খাইয়াই পোকারা কোয়া প্রস্তুত করে, শীতকালে প্রায় একমাস লাগে।

২০। এড়ী পোকাদিগের কখন কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় হইয়াছে, তাহাদিগের আকার দেখিয়া এ কথা বলা কঠিন। কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় ইহারা আহার করে না। কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় ইহাদিগের বর্ণ সবুজ হয়। কিন্তু সবুজ বর্ণ হইবার পরেও ইহারা দুই একদিন আহার করে। কোয়া প্রস্তুতের সময় ইহাদের দেহ কিছু ছোট হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা ঠিক চিহ্ন বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় পোকারা এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু অন্য সময়ে ক্ষুধা পাইলেও তাহারা এইরূপ করিয়া বেড়ায়। তবেই হইল, এড়ী কীটের কোয়া প্রস্তুতের সময় কখন্ হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিবার যো নাই। সে নিমিত্ত তুঁত পোকার পাকা কীটগুলিকে বাচিয়া বাচিয়া যেরূপ কোয়া বুনিবার বাঁশের জাফ্রিতে রাখা যাইতে পারে, এড়ী পোকার তাহা হয় না।

২১। এড়ী পোকার জন্য অন্য উপায় করিয়া দিতে হয়। শুষ্ক কাটি-কুটি অথবা বাঁশের কঞ্চি মাচানের এখানে ওখানে বাঁধিয়া দিলে, সেগুলিকে ধরিয়া কোয়া বাঁধিতে এড়ী পোকাদিগের সুবিধা হয়। ডালার উপর কঞ্চি প্রভৃতি ফেলিয়া দিলেও চলে।

২২। কোয়া বাঁধা হইয়া যাইলে, যদি ভিজা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহাদিগকে রৌদ্রে দিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু অধিককালের নিমিত্ত রৌদ্রে দিবে না, তাহা হইলে ভিতরের পোকা মরিয়া যাইবে। অন্যান্য রেশমের পোকা মারিয়া তবে কোয়া হইতে সুতা বাহির করিতে হয়। কিন্তু এড়ী রেশমের তাহা নহে। এড়ী রেশমের সুতা বাহির করিতে পারা যায় না, ইহা পিঁজিয়া সুতা করিতে হয়। সুতরাং এ কোয়া হইতে প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইলে ক্ষতি নাই। এই প্রজাপতি পুনরায় পূর্ব্ববৎ ডিম্ব প্রসব করিবে। সেই ডিম্ব হইতে পোকা হইবে, আবার সেই পোকাকে প্রতিপালন করিলে তাহারা আবার কোয়া বাঁধিবে।

২৩। কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া যাইলে সেই কোয়া বিক্রয় করিতে পারা যায়। অথবা পিঁজিয়া তাহা হইতে সুতা কাটিয়া কাপড় করিতে পারা যায়।

২৪। জীয়ন্ত কোয়া লইয়া আসামের স্ত্রীলোকেরা একটী বাঁশের ঝোড়ার ভিতরে রাখিয়া দেয়। প্রজাপতি বাহির হইলে, প্রজাপত্নীদিগকে ধরিয়া একহাত লম্বা নল বা কঞ্চি বা ঘাসের ডাঁটায় বাঁধিয়া রাখে। কাঁধের নিকট একদিকের পালক বাঁধিয়া দিলেই চলে। একটী নলে আটটী দশটী প্রজাপত্নী বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এই অবস্থায় প্রজাপতিদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর এই নলের

গায়েই প্রজাপতীরা ডিম পাড়ে। সেই ডিম নেকড়ার ভিতরে রাখিয়া কোন স্থানে তাহারা ঝুলাইয়া রাখে। ডিম ফুটিলে কচি রেড়ীর পাতা হাতে রগড়াইয়া আরও নরম করিয়া শিশু পোকাদিগকে খাইতে দেয়। পাতা কাটিয়া খাইতে দেয় না। ফল কথা এড়ী পোকার চাষে কোনও গোলযোগ নাই। কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইল, ডিম পাড়িল, ডিম ফুটিল, পোকা বাহির হইল। পোকাগুলিকে ডালায় রাখিয়া, দিনের মধ্যে চারি পাঁচবার তাহার উপর গুটিকত রেড়ী পাতা ফেলিয়া দিলে, মাঝে মাঝে ডালাগুলিকে পরিষ্কার করিলে—বশ। এই হইল এড়ী পোকার চাষ। গোলযোগের মধ্যে এই যে, পোকাদিগের শরীর আছে, আর শরীর থাকিলেই ব্যাধি আছেন। একবার মড়ক পড়িল তো সব পোকাগুলি মরিয়া গেল। যাই হউক, এড়ী রেশমের অনেক গুণ। ইহার একবার একখানি চাদর করিলে তো আজন্ম কাটিয়া গেল। একবার একটি চাপকান করিলে তো ২৫ বৎসরের দায় নিশ্চিন্ত। পূর্বে বলিয়াছি যে, এড়ী কোয়া হইতে রেশম বাহির করিতে পারা যায় না, ইহাকে পিঁজিয়া সুতা কাটিতে হয়। কিন্তু শুনিয়াছি যে, ইতালি দেশে কেহ কেহ ইহা হইতে রেশম বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা যদি হয় তো এ রেশমের চাষ করিলে আরও অধিক লাভ হইবে।

২৫। এড়ী কোয়া কি করিয়া কাটিয়া সুতা করিতে হয়, আপাততঃ সে কথা বলিবার আমার ইচ্ছা নাই। তবে নিত্যগোপাল বাবুর "রেশম-বিজ্ঞানের" প্রুফ হইতে পশ্চাৎ লিখিত সামান্য বিবরণটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এণ্ডি কোয়া কাটাই। এণ্ডির লাট, কোয়া রেশমের লাট কোয়ার ন্যায় সহজে কাটাই করা যায় না। উহাকে ক্ষার মিশ্রিত জলের সহিত ২।৩ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া এবং ভাল করিয়া ধৌত ও শুষ্ক করিয়া লইয়া পরে রেশমের লাটের ন্যায় সহজে কাটাই করা যাইতে পারে। যে ক্ষারের কথা বলা হইল, ঐ ক্ষার কদলীপত্র অথবা যে সে বৃক্ষের নব পল্লব শুকাইয়া অগ্নিতে জ্বালাইয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই ক্ষার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কোয়াগুলি ঐ জলে চটকাইতে হয়। পরে এক খণ্ড প্রস্তরের সহিত একখানি কাপড়ে আল্গা করিয়া ঐ কোয়ার তালটী বাঁধিয়া উহা একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিতে হয়। হাঁড়িটী জলপূর্ণ করিয়া উহার উপর একটী সরা ঢাকা দিয়া ২।৩ ঘণ্টাকাল হাঁড়ি অগ্নির উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। মধ্যে মধ্যে হাঁড়িতে জল ভরিয়া দিতে হইবে। পরে হাঁড়িটী অগ্নি হইতে নামাইয়া উহার উষ্ণতা কিছু কমিলে, উহার মধ্য হইতে পুঁট্‌লিটী বাহির করিয়া কোয়াগুলি হাত দ্বারা বলপূর্বক চটকাইতে হয়। এইরূপ চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে পরিষ্কার জলদ্বারা উহা ধৌত করিতে হয়। ধুইতে ধুইতে কোয়াগুলি পরিষ্কার হইয়া আসিবে। পরিষ্কার জল কোয়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ময়লা হইয়া বাহির হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোয়াগুলি ধৌত করিতে হইবে। পরে অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিয়া ঐগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া বস্তাবন্দি করিয়া রাখিয়া অবসরমত জলে ভিজাইয়া উহা হইতে টেকো অথবা চরকার সাহায্যে সুতা বাহির করিয়া লইতে হয়। রেশমের লাট কোয়া কাটাই করিয়া যে পরিমাণ লাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, এণ্ডি কাটাই করিয়া ঐ পরিমাণেই লাভ হওয়া সম্ভব। এণ্ডির সূত্র মটকার সূত্র অপেক্ষাও মজবুত। এ কারণ ইহার দাম সের-করা ৭।৮ টাকা; কিন্তু ঐ সূত্র বাহির করিতে জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি লাগে বলিয়া ইহাতে খরচ অধিক পড়ে। তসর-কোয়ার লাট এণ্ডি-কোয়া অপেক্ষা কিছু সহজে কাটাই করা যায়। কিন্তু ইহাকেও কিছুক্ষণ ক্ষার মিশ্রিত জলদ্বারা সিদ্ধ না করিলে ইহা হইতে সহজে সূত্র বাহির করা যায় না।"

নূতন কথা

॥ এক ॥

আমাদের বনে-জঙ্গলে বেড়েলা বলিয়া একটী গাছ হয়। লোকে উহাকে বালাও বলে। রাজশাহী অঞ্চলে ইহার নাম বরিয়ার।

বেড়েলাকে ইংরেজিতে সাইডা (Sida) বলে। সাইডা এক প্রকার গাছ নয়, অনেক প্রকার। যে সব গাছগুলি ঠিক বেড়েলার মত, উদ্ভিদ্-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে সাইডা শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর পাতার ইতরবিশেষ দেখিয়া এক একটী গাছকে এক একটী বিশেষ নাম দিয়াছেন, যথা,—সাইডা কারপিনিফোলিয়া, সাইডা রমবিফোলিয়া ইত্যাদি। জবা, স্থলপদ্ম, ঢেড়শ, সাইডা, ইহারা সব এক জাতীয় উদ্ভিদ্। এই জাতিকে উদ্ভিদ্-শাস্ত্রে মালভ্যাসি (Malvaceae) বলে। ম্যালভ্যাসি জাতীয় উদ্ভিদের ছালে পাট প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

বেড়েলা ছালেও পাট বা আঁশ হয়। কিন্তু শণ ও প্রকৃত পাটের গাছ হইতে আঁশ বাহির করা যেরূপ সহজ, বেড়েলার গাছ হইতে আঁশ বাহির করা সেরূপ সহজ নয়। সেইজন্য এদেশের লোকে কখনও ইহা হইতে আঁশ বাহির করে নাই। এতদিন গাছের আঁশ হইতে কেবল দড়ি-দড়া, চট ও গুণ প্রস্তুত হইত, সুতরাং শণ ও পাটের আঁশ হইতেই সমুদয় কাজ চলিত। জাহাজ প্রভৃতির জন্য দড়ি-দড়ার এখন অধিক আবশ্যক হইয়াছে। বিদেশীয় আমদানি-রপ্তানির জন্য চট গুণেরও অধিক প্রয়োজন হইয়াছে। তাছাড়া কলের সহায়তায় আজকাল গাছের আঁশ হইতে সতরঞ্জি, গালিচা, উত্তম উত্তম কাপড় ও কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। মোটা আঁশে দড়ি-দাড়া হয়, সরু আঁশে কাপড় হয়, নিতান্ত অকর্মণ্য আঁশ লইয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। নারিকেলের ছোবড়ায় উত্তম দড়ি-দড়া হয়। দক্ষিণ দেশে কালিকট নামক নগরে নারিকেলের ছোবড়ার কারখানা আমি দেখিয়াছি। সেস্থানে ছোবড়া হইতে সাহেবেরা এরূপ সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতেছেন যে, দেখিলে চমৎকার বোধ হয়।

ফিলিপাইন দ্বীপে একপ্রকার কলাগাছ আছে। সেই কলাগাছের বালদো হইতে সেখানে লোকে পাট প্রস্তুত করে। সেই কলার আঁশে যেরূপ বলশালী রশি প্রস্তুত হয়, এমন আর কোনও দ্রব্যে হয় কিনা সন্দেহ। কলা হইতে এদেশেও আঁশ বাহির করিতে পারা যায়, কিন্তু অতি ক্ষীণ ও ভঙ্গপ্রবণ। বিশেষ তাহাতে কোনও কাজ হয় না। সখ করিয়া ঢাকার তাঁতিরা তাহা হইতে দুই-একবার কাপড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সখের জিনিস। ব্যবহারোপযোগী নয়, অর্থ-লাভেরও উপায় নয়। আমার এই বোধ হয় যে, এদেশের কলার আঁশে কাগজ ভিন্ন আর অন্য কোনও বস্তু প্রস্তুত করিতে যাইলে তাহাতে লাভ হইবে না। কলার বালদো কাটিয়া, আকমাড়া কল দিয়া তাহার জল বাহির করিয়া, তাহাকে শুকাইয়া, কাগজের কলে বেচিলে লাভ হইতে পারে। কিন্তু দুই একমণ কলার আঁশ কাগজের কলে আনিলে কেহ ফিরিয়াও চাহিয়া দেখিবে না। শত শত ভীমের বলে যে সমুদয় কল পরিচালিত হয়, সে কলে কোনও দ্রব্যের দুই এক মণে কি হইবে? তাহা লইয়াও কোনও কাজ হয় না। সে নিমিত্ত সকলের এই কথাটী সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, কোনও একটী নূতন বিষয় প্রচলন করিতে হইলে, কোনও একটী নূতন বিষয় হইতে অর্থলাভের কল্পনা করিলে, প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, সে জিনিসটী অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় কি না যায়। তাহা না হইলে সে দ্রব্যের প্রতি কেহ ফিরিয়াও চাহিবে না। আমাদের দেশে পার্বত্য প্রদেশে যে বন্য কলাগাছ হয়,

কাগজের নিমিত্ত তাহা হইতে আঁশ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হইতে পারে. কিন্তু প্রথম নমুনা আনিয়া কলওয়ালাদিগকে দেখাইতে হয়। কলওয়ালারা তাহার নিমিত্ত কি মূল্যে দিবেন, তাহা ঠিক্ করিতে হয়। সে মূল্যে লাভ হইতে পারে কিনা, একথা বুঝিয়া তবে সে কার্য্যে হাত দিতে হয়। আমাদের দেশে সচরাচর যে কলা দেখিতে পাই, উদ্ভিদ্-শাস্ত্রে তাহাকে মুসা স্যাপিয়েণ্টম (Musa Sapientum) বলে। ফিলিপাইন দ্বীপের যে কলাগাছে রশারশি হয় তাহাকে মুসা ফিলিপিনেনসিস (Musa Phillipinensis) বলে। এদেশে এই কলার চাষ করিবার নিমিত্ত অনেকবার যত্ন হইয়াছিল। গাছ হয়, কিন্তু সেরূপ কাজ হয় না। মাদ্রাজে একবার দেখিয়াছিলাম, একজন এই কলার কতকগুলি আঁশ হাতে করিয়া বিক্রয় করিবার নিমিত্ত রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহার সেই আঁশগুলি ক্রয় করিয়া লইলাম। সে বলিল, মালীরা ইহা দিয়া ফুলের মালা গাঁথিয়া থাকে।

অনেক স্থানে আনারসের মত যে বড় বড় গাছ হয়, তাহার পাতার আঁশেও উত্তম রশি প্রস্তুত হয়। বাঙ্গলায় ইহাকে বন-আনারস, মুরগা বা কোঁয়া বলে। উদ্ভিদ-শাস্ত্রে ইহার নাম আগাভি আমেরিকানা (Agave Americana)। বেড়ার জন্য অনেক রেলের ধারে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে এই গাছ দিয়া লোকে বাগানেরও বেড়া দিয়া থাকে। এ গাছ আমাদের দেশের নয়। আনারস, আতা, নোনা, পেঁপে, আলু, তামাক, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি গাছের মত ইহাকে আমরা আমেরিকা হইতে পাইয়াছি। পূর্বকালে আমেরিকার মেক্সিকো নামক দেশে এই গাছকে লোকে নানা কার্য্যে পরিণত করিত। আস্ত পাতা দিয়া ঘর ছাইত। পাতা চাঁচিয়া কাগজ প্রস্তুত করিত, পাতা হইতে আঁশ বাহির করিয়া দড়ি-দড়া করিত। মূল হইতে সাবাং প্রস্তুত করিত। কচি কচি পাতা রাঁধিয়া খাইত। ফুলের শাখা হইতে মদ প্রস্তুত করিত। সম্প্রতি এই গাছের আঁশ আমি বিলাতে পাঠাইয়াছিলাম। সে স্থানের ব্যবসাদারেরা এই আঁশ প্রতি মণ দশ টাকা হইতে পনর টাকা পর্য্যন্ত দরে ক্রয় করিতে পারেন।

বন-আনারসের আর একটী জাতি আছে। তাহার নাম আগাভি রিজিডা, রূপ সিসলিয়ানা (Agave rigida Variety Sissaliana) ইংরেজিতে আজকাল ইহাকে সিসল হেম্প বলে। আমেরিকার উপকূলে বারমুডাস নামক দ্বীপে ইহার বাস। বিলাতে ইহার আঁশ পঁচিশ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। বারমুডাস দ্বীপের লোক ইহা বেচিয়া বড়মানুষ হইয়া গিয়াছেন। বারমুডাস ইংরেজের রাজ্য। সেস্থানে ইংরেজ-গবর্ণর আছেন। তাঁর ইচ্ছা অন্য দেশে সিসলের চাষ না হয়, বারমুডাবাসীদিগের একাধ্য নিজস্ব থাকে। যাহাতে এ গাছের চারা অন্য দেশে না যাইতে পায়, তিনি সেইরূপ আইন করিলেন। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট কৌশল করিয়া ইহার চারা এদেশে আনিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজিতে এ গাছকে সিসল হেম্প বলে। হেম্প (Hemp) কথাটীর এক অর্থ "পাট", অপর অর্থ "গাঁজা"। তাই মিরর খবরের কাগজে সেই সময়ে গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করা হইল। মিরর বলিলেন,—"গবর্ণমেণ্ট এইবার দেশটীকে একেবারে উৎসন্ন দিবার নিমিত্ত কল্পনা করিয়াছেন। এক দেশী গাঁজার জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর আবার কোথা হইতে গবর্ণমেণ্ট নূতন প্রকারের সিসল নামক গাঁজা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বিলাতি গাঁজা পাইয়া এইবার মেয়ে-মর্দে সব গাঁজা খাইবে, দেশটী ছারে-খারে যাইবে।" বলা বাহুল্য যে, মিরর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। দেশে নূতন প্রকার গাঁজা আসে নাই, নূতন এক প্রকার পাটের বীজ আসিয়াছে, যাহার মূল্য আমাদের এ পাটের চেয়ে অন্ততঃ চারিগুণ অধিক। গবর্ণমেণ্ট যদি কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে দেশী পাটের চাষ করিয়া যেখানে

আজকাল লোকে এক টাকা পায়, সিসল পাটের চাষ করিয়া সেখানে চারি টাকা পাইবে। আচ্ছা ভাল, ননারূপ পাট বা গাছের আঁশকে ইংরেজি ভাষায় হেম্প বা গাঁজা বলে কেন? যথা;—ম্যানিলা হেম্প অর্থাৎ ম্যানিলা দেশের কলার আঁশ, নিউজিলান্ড হেম্প অর্থাৎ নিউজিলান্ড দেশের আঁশ, সন হেম্প অর্থাৎ আমাদের শণ, সিসল হেম্প ইত্যাদি। হেম্প মানে যে পাটও হয় গাঁজাও হয়, তাহা বোধহয় অনেকে জানেন না। অনেকে বোধহয় একথাও জানেন না যে প্লম্ (Plum) মানে কুল নয়, পেয়ার (Pear) মানে পেয়ারা নয়, র‍্যাট (Rat) মানে নেঙটি ইঁদুর নয়। প্লম বা আলু বোখারা, পেয়ার মানে ন্যাসপাতি, র‍্যাট মানে বড় ইঁদুর, মাউস (Mouse) মানে নেঙটি ইঁদুর। হেম্প মানে গাঁজাও হইল আবার পাটও হইল কেন? রুশিয়া দেশে যে গাঁজার গাছ আছে, তাহাতে গাঁজা, অথবা চরস, অথবা সিদ্ধি হয় না, তাহাতে কেবল পাট হয়। সেই পাট বিলাতে আমদানি হইত। সুতরাং সে পাটের নাম হেম্প হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আবার সেই হেম্প গাছ হইতে গাঁজা, চরস ও সিদ্ধি হয়। সুতরাং গাঁজা, চরসের নামও হেম্প হইল। হিমালয়-পর্বতে বন্য গাঁজার গাছ হইতে কিরূপে পাট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আমি লোকদিগকে শিখাইয়াছিলাম। তাহারা ইহা হইতে এক্ষণে সামান্যভাবে চট প্রস্তুত করে।

এ সম্বন্ধে আজ আর আমি অধিক লিখিতে সাহস করি না। কেবল আরম্ভ করিয়া রাখিলাম। কারণ, নয়ন-চাঁদ এবার জন্মভূমির অনেকগুলি পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছেন। নয়নবাবুর গল্পটী আমি করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁর সব কথা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

॥ দুই ॥

গতবারে বলিয়াছি যে, ননারূপ পাটকে ইংরেজি ভাষায় হেম্প বলে। কেননা, সিদ্ধির পাট পূর্বে বিলাতে আমদানি হইত। আর সিদ্ধি ও গাঁজা গাছের নাম ইংরেজি ভাষায় "হেম্প"। তাই, অনেকে শণকে "হেম্প" বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমার একটী বন্ধু এই কথা লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। ইহাঁর বাড়ী মেমারীর নিকট, নাম যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইনি কলিকাতায় চাকরি করেন, কিন্তু কৃষিকার্য্যে বিলক্ষণ সখ আছে। ধান, আলু, আখ, কত কি দ্রব্যের চাষ করিয়া থাকেন। এবার তাঁর শণের চাষ করিতে বাসনা হইয়াছিল। ভাল বীজ পাইবেন বলিয়া সরকারি কৃষি অফিসে ইনি এক পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিলেন যে, "মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট কিছু হেম্পের বীজ পাঠাইয়া দিবেন; ইহার যাহা মূল্য হয়, আমি তাহা দিব।" বীজ আসিল। ভাল করিয়া জমিতে চাষ দিয়া, সার দিয়া বীজ বুনিলেন। চারা বাহির হইল। কিন্তু সে চারা শণের গাছের মত নয়, অন্যপ্রকার।

যোগেন্দ্রবাবু আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! এবার আমি শণের বীজ বুনিয়াছিলাম, কিন্তু শণের গাছ বাহির না হইয়া অন্য গাছ বাহির হইল, ইহার অর্থ কি?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বীজ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন?

তিনি বলিলেন,—"বাঙ্গালার কৃষি-অফিস হইতে লইয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হেম্পের বীজ চাহিয়াছিলেন?"

যোগেন্দ্রবাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

আমি বলিলাম,—"আর শণের চাষ করিয়া কাজ নাই। আস্তে আস্তে গাছ-

গুলি গিয়া মারিয়া ফেলুন। তা না হইলে, নয়ন-চাঁদের সুবল ঘোষের যো হইবে। গাঁজার চাষ করিতেছেন বলিয়া পুলিশের টানা-হেঁচড়ায় আপনার প্রাণ যাইবে।"

গতবারের প্রবন্ধে আমি বেড়েলার কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম। বেড়েলার গাছ হইতে চমৎকার পাট বাহির হয়। আজ বার বৎসরের কথা হইল, রাজসাহী জিলার বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় এই গাছের অনেকগুলি পাট দিয়াছিলেন। বিলাতে অনেক ব্যবসাদারকে আমি ঐ পাট দেখাইয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। মসিনা বা তিসির গাছ হইতে বিলাতে এক প্রকার পাট প্রস্তুত হয়। এ পাটের অনেক দাম। আমাদের দেশে তিসির গাছ হইতে কেবল তিসি হয়, পাট হয় না। কতবার ইহা হইতে পাট বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু যে পাট বাহির করিয়াছিলাম, তাহা ভাল নয়। তাহা হইতে কাগজ ভিন্ন অপর কোন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে না। বিলাতের তিসির গাছে তিসি হয় না। সেখানে লোকে কেবল পাটের জন্য ইহার চাষ করিয়া থাকে। এই পাটে উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি আমেরিকার লোকে তিসির গাছ হইতে বীজও উৎপন্ন করিতেছে, আবার পাটও বাহির করিতেছে। সুতরাং এক গাছ হইতে তাহারা দুইটী ফসল লাভ করিতেছে। পূর্বে এ দেশ হইতে আমেরিকায় অনেক তিসি যাইত। এখন আর যায় না। কারণ, সেস্থানে লোকে তিসির গাছ হইতে এখন বীজ উৎপন্ন করিতে শিখিয়াছে।

যাহা হউক, বিলাতে তিসির পাটে উত্তম উত্তম কাপড় প্রস্তুত হয়। আমার বেড়েলার পাট দেখিয়া ব্যবসাদারেরা বলিলেন যে, ইহাতে সেইরূপ কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার পর ভালরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই পাট আমি আয়রলণ্ড দেশে বেলফাষ্ট নগরে পাঠাইয়া দিই। যাহারা তিসির পাটে কাপড় প্রস্তুত করে, তাহারা এই পাট দিয়া কাপড় বুনিয়া দেখিল, উত্তম কাপড় হইল। তাহার পর প্রশ্ন উঠিল এই যে, এ পাট কত পাওয়া যায় আর কি মূল্যে ভারতবাসীরা ইহা যোগাইতে পারে? একথার এখনও মীমাংসা হয় নাই। রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণকে আমি পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যুত্তরে ইনি লিখিলেন যে, তিনি ইহার চাষ করেন নাই। বন হইতে জমা করিয়াছিলেন। প্রতি মণ জমা করিতে তাঁহার প্রায় একশত টাকা খরচ পড়িয়াছিল। তবেই হইল যে, ব্যবসার নিমিত্ত এ পাট এখন দুষ্প্রাপ্য। বন হইতে জমা করিতে যাইলে অতিশয় খরচ পড়ে, তাহাতে ব্যবসা চলে না। চাষ করিলে কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত এক্ষণে চেষ্টা করিতেছি। অনেক স্থানে বীজ পাঠাইয়া দিয়াছি। বঙ্গদেশে শিবপুর, মালিকপুর, ভাগলপুর, মানভূম ও আমার নিজগ্রাম রাহুতায় ইহার বীজ পাঠাইয়া দিয়াছি। মান্দ্রাজের নিকট সৈদাপেটেও ইহার বীজ দিয়াছি। পশ্চিমে সাহারাণপুরেও ইহার চাষ করিতে বলিয়াছি। দেখা যাউক, চাষ করিলে কিরূপ পাট হয়, আর কত খরচ পড়ে। দোষ এই যে, বেড়েলার গাছে অনেক ডালপালা হয়, সুতরাং পাট বাহির করিতে অতিশয় পরিশ্রম হয়। সকলকে ঘন করিয়া ইহার বীজ বুনিতে বলিয়াছি। ঘন হইয়া গাছ উঠিলে বড় ডালপালা বাহির হয় না। ইহার আর একটী দোষ এই যে, এ গাছের কাঠি অতিশয় কঠিন। সহজে ভাঙ্গিতে পারা যায় না। কাঠি সহজে ভাঙ্গিতে না পারিলে, পাট বাহির করিবার সুবিধা হয় না। চাষ করিতে করিতে এ দোষ দূরীভূত হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। আমি এসকল কথা বলিতেছি কেন, না আমাদের এখন চারিদিকে দৃষ্টি চাই। দেশে বিদেশে গিয়া এক্ষণে আমাদিগকে নানারূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। জানি যে, এই জন্মভূমির কর্তাদিগের সে মত নয়। তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আর

নূতন জ্ঞানের উৎপত্তি হয় নাই। দেশ কিরূপ কচুপোড়া খাইয়া বসিয়া আছে, তাহা আর আমাকে বলিতে হইবে না, সকলেই তাহা দেখিতেছেন। বার বার নানা কথা লিখিয়া দেশকে জাগরিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমার কাজ আমি করি, ফল হয় ভাল, না হয় কি করিব? জেপানিদের কাণ্ড দেখিয়াও যদি এ দেশের লোকের চক্ষু উন্মীলিত না হয়, তাহা হইলে জানিব যে চক্ষু আর নাই, গলিয়া ঢেলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তেলাকুচা গাছের ডাঁটায় পাঠ হয়, একথা কি কেহ জানেন? কেহই জানেন না, কোনও পুস্তকে এ কথা লেখা নাই। আর বৎসর আমি এই কথাটী আবিষ্কার করি। কিন্তু এ পাট কাপড় কি দড়ি-দড়া হয় না? ইহাতে উত্তম কাগজ হয়। এই পাট বাহির করিয়া আমি বামারলরিদের বড় সাহেবকে দেখাই। রাণীগঞ্জের নিকট ইহাঁদের কাগজের কল আছে। এই পাট পরীক্ষা করিয়া তিনি ইহার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার চাষ করিবার নিমিত্ত তিনি আমার নিকট বীজ লইয়াছিলেন। বামারলরিদের সে বড় সাহেব এক্ষণে চিরকালের নিমিত্ত বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এ বিষয়ের কি হইতেছে, অথবা কিছু হইবে কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যেরূপভাবে চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা করিলে চলিবে না। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে,—"আপনি এক কাজ করুন। প্রতি মণ এত টাকার হিসাবে আমি এ পাট খরিদ করিব, এইরূপ একটী ঘোষণা করিয়া দিন; লাভ বুঝিলে লোকে ইহা জমা করিবে। বেড়ার ধারে ও প্রাচীরের গাছে পুতিয়া লোকে এ গাছের যত্ন করিবে। এ গ্রাম হইতে একমণ, সে গ্রাম হইতে দুই মণ, এইরূপে একত্র হইয়া সহস্র সহস্র মণ জমা হইয়া পড়িবে। চাষ করিলে ইহার লাভ হইবে না।" তিনি সে কথা না শুনিয়া ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার পর কি হইল জানি না। আমার এই "নূতন কথা" অল্প অল্প করিয়া এখন কিছুদিন চলিবে।

॥ তিন ॥

মাননীয় সম্ভ্রান্ত একজন কায়স্থ সম্প্রতি আমার লেখার কিছু দোষ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন যে, নয়নচাঁদের গল্পে আমি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি পরিহাস করিয়াছি। এরূপ দোষ ধরিলে হাসির গল্প একেবারেই লিখিতে পারা যায় না। তা ছাড়া, সে গল্পে আমি আপনাকে একেবারে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। নয়নচাঁদের কথা, নয়নচাঁদের ভাব সম্পূর্ণভাবে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ক্রমাগত আপনার কোলে ঝোল টানিয়া গুলিখোর যাহা করিতে পারে কি বলিতে পারে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার ভিতর যদি টি, এন, মুখার্জির গাম্ভীর্য্য আনিতে যাইতাম, তাহা হইলে আমার গল্পের দশা কি হইত? "গিন্নী! একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি, বাপধোন! ব্যাপারখানা কি?" যে নয়নচাঁদের মুখ দিয়া এ কথা বাহির হইয়াছে, তাহার মুখ দিয়াই অপর সব কথা বাহির হইয়াছে। তার আবার দোষ-গুণের বিচার কি? কিন্তু দোষ সেজন্য ধরা হয় নাই। দোষ ধরা হইয়াছে এইজন্য যে, আমি বিলাত গিয়াছি। বিলাত যাইলেই যে, আর্য্যধর্ম্মের নিন্দা করিতে হয়, এ কথা আমি স্বীকার করি না। বিলাত যাত্রার পক্ষে যাহা কিছু গোলমাল, তাহা যে কুসংস্কার-জনিত তাহাই আমার বিশ্বাস। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার একটী আত্মীয় ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন। সেজন্য গ্রামের লোকে এতই উৎপীড়ন করিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে সে রেঙ্গুন, মোলমিন, শিঙ্গাপুরে যাইলে কি হয়? তাহার পর এই যে শত শত হিন্দু প্রতি বৎসর ডেমেরা, ট্রিনিডাড, মরিশস হইতে ফিরিয়া আসিতেছে,

তাহাদের কে কি বলিতে সমর্থ হইয়াছে। উদয়পুর, বরদা, নরসিংহগড় প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদিগের কে কি করিতে পারিয়াছে? ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যেসমুদয় পল্টন ও তাহার সহিত যে সমুদয় বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ মিসর ও মল্টায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কে কি করিতে পারিয়াছেন? প্রকৃত কথা এই, সমুদ্রযাত্রায় এখন লোকের আপত্তি নাই, "বিলাত" নামেই যত দোষ। এই হইল লোকাচারের কথা। শাস্ত্র বিষয়েও দুই মত। শূলপাণি, রঘুনন্দন, যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ববাদিসম্মত নয়। মহাত্মা রাধাকান্ত দেবের সময় পণ্ডিতগণ শূলপাণির মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাচস্পতিমহাশয় এ মত একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরও এইভাবে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে, জয়পুরে আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশ-দেশান্তর হইতে পণ্ডিত একত্র করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া সেই পণ্ডিত-মণ্ডলী কয়দিন ধরিয়া বিচার করেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা অনুসারে পুনর্বার যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও বেদপাঠ প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা আমাকে সংস্কৃত হইতে হইয়াছিল। সে সভায় সমগ্র ভারতবর্ষের মহা-মহা পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। বিলাত যাইলে যে অখাদ্য খাইতে হইবেই হইবে ও তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া যে আর্য্যধর্মের নিন্দা করিতে হইবেই হইবে, যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস, ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাদের মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে পারে। আমি যে এত কথা বলিলাম, সে কেবল ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত। নিজে আমি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করি না। ভৃগু কর্তৃক আঘাতিত হইয়া, তবুও যে শক্তির নিমিত্ত নারায়ণ ভৃগুর সম্মান করিয়াছিলেন, আজ, পাঠক! এই সমস্ত পৃথিবীর ভিতর, গৃহস্থের মধ্যে, একা আমাতে সেই মহাবল বিদ্যমান। ইহা ধ্রুবের কোমল ভক্তি নয়, ইহা ঘোর-গর্বিত মহাশক্তি।

সমস্ত দিন অপর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া রাত্রি কালে এই যে জন্মভূমির জন্য পরিশ্রম করিতেছি, সে কেবল দেশের উপকারের জন্য, অণুমাত্র নিজের জন্য নয়। ১৮৭৫ সালে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হণ্টার সাহেব আমাকে প্রথম বিলাত লইয়া যাইবার জন্য একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। "জাতি যাইবে" একারণে আমি সম্মত হইলাম না। ১৮৮২ সালে বিলাত যাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাকে পুনর্বার বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। সেবারও সম্মত হইলাম না। ১৮৮৫ সালের ১৬ই নভেম্বর রাত্রিকালে বোম্বাই নগরে সমুদ্রকূলে মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে একখানি পাথরের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। ঘোর নিশীথকাল, গভীর অন্ধকার, ঘন ঘন সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে পৃথিবী আলোড়িত হইতেছিল। স্বদেশের হিতের নিমিত্ত তখন বিলাত যাত্রা স্থির হইল। কি করিয়া স্থির হইল, সে কথার আবশ্যক নাই। বিদ্যালয়ে আমি লেখাপড়া কিছুমাত্র শিখি নাই, কিন্তু তখন হইতে নানা বিদ্যা আমার প্রত্যক্ষ হইল, বিশ্ব-জগতের নানা রহস্য আমার নয়নগোচর হইল। বিলাতে যাইলে মহারাণী প্রভৃতি আমার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। যাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষে লোকে রাজা মহারাজা হইতে পারে, তাঁহারা সমকক্ষভাবে আমার সমাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাত যাইয়া যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আমি কোনও বিষয়ে লাভবান না হই, যাহাতে অণুমাত্র স্বার্থ-চিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান না পায়, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষরূপে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। যদি উচ্চপদ অথবা উচ্চ উপাধি লইয়া আসিতাম, তাহা হইলে, পাঠক! আজ তোমাদিগকে আমি শিক্ষা দিতে পারিতাম না। জনসাধারণকে লোকে যেভাবে বিচার করিয়া থাকেন, আমার

প্রতি যিনি সেই ভাব আরোপিত করিতে যাইবেন, তিনি ঘোরতর ভ্রমে পতিত হইবেন।

যাঁহারা অমার নিকট শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি যে, এক্ষণে এই পৃথিবীর উপর আমাদিগকে কিছু খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। সামান্য পদ-দলিত মৃত্তিকা হইতে কোটী কোটী যোজন অন্তর নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর এই খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। প্রচ্ছন্নভাবে হউক কি প্রকাশ্যভাবে হউক, এই প্রকৃতি-রাজ্যে, এই বিশ্বজগতে, মুহুর্মুহুঃ নানা ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে, একান্তমনে এই সব ক্রিয়া অবলোকন করিয়া, কার্য্যকারণ অনুশীলন করিয়া, জীবের হিতের নিমিত্ত প্রকৃতির আসুরিক বলসমূহকে পদানত করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাবে এক্ষণে কার্য্যকারণ অনুসন্ধান করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অতি সামান্য সামান্য বিষয় হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এক-একটী বিষয়ে এদেশে এমন এক-একটী পণ্ডিত আবির্ভাব হউন, যেন পৃথিবীতে তাঁহার মত আর দ্বিতীয় লোক না থাকে। কি দুরাশা আমার? বর্তমানের অবস্থা দেখিয়া বড়ই নিরাশ হইতে হয়। এই দেখ, আমাদের দেশে কিরূপ উদ্ভিদ আছে, তাহা কে জানে? সাহেবেরা। আমাদের মাটির ভিতর কিরূপ ধাতু আছে, তাহা কে জানে? সাহেবেরা। আমাদের বনে কিরূপ জীবজন্তু আছে, তাহা কে জানে? সাহেবেরা। আমাদের জলে কিরূপ মৎস্যাদি আছে, তাহা কে জানে? সাহেবেরা। অধিক আর বলিবার আবশ্যক নাই। এই সব প্রশ্নের উত্তর যেদিন হইবে—"বাঙ্গালিরা", সেই দিন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

প্রতিদিন কত কি আমাদের নয়নগোচর হয়, অথচ আমরা চক্ষু মেলিয়া দেখি না। এই একটী সামান্য বিষয়ের কথা বলিতেছি। এক ক্ষেত্রে, একরকম মাটীতে, এক প্রকার আঁবের বীজ পুঁতিয়া নানাপ্রকার ফল পাই কেন? আমি সাধের একটী বাগান করিব। একস্থানে পরিসর ভূমি লইলাম। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল আঁবের আঁটি তাহাতে পুঁতিলাম। আট বৎসর আশাপন্ন হইয়া অতি যত্নে সেই গাছগুলিকে প্রতিপালন করিলাম। কিন্তু হায়! যখন ফল ফলিল, তখন দেখিলাম যে, কোনওটী গাছের ফল খাইতে সুস্বাদু, আবার তাহার ঠিক পাশের গাছটীর ফল জোঁদা টক। গাছটী কাটিয়া ফেলিতে হইল। আমার আট বৎসরের পরিশ্রম মাটি হইয়া গেল, আমার আট বৎসরের প্রতীক্ষায় নিরাশ হইলাম। মাটির দোষে এইরূপ হয় সকলের এই ধারণা। কিন্তু পনর হাত দূরে, সেই ক্ষেত্রে, এমন কি মাটির পার্থক্য আছে যে, সে স্থানের গাছটীর ফল সুস্বাদু হইল? যাহা হউক, এ বিষয়ের আজ পর্য্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই। কেহ ভালরূপে অনুসন্ধানও করেন নাই। যদি মাটির দোষেই হয়, তাহা হইলে আজকাল আর অন্ধকারে ঢিল মারিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। বর্তমানকালের রসায়ণ-শাস্ত্রের সহায়তায় মাটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায়। কোন্ মাটিতে কি দ্রব্য আছে, তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে বলিয়া দিতে পারা যায়। পরে কোন্ মাটিতে কিরূপ ফল হয়, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত একত্র করিয়া কার্য্যকারণের কথাটী মীমাংসা করিয়া লইতে হয়। এইরূপ নিয়মাবলী একবার আবিষ্কার হইয়া যাইলে আর আমাদের পরিশ্রম বিফল হয় না। কিন্তু এরূপ সব আবিষ্কার একদিনের কি একজনের কার্য্য নয়। শত শত লোক চারিদিকে বিচক্ষণতার সহিত নিরীক্ষণ করিলে তবে ফল ফলিতে পারে। আঁবের বিষয় বলিতে আর একটী কথার উল্লেখ করি। আমাদের এখানে বোম্বাই গাছে ভাল ফল হয় না। তিন চারি বৎসর পরে হয়তো একবার ফলিল, তা না হইলে

দেখিতে পাই সব শেওড়াগাছের মত দাঁড়াইয়া আছেন। যাঁহাদের আঁব বাগান আছে, আঁব তাঁহাদের বড় একটী আশার সামগ্রী। বাগানটী রহিল, অথচ আঁব হইল না, এরূপ নিরাশ হইলে ছেলে-পিলের জন্য বিশেষতঃ বড়ই মনঃকষ্ট হয়। বড় বড় গাছ হইল, অথচ আঁব হয় না, ইহার কারণ কি? আমি বিলাতে দেখিয়াছি সেব বা আপেলের গাছের ডাল লোকে খুব কাটিয়া দেয়, চারিদিকে ভাসা-ভাসা শীকড়ও সব কাটিয়া দেয়। গাছগুলি মুড়া হয় বটে, কিন্তু তাহার হাড়ে হাড়ে ফল ধরে। অনেক গাছের স্বধর্ম এই যে, তাহারা সহজে ফল ফলাইতে চায় না। যে বলটী প্রয়োগ করিয়া ফুল ফল করিতে হইবে, এই সব সন্ন্যাসী গাছেরা সেই বলটী প্রয়োগ করিয়া নিজের শরীরের পরিবৃদ্ধি সাধন করে। নিজের ডাল-পালা বৃদ্ধি করে। মানুষে সে নিমিত্ত তাহাদের ডালপালা কাটিয়া দিয়া তাহাদিগকে তেজ-হীন করিয়া বলপূর্বক ফলবান করে। গাছের ভাসা-ভাসা শীকড়ে যে রস সংগৃহীত হয়, তাহাতে ডাল-পালা বৃদ্ধি পায়, তাহাতে ফল হয় না। সে নিমিত্ত মানুষে অনেকগুলি এই ভাসা-ভাসা শীকড় কাটিয়া দেয়। নিরুপায় হইয়া তখন গাছদিগকে ফলবান হইতে হয়। আঁবের কি সেরূপ কোনও উপায় করিবার যো নাই। যদি এরূপ কোনও একটী উপায় আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে লোকের বড়ই উপকার হয়। কলিকাতার নিকট পল্লি-গ্রামে অনেক ভদ্র-সন্তান আঁব, কাঁঠাল, নারিকেল, বাঁশ বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের বৎসরের আশা-ভরসা একেবারে মাটি হইয়া যায়। প্রথমত তাঁহাদের উপকার হয়। তাহার পর অধিক ফল জন্মিলে ফল শস্তা হয়। গরীব-দুঃখী সকলেই এই অমৃতসমান সুস্বাদু ফল খাইতে পায়।

এ স্থানে আর একটী কথা রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়। ঘাস ও বাঁশ একজাতীয় উদ্ভিদ। গম, ধান্য প্রভৃতি একপ্রকার ঘাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। নীরবে দাঁড়াইয়া বাঁশ মহাশয় দেখিলেন যে, বোকা ধান্য প্রভৃতি ঘাসেরা প্রতি বৎসর ফলোৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়। বাঁশ ভাবিলেন, "বটে! তবে যে বলে ফল ফলে, আমি দেহ পুষ্টির দিকে সেই বলটী প্রয়োগ করিব, ফলের দিকে তাহা বৃথা নষ্ট করিব না।" বংশানুক্রমে বাঁশ সেইভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। কাল কালান্তরের যত্ন সহকারে বাঁশ কি ঘাস হইতে এত পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন? মশাটী হইতে ক্রমে হাতিটী হইয়াছেন? কেবল ঘোরতর অনাবৃষ্টির বৎসরে বাঁশ আর থাকিতে পারেন না। রৌদ্রের উত্তাপে তাঁহাকে ফলিতে হয়। তখন তিনি ঠিক ধান্যের মত ফল উৎপাদন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষের সময় বন্য প্রদেশের লোক সেই বাঁশের চাউল খাইয়া জীবিত থাকে।

সচরাচর গাছপালা কিন্তু আঁব ও বাঁশের মত স্বার্থপর নয়। সন্ন্যাসধর্ম্মে তাহাদের রুচি নাই। পাঁচটী বাচ্ছা কাচ্ছা লইয়া সংসারী হয়, এই তাহাদের বাসনা। কত না কৌশল করিয়া তাহারা আপনাদিগের বংশ বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়! কেহ বা ফলগুলি উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে। যে পক্ষী পাখালি তাহাদিগের রূপে মোহিত হইয়া, মুখে করিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া ফেলিবে। কারণ ঠিক তলায় পড়িলে, ছায়ায় সূর্য্যকিরণ অভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন হইবে। কেহ বা সুস্বাদু শস্যে বা সুমিষ্ট রসে বীজগুলিকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহার উদ্দেশ্যও তাহাই। যে পক্ষী ও জীবজন্তুগণ মুখে করিয়া দূর দূরান্তরে লইয়া ফেলিবে। কেহ বা বীজের গায়ে পক্ষ নির্ম্মাণ করে। যে, এই পক্ষের সহায়তায় বায়ুভরে উড়িয়া বীজগুলি দূরে গিয়া পড়িবে। পাঠক! একবার শিমুলের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখ, বংশ বিস্তারের নিমিত্ত শিমুল কিরূপ বুদ্ধি বাহির করিয়াছে।

শুনিলাম, কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার মহাশয় আমার নানারূপ ভ্রম দর্শাইয়া দৈনিকে এক পত্র লিখিয়াছেন। যা, একটু আধটুকু অবসর পাই, তাহা এইরূপ লিখিতে পড়িতে অতিবাহিত হইয়া যায়। আফিসের কাজে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময়ে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাহার উপর লোকের পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে হইলে আর আমার প্রাণ বাঁচে না। তবে যে, আমি ভ্রমে পতিত হইলে কেহ আমার ভ্রম সংশোধন করিবেন না, একথা আমি বলি না। আমি কেবল এই কথা বলি যে, অযথা আমার দোষ দর্শাইলেও সে ভ্রম খণ্ডন করিবার আমার অবসর নাই। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে। দৈনিকে তিনি লিখিয়াছেন যে, মূর্গা ও মুর্ব্বা এক গাছ। আমার নিবেদন এই যে, তাঁহার ঔষধে তিনি যেন ভারতীয় মুর্ব্বার পরিবর্ত্তে আমেরিকা হইতে আনীত মূর্গা না ব্যবহার করেন। বিলাতী উদ্ভিদশাস্ত্রে মুর্ব্বার নাম Sanseviera Zeylanica, ইহা এ দেশের। মূর্গার নাম Agave americana, ইহা বিদেশের। দুইটী পৃথক বস্তু।

গ্রন্থ পরিচয়

ভূত ও মানুষ ॥ প্রথম প্রকাশ : ১৩ জানুয়ারি ১৮৯৬। এই গল্প-গ্রন্থের চারটি গল্পই প্রথমে 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় : 'বাঙ্গাল নিধিরাম' অগ্রহায়ণ ১৩০০, 'বীরবালা' পৌষ ১২৯৯, 'লুল্লু' পৌষ ১২৯৮, 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' শ্রাবণ ১৩০২। পত্রিকায় শেষোক্ত তিনটি গল্পের সঙ্গেই নানা কৌতুকোদ্দীপক চিত্র ছাপা হয়েছিল। শোনা যায়, ত্রৈলোক্যনাথের প্রত্যক্ষ নির্দেশ অনুসারেই চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছিল, ছাপাখানায় বসে তিনি নিজে আর্টিস্টকে নির্দেশ দিতেন। পত্রিকায় 'লুল্লু' গল্পের শিরোনামের তলায় বন্ধনীর মধ্যে 'কৃষ্টমাস নম্বর' কথাগুলি ছাপা হয়েছিল এবং গল্পের শেষে পাদ-টীকা ছিল : 'ভূতের কথায়, ভূতের অধিকার ; ইহার সহিত মনুষ্যসমাজের সম্পর্ক নাই। ইতি ছাপাখানার ভূত' ; 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পের শেষে পাদটীকায় 'জন্মভূমি'—সম্পাদকের মন্তব্য ছিল : 'পাঠকের মনে থাকে যেন এটী গুলিখোরের গল্প।'

মুক্তামালা ॥ প্রথম প্রকাশ ১৯০১। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২০। প্রথম সংস্করণের নামপত্র : মুক্তা-মালা। কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। (এমব্লেম) G. N. Halder, Calcutta প্রকাশক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার, ৬৩ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯০১। (অপরপৃষ্ঠায়) Calcutta : Printed by R. Dutt, Hare Press : 46 Bechu Chatterjee's Street. 1901. এই গ্রন্থের 'আদুরী ও আরসী' থেকে 'মদন ঘোষের বদনে হাসি' পর্যন্ত এগারটি গল্প প্রথমে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গল্প হিসাবে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ; পরে বেতাল পঞ্চবিংশতির ধরণে একটি বড় উপাখ্যানের আধারে এই এগারটি বিচ্ছিন্ন গল্পকে একত্র সন্নিবিষ্ট করে ত্রৈলোক্যনাথ 'মুক্তামালা' প্রকাশ করেন। কোন কোন গল্পে সত্য ঘটনার ভিত্তি আছে। লেখকের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপতি মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি, গুরুদেব গোলোক চক্রবর্ত্তীর চরিত্র ও বৃত্তান্ত কোন বাস্তব চরিত্র ও ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। ত্রৈলোক্যপুত্রের কাছে শুনেছি, 'বেতাল ষড়বিংশতি' গল্পের থিয়েটারী বীরের বৃত্তান্তে সেকালের বিখ্যাত নট অমরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৭৬—১৯১৬) অভিনয়পদ্ধতির প্রতি কটাক্ষ আছে।

মজার গল্প ॥ প্রথম প্রকাশ ১৩১২ বঙ্গাব্দ (১৩ এপ্রিল ১৯০৬)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭২। 'মজার গল্পে'র আটটি গল্পই প্রথমে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র দুষ্প্রাপ্যতার জন্য গল্পগুলির প্রথম প্রকাশকাল আমাদের অজ্ঞাত। এইসব গল্প সেকালের পাঠকসমাজে কেমন জনপ্রিয় ছিল তার পরোক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে : "সে (হরিহর) বহুদিন হইতে বঙ্গবাসীর গ্রাহক, অনেকদিনের পুরানো 'বঙ্গবাসী' তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বাণ্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ... অপু তবুও পুরাতন 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—লিউকা ও রাফেল, মার্টিনিক দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা যাদুকরের গল্প, আরও কত কথা। ...তবুও তার মনে দুঃখ থাকিয়া যায় যে, গত বৎসর

কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষভাগ তহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।" ত্রৈলোক্যনাথ প্রচুর বিদেশী পত্র-পত্রিকা পড়তেন এবং ঐসব পত্রিকার আখ্যানাদি থেকে উপকরণ নিয়ে বাংলা গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। 'মজার গল্পে' বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা এই ধরনের কয়েকটি গল্প আছে।

১৩৩০ সালে 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় থেকে 'মজার গল্পে'র যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় সেটি এখানে উদ্ধৃত হলো : "এই পুস্তকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সরল লেখনী-প্রসূত আটটি অতি সুন্দর সুন্দর গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে সমাজচিত্র, মজার গল্পচিত্র, গার্হস্থ্যচিত্র, দাম্পত্য প্রণয় চিত্র এমনই প্রস্ফুটভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে পুস্তক পড়িলেই মনে হইবে, যেন ইটালির প্রসিদ্ধ চিত্রকর গাইডো চক্ষুর সম্মুখে এক একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র আঁকিয়া তুলিয়া ধরিতেছেন। হাস্যকৌতুক আমোদপ্রমোদের ত কথাই নাই, রঙ্গ-রহস্যরস যেন নির্ঝর ঝরে ঝর ঝর ঝরিতেছে। আবার ওদিকে বীর, করুণ, রৌদ্র, শান্ত প্রভৃতি রসধারা যেন মন্দাকিনীর তরতর তরঙ্গে ছুটিতেছে।"

ডমরুচরিত ॥ লেখকের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে ১০ আগষ্ট ১৯২৩ তারিখে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৭। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে গল্প সাতটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সাতটি পূজাসংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ডমরুচরিতের' গল্পগুলি সেকালের শারদীয় সাহিত্য পাঠকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল। 'বঙ্গবাসী'র সংশ্লিষ্ট সংখ্যা-গুলি আমাদের হস্তগত না হওয়ায় গল্পগুলির প্রথম প্রকাশকাল আমাদের অজ্ঞাত। ত্রৈলোক্যপুত্রের কাছে শুনেছি, ত্রৈলোক্যনাথ বিদেশী পত্রপত্রিকায় ছলনাকুশল চতুর নাবিকদের কৌতুককর অভিযান-কাহিনী পড়তে ভালবাসতেন এবং ঐসব গল্পের কাটিং রেখে দিতেন। ডমরুধরের চরিত্রকল্পনায় এই সব চরিত্রের ছায়া থাকা অসম্ভব নয়, তবে সমস্ত আখ্যানই কতকাংশে লেখকের মৌলিক কল্পনা-প্রসূত এবং কতকাংশে সমসাময়িক ঘটনার উপর স্থাপিত। চতুর্থ গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে ছেলেখেকো স্বদেশী বক্তার কথা আছে, তার মূল আদর্শ হচ্ছে সেকালের স্বদেশী আন্দোলনের কোন গুরুস্থানীয় বিখ্যাত বাগ্মী নেতা।

অগ্রন্থিত গল্প ॥ 'রূপসী হিরণ্ময়ী' প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের 'জন্মভূমি' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায়। এটি 'ভূত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙাল নিধিরাম' গল্পের উপসংহার। 'আমার সেই অমূল্য মণি' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের 'জন্মভূমি' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায়।

প্রবন্ধাবলী ॥ এই প্রথম 'জন্মভূমি' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে ত্রৈলোক্যনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ সংগ্রহ করে গ্রন্থবদ্ধ করা হলো। প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশকাল নিম্নরূপ :

ভারতে সুবর্ণ : পৌষ ১২৯৭। লৌহ : মাঘ—চৈত্র ১২৯৭, বৈশাখ ১২৯৮। ইস্পাত : জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮। বিড়াল : আষাঢ় ১২৯৮। পশম : মাঘ ১২৯৮, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। এরণ্ড বা রেড়ি : চৈত্র ১২৯৮। গজদন্ত : বৈশাখ ১২৯৯। পাথুরে কয়লা : আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ১২৯৯। গ্যাস : পৌষ ১৩০০। গুটিকত ধাতু : মাঘ ১৩০০। নূতন বৃক্ষ : বৈশাখ ১৩০১। বায়ু : আষাঢ় ১৩০১। সুগন্ধ : ভাদ্র ১৩০১। এড়ী রেশম : অগ্রহায়ণ ১৩০১। নূতন কথা : শ্রাবণ, ভাদ্র. আশ্বিন ১৩০২।

নির্মল দাশ

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা

[ইহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত ও অভাব]*

ভূমিকা : ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা সম্বন্ধে বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে ইতিপূর্বে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধ কয়টী স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করিয়া এস্থানে সন্নিবেশিত হইল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে সমুদয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারও কতকগুলি এস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

দিন দিন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগের দশা কিরূপ হইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অনেকস্থানে সামান্য একজন মজুরের মাহিনা দশ টাকা, কিন্তু রেলে হউক, অথবা অন্য স্থানে হউক, একজন শিক্ষিত ভদ্র যুবক সেই মাহিনায় একটী চাকরি পান না। সেদিন একজন ছাত্রবৃত্তি পাশকরা যুবক পাচক ব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে একজন এফ এ পাশ করা ব্যক্তি কোন আপিসে দপ্তরির কার্য্য করিতেছেন। ফলকথা, ভদ্রসন্তানগণকে পেটের জ্বালায় যে কুলিগিরি করিতে হইবে সেই লক্ষণ চারিদিকে প্রতীয়মান হইতেছে।

এখন উপায় কি? আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র কৃষি ও কারুকার্য্যে নিয়োজিত করা, তাহাই এ বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র তরণীস্বরূপ। ইতিপূর্বে এই বঙ্গদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চমনা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ও জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই, এইরূপ ভাবিয়া সরকার মহাশয় এই বিজ্ঞান সভা স্থাপিত করিয়াছেন। সরকার মহাশয় এখন পীড়িত হইয়া কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। তবুও এখনও তিনি বিজ্ঞানসভার জন্য ঘোরতর পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে অধিক প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। সুতরাং তিনি ও অন্যান্য মহাত্মাগণ যে সমুদয় কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, সে সমুদয় কার্য্য যাহাতে ভালরূপে সম্পাদিত হয়, সে চেষ্টা বর্ত্তমানকালের যুবকদিগের করা কর্ত্তব্য। পূর্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি অক্ষয় রাখিতে কর্ত্তব্য-পরায়ণ পুত্রগণের যেরূপ চেষ্টা করা উচিত, সেইরূপ গতকালপ্রসূত মহাত্মাদিগের কার্য্যকলাপ অক্ষয় রাখিতে বর্ত্তমানকালের যুবকদিগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই বিজ্ঞান সভা, দেশের মঙ্গলের একমাত্র আশা ভরসা। এক্ষণে এই বিজ্ঞান সভার কিঞ্চিৎ পূর্ব পরিচয় এস্থলে প্রদান করিব।

আমাদের দেশে যাহাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হয়, সেই সম্বন্ধে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর পূর্বে, চিকিৎসা বিষয়ে একখানি মাসিক পত্রে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান

---

* শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমৃতলাল সরকার কর্তৃক সংকলিত। Printed by P. Sircar, Anglo-Sanskrit Press, 51 Sankharitola Lane, Calcutta. Price 1 Rupee. 1903

সভার ইহাই প্রথম সূচনা। তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে জন্য পর বৎসর তিনি তিনটী প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ :

(১) এ দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনার নিমিত্ত কলিকাতায় একটী সভা স্থাপিত হউক, এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাঁহার সহিত সংযোগে শাখা সভা সংস্থাপিত হউক।

(২) ভারতের লোককে নানাবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করা এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতে যে সমুদয় প্রাচীন পুস্তক আছে, তাহাও প্রকাশিত করা এ সভার আর একটী উদ্দেশ্য হইবে।

(৩) এই সভার নিমিত্ত গৃহ, নানারূপ যন্ত্র, ও কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত লোকের আবশ্যক। ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন, চাঁদা স্বরূপ সেই অর্থ সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হউক।

এই সভায় কি কি শাস্ত্র আলোচিত হইবে, ও কি কি উপায় অবলম্বন করিলে সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হইবে, ইহার পর সেই সম্বন্ধে সরকার মহাশয় কলিকাতা, উত্তরপাড়া প্রভৃতি নানাস্থানে বক্তৃতা করেন, ও সেই বক্তৃতায় তাঁহার উদ্দেশ্য অতি বিশদভাবে সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। সংবাদপত্র সমূহেও এই বিষয় সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই সমুদয় বক্তৃতা শ্রবণ ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেশের অনেক বড়লোকদিগের মনে একান্ত বিশ্বাস হয় যে, ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় বৃহৎ এক বিজ্ঞানালয় সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অনেক ধনবান লোক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বঙ্গদেশের তাৎকালীন ছোটলাট সাহেবও সরকার মহাশয়কে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিলেন। তাহার পর যে যে মহোদয়গণ এই কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ১৮৭৫ সালের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে তাঁহারা একটী সভা করিলেন। বিজ্ঞান সভায় কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, সেই সম্বন্ধে এই সভায় সরকার মহাশয় আর একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন, সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সভ্যগণ সত্বর এই সদনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন। এই কার্য্যে যাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও চাঁদা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহার পর তাঁহারা আরও দুইটী সভা করিয়া বিজ্ঞানসভা স্থাপন সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে, উদ্যোগীগণের তৃতীয় সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশের ছোটলাট সাহেব এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইদিন উপস্থিত সভ্যগণ এক-বাক্য হইয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা সংস্থাপন করিলেন। সভাদ্বারা কি কি কার্য্য সম্পাদিত হইবে ও কোন কোন ব্যক্তি ইহার কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিবেন, এই অধিবেশনে সে সমুদয় বিষয়ও স্থির হইল।

বিজ্ঞান সভা এইরূপে সংস্থাপিত হইল। এস্থানে একটী কথা বলিয়া রাখি। অনেকের ধারণা এই যে, বিজ্ঞান সভার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহার সত্ত্বাধিকারী সরকার মহাশয় নিজে আর তাঁহার পরলোকগমনে এই সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হইবে। এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক। বিজ্ঞান সভা এবং ইহার সমুদয় সম্পত্তি সাধারণের ; সরকার মহাশয়ের নিজের নহে। সাধারণের পক্ষ হইতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ তাহারাই সভার সম্পত্তির অধিকারী ও তাঁহারাই সভার তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন।

সভা সংস্থাপনের কিছু দিন পরে সেই সময়ের ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব, এক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। বঙ্গদেশের লোক যদি এককালীন ৭০ হাজার টাকা ও মাসিক ১ শত টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞান সভার জন্য কয়েক বৎসরের নিমিত্ত একটী বাটী প্রদান করিবেন, ছোট লাট সাহেব এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশের ধনবান ও শিক্ষিত লোকগণ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে বিজ্ঞান সভা এক্ষণে বৃহৎ এক অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অট্টালিকার মধ্যে বৃহৎ একটি হল আছে, তাহাতে প্রায় পাঁচশত লোক উপবেশন করিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারেন। পরীক্ষার নিমিত্ত নানারূপ বহুমূল্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিমিত্ত একটী পরীক্ষাগার (Laboratory) নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পরীক্ষাগার নির্ম্মাণের জন্য বিজয়নগরের মহারাজ চল্লিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানারূপ পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি ক্রীত হইয়াছে ও হইতেছে। জন কয়েক দেশহিতৈষী পণ্ডিত নিয়মিত-রূপে প্রতিদিন সাধারণকে নানাশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদানে ব্রতী হইয়াছেন। সভার উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রতিমাসে প্রায় দুইশত টাকা খরচ হইয়া থাকে। সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা লইয়া সেই চাঁদার টাকা কার্য্যাধ্যক্ষগণ কিরূপ পরিমিতভাবে ও বিচক্ষণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এককালীন দান ও মাসিক চাঁদাস্বরূপ কার্য্যাধ্যক্ষগণ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। উক্ত টাকার সুদ লাভ করিয়া, ও বিজ্ঞানালয়ের বহির্ভাগ ভাড়া দিয়া, তাঁহারা মূলধন অনেক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিজ্ঞানালয়ের বাটী খরিদ, পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ, যন্ত্র ও পুস্তক ক্রয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে কার্য্যাধ্যক্ষগণ দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত এখনও সভার প্রায় দেড়লক্ষ টাকা মূলধন জমা আছে। এই টাকায় ট্রষ্টিদিগের নামে কোম্পানি কাগজ ক্রীত হইয়াছে। কার্য্যাধ্যক্ষগণ সাধারণের নিকট হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সভার সম্পত্তির মূল্য এক্ষণে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা। ১৮৭৬ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞান সভার আয়ব্যয়ের হিসাব এই পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল।

একজন বাঙ্গালির উদ্যোগে ও অনেকগুলি মহাত্মার সহায়তায় যে এতদূর কার্য্য হইয়াছে তাহা আনন্দের বিষয় বটে। কিন্তু প্রকৃত কার্য্য এখনও অনেক বাকি রহিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রকে যেভাবে কৃষিকার্য্য ও কারুকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া অন্যান্য দেশের লোক বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছেন, আমাদিগকেও এক্ষণে সেই জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইবে। এই বিজ্ঞান সভার দ্বারাই সেই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে। নানারূপ পরীক্ষা না করিলে নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হয় না। নারিকেল তৈল হইতে মাখন ও আলকাতরা হইতে নীল প্রভৃতি কোটি কোটি টাকার বস্তু অনেক পরিশ্রম, অনেক পরীক্ষা ও অনেক ব্যয় করিয়া অন্যান্য দেশের লোক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞান সভা যাহাতে এইরূপ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারে আমাদের এক্ষণে সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানবিৎ কর্ম্মচারীর আবশ্যক। সেই পণ্ডিতগণ যাহাতে এই কার্য্যে এক মনে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে পারেন, সেইরূপ আয়োজন করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাদের অন্নের চিন্তা না থাকে, সেইরূপ বেতন তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। খনিজ শাস্ত্র, উদ্ভিদ শাস্ত্র, রসায়ন, তাড়িত, কৃষি-কার্য্য, কারু-কার্য্য, এইরূপ এক

একটী বিষয়ে এক একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নিয়োজিত থাকা আবশ্যক। তাহার পর পরীক্ষার নিমিত্ত দ্রব্যাদির আবশ্যক, এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বঙ্গভাষায় একখানি মাসিকপত্রের আবশ্যক। ফলকথা, ভালরূপ কার্য্য করিতে হইলে এখনও অনেক টাকার প্রয়োজন। একেবারে এত টাকা সংগৃহীত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু তা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকাও উচিত নহে। প্রথমতঃ যতই সামান্যভাবে হউক না কেন, কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। যেমন আয় হইবে, সেইরূপ বুঝিয়া একটী কি দুইটী বিষয় লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক। কিন্তু সকল কার্য্যের মূল টাকা, টাকা না হইলে কোন কার্য্য আরম্ভ হইবে না। যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে অনেক টাকা খরচ না করিলে কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। বোম্বাই প্রদেশবাসী পার্সি টাটা সাহেবের উদ্যম তাহার দৃষ্টান্ত। তেত্রিশ বৎসর পূর্বে সরকার মহাশয় যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে মানস করিয়া টাটা সাহেব গবর্ণমেণ্টের হস্তে ত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্ট অবগত হইলেন যে ত্রিশ লক্ষ অতি সামান্য টাকা, ইহাতে আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা ও পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। অবশেষে এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত টাটা সাহেবের ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যতীত মহিসূরের মহারাজা এগার শত বিঘা ভূমি, পাঁচ লক্ষ টাকা এককালীন দান, ও দশ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দিবেন, ও গবর্ণমেণ্ট এককালীন এক লক্ষ টাকা ও দশ বৎসরের নিমিত্ত বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করিবেন। অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণের নিমিত্ত ছয় লক্ষ টাকা ও তাহার পর বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা খরচ করিতে গবর্ণমেণ্ট মানস করিয়াছেন। সর্বসুদ্ধ বাহাত্তর লক্ষ টাকা মূলধনের আবশ্যক। ইহাতেও যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করেন না। বঙ্গদেশের ধনবান লোকগণ এইরূপ কার্য্যের নিমিত্ত সরকার মহাশয়ের হস্তে কেবল প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। এই সামান্য টাকায় সরকার মহাশয় যে এতদূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক সামান্যভাবে কার্য্য করিতে হইলেও আরও টাকার আবশ্যক। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। এই হিতকর কার্য্যে সকলেরই মনোযোগ করা আবশ্যক। দেশে যত শিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতিজনে যদি বৎসরে এক টাকা করিয়া চাঁদা প্রদান করেন, তাহা হইলেও কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে। তাহার পর ভবিষ্যতে আমাদের পুত্র পৌত্রগণের যে কিরূপ শোচনীয় দুর্দশা হইবে, যাঁহারা সেইকথা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, বিজ্ঞান সভার জন্য লজ্জা ঘৃণাকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাও করিতে হইবে। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি শুভ কার্য্যে যাঁহারা শত শত টাকা ব্যয় করেন, বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত তাঁহাদের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলে, তাঁহারা বোধ হয় নিরাশ করিবেন না। আমাদের নিশ্চয় বিশ্বাস এই যে যত্ন করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। সেই যত্নের নিতান্ত প্রয়োজন। স্বদেশের, স্বজাতির, আপনাদের নিজের পুত্র পৌত্র, সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত, আজ কৃতাঞ্জলি হইয়া দেশের শিক্ষিত লোকদিগের নিকট আমরা সেই যত্ন ভিক্ষা করিতেছি। যিনি যতটুকু পারেন তিনি ততটুকু চেষ্টা করুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বিজ্ঞানালয়, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৮ই ভাদ্র, ১৩১০ সাল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅমৃতলাল সরকার

বিজ্ঞান-আলয় : প্রথম প্রস্তাব

মূল পদার্থ : পূর্বে যে সমুদয় দ্রব্য উদ্ভিদ অথবা পশু শরীরে উৎপন্ন হইত, মানুষ এখন সেই সমুদয় বস্তু কৃত্রিম প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কৃত্রিম চিনি, ইক্ষু চিনি অপেক্ষা আড়াইশত গুণ মিষ্ট। কৃত্রিম নীল, উদ্ভিদ-জাত নীলের ব্যবসাকে মাটি করিতে বসিয়াছে। কৃত্রিম ম্যাজেণ্ডা রং লাক্ষা, কুসুম, আচ প্রভৃতি রঙের ব্যবসাকে একেবারে লোপ করিয়াছে। বাজারে যে নানারূপ বিলাতী সুগন্ধযুক্ত এসেন্স বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশ কৃত্রিম। ফল কথা পূর্বে যাহা ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, মানুষ এখন সেই-রূপ কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞানবলে মানুষ এই সমুদয় কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এই ভারতবর্ষে নানারূপ বিজ্ঞানের সূচনা হয়। তাহার পর এ দেশের লোক মনে করিল যে,—"যাহা আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাই চূড়ান্ত, ইহার উপর আর উন্নতি হয় না।" এইরূপ ভাবিয়া আমাদের দেশের লোক আর কোনরূপ উন্নতি করিতে চেষ্টা করিল না। উন্নতি করিবার চেষ্টা, বলিতে গেলে, দেড় শত বৎসর পূর্বে কোন দেশেই ছিল না। যত কিছু ভাল ভাল নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা এই দেড়শত বৎসরের ভিতরেই হইয়াছে।

প্রথম মানুষ দেখিল যে, পৃথিবীর কোন পদার্থ একেবারে ধ্বংস হয় না,—রূপান্তর হয়, এই মাত্র। আগুনে আমি কাঠ, কি বাতি, কি তৈল জ্বালাইলাম ; সে কাঠ, বাতি ও তৈল লোপ পাইল। লোপ পাইল? না,—তাহারা লোপ পাইল না, তাহাদের রূপান্তর হইল অর্থাৎ তাহারা অন্য বস্তুতে পরিণত হইল। সে বস্তুর আকার বায়ুর মত। সে জন্য তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। অদৃশ্যভাবে সে বস্তু আশেপাশের বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। কিন্তু কাঠ, কি কয়লা, কি তৈল পুড়িয়া নূতন একটী পদার্থ যে উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ এই নূতন বায়ুর ন্যায় পদার্থটী ভয়ানক বিষ। ঘরের দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া কয়লা জ্বালাইলে ঘরটী এই বিষময় পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আর সে ঘরে যত মানুষ থাকে, তাহারা সব মরিয়া যায়। এই বিষ নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রতি বৎসর কলিকাতা সহরে অনেক লোক মারা পড়ে। আতুড় ঘরে গুলের ধুমেও প্রতি বৎসর অনেক শিশু মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

পৃথিবীর কোন বস্তু ধ্বংস হয় না। আগুনের তাপে কাঠ, কয়লা প্রভৃতি দাহ্য বস্তুর রূপান্তর হয়। বায়ুর সংযোগে, জলের সংযোগে, অম্ল দ্রব্যের সংযোগে, আরও নানা বস্তুর সংযোগে, বিশেষতঃ তাড়িত বলের সংযোগে, পৃথিবীর প্রায় সকল বস্তুর রূপান্তর হয়। পৃথিবীর সকল বস্তুর এইরূপ রাত্রি-দিন রূপান্তর হইতেছে, আবার পুনর্বার গঠিত হইতেছে।

এ রূপান্তরের অর্থ কি? আমার মত এই যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু কেবল একটী সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এ কেবল অনুমান, ইহার কোন প্রমাণ নাই। সকল বস্তু যে একটী মূল পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই বটে ; কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু যে ন্যূনাধিক সত্তরটী মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কারণ এই সত্তরটী বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। বায়ু বল, মৃত্তিকা বল, প্রস্তর বল, উদ্ভিদ-শরীর বল, জীব শরীর বল, সমুদয় বস্তু, এই সত্তরটী মূল পদার্থ দিয়া গঠিত। এক সের ওজনের এক খণ্ড কাষ্ঠ লইলাম। এই কাষ্ঠ

খণ্ডকে দগ্ধ অর্থাৎ রূপান্তর করিলাম। যে যে মূল পদার্থ দ্বারা কাষ্ঠখণ্ড গঠিত, তাহারা পৃথক পৃথক হইয়া গেল। সেই সমুদায় পদার্থকে ওজন করিয়া দেখিলাম যে, ঠিক এক সের হইল। লৌহ, তাম্র, পারদ, রৌপ্য, স্বর্ণ, গন্ধক ইহারা মূল পদার্থ। কাষ্ঠকে পোড়াইলে তাহার ভিতর হইতে অনেকগুলি অন্য বস্তু বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু বিশুদ্ধ স্বর্ণকে পোড়াইলে তাহার ভিতর হইতে অন্য কোন বস্তু বাহির হয় না; সোণা সোণাই থাকিয়া যায়। সম্প্রতি আমার হাতে একটু সুবর্ণ ভস্ম পড়িয়াছিল। সে সুবর্ণ-ভস্ম ঠিক অন্য ভস্মের ন্যায়। পয়সা দিয়া এরূপ সুবর্ণ ভস্ম ক্রয় করিতে কাহাকেও আমি পরামর্শ প্রদান করি না। কারণ, স্বর্ণকে চূর্ণ করিতে পারা যায়, একেবারে ভস্মে পরিণত করা যায় না। পারদ ও গন্ধক দিয়া লোকে মকরধ্বজ প্রস্তুত করে। সে পারদ ও গন্ধক কোথায় যায়? কাষ্ঠ পুড়িয়া যেরূপ ভস্ম হইয়া যায়, তাহারাও কি সেই-রূপ ভস্ম হয়? কিছুতেই নয়। সে পারদ ও গন্ধক সূক্ষ্মভাবে মকরধ্বজেই রহিয়া যায়। কাঠ কি কয়লার ভস্ম হইতে আমরা কাঠ কি কয়লা পুনরায় বাহির করিতে পারি না; কিন্তু মকরধ্বজ হইতে আমরা পুনরায় পারা ও গন্ধক বাহির করিয়া লইতে পারি। লৌহ ও গন্ধক মিশ্রিত হইয়া হীরাকস, ও তাম্র ও গন্ধক মিশ্রিত হইয়া তুঁতিয়া হয়। হীরাকস হইতে লৌহ ও গন্ধক, ও তুঁতিয়া হইতে তাম্র ও গন্ধক বাহির করিতে পারা যায়; কিন্তু লৌহ অথবা গন্ধক হইতে অন্য কোন বস্তু বাহির করিতে পারা যায় না, কারণ ইহারা মূল পদার্থ।

হীরাকস ও তুঁতিয়ার ন্যায় জলও দুইটী পদার্থ দিয়া গঠিত। এ দুইটী বায়ুর ন্যায় পদার্থ। দুইটী, বায়ুর ন্যায় পদার্থের সংযোগে তরল জল হইয়াছে। ইহাদের একটীর নাম অক্সিজেন, অপরটীর নাম হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছ সে জন্য ইহাদিগকে আমরা চক্ষে দেখিতে না পাইলেও যেরূপ বায়ুর বল আমরা বুঝিতে পারি, সেইরূপ হাই-ড্রোজেন ও অক্সিজেনের গুণ আমরা নানারূপে অনুভব করিতে পারি। অক্সি-জেনের ভিতর জ্বলন্ত বাতি রাখিলে দাউ দাউ করিয়া পুড়িতে থাকে, এমন কি লৌহ পর্য্যন্ত পুড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়। অক্সিজেনের ভিতরে মানুষ রাখিলে তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া এত দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয় যে, সে মানুষ অবিলম্বে ভিতর ভিতর পুড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক সের জল লইয়া তাহার অক্সিজেন এক স্থানে ও হাইড্রোজেন অন্য স্থানে করিতে পারি। তখন সে দুইটী বস্তুকে বায়ুর ন্যায় দেখায়। তাহার পর সেই দুই বস্তুকে একত্র করিয়া পুনরায় সেই এক সের জলে পরিণত করিতে পারি। একত্র হইয়া সেই দুই বস্তু তরল পদার্থ হয়, অর্থাৎ জল হয়।

হীরাকসের লৌহ ও গন্ধক পৃথক করিতে পারি, আবার তাহাদিগকে যোগ করিয়া হীরাকস করিতে পারি। তুঁতিয়ায় তামা ও গন্ধক পৃথক করিতে পারি, আবার সেই দুই বস্তুকে যোগ করিয়া তুঁতিয়া করিতে পারি। জলের হাইড্রো-জেন ও অক্সিজেন পৃথক করিতে পারি, আবার সেই দুই বস্তুকে যোগ করিয়া জল করিতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুর উপাদানকে এরূপ অনায়াসে পৃথক করিতে পারা যায় না। পৃথক করিতে পারিলেও তাহাদিগকে যোগ করিয়া পুনরায় সেই পূর্ব বস্তুতে পরিণত করিতে পারি না। উদ্ভিদ ও প্রাণী শরীর, ও জীব শরীরে যাহা উৎপন্ন হয়, এরূপ বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে পৃথকীভূত করা বড়ই কঠিন কাজ। তাহার পর, কোন বস্তুর কি উপাদান তাহা জানিলেও সেই সমুদয় উপাদান দিয়া সেই বস্তু সৃজন করা আরও কঠিন কাজ। কিন্তু জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে নিয়তই এই চেষ্টা হইতেছে, আর সেই চেষ্টার বলে,

বিটচিনি ইক্ষু-চিনিকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই চেষ্টার বলে কুৎসিত আলকাতরা হইতে মেজেন্ডার রং প্রস্তুত হইয়াছে। সেই চেষ্টার বলে ইউরোপ মহাদেশের লোক কোটি কোটি টাকা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখানেও যাহাতে সেইরূপ চেষ্টা হয়, সেই উদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় বিজ্ঞানালয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানালয়ে কিরূপ কাজ হইতে পারিবে ও কি উপায়ে সরকার মহাশয়ের মনোরথ সিদ্ধ হইবে, তাহা পরে বলিব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য

ইতিপূর্বে আমি মূল পদার্থের কথা বলিতেছিলাম। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ নূন্যাধিক সত্তরটী মূল পদার্থ দিয়া গঠিত। কেবল পৃথিবী নহে,—সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই সে সমুদয় এই কয়টী মূল পদার্থ দিয়া গঠিত। কোটি কোটি ক্রোশ দূরস্থিত নক্ষত্র প্রভৃতি কি দ্রব্য দিয়া গঠিত, তাহা কি করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম? সে কথা এখানে বলিবার স্থান নাই। তবে এখন কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, এ অনুমান নহে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলেও চলে।

সত্তরটী মূল পদার্থ দ্বারা পৃথিবী গঠিত বটে, কিন্তু ইহার সকলগুলি অধিক পরিমাণে নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ পারদ প্রভৃতি ধাতু ব্যতীত, আর কেবল গুটিকত পদার্থ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই ও সচরাচর ব্যবহার করি। যে কয়টী পদার্থ আমরা সচরাচর ব্যবহার করি, তাহাদের মধ্যে চারিটী পদার্থের নাম না করিলে চলে না। কারণ ধাতু ব্যতীত যাহা কিছু আমরা ব্যবহার করি, সে সমুদয় এই চারিটি পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই চারিটী পদার্থের নাম—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বণ। প্রথম তিনটী বায়বীয় পদার্থ, অর্থাৎ বায়ুর ন্যায়। কার্বণ—কয়লার ন্যায়। সেজন্য বাঙ্গালায় কেহ কেহ ইহার নাম "অঙ্গার" দিয়াছেন। আমরা যে নিশ্বাস লই, তাহা অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। অক্সিজেন জীবের জীবন, কারণ অক্সিজেন নিশ্বাস না লইলে জীব মরিয়া যায়। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস লই, চাপ দিয়া তাহাকে জলের ন্যায় তরল করিতে পারা যায়, এবং বরফের ন্যায় কঠিন করিতে পারা যায়। সে তরল বায়ু এত শীতল যে, যেমন আগুনে হাত পুড়িয়া যায়, তেমনি তাহার শীতলতায় হাত পুড়িয়া যায়।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই দুই বায়বীয় পদার্থের সংযোগে জল হইয়াছে। জলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই দুই পদার্থে পরিণত করিতে পারা যায়। এই দুই পদার্থকে যোগ করিয়া পুনরায় কি জল করিতে পারা যায়? হাঁ, তাহা করিতে পারা যায়। কার্বণ, অর্থাৎ কয়লা দ্বারা বহুমূল্য হীরক গঠিত। কার্বণ দিয়া আমরা কি হীরক করিতে পারি? হাঁ, কতক পরিমাণে তাহা আমরা করিতে পারি; কিন্তু ভালরূপ নহে।

উদ্ভিদ্ ও জীব-দেহ, প্রধানতঃ অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বণ দিয়া গঠিত। অর্থাৎ; আমাদের খাদ্য-সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, তৈল, ঘৃত, রং, সুগন্ধ, প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু, এই কয়টি পদার্থ দিয়া গঠিত। যদি এই কয়টি পদার্থ দ্বারা চাউল, গম, দাল, সরিষা প্রভৃতি সমুদয় বস্তু গঠিত, তাহা হইলে ইহাদিগকে যোগ করিয়া আমরা চাউল প্রভৃতি বস্তু প্রস্তুত করিতে পারি? না, তাহা আমরা এখনও পারি না। তাহার কারণ এই যে, কোন্ বস্তুতে কি কি

পদার্থ কিভাবে সজ্জিত আছে, তাহা আমরা ভালরূপ জানি না। যে লোক অট্টালিকা নির্মাণের কাজ একেবারেই জানে না, তাহাকে যদি একটী অট্টালিকা নির্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে কি করিবে? প্রথম তাহাকে দেখিতে হইবে যে, অট্টালিকা কি কি বস্তু দিয়া প্রস্তুত হয়। কেহ যদি তাহাকে একথা বলিয়া দিতে না পারে, আর চারিদিকে যদি বৃথা অনেক অট্টালিকা পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সে অনেকগুলি অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া দেখিবে যে, কি দিয়া তাহারা নির্মিত। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ ক্রমাগত এই কাজ করিতেছেন। পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তাঁহারা ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া দেখিতেছেন যে, তাহারা কি কি মূল পদার্থ দিয়া গঠিত। কিন্তু এ কাজ সামান্য নহে, অতি কঠিন কাজ। অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া দেখিলাম যে, ইট, চূণ সুরকি, কাঠ, লৌহ প্রভৃতি বস্তু দিয়া গঠিত; কিন্তু কত চূণ, কত সুরকি, কত ইট দিয়া গঠিত? তেমনি এক একটী পদার্থ কত অক্সিজেন, কত হাইড্রোজেন, কত নাইট্রোজেন, কত কার্বণ দিয়া গঠিত? সে তত্ত্ব বাহির করা আবার আরও কঠিন কাজ। তাহার পর অট্টালিকা নির্মাণ করিতে ইট কিভাবে গাঁথিতে হইবে, কিসের পর কি দিতে হইবে? বস্তুসমূহের বিষয়ে এ জ্ঞান লাভ করা আরও বিষম কাজ। কারণ মূল পদার্থের পরমাণু আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না।

এইরূপ নানা কারণে, উদ্ভিদ্ ও জীবদেহ কি কি মূল পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলেও সে সমুদয় পদার্থ যোগ করিয়া আমরা উদ্ভিদ্ ও জীবদেহ সৃজন করিতে পারি না। পরমাণুর সংযোগে এ সমুদয় বস্তু সৃজন করা যে মানুষের সাধ্য, একশত বৎসর পূর্বে যদি কেহ সে কথা বলিত, তাহা হইলে লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এখন বুঝিয়াছেন যে, এ কাজ মানুষের সাধ্যাতীত নহে। ফল কথা, কি বস্তু কি দিয়া গঠিত, তাহা জানিতে আর সেই বস্তু তাই দিয়া সৃজন করিতে, ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে। আর এ পর্য্যন্ত এ চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই চেষ্টার ফলে ইউরোপের লোক নানা প্রকার রং ও সুগন্ধ প্রস্তুত করিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমরাই অনেক টাকার চাউল প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য দিয়া সেই সমুদয় বস্তু ক্রয় করিতেছি। লক্ষ লক্ষ টাকার যে বিটচিনি এদেশে আমদানী হয়, সে বিট কি? সে বিট এক প্রকার পালংশাকের গোড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেড়শত বৎসর পূর্বে এই পালং শাকের গোড়া হইতে কেহ এক ছটাকও চিনি বাহির করিতে পারিত না। এখন একমণ গোড়া হইতে সাত সের চিনি বাহির হইতেছে। ইক্ষু হেন সুমিষ্ট রস-সম্পন্ন দ্রব্যকেও বিট পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু বলিতে গেলে বিট ইক্ষুকে পরাজয় করে নাই; ইউরোপবাসীদের বিদ্যা বুদ্ধি আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়াছে। সম্প্রতি সেই দেশের লোক কৃত্রিম নীল বাহির করিয়াছে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি হইবে কি লাভ হইবে, সে বিচারে এখন আবশ্যক নাই। এখন কেবল এই কথা বলিতে পারা যায় যে, যে বস্তু ঈশ্বরসৃষ্ট উদ্ভিদ দেহ সঞ্চিত হইত, সে বস্তু এখন মানুষ ঘরে প্রস্তুত করিতেছে। মৃত্তিকা কি, ইট কি অনুসন্ধান করিতে করিতে নূতন একটি ধাতু বাহির হইয়া পড়িল। সেই ধাতু রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। এই ধাতু আর একটু সস্তা হইলেই, পিতল কাঁসার বাসন উঠিয়া যাইবে। আমাদের দেশ হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে জর্ম্মানি দেশে অনেক শুষ্ক নারিকেলের শাঁস প্রেরিত হয়। তাহা হইতে সেস্থানের লোক চমৎকার মাখন প্রস্তুত করিতেছে। নারিকেল হইতে যদি ভাল মাখন হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে ভাল ঘৃতও হইতে পারে। কিন্তু

কি করিয়া করিতে হয় তাহা আমরা জানি না। নারিকেল তৈল উপকারী বস্তু। ঘৃত অপেক্ষা না হউক, কিন্তু ইহা বলকারক খাদ্য। তবে গন্ধের নিমিত্ত কোন বস্তু ইহা দ্বারা পাক করিতে পারা যায় না। এ দেশে এমন উপকারক দ্রব্য থাকিতে, পচা চর্বি দ্বারা প্রস্তুত দুর্গন্ধযুক্ত ঘৃতের জ্বালায় লোক উৎপীড়িত হইয়াছে। নারিকেল তৈল হইতে যিনি ঘৃত প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তিনি নিজে যে কেবল বড় মানুষ হইবেন তাহা নহে ; তিনি দেশের লোককেও এক বিষম দায় হইতে উদ্ধার করিবেন।

কেবল যে রসায়ন শাস্ত্রের সহায়তায় মানুষ নূতন নূতন কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা নহে। ভূতত্ত্ব-বিদ্যার সহায়তায়, কোথায় কয়লা আছে, কোথায় স্বর্ণ আছে মানুষ তাহা জানিতে পারিতেছে। তাড়িতবিদ্যার সহায়তায় মানুষ সূর্য্যের আলোক উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, আর লৌহ প্রভৃতি নানারূপ ধাতু সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতেছে। যে সমুদয় কাজ পূর্বে দেবতার কাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল, মানুষ এখন সেই সকল কাজ করিতেছে। সুতরাং যাহারা এই সমুদয় কাজ করিতেছে, তাহারা দৈববলে বলীয়ান হইয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইতেছে। আর যাহারা এই সকল বিদ্যা অবগত নহে তাহারা পশু-তুল্য হইয়া কষ্টে দিনপাত করিতেছে।

আমরা দরিদ্র হই, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই ; কিন্তু পৃথিবীতে যে সমুদয় জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতে যে আমরা বঞ্চিত হইয়া আছি, তাহাই বড় দুঃখের বিষয়। বিদ্যাই মানুষের বল, বিদ্যাই মানুষের অলংকার। বিদ্যা ও বুদ্ধিবলেই মানুষ পশু অপেক্ষা উচ্চ আসনে আসীন হইয়াছে। সে বিদ্যা হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিতে পারি না। যেমন করিয়া পারি, সে বিদ্যা আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। বিদ্যায় যেন আমাদিগকে কেহ পরাজয় না করিতে পারে, সর্বদা আমাদিগকে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। বিদ্যা হইলে আমাদের ধন হইবে, আমাদের বল হইবে, আমাদের সম্মান হইবে, আমাদের সব হইবে।

এই নূতন বিদ্যা আমাদের দেশে আনিবার নিমিত্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানালয় স্থাপিত করিয়াছেন। রসায়ন তাড়িত প্রভৃতি বিদ্যাবলে অন্যান্য দেশের লোক যে সমুদয় অলৌকিক কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছে, আমাদের দেশের লোকও যাহাতে সেই সমুদয় কাজ করিতে পারে, এই বিজ্ঞানালয়ের তাহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এ একজনের কাজ নহে, এ একদিনের কাজ নহে। ক্রমাগত চেষ্টা, ক্রমাগত পরীক্ষা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে হইবে। তবে ইহা হইতে সুফল ফলিবে। সরকার মহাশয় বীজ বপন করিয়াছেন। সেই বীজ হইতে যে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, তাহাকে লালন পালন করিয়া ফলবান বৃক্ষে পরিণত করা এক জনের কাজ নহে। বিজ্ঞানালয়ের উদ্দেশ্য কি করিয়া সাধিত হইবে, সে বিষয়ের আলোচনা আমি পুনরায় করিব।

তৃতীয় প্রস্তাব : স্বদেশের হিতকামনা

সরকার মহাশয় কি উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বিজ্ঞানালয় স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা আমি পূর্বে বলিয়াছি। সংসারে বাস করিতে হইলে তিনটী বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজন হয়,—১। সুস্থ শরীর, ২। জ্ঞান, ও ৩। অর্থ। সত্য ও ঈশ্বরে ভক্তি, সকলের আগে প্রয়োজন। কিন্তু এ দুই বিষয়ে লোককে শিক্ষা

দিবার নিমিত্ত ভারতে অনেকগুলি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে ও অনেক ধর্ম্মপ্রচারক আছেন। সে জন্য আমি এই সামান্য ইহজীবন সম্বন্ধে লোককে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বিজ্ঞানালয়ের কার্য্য যদি সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়, তাহা হইলে সুস্থ শরীর, জ্ঞান ও অর্থ,—এই তিন বিষয় দ্বারাই ভারতের লোক ভূষিত হইতে পারে। পৃথিবী অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। রঘু-রাজের দিগ্বিজয় উপলক্ষে কালিদাস, দেশের অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এখন আর সে অবস্থা নাই। যে স্থানে পূর্বে নৈমিষারণ্য ছিল, এখন সে স্থানে বনের ছিটে ফোঁটাও নাই। আমাদের চক্ষের উপরেই সুন্দরবন আবাদ হইয়া গেল। বন থাকিলে ভূমিতে রস থাকে, মেঘ আকৃষ্ট হয় ও অধিক বৃষ্টি হয়। বনের অভাবে এ সকলের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার পর রেল-পথ-নির্ম্মাণে অনেক স্থানে জল-নির্গমণের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। গঙ্গার মুখে প্রতি বৎসর রাশি রাশি পলি পড়িয়া ক্রমে ক্রমে নূতন দেশের সৃষ্টি হইতেছে। প্রবল স্রোতস্বতী নদী সকল এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ফল কথা, নানা কারণে দেশের জল-বায়ু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে সকল বস্তু দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, সেই সমুদয় বস্তুর পরিবর্ত্তন হইলে আমাদের আচার-ব্যবহারও পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কারণ, বাহ্য-বস্তুর সহিত আমাদের শরীরের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই আমরা জীবিত থাকি। বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হইলেই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। ত্বক যখন বাহ্য-বস্তু আর স্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষু যখন দর্শন করে না, কর্ণ যখন শ্রবণ করে না, মন যখন চিন্তা করে না, তখনই আমরা বলি যে মৃত্যু হইয়াছে। বাহ্য-বস্তুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ যখন জীবন, তখন বাহ্য-বস্তুর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে শরীরের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। সেই জন্য শীতকালে আমরা শীতবস্ত্র পরিধান ও বর্ষাকালে ছাতি ব্যবহার করি। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নূতন ব্যবহার প্রয়োজন হয়, সেই জন্য প্রাচীনকালে ক্রমে ক্রমে এতগুলি সংহিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এখন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে নূতন ব্যবস্থা করে কে? এখন আর আমরা কোন উপদেশ পাই না। পৃথিবীতে যখন নূতন তাঁতের সৃষ্টি হইল, তখন কেহ কি দেশের তন্তুবায়-দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন? উপদেশচ্ছলে সেই অজ্ঞলোকদিগকে কেহ একটী কথাও বলেন নাই। সে জন্য অতি নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। নূতন উপদেশের অভাবে এইরূপে নানা দিকে আমরা উৎসন্নে যাইতেছি।

দেশের লোককে নূতন নূতন বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্তই এই বিজ্ঞানা-লয় স্থাপিত হইয়াছে। দেশের জলবায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সে জন্যই হউক, কি যে জন্যই হউক, আমরা এখন নূতন নূতন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতেছি। এক ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশের লোককে উৎসন্ন দিতেছে। ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত আমরা কি চেষ্টা করিতেছি? কিছুই নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ! সাহেবেরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজ স্বরূপ এক প্রকার জীবাণু আছে। ম্যালেরিয়া জ্বর দ্বারা আক্রান্ত মনুষ্য অথবা পশুদিগের রক্তে এই জীবাণু অধিক পরিমাণে থাকে। এক্ষণে কথা এই যে কোথা হইতে এই জীবাণু আসিয়া মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করে? অনেক অনুসন্ধান করিয়া সাহেবেরা দেখিলেন যে, মশক, মনুষ্য শরীরে বসিয়া শোণিত পান করিলে—সেই শোণিতের সহিত মশক-শরীরেও এই জীবাণু প্রবেশ করে। যাঁহারা পরীক্ষা

করিতেছিলেন, সেই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, সেই মশক দ্বারা আপনাদের শরীর দংশন করাইলেন। মশক দংশনের দুই চারি দিন পরে তাঁহারা কম্প সহিত ম্যালেরিয়া জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। ইহাতে কি প্রমাণ হইল? ইহাতে প্রমাণ হইল যে, যে মশা কোন ম্যালেরিয়া-জ্বর কর্তৃক আক্রান্ত রোগীর রক্ত পান করিয়াছে, সে মশা যদি সুস্থ মনুষ্যকে দংশন করে, তাহা হইলে সেই সুস্থলোকও ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হয়। আমাদের পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীর অভাব নাই, আর মশকেরও অভাব নাই। সুতরাং মশকের দ্বারা এক জনের শরীর হইতে অন্য জনের শরীরে যে এই বিষ নীত হইবে, সে আর বিচিত্র কথা কি। যাহা হউক, পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ কতকটা এইরূপে বাহির করিলেন। সকল মশক ম্যালেরিয়ার কারণ নহে। মশার অনেক জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে আনোফিলিস নামক এক জাতীয় মশা দ্বারাই এক জনের শরীর হইতে অন্য জনের শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ সঞ্চালিত হয়। এখন কথা এই যে, যদি এই জাতীয় মশা একেবারে নির্মূল করিয়া ফেলিতে পারা যায়, অথবা মনুষ্যকে যাহাতে ইহারা দংশন করিতে না পারে সেই রূপ উপায় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া জ্বর কি নিবারিত হয়? ইতালী দেশে ও কিউবা দ্বীপে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই মশক যদি মানুষকে দংশন না করে, তাহা হইলে মানুষ ম্যালেরিয়া জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হয় না। আফ্রিকার পশ্চিমকূলে সিরালিওন নামক ইংরেজ অধিকৃত স্থান আছে। এ স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের এত প্রাদুর্ভাব ছিল যে, কোন শ্বেত মনুষ্য এ স্থানে অধিক দিন বাস করিতে পারিত না। সেজন্য এই স্থানের নাম হইয়াছে White Man's Grave অর্থাৎ "শ্বেত মানুষের কবর স্থান"। কিন্তু এখন সাহেবেরা কেরোসিন তৈলের সহায়তায় আনোফিলিস মশক অনেক মারিয়া ফেলিয়াছেন। সেই অবধি এ স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বর অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্বে যে হাসপাতালে ঃ একশত জন ম্যালেরিয়া রোগী থাকিত, এখন সে স্থানে পাঁচ জন, কি ছয় জনের অধিক নাই। আমাদের দেশে নাগপুরের জেলখানায় ম্যালেরিয়া মশক সম্বন্ধে সাহেবেরা অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। ত্রিশ জন লোককে রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা মশারী দিয়াছিলেন। বাকি লোক বিনা মশারি রাত্রি যাপন করিত। যে ত্রিশ জন মশারির ভিতর নিদ্রা যাইত, তাহারা ম্যালেরিয়া জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই; কিন্তু যাহারা আদুড় গায়ে শয়ন করিয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

মশক, ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ হউক আর না হউক; কিন্তু উপরের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, মানুষ এখন কতদিকে কতরূপ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতেছে। এইরূপ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার গুণে অন্যান্য দেশের লোক নানা বিষয়ে জ্ঞান-সঞ্চয় করিতেছে, আর সেই জ্ঞানের সহায়তায় তাহারা অসীম বিক্রমশালী ও অপরিমিত ধনশালী হইতেছে। কিন্তু এই সমুদয় নূতন জ্ঞানে আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া আছি। যাঁহারা আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করি, যাহাতে আমাদের দেশের লোক এই সমুদয় নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত কি না? আমার মত এই যে, যদি আমরা এই সমুদয় নূতন জ্ঞানলাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের বড় দুর্গতি হইবে। তাহা হইলে হয় আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইব, আর না হয় পশুতুল্য হইয়া আমাদিগকে জীবনযাপন করিতে হইবে। পশু পক্ষীরাও আপন আপন পরিবার প্রতিপালন

করে। কিন্তু মানুষ স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর হিত চিন্তা করে। কেবল স্বদেশবাসীর কেন? মহাত্মাগণ সমস্ত মানব জাতির হিত চিন্তা করেন। যাঁহারা আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাঁহারা সকলেই স্বদেশের মঙ্গল চিন্তা করেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। এরূপ চিন্তা করিলে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরও উপকার হইবে। অমৃতবাজার পত্রিকা বার বার লিখিতেছেন যে, আমাদের দেশের ভদ্র ও শিক্ষিত জাতিরা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। এই কলিকাতার নিকট গ্রামগুলির শোচনীয় অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কলিকাতার নিকটে অনেক গ্রাম জনশূন্য হইয়া নিবিড় বনে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, সে সম্বন্ধে কি একটু চিন্তাও আমরা করিব না? যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা তিনি সেইরূপ কি একটু যত্নও করিবেন না?

দেশের হিত-কামনা করিতে হইলে আমাদের প্রথম চিন্তা করিতে হইবে,—আধুনিক জ্ঞানসঞ্চয়। এই আধুনিক জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত সরকার মহাশয় সূত্রপাত করিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞানালয়ে যাহাতে সুচারুরূপে কাজ হয়, এক্ষণে সেই বিষয়ে আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে। বিজ্ঞানালয়ের প্রথম কাজ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা। নানা বিষয়ে ক্রমাগত অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে হইবে। সেই পরীক্ষার জন্য লোক আবশ্যক। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, তাড়িত প্রভৃতি এক একটী বিষয় লইয়া এক একটী লোক ব্রতী থাকিবেন। এক একটী বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে তিনি জীবন অতিবাহিত করিবেন,—তবে যদি কিছু ফল হয়। জর্মানিতে যে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দশ বৎসর পরীক্ষার পর তবে হইয়াছে। ক্রমাগত অনুসন্ধান ও পরীক্ষার নিমিত্ত পাঁচ জন দেশীয় লোক নিযুক্ত রাখিতে ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে মাসে তিন হাজার টাকার কম হয় না। অন্ততঃ পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা মূলধন হইলে, তাহার সুদ হইতে এ কাজ এক প্রকার চলিতে পারে। কিন্তু এ পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা কোথা হইতে আসিবে? সরকার মহাশয় সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া বিজ্ঞানালয়ের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; সুতরাং সকলেই মনে করিতে পারেন যে, বিজ্ঞানালয়ের নিমিত্ত পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা কিছুতেই সংগ্রহ হইবে না। কিন্তু আমি হতাশ হইতে পারি না। আমাদের দেশের লোক নির্বোধ নহেন। আমি বার বার বলিয়াছি যে, বাঙ্গালীর বুদ্ধি যেরূপ প্রখর, এরূপ প্রখর বুদ্ধি আমি কুত্রাপি দেখি নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালিগণের যদি একবার ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে এই কাজ করিলে আমাদের দেশের মঙ্গল হইবে, আর স্বদেশের মঙ্গলে তাঁহাদের নিজেরও মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে সেই কার্য্যে ব্রতী হইবেন। কি কাজ করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে, সেই বিষয়ের আলোচনা আজ আমি কুড়ি বৎসর ধরিয়া করিতেছি। সে আলোচনা বিফল হয় নাই। নানা বিষয়ে অনেক লোকের চক্ষু এক্ষণে উন্মুক্ত হইয়াছে; আর "সকলে আমরা দেশের হিত-সাধনে ব্রতী হইব।" এই বলিয়া লোকের মনে একটা প্রতিজ্ঞার আভাস উদয় হইয়াছে। যাঁহাদের মনে এইরূপ চিন্তা উদয় হইয়াছে, পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা যদি বিজ্ঞানালয়ের নিমিত্ত মূলধন সঞ্চয় করেন তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, ভারতবাসীরা যদি আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা না করে, আর সেই বিজ্ঞান যদি কৃষিকার্য্য, কারুকার্য্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রয়োগ না করে, তাহা হইলে তাহাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। তাহা হইলে দেশ হইতে মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোক একেবারে লোপ হইবে। তাহা হইলে আমাদের সন্তান-সন্ততিগণকে পশুতুল্য হইয়া কুলিবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে।

শেষ প্রস্তাব : স্বদেশের হিতকামনা

যে কাজ করিলে ভারতের মঙ্গল হয়, সেই কাজে সকলেরই যথাসাধ্য সহায়তা করা কর্তব্য। এই ভারত আমাদের পিতৃ ও মাতৃ-ভূমি। যেমন মাতার স্তন্যপান করিয়া শিশুগণ প্রতিপালিত হয়, সেইরূপ ভারতজাত দ্রব্যে আমরা প্রতিপালিত হইতেছি। আমাদের শরীরের অস্থি, মাংস, রক্ত ভারতের ভূমি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ভারত আমাদের পূর্বপুরুষগণের কীর্তিস্থল। এই স্থানে ভরদ্বাজ, ভৃগু, কশ্যপ প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ মানবকুলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে মনু, মানবাদিগের হিতের নিমিত্ত যে সমুদয় বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এখনও সেই সমুদয় বিধি আমরা যথাসাধ্য মান্য করিয়া থাকি। এই ভারতের প্রজাপুঞ্জকে হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি রাজগণ পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই ভারতে বাস করিয়াছিলেন, আমরাও বাস করিতেছি, আমাদের বংশধরগণ এই ভারতে বাস করিবে। এই ভারতভূমি পিতৃগণের প্রিয় স্থান, আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদেরও ইহা প্রিয় ভূমি হইবে। ভারতের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, ভারতের হিতের নিমিত্ত আমরা কি করিতেছি? পশুদিগের ন্যায় কেবল আমরা নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের উদরপূরণে ব্যস্ত আছি। "ভারতের হিত"—ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ—আমাদের নিজের ও আমাদের সন্তান-সন্ততির হিত ব্যতীত আর কিছুই নয়। দেবতাগণ স্বর্গ হইতে, পিতৃগণ পিতৃলোক হইতে, আমাদের কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া আমাদিগকে মস্তক অবনত না করিতে হয়, তাহাই আমার প্রার্থনা।

ভারতের মঙ্গল সাধন এক জনের কাজ নহে, অনেক লোকের কাজ। প্রাচীন কথা আছে যে, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" কিন্তু এই প্রাচীন উপদেশ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। দশ জনে মিলিয়া আমরা যে কোন কাজ করিতে পারি না—ইহা সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে দশজনে মিলিয়া বড় বড় সাম্রাজ্য শাসন করিতেছে; কিন্তু আমরা দশজনে মিলিয়া সামান্য একটী সভার কার্য্য, কি সামান্য একটী যৌথ কারবার নির্বাহ করিতে পারি না। সাত সমুদ্র পার, ছয় মাসের পথ হইতে জন কত বণিকের ভৃত্য আসিয়া, এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু দুই ক্রোশ দূরে ভৃত্য-হস্তে সামান্য একটী দোকান সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে হইলে, সকল সময়ে, সকল বিষয়ে সকলের এক মত হইতে পারে না। এরূপ স্থলে অন্যান্য দেশের লোক সঙ্গিগণকে প্রথম আপনার মতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন। সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, তাহারা মস্তক অবনত করিয়া অধিকাংশের মত গ্রহণ করেন, আর যাহাতে সেই মতানুযায়ী কার্য্য হয়, সে বিষয়ে সকলেই তখন যত্ন করেন। কিন্তু আমরা তাহা করি না। কোন বিষয় আমাদের মনোমত না হইলে, অধিকাংশের মতের বিরোধী হইয়া যাহাতে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে—সে বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সেই অধিকাংশ লোকের সহিত আমরা শত্রুতা করি, দলাদলি করি, মারপিট করি ও পরে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করি। যদি সভা লইয়া এরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অবশেষে যাত্রাদলের ন্যায় ভাঙ্গা সভা স্থাপিত করি। বলা বাহুল্য যে, যে জাতির এরূপ প্রবৃত্তি—সে জাতির লোক দশজনে মিলিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। সেজন্য সাধারণের হিতের নিমিত্ত যে কোন কাজে

আমরা প্রবৃত্ত হই না কেন, তাহার প্রথমেই আমাদিগকে এইরূপ সত্যে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, অধিকাংশের যেরূপ মত হইবে, সেই মত আমরা শিরোধার্য্য করিব। নিঃস্বার্থভাবে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, আপনা হইতেই মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা আসিয়া যায়। কিন্তু নিজের লাভের জন্য অথবা নামের জন্য অথবা অন্য কোনরূপ স্বার্থের জন্য, যদি আমরা অপবিত্র মনে কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে এরূপ প্রতিজ্ঞা মনে কখন উদয় হয় না। অধিকাংশ লোক কোনরূপ অন্যায় করিলে, তাঁহাদিগকে কুপথ হইতে সুপথে আনিবার নিমিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। সত্যের জয় হইতে কিছু বিলম্ব হইলেও, অবশেষে সত্যের জয় নিশ্চয় হইয়া থাকে।

দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে পারিলে, নানা বিষয়ে আমরা ভারতের উপকার করিতে পারি। যে সমুদয় বিদ্যার সহায়তায় অন্যান্য জাতি প্রভূত ধনশালী ও পরাক্রমশালী হইয়াছে—সেই সমুদয় জ্ঞান দ্বারা ভারতবাসীকে আমরা ভূষিত করিতে পারি—নানারূপ রোগ হইতে ভারতের লোককে মুক্ত করিতে পারি। যে ভূমিতে এখন এক মণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই ভূমিতে দুই মণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারি। যে সমুদয় বনজাত দ্রব্য এখন বনে পচিয়া নষ্ট হইতেছে, সেই সমুদয় দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করিয়া —তাহাদের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য উপার্জন করিতে পারি। যে সমুদয় কারুকার্য্যের বিনিময়ে এখন লক্ষ লক্ষ মণ চাউল, গম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশীয়দিগকে প্রদান করি, সে সমুদয় কারুকার্য্য দেশে করিয়া—সেই লক্ষ লক্ষ মণ চাউল প্রভৃতি দেশে রাখিতে পারি ও তাহা দ্বারা লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু ভারতবাসিকে ক্ষুধার জ্বালা হইতে পরিত্রাণ করিতে পারি। অন্যান্য দেশের লোক যে সমুদয় শিল্প দ্রব্য আদরে ক্রয় করে, সে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশীয় অর্থ আমরা ভারতে আনিতে পারি। ভারতের বণিক্‌কুল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয় আমদানি রপ্তানি এখন বিদেশীয়দিগের হাতে, প্রতি বৎসর একশত কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি রপ্তানি হইতেছে। শক্তিহীন, জ্ঞানহীন পাগলের ন্যায় এই বিশাল বাণিজ্যের দিকে আমরা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ নয়নে চাহিয়া আছি। কিন্তু চেষ্টা করিলে আমরা সেই ধনপতি সওদাগর—সেই শ্রীমন্ত সওদাগরের মত লোককে ভারতে পুনর্ব্বার উৎপাদিত করিতে পারি। এ সকল কথার কথা নহে। আমি নিজে এইরূপ অনেক কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি, সেইজন্য বলিতেছি। নানারূপ বিজ্ঞান বিষয়ে আমি সাধারণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। নিজ মস্তকে ইষ্টকখণ্ড বহন করিয়া আমি গ্রামবাসীদিগকে কাদার দায় হইতে উদ্ধার করিয়াছি। নিজ হস্তে বন কাটিয়া আমি গ্রামবাসীদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে জ্বরের যাতনা হইতে নিস্তার করিয়াছি। গোখাদ্যের চাষ করিয়া গো জাতির ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছি। যে মূল মানুষে ভক্ষণ করে, সেই দ্রব্যের চাষ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছি। যে স্থানে আলুর চাষ ছিল না, সে স্থানে আলুর চাষ প্রচলিত করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মানুষের খাদ্য উৎপাদন করিয়াছি। বনজাত হরীতকী প্রভৃতি ব্যবসায় উন্নতি করিয়া, বিদেশ হইতে নূতন অর্থ দেশে আনিয়াছি। ছাতা নির্ম্মাণকার্য্যের সূচনা করিয়া ছাতার বিনিময়ে যে অর্থ বিদেশে প্রেরিত হইত, তাহার কিয়দংশ দেশে রাখিয়াছি। লোপপ্রায় তারকশি কার্য্যকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছি। মোরাদাবাদের সিয়া-কলম প্রভৃতি কারুকার্য্য বিদেশীয়দিগকে বিক্রয় করিয়া, বিদেশের টাকা দেশে আনিয়াছি। নিজের গৌরব করিবার নিমিত্ত আমি এ সকল কথার উল্লেখ করি নাই। যে সমুদয় কার্য্যের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যে আমাদের সাধ্যাতীত নহে—তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত আমি নিজের কথা উল্লেখ করিলাম। ঘোরতর হতাশ সমুদ্রে আমরা এখন হাবুডুবু

খাইতেছি। এই দুঃসময়ে কোন একজন লোক সামান্য কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছে—সে কথা শুনিলেও লোকের মনে আশার সঞ্চার হয়। লোককে উৎসাহিত করিবার নিমিত্তই আমি নিজের কথা উল্লেখ করিলাম। যদি দোষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমরা হতাশ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। স্বদেশের উপকার করিতে ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে জানেন না যে, কি উপায়ে তাহা করিতে পারা যায়। নিজের পরিবারের, প্রতিবাসিদিগের ও গ্রামবাসীর উপকার অনেকে করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার উপরে যাইতে বড় কেহ পারেন না। বৃহৎ বৃহৎ কাজ ব্যতীত অনেক সামান্য সামান্য কাজ আছে ,যাহা অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সামান্য একটী কাজের উল্লেখ করি। পশ্চিমে সকল নগরে ও প্রায় সকল বড় বড় গ্রামে পান্থশালা আছে। কিন্তু কলিকাতায় সেরূপ পান্থশালা নাই। পল্লিবাসিদিগকে কোন কর্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে হইলে, বড়ই বিপদে পতিত হইতে হয়। এ দুঃখ অতি সহজেই দূর হইতে পারে। তাঁহার নাম ধন্য হউক, যিনি হাওড়া ষ্টেশনের নিকট এইরূপ এক পান্থশালা নির্মাণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ের এখন আর আলোচনা করিব না।

আমার কামনা ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অধিক। সমগ্র দেশের লোককে জ্ঞানে, ধনে ও সম্মানে ভূষিত করিতে পারি তাহাই আমার কামনা। এ কাজের সূচনা করিতে হইলে, প্রথম আধুনিক জ্ঞানের আবশ্যক। সেই জন্য সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞানালয়ের কথা প্রথমেই আমি উত্থাপিত করিয়াছি। এই বিজ্ঞানালয়ে কেহ বা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, কেহ বা প্রাণীতত্ত্ব, কেহ পদার্থতত্ত্ব, এইরূপ নানা বিষয়ের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা লইয়া জীবন অতিবাহিত করেন, তাহাই এখন নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ কাজ আরম্ভ করিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা মূলধনের আবশ্যক। এখন সময় এইরূপ পড়িয়াছে যে, যে কাজেই প্রবৃত্ত হই না কেন, সেই কাজই লক্ষ লক্ষ টাকার মূলধন ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। দেখিতে অধিক টাকা বটে; কিন্তু দশ জনে মিলিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিলে, এ মূলধন অনায়াসেই একত্রিত হইতে পারে। এই বঙ্গদেশে প্রায় এক লক্ষ লোক আছে, যাহারা ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্বাহ করে। অনেক হিন্দু বৈরাগী ও মুসলমান ফকির আছে, যাহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে এই কাজ ব্যতীত অন্য কাজ কখনও করে না। ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কাজ করিলে তাহাদের অধর্ম হয় ও জাতি যায়। যেমন তেমন করিয়া মাসে এক টাকার কম একজন লোক প্রাণধারণ করিতে পারে না। তবেই হইল যে, এই বঙ্গদেশের ভিখারিগণ মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা হউক অথবা অন্য কোন প্রকার ভিক্ষাদ্বারা হউক প্রতি বৎসর বার লক্ষ টাকা লোকের নিকট আদায় করিয়া থাকে, বরং অধিক তবু কম নহে।

বৃদ্ধ, দীন-পিতা ভারতের নিমিত্ত ভিখারীর আবশ্যক। যুবক পুরুর নব শোণিতে যযাতি রাজার জীর্ণদেহ যেরূপ সজীব হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতপুত্র-দিগের শোণিতে বৃদ্ধ ভারতের দেহকে সজীব করিতে হইবে। বৃদ্ধ ভারতকে শোণিত প্রদান করিবার নিমিত্ত পিতৃভক্ত পুত্র কি বঙ্গদেশে আছেন? তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ভারতের হিতের নিমিত্ত ভিখারী হইয়া তাঁহাদিগকে ভিক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ শোণিত আমি প্রার্থনা করি। এরূপ কাজে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার; এরূপ প্রতিজ্ঞা কি তাঁহারা করিতে পারিবেন? যদি বঙ্গদেশে এরূপ লোক থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপন আপন নাম ও ঠিকানা পোষ্টকার্ডে লিখিয়া "ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার" মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। অমৃতবাবু "শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল

সরকার" মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। ইনিও ডাক্তার। বিজ্ঞানালয়ের নিমিত্ত ইনিও নিজের প্রাণ সঁপিয়াছেন। তাহা ব্যতীত এই কলিকাতা নগরের গীতা-সমাজ ইহাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নিকট নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে তাহার পর কি করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিব। ভারতের হিতের নিমিত্ত যদি পঞ্চাশ হাজার ভিখারী একত্রিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ টাকা অনায়াসেই তুলিতে পারা যায়। দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিতে হয় না। অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্যের সময় লোকের নিকট কিছু কিছু প্রার্থনা করিলেই, বোধ হয় যথেষ্ট হয়। আমাদের অনেক গ্রাম, আমরা অনেক লোক। "দশের লাঠি, একে বোঝা"; এক এক জনের নিকট সামান্য কিছু আদায় করিতে পারিলেই টাকার বোঝা হইয়া পড়ে। এক এক জনের নিকট যৎসামান্য কিছু কিছু আদায় করিয়া প্রতি বৎসর যদি পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে দশবৎসরের ভিতর দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রথম বৎসরের টাকা ধর, বিজ্ঞানালয়ের কার্য্যে প্রদান করিলাম। দ্বিতীয় বৎসরের টাকায় নূতন একটী কল-কারখানা স্থাপিত করিলাম। এইরূপ পাঁচ বৎসরের টাকায় পাঁচ প্রকার কল-কারখানা স্থাপিত করিলাম। এই পাঁচটী কারখানা যেই লাভবান হইল, অমনি সাধারণকে তাহা বেচিয়া ফেলিলাম; আর সেই টাকায় পুনরায় নূতন পাঁচটী কারখানা স্থাপিত করিলাম। চিঁড়ের বাইশ ফের হইয়া কল-কারখানা এইরূপে বৃদ্ধি হইতে পারে। তাহার পর অন্যান্য বৎসরের টাকায় পাঠশালা, শিল্পবিদ্যালয়, বিজ্ঞান-বিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয় প্রভৃতি নানারূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে।

হয় সব,—যদি পরিশ্রম করিবার নিমিত্ত লোক পাওয়া যায়। উড়িষ্যা ও বেহার পরিত্যাগ করিয়া এই বঙ্গদেশে প্রায় চারি কোটি লোক আশী লক্ষ গৃহস্থের বাস। প্রতি গৃহস্থের নিকট যদি একটা করিয়া পয়সা আদায় করিতে পারা যায়, তাহা হইতে এক লক্ষ টাকা হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছি যে, আমরা অনেক লোক, মনে করিলে আমরা সব করিতে পারি। ভারতের হিতের নিমিত্ত প্রতি গ্রামে যদি একজন করিয়া ভিখারী হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? এইরূপ ভিখারী করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথম যদি এক হাজার লোক হয়, তাহা হইলে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। সেই এক হাজার লোকের শিক্ষায়, উত্তেজনায় ও দৃষ্টান্তে দশ হাজার লোক হইবে। ভারতের হিতের নিমিত্ত এক লক্ষ লোক যদি চারিদিকে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করে, তাহা হইলে আর আমাদের ভাবনা কি? যাহা হউক আপাততঃ আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। ভারতের হিতের নিমিত্ত যিনি পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করিবেন, আপাততঃ তিনি "ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার" মহাশয়ের নিকট আপনার নাম পাঠাইয়া দিবেন। অমৃতবাবুর ঠিকানা—"সাঁকারিটোলা, কলিকাতা।" কাজ করিবার যদি লোক হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাইবে। যদি লোক না হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে শিক্ষিত লোকদিগের জঠরের জ্বালা আরও একটু প্রখরতর না হইলে, তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে না ও দেশে বক্তৃতাস্রোত ঘুচিয়া কার্য্যস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইবে না।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা 'ম্যাকবেথে'র ভূমিকা

[ত্রৈলোক্যনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ আশুতোষ ঘোষ 'ম্যাকবেথ' নাটকের বঙ্গানুবাদ করে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তা প্রকাশ করেন। তাঁর অনুরোধে ত্রৈলোক্যনাথ এই নাট্যানুবাদের একটি ছোট ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকাটি ছোট হলেও এর মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যরুচির নানা ইঙ্গিত পাওয়া যায়; তাছাড়া 'কঙ্কাবতী'র রচনাকালের আভাসও এতে আছে। এই কারণে ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত হলো। ভূমিকাটি শ্রীস্বপন মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদকমণ্ডলী]

Introduction

In the year 1883 the Editor conceived the idea of tssuing (sic) literal translations of the principal dramas of Shakespeare. The metrical translation of Macbeth was accordingly undertaken and finished. But certain circumstances prevented the author from publishing the work. About three years ago while I was writing my Bengalee tale Kankabati (sic) the editor showed me the translation of Macbeth; I was so struck with the beautiful metrical translation of Macbeth that to make English dramas popular in Bengal, immediately the wellknown manager of a distinguished native theatre was written to for its production on the stage, but somehow the scheme fell through. However I insisted the Editor to publish the translations one by one. The reader will see the accuracy of translation, line by line, as well as the beauty of its rendering in Bengalee blankverse. I hope the reading public will appreciate the translatian of the tragedy and encourage the Editor (sic) to publish the translations of Hamlet and other works of the Immortal Bard of the Avon.

12th June 1894 — T. N. MUKHARJI
CALCUTTA
12, Patuatola Lane.